কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী

গবেষকের ডায়েরী

গবেষকের ডায়েরী

কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী
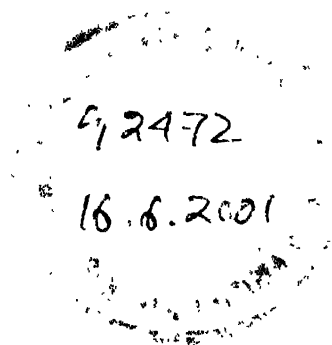
Gobeshakcr Diary
Kumud Kundu Choudhury

গ্রন্থস্বত্ব
শ্রীমতী ফুলকুমারী দেববর্মা

প্রথম প্রকাশ
আগরতলা বইমেলা, ফেব্রুয়ারী, ২০০১

প্রচ্ছদ
ইমানুল হক

প্রকাশক
সুরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরী
জরা পাবলিকেশনস
কর্ণেল চৌমুহনী,
আগরতলা-৭৯৯০০১

আগরতলায় প্রাপ্তিস্থান
ত্রিপুরা দর্পণ
কর্ণেল চৌমুহনী
আগরতলা-৭৯৯০০১

কলকাতায় প্রাপ্তিস্থান
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩-বি, বঙ্কিম চন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা- ৭৩

বর্ণযোজনা ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
কম্পিউট আগরতলা

মূল্য : ২৫০ টাকা

উৎসর্গ

'ককবরক উন্নয়ন পরিষদ' এর

প্রাক্তন সভাপতি

প্রয়াত অ্যাডভোকেট

বীরচন্দ্র দেববর্মণের স্মৃতির উদ্দেশে

এই ডায়েরীতে বিধৃত কাল পরিধি

১লা জানুয়ারী ১৯৮৫ থেকে ৩১শে জানুয়ারী ২০০০ কিছুটা বিক্ষিপ্তভাবে।

মুখবন্ধ

১৯৬৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পাশ করে ত্রিপুরার 'ককবরক উন্নয়ন পরিষদ'-এর ডাকে ককববক ভাষার বিজ্ঞান সম্মত লিখিতরূপ দেয়ার কাজে ত্রিপুরায় চলে আসি। ভাষা গবেষণার কাজ শুরু হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের খ্যাতনামা ভাষাবিদ ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। সেই সময়ে অ্যাডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে তাঁর স্নেহভাজন মুহুরী শ্রীশ দেববর্মা আমাকে কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কুমুদবাবু, আপনি আমাদের এই চতুর্দশ দেবতার মাটিতে কত দিন থাকবেন?' উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'কেন, ককবরক ভাষার গবেষণার কাজ সেরে কলকাতায় ফিরে যাবো।' তিনি আমার কথা শুনে হেসে ফেলে বলেছিলেন, 'জানেন তো, ত্রিপুরায় একটা প্রবাদ আছে — 'চতুর্দশ দেবতার মাটি সেলাম করে হাঁটি', এই পাহাড়ী রাজ্যে একবার কেউ এলে নিজের ইচ্ছেয় আর ফিরে যেতে পারেনা, চতুর্দশ দেবতার ইচ্ছে না থাকলে তার ফিরে যাবাব পথ বন্ধ; আপনার ক্ষেত্রেও তাই হতে পারে।' সে-দিন শ্রীশবাবুব কথার তাৎপর্য ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। আজ দেখছি তাঁর কথাই সত্যি, ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতার মাটি থেকে আমি আর বেরুতে পারিনি, অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেছি ত্রিপুরার ককবরকভাষী উপজাতিদের সমাজ জীবনে। আবার, ককবরকভাষী উপজাতি রমণীর পাণিগ্রহণ করে সেই বন্ধন আরও নিবিড় হয়েছে। উপজাতিদের জীবনের পাশাপাশি ত্রিপুরার বাঙালী সমাজকেও কাছের থেকে দেখারও সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আমার গবেষকের ডায়েরীতে এই দুই জনগোষ্ঠীরই কথা আছে অনেকটা অম্লমধুর ভাবে। এবং পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে এক অজানা জগতে।

গবেষকের ডায়েরী যেমন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, তেমনি শ্রুতিনির্ভরও বটে। বেশ সাহসের সঙ্গে এই দু'ধরনের তথ্যেব সমন্বয় ঘটিয়েছি আমি। ডায়েরীতে চলমান ত্রিপুরার এমন কিছু রাজনৈতিক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছি যা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। ডায়েরীতে জড়িয়ে পড়েছে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কিছু স্মৃতি ও ত্রিপুরার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিব অবদানের কথা। ঠিক একইভাবে এসেছে মুজিব-হত্যার কথাও। আগরতলার উপজাতীয় ঠাকুব লোকের কিছু ব্যক্তির কথা লোকমুখে শুনে আমি তুলে ধরেছি অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে। তবে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দেয়া এইসব তথ্য অসত্য নয়। আমাদের আর্য-মোঙ্গল পবিবারেব পারিবারিক জীবন এমন কিছু কঠিন সত্যের মুখোমুখি হয়েছে, যা আমি অকপটে লিখতে বাধ্য হয়েছি আমার ডায়েরীতে। আমাব ডায়েরী নানা কারণে ব্যতিক্রমধর্মী। আব, এই ব্যতিক্রমধর্মিতাই পাঠককে মুগ্ধ করতে পারে, ভাবিয়েও তুলতে পারে। অসুস্থ অবস্থায় যত্নে লালিত আমার এই ডায়েরী পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিয়ে আজ আমি অনেকটা স্বস্তি পাচ্ছি।

মূল ডায়েরীর শেষে ডায়েরীতে বিধৃত ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি দিয়েছি, তাতে কোনো ত্রুটি থাকলে আমি ক্ষমা প্রার্থী। বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণায় যাঁকে আমি কবি সুফিয়া কামাল বলেছি, তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে। আর এই সংশয় খন্ডন করতে পারেন কেবলমাত্র বাঙলাদেশের নেত্রী অগ্নি কন্যা মতিয়া চৌধুরী। কারণ, সুতারমোড়ার মিটিংএ তাঁর সঙ্গে যে মহিলা ছিলেন, তাঁকেই আমি বেগম সুফিয়া কামাল বলে জেনেছিলাম। আর, সেভাবেই তাঁর সম্পর্কে লিখেছি।

আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের একান্ত সহানুভূতি না থাকলে আমার এই ডায়েরী কোনদিন ছাপার মুখ দেখতে পেতনা। তাঁদেরকে ধন্যবাদ দেয়ার ভাষা আমার নেই। আমার ডায়েরীর কিছু কিছু ত্রুটি সংশোধন করতে সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন আমার প্রিয় বন্ধুরা।

১১ই নভেম্বর ২০০০

ধ্রুব কর্তার বাসভবন, বাবাজী নিকেতন

প্যালেস কম্পাউন্ড, ওয়েস্ট গেট, আগরতলা, ত্রিপুরা।

কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী

১৯৬৭ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত আমি ত্রিপুরার ট্রাইবাল এলাকায় থাকি ককবরক ভাষা গবেষণার কাজে। মাঝখানে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৩ সাল, ওই তিন বছর ছিলাম শান্তিনিকেতনে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা CRESSIDA (Centre for Regional Ecological Science Studies Inorder to Develop an Alternative)'র গবেষণার কাজে। কলকাতার এই আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা অর্থ পেতো UNISEF এবং UNRISD থেকে। এই সংস্থার কাজ ছিল Food System in Eastern India গবেষণা করা। আমি এই সংস্থার বীরভূম জেলার দায়িত্বে ছিলাম JRA (Junior Research Associate) হিসেবে। আমার সঙ্গে আমার সহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন ডাঃ উদিতা সেনগুপ্ত। তিনি ছিলেন আবার কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ। আমরা শান্তিনিকেতনের পীয়র্সন পল্লীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী কবি অমিয় চক্রবর্তীর ছোট ভাইয়ের পাশের বাড়ি শ্রীযুক্ত সত্যেন বাগচীর সুরম্য বাড়িতে থাকতাম। আমাদের গবেষণার Schedule এর দুটো দিক ছিলো। একটা Socio-Economic-Information এবং অন্যটা Health Status- এই দু'ধরনের তথ্যই ওই একই প্রশ্নপত্রে তুলতে হতো। আমি দেখতাম Socio-Economic-Information-এর দিক এবং উদিতা দেখতেন Health Status-এর দিক। সমগ্র বীরভূম চষে বেড়ানোর জন্যে CRESSIDA কর্তৃপক্ষ আমাদের শান্তিনিকেতন অফিসকে একটা সর্বক্ষণের জীপ গাড়ি দিয়েছিলেন। আমাদের দু'জন JRA 'র অধীনে আরো কুড়িজন Field Staff ছিলেন। গবেষণার কাজ ভালোই চলছিলো। এরমধ্যে একদিন CRESSIDA 'র ডিরেক্টর ডঃ বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন ভিজিটে এসে আমাকে এই Socio-Economic কাজে আরো পারদর্শী হতে একবছরের জন্যে ক্যানাডায় পাঠাতে চাইলেন। আমি দেখলাম, আমি সত্যি সত্যিই ডলারের বন্ধনে পড়ে গেছি। যে ডলারের বন্ধন ছিন্ন করার জন্যে ৬০-এর দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছি, এখন দেখছি সেই ডলারের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ছি। তাছাড়া, ত্রিপুরায় ককবরক গবেষণার কাজ ছেড়ে এসে আমার মনে এতটুকু শান্তি ছিল না। যদিও বৌ-ছেলে মেয়ে নিয়ে আর্থিক দিক থেকে ভালোই ছিলাম, তবু মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করে অনবরত বিঁধতো। তাই একদিন আমার মোঙ্গলিনী বৌ ফুলকুমারী দেববর্মার সঙ্গে পরামর্শ করে CRESSIDA'র গবেষণার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে ডঃ বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়কে অসন্তুষ্ট করে সুদূর ত্রিপুরায় আবার ফিরে এলাম আমাদের ট্রাইবাল এলাকার হেরমা গ্রামের মাটির ঘরে।

ফিরে এসে দেখি ত্রিপুরার দাঙ্গাবিধ্বস্ত উপজাতি জনপদের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। স্কুলগুলো চলে না বললেই চলে। বাঙালি মাষ্টারমশায়রা ভয়ে পার্বত্য স্কুলে আসেন না। আমার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বিষয় নিয়ে পড়লাম আমি বিপদে। তারা শান্তিনিকেতনে পড়তো। এখন কি করি ? তাই একদিন আগরতলায় এসে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী আমার শুভার্থী দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন, 'ব্রাদাব, কোনো কথা নয়, আপনি এক্ষুণি আগরতলায় বাসা ভাড়া করে ছেলে-মেয়েগুলোকে স্কুলে ভর্তি করুন।' উত্তরে আমি বললাম, 'আগরতলায় এসে খাব কী ?' তিনি বললেন, 'কেন প্রথম দিকে প্রাইভেট টিউশনি করবেন।' তাঁর পরামর্শ শুনে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম উপাচার্য ডঃ জে. বি. গাঙ্গুলীর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে। তাঁকেও আমার সমস্যার কথা বললাম। তিনি বললেন, 'আপনি শান্তিনিকেতন থেকে Socio- Economic এর কাজ করে এসেছেন তা আমি জানি। আপনি একটা কাজ করুন, অধ্যাপক বি. কে. রায়বর্মণ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে 'Land based Development among the Tribals in Tripura' এই নামে একটা প্রজেক্ট করছেন, আপনি এর সুপারভাইজার হয়ে যান, ১৫০০শ'র মত টাকা পাবেন মাসে মাসে।'

তাঁর কথা শুনে আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম উপাচার্য ডঃ গাঙ্গুলীর প্রস্তাবে। আর, ডঃ বি. কে. রায়বর্মণের সঙ্গে আমার শান্তিনিকেতনেই পরিচয়। তাঁকে তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধী পল্লীমঙ্গলের দায়িত্ব দিয়ে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে প্রায়-ই তাঁর কোয়ার্টারে যেতাম। তিনি CRESSIDA'র কাজকর্ম সম্পর্কে কম জানতেন। আমাকে পেয়ে বড্ড খুশি হলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ত্রিপুরা প্রজেক্টের সুপারভাইজার হয়ে গেলাম আমি।

Land based Development among the Tribals in Tripura প্রজেক্টের সুপারভাইজার হবার কথা শুনে আমার স্ত্রীও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বাসা খুঁজতে শুরু করলাম আগরতলায়। অবশেষে মিলে গেলো কৃষ্ণনগরে কমলকুমারী দেববর্মার বাড়িতে একটি কাঁচা ঘরের বাসা, ভাড়া ২৫০ টাকা। সেই ঘরে বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে উঠলাম আমি।

কমলকুমারী দেববর্মা উপজাতি, স্বামী আবার বাঙালী। মাতৃভাষা ককবরক ভুলে গেছেন তিনি। মহিলা খুব মেজাজী এবং দারুণ পার্সোনালিটি তাঁর। তাঁর এক পিসি ছিলেন রাজরাণী, ত্রিপুরার শেষ রাজা মহারাজ বীরবিক্রমের এক মহিষী। পিসি মারা যাবার পর তাঁর রাজভাতা পান তিনি ভাইঝি হিসেবে। প্রতিদিন সকালে তাঁর চিৎকারে ঘুম ভেঙে যেত। খুব ভোরে ফুল চোরেরা তাঁর বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে ফুল চুরি করত, আর তিনি তাদেরকে গালিগালাজ করতেন এক অদ্ভুত বাঙলা ভাষায়। দিনের পর দিন এই ভাষা শুনে আমার মনে হল, আগরতলার ঠাকুর লোকের এমন ওর্জস্বিনী আঞ্চলিক বাঙলা উপভাষা আর কোথাও নেই। তাই একদিন ভাবলাম, কমলকুমারী দেববর্মার এই অদ্ভুত বাঙলা ভাষায় কিছু উচ্চারণ রেকর্ড করে রাখি। কিছু রেকর্ড করেছিলাম কমলকুমারী দেববর্মার অদ্ভুত উচ্চারণের বাঙলা ভাষা যার মুখোমুখি হবেন পাঠকবর্গ আমার গবেষকের ডায়েরীর শুরুতেই।

কমলকুমারী দেববর্মার ডায়লগ ঃ ১লা জানুয়ারী ১৯৮৫ থেকে ২৮শে জানুয়ারী

বেশী আরাম পেয়ে লাইছস। জলের লাইগ্যা একটা মাইয়া ফিট হয়ে গেছে গা। একটা জলের ব্যবস্থা যদি কইর‍্যা রাখত। চালাকির জায়গা আর পাইছে না। শ্যাম্পু একটা কিন্যা আনতো পারে না। এই শ্যাম্পুটা কিসের লাইগ্যা আনছস। কেটা রুটি দিছে লাকিরে। জানলা দিয়া ফালাইছে, লইয়া আইছে লাকি।

স্বাধীনতা একেবারে উলটাইয়া লাইতেছে। কালোবাজারীরা আবার স্বাধীনতা মারস। ইতান দেখবেন কিয়ের লাইগ্যা। ইনকিলাবের যন্ত্রণায় আর ভাল লাগেনা। মানষের মন কচুর পাতার জল। বাড়ি বাড়ি হুয়োরের মাংস পাঠাইয়া দিলে ভোটটা দিতাম। স্বাধীনতা দিবসে পায়রা ওড়ায়না কিয়ের লাইগ্যা, বেলুন ওড়ায় বইল্যা স্বাধীনতার এমনতর অবস্থা হইছে। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর বইল্যা রাজীব গান্ধী বেশী বেশী ভাষণ দিছে।

বাদাম্যা কুত্তার মতো ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা থাকস। বানধা গরু ছাইড়া দিলে অমনতর হয়। ফুল তুলতা আইলে কুত্তা ছোঁয়াইয়া দিমু। ফুলডি টুকাইয়া আনচাই। দিনের পর দিন কুটনা কস কিসের লাইগ্যা। আইয়া গেছে একবার খাওনেব লাইগ্যা, আমি দিছিনা গো। মাইযাডারে একবার আনজা কইরা ধইরা দেখুন না, বুজতা পারবেন কয় ইঞ্চি ব্লাউজ লাগে। টুকাইতে টুকাইতে জান শেষ।

ইলেকশন কাছাইছে, এর লাইগ্যা অমনতর হয়। হ, হ, তাদের বেলায় বন্‌ধ। হেদিন যে ভালা ছেলে দুইটারে কুপাইছে, তার বেলায বন্‌ধ নাই। একটা উষ্টা দিমু রে, বেশী বাড়িস না। আপনার 'চাখুই' দিয়া ভাত খাইছি, কি স্বাদ লাগছে গো। ফাইন হইছে। আঠা হয়ে গেছে গা, কি ময়লা হইছে গো। পিছা দিয়া পরিষ্কার করুম।

কৈ গেলো এটা। আয়, আয় নে নে ভাত। আইচ না মরা। মাকুম ধইবা, কই যাস তুই ? বাদাম্যা। কি হইছে খাও খাও, খা মণি খা, খাস না খা। ভাত খাইলি না কেন তোরা ? আচ্ছা ঠিক আছে, আজগা এক ফোঁটাও ভাত দিতাম না তোদের। বাদাম্যা কুত্তাবা। কুত্তীর পিছন পিছন ছুটতো পারস তোরা। বেহাইয়া।

কাইল থাইক্যা কী গরম না পড়তাছে মাগো মা। অসহ্য কইরা লইছে বিদ্যা। গরমেব জ্বালায় ঘুমাইতো পারিনা। কই গ্যালো চামচিডা, ঘরোতো খুঁইজ্যা পাই না। আইয়ে বৃষ্টি, কাইলকে ইয়াব লাইগ্যা গরমডা না পডছে। এড়া একটা দাওনা এড়া। আনন্যারে কইতে পাবেন না। এড়ারে কয় কোপ যে দেওন লাগছে। বৃষ্টি তো পড়োই।

খবরে দেখি কইয়া দিলো তামিল উগ্রপন্থীরা না আক্রমণ করছে। রাজীব গান্ধীরে পিটা দিছে বইল্যা এই আক্রমণ না করছে। তামিলরা কম না কিন্তু, হুঁ।

আমাব মাইয়ার যাওনের দরকার নাই মিছিলো। আমার এতান পুষতো না। পেটাপেটি লাইগ্যা গেলে গা আমার মাইয়া দৌড়াইয়া ভাগতো পারতো না।

কিতা কিতা নাকি একলা একলা কইয়া থাকে। বুড়া গো উপায় নাই, শুধু প্যাড়প্যাড় কইর‍্যা থাকবো।

কিয়ের লাইগ্যা কুত্তা আমার পিছে লাগলো। আমার বয়স গেছে গা। আমি মরণরেও ডরাইনা বাঁচনরেও ডরাই না। কিয়ের লাইগ্যা কুত্তা আমার ইখানো আইয়ে। আমি কী উদাম কইরা খুইল্যা বইসা আছি। কুত্তার জাত।

মাইয়ারা সংসার বানদে আর পুরুষরা সংসার ভাঙ্গে। মাইয়ারা কঠিন এক দিক দিয়া, মাইয়াদের ঝুল-ঝামেলা সব কিছু সহ্য করতো হয়। বিয়া কইরা স্বামীর ঘর করতো হইলে তো সব কিছু সইতা হইব। মাইয়ারা মাইয়াদের হিংসা করবোই।

কেডালো তুই বারমাস্যা বাঁনদী ? তুই কওনের কে ?

ছাঁদে উইঠা একবার ডিসাও চাই। নারকোল খাইয়া লাইতেছে। জ্বালাইয়া লাইছে মরা চলুই। এই আমগাছটার লাইগ্যা চলুইডি এইদিক দিয়া আইয়ে। নারকোল গাছ ছাপ করইন্যা আইয়েনা তো মরারা। দুপুরবেলা সকালবেলা মরারা এই কান্ডডি করে। আইছে আইছে চলুই। জ্বালায় লাইছে জ্বালায়

লাইছে। বইয়া রইছে দ্যাখো। গেছেনা গেছেনা এই নাও ইটা দাও এই দিয়া। ইটের চাকা লইয়া ইটা দাও। ইটা না দিলে যাইতো না। কয়েকটা ইটা দাও। বইয়া রইছে, তোমারো চাইয়া রইছে। এহানে বাসাই বানধ্যা বইছে মরারা। লাফ দিয়া জায়গা। আছেনি ? উই বাঁশটা দিয়া গুতা মার। একটা লম্বা কইরা সুন্দর কইরা বানধ্ দাও। গেছে নি আছিলো যে। আরে আছে এডি অসৎ। আছিলো ইখানে তুমি কও নাই। এত যে শয়তান চলুই অ চলুই অ। হেই ছো, ছো, যায়নি তো মরাডা। ওপরে এডা বাসা কইরা বইসা আছে। আগে খাইতো না। এখন এডি নারকোলের জল সব খাইয়া ল্যায়।

এতটুকু শান্তি দিলো না মরাডা আমারে। জ্বালাইছে আমারে, জ্বালাইয়া শেষ কইর‍্যা লাইছে। জুতা-মুতা সব ফাইলা দিমু এখন। বেশি বাইড়া গেছে গা। দেখছো নি হাত- পাও কাটনোর লাইগ্যা। মরার আক্কল আছে নি। এডা অলক্ষ্মী, কিছু হইতো না আমার। ইস, উপায় নাই আর, অপরিষ্কার হইয়া গেছে গা ঘর। মরা জ্বালাইছে সব দিক দিয়া। মব মর মব তুই, মরসনা ক্যান ? ফাল মারে। কামের বেলায় নাই। ছান-ছন কইরা এসব কাম করতো ইচ্ছা করে ? বাড়িঘর থামাইয়া রাখতো জানে না। আমি পারলামনা। আর হে পারবো ? ঠাইট মাইরা ফেলমু। বেহদ্দা কাঁনদে। অসৎ, বেশী বাইডা গেছে গা, একেবারে মাইরা ফেলমু ঠাইট। হারামজাদারা জলডা দিলো না, চৈতালি করনের আর জায়গা পাযনা।

বাউন জাত, বাজার জমি মাগনা পাইছে নিছে, রাজাবে তেলাইছে, রাজা জমি দিছে। হগলে ডরাইয়া ডবাইয়া থাকে।

পান আইন্য, এমন বারী বারী পানটি আইন্যানা, বুরা পানটি।

এই কার কুত্তা আইচে, অখুনি তো কাইজা লাগবো। আহা, কামডাইছে লাকিরে, একটা ওযুধ আইন্যা রাখি না ঘবেব মইধ্যে। একটা দিমু মিতুরে অসৎ, বক্ত আসতাছে, কোই থেইক্যা ওযুধ দিমু এখন !

পাহাডের তিপরাডি আলস্যা, কাজ-কাম কবেনা, মদ খায়, হুক্কা খায়, আর শুইয়া শুইয়া থাকে।

হেরার কতনা নেতামি, আমার শরীরডা শেষ হইয়া যায়, দেহ থাকলে না কর্তব্য করতো মানষের।

দেখ চাই কিরকম অসইভ্য, দেশে শাসন নাই তো। শাসন না থাকলে পুলিস মার খায় পাব্লিকের। উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে আয়ত্তে আনতো পটাপট মেসিন গান চালাইত পারলো না ? জনতারও দোষ আছে, চাই চাই আরো চাই। একটা ভদ্রমহিলার বাড়িত ঢুকছস তোরা। আক্কল নাইলো তোরার। অসইভ্য, হগলে বাড়ি থাইকা দা, কুড়াল, খুন্তি লইয়া বার হইলে কী হয় ? এমন জনতারে গুলি কইর‍্যা মাইরা ফালালে কী হয ?

বাড়ির ভিতরো হামানোর কোনো প্রযোজন নাই পোলাপানের। একেবারে বাঁশ দিয়া বাইড়্যা ঠান্ডা করে দিমু, অসইভ্য কোনহানের।

এক জ্বালাইছে রিফুজিয়ে, আব এক জ্বালাইছে চলুইয়ে।

কি ডিজাইন বাইর অইছে, মাইয়াদেব বগলের তলায় বাদুডের পাখার মতো ঝুইল্যা থাকে।

বাঙালে চিনাইতে আইছে তিপ্রারে বাঁশের করুল। যুগীদের আছে সুতোর প্যাঁচ, আর তিপরারার আছে করুলের প্যাঁচ। তিপরার করুল চিনাইতে হইবো না।

অসৎনী, ভাত খাওয়ানোর লাইগা ডাকি কোনো কথা শোনে না ; খুব ক্ষুধা লাগছে তার, সবটি খাইয়া ফালাইছে।

স্বামীটা মানুষ না গো, হারাদিন মদ খাইয়া থাকে। অমন হাইয়ের ঘর করন-ই নাই, রাতের বেলায় শুধু মাইয়া মানুষের গা শুঁকতো আইয়ে, গলা টিপ্যা মাইরা ফালাইত হয় অমন হাইরে।

আমরা পরনি, আমরা তো আপন-ই, হোনো কথা, ছিনালী রক্ত রইছে গাওয়ে এতানি। নিজেরা খাইতো পারে না, আবার কুত্তা ভাগা লয়।

ফাজিল বেটী, বেশী হইয়া গ্যাছে গা, ধইরা চড়ামু তারে, কয়টা বাড়িত কাজ করে, কেউরে তো খুশী করত পারেনা, বাড়িটা একেবারে চইষ্যা খাইয়া ফালায়, অন্য তাল আছে তার, ফাজলামো করবার জায়গা পায়না।

মা গো, কত্ত বড়ো সাপ, ডরাইয়া মরি, এডারে আমি দেখছি, উই ওখানে বাঁশের মইধ্যে ঘুমাই'য়া থাকে। আমারে দেইখ্যা চইলা গ্যাছে গা, ঘাটলাত ভাত খাওনের লাইগ্যা আয়ে। মাগো মা, সাপটা আইয়া মাছ টানাটানি করে গো, এডার সাহস কম না গো, দেখছোনি দেখছোনি, এমনতরো কান্ড আর দেখছিনা, সাপতো, ডর লাগে তো, আমি আইছি পরে ফুরুত কইর‍্যা চইলা গেছে গা, হেতো এমন তরো আমার সঙ্গে ফাজলামো করছে, কি আরম্ভ করছে। থালের থাইক্যা মাছ কামড়াইয়া লইয়া যায়গা, এমন তরো জীবনে দেখিনি, ফাজিলই না সাপটা, মাছটা খায়. খাইয়া সারলে মারণ, মারণের দরকার, হাতের থেইক্যা মাছ খাইয়া ফেলেগা, মরছে না, মরছেনা, এমন কান্ড জীবনে দেখিনি, চিকার দিইয়া আমি খাঁড়াই গেছি গা। আয়ছেনি সাপটা, কাছে আইলে একটা ইটা দিমু গা। ডরাইছে সাপটা। সাপটা ঘাটলাতো ঘুমাইয়া থাকে।

এতানটি কুশিক্ষা পাইয়া বড়ো হইছে, বাড়ির ধাতই ওই রকম, সুশিক্ষা পাইলে না কথা। আগালা যেদিকে যায়, পিছা লা সেদিকে ধায়। একটা কথা কইলে মুখটা কালা কইর‍্যা থাকে, একেবারে ছালির মতন।

রাষ্ট্রপতির শাসন হইলে বেটীরা রাস্তা দিয়া হাঁটতো পারবো নাকি, মিলিটারীরা সব মাইযাদের ধইরা লইয়া ভোগ করবো, তখন ? মুখডা আমার খারাপ, মাইয়ারা মিলিটারীগোর রাজভোগে লাগবো। রাজীব গান্ধী দিল্লীতো রাষ্ট্রপতির শাসন দিলে পাবে।

একেবারে ফাঁর্ক্কি দিয়া বেড়াডা বাঁইধা দিছে, টাকার কি দাম নাই, বলি টাকা কি হাতির পুটকি দিয়া আয়ে ?

ধর্মে-কর্মে মন নাই, অখন রাজনীতি মাইনষের জীবনের ব্রত হইছে, গুলি মারো রাজনীতির। আমার রাজনীতির কাম নাই।

ভোর বেলায় বেড়াইতে কি সুন্দর লাগে, একটু বেলা হইলে শহররে লাগে নরক কুন্ড, মানুষ কিলবিল কিলবিল করে।

মহারোগে ধরবো এতানের মরণের আগে। হারমাদের হারমাদ। হাগ্যা আইস্যা পড়ে পাছা দিয়া। জল ঢালনের নাম নাই, ভরণের বেলায় ষোলো আনা। পায়খানা পরিষ্কার থাকলে পায়খানা করণেও শান্তি।

শাপ দেবো আমি এতানরে, মহারোগে ধইর‍্যা পইচ্যা পইচ্যা মরুক এতানরা। পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলার চাউনিডা মতলব মতলব. যুবক পুলাপান দেখলে খায় একেবারে। হইব না, হাইডা একেবারে রোগাপটকা।

শুধু নৃপেন চক্রবর্তীর পোঁদে গন্ধ, রাজীব গান্ধীর পোঁদে গন্ধ নাই। রাজীব গান্ধী আইস্যা উগ্রপন্থী দমন করুক না। মিলিটারীরা পাহাড়ে নাইম্যা কী করে রাজীব গান্ধী জানবো? তিপ্‌রা মাইয়াদের ধইর‍্যা ধইর‍্যা মজা লুটবো আর কি '

মানুষের মতো চৈতাল আছে নাকি ? গ্রামের মানুষ টাকা পাইবো আর ভোট দিবো। কংগ্রেস ঋণ দিইয়া ভোট কিনছে ক্যান্ ? গ্রামের লোক বোকা হইতে পারে শহরের লোক অত বোকা না। ভোট

পাইবো মহারাণী ? আমার ছাতা পাইবো। হগ্‌গলে তাঁর রূপ দেখতো ভিড় করছে, ভোট দিতো না।

বেটীটা কাম করে ভালা। এমন কোদাল চালন চালায় বেটী। মেস্ত্রিটা ভালা না। বেটীটাকে নরম পাইছে বেটা। এমনতর অসইব্য বেটা। প্রত্যেক মেস্ত্রির এক একটা বেটী লাগে লগে। পুইসা দিয়া কাম করাইব, মেস্ত্রি মানে তো শিল্পী, একটা উঁচা, একটা নেচা, কেমনতর মেস্ত্রি। তোমার মতো মেস্ত্রি নাইরে বাজারে। সাংঘাতিক শয়তান এডা।

পুরুষ লোকগুলো কুত্তার মতন বাদাইম্যা। এত রাত হইল আওনের নাম নাই। এখানে পেখম ধরন লাইগ্যা বসন থাকলে চলতো না।

বাপ মরছে এক মাসও হইছেনা, মেয়েটার সাজন দ্যাখো, ফিরিঙ্গীর মতো, একটুও শোকের চিহ্ন নাই। কেমনতর মাইয়া এডি। স্টাইল দ্যাখো, স্কুল ফাইন্যাল পাশও করস নাই, সাজনের এত বাহার ক্যানো ?

আমার লগে এত চদর-বদর খাটতো না। কাম করবি পুইসা নিবি, কাম না কইরাই পুইসা চাওন, কেমনতর কথা এডি। হগ্‌গলের সঙ্গে বাটপাড়ি করস না। আমার নাম কমলকুমারী দেববর্মা, দারগা বেটি বলে হগ্গলে, খুব সাবধান। সারা শরীরো রাজরক্ত বইতাছে আমার, খুব সাবধান কইলাম।

পুঁটকির মধ্য দিয়া ঢুকাইয়া দিমু পার্টি, মন্ত্রীদের শ্রাদ্ধ করণের সময় হইছে।

দোকানঅ যাইতে পারেনা, কিবা দেখতো, যেন আলগি দিয়া লইয়া যাইব একেবার।

কুত্তাটা এ্যাকসিডেন্ট করছে, আধমরা হইয়া আইছে সেবা পাওয়ার লাইগ্যা। একেবারে মরতে পাবস না ? কোথার থাইক্যা একটা মায়া কুত্তা আইন্যা দিছে আমার, বছর বছর বিয়াইবো, আর আমার জান শেষ।

ইঃ ছ্যাঙ্গা কতডি, কুত্তাডাকে কি ছ্যাঙ্গার মধ্য দিছ ? কুত্তাব সেবা করা আমার ধর্ম হইয়া গেছে।

শেখেদের জবান ঠিক ছিলো আগে, অখন আর নাই, রিফুজিদের চরিত্র পাইতাছে হগলে।

কইছিলাম তখন গাবর্যাদের পুকুর-ভাগা দিতাম না, আমার লগে মিল তো না হেরার, তারা শুধু মাছ, জাল আর পুইসা চেনে, মালিকের সুখ-সুবিধা বুঝতো না। পুকুরের জঞ্জাল তোমবা ফুলগাছের ওপর ফেলাও কিরে, কিতা কপালে চোখ নাই তোমাগোর ? ফুল গাছের মর্ম কী বুঝব গাবরে, গাবরে চিনে শুধু পুইসা।

রিফুজিদের কাছে জমি বিক্রি করতাম না আমি। কম দাম পাইলেও আমার জাতভাই ভালা। রিফুজিদের কোনো চরিত্র আছে ? বসতো পাইলে শুতো চাইবো। আস্তে আস্তে আমার হগল জায়গা লইয়া লইব। সামনে তো দিতাম-ই না জায়গা, পেছনে হইলে আচ্ছা, কতকটা জায়গা ছাড়তাম পারি। হাজার হোক, রিফুজিদের কাছ থাইক্যা দুইটা পুইসা বেশী পাওয়া যায়, এই আর কি। তিপরাদের পুইসা আছে নাকি আগরতলা শহরে জমি কিনার ?

রিফুজিদের কাছে জমি বিক্রি করলে পাইব কানি প্রতি ছ'লাখ-আট লাখ টাকা ; আর তিপরারা দিব তিন লাখ চার লাখ টাকা। হইলো নাকি ? এত বেশকম হইলে ক্যামনে হইবো কন ? সরকার আবার পারমিশন দিবো না রিফুজিদের কাছে জমি বিক্রি করত, মহা মুশকিলে পইড়াছে শহর্যা তিপরারা। জাতভাই বইল্যা কী জলের দামে জমি বিক্রী করতে হইব ? পারমিশন পাইলে বাঙালদের কাছে জমি বিক্রি করাম —তারা টাকা বেশী দেয়; বাঙালরাই ভালা।

রাত্র পোয়াইলেই ফুল তুলব। কেন নিজেদের বাড়ি ফুলগাছ লাগাইতে পারস না ? রিফুজির জাত, সব পরে পরে। একসঙ্গে এত ফুল পাড়িস না, গাছটা তো সুন্দর লাগানোর দরকার। রিফুজিদের সৌন্দর্যবোধও নাই নাকি রে, বাবা। দ্যাখ গিয়া, কৃষ্ণনগরে হগল ট্রাইবেল বাড়ি একটা কইর্যা ফুলবাগান

আছে। তোরা রিফুজিরা এতবছর আইছস একটা ফুল বাগানও লাগাইতে পারসনা! তিপরারারে গরিব পাইয়া হগল কৃষ্ণনগর তো দখল কইর‍্যা লাইছস, আর ফুল গাছ লাগাইতে পারস না। রিফুজিদের সৌন্দর্য বোধ আছে বা! সকাল হইলে তিপরা বাড়ি ঢুইক্যা ফুল চুরি।

কুত্তার বাচ্চারা আমার ফুলগুলো লইয়া যাইতাছে। সরকার বদল হওনে তাদের সাহস বাইড়া গেছে। আমার বাড়িত আছস কিরে কুত্তাবা, চোরের বাচ্চারা হগল, বাপও চুর, পুলাও চুর, হেদের চৌদ্দ গুষ্টি চুর। দা দিয়া কুপাইমু। কুত্তারা আমার এহানে আইব দৌড় দিয়া দিয়া। আমার এহানে না আইলে উদ্ধার নাই। বিশ্বকাপ জয় করব, এমন দাউর। জুতা দিয়া পিটাইয়া শেষ করমু, হগলের লগে চললেও আমার লগে চলতো না। চামারের বাচ্চা হগল। দেশের ভিতর এই মরাডা আইয়া দেশডারে নষ্ট কইর‍্যা ফ্যালছে। যত্ত কুবুদ্ধি এই বাঙালদের, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও লাগাইয়া দিছে গন্ডগোল। পরের মাথায় লবণ থুইয়া লবণ খাওয়ান্যা জাত। নিজের মাথায় লবণ থুইয়া খাইত জানে না। ত্রিপুরা রাজ্যের তিপরা আহম্মক। হগল বাঙালদের ঢুকত দিছে এহানে। আগুন লাগাইয়া রাইখ্যা দিছে দেশডার ভিতর।

বাঙাল পুলারে বিয়া কইর‍্যা ঘরো আইন্যা কি ভুলডাই না করছি আমি। হারমাদ, আস্ত হারমাদ, হারমাদের জাত। হদাগুষ্টি আমার ওপর বইস্যা বইস্যা খাইব। জমি বিক্রি কইর‍্যা পর্যন্ত তানগো খাওয়াইতো লাগবো। বলি, আয় রোজগার বাড়াও না কিবে? কি ছাতার এস.এস.বির চাকুরি করো, বেতন অত কম কিরে? ইন্দিরা গান্ধী না এস.এস. বি. কইর‍্যা গেছে। তা মরণের আগে বেতন বাড়াইয়া যায় নাই কিবে? তিপরা মাইয়া পাইযা শোষণ করন, না? যাও না তোমার বাঙাল জাতরে শোষণ করো না গিয়া, তখন দেখন যাইবো। বাঙাল পুলারে ঘর আনলাম কত আশা কইর‍্যা, এখন আমার ঘাড়ো বইস্যা খাইতো চায়! আমার বাড়ি ঘরদোর কিছুই হইল না তাদেরগো জ্বালায়। আমার যা ছিলো তাও চইলা যাইতেছে। আমার রাজ ভাতা দিয়া পর্যন্ত তাদেরগো খাওয়াইতে হইবো। তিপরা পাইলে বাঙাল বাইরেও শোষণ করব, ঘরেও শোষণ করব। ছাতা গুষ্টিকে খাওয়াইতো খাওয়াইতো আমি মইরলাম। মইর‍্যা গেলে তোমার হদাগুষ্টিরে আমার জমির ওপর পুড়াইয়া ছাড়মু।

শুনছেন, নতুন মন্ত্রীদের লাইগ্যা বলে ১৯ লক্ষ টাকার বিলাস-ব্যসনের জিনিসপত্র কেনা হইছে। সব তো ছালা বিছাইয়া ঘুমান্যার জাত। করুক কিছুদিন আরাম কইর‍্যা লউক। গ্রাম দেশ মানুষ না খাইয়া দিন কাটাইতাছে, আর উনারা সরকারী টাকায় ফিরিজ, জাজিম কিনতাছেন। তেলকাষ্ঠা বালিশে যাদের ঘুমান্যোর অইভ্যাস তারা আবার জাজিম বেছাইয়া বসবো। বলি তাদের বাপের চোদ্দগুষ্টি কখনো জাজিমের কথা শুনছে, হেদিনও তো তোরা ছিলি রিফুজি, বাঙালা দেশ থেইক্যা আইছস, লোটা-ঘটি-বাটি কিচ্ছু ছাতা ছিলো তোরার? আর অখন হইছস মন্ত্রী, লুট করতাছ সরকারী কোষাগার। বলি, গরিবরা ভুখা থাকে কিরে? তাদের ভোটেই তো তোরা মন্ত্রী হইছস। তাদের দিকে তো চাওনের কাম। তোরা শুধু বিলাস করলে চলব?

তোর আক্কল আছে নি? তোর শরীরে বইতাছে রিফ্যুজির রক্ত। তুই পাইছস তোর বাপের স্বভাব, বাঙালদের পতার আছে নি? ডাক তোর বাপেরে, চৌকাঠটা তোঁলন লাগবো। যাইব ওইটা বানের জলে ভাইস্যা। আমার হইছে খাটুনির জন্ম, আমার বইয়া থাকলে চলতো না। মাইয়ালোকের সব করত হইবো, পুরুষ মানুষ বইস্যা বইস্যা খাইব। ক্যামন তরো পুরুষ মানুষ এতানি।

এখন আইছস কেন কুত্তার মতন। পডাডা বাদ দিয়া শুধু শুধু চৈ চৈ করে। মাইরা ফালামু ধইরা। এক্কেবারে দিমু ধইরা, কোথায় বেড়াইয়া থাকস।

কচুর আগা পড়াশুনা করছ তোমরা। ঘরো দুই দুইজন 'বিয়া' পাশ মানুষ রইছে তবু মায়াডাকে এক

ফোঁটা দেখেনা। শুধু ঘুমাইবো, আর ঘুইরা ঘুইরা বেড়াইবো। লজ্জা করেনা তোমাগোর। মাইয়াডার একটুখানিও লক্ষ্য করেনা, পুঙতানির তালে আছে হ্গলে। আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবো? এই মাইয়ারে ভালা গাইড করলে সেই বংশের মুখ উজ্জ্বল করব। আমার বংশের মুখে চুন-কালি দেওয়ান্যা হ্গল।

গুষ্টির ধাত পাইছস, না? একেবারে উষ্টা মাইরা চাপার দাঁত ফাইলা দিমু একে বারে। চুপ কর, অখন থাইক্যাই স্বার্থের কথা ভাবস, তোরে ছাড়তাম না আমি। মাইয়া হইছে দেইখ্যা অন্যায় সহ্য করতো হইব নাকি? কেমন তরো উশৃঙ্খল হইতাছে দ্যাখো একটা ম্যাইয়া, অসইব্য। কাজ করসনা ক্যান? আজাইরা বইস্যা বইস্যা খাইব। ঘর সুড়তাতো পারস না, থাকবি তো গুয়ে-গোবরে, রিফুজি অইভ্যাস যাইব কই? বাপ রিফুজি, মাইয়াও পাইছে রিফুজির স্বভাব।

রিফুজিরা আইস্যা তিন চৈতালের রাজনীতি ঢুকাইছে ত্রিপুরায়। হারামজাদারা খাওনের সময় হাগনের সময় পর্যন্ত রাজনীতি করব। রাজনীতি করলে তো তাদের স্বার্থ আছে, তিপরাদের পোদাইয়া খাওন যায়।

এই মরা তুই এত বাড়ছস কেরে? বেশী বাড়ন ভালা না। কৈলে যে কথা শোনস না, থেতলা কইর‍্যা থাকস, এর লাইগ্যা তো ভালা লাগেনা।

মিলিটারি আইন্যা কিতা হইছে? বিজয় রাঙ্খলের টি. এন. ভি. বন্ধ হইছে কি? আরো না উগ্রপন্থী বাড়তাছে, মা-বোনদের ইজ্জত মারতাছে। উজান ময়দানে তিপরা মাইয়াদের লুইট্যা পুইট্যা খাইছেনা আসাম রাইফেলসের কুত্তারা? তিপরা মাইয়া দেখলেই কুত্তাদের জিহ্বাতো জল আইস্যা যায়। বলি, তোরার ঘরো মা-বোন নাইরে? যা তাদেরগো ইজ্জত মারগে যা।

লেখাপড়া না কইরলে চাকরি পাইত না। যে লেখাপড়া তাতো গু ফেলত নিত না।

আজকার পুলাপানদের দেখতোই ইচ্ছা করেনা। মাইয়া দেখলেই পাগল, লাথ্থাইয়া বার কইর‍্যা দিতো হয় অমন পুলাপানরে।

শেখের লগে দৌড়ানি খাইয়া এই দেশ আইছস, আর বড় বড় কথা। হুদাহুদি কি শেখেরা তাড়াইছে রিফুজি হ্গল কে, রিফুজিদের খাচ্চত খারাপ। বাঙলা দেশ থেইক্যা দৌড়ানি খাইয়া ত্রিপুরা রাজ্যে ঢুইক্যা জ্বালাইছে তিপবাদের। ছোটলোক, আস্ত ছোটোলোক হেরা। হেরা বইতো পাইলে শুইতো চায়। ছুঁচ হইয়া ঢুইক্যা ফাল হইয়া বার হইত চায় রিফুজিরা।

বীর্য বাবার, রক্ত মার। মা রক্ত দিয়া সন্তান গড়ে, তাই মার ওপর পুলা মাইয়ার অত টান। যে পুলা মারে দ্যাখেনা তার মুখে মারি লাথি। বাঙাল বাপ হইল কি হইবো, তিপ্রা রক্ত তার শরীরে বইছেনা নাকি?

মানুষের মইধ্যেও আছে, ধরলই হুদাহুদি চিলি মারে।

পরের বাড়ি দ্যাইখবার কি কাম আছে? আমার বাড়িটার ওপর হ্গল্যের নজর পড়ছে। রাতটা পোহাইলে বুড়া মস্তানগুলো আমার বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া গবেষণা করবো। বলি পরের পুকুর কি আর ভরাট করে না? তা হইলে আমার বাড়ির দিকে এত তাকানো ক্যান? আসলে আমার প্রতি ঈর্ষা।

পশুর জাত এতডা কি বুঝে, নিজের ছাওরে নিজে কামড়ায়। মাইনষের মইধ্যেও এমনতর পশু কি নাই? কুত্তাডাকে খুব কামড়াইছে, একেবারে তাজা রক্ত পড়তাছে। বিয়ানোর সময় এতডা বাচ্চা দেওয়া ক্যান? নিব্বংশনী, পিছা দিয়া পিটাইমু তোরে।

<u>সীতানাথ সিংহ রায়- এর ডায়লগ, ১লা এপ্রিল, ১৯৮৫</u>

— "নমস্কার।"

— "কোন সাহসে নমস্কার করলেন ?"

—" ভদ্রজনকে দেখলে আমার নমস্কার করা অভ্যাস ।"

—" বলি, গুয়ের টিনের পাশ দিয়ে যদি কেউ এসেন্স মেখে যায়, তাহলে গুয়ের টিনকে কি নমস্কার করবে ? বুঝলেন, মশায়, সব চোর, মন্ত্রী পর্যন্ত চুরি করছে, সেদেশের আর কী হবে ? মন্ত্রীগুলো সব গুয়ের টিন ।"

এই প্রসঙ্গে সীতানাথ সিংহরায় সম্পর্কে কিছু বলতে হয় । সীতানাথ বাবু ছিলেন আগরতলার স্বনামধন্য ঠাকুর মহিম কর্ণেলের জামাই । (ঠাকুর মহিম কর্ণেল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী এবং শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সূত্রে তাঁর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে ছিল অবাধ গতায়াত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাত্র মহিম চন্দ্রের গলায় সোনার লকেটে বাঙলা ভাষায় লেখা, 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপদে শ্রীযুত মহারাজা গৌবিন্দ মাণিক্য, শ্রীশ্রীমহারাণী গুণবতী দেব্যা' পড়ে বিস্ময়ে বলেছিলেন, 'ইহাতে যে বাঙ্গলা ভাষার ছাপা। তবে আমার বাঙ্গালা রাজভাষা?') তিনি বিয়ে করেছিলেন মহিম কর্ণেলের দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয়া কন্যা রেণুকাপ্রভা দেববর্মাকে । ঠাকুর মহিম কর্ণেলের দশ মেয়ে ছিলো । রেণুকাপ্রভার সঙ্গে সীতানাথ সিংহরায়ের যখন বিয়ে হয়, তখন তিনি প্রয়াত । মহিম কর্ণেলের পুত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা (ডাক নাম রেণু সাহেব) M.A., Harvard, তাঁর ছোটবোন রেণুকাপ্রভার সঙ্গে সীতানাথ বাবুর ঘটকালি করেছিলেন । রাজ আমলে ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে তখন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজা-জমিদার পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক হতো । সীতানাথ সিংহরায় ছিলেন কাঁচড়া পাড়ার ফতেপুরের ক্ষত্রিয় জমিদার বাড়ির ছেলে । যে কোনো ভাবেই হোক, তিনি রেণু সাহেবের চোখে পড়ে গিয়েছিলেন । সীতানাথ বাবু ছিলেন তখনকার দিনের আই. এ. পাশ । দেখতে শুনতে খুব সুন্দর ছিলেন তিনি। রেণুসাহেব তাঁর বোন রেণুকাপ্রভার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিতেই সীতানাথ সিংহরায়ের পরিবার রাজি হয়ে যান । কিন্তু ঠাকুর মহিম কর্নেলের স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে কাশীতে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে নেপালের রানাদের বিরাট বাড়িতে খুব ধুমধাম করে রেণুকাপ্রভার সঙ্গে সীতানাথ সিংহরায়ের বিয়ে হয় । পাত্রপক্ষ কাঁচড়া পাড়া থেকে এবং পাত্রীপক্ষ আগরতলা থেকে কাশীতে চলে যান এই বৈবাহিক কার্য সমাধা করতে ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিয়ের পরে জানা যায়, সীতানাথ সিংহরায় মৃগী রোগে আক্রান্ত। তখন রেণু সাহেব ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী । তিনি ভগ্নীপতি সীতানাথ সিংহরায়কে আগরতলায় এনে চিকিৎসা করে মৃগীরোগ মুক্ত করেন । আগরতলায় সীতানাথ বাবুর চিকিৎসা চলাকালীন মৃগীরোগ দেখা দিতো। তিনি শুয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকতেন, চোখ-মুখ উল্টে যেতো, বমিও করতেন বারবার । এমন সুদর্শন শিক্ষিত স্বামী পেয়েও মহিম-কন্যা রেণুকাপ্রভা খুব অশান্তিতে থাকতেন । কিন্তু দাদা রেণু সাহেব তাঁর ভগ্নীপতিকে নানাভাবে চিকিৎসা করে মৃগীরোগ মুক্ত করেন এবং বিজয়কুমার পাঠশালায় মাস্টারির চাকরি দিয়েছিলেন । তখন আদরের বোন শান্তি ফিরে পান । তখন থেকেই সীতানাথ সিংহরায় অনেকটা ঘর জামাইয়ের মতো শ্বশুর বাড়িতে থেকে যান । কাঁচড়া পাড়ার ক্ষত্রিয় জমিদার পরিবারের সঙ্গে আগরতলার মহিম কর্নেলের পরিবারের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে । কাঁচড়াপাড়া থেকে সীতানাথ বাবুদের বাগানের বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু আম আসতো চাঙ্গারি ভর্তি ভর্তি কর্ণেল বাড়িতে ।

পরে রেণুসাহেব মারা গেলে, সীতানাথ বাবু শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আগরতলার পুরনো কালীবাড়ির দক্ষিণে যামিনী ঠাকুরের পুকুরের ওপারে বাড়ি করেন । সীতানাথ বাবুর এক ছেলে, দুই মেয়ে । ছেলের নাম রাধানাথ সিংহরায় । স্বাস্থ্য বিভাগে চাকরি করতেন । প্রথম মেয়ের নাম অনুরাধা । তার

বিয়ে হয়েছিল শেওড়াফুলীতে। ছোট মেয়ের নাম ডালিয়া। তার বিয়ে হয়েছিলো জমিদার বাড়িতে। সীতানাথ বাবু একটু একগুঁয়ে ধরনের লোক ছিলেন। তাই শেষ জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক খুব মধুর ছিলনা। তিনি স্পষ্টবাদী এবং রসিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। রসিকতা করতে গিয়ে তিনি এমন সব মন্তব্য করতেন, যা রীতিমতো উচ্চমানের।

শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণের পর দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন তিনি। প্রায় ৯০ বছর বয়সে মারা যান। শেষ বয়সে তাঁকে দেখা যেতো গ্রীষ্মের দিনে ছাতির ওপর ভিজে গামছা বিছিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে খুব রসিকতার সঙ্গে জাবব দিতেন তিনি। একেবারে শেষ বয়সে ছাতি মাথায় দিয়ে পথ চলতে চলতে ধূপকাঠি ফেরি করতেন 'চাই ধূপকাঠি চাই ধূপকাঠি' বলে। এতে ছেলে-পিলেরা খুবই পুলকিত হয়ে তাঁর কথা নকল করে ভেঙাতো।

সীতানাথ সিংহরায় সম্পর্কে ওপরের তথ্য সরবরাহ করেছেন ত্রিপুরার রাজা নক্ষত্র রায়ের বংশধর ও ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডল সমিতির সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা প্রয়াত প্রভাত রায়ের স্ত্রী এবং বর্তমানে আলেকবাবা মন্দিরের সেবিকা শ্রীযুক্তা হাসি রায়। সীতানাথ সিংহরায় ছিলেন তাঁর আপন পিসেমশায়। আর মহিম কর্ণেল ছিলেন তাঁর জ্যাঠামশায়।

১৮ই মে, ১৯৮৫। আজ গবেষকের ডায়েরী লিখতে গিয়ে আমার চোখ জলে ভরে যাচ্ছে। আমার ভাষা বিজ্ঞানের শিক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের খয়রা অধ্যাপক ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের গত ৮ই মে, ১৯৮৫ দেহান্তর ঘটেছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীদের ভাষা ককবরকের একটি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানসম্মত লেখ্যরূপ দেওয়ার গবেষণার কাজে একাধিকবার তিনি ত্রিপুরায় এসেছিলেন এবং বর্তমান লেখক ছিলেন তাঁর গবেষণা কাজের সহযোগী। ডঃ চট্টোপাধ্যায় কেনই বা ককবরক ভাষার লেখ্যরূপ দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কাদের অনুপ্রেরণায় বা তিনি এরাজ্যে এসেছিলেন এবং তার ফল কী হয়েছিল, সে সম্পর্কে কিছু তথ্য এখন নিবেদন করব। কিন্তু, তার পূর্বে তাঁর শিক্ষা ও শিক্ষক জীবনের ধারাবাহিকতার দিকগুলো আলোচনা করা প্রয়োজন, কেননা, এই ধারাবাহিকতার মধ্যে এমন কতকগুলো দিক আছে যা আমাদের বড় হতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

বর্তমান বাঙলা দেশের খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার এক গন্ড গ্রামে ১৯৩০ সালে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা ছিলেন টোলের পন্ডিত। বাল্যকালে সংস্কৃত চর্চার আবহাওয়া তাঁর পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। টোলের পন্ডিতের জীবন মানে আর্থিক অনটনের জীবন। ইস্কুলের সব বই কেনা সম্ভব হতোনা, চেয়ে চিন্তে পড়া ছাড়া উপায় ছিলো না। কিন্তু ক্লাসের প্রথম হতে কেউ আটকাতে পারতনা তাঁকে। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৭ সালেই কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু থাকবেন কোথায়, টাকা-পয়সাই বা আসবে কোত্থেকে? শেষে বঙ্গবাসী কলেজের কাছে আমহার্স্ট স্ট্রীটের ফেলে যাওয়া এক বাইজীর বাড়িতে দুই বন্ধু মিলে আশ্রয় নিলেন। আবার ছেলে পড়ানোই হলো উপজীবিকা। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তিনটি লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। ভর্তি হলেন আই. এস. সি.তে। বিজ্ঞানের ছাত্র, আরো টাকা পয়সার দরকার। ছাত্র ঠেঙানো ছাড়া আরেকটি কাজ তিনি নিলেন কমলালেবু বিক্রির কাজ। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশে নিয়ন আলোর নিচে বসে সন্ধ্যে থেকে রাত্রি আটটা-নটা পর্যন্ত গলা হেঁকে কমলালেবু বিক্রি করতেন। আই.এস.সি. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু টি.বি. রোগে আক্রান্ত হলেন অচিরেই। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে হলেন দিশেহারা। ঠিক এই সময় তিনি আমহার্স্টস্ট্রীটের পাশে বৈঠকখানা রোডর বুক বাইন্ডিং দোকানে এক মুসলমান কারিগরের সঙ্গে মিশে উর্দু শিখতে শুরু করলেন। আগে যখন মেছো

বাজারে গিয়ে মুসলমান ফল বিক্রেতাদের কাছ থেকে কমলালেবু কিনে আনতেন তখনই ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দু বলতে আরম্ভ করেন। এভাবে তিনি উর্দু ভাষা ও ভাষাতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাই দেখা গেল, বি.এস.সি. না পড়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন স্নাতক বিভাগে ভর্তি হলেন। শিক্ষক ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেন। রতনে রতন চেনে। ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় তাঁরা ছাত্র সুহাসের মধ্যে আবিষ্কার করলেন বৈজ্ঞানিক মননশীলতা। বি.এ. অনার্স এ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে গুরুদেবদের মুখ উজ্জ্বল করে সুহাস প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করলেন। এম.এ. পরীক্ষায় শুধুমাত্র স্বর্ণপদক পেলেন না, রেকর্ডও ভাঙলেন। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পালা। পরপর দুটি স্বর্ণপদক পাবার দুর্লভ অধিকারী টোলের পন্ডিতের ছেলে সুহাস চট্টোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাতাত্ত্বিদ দুই গুরুর পদধূলি ও আশীর্বাদ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্টফোর্ড সেমিনারির উদ্দেশ্যে বিদেশ পাড়ি দিলেন। সেখানে ভাষাবিজ্ঞানের আর এক দিকপাল এইচ. এ. গ্লিসন-এর অধীনে পি.এইচ.ডি. করলেন। তাঁর পি.এইচ.ডি থিসিসের বিষয়বস্তু ছিলো, "A Study of the Relationship between written and colloquial Bengali." ভাষাবিজ্ঞানে পি. এইচ. ডি. লাভের পর তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর হিসেবে যোগ দিলেন। ১৯৬৪ সালে তাঁর এককালের শিক্ষক ডঃ সুকুমার সেন তাঁকে শিকাগো ছেড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের 'রিডার হিসাবে যোগদানের জন্যে অনুরোধ জানালেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় পদ, মোটা টাকার বেতন (ডলারের বন্ধন), সব ছেড়ে দেশে ফেরা? তার থেকে বড় কথা পাশ্চাত্যে গিয়ে New school of Linguistics-এর আদর্শে ফলিত ভাষা বিজ্ঞান (Applied Linguistics)-এ যে পারদর্শিতা অর্জন করলেন, তা নিজের দেশে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োগ করতে পারবেন তো ? কারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞান বিভাগ Old School of Linguistics-এর ভাবধারায় বিশ্বাসী। কিন্তু সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে ডলারের বন্ধন ছিন্ন করে শেষ পর্যন্ত দুই শিশুপুত্র শাশ্বত, সুশ্রুত ও স্ত্রী শিপ্রা চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। এখন তিনি ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার তখন জাতীয় অধ্যাপক। বসেন আলিপুর জাতীয় গ্রন্থাগার সংলগ্ন তাঁর আপিসে। ডঃ চ্যাটার্জী কলকাতায় ফিরেই ছুটলেন আচার্যের পদধূলি নিতে। আচার্যের পা থেকে মাথা তুলতেই সুনীতিকুমার বললেন, 'সুহাস, আমেরিকা থেকে যা শিখে এসেছ, প্রমাণ কর তা সব ভুল।' সুহাসের বাক রুদ্ধ হয়ে এল, চোখ ছল ছল করছে; ভাষাচার্যের কথার কোন জবাব তিনি খুঁজে পেলেন না। মাথাটা উঁচু করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুক্ত হাওয়ায় এলেন; দম যেন বন্ধ হয়ে এল ডঃ চ্যাটার্জীর। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরে সব জানালেন মিসেস চ্যাটার্জীকে।

এবার ডঃ সুকুমার সেনের কাছে যেতে হবে। তিনিই তাঁকে সব ছেড়ে ছুড়ে কলকাতায় এনেছেন। মিসেস চ্যাটার্জীকে নিয়ে তিনি দেখা করতে গেলেন ডঃ সেনের সঙ্গে। মিসেস চ্যাটার্জীকে ডঃ সেন খুব স্নেহ করতেন, ছাত্রীও বটে। তাছাড়া ডঃ চ্যাটার্জীর আমেরিকা চলে যাবার পর তিনিই মিসেস চ্যাটার্জীর খুব খোঁজ খবর রাখতেন। স্বামী-স্ত্রীতে গিয়ে পদধূলি নিলেন। ডঃ সেন তাঁদেরকে মিষ্টি-মিঠাই দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। তার পরে ডঃ চ্যাটার্জী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন সবিনয়ে।

ডঃ সেন বললেন, 'তোমরা আমাকে ভুল বুঝনা, রিডারের পদটা নিয়ে একটা মুশকিল দেখা দিয়েছে, ব্যাপারটা সিনিঅরিটি নিয়ে; তা সুহাস, তুমি লেকচারের পদে জয়েন কর।' ডঃ চ্যাটার্জীর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। সবিনয়ে বললেন, 'স্যার, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তো এসিষ্ট্যান্ট

প্রোফেসর ছিলাম, এখানে অন্ততঃ রিডার হতে না পারলে'... বাধা দিয়ে ডঃ সেন বললেন 'দেখ, আমার তো কোনো আপত্তি নেই, তাছাড়া আমি তো তোমাকে সেই কথা দিয়ে এনেছি, এখন সিনেট, একাডেমিক কাউন্সিল নানা রকম প্রশ্ন তুলেছে। তুমি লেকচারার হিসেবেই এখন জয়েন কর; আমি ব্যাপারটা দেখব।' ডঃ চ্যাটার্জী কথা বাড়াবার মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই উঠে পড়লেন। বললেন, 'স্যার, ভেবে দেখি, পরে দেখা করব।'

পরপর দুটো আঘাত! দেশে ফিরে এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে কে জানত? না পাচ্ছেন পাশ্চাত্যের বিদ্যার স্বীকৃতি, না জুটছে মনোমত পদ। ডঃ সেনের মতো দিকপাল ব্যক্তি কথা দিয়ে কথা রাখতে পারছেন না! ডঃ চ্যাটার্জীর খুব অভিমান হলো। পুনরায় আমেরিকায় ফিরে যাবেন? মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে এভাবে ক'দিন গেলো। শেষে ঠিক করলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারের পদে জয়েন করবেন না - দুধের ব্যবসা করবেন। যতদিন না রিডারের পদ পান ততদিন এভাবেই থাকবেন। আর, আমেরিকায় ফিরবেন না; দেশের মাটিতে ফলিত ভাষা বিজ্ঞানের আবাদ করবেন, দেশের অজস্র ভাষা, বিশেষ করে উপজাতিদের ভাষাগুলো এখনো লেখ্যরূপ পায়নি; সুযোগ পেলে ছাত্র-ছাত্রীদের সেইসব উপজাতীয় ভাষাগুলোর এ্যানাটমি ঘাঁটতে উৎসাহ দেবেন।

অভিমানে ভরা মন নিয়ে শুরু করলেন দুধের ব্যবসা। দমদম এয়ারপোর্টের কাছাকাছি জায়গায় একটা বাসা নিলেন। সামনে সবুজ মাঠ। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরু-প্রণামী চলে গেল জারসি আর বড় জাতের দুধেল গোরু কিনতে। সময় সময় ডঃ চ্যাটার্জী সবুজ মাঠটায় গোরু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতেন। এভাবে কিছুদিন গেল। জল ইতিমধ্যে অনেক দূর গড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে চারটি ইনিশিয়াল দিয়ে লেকচারারের পদে যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। ডঃ চ্যাটার্জী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে অবশেষে যোগ দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুরোধকে তিনি মন্দের ভালো হিসেবে নিলেন। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে তখন ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের কোর্স সামান্যই ছিল। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর ভাষাগুলোর তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণই ছিল মূলকথা। তথাপি তিনি সুযোগ পেলেই ছাত্রছাত্রীদের ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করতেন।

আমরা ১৯৬৬ সালে যখন ডঃ চ্যাটার্জীকে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে পেলাম, তখনও তিনি বিভাগীয় 'রিডার' হতে পারেননি। তিনি অতি সহজেই আমাদের ক'জনকে আকৃষ্ট করে ফেললেন। তাঁর বাসায় ফলিত ভাষা বিজ্ঞানের দিকগুলো তিনি আমাদের বোঝাতেন, তুলে ধরতেন linguistics এর প্রসারিত দিগন্ত। ইতিমধ্যে তাঁর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসায় স্থাপন করেছিলেন Institute of languages and Applied Linguistics। আমরা ক'জন এই ভাষা গবেষণা কেন্দ্রের সদস্য হয়ে গেলাম।

অন্যদিকে, ১৯৬৬ সালেই গড়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বি. বি. মালিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘর নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির জন্যে ছেড়ে দেন। আমরা ক্লাস শেষে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কাজে অংশ নিতাম। ডঃ চ্যাটার্জী বয়স্ক সাক্ষরতার একটি বই লিখে দেন এই সমিতিকে। আমরা বয়স্ক সাক্ষরতার Lesson Material কীভাবে লিখতে হয় তার হাতে খড়ি দিতাম।

ঠিক এই সময় আগরতলার ককবরক উন্নয়নপরিষদ-এর পক্ষ থেকে মোহন চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ কক্ষে আমার সঙ্গে দেখা করে ত্রিপুরার ককবরক ভাষার লিখিত রূপ দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের সাহায্য চান। আমি সন্ধ্যের দিকে মোহনবাবুকে নিয়ে ডঃ চ্যাটার্জীর বাসায় যাই। মোহনবাবুর কাছ থেকে ডঃ চ্যাটার্জী মনোযোগ সহকারে সব শুনে বললেন, 'আমি

আমেরিকা থেকে যা শিখে এসেছি, তার আলোকেই ককবরক উপভাষাগুলোর একটা লিখিত রূপ দেওয়া যেতে পারে।'— এই আলোচনার সময় আমার সতীর্থ শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। ঠিক হলো, গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা দু'জনে ককবরকের উপভাষাগুলো 'স্টাডি' করবার জন্যে ত্রিপুরায় যাব। মোহনবাবু ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির ছাত্রনেতা কমলেন্দু গাঙ্গুলী, পার্থ সেনগুপ্ত, সুধীর চ্যাটার্জী প্রমুখের সঙ্গে দেখা করেছেন। সমিতির নেতারা আমাদের ত্রিপুরায় যাবার ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মোহনবাবু কলকাতা থাকতে থাকতেই ককবরক ভাষী এক যুবককে ডঃ চ্যাটার্জীর বাসায় নিয়ে এলেন। যুবকটির নাম মনোরঞ্জন দেববর্মা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তখন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তেন। ডঃ চ্যাটার্জী যখন মনোরঞ্জনবাবুর কাছ থেকে Data নিতেন, তখন আমার বন্ধু শ্যামসুন্দর ও আমি বসে বসে 'ডেটা' নেবার পদ্ধতি লক্ষ্য করতাম। প্রথম প্রথম আমরা কিছুই বুঝতে পারতাম না। ভাষাটি তিব্বত-বর্মীয় ভাষা জাত, যা আমাদের কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য। ডঃ চ্যাটার্জী এর আগে মণিপুরী ভাষার ওপরে কিছু কাজ করেছিলেন, তাই তাঁর খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিল না। কারণ ককবরক ও মণিপুরী ভাষা সুদূর অতীতে একই ভাষাজননীর উদর থেকে বেরিয়েছিল। আর একটি অসুবিধে আমাদের পক্ষে ছিল, সেটি ককবরকের টোন। উচ্চারণ পার্থক্যজনিত একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা সরকার প্রকাশিত রাধামোহন ঠাকুরের লেখা দু'খানা ককবরকের বই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন রাধামোহন ঠাকুরের সম্পর্কে পৌত্র জননেতা অঘোর দেববর্মা। ত্রিপুরায় গ্রীষ্মকালীন অভিযানের পূর্বে এই বই দু'খানার ককবরক শব্দ বার বার উচ্চরণ করে যাচ্ছিলাম আমরা। ডঃ চ্যাটার্জী আমাদের তালিম দিচ্ছিলেন।

এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটল। বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাহায্যে ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতিদের সার্বিক সমস্যা নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ বড় ধরণের সেমিনারের আয়োজন করেন। সেমিনারের নাম ঃ 'National Seminar on the Hill people of North-Eastern India.' ডঃ চ্যাটার্জী আমন্ত্রিত হয়ে সেই সেমিনারে Language and Literacy in the Nort-Eastern Region নামে একটি 'পেপার' পড়েন। পরে লেখাটি পান্নালাল দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'A Common Perspective for North-East India' বইয়ে প্রকাশিত হয়। লেখাটিতে ডঃ চ্যাটার্জী ককবরক ভাষার উপভাষাগুলোর সাদৃশ্যগত দিকগুলো আলোচনা করেন এবং একটি লেখ্যরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টার ওপোরে গুরুত্ব আরোপ করেন। পান্নালাল দাশগুপ্ত আয়োজিত সেমিনারটি আমার ওপরে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। ওই সেমিনারের বিশেষ একটি দায়িত্বে ছিলাম আমি। নাগাল্যাণ্ড এর রাণী গুইদালো, ফিজোর বোন এবং ক্যাপটেন উইলিয়ামসন ছাংমা (বর্তমানে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী)র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পেরেছিলাম। সেমিনার আয়োজিত উপজাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করেছিল। এর থেকে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম ত্রিপুরার উপজাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কি ধরনের হতে পারে।

১৯৬৭'র জুনে ককবরক উন্নয়নপরিষদ-এর আমন্ত্রণে বন্ধু শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যকে নিয়ে আগরতলায় এলাম। ডঃ চ্যাটার্জী আমাদের সঙ্গে টেপ রেকর্ডার দিয়ে ছিলেন ভাষার কাজে ব্যবহারের জন্যে। সব নিয়ে উঠলাম ককবরক উন্নয়ন পরিষদ-এর সভাপতি অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র দেববর্মণের কৃষ্ণনগরের বাসভবনে। ককবরক উন্নয়নপরিষদ পূর্ব থেকেই আমাদের ককবরকের বিভিন্ন উপভাষা এলাকায় ক্যাম্প-এর ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। প্রথমেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো টাকারজলার আমতলীতে। সঙ্গে ছিলেন সি পি আই নেতা মোহন চৌধুরী।

টাকারজলায় আমরা উদয়জমাদার পাড়ায় পুরান ত্রিপুরী ও কলই - ককবরকের এই উপভাষা দুটির

তথ্য সংগ্রহ করলাম। এখানে পুরানী ত্রিপুরী উপভাষার তথ্য দিয়েছিলেন ব্রজ দেববর্মা ও সুকুমার দেববর্মা। এখানেই শম্ভু দেববর্মাও তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। এখানে আনা হয়েছিল জম্পুইজলা বাজারের দিক থেকে শক্তমণি কলইকে। তিনি কলই উপভাষার তথ্য সরবরাহ করেছিলেন আমাদেরকে। উদয়জমাদাব পাড়ায় এই ভাষা গবেষণার কাজ হয়েছিল আমতলীর বুদ্ধিচন্দ্র দেববর্মা বাড়ী থেকে সি পি আই নেতা অখিল দেববর্মাও কুঞ্জ দেববর্মার তত্ত্বাবধানে। এরপরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো বিলোনীয়া বিভাগের বগাফায়। বগাফার আশ্রম স্কুলের আমাদের ভাষা ক্যাম্প হয়েছিল। সেখানে রিয়াং উপভাষার তথ্য সরবরাহ করেছিলেন শ্রীযুক্ত বাজুবন রিয়াং (এম এল এ)-এর পিসেমাশাই ক্ষেম্পাহা রিয়াং। এক রাত্রি তাদের গ্রামের অপূর্ব এক টঙঘরে ছিলাম আমরা। সেখান থেকে লক্ষ্মীছড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন সি পি আই নেতা দুর্বাজয় রিয়াং। সেখানে আমরা ককবরকের আরেকটি উপভাষা রিয়াং-এর থেকে তথ্য সংগ্রহ করলাম। এরপরে গেলাম সাব্রুমের কাছে পূর্ব চড়কবাই গ্রামে। এই গ্রামের হবিমোহন রিয়াং, কুম্ভরাম বিয়াং ও উপেন্দ্র রিয়াং-এর বাড়ীতে থেকে সাব্রুমের ভুরাতলী গ্রামের সুরেশ চন্দ্র দেববর্মা (ত্রিপুরা)'র কাছ থেকে নোয়াতিয়া উপভাষাব তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। সেখানে নোয়াতিয়া ও রূপিনী উপভাষার তথ্য নিতে। পরিশেষে আমাদেব উদয়পুরের মহারাণীতে জমাতিয়া গ্রামে ভাষা ক্যাম্প কবে দেওয়া হলো চবণ ও আনন্দ জমাতিয়ার তত্বাবধানে। আমাদের এই পর্যায়ের ভাষার কাজেব মূল উদ্দেশ্য ছিল ককবরকের উপভাষাগুলোব মধ্যেকার সাদৃশ্যগত মিল আবিষ্কার করা এবং ককববকেব আটটি উপভাষা থেকে সমসংখ্যক শব্দ নিযে ধ্বনিগোত্রগত ও রূপ গোত্রগত বিশ্লেষণ করা। আমবা রিয়াং ও রূপিনী উপভাষার দু'জন তথা সববরাহকারী (informant)কে আগবতলায় বীবচন্দ্র দেববর্মণেব বাড়ি নিয়ে এলাম তাঁদেব কাছ থেকে নেওয়া শব্দগুলোব টেপরেকর্ডিং কবতে। পরিশেষে আমাদেব সে যাত্রার ককবরক গবেষণার কাজ সাঙ্গ কবে আগবতলা পবিত্যাগেব পূর্ব মুহূর্তে এক সাংবাদিক সম্মেলন করলাম বীরচন্দ্র দেববর্মণের বাড়িতে। আগবতলার প্রায় সব পত্রিকায় আমাদের ভাষা গবেষণামূলক সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য গুরুত্ব সহকাবে ছাপা হয়েছিল। কলকাতায় ফিবে ডঃ চ্যাটার্জীর Institute of language and Applied Linguistics সেন্টারে আমাদের নেওয়া ককববকের ডেটা ও টেপ জমা দিলাম। ডঃ চ্যাটার্জী আমাদের নিয়ে আমাদের সংগ্রহ করা প্রতিটি উপভাষার পাবস্পবিক সাদৃশ্য ও পার্থক্য পরীক্ষা করলেন। টেপে ধবা আমাদের সংগৃহীত শব্দ বাববাব বাজিয়ে শুনলেন এবং খাতায় লেখা উচ্চারণের সঙ্গে টেপে উচ্চাবিত শব্দের ধ্বনিগত হুবহু মিল আছে কিনা যাচাই করলেন।

করবরকের মতো অলিখিত ভাষার লেখ্যরূপ দেওয়া সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। একে ভাষাটি 'ইন্দো-এরিয়ান' ভাষাগোষ্ঠীর বাইরে, রূপগোত্রগত ও বাক্যবিন্যাসগত চরিত্র আমাদেব সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; তাই খুব সতর্কতাব সঙ্গে এগোনোর প্রয়োজন ছিল। ডঃ চ্যাটার্জীর [illegible] ককবরক উন্নয়ন পরিষদ শম্ভু দেববর্মা ও সুকুমার দেববর্মা নামে দু'জন [illegible]কে পরপর কলকাতায় তাঁর ভাষা গবেষণা কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন। আমি সবসময় ডঃ চ্যাটার্জীর সহকারী ভাষা গবেষক [illegible] উপস্থিত থেকে ভাষাটির আন্তররূপ বুঝবার চেষ্টা করতাম।

ডঃ চ্যাটার্জীর ভাষা গবেষণা কেন্দ্রে [illegible] ককবরক-এব তথ্য [illegible] করবার পরে আমাদের ত্রিপুরায় গিয়ে একটি 'চেক আপ' প্রোগ্রামের [illegible]জনীয়তার কথা [illegible] চ্যাটার্জী ব্যক্ত করলেন। আমরা সেইভাবে ককবরক উন্নয়ন পরিষদের কর্ম[illegible] করে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ চ্যাটার্জী ও আমি ত্রিপুরায় এলাম। পূর্ব থেকে [illegible] পরিষদ আমাদের ভাষা ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। প্রথম ক্যাম্প হলো বিশ্রামগঞ্জের কাছে খেংরাবাড়িতে উন্নয়ন পরিষদের তরফ থেকে। সি পি আই নেতা অঘোর দেববর্মা আমাদের সঙ্গে সবসময় ছিলেন এবং একাধিক তথ্য

সরবরাহকারী (informant) ঠিক করে দিয়েছিলেন, এঁদের মধ্যে হেরমাবাড়ির যোগেন্দ্র দেববর্মা ছিলেন অন্যতম। মনে আছে, যোগেন্দ্রবাবু একখানা খাতা হাতে করে এনেছিলেন। তাঁর লেখা সেই খাতা ককবরক ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি ছিল। তিনি ককবরক ব্যাকরণের ফলিত ভাষা বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী ভাষা বিশ্লেষণ পদ্ধতি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। খেংরাবাড়িতে চন্দ্রকুমার দেববর্মার ঘরে আমরা সাত দিন ভাষা ক্যাম্প করেছিলাম। এই ভাষা ক্যাম্পে অতুল দেববর্মা, অশ্বিনী দেববর্মা, বিষ্ণু দেববর্মা, সোনারাম দেববর্মা ও হরচন্দ্র দেববর্মা সর্বক্ষণ থেকে আমাদের ভাষা গবেষণার কাজে সাহায্য করেছিলেন। এখানে থেকেই অমরেন্দ্রনগরের কুরিয়া দেববর্মা দেববর্মার কাছ মনমাতানো থেকে 'জাদুনি' লোকগীতি টেপরেকর্ডিং করেছিলাম। এখানে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। একদিন বিকেলে একটা জিপ গিয়ে আমাদের ক্যাম্পে হাজির। যে ভদ্রমহিলা জিপ থেকে নেমে ডঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন, তাঁকে পাঠিয়েছিলেন তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা অধিকর্তা ডঃ জি. এন. চ্যাটার্জী। ভদ্রমহিলা ককবরক গবেষণা প্রসঙ্গে বললেন, 'ডঃ চ্যাটার্জী, ককবরকে কটাই বা শব্দ আছে, আর যার জন্যে এই জঙ্গলে এসে গবেষণা করছেন। আমি শহরে বসেই তো ককবরক শিখে ফেলেছি।' জি এন চ্যাটার্জী সাহেব আমাদেব ত্রিপুরায় আসার আগের দিনই কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর আপন ভায়রাভাই ডঃ চ্যাটার্জীর ককবরকের ভাষা গবেষণা কাজটি মোটেই পছন্দ করেননি। এটা নাকি ছিল সরকার বিরোধী কাজ। তাছাড়া তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই তিনি একাজে হাত দিয়েছেন। ককবরকের কাজ নিয়ে দুই ভায়রার মধ্যে দীর্ঘদিন মনোমালিন্য চলেছিল।

খেংরাবাড়ির ভাষা ক্যাম্প তুলে দিয়ে আমরা এলাম চড়িলামের লেম্বুথলে। সেখানে শ্রীযুত কার্ত্তিককুমার দেববর্মা তাঁর ভাগ্নে ভগীরথ দেববর্মার মাটির ঘরে আমাদেরকে বেখেছিলেন। অঘোরবাবু আগের থেকে সব ঠিক করে রেখেছিলেন। পুনরায় যোগেন্দ্রবাবুই হলেন আমাদের মুখ্য তথ্য সরবরাহকরী। এখানে আমরা ভাষা গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ককবরক প্রবাদ ও সংগ্রহ করেছিলাম। ককবরক ভাষায় বিভিন্ন বাঁশের নাম লিপিবদ্ধ কবেছিলাম এইখানেই। এক রাত্রে একটা খরগোশ শিকার করে আমাদের ঘরে এনে রাঁখা হলো। খরগোশটি শিকার করেছিলেন কার্ত্তিককুমার দেববর্মার ছেলে শ্রীযুত বরদাকান্ত দেববর্মা তাঁর দলবল নিয়ে। পরের দিন আমাদের ঘরে একটা উনুন খুঁড়ে খরগোশের মাংস রান্না হলো। ককবরকে উনুনকে বলে 'থাফা'। ডঃ চ্যাটার্জী সদ্য খোঁড়া উনুনের দিকে তাকিয়ে 'থাফা' (উনুন) শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আবিষ্কার করার চেষ্টা করলেন। 'থাফা'র দুটি অংশ 'থা' ও 'ফা'। থা অর্থ বন্য আলু, 'ফা' এসেছে 'ফার' (পরিষ্কার) করা থেকে। ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, 'বন্য আলু (থা) রাখবার জন্যে জায়গাটা পরিষ্কার করতে (ফার) হতো। আদিম আদিবাসী মানুষরা আগুন জ্বালাতে শেখবার পর 'থা' আলু বা কন্দ জাতীয় মূল পোড়াতে শুরু করল ওই পরিষ্কার করা জায়গাটাতেই। পরবর্তীকালে পরিষ্কার করে আলু রাখবার জায়গাটা উনুনের (থাফা) রূপ নিল।' উনুনের ব্যুৎপত্তির কাহিনী শুনে উপস্থিত সকলেই তাজ্জব বনে গেলেন, ককবরকে কি যেন বলাবলি করলেন তাঁরা। সকলে ব্যাপারটি যে উপভোগ করলেন তা বোঝা গেল।

লেম্বুথলে হঠাৎ একদিন অরুন্ধতীনগরের খ্রীষ্টান মিশনারী থেকে ব্রায়ান স্মিথ সাহেব গিয়ে উপস্থিত। তিনি প্রথমেই আমাদের ককবরকের লেখ্যরূপ দেওয়ার প্রয়াসকে ধন্যবাদ জানালেন। ডঃ চ্যাটার্জীর বিদ্যার তারিফ করলেন এবং পরিশেষে রোমান হরফে যাতে আমরা ককবরকের লিখিত রূপ দিই, তার অনুরোধ পেশ করলেন। ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, 'আগে ককবরকের ধ্বনিগত দিকটা গবেষণা করা যাক, তারপরে হরফের কথা ভাবা যাবে।' স্মিথ সাহেব ককবরকের ধ্বনিগুলো রোমান হরফে যথার্থ প্রতিবিম্বিত হতে পারে বলে মন্তব্য করলেন। ডঃ চ্যাটার্জী উত্তরে বললেন, 'ককবরকে এমন কতকগুলো ধ্বনি

আছে যা রোমক বর্ণমালার কোনো বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।' উদাহরণ স্বরূপ তিনি ককবরকের কেন্দ্রীয় স্বরবর্ণ (Central Vowel) 'উ'র কথা উল্লেখ করলেন। স্মিথ সাহেব একজন ভাষাতত্ত্ববিদ (Philologist) এর সঙ্গে আর বাড়তি তর্কের মধ্যে গেলেন না। অরুন্ধতীনগরে আমাদের সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের ভাষা ক্যাম্প ত্যাগ করলেন।

লেম্বুথলেও আমাদের ভাষা ক্যাম্প ছিল সাত দিনের। এর মধ্যে আমাদের মুখ্য তথ্য সরহবরাহকারী যোগেন্দ্র দেববর্মা তাঁর নিজ গ্রামে হেরমাবাড়ি আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। লেম্বুথল ও হেরমাবাড়ির মাঝখানে ধারিয়াথল গ্রাম। ওই গ্রামের মধ্য দিয়ে যাবার পথে শ্রীযুত গদাধর দেববর্মার বাড়িতে বসলাম। সেখানে রিছা (বক্ষাবরণী) পরিহিতা কয়েকজন যুবতী মেয়ে উদুখলে তাদের শক্তি প্রয়োগ করে চিড়ে কুটছিল। ডঃ চ্যাটার্জী একজন ককবরকভাষীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ককবরকে চিড়েকে কি বলে?' ভদ্রলোক চিড়ের ককবরক নাম 'রমফে' বলে জানালেন। ককবরকে উদুখলকে বলে 'বৃছাম-রম'। 'বৃছাম' হলো কাঠের আধার যার মধ্যে ধান, চাউল বা অন্যান্য শস্য রেখে পেষা হয়। আর 'রম' হলো কাঠের দণ্ড, যা দিয়ে 'বৃছাম'-এর মধ্যস্থিত শস্যাদি পেষণ করা হয়। ডঃ চ্যাটার্জী 'বৃছাম-রম' 'রমফে বার বার উচ্চারণ করেত লাগলেন। হেরমা বাড়ি পৌছান পর্যন্ত মাঝে মধ্যে শব্দগুলো উচ্চারণ করেই চললেন। হেরমায় পৌঁছিয়েই তিনি যোগেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা যোগেন্দ্রবাবু, 'রমফে'র 'রম অর্থ কাঠের দণ্ড, কিন্তু 'ফে'র অর্থ কি ? 'ফে'র অর্থ উদ্ধার করতে পারলে 'বমফে' (চিড়ে)র ব্যুৎপত্তি বের করা যায়।' যোগেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ ভাবলেন, কিন্তু 'রমফে'র 'ফে' অংশের অর্থ বলতে পারলেন না। পরবর্তীকালে ককবরকের অভিধান সংকলন করতে গিয়ে আমি 'রমফে'র 'ফে' অংশের ব্যুৎপত্তি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলাম। ককবরকে 'কেফের' শব্দটি অর্থ চেপ্টা। শব্দটি বিশেষণ। 'কেফেব' এর 'ফের' অংশটির অর্থ চেপ্টা করা এবং এটি একটি ক্রিয়া পদ। 'রমফে'র অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'রম বাই ফের' অর্থাৎ দণ্ড দিয়ে চেপ্টা করে। কাজেই দণ্ড (রম) দিয়ে চেপ্টা কৃত (ফেরভাক) জিনিষটি হচ্ছে 'রমফে'। ডঃ চ্যাটার্জী আমার 'রমফে' (চিড়ে)'ব ব্যুৎপত্তির ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুমোদন করেছিলেন।

হেরমা বাড়িতে যোগেন্দ্রবাবুর ঘরে বসে আমাদের ভাষা গবেষণা কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হলো। ঠিক হলো ডঃ চ্যাটার্জী কলকাতায় ফিবে যাবেন, আর আমাদের ভাষার কাজের চাহিদা অনুসারে আমি হেরমাবাড়িব যোগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে পেটে ভাতে থাকব কিছুকালের জন্য। আমার কাজ হবে ককবরক শেখা এবং ককবরক ভাষায় অভিধানের জন্যে শব্দ সংগ্রহ করা। আর মাঝে মধ্যে কলকাতায় গিয়ে ডঃ চ্যাটার্জীকে ভাষা বিশ্লেষণে অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করা। সাতদিন পরে লেম্বুথলের ভাষা-ক্যাম্প গুটিয়ে আগবতলা বীরচন্দ্র দেববর্মণেব ডেরায় ফিরে এলাম। যেদিন আমরা লেম্বুথল ছাড়লাম, তার আগেরদিন বিকেলবেলায় লেম্বুথল সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের কাঁঠাল বাগানে আমাদেরকে বিদায় সম্বর্ধনা জাননো হলো। সম্বর্ধনা সভার সভাপতি ছিলেন কার্ত্তিক কুমার দেববর্মা। তাঁর ছোট ভাই জ্ঞান মাস্টার বাংলা ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের ককবরক গবেষণা কাজের সেতুবন্ধ ব্যাখ্যা করেছিলেন এক অপূর্ব আবেগময়তায়। এখানে ফিরে ডঃ চ্যাটার্জী একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে আমাদের ককবরক গবেষণা কাজের অগ্রগতির কথা একটা হ্যাণ্ডআউট-এর মাধ্যমে জানালেন। প্রায় সব পত্রিকাই আমাদের গবেষণার অগ্রগতি সম্বলিত হ্যাণ্ডআউটের সারাংশ গুরুত্ব দিয়ে ছাপলেন এবং আমাদের উদ্যমের প্রশংসা করলেন। কিন্তু আমাদের সকলকে অবাক করে দিয়ে একটি বিশেষ বামপন্থী রাজনৈতিক দলের মুখপত্র আমাদের ককবরক ভাষার গবেষণাকর্মকে সি. আই. এ'র কাজ বলে অভিহিত করলেন এবং ডঃ চ্যাটার্জী ও তাঁর সহযোগীকে সি.

আই.এ.'র লোক হিসেবে চিহ্নিত করলেন। অরুন্ধতীনগরের মিশনে স্মিথ সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করে আমরা উক্ত পত্রিকাটি পড়লাম এবং ডঃ চ্যাটার্জী আমাকে বললেন, 'এই নিন আমাদের পুরস্কার।'

আমরা যারা ককবরক ভাষার লিখিত রূপ দেওয়ার জন্যে উপজাতিদের হাঁড়ি-হেঁসেলে ঢুকেছি, তারা যে 'সি. আই. এ'র চর নই, আগরতলার অরুন্ধতীনগরের মুখ্য প্রচারক (evangelist) Mr Brain Smith তা আন্দাজ করতে পেরে বললেন, 'ডঃ চ্যাটার্জী, আমি খুব দুঃখিত, আপনাদেরকে এভাবে ছাপ দিয়ে দেওয়া উচিত নয়।' প্রত্যুত্তরে ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, 'দেখুন মিস্টার স্মিথ, এইসব ছাপে আমাদের কী এসে যাবে, কাজটা হলে হলো।' ঠিক এমনি সময়ে মিসেস স্মিথ প্রাতরাশ নিয়ে উপস্থিত হলেন আমাদের সামনে, পেছন পেছন শিশুপুত্র, হাতে তার প্রজাপতি। স্মিথ সাহেব আমাদের তাজ্জব বানিয়ে বিশুদ্ধ ককবরকে পুত্রকে বললেন, 'ফিয়গুই রুদি' লারিমান, ছাতুংগ ফিয়গুইদি' (ছেড়ে দাও প্রজাপতিকে, রৌদ্রে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসো)। তারপরে ইংরিজিতে বললেন, 'put it in the sun।' ছেলেটা তৎক্ষণি বাইরে ছুটে গিয়ে প্রজাপতিটা ছেড়ে দিল।

প্রাতরাশ চিবুতে চিবুতে ককবরক গবেষণার কথা এসে গেল অপরিহার্যভাবে। উপজাতিদের ভাষা সমস্যার কথা উঠল, উঠল একটা সর্বজনগ্রাহ্য বানান পদ্ধতির কথা, পরিশেষে এলো হরফ (script) বা লিপির প্রশ্ন। লিপির প্রশ্নে স্মিথ সাহেব আবার রোমক লিপি (roman script)'র আবশ্যকতার কথা তুললেন। বললেন, 'আচ্ছা, ডঃ চ্যাটার্জী, রোমান হরফে ককবরক লিখলে আপনাদের আপত্তি কোথায়? উপজাতীয় ভাষার পক্ষে রোমান হরফ বাস্তবিকই আশীর্বাদ স্বরূপ।' বলেই তিনি প্রাতরাশের টেবিলে রাখা ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চ্যাটার্জীর একখানা বইয়ের পাতা উলটিয়ে দেখালেন 'Roman script is the boon of God to the tribal languages'। বোঝা গেল, স্মিথ সাহেব পূর্ব থেকেই রোমান লিপির পক্ষে ওকালতি কববার জন্যে ভাষাচার্যকে প্রাতরাশের টেবিলে নামিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। এবার আমার গুরুদেব মুখ খুললেন, 'মিস্টার স্মিথ, সুনীতিবাবু আমার শিক্ষক, ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর কাছেই হাতে খড়ি। কিন্তু শুধুমাত্র রোমান হরফেই উপজাতিদের ভাষাগুলোর লেখ্যরূপ দেওয়া সম্ভব, অন্য হরফে নয়, এরূপ স্বতঃসিদ্ধ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা মেনে নেন না।' প্রসঙ্গক্রমে তিনি পাশ্চাত্যের ভাষাবিদ Gleason ও Hocket এর কথা তুললেন, যাঁরা পৃথিবীর একগাদা অলিখিত উপজাতীয় ভাষার লিখিত রূপ দিতে চুল পাকিয়েছেন। স্মিথ সাহেব এবার আরেক ধাপ এগিয়ে বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করলেন, 'আপনারা হয়তো ভাববেন, আমরা খ্রীষ্টান মিশনারীর ধর্মপ্রচারকরা রোমান হরফে ককবরকে বাইবেল ছাপাবে, বলেই আপনাদের ওপর চাপ দিচ্ছি; আসলে তা নয, দেখুন, আমাদের মিশন ইতিপূর্বে রিয়াং উপজাতিদের ভাষায় বাঙলা হরফে বাইবেলের অংশ বিশেষ প্রকাশ করেছে। যদিও এখন আমরা রোমান হরফে ককবরক ভাষায় 'নিউ টেস্টামেন্ট' অনুবাদ করবার চেষ্টা করছি, তবে কি জানেন, আমাদের কোন গোঁড়ামি নেই, যে হরফে 'সুসমাচার' বোধগম্য হয়, সেই হরফেই আমরা ছাপি। তবে, আমার ধারণা, উত্তর-পূর্ব ভারতে একটা বিশেষ হরফ ব্যবহার করে উপজাতীয় ভাষাগুলোর লেখা রূপ দিলে ভাল হতো। খাসি, গারো, লুসাই, নাগামিজ প্রভৃতি ভাষাগুলো তো রোমান হরফেই লেখা হয়েছে; তাছাড়া একটা কমন স্ক্রিপ্ট (Common script) ব্যবহার করলে এই অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে ঐক্য বাড়ত, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে একে অন্যের কাছাকাছি আসতে পারত কিনা বলুন, ডঃ চ্যাটার্জী।' বলেই সাহেব আমাদের দুজনের দিকে প্রতিশ্রুতির চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন। ডঃ চ্যাটার্জী সোজাসোজি স্মিথ সাহেবের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, মিস্টার স্মিথ, আপনি তো একটু আগেই বললেন, যে হরফে বাইবেল সহজে বোধগম্য হয় সে হরফে আপনারা ছাপেন, সেদিক দিয়ে বিচার করলে ককবরকের বাঙলা হরফ তো

'আইডিয়াল' । এ রাজ্যের ককবরকভাষীরা সকলেই বাঙলা হরফ তো ভালই বোঝেন, সকলেই বাঙলা বলতে পারেন, শিক্ষিতরা তো বাঙলা হরফে লেখাপড়া করেছেন, এখনো করছেন । বাঙলা ভাষা এ রাজ্যের মেজর ভাষা, আর বাঙলা তো ত্রিপুরার 'লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা' (Linguafranca) । বাঙলা হরফের সঙ্গে দীর্ঘদিনের এই পরিচিতি ছিন্ন করা উচিত হবে কি ? এতে ককবরকভাষীরা পেছিয়ে যাবেন না কি?' আমি অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিলাম কিছু বলবার জন্যে । ডঃ চাটার্জীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'স্যার, এব্যাপারে আমি কিছু বলব ?' সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডঃ চ্যাটার্জীর থেকে আপনার কি আলাদা কোনো মত থাকবে ?' আমি বললাম, 'না, মানে, বাঙলা ও রোমান দুটো হরফ দিয়েই ককবরক লিখলে ক্ষতি কোথায় ? দুটো হরফেই ককবরকের উচ্চারণ ধরা পড়বে, দুটো হরফেই ককবরকের সাহিত্য লেখা হবে, আমি তো তেমন কোন বিরোধ দেখি নে ।' আমার বক্তব্য দু'জনেরই কেমন যেন খাপছাড়া লাগল । স্মিথ সাহেব বললেন, 'মিস্টার চৌধুরীর, যুক্তিটা মাথায় ঢুকছে না।' ডঃ চ্যাটার্জী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কুমুদ, তোমার একই সঙ্গে ককবরকে দুটো হরফের ওকালতিটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছিনে ।' বললাম, 'একই ভাষার জন্যে দুটো হরফের ব্যবহার পৃথিবীতে বিরল নয় । বিদেশের কথা বাদ দিন । আমাদের ভারতবর্ষে সব থেকে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষার দুটো হরফ । আমি হিন্দুস্তানী (হিন্দি ও উর্দু)'র কথা বলছিলাম । সুনীতি বাবু তো বলেছেন, হিন্দি ও উর্দু একই ভাষা, কিন্তু হরফ দুটো; একটি দেবনাগরী অপটি আরবীয়; পার্থক্য শুধু হিন্দিতে সংস্কৃত শব্দ ও উর্দুতে ইসলামীয় শব্দ(আরবি, পার্শি) এর প্রাধান্য । আর, হিন্দি সাহিত্যে যেমন তুলসী দাস, প্রেমচন্দ, তেমনি উর্দুতে গালিব ও ইকবাল । ককবরকে একই সঙ্গে তুলসী দাস, প্রেমচন্দ, গলিব, ইকবাল এব সাক্ষাৎ আমরা যদি পাই, তাতে ককবরক সাহিত্যেরই লাভ হবে বেশী, হরফের ব্যবধান আচ্ছ্যুত হয়ে দাঁড়াবে না ।' 'আমার যুক্তিতে মিষ্টার স্মিথ ও ডঃ চ্যাটর্জী দুজনেই হেসে ফেললেন । ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, কুমুদ, ককবরকে তুলসী দাস, গালিব সৃষ্টি হোন । কিন্তু ককবরকের মাত্র ছ'লক্ষ লোকেব ভাষার সর্বজনগ্রাহ্য একটি হরফই মঙ্গলকব।' আর সঙ্গে সঙ্গে স্মিথ সাহেব বলে উঠলেন, 'আর সেটা রোমান হরফ ।'

ডঃ চাটার্জী এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্মিথ সাহেবের আপাদ মস্তক দেখলেন । বললেন, 'মিস্টার স্মিথ, খাসি, গারো, লুসাই, নাগামিজোব পরিবেশ তো ত্রিপুরায কখনো তৈরি হয়নি । সেখানে মিশনারীরাই তাঁদেরকে চার্চেব মাধ্যমে রোমান হরফেই লেখাপড়া শিখিয়েছেন । ধর্মান্তরিত খাসি, গারো-লুসাই-নাগা ট্রাইবদের ইংরিজিতে লেখা বাইবেলের আকর্ষণ এসেছে রোমান হরফেই । ওখানকার পরিবেশে রোমান হরফে লেখ্যরূপ দেওয়া সঠিক হয়েছে বলে আমার মনে হয় । কিন্তু মহারাজের ত্রিপুরায় পরিবেশ ছিল একেবারেই ভিন্ন ।' বলেই ডঃ চ্যাটার্জী তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে একটা ধুলোমাখা ময়লা পুরোনো কাঁচা টাকা (মুদ্রা) বের করে বললেন, 'গতকাল আমি উদয়পুরের পুরোনো রাজবাড়ি থেকে এক ফকিরের কাছ থেকে এই টাকাটি সংগ্রহ করেছি; দেখুন, আন্দাজ করুন, কতদিনের মুদ্রা এটি; আর দেখুন, বাঙলা হরফেই কিসব লেখা আছে যেন । ডঃ চ্যাটার্জী গলাটা একটু খাদে নামিয়ে বললেন, মিস্টার স্মিথ, এখানকার মহারাজারা ছিলেন বাঙলা প্রেমিক, বাঙলাই ছিল পার্বত্য ত্রিপুরার সরকারী ভাষা । এখানে যাঁরা গত শতাব্দীতে ককবরকে পাঠ্য বই তৈরী করবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা বাঙলা হরফকেই বেছে নিয়েছিলেন । খাসিয়া পাহাড়, নাগাল্যান্ড, গারোপাহাড়, লুসাই হিল্স এর সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশ ত্রিপুরার সঙ্গে খাপ খায় কি ? বলুন মিস্টার স্মিথ ।'

মিস্টার স্মিথ এবার হরফের প্রসঙ্গ এড়িয়ে ককবরকের রিয়াং উপভাষার প্রশ্নে এলেন । বললেন, 'ডঃ চ্যাটার্জী, রিয়াং ভাষা আর ককবরক কি এক ? দেববর্মাদের উচ্চারণের সঙ্গে রিয়াংদের উচ্চারণের

মধ্যে তো আকাশ পাতাল পার্থক্য। অনেকে মনে করেন ককবরকের সঙ্গে রিয়াং এর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই, রিয়াং ভাষায় আলাদা লিখিত রূপ দিলে কি হয়?' ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, 'দেখুন মিস্টার স্মিথ, আমাদেব সংগৃহীত তথ্য বলছে ককবরকের আটটি উপভাষা আছে, আর রিয়াং তাদেরই একটি। আপনি তো জানেন, খোদ ইংরেজী ভাষায় কতগুলো উপভাষা (dialect) আছে, যাদের উচ্চারণগত পার্থক্য ককবরকের থেকে অনেক গুণ বেশি। অবিশ্যি, এটা ঠিকই, ককবরকের অন্যান্য উপভাষা থেকে রিয়াং এর উচ্চারণগত পার্থক্য সব থেকে বেশি। কিন্তু তার মানে এই নয়, রিয়াং উপভাষায় কথা বললে ককবরকের অন্যান্য উপভাষাভাষী লোকেরা কিছুই বোঝে না, 'ইট ইজ মিউচুয়ালি ইনটেলিজেবল।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কুমুদ তো রিয়াংডায়ালেকট' এ ফিল্ডওয়ার্ক করেছে, আমি তা চেক করে দেখেছি, উপভাষাগুলোর উচ্চারণ বেশ কাছাকাছি। কুমুদের যদি মনে থাকে, তাহলে এখুনি রিয়াং এর একঘরে না হবার অবস্থাটা বোঝান যেতে পারে।' আমার ঝোলার খাতায় ককবরক ভাষার উচ্চারণ পার্থক্য জনিত একটা তুলনামূলক লিস্ট ছিল ককবরকের পাঁচটি উপভাষার পারস্পরিক উচ্চারণগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য যা থেকে বোঝা যায়।

লিস্টটা স্মিথ সাহেবের সামনে তুলে ধরলাম ঃ-

পুরান ত্রিপুরী	রিয়াং	জমাতিয়া	কলই	রূপিনী
থাপ্‌লা (ছাই)	থাছফলা	থাপলা	থাপলা	থাপরা
হামরা (ভাল নয়)	হাঁইয়াঃ	হাঁইয়া	হামিয়া	হামজ্যা
বুকুর (চামড়া)	বুকুঃ	বুকুয়	বুকুর	বুকুর
কতর(বড়)	কঃতঃর	কতর	কতর	কতর
তক (পাখি)	ত্যাঃউও	তক	তও	তাও
কছম (কালো)	কছঃম	কঁছ	কছম	কোছুম
থুই (রক্ত)	থুঁই	থুঁই	থুঁই	থুঁই
ছাল (সূয)*	ছাঃল	ছাল	ছাল	ছার
চূরাই (শিশু)	চেরাই	চুরাই	চেরাই	চরাই
উল (পিছনে)	উকলাউঅ	উকলক	উলকলাও	উকরাও
বহক (পেট)	বহউক	বহক	বহক	বহক
বেকেরেং (হাড়)	বিক্রেইং	বেকেরেঁই	বেকেরেং	বেকরেং

ককবরক ভাষার আটটি উপভাষার মধ্যে পাঁচটি উপভাষার কয়েক'শ শব্দের লিস্টের প্রথম পাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মিস্টার স্মিথ আমাদের দিকে কেমন যেন অপবাধের দৃষ্টিতে তাকালেন; বললেন, 'ডঃ চ্যাটার্জী, আমার কোনো প্রেজুডিস নেই, মিস্টার চৌধুরীর লিস্ট দেখে আমার আগের ধারণা সংশোধন করছি, রিয়াং যে ককবরকেরই উপভাষা তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।' হঠাৎ একটা গাড়ির হর্ণের শব্দ শোনা গেল। আমরা মিস্টার স্মিথের কক্ষ থেকে বিদায় নেবার জন্যে উঠে পড়লাম। মিশনের গেট পর্যন্ত এসে তিনি জিপের ভেতব তাকালেন। অঘোর দেববর্মা আমাদের এয়ারপোর্টে নেবার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

অরুন্ধতীনগর মিশন থেকে জিপ ছুটলো কৃষ্ণনগরে। ককবরক উন্নয়নপরিষদের সভাপতি বীরচন্দ্র দেববর্মার সঙ্গে বিদায়কালীন শুভেচ্ছা বিনিময় করে ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, 'কুমুদকে রেখে যাচ্ছি, তাকে দেখবেন; আমাদের ভাষার কাজের পরিকল্পনা এত বড়ো, আর আপনারা যেভাবে ভাবছেন, তাতে করে কুমুদকে বেশ কিছুদিন এখানে পড়ে থাকতে হবে।' প্রত্যুত্তরে বীরচন্দ্র বাবু বললেন, 'কুমুদ

বাবুর কথা ভাববেন না, ডঃ চ্যাটার্জী, আমরা যেভাবে হোক তাঁকে পুষবো।'

ডঃ চ্যাটার্জীকে এয়ারপোর্টে বিদায় জানাবার জন্যে আমিও জিপে চড়ে বসলাম। যেতে যেতে ডঃ চ্যাটার্জী অঘোর দেববর্মাকে অনুরোধ করলেন, 'আঘোর বাবু' কুমুদকে আপনি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন হেরমা বাড়িতে। কুমুদেব পক্ষে প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধে লাগবে, অবিশ্যি কিছুদিন গেলেই অনেকটা গাসওয়া হয়ে যাবে।' তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'কি 'ছূকাল' (ডাইনী) এর গল্পটা শুনে আমারো রাত্রে খেঙরাবাড়িতে জানলা বন্ধ করে দিতে ইচ্ছে করেছিলো। আর, 'চুওয়াক' (মদ) খাবার অভ্যেসটা না করলে ভালোই করবে, তবে একটু আধটু কখনো-সখনো 'এনজয়' কোরতে পারো।'

আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছিয়ে আর সময় পেলাম না। রিপোর্টিং-এর ডাক পড়ে গেছে। প্লেনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালাম আমরা, আমাকে নিয়ে ডঃ চ্যাটার্জীর ভাবনাটা তাঁর চোখেমুখে ধরা পড়ছে। পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, 'আমার জন্যে ভাববেন না, স্যার, অঘোর বাবুবা রয়েছেন, তাছাড়া, যোগেন্দ্র বাবু একজন ভাল লোক, তাঁর বাড়িতে থাকতে কোন অসুবিধে হবে না, ভালই থাকব।' প্লেনে চেপে বসেছেন ডঃ চ্যাটার্জী। মনে হল, জানালার পাশে বসে আমাদের দিকে হাত নাড়ছেন। অঘোব বাবু ও আমি হাত নাড়াতে থাকলাম। প্লেন ছুটবার জন্যে বাঁক নিল। আমি তখনো সজোরে হাত নেড়ে চলেছি। অঘোব বাবু আমার পিঠে চাপ দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'চলুন, আপনার স্যারকে আর দেখতে পাবেন না।'

বীরচন্দ্র দেববর্মার ডেরাতে দিন তিনেক কাটালাম। পরিচয় হলো ত্রিপুর চন্দ্র সেনের সঙ্গে। গবেষক লেখক এই আপন ভোলা মানুষটিকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি তাঁর কাছে আগরতলা শব্দটির বুৎপত্তি জানতে চাইলাম। বললেন, 'আগবফা' থেকে আগরতলা শব্দটি এসেছে মনে হয়। তবে কেউ কেউ বলেন, এখানে নাকি আগববাতির গাছ ছিলো, কেউ বলেন অগুরু থেকে আগব শব্দটি এসেছে।' তাবপরে চশমাটা নামিযে বললেন, 'আপনারা ভাষাতত্ত্বের লোক, আবিষ্কাব করুন আগরতলা শব্দেব ব্যুৎপত্তি।' আমি সবিনয়ে বললাম, 'আমি ভাষাতাত্ত্বিক পুরোপুরি এখনো হতে পারিনি, ভাষাতত্ত্ব নিয়ে সবেমাত্র এম.এ. পাশ করে বেরিয়েছি। তবে, ডঃ চাটার্জীর নির্দেশ প্রতিটি 'ককবকর' শব্দকে ভাঙতে হবে এবং প্রতিটি অংশের অর্থ আবিষ্কার করতে হবে।' ত্রিপুর বাবু এবার কৌতুহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'আপনার কী ধারণা আগরতলা ককববক শব্দ?' বললাম, 'আগরতলা শব্দটাব দুটো অংশ 'আগব' এবং 'তলা'। আমাদের কাজ হবে ঐ দুটো অংশের অর্থ আলাদা আলাদা করে বের করা। অনেক সময জায়গা বিশেযেব অর্থের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার ভূঅবস্থান ভূপ্রকৃতি নির্ভর কবে। তবে এই যদি হয় 'আগর' অর্থে আগব গাছ এবং তলা মানে আগর গাছের তলা, তাহলে হতেও পারে, তবে, শব্দটা ককবরকের কিনা তা এই মুহূর্তে বলা যাবে না। ককবরকের কাজ করতে করতে এব্যাপারে নিঃসংশয় হওয়া যাবে।' পরবর্তীকালে ককবরকের অভিধান সংকলন করতে করতে আগরতলা শব্দের ব্যুৎপত্তি যখন আবিষ্কার করলাম, ত্রিপুর চন্দ্র সেন তখন আগরতলা থেকে চির বিদায় নিয়েছেন। একদিন বীরচন্দ্র দেববর্মাকে আগরতলা শব্দের ব্যুৎপত্তি নিবেদন কবলাম। বললাম, 'আগরতলা' শব্দটি জন্ম নিয়েছে 'আগর' ও 'তূইলাম' এই দুটি পৃথক পৃথক শব্দ থেকে। 'আগর' অর্থ ককবরকে 'মাছের গর্ত' আর 'তূইলাম' (জলের ছিদ্র পথ) থেকে এসেছে 'তলা'।' বীরচন্দ্র বাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তাঁর অতি ক্ষুরধার চোখ দুটি দিয়ে। বুঝলাম ব্যাখ্যাটা বোধগম্য হচ্ছে না তাঁর। তাছাড়া, এতদিনের প্রচলিত আগরতলা শব্দটির ভিন্ন অর্থ করছি। বললাম, 'দেখুন, আগর-এর 'আ' অংশটির অর্থ 'মাছ', 'গর' এসেছে হাকর (গর্ত) থেকে।

আ + হাকর = '**আগর**' । মাছের গর্তকে 'আ-হাকর' না বলে ককবরকে 'আগর' বলছে । তবে এখানে একটু কথা আছে । '**আগর**' আ + **খর** এরূপও হতে পারে । কারণ 'খর' শব্দটির অর্থ গর্ত । যেমন, 'তিপরাখর (তিপরা নামে ক্ষুদ্র কচ্ছপের গর্ত), নাওয়ারি খর (নাওয়ারি নামে ক্ষুদ্র কচ্ছপের গর্ত বা তিপরা খরের সমার্থক), 'মাইখর' (কুকীদের দ্বারা লুন্ঠিত হবার ভয়ে ধান লুকিয়ে রাখার গর্ত)। তেমনি 'হাকর' শব্দটির অর্থ মাটির গর্ত । 'হা' মানে মাটি, আর 'কর' এসেছে 'খর' থেকে । 'হাকর' আসলে 'হাখর' । ককবরক ভাষীরা 'হাখর' উচ্চারণ করতে পারেন না, জিহ্বাতে উচ্চারিত হয় 'হাকর'। এর কারণ হলো 'হ' এবং 'খ' উভয়েই মহাপ্রাণ ধ্বনি (aspirates) । ককবরক ভাষীরা দুটো পাশাপাশি মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারে না; দুটোর একটি অমহাপ্রাণ হয়ে যায় । তাই এখানে 'হাখর' এর 'হ' এর পাশে অবস্থিত 'খ' (মহাপ্রাণ) মহাপ্রাণতা হারিয়ে অল্প প্রাণ 'ক' এ পরিণত হয়েছে । তাই 'হাখর' না হয়ে হয়েছে 'হাকর' ।' এরপর বীরচন্দ্র বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আর 'তুইলাম' থেকে 'তলা' কিভাবে হলো ?' বললাম, 'তুই' অর্থ ককবরকে জল, 'লাম' (বুলাম) অর্থ ছিদ্র বা অতিক্ষুদ্র পথ । 'তুইলাম থেকে হয়েছে 'তুইলা' এবং 'তুইলা'র রূপান্তরিত রূপ 'তলা' । মূলকথা, 'আগরতলার' অর্থ মাছের গর্ত ও জলের গর্ত । আমার মনে হয়, যে জায়গাটাকে এখন আগরতলা বলা হচ্ছে, সেটা এক সময় ছিলো খাল বিলের জায়গা, যাকে বলে জলাভূমি, আর সেখানে মাছও পাওয়া যেত প্রচুর । জল মাছের এই জায়গাটিকে বহুকাল আগে ককবরক ভাষীরা বলতো 'আগরতুইলা' । পরবর্তী কালে বাঙালির জিভে এটি হয়েছে 'আগরতলা' । বাঙালির জিভে ককবরকের 'তুই' (জল) উচ্চারিত হয় না । কারণ, 'তুই' উচ্চরাণ করতে গেলে যে কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনিটি (Central Vowel) উচ্চারণ কোরতে হয়, বাঙালির জিভে তা আসে না । তাই বাঙালিরা 'তুইলা' উচ্চারণ কোরতে না পেরে 'তলা' উচ্চারণ করে । এই হলো আমার 'আগরতলা'র ব্যুৎপত্তি আবিস্কার ।' এতটা ভাষাতাত্ত্বিক কচকচানি আগরতলা নামের জন্যে করতে করতে আমার গলা শুকিয়ে এসেছিলো, বীরচন্দ্র বাবুর কাছে এক গ্লাস জল চাইলাম । গলা ভিজিয়ে নিয়ে বললাম, 'আজ ত্রিপুর সেন মশায় নেই; আমার এই আগরতলা ব্যুৎপত্তির ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তিনি সমর্থন করতেন কিনা জানিনা, তবে আমাকে আরো কিছু দিন বেঁচে থাকার জন্যে আশীর্বাদ করতেন নিশ্চয়ই ।'

আমার আগরতলা শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে বীরচন্দ্র বাবু খুব যে একটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন এমন মনে হলো না । সবিনয়ে নিবেদন করলাম, 'আপনার যদি ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে তাহলে 'আখাউড়া' শব্দটির ব্যুৎপত্তির রহস্যটা বোঝাতে চেষ্টা করতে পারি ।' বীরচন্দ্র দেববর্মা সবসময় স্বল্পবাক । মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন । বললাম, 'আখাউড়া' শব্দটি ককবরক শব্দ । শব্দটির দুটো অংশ 'আখা' ও 'উড়া'; এদের শরীরের বর্তমান আদল দেখলে ককবরকের চিহ্ন মাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না । আসলে 'আখা' এসেছে ককবরকের 'আইখা' (প্রভাত হলো) থেকে আর 'উড়া' এসেছে ককবরকের 'উর'(ওখানে) থেকে । তাহলে 'আইখাউর' মানে দাঁড়াচ্ছে ওখানে প্রভাত হলো । 'আইখা'র দুটো অংশ 'আই' ও 'খা' । ককবরকে 'আই' অর্থ প্রভাত বা ভোর হওয়া, তার সঙ্গে 'খা' এই অতীত কালের প্রত্যয় যোগ কোরে '**আই**' + '**খা**' = '**আইখা**' (প্রভাত হয়েছে) হয়েছে । 'উর' অংশটি পরবর্তীকালে বাঙালিদের জিভে উড়া হয়ে গেছে । এরকম অনেক দেখা যায় । বহু উপজাতীয় শব্দ বহিরাগতদের জিভে পড়ে কিছুটা রূপ বদল করেছে । কলম্বাসের আমেরিকা দখলের পরে ওখানকার রেড ইন্ডিয়ানদের অজস্র শব্দ ই[illegible]রোপের বিভিন্ন ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সঙ্কর রূপ ধারণ করেছে ।' দেখলাম বীরচন্দ্রবাবু তখনো চঞ্চল হননি । বললাম,'প্রশ্ন উঠতে পারে ওখানে প্রভাত হলো এমন একটা ক্রিয়াপদ মিশ্রিত নাম কিভাবে হতে পারে ? এমন তো হতে পারে, উপজাতিদের দুটো বিবাদমান

গোষ্ঠী কোনো সুদুর অতীতে যুদ্ধ করতে করতে ওখানে রাত্র প্রভাত করেছিলো। পরবর্তীকালে তাদের উত্তর পুরুষরা ওই বিশেষ স্থানটি স্মৃতিতে জাগরূক রাখবার জন্যে 'আইখাউর' (ওখানে প্রভাত হয়েছিল) এমন একটি ক্রিয়াপদ মিশ্রিত শব্দে ধরে রেখেছেন, যেমনটি হয়েছে বাঙলাদেশের 'কাপতাই' জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে শব্দটি 'কাপ তৃতুই তুই' (কাঁদতে কাঁদতে জল অর্থাৎ চোখের জল) থেকে। কাহিনীটি এরূপ ঃ যাযাবর ককবরক ভাষীদের একটি গোষ্ঠী ঠিক একটি বিশেষ জায়গায় এসে কোন কারণে দুভাগ হয়ে একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। যারা সেখানে থাকলো, তারা আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগ ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল ফেলে দিন কাটাতে লাগলো। 'কাপতাই' এর ব্যুৎপত্তিগত রূপকথাটি বলে বীরচন্দ্রবাবুকে বললাম, ককবরকে গবেষণা করতে করতে এমন একটা দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছি, যার আলোকে আসাম, উত্তরবঙ্গ এবং বাঙলাদেশের বহু জায়গার নাম ককবরক বলে চিনতে পারি আমি।'

আগরতলায় 'ককবরক উন্নয়নপরিষদ'-এর সভাপতি বীরচন্দ্র দেববর্মণের পান্থশালায় (বীরচন্দ্র দেববর্মণের সংসারকে আমার কাছে পান্থশালা মনে হয়) তিন দিন কাটিয়ে আমার গন্তব্যস্থল চড়িলামের দিকে পা বাড়ালাম। সেদিন ছিল সোমবার, চড়িলামের হাটবার। সন্ধ্যের আগ মুহূর্তে অঘোর দেববর্মা চড়িলামের পুরোনো বাজারে আমাকে পৌঁছে দিলেন। সেখানে হেরমার যোগেন্দ্র দেববর্মা লোকজন নিয়ে আমার অপেক্ষায় ছিলেন। আমাকে যোগেন্দ্রবাবুর হেফাজতে রেখে অঘোর বাবু তাঁর নিজ গ্রাম লাটিয়াছড়ার পথ ধরলেন। ডঃ চ্যাটার্জী কয়েক দিন আগে আমাকে নিয়ে এই চড়িলাম দিয়েই উপজাতীয় গ্রাম লেম্বুথলে গিয়েছিলেন। সেখানে রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে একই তক্তপোষে গুরু-শিষ্য পাশাপাশি শুয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, 'আচ্ছা, কুমুদ, ঐ চুরাইলাম বাজারটা, মানে যেটার ওপর দিয়ে আমরা এলাম, ওটা আমার কাছে ককবরক শব্দ বলে মনে হয়।' আমি স্যারের চড়িলাম শব্দের উচ্চারণ চুরাইলাম শুনে হেসে ফেললাম। বললাম, 'স্যার, ওটা তো চুরাইলাম নয়, চড়িলাম।' উনি বললেন, 'এই নামটার যখন উৎপত্তি হয় তখন সেখানে গভীর জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই ছিলনা, আর ওখানে যাদের দেখছো, ওরা সকলেই পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তু, কাজেই ওরা এই নামটা দেননি।' আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'স্যার, আঘোর বাবু সেদিন যে বলছিলেন, চড়িলামে উদ্বাস্তু আসার আগে মুসলমান বসতি ছিল; তা, মুসলমান বাঙালিরা তো এই চড়িলাম নামকরণ করতে পারেন।' আমার কথা শুনে ডঃ চ্যাটার্জী এবার উঠে বসলেন। হ্যারিকেনেব আলোয় দেখা গেল তার চোখ দুটো আমাব ওপর নিবদ্ধ। 'তুমি তো ভাষাতত্ত্বের ছাত্র, আমাকে দেখাও তো ক্রিয়াপদ দিয়ে এইরূপ অদ্ভুত নাম 'চড়িলাম-নামিলাম-উঠিলাম' কোথাও আছে কিনা?' একটু থেমে বললেন, 'ওঠো, হ্যারিকেনটা বিছানার ওপর আন, আর ঐ খাতা কলমটা আমাকে দাও; আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, চড়িলাম নামটা বাঙলা ক্রিয়াপদ থেকে আসেনি, ওটা ককবরকেরই শব্দ।' এবার স্যার খাতায় বড় বড় করে লিখলেন চড়িলাম। চড়ি এবং লাম-এর মাঝখানে একটু ফাঁক রাখলেন ইচ্ছে করেই। তারপরে ঐ ফাঁকের মাঝমাঝি দিয়ে ওপর-নিচে একটা রেখা টেনে চড়িলামকে চড়ি এবং লাম এই দুভাগে ভাগ করে ফেললেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখছো তো, বামে চড়ি ডাইনে লাম?'

উত্তর দিলাম 'দেখছি, স্যার।' এরপরে কলমের নিবটা 'লাম' এর ওপর রেখে বললেন, 'এই যে 'লাম' দেখছো এটি এসেছে ককবকর 'লামা' থেকে। লামা মানে তো জান? রাস্তা। আর বামের 'চড়ি' এসেছে ককবরকেব 'চূরাই' থেকে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ককবরকের চূরাই মানে কি?' উত্তর দিলাম, 'ককবরকে চুরাই মানে শিশু বা বাচ্চা।' 'ঠিকই বলেছো, তাহলে চুরাইলাম মানে কী দাঁড়ালো? শিশু পথ বা অতি ক্ষুদ্র রাস্তা। অর্থাৎ 'চুরাইলাম' থেকে 'চড়িলাম' এর উৎপত্তি।' ছাত্রকে

চড়িলাম শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করে চোখ থেকে চশমা নামিয়ে পুনরায় শুয়ে পড়লেন ডঃ চ্যাটার্জী। আমিও স্যারের খাতা কলম গুছিয়ে হারিকেনের আলোটা একটু কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসার আগ পর্যন্ত চড়িলামকে দিয়ে দু'লাইনের একটা ছড়া তৈরি করলাম ঃ—

'বামে চড়ি ডাইনে লাম
তার নাম চড়িলাম।'

কিছুদিন পরে ককবরকের অভিধান সংকলন করতে করতে চড়িলাম কীভাবে শিশু পথ বা শিশুদের অনুপ্রবেশ যোগ্য রাস্তা হলো তা আরো ব্যাপকভাবে জানবার প্রয়াস করেছিলাম। আর 'লামা' অর্থ পথ থেকে 'লাম' এসেছে ডঃ চ্যাটার্জীর এই ব্যাখ্যা একটু সংশোধন করে তাঁকে জানিয়ে ছিলাম। আমার কথা হলো চড়িলাম-এর চড়ি ককবরকের চূরাই (শিশু) থেকে এসেছে সেটা ঠিকই কিন্তু লাম অংশটি লামা থেকে না এসে 'বূলাম' থেকে এসেছে। বূলামকে সংক্ষেপে লামরূপে উচ্চারণ করা হয়। বূলাম অর্থ ছিদ্র বা ক্ষুদ্র পরিসারের চলাচলের রাস্তা। চূরাই বূলাম থেকে চূরাইলাম। এবং তা থেকে আজকের পরিবর্তিত উচ্চারিত রূপ চড়িলাম।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এই চূরাইলাম নামটি এই আরণ্যক পরিবেশে কবে জন্ম নিল, আর কারাই বা তার জন্ম দিল ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে ফিরে যেতে হবে চড়িলামের চারিপাশে অবস্থিত উপজাতি জনপদ (tribal settlement) গুলোর যাযাবর জীবনকাহিনীতে। কয়েকশ বছর আগের কথা। বিশালগড়-এর কাছাকাছি কোনাবন-ভাটিবন-কসবা অঞ্চল ছিল ককবরক ভাষাভাষী উপজাতিদের আদি বাসস্থান। যাযাবর জুমিয়া জীবনের চলমান গতির রাশ টেনে ধরে কয়েকশ উপজাতি পরিবার এই আরণ্যক পরিবেশে স্থায়ী উপজাতীয় উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। এই সব উপজাতীয় পরিবারের নারী-পুরুষ বৃহত্তর বিশালগড় অঞ্চলে জুম চাষ করে জীবন যাবন করতেন। ঘর বলতে ছিল টোঙঘর, ককবরকে যাকে বলে 'গাইরিঙ'। আর গৃহপালিত পশু বলতে ছিল শূকর আর কুকুর। শান্তিতেই ছিলেন তাঁরা। কিন্তু এই শান্ত সমাহিত জীবনের সমাপ্তি ঘটল এক মুসলমান ফকিরের আগমনকে কেন্দ্র করে। কসবা কালীবাড়ির ওপার থেকে একদিন এক মুসলমান দরবেশ এলেন ওই উপজাতীয় জনপদে। দুরারোগ্য ব্যাধি আর শিশুর মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তাবিজ-কবচ নিতে জনপদের নারীপুরুষ ভিড় করলেন। ফকির তাবিজ কবচ নিজ হাতে পরিয়ে দিলেন শিশুদের গলায় ও বাহুতে। সরল প্রাণ আদিবাসীরা ফকিরকে সেবা যত্ন দিয়ে রাখতে চাইলেন তাঁদের জনপদে। ফকির খুশি হয়ে সম্মতি জানালেন। কিন্তু বিপত্তি ঘটল একদিন। মদমত্ত অবস্থায় কয়েকজন উপজাতীয় যুবক ফকিরকে ভণ্ড বলে অভিহিত করে অপমান করে বসল, ফকিরের সর্বস্ব লুট করল তারা। জনপদের অন্যান্য আদিবাসীরা ছুটে এলেন ফকিরকে সান্ত্বনা জানাবার জন্যে। তাঁরা ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন ফকিরের কাছে। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে ফকির অদৃশ্য হয়ে গেলেন উপস্থিত সকলের সামনেই। বিপদ গুনলেন উপজাতীয় জনপদের সকলেই। তিরস্কার করলেন অপরাধী যুবকদের। সেই রাত্রেই এক দীর্ঘাকৃতি বাঘ উপজাতীয় জনপদ আক্রমণ করে কয়েকজনকে হত্যা করল। পরের দিন রাত্রেও এই ঘটনা ঘটল। দিনের বেলায় বাঘকে দেখা যায় না। রাতের পর রাত বাঘের আক্রমণে উপজাতিরা ভীত সন্ত্রস্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অনেকেই বলতে লাগল ওই ফকিরই বাঘের রূপ ধরে আক্রমণ করছে, তার ওপর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিচ্ছে নরহত্যা করে। উপজাতীয় প্রথাতে ফকিরের পূজা-অর্চনা দেওয়া হল। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হলো না ; নিরুপায় হয়ে উপজাতীয়দের এক জরুরী মিটিং ডাকা হলো। উপস্থিত সকলেই তাঁদের পুরাতন জনপদ পরিত্যাগ করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। সকলেই এই মন্তব্য করলেন যে জায়গাটি অপদেবতা ভর করেছে।

তিন দলে ভাগ হয়ে কোনাবন-ভাটিবনের উপজাতীয় জনপদের আদিবাসীরা শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যপথে নতুন এক অনিশ্চিত জীবনের সন্ধানে যাত্রা শুরু করলেন। এক দল প্রভুরাম সর্দারের নেতৃত্বে বর্তমান চড়িলাম রিজার্ভ ফরেষ্ট-এর পাদদেশে চড়িলাম হাই স্কুলের ঠিক পশ্চাৎভাগে বসতি স্থাপন করলেন। চড়িলামের গভীর অরণ্যে এখনো প্রভুরাম ঠাকুর পাড়ার চিহ্ন বিশেষ রয়ে গেছে। প্রভুরাম ঠাকুরপাড়া থেকে বর্তমান ধরিয়াথল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ টিলা ভূমি ছিল জুম চাষের কুমারী ভূমি। আর যার মধ্যে কালেশ্বর থেকে শ্বেত হস্তীর মতো অতি মূল্যবান জন্তু অবাধে বিচরণ করত, বন্য কুকুরেরা দল বেঁধে বন্য হাতী ঘিরে ফেলে কুরে কুরে মাংস খেয়ে ফেলত তার। প্রভুরাম ঠাকুর পাড়ার জুম জীবীরা ধারিয়াথল উপজাতীয় জনপদের সঙ্গে একটা সংযোগ স্থাপনকারী অতিক্ষুদ্র বনপথ (চূরাইলাম) সৃষ্টি করলেন এবং আজ যা চড়িলাম বলে পরিচিত। একদিন এই 'চূরাইলাম' ধরে প্রভুরাম ঠাকুর পাড়ার উপজাতিরা তাদের যাযাবর জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধারিয়াথলের বৃহত্তর উপজাতীয় জনপদে আশ্রয় নিলেন। সেখান থেকে তারা পুনরায় দু'ভাগে ভাগ হয়ে ধারিয়াথল ত্যাগ করলেন, এক ভাগ গেলেন পুরোনো লেম্বুথাল, অন্য ভাগ প্রভুরাম ঠাকুরের উত্তবপুরুষ মঙ্গল ঠাকুরের নেতৃত্বে হেমরা (বর্তমান মনা ঠাকুরপাড়া)'র আঁদি নদীর ধারে বসতি স্থাপন করলেন। হেরমা ছিলেন এক মরছুম উপজাতি সর্দার। তাঁর নাম অনুসারে মনাঠাকুর পাড়ার নাম হেরমা। চড়িলাম নামের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা, যা বারহাত কাকুড়ের তের হাত বিচি'র মতো মনে হলো, তা কবতে পেরেছি, প্রভুরাম ঠাকুরেব উত্তব পুরুষ ও মনা ঠাকুরের পৌত্র (বর্তমানে আমার দাদাশ্বশুর) গৌরচাঁন ঠাকুরের সাহায্যে।

চড়িলাম বাজার ছেড়ে হেরমার দিকে যখন রওনা দিলাম তখন সন্ধ্যে উতরে গেছে। আমাব হাতে রয়েছে একটা মূল্যবান টেপরেকর্ডার। ককবরক ভাষাগবেষণায় লাগবে বলে পূর্বজার্মানী থেকে সি. পি. আই. পার্টির চেয়ারম্যান এস.এ.ডাঙ্গে এটি এনে দিয়েছিলেন কমবেড মোহন চৌধুরীর হাতে। আমার ভাষাতত্ত্ব ও ট্রাইবাল দুনিয়ার খববে ভরা ক্যাম্বিশের ব্যাগটি যোগেন্দ্রবাবু নিয়েছিলেন কাঁধে করে। আমার বেডিং ও ট্রাঙ্ক বাঁকের দু'দিকে ঝুলিয়ে হেরমার ক্ষীরোদ দেববর্মা আমাদের আগে আগে চললেন। বাজার ফেরতা হেরমার অনেকেই আমাদের সঙ্গে দলবেঁধে চললেন। রাস্তায় যোগেন্দ্রবাবুকে কলকাতার ভাষার এটা-ওটা জিজ্ঞেস করছিলাম। চাঁদের আলোয় আমি সকলকেই আপাদ মস্তক লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেলাম। এক যোগেন্দ্রবাবু ছাড়া প্রায় সকলেরই পরনে এক বিশেষ ধবনের গামছা। যোগেন্দ্রবাবুকে অনেকেই, আমার যা মনে হয়েছিল, আমাব সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন করছিলেন ককবরক ভাষায়। তাঁদের কথাবার্তার বিন্দুবিসর্গ আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। শুধু একটি শব্দ 'ওআন্‌ছা' আমার কানে এসে বিঁধছিল। শব্দটি মনে মনে উচ্চাবণ করলাম বার কয়েক। সার্মযিক ভাবে মনে হচ্ছিল, আমি যেন খাস চীন দেশের কোন এক জনপদ দিয়ে চলেছি। মনে মনে বললাম, কথাটা খুব একটা বেঠিক কিছু বলিনি। ককবরক ভাষাভাষী লোকদের পূর্বপুরুষরা তো একদিন চীন দেশ থেকে 'বোরোমা' (ব্রহ্মপুত্র)র উৎসমুখে এসে হাজির হয়েছিল, যেখানে এখনো চুতিয়া পুরোহিতরা রয়েছেন, আর যার থেকে এখানে এই চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে চন্তাই পুরোহিতদের আনা হয়েছে। আসামের ব্রহ্মপুত্র নদের ব্যুৎপত্তি এখন আর্যীকরণ বলে মনে হচ্ছে। ব্রহ্মপুত্র-এর ব্রহ্ম অংশটুকু ককবরক ও বোরো (বোডো-বোড়ো) ভাষায় 'বোরোবুমা' সংক্ষেপে 'বোরোমা'। আর্যদের কাছে যা ব্রহ্মপুত্র, বোরো উপজাতিদের কাছে তা ছিল বোড়ো জননী। নদীকে মাতা বলে গ্রহণ করার ব্যাপার তো সব দেশেই আছে। আদত কথা, বোডো উপজাতিদের 'বোরোমা' একদিন আর্যজাতিদের জিভে ব্রহ্ম হয়ে গেল। হঠাৎ যোগেন্দ্রবাবুর প্রশ্ন আমার বোরোমা ব্রহ্ম ব্যুৎপত্তি চিন্তার ছন্দপতন ঘটল। 'লামা কেছেপ' হাইটতা পারতাছেন না তো?' বললাম, 'হাঁটতে পারছি, তবে 'লামা কেছেপ' শব্দটা বুঝলাম না।' বললেন, 'লামা কেছেপ

মানে সরু রাস্তা, লামা অর্থ রাস্তা, আর কেছেপ অর্থ সরু বা আপনাদের কলিকাতার ভাষায় বলে সংকীর্ণ।' ইতিমধ্যে আমরা হেরমা কামি (হেরমাবাড়ি -হেরমাপাড়া) তে পৌঁছেগেছি। ঠিক কয়েকদিন আগে ডঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে এই গ্রামে এসে যোগেন্দ্রবাবুর বাড়ি বসে আমাদের ককবরক ভাষা গবেষণার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঠিক করেছি এবং তাঁর স্ত্রী যাঁকে আমি মাসীমা বলে ডাকব ভেবেছি, তাঁর হাত থেকে 'আওআঙ ছকরাঙ' (দুটি হাড়ির সমন্বয়ে ভাঁপে তৈরী বিন্নি চাউলের পিঠে) খাবার কথা এখনো ভুলতে পারিনি। যোগেন্দ্রবাবুর উঠোনে পা দিতেই মেয়ে পুরুষ আর বাচ্চারা ভিড় করে দাঁড়াল। বাচ্চারা একটু দূরে থেকে আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। 'ওআনছা ফাইকা' 'ওআনছা ফাইকা' তাদের মুখ থেকে বারবার এই কথা শুনে আমার 'ওঅনছা' শব্দটির অর্থ জানবার জন্যে ছটফটানি শুরু হলো। আমার কাছে মনে হলো, আমাকে যেন সকলেই আগন্তুক হিসাবে বিশেষ এক জীবের মতো দেখছেন। আমার অস্বস্তির কথা ভেবে যোগেন্দ্রবাবু বললেন, 'কুমুদবাবু ঘরে হামান'। ঘর থেকেও মেয়েলী গলায় কে যেন বললেন, 'নগ হাপাইদি' (ঘরে আসুন / ঘরে প্রবেশ করুন)। হঠাৎ 'হামান' এবং 'হাপাইদি'র মধ্যে কেমন যেন মিল আছে মনে হলো। ঘরে ঢুকেই যোগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী চাঁদলক্ষ্মী দেবীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম, 'মাসীমা খুলুমকা' (মাসীমা প্রণাম)। মাসীমা আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ভাবলেন 'খুলুমকা' যার অর্থ ককবরকে প্রণাম করলাম, আমি জানলাম কি করে ? আসলে ইতিমধ্যে ককবরকের কয়েকটি অপরিহার্য শব্দ আয়ত্ত করে ফেলে ছিলাম। বললাম, 'আজ থেকে আপনাকে মাসীমা বলে ডাকবো আপনি আমার সঙ্গে ককবরকেই কথা বললেন।' বলেই মনে হলো ভুল করলাম, মাসীমা ককবরকে কথা বললে বুঝব কি করে? যোগেন্দ্রবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনাকেও মাস্টার মশায় বলে ডাকবো,' 'আপনি তো ইস্কুলের মাস্টার।' যোগেন্দ্রবাবু আমার কথা শুনে হাসলেন। বললেন, ঠিক আছে, 'অখন চেয়ারে বন জামা কাপড় খুইলা আরাম কইর‍্যাই বন আমি আপনার মাছিমার সঙ্গে গানতি নর্গ (রান্না ঘরে) যাই।'

জামা প্যান্ট ছেড়ে পায়জামা পাঞ্জাবী পরে চেয়ারে বসে ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্রের দিকে চোখ বুলাতে লাগলাম। গানতি নক (রান্না ঘর) থেকে মাস্টার মশাই ও মাসীমার কথাবার্তা কানে আসছিল। মনে হলো তাঁরা যেন কি নিয়ে তর্কাতর্কি করছেন। ভাষা বুঝিনে তবু তাঁদের গলার স্বরের ওঠানামা থেকে এমনি আন্দাজ করলাম। হঠাৎ মাস্টার মশাইর আমার সামনে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস কোরলেন, 'কুমুদবাবু একটু বিপদে পইরা গেলাম। বাজার থেইক্যা ওআকবাহান (শূকরের মাংস) আনছি খাইবেন কিনা? আপনার মাছিমা তো আমাকে বইকত্যাছেন।' বললাম, 'রিয়াং এলাকায় একদিন শূকরের মাংস খেয়েছিলাম; খারাপ কি, খেতে তো ভালোই লাগে; আপনি যান, মাসীমাকে বলুন আমি 'ওআকবাহান' খাব।' মাস্টার মশায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে 'গানতিনক (রান্না ঘর) এর দিকে গেলেন। আমার মনে পড়ে গেল রিয়াং এলাকার শূকরের মাংস খাওয়ার চিরস্মরণীয় ঘটনাটির কথা ঃ সাব্রুমের কাছাকাছি পূর্ব চড়কবাই রিয়াং উপজাতীয় গ্রাম। কয়েকদিন ধরে সেখানে রিয়াং-নোয়াতিয়া উপভাষার তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। আমার তথ্য সরবরাহকারী (informant) হরিমোহন রিয়াং একদিন খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙালেন। বললেন, 'আজ আপনার সঙ্গে কাম কইরত্যা পারুম না। বলঙ্গ (বনে) যাইতে লাগবো, 'ফূজা-ফালি দিইত্যা হইব। আপনি যাইলে যাইতে পারেন।' বনের মধ্যে রিয়াং প্রথায় পুজো দেওয়ার নিয়ম-কানুন প্রত্যক্ষ করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম, 'আমাকে নিয়ে গেলে আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না তো?' আমার রিয়াং বন্ধু উত্তরে বললেন, 'আপনি স্যার কলিকাতার লোক, আমাদের ফূজা-ফালির কথা কলিকাতা ফিইর‍্যা কইবেন আর কি।' আমি তাকে সম্মতি জানালাম। একটু পরে আমি মুখে ব্রাস ঢুকিয়ে টিলার নিচে পুকুরের দিকে যেতেই এক কাঁঠাল বাগানের মধ্যে থমকে

দাঁড়ালাম। এক রিয়াং অচাই (পুরোহিত) কতকগুলো মোরগ-মুরগী কেটে, নাড়ি-ভুঁড়ি পরীক্ষা করছেন, আর মাঝে মাঝে উচ্চারণ কোরছেন 'ছেমা'। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে এক অনির্বচনীয় কৌতূহলী দৃষ্টিতে রিয়াং পুরোহিতের মোরগ-মুরগীর নাড়ি-ভুঁড়ি পরীক্ষা করবার পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। পুরোহিত দু'হাত দিয়ে নাড়ি বার করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি যেন দেখছেন ও রিয়াং উপভাষায় মন্ত্র-তন্ত্র পড়ছেন, আর কিছু পরে পরেই ছেমাছেমা সজোরে উচ্চারণ করছেন। আমার গাটা ছম ছম করে উঠলো। ভাবলাম, আমার উপস্থিতি 'অচাই' কিভাবে নিচ্ছেন কে জানে? পরে কোন বিপদে পড়তে হয় কিনা, এইসব সাত পাঁচ ভেবে টিলার নীচে পুকুরের দিকে পা বাড়ালাম। হাত মুখ ধুয়ে আমার নির্দিষ্ট টোং ঘরে বসে রিয়াং উপভাষার তথ্যগুলো দেখবার কাজে মনোনিবেশ করবো ঠিক এমনি সময়ে আমার তথ্য সরবরাহকারী বন্ধু এসে জানালেন যে মূল দলটি ইতিমধ্যে বনের দিকে রওনা হয়ে গেছে। আমি জামা প্যান্ট পরে আমার রিয়াং বন্ধু এবং বর্তমান গাইডের সঙ্গে মূল দলটির অনুসরণ করলাম। গ্রাম ছাড়িয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে পড়লাম। আমি আমার রিয়াং বন্ধুকে বনের মধ্যে আজকের এই বিশেষ পুজো দেওয়ার কারণ সম্পর্কে জানবার উগ্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলাম। বন্ধুটি তাঁর আঞ্চলিক বাঙলা ও রিয়াং উপভাষার মিশ্রণে যা আমাকে বললেন তার মর্মার্থ হলো ঃ বন্ধুটির দিদির ঘরে বিয়ে হয়েছিল। বাবার কাছ থেকে কানি (বিঘে) সাতেক জমিও পেয়েছিল তার দিদি। দিদির একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। সুখেই ছিল তারা। কিন্তু কিছুদিন হলো দিদির ঘরজামাই স্বামীটি মারা গেছে। তারপর থেকে সংসার ভালো যাচ্ছে না। নানারকম অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। ছেলেটার সারা দেহ তাবিজ করা ও মন্ত্রপুত কড়ির হার দিয়ে ছেয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। কয়েকদিন হলো এক দূর রিয়াং গ্রাম থেকে একজন রিয়াং অচাই (রিয়াং পুরোহিত)কে আনা হয়েছে। তিনি আজ মোরগ-মুরগীর নাড়িভুঁড়ি পরীক্ষা করে দেখেছেন কী-কী অপদেবতা সংসারের ক্ষতি ও এইসব একটানা অসুখ-বিসুখের জন্যে দায়ী। বনের মধ্যে আজ সেইসব অপদেবতার পুজো দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে আমরা দু'জনে পুজো দেওয়ার বিরাট টিলায় পৌঁছে গেছি। পুজোর জন্যে নির্দিষ্ট সমতল জায়গাটি পরিষ্কার করা হয়েছে সুন্দরভাবে। কঞ্চি ও চটা দিয়ে দেড় থেকে দু'হাত উঁচু করে পুজোর থান করা হয়েছে কয়েকটি। প্রতিটি দেবতা বা অপদেবতার জন্যে বোধহয় পৃথক পৃথক থান। বেশ মনে পড়ছে, বন্ধুটির দিদি ছাড়া আর কোন মেয়েলোক পুজোর মূল দলে ছিল না। পুজোর থানের ক'হাত দূরে একটা শূকর, একটা পাঁঠা, একটা 'তাখুক' (মোরগ মুরগী রাখার খাঁচা বিশেষ) এ কয়েকটা মোরগ-মুরগী ও পা বাঁধা অবস্থায় একজোড়া হাঁস সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। পুজো শুরু হল। যতদূর মনে পড়ছে কোনো বাদ্যযন্ত্র নেই। অচাই রিয়াং উপভাষার মন্ত্র উচ্চারণ করে পুজো করতে লাগলেন। দুর্বা ও বেলপাতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না তাঁর হাতে। আমার রিয়াং বন্ধুর দিদিটি, যাঁর জন্যে মানত করা হয়েছে, তিনি পুরোহিতের পাশে বসে একদৃষ্টিতে দেবতার থানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর গলায় ছিল রাঙ বৃতাঙ (টাকার মালা), একখানা 'রিগুনাই বরক' (পাছড়া- উপজাতীয় তাঁতে তৈরী মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র) এ তাঁর বুক পর্যন্ত ঢাকা। কিছুক্ষণ পরে বলি শুরু হলো। বলির খাঁড়াখানা অনেকটা রামদার মতো দেখতে। বলি দেওয়ার জন্যে প্রথমে পাঁঠা আনা হলো। অচাই পাঁঠার ওপর দুর্বা-বেলপাতা ছিটিয়ে দিলেন মন্ত্রপূত করে। বলির জন্যে কোন হাড়িকাঠের ব্যবস্থা ছিল না। পাঁঠার পেছনের দু'পা একজন ও গলায় দড়িটা অপরজন সজোরে টেনে ধরতেই অচাই এক কোপে তার গলাটি নামিয়ে দিলেন। এরপরে এলো শূকরের পালা। শূকরটা এতক্ষণ পা বাঁধা অবস্থায় মাঝে মধ্যে চিৎকার করছিল। শূকরটি চার'পা বেঁধে বাঁশ দিয়ে ঝুঁলিয়ে আনা হয়েছিল। দু'জন গিয়ে বাঁশের দু'মাথা ধরতেই শূকরটি আরো জোরে চিৎকার করে উঠল। শেষ পর্যন্ত শূকরটিকে 'অচাই' এর সামনে এনে ফেলা হল।

শূকরটির চারপায়ের ভেতর থেকে বাঁশটা বের করে নেওয়া হলো। 'অচাই' এবারও শূকরের ওপর অঃদোঃ সুরে মন্ত্র পড়ে দুর্বা বেলপাতা ছিটিয়ে দিলেন। একটা মোটা দড়ি দিয়ে শূকরের গলাটা বাঁধা হল। এবার ঠিক একই সময়ে দু'জন শূকরের দু'পা ও অপর দু'জন শূকরের গলার দড়িটা টানার চেষ্টা করতেই শূকরটা এমন চিৎকার শুরু করল যে আমাদের পাশের জঙ্গল থেকে কয়েকটা 'তমছা' (বন মোরগ) কক কক করে সভয়ে উড়ে পালিয়ে গেল। আমার গায়েও কাঁটা দিয়ে উঠলো। 'অচাই' শূকরটির গতিবিধি লক্ষ্য করে অর্ডার দিতেই দু'পা ও গলার দড়ি টান টান হবার সঙ্গে সঙ্গে এক কোপেই তেজী শূকরটিকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। শূকরটির দেহ ক'হাত দূরে ছিটকে আমাদের দিকে পড়তেই আমাদের জামা কাপড়ে রক্ত লেগে গেল। শূকর বলির পরেই একে একে মোরগ-মুরগী, হাঁস পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কেটে 'অচাই' তাদের রক্ত দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন। এরপরে কয়েক মিনিট বিরতি দিলেন। 'অচাই' থানের সামনে বসে কিছু বেলপাতা ছড়ালেন, জায়গাটা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিলেন। কিছুক্ষণ অচাই রিয়াং বন্ধুটির দিদির হাতে দুটো বেলপাতা দিলেন। কিছুক্ষণ মন্ত্র উচ্চারণ করবার পরে 'অচাই' মহিলাটিকে আদেশ দিলেন পাতা দুটো সজোরে দূরে ছুঁড়ে দিতে। বন্ধুটির দিদি তাই করলেন। কিন্তু দেখা গেল দুটি পাতাই উপুড় হয়ে পড়েছে। প্রথা অনুসারে একটি পাতা উপুড় ও একটি পাতা চিৎ হয়ে পড়লে দেবতা খুশী হন। কিন্তু বন্ধুটির দিদি যতবার বেলপাতা দুটো ছুঁড়ে দিতে লাগলেন, ততবারই দুটো বেলপাতা-ই চিৎ হয়ে পড়তে লাগলো। এরপর বুকে প্রচণ্ড বল নিয়ে পাতা দুটি ছুঁড়ে দিলেন শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে। পাতা দুটি পড়তেই সকলেই আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। একটি পাতা উপুড় ও একটি পাতা চিৎ হয়ে পড়েছে। বন্ধুটির দিদির মুখে হাসি ফুটে উঠলো। আর সব থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি, ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল আমার।

একটু বেশী দেরীতেই ঘুম থেকে উঠতেই মাসিমা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফাতার থাঙনাই দা ?'(পায়খানায় যাবেন কি ?)। আমিও কিছুটা লজ্জিত। রাতে মাসিমার দেয়া ট্রাইবাল বাড়ির সোমরস (মদ) খেয়ে একেবারে রিপভ্যান উয়িঙ্কিলের মতো লম্বা ঘুম দিয়েছিলাম। আমার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে মাসিমা এবার একটু জোরেই বললেন, 'কি বুঝত পারল না ? ফাতার থাঙানাই দা— পায়খানা যাইবেন কি ?' আমি লজ্জায় ফেটে পড়ে সুবোধ বালকের মতো ঘাড় নাড়লাম। বললাম, 'কোথায় যাব?' মাসিমা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'বললেন, তওগূরাখুদি, আঙ লতাছা তুই তুবুইগূবানা— দাঁরান, এক লতা জল লইয়া আছি।' বলেই তিনি হন হন করে ঘরে ঢুকেই একটি এলুমিনিয়ামের ঘটিতে জল নিয়ে এসে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'ফাতার বিয়াঙ থাঙনাই তাবুক, কই পায়খানা যাইবেন অখন ? কলিকাতানি বরক, চিনি খিনক হাম্‌য়া থা দা থাঙমান ছিদ — কলিকাতার বরক (লোক) আমাদের পায়খানাগর ভালা না, যাইত পারবো কি, কিজানে?' বললাম, 'কোন দিকে মাসিমা ?' এবার তিনি আঙুল দিয়ে খড়ের ছাউনি দেওয়া পায়খানা ঘরটি নির্দেশ করলেন। উক, অরনি নুগজাগূইতওখ— উই, এইখান থাইক্যা দেখা যায় তো ? আমি এবার জলের ঘটি'টা হাতে নিয়ে সেই দিকে চললাম। পায়খানায় বসে একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়লাম। আচ্ছা, মাসিমা তো পায়খানা যাওয়া অর্থে 'ফাতার থাঙনাই' বললেন, কিন্তু এর আগে জেনেছি, পায়খানা যাওয়া অর্থে 'খিনা থাঙনাই' বলে। তবে কি 'ফতার থাঙনাই' (পায়খানায় যাব/যাবে) ও 'খিনা থাঙনাই' সমার্থক ? মনে মনে ভাবলাম, ঠিক আছে মাস্টার মশায়ের কাছ থেকে ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া যাবে। পায়খানা থেকে ফিরে ঘটি'টা বারান্দায় রেখে ঘরে ঢুকে মুখে ব্রাসটা গুঁজে মাস্টার মশায়ের বাড়ির ফটকের বাইরে কলতলার দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু বেশী দূর এগোতে পারলাম না, কয়েকজন অবিবাহিতা মেয়ে, পনের ষোলর মতো বয়েস, শুধুমাত্র ব্লাউজে বুকটা ঢাকা, আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলাবলি

করছে; কলতলাটা ছাড়তে চাইছে না। আমি প্রচন্ড অস্বস্তির মধ্যে পড়ে অন্য দিকে তাকিয়ে দাঁতে ব্রাস বোলাতে লাগলাম। এই বয়েসের মেয়েদের, বিশেষ করে স্বাস্থ্যবতী সুডৌল আদিবাসী মেয়েদের শুধুমাত্র ব্লাউজে সাঁটা দেহের দিকে তাকাতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার আঁখি পল্লব প্রচন্ড লোভ সামলিয়ে ধর্মঘট করে বসল। বাঙালি, তার ওপর কলকাতার লোক, বাঙালি মেয়েদের এই বয়েসে শাড়ি ছাড়া ব্লাউজে বুক ঢাকার কথা কল্পনা করা যায় না। প্রশ্ন জাগল, শুধুমাত্র ব্লাউজ কেন ? পরে বুঝেছিলাম আদিবাসী সাম্যবাদী সমাজে একেবারে আদুল গা থেকে 'রিছা' এবং 'রিছা' থেকে ব্লাউজে উত্তরণ একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। মাস্টার মশায়কে এব্যাপারে নিঃসঙ্কোচে সব জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম যে আদিবাসী মেয়েরা সাধারণত ঋতুমতী হবার আগ পর্যন্ত আদুল বুকেই থাকে। ঋতুমতী হলে পর অথবা বছর খানেক আগে তাদেরকে বুকে রিছা বেঁধে দেওয়া হয়। এই রিছা বাঁধার মধ্য দিয়ে মেয়েটি বুঝতে পারে তার দেহে যৌবন এসেছে, আগের মতো বনবিহারিণী হরিণীর মতো স্বচ্ছন্দ বিহারের স্বাধীনতা সে হারাতে বসেছে। ঋতুমতী অথবা প্রাক ঋতুমতী মেয়েদের এই রিছা বাঁধার ব্যাপারটা একটা উৎসবের মতো। ঋতুমতী হবার পরে যে মেয়েটার রিছা বেঁধে দেওয়া হয়, তার ভয়ানক আপত্তি থাকে এব্যাপারে। প্রথমত মেয়েটি লুকিয়ে থাকে। বয়স্কারা তাকে জোর করে ধরে এনে নানারকম হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে জোর করে তার অনাবৃত বুক রিছা দিয়ে বেঁধে দেন। আমার কাছে এটা আমাদের মা-ঠাকুরমার আমলের পুনর্বিবাহের অনুষ্ঠান বলে মনে হয়েছে। তবে কয়েক বছর ধরে বিশেষ বিশেষ আদিবাসী এলাকায় ঋতুমতী অথবা আসন্ন যৌবনা মেয়েদের এই রিছা বাঁধার উৎসব লুপ্ত হতে বসেছে। পবিত্র রিছার জায়গা অধিকার করে নিয়েছে আধুনিক পরিধেয় ব্লাউজ। কিন্তু পুজা-পার্বণের আসরে অথবা পবিত্র আচার-অনুষ্ঠানে রিছার ব্যবহারিক মর্যাদা অক্ষুন্নই আছে। এতো গেল রিছা লৌকিক রূপের চেহেরা। কিন্তু তার অন্তররূপ কী ? কিভাবে রিছা শব্দটির উৎপত্তি হলো, এনিয়ে কোনো বিতর্ক আছে কিনা, এগুলো দেখাই হলো ককবরক ভাষার গবেষক হিসেবে আমার মুখ্য কাজ। কিন্তু একথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে, কোন শব্দের আন্তররূপ শব্দটির ব্যবহারিক রূপের সঙ্গে পরতের পর পরতের মতো জড়িয়ে থাকে। শব্দটির আক্ষরিক আদল ভাষাগবেষকদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। এক একটি শব্দ এমন ঘটনা বা লোকাচারের মধ্য দিয়ে অর্থ প্রসারিত করে যাতে করে ওই একই শব্দের সম্প্রসারিত পরিবর্তন (Semantic change) আমাদেরকে অবাক করে দেয়। ধরা যাক রিছা শব্দটির কথা। শব্দটি আসলে রিছা না রিয়া ? ককবরক ভাষীরা কোথাও 'রিছা' আবার কোথাও 'রিয়া' উচ্চারণ করেছেন। সমার্থক একটি শব্দের দুটি স্বতন্ত্র উচ্চারিত রূপ ? না দুটি স্বতন্ত্র শব্দের একই ব্যবহারিক রূপ? এই প্রশ্নের উত্তরের চাবিকাঠি রয়েছে শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তির মধ্যে। এখন 'রিছা' এবং 'রিয়া' শব্দ দুটিকে ভাঙতে হবে। উভয় শব্দ শুরু হয়েছে 'রি' দিয়ে। **রি+ছা এবং রি+য়া**। 'রি' উভয়ের ক্ষেত্রে এজমালী। এবার এই এজমালী অংশটির অর্থ কি দেখা যাক। ককবরক ভাষায় টোন পার্থক্যের জন্যে রি-এর একাধিক অর্থ। তবে 'রি' বিশেষ্য বাচক হলে ককবরকে পরিধেয় বস্ত্র এবং ক্রিয়া বাচক হলে পোষা বা পালন করা এই দুটি অর্থের ব্যবহার সব থেকে বেশী। কাজেই 'রিছা' এবং 'রিয়া'র 'রি' এর অর্থ পরিধেয় বা ব্যবহারযোগ্য বস্ত্রখণ্ড। এখন প্রথমে রিছার অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যাক। 'রি' অর্থ তো বস্ত্র কিন্তু 'ছা' অর্থ কি ? 'ছা'র অর্থ তার ব্যুৎপত্তির সঙ্গে জড়িত। 'ছা' এসেছে 'বৃছা' থেকে। বৃছা অর্থ কি ? 'বৃছা'র প্রধান বা মুখ্য অর্থ সন্তান। এছাড়া বাচ্চা, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্ররূপ এই অর্থগুলোও 'বৃছা'রই প্রাসঙ্গিক ব্যবহারিক রূপ - আবার 'বৃছা' যখন বিশেষণ হিসাবে ককবরকের নিয়ম অনুসারে অন্য শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়, তখন 'বৃছা'র 'বৃ' এই উপসর্গটি লুপ্ত হয়, থাকে শুধু 'ছা', কিন্তু অর্থ একই থাকে। তাই যদি হয়, তাহলে রিছা এসেছে **রি-বৃছা (রি + বৃছা)** থেকে অর্থ বস্ত্র-সন্তান অথবা ক্ষুদ্র বস্ত্র।

এখানে ক্ষুদ্র বস্ত্রই সমধিক প্রযোজ্য। এবার 'রিয়া' শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করা যাক। 'রিয়া' 'রি' এর অর্থ পূর্ববৎ, অর্থাৎ পরিধেয় বা ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র। কিন্তু 'য়া' অর্থ কি? এখানে 'য়া' কোন শব্দ নয়, এটি হল একটি ককবরকের নাবোধক প্রত্যয়। যেকোন পদের পরে ব্যবহৃত হয়ে 'য়া' উক্ত শব্দটিকে নাবোধক অর্থে রূপান্তরিত করে দেয়। যেমন, 'বুফাঙ' অর্থ গাছ। কিন্তু বুফাঙ + য়া = বুফাঙয়া অর্থ গাছ নয়। 'ছূই' অর্থ কুকুর কিন্তু ছূই + য়া = ছূইয়া অর্থ কুকুর নয়। তেমনি 'রি' কাপড় বা পরিধেয় বস্ত্র কিন্তু রি + য়া = রিয়া অর্থ কাপড় নয় বা বস্ত্র নয়। এখানেই রিছা এবং রিয়ার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ভিন্ন কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ অভিন্ন। একদিকে যা ক্ষুদ্র বস্ত্ররূপে বিবেচিত, অন্যদিকে কোনভাবেই তাকে বস্ত্ররূপে বিবেচনা করা হচ্ছে না। 'রিয়া' বস্ত্র নয়, তবে কি? একথা উহ্য থাকছে। অন্যদিকে 'রিছা' বস্ত্রখন্ড বা ক্ষুদ্রবস্ত্র, পরিপূর্ণ বস্ত্র নয়। তা সত্ত্বেও উপজাতি মেয়েদের স্তনযুগল আবৃত করতে যে ক্রিয়াপদের আশ্রয় নিতে হয়, তা হলো 'ছর' এই ক্রিয়াপদের যার অর্থ পরা বা গায়ে দেওয়া বুঝায় না। বাঙলায় কাপড় পরাও বলে ব্লাউজ পরাও বলে, আবার ব্রাসায়ার পরাও বলছে বাঁধা বলছে না। অন্য দিকে 'ছর' পরা, গায়ে দেওয়া বা বাঁধা অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না- হচ্ছে জড়ানো বা পেঁচানো অর্থে। ককবরকে যেখানে 'রি কানদি' (কাপড় পর), কামচূলুই চুমদি (জামা পর) অথবা ব্লাউজ চুমদি (ব্লাউজ পর) বোঝাচ্ছে, সেখানে 'রিছা ছরদি' (রিছা জড়াও বা পেঁচাও) বোঝাচ্ছে। আসলে রিছার যা আকৃতি তা দিয়ে পরাও যায় না গায়ে দেওয়াও যায় না- শুধুমাত্র পেঁচানো বা জড়ানো যায়। আবার গামছাকে যখন 'রিছা' বা 'রিয়া'র মতো ব্যবহার করে বুক আবৃত করা হয়, তখনও এই 'ছর' ক্রিয়াপদকে আশ্রয় করা হয়। 'রিতুকু' অর্থ ককবরকে গামছা, যার ব্যুৎপত্তি হলো, 'রি' অর্থ বস্ত্র এবং 'তুকু' অর্থ স্নান করা অর্থাৎ যে বস্ত্র স্নানের জন্যে ব্যবহার করা হয় তাকে রিতুকু (রি + তুকু) বুঝায়। কোন স্ত্রীলোককে যদি 'রিতুকু ছরদি' বলা হয়, তার অর্থ দাঁড়াবে গামছা পেঁচিয়ে বুক ঢাক।

এবার 'রিছা'র ব্যবহারটা একটু অন্য ভাবে দেখা যাক। 'রিগ্নাই' অর্থ ককবরকে মেয়েদের পরিহিত বস্ত্র আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলে পাছড়া। উপজাতীয় প্রথা অনুসারে ট্রাইবাল মেয়েরা রিগ্নাই পরে রিছা দিয়ে বুক ঢাকেন, যেমনটি দেখেছি আমরা মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা বা নাগকন্যা উলুপীর ক্ষেত্রে। তাই দেখি, রিগ্নাই এর পরেই রিছা শব্দটির ব্যবহার। এরা বলেন, রিগ্নাই-রিছা রিছা-রিগ্নাই নয়। কিন্তু ককবরক প্রবাদে কিন্তু ঠিক উল্টো ব্যাপারটি ঘটেছে। প্রবাদটি এই রকম ঃ

বুইনি রিছা বাই
বুইনি রিগ্নাই বাই
নাগবি নাদু দুঙ।

অর্থ ঃ অন্যের বক্ষাবরণী ও বস্ত্র পরে নাগরী হেলে দুলে ঘুরে বেড়ায়।

ঠিক এমন সময় মাসিমা একহাতে একটি প্লেটে চা একটি ছোট বাটিতে একটা সিদ্ধ ডিম এনে আমার টেবিলের ওপর রাখলেন। হেসে বললেন, 'চা কাইছা তকতূই তূইছা; চা নৃঙদি তাই তকতূই চাদি'- একতা চা একতা দিম; চা আর দিম খান।' আমি সঙ্গে সঙ্গে মাসিমার ককবরকের কথাগুলো আওড়ালাম ঃ চা কাইছা তকতূই তূইছা, চা নৃঙদি, তকতূই চাদি। আমার কথা শুনে মাসিমা হাসতে হাসতে আমার টেবিল থেকে দেশলাইটা নিয়ে এক টা বিড়ি ধরিয়ে আমার সামনে নিচে মাটিতে বসলেন। বললেন, 'ছাতে ছাতে উঙগান্—কইতে কইতে অইব।' আমি প্রাতরাশ করতে করতে মাসিমাকে জিজ্ঞেস করলাম— 'আচ্ছা মাসিমা, চার পরে কাইছা আর তকতূই এর পরে তূইছা হলো কেন? আর, চা নৃঙদি, তকতূই চাদি-ই বা হলো কেন?' মাসিমা আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে বিড়িতে একটা জোর টান লাগিয়ে জোরের সঙ্গে বললেন, 'আপনার মাসিমা চাঁদলক্ষ্মী দেবী লেখাপরা

জানেনা, নাম ছইও করতে জানেনা, ওছব কথার উত্তর দিতেও জানে না; আপনার মাছতর মছাইকে জিগাইলে ওছব কথার উত্তর দিব।' প্রাতরাশ শেষ। দেখলাম বারান্দায় অনেকগুলো ছেলেমেয়ে কিচির মিচির করছে । আর ওআনছা ওআনছা বলে আমার দিকে তাকাচ্ছে। মাসিমা বললেন—'চূরাইরগ নিনি রেকরদ খূনানানি ফাইঅ, কিছা তামরূদি দ—পুলাপানরা আপনার রেকরদ হুনতে চায়, কিছু বাজাইলে বালা অয় আর কি।' বুঝলাম, মাসিমা আমাকে টেপরেকর্ডার বাজাতে বলছেন। আমার টেপে তখন জুমের প্রেমিক-প্রেমিকার গান রেকর্ড করা ছিলো। রেকর্ডটা চালাতেই মুহূর্তের মধ্যে বারান্দা মেয়ে- পুরুষে ভর্তি হয়ে গেলো। মন্ত্র মুগ্ধের মতো সকলে শুনতে লাগলেন, আর যার ভাষা সুর আমি একদম বুঝিনা। গানগুলো আমাদের ভাষা গবেষণার কাজেই লাগবে। অবসর সময়ে শুনব এবং তার থেকে শব্দগুলো বুঝবার জন্যে কান তৈরি করব। কিন্তু গানগুলোর শব্দ আলাদা আলাদা করে বাছা প্রচন্ডতম কঠিন কাজ। সুর দিয়ে শব্দগুলো এমনভাবে দীর্ঘায়িত করে টানা হয়, তার থেকে শব্দগুলো বুঝাই মুশকিল। কিন্তু যারা জুম জীবনের প্রেমিক-প্রেমিকার গান শুনছেন তাঁদের কাছে শব্দ ও সুর একাকার হয়ে গেছে। একজন পুরুষ এবং একজন মেয়ে পাশাপাশি টিলায় জুমের কাজ করছেন, কিন্তু আরণ্যক ব্যবধান এবং গভীরতা এমনই যে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না, অথচ উভয়ের মিলন আকাঙ্ক্ষা সাগরের মতো অতলান্ত; তখন গানই একমাত্র বেদনা বিধুর দুটি হৃদয়ের মিলন সেতু। গানের মধ্যদিয়ে উভয়ে উভয়ের রূপ-গুণ বর্ণনা করছেন, ভবিষ্যতে জুম নির্ভর সংসার জীবনে দুজনের সম্পর্ক কি হবে, তার প্রশ্ন করে একে অন্যকে গানের মাধ্যমে ছুঁড়ে মারছেন এবং নারীপুরুষ তার সহজ সাবলীল উত্তর পাল্টা গান দিয়ে দিচ্ছেন। পাল্টা-পাল্টি প্রেমিক-প্রেমিকার গান শুনতে শুনতে সকলে তন্ময়, হঠাৎ একজন মাঝ বয়সী লোক 'এঁহ্' কোরে লম্বা টান দিলেন গলায়, পরক্ষণই একজন সমবয়সী পুরুষলোক উহ্......উহ্ করে জোরে দীর্ঘয়িত টান জুড়লেন, আর সকলেই ওই দুইজনের আনন্দব্যঞ্জক ও সম্মতিসূচক ধ্বনিকে তারিফ করে হো হো করে হেসে উঠে এতক্ষণে নীরবতা ভাঙ্গলেন। প্রেমিক-প্রেমিকার গানের টেপটি শেষ হলো, কিন্তু শ্রোতারা অনড়। মাসিমা তাদের ভাবগতি দেখে আমাকে বললেন, 'আরেকতা যাদুনি গান বাজাইবানি। বরক-ত কুতুল না ছইয়া,— মানুষ তো উঠতো চায়না, আরেকতা গান বাজান আরকি।' আমার টেপের অপরদিকে ককবরকের দুটো গান ছিলো। একটি গানে প্রেমিক-প্রেমিকার রূপ বর্ণনা করে ভালবাসার প্রতীক হিসাবে তার মমত্ব বোধ প্রকাশ করেছে। গানটি এই রূপ ঃ

য়াকুরাই কুচাক হাদূলুই নাঙগানূ
রাঙচাকনি জুতা কাদি
মুখাঙ বাতাছা ছাতুঙ কগানূ
ফিরিঙ্গি ছাতা হুঙদি।

প্রেমের এই গানে প্রেমিক-প্রেমিকার উদ্দেশে বলছে ঃ তোমার পায়ের গোড়ালি রক্তবর্ণ, তাতে ধুলো লাগবে, সোনার জুতো পায়ে দিয়ে চল; তোমার বাতাসার মত মুখে সূর্যরশ্মি উঁকি মারবে, তুমি ফিরিঙ্গি ছাতা মাথায় দিয়ে চল।

আর, আমার মতো অকবির কলমে ককবরকের এই প্রেমের গানটি বাঙলা কবিতায় রূপ পেয়েছিলো নিম্নভাবে ঃ

রক্তরাঙা চরণদুটি ধুলায় ধুলায় মলিন হলো
চিনি মুখে টোল খেয়েছে রক্ত রবির ওই যে আলো
ওগো বধূ সয়না বুকে ব্যথার ভারে পড়ছি নুয়ে

ফিরিঙ্গি ছাতা স্বর্ণ জুতা পড়ুক তোমার চরণ ছুঁয়ে ।

গানটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-পুরুষরা একে অন্যের দিকে তাঁকিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন, মনে হলো পুরুষরা খুব অস্বস্তির মুখে পড়েছেন । আর আমিও কম অস্বস্তির মুখে পড়িনি । কারণ দেখলাম অনেকগুলো যুবতী মেয়ের কৌতুহলী চোখ আমার ওপর নিবদ্ধ রয়েছে । আমি টেপটি মাঝ রাস্তায় বন্ধ করে দিলাম । এবার সকলের চোখ পড়ল মাসিমার দিকে । মাসিমা আমার উদ্দেশে বললেন— 'তাঙগৃই মুথাক ছুলা, তাই কিছা খূনারূদিবা—থামাইলেন কেন, আর কিছু হুনান না ।' বলেই তিনি শ্রোতাদের মধ্যে বিড়ি বিতরণ করলেন । কিন্তু এবারের গানটি বাজাতে আমার দিক থেকে আপত্তি ছিলো । কারণ গানটিব বিষয়বস্তুর মধ্যে একটু পরকীয়া ভাব আছে । গানটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম রিয়াং উপজাতি এলাকায় ভাষার কাজ করতে গিয়ে । গানটির মধ্যে রয়েছে প্রেমিকের দৃষ্টিতে প্রেমিকার রূপ বৈশিষ্ট্য এবং তার কাছে যাওয়ার শর্ত । গানটি নিম্নরূপ ঃ

করমতী বাই কক ছানাখে
চাঙগ' রাঙ খক বা
বুআ কুফুর মা
বৃরূই কাহামা
মুই থগ্য়া চায়া না দ ।

বাংলা করলে গানটির অর্থ দাঁড়ায় ঃ হলুদ বর্ণা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ট্যাঁকে পাঁচ টাকা গুঁজে নাও । মেয়েটির দাঁতগুলো পরিষ্কার ঝকঝকে, মেয়েটি সত্যিই ভাল, সুন্দরী; সুস্বাদু ব্যঞ্জন ছাড়া কিছুই তাঁর মুখে রোচেনা ।

মাসিমার কাছ থেকে আবার তাদিগ এলো—'তাঙগৃই লেরছূলা ? —দেরি কইবতাছেন কেন?' কাজেই টেপ রেকর্ডে টিপ দিলাম । যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হলো । মুহূর্তের মধ্যে মেয়েরা বিড়ি মুখে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, পুরুষদের দিকে তাঁকিয়ে মরা মরা বলতে বলতে ঘর ফাঁকা করে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন সকলে । লক্ষ্য করলাম বিবাহযোগ্যা মেয়েদের মুখ লাল হয়ে উঠেছে । আমি যেন বেকুব বনে গেলাম । মাসিমা আমার অবস্থা দেখে বললেন— 'মহাই রূচামুঙ বরনি মানূই ফাইকা, বৃরূই নাইথকতী বাই মালাইনা থাঙকে রাঙ খগবা রূনা নাঙগ', মদা রূচামুঙ—এই ছব গান কোন জাগা থাইক্যা পাইয়া আইছেন আপনি, ছুন্দরী মায়ালোকের লগে কথা কইতে যাইলে পাঁচ তাকা লাগে, এতা কি একতা গান অইল ?'

১লা জানুয়ারী ১৯৯৫ । থাকি নাজির পুকুরের কাছে পাল্লা-বাটখারা অফিসের পাশে শ্রীযুক্ত দিলীপ দেবরায়ের বাড়ি মঞ্জু আলয়ে । আজ ১লা জানুয়ারী ভোর চারটেয় উঠলাম । উঠে পিতা-মাতাকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়ের বইয়ে মাথা ঠেকালাম । দরজা খুলে ছাদে গেলাম, ছাদ ঝাঁট দিয়ে মাদুর পেতে বসে ভোরের আলোয় প্রথম পড়লাম রবীন্দ্রনাথের বাঙলাভাষা-পরিচয় থেকে কিছু অংশ। তারপর তুর্গেনিভের পিতাপুত্র উল্টে-পাল্টে দেখলাম একটু । সাড়ে ছ'টায় বড় মেয়ে তানিয়া (নন্দিনী) ও ছোট মেয়ে দেবযানীকে উঠতে বললাম । স্ত্রীকে (ফুলকুমারী দেববর্মা) ডাকলাম, তাঁর শরীর খারাপ Hypothyroidism-এর রোগী । উঠলেন তিনি, তাঁকে মধু খেতে বললাম । টাটকা মধু এনেছিলাম নগেন্দ্র জমাতিয়ার স্ত্রী আমার ধর্মবান্ধবী পবিত্ররাণী জমাতিয়ার কাছ থেকে । ওঁরা থাকেন বিজয়কুমার চৌমুহনীর কাছে কাশী ঠাকুরের প্রথম স্ত্রীর বাড়ি । আটটা নাগাদ পুত্র সুরঞ্জন ও আমার ছোটো শালা বিমল উঠলো । বিমলকে নিয়ে আস্তাবল বাজারে গিয়ে ৫৬ টাকা খরচ করে নববর্ষের বাজার করলাম। খোলা বাজার (কালোবাজার ?) থেকে দশ টাকা দরে কেরোসিন কিনে আনলাম ।

বিকেলে গেলাম রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনের চত্বরে গপ প্রতিযোগিতার আসরে। গপ প্রতিযোগিতার পাশে আমাদের AICMED (All India Council for Mass Education and Development) এর তরফ থেকে সাক্ষরতা ক্যানটিন খোলা হয়েছে। ক্যানটিনের প্রধানকর্মী সাহানা সেনগুপ্ত, অধ্যাপিকা আলপনা সিনহা, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রমুখ পরিবেশন করলেন। ক্যানটীনে এসে বসেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রমী দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত। চুরাশি বছর বয়েসে তিনি দিব্যি ফিট। ক্যানটিন থেকে গেলেন তিনি গপের আসরে। তিনি পেলেন শ্রেষ্ঠ দর্শকের পুরস্কার একটা লেপ। কী হাসি হাসলো সব। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে আমার ছোট মেয়ে দেবযানী কলাতীর্থের ছাত্রী হিসেবে নাচছিলো। নাচের পরে আমার বড়মেয়ে তানিয়া ও তাকে নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

২রা জানুয়ারী ১৯৯৫। আজ ভোর ৫টা থেকে ৬টা সুধন্বা দেববর্মার উপন্যাস 'হাচুক খুরিঅ'র ১৮ পরিচ্ছেদ অনুবাদ করতে শুরু করলাম। এর পরে স্ত্রীকে তুলে মধু খাওয়ালাম। তানিয়া চা করলো, সকলে খেলাম। সাড়ে আটটা নাগাদ বেরিয়ে ত্রিপুরা দর্পণ নিয়ে এলাম। তারপর ১০টায় স্ত্রীকে নিয়ে রিক্সায় চাপলাম। তাঁকে তাঁর কর্মস্থল জেলখানা রোডে 'পূর্বাশা'য় নামিয়ে দিয়ে আমি গেলাম কলেজ টিলার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে গিয়ে Language Laboratory খুলে বসলাম কিছুক্ষণ। তারপর বাঙলা বিবাগের প্রধান ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদের কোয়ার্টারে গেলাম। তাঁকে নববর্ষের নমস্কার করলাম। ককবরক সার্টিফিকেট কোর্সের রেজাল্ট বের করার ব্যাপারে আলোচনাও হলো। বেলা দেড়টার সময় এলেন অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন মেলার মাঠে সাহানা সেনগুপ্তের বাড়ি। সেখান থেকে সাক্ষরতা ক্যানটিনের খাবার নিয়ে আমরা তিনজনে গেলাম সূর্যমণি নগর ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে Life Science Dept-এ। ২.৪৫ এ বাসে চেপে রামেশ্বর বাবু ও আমি আবার ফিরলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৩.৩০ থেকে ৫ টা পর্যন্ত ককবরক ক্লাস নিলাম। তারপর ফিরলাম বাড়ি। স্ত্রীকে নিয়ে ৬টায় এ্যাডভাইজর চৌমুহনীতে গিয়ে শূকরের মাংস কিনলাম। সেখান থেকে আমি গেলাম রাধামোহন ঠাকুর একাডেমীতে ককবরক ক্লাস নিতে। ক্লাসের পরে ডাঃ নীলমণি দেববর্মার নীলকরবী বাড়িতে বসে ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করলাম।

৩রা জানুয়ারী.১৯৯৫। ভোব পাঁচটায় উঠে প্রতিদিনকার মতো ছাদ ঝাঁট দিলাম। কিছুক্ষণ ডায়েরী লিখলাম। স্ত্রীকে মধু খাওয়ালাম। তাঁর খুব সর্দি-কাশি হয়েছে। এরপরে তাঁর জন্য ওষুধ আনতে গেলাম কের চৌমুহনীতে হোমিও প্যাথিক ডাক্তার ডঃ গুপ্ত (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাধিকা রঞ্জন গুপ্তর দাদা)'র কাছে। সেখান থেকে বেরিয়ে কের চৌমুহনীর কাছেই ডঃ এস. আর. দেবের চেম্বারে ঢু মারলাম। আমার স্ত্রীর E.C.G করতে হবে। তাঁর Hypothyroidism এর জন্যে Eltroxin ওষুধ দেয়ার আগে হার্টের অবস্থা জানতে হবে। ফিরে এসে গেলাম ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা আনতে কর্নেল চৌমুহনীতে। ১০টায় স্ত্রীকে তাঁর অফিসে রওনা করে দিলাম। ১২টায় বেরিয়ে গেলাম সেক্রেটারিয়েটে আমার খুড়শ্বশুর বীরকুমার দেববর্মার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি গিয়েছিলেন কমলপুরের মরাছড়ায় তাঁর শ্বশুর বাড়ি তাঁর স্ত্রীর স্কুলসার্টিফিকেট আনতে। উগ্রপন্থীদের ভয়ে তিনি একরকম পালিয়ে এসেছেন বললেন। তাঁর সঙ্গে কথা শেষ করে গেলাম মেলার মাঠে স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে কালান্তর পত্রিকার টাকা (৫০) দিলাম। কথা হলো C.P.I. পার্টি revitalised করার ব্যাপারে। দেখলাম তিনি অঘোর দেববর্মার ভূমিকা সম্পর্কে খুব খুশী নন। অঘোর দেববর্মা ও প্রশান্ত কপালীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছে পার্টির কাজকর্ম নিয়ে তা আমি মীমাংসা করতে বললাম তাঁকে। দেবুদার ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরক ক্লাস নিতে। ক্লাস শেষে ডঃ আমেদের সঙ্গে কথা বললাম। ঘরে ফিরে শুনলাম অঘোর দেববর্মা এসেছিলেন দেখা করতে। আমার

কাছে তাঁর 'ত্রিপুরার জনশিক্ষাসমিতির ইতিকথা'র পান্ডুলিপি ছিলো। ওটা এখন জগৎজ্যোতি রায়ের কাছে, তিনি সেটা Edit করেছেন, ত্রিপুরা দর্পণে ওটা ধারাবাহিক ভাবে বেরবে।

৪ঠা জানুয়ারী ১৯৯৫। ভোর ৫টায় উঠে 'হাচুক খুরিঅ' অনুবাদ করলাম কিছুটা। সকালে প্রথম গেলাম গোবিন্দ আচার্যীর দোকানে মাসকাবারী মাল কিনতে। তারপর গেলাম আস্তাবল বাজারে বাজার করতে। দুপুর ১১টায় রওনা দিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। বিশ্ববিদ্যালয় যাবার পথে প্রথম গেলাম A.G. অফিসে জগৎজ্যোতি রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর কাছে অঘোর দেববর্মার 'জন শিক্ষা সমিতির ইতিকথা'র পান্ডুলিপি ছিলো। কথা হলো, ওই পান্ডুলিপি নিয়ে আগামী শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টায় অঘোর দেববর্মার বনমালীপুরের বাসভবনে যাবো আমরা দু'জনে। সেখানে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে ত্রিপুরা দর্পণে ওই ইতিকথা প্রকাশ করা হবে। মালঞ্চ নিবাসের পাশে A.G. অফিস থেকে বেরিয়ে অভয়নগরের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে সোজা চলে গেলাম অঘোর দেববর্মার বনমালীপুরের বাসভবনে। তাঁর সঙ্গে শুক্রবারের Appointment ঠিক করে হেঁটে জেলখানার পাশ দিয়ে চলে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ১.৩০ টায় ছিলা ককবরকের পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে মিটিং। মিটিং সেরে চলে এলাম আমার স্ত্রীর অফিস পূর্বাশায়। সেখান থেকে তাকে নিয়ে রিকসা কবে এলাম কেরচৌমুহনীতে ডঃ এস.আর. দেবের কাছে। ECG করা হল। বললেন আমার স্ত্রীর হার্ট মোটামুটি ভালো। Hypothyroidism এর জন্যে Eltroxin দিলেন।

৫ই জানুয়ারী ১৯৯৫। প্রাত্যহিক ছাদ ঝাঁট দিয়া সেরে সুধন্বা দেববর্মার 'হাচুক খুবিঅ' অনুবাদের কাজে হাত দিলাম। অনুবাদটি বেরোচ্ছে শুভব্রত দেব সম্পাদিত 'একুশ শতক' পত্রিকায়। উপন্যাসটির ২২ পরিচ্ছেদের মধ্যে ১৭ পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে। অনুবাদের কাজ শেষ করতেই সাতটা নাগাদ এলেন প্রক্তন কৃষি মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, সঙ্গে দেহরক্ষী প্রমোদ বাবু। একসঙ্গে চা খেলাম। কথা উঠলো তাঁর একটা বিতর্কিত প্রবন্ধ নিয়ে। বিবেকানন্দেব শিকাগো বক্তৃতাব শতবর্ষ পূর্তি পুস্তিকায় তিনি ত্রিপুরার উপজাতিরা কেন এত অধিক সংখ্যায় খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছেন তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মূল কক্তব্য হল, হিন্দু ধর্মপ্রচারকরা এ ব্যাপাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ধর্ম প্রচারে ও হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা উপজাতিদের কোন আশা দেখাতে পারেন নি, বরঞ্চ তাঁরা ধর্ম আচার-আচরণের নামে উপজাতিদের শোষণ করেছেন, বঞ্চনা করেছেন। উপজাতি শিক্ষিত যুবকেরা এখন নতুন রাস্তা খুঁজছে। তাঁরা খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকদের সেবামূলক কাজে, তাঁদের শিক্ষা বিস্তারের কাজে আকৃষ্ট হয়ে খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে। রামকৃষ্ণ মিশনকে এই ব্যর্থতাকে জয় করতে হবে। নগেন্দ্রবাবু চলে যাবার পর গেলাম সুধন্বা দেববর্মার জামাই ডঃ এস.আর. দেববর্মার এ্যাডভাইজার চৌমুহনীর চেম্বারে। তাঁর সঙ্গে আমার স্ত্রীর চিকিৎসার বিষয়ে আলোচনা করলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে দৈনিক সংবাদ ও ত্রিপুরা দর্পণ হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। বারোটা পর্যন্ত আবার 'হাচুক খুবিঅ' অনুবাদ করলাম। তারপর বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওনা দিলাম। পথে ডঃ জীবন নাগের চেম্বারে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ককবরক ক্লাস শেষ করে চলে গেলাম ডঃ নীলমণি দেববর্মার বাসভবনে। সেখানে রাধামোহন ঠাকুর একাডেমীতে আজ থেকে ককবরক ক্লাস শুরু হল। সন্ধ্যে ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ক্লাস নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

৬ই জানুয়ারী ১৯৯৫। ভোর পাঁচটায় ছাদ ঝাঁট দিয়ে এসে দোতলার ঘরে বসে সুধন্বা দেববর্মার 'হাচুক খুরিঅ'র অনুবাদের কাজে হাত দিলাম। আজ যে অংশটুকু আনুবাদ করলাম, তা থেকে জানতে পারনাম যে ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্য থেকে কিছু লোক জুমিয়া পুনর্বাসনের দালালি করে। এমন একজন দালালের নাম বীরমণি। সে কোর্ট-কাছারিতে এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকে আর

পাহাড়ী লোক পেলেই খপ করে ধরে। বেলা ৮টায় গেলাম আস্তাবল বাজারে কেরোসিনের খোঁজে। রেশনে কেরোসিন ক'দিন হলো পাওয়া যাচ্ছেনা। ১৫টাকা দিয়ে চোরাবাজার থেকে বহুকষ্টে ১ লিঃ কিনলাম। লোকদের ঠাট্টা করে বলতে শুনলাম-'জয় রাজা দশরথ কেরোসিনের দাম পনের টাকা।' 'রাতে আলো নেই, রেশনে কেরোসিন নেই-বামফ্রন্ট জিন্দাবাদ।' সকাল ১০টায় ফুলকুমারীকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে বেরিয়ে পড়লাম। তাঁকে নামিয়ে দিলাম পূর্বাশায়। সন্ধ্যে ৬ টায় এলাম ত্রিপুরা দর্পণে। সেখানে বন্ধুবর জগৎজ্যোতি রায় বসে ছিলেন আঘোর দেববর্মার জনশিক্ষা সমিতির ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে। দর্পণ সম্পাদক সমীরণ রায় ওটা তাঁর পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ছাপতে রাজি হয়েছেন। আলোচনার পর পাণ্ডুলিপি নিয়ে অঘোর বাবুর বনমালীপুরের বাসভবনে গেলাম। তিনি তার জনশিক্ষা সমিতির ইতিহাস একটু Re-writing করে দেবেন বললেন। ফিরে এলাম লোডশেডিঙয়ের মধ্য দিয়ে আবার দর্পণ পত্রিকার অফিসে। সমীরণ বাবুকে সব বললাম। তারপর কাঁধের লাল ঝোলা থেকে অধ্যাপক সত্যেন পালের একটা লেখা সমীরণকে দিলাম। লেখাটা ছিলো নেশার ওপর। বাড়ি এলাম রাত ৮.৩০ এ।

৭ই জানুয়ারী ১৯৯৫। প্রাত্যহিক কাজ সেরে ভোর ছ'টায় 'হচুক খুরিঅ' কিছুটা অনুবাদ করলাম। সকালে চা খাবার পর সংসার চালানোর ব্যাপারে স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হল। তাঁর কথা, মাত্র ৭-৮ শ'টাকা আছে বাকি মাস কী করে চালাবে? দাম্পত্য কলহ শেষে গেলাম বংশীঠাকুরের প্রথম স্ত্রীর বাড়ি। সেখানে নগেন্দ্র জমাতিয়া ভাড়া থাকেন। আমার বান্ধবী, নগেন্দ্র জমাতিয়ার স্ত্রী, এক বোতল লালি পাতলা করে জ্বাল দেয়া গুড় দিলেন। বান্ধবীর কাছ থেকে দু'কেজি বিনি চাল কিনে নিয়ে এলাম ছ'টাকা করে। দশটায় স্ত্রী অফিসে যাবার পর আমিও বেরিয়ে পড়লাম মহাকরণ পাড়ায়। সেখানে Employment Exchange Office-এ গিয়ে প্রচীন মুদ্রা সংগ্রহকারী জহর আচার্জির সঙ্গে দেখা করলাম। সেখান থেকে গেলাম আমার স্ত্রীর অফিসে। তাঁর আফিসে ঢুকতেই রাস্তার চায়ের দোকানের সামনে দেখা হলো সরকারি আর্ট কলেজের ভাবপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বন্ধুবর চিন্ময় রায়ের সঙ্গে। দাঁড়িয়ে ২ কাপ চা খেতে খেতে শিল্পী পরিতোষ সেনের লেখা দেশপত্রিকায় প্রকাশিত 'পিকাসো'র ওপর লেখা একটা প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা হলো। পূর্বাশা থেকে স্ত্রীকে নিয়ে চলেগেলাম ধলেশ্বরে ডঃ জীবন নাগের চেম্বারে। আমার স্ত্রী Arthritis-এর রোগী। সেখান থেকে বেরিয়ে ঢুকলাম ধলেশ্বর স্কুলের পাশে আমার মেসো শ্বশুর আশ্বিনী দেববর্মার বাড়ি। সেখান থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যে বেলায় বাড়ি। একটু পরে আমি বেরিয়ে পড়লাম কবি রাতুল দেববর্মার বাড়ি। সেখান থেকে বেরিয়ে অসুস্থ বীরচন্দ্র দেববর্মাকে দেখে আবার গেলাম নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাড়ি। ঠিক হলো আমারা ১২ই জানুয়ারি আম্পির কাছে তুইদু যাবো। সেখানে ওইদিন উপজাতি এলাকায় উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে শান্তি মিছিল বেরোবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে দৈনিক সংবাদ ও ত্রিপুরা দর্পণের সাংবাদিক।

৮ই জানুয়ারী ১৯৯৫। ভোর ৫ টায় উঠে ছাদ ঝাঁট দিয়ে এসে 'হাচুক খুরিঅ' অনুবাদ করলাম কিছুক্ষণ। তারপর গেলাম আস্তাবল বাজারে, সওদা করলাম, আর চোরাবাজার থেকে ১৫টাকা দরে কেরোসিন কিনলাম। বাজার থেকে ফিরে আবার অনুবাদের কাজে হাত দিলাম। বিকেল চারটেয় বেরিয়ে গেলাম পুরনো R.M.S চৌমুহনীতে ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তীর কাছে। তাঁর সঙ্গে আমার স্ত্রীর চিকিৎসার বিষয়ে আলোচনা হলো, ঠিক হলো আগামী কাল থেকে Eltroxin খাওয়াতে হবে। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম মেলারমাঠে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর বাড়ি। তিনি বাড়ি ছিলেন না। খুব খুঁজে পেতে Eltroxin কিনে বাড়ী ফিরলাম। রাত ৭.৩০ টা-এ গেলাম ত্রিপুরা দর্পণে। সেখানে গিয়ে ফুলন ভট্টাচার্যের কাছ থেকে শুনলাম DSP অমিতাভ করের ছোট ভাই তরুণ ডাক্তার অমিতেশ কর আত্মহত্যা

করেছেন। অমিতেশ দৈনিক সংবাদ পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক মৃনাল কান্তি করের খুড়তুতো ভাই।

৯ই জানুয়ারী ১৯৯৫। সকালে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। 'হাচুক খুরিঅ' অনুবাদ করে সকাল ৮ টায় আমার স্ত্রীকে Eltroxin খাওয়ালাম। এটি Hypothyroidism -এর ওষুধ। তাঁর Hypothyroidism (এক প্রকারের গলগন্ড) হয়েছে। আমি তাঁকে আমি নিজেই তাঁর অফিসে নিয়ে গেলাম এবং হাজিরা খাতায় সই করিয়ে বাড়ি নিয়ে এলাম। Eltroxin খাবার পরে তাঁর শরীর ভালো লাগছিলনা। দুপুরে খেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম ককবরক ক্লাস নিতে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে দেখে আবার গেলাম রাধামোহন ঠাকুর একাডেমীতে ককবরক ক্লাস নিতে। আজ অপর শিক্ষক বিশিষ্ট ককবরক প্রবন্ধকার নরেশচন্দ্র দেববর্মাও উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন ডঃ নীলমণি দেববর্মা ও তাঁর স্ত্রী করবী দেববর্মা। রাত ৮টায় বাড়ি ফিরলাম।

১০ই জানুয়ারী ১৯৯৫। প্রাত্যহিক কাজ সেরে 'হাচুক খুরিঅ' অনুবাদ করলাম। সকাল ৭.৩০ -এ এলেন প্রখ্যাত ককবরক লেখক শ্যামলাল দেববর্মা। তাঁর একটি ককবরক ছোটো গল্প অনুবাদ করেছে আমার পুত্র শ্রীমান সুরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরী, বেরিয়েছে কবি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত স্পন্দন পত্রিকার বিশেষ ত্রিপুরা সাহিত্য সংখ্যায় (শ্রাবন, ১৪০১), নাম 'খুমতয়া পাড়ায় গিয়েছিলো যারা' সেটা নিতে।

স্ত্রীকে দশটায় অফিসে রওনা করে দিয়ে আমি গেলাম নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায়। পূর্ব কথা মত তাঁকে নিয়ে গেলাম Census Office -এ। সেখান থেকে ফিরে আবার তাঁর বাসায় এলাম। দেখলাম তাঁর 'ত্রিপুরার উপজাতিদের সমস্যার সমাধান কোন পথে' নামে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে আজকের দৈনিক সংবাদে। প্রবন্ধটি চমৎকার। লেখাটায় উপজাতিদের মূল সমস্যা ও উপজাতি-বাঙালিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী হবে তা খুব Sharply তুলে ধরেছেন। একটু পরেই এক ভদ্রলোক এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তার নাম সমীর গোস্বামী বাড়ী কমলপুর। তাঁর সারা শরীর অ্যাসিড-দগ্ধ, বিকৃত চোখ*মুখ, বামফ্রন্ট বিজয়ের তিনি নাকি Victim হয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন সাহায্যের জন্যে। নগেন্দ্র বাবু ৫০ টাকা দিলেন তাঁকে। নগেন্দ্র বাবুর ওখান থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় যাবার পথে ঢু মারলাম ত্রিপুরা দর্পণে। সেখানে দেখি কলকাতার প্রখ্যাত লেখক শৈবাল মিত্র দর্পণ সম্পাদক সমীরণ রায় ও কবি রাতুল দেববর্মার সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি এসেছিলেন T.G.T.A.'র (অজয় বিশ্বাসপন্থী) সুবর্ণজয়ন্তীতে ভাষণ দিতে। সেখান থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম বাঙলা ভাষাতত্ত্ব ও ককবরক ক্লাস নিতে। যাবার পথে স্ত্রীর অফিসে ঢুকে তাঁর শরীরের অবস্থা জেনে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরতে দেখি তিনি বাজার করছেন তুলসীবতী বাজারে। তাঁকে রিকসায় তুলে দিয়ে আমি গেলাম রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে CPI-MP. গুরুদাস দাশগুপ্তর ভাষণ শুনতে। তিনি TGTA'র সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে ভাষণ দিলেন। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে বাইরে বেরোতেই দেখা পেলাম প্রখ্যাত ককবরক কবি নন্দকুমার দেববর্মার। তিনি বাদাম কিনলেন। ঘাসের ওপর বসে আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখলাম কিছুক্ষণ। দূর থেকে দেখলাম শৈবাল মিত্রকে ঘিরে কারা কথা বলছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে দর্পণের দিকে ফিরতেই বিখ্যাত চিত্রপরিচালক দীপক ভট্টাচার্য পাকড়াও করলেন আমায়। বুধবারে তিনি আসবেন বললেন আমার কাছে। তারপর দর্পণে আবেকবার ঢুঁ মেরে বাসায় ফিরলাম রাত ৮.৪৫-এ।

১১ই জানুয়ারী ১৯৯৫ঃ খুব ভোরে ছাদ ঝাঁট দেয়া সেরে 'হাচুক খুরিঅ' অনুবাদ করলাম কিছুক্ষণ। তারপর সকাল সাতটায় প্রগতি স্কুলের কাছে শ্যামলাল দেববর্মার বাড়ি গিয়ে তাঁর ককবরক

ছোটগল্পের অনুবাদের Xeroxed Copy দিয়ে ফিরছিলাম। রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল শ্রীযুক্ত মানিক মজুমদারের সঙ্গে তাঁর বাড়ির কাছেই। মজুমদার মশায় সরকারি অফিসার থাকাকালীন উপজাতিদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখেন। কথায় কথায় এল তেলিয়ামুড়ার ধনী ব্যবসায়ী সারদা রায় ও বিজয় রায়ের কথা। বললেন, তিনি শুনেছেন, তাঁরা একসময় উত্তর ত্রিপুরার এক বিরাট অঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে একচেটিয়া দাদনের ব্যবসা করতেন। উপজাতি কৃষক ও জুমিয়াদের টাকা দিতেন রুপোর গয়না বা পাছড়া রেখে। পাহাড়ের যতো ধান, তিল, কার্পাস ও পাট এঁরা সংগ্রহ করতেন দাদন প্রথার মারফত। বললেন, তাঁদের ধনঢ্য হবার পেছনে রয়েছে উপজাতিদের রক্ত জল করা শ্রম। সারদা রায়েরা নাকি কমিউনিস্ট-কংগ্রেসকে সমানভাবে টাকা দিতেন, কমিউনিস্টরা পেতো সিংহভাগ, তবে তাঁরা ভোট দিতেন কংগ্রেসকে। দশরথ দেববর্মার নির্বাচনে তাঁরা নাকি গাড়িও দিতেন — এই কথাও তিনি শুনেছেন।

স্ত্রী ফুলকুমারী আজ একাই অফিসে গেছেন। আমি ১১টায় বেরিয়ে পড়লাম অক্ষর প্রকাশনাব অফিসে। ভাবলাম সেখান থেকে আমার লেখা একখানা ত্রিপুরার রূপকথার বই নিয়ে লেখক বন্ধু শৈবাল মিত্রকে দেবো। কিন্তু ত্রিপুরা দর্পণে এসে শৈবালের খবর নিতেই দর্পণ-সম্পাদক সমীরণ রায় বললেন যে শৈবাল গুরুদাস দাশগুপ্তর সঙ্গেই সকালের Flight -এ কলকাতা চলে গেছেন। অথচ তাঁর যাবার কথা ছিলো ১২ তারিখে। এর পরে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে Science Faculty 'র Dean ডঃ অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে সূর্যমণিনগরের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমাদের AICMED (অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর মাস এডুকেশান এণ্ড ডেভেলপম্যান্ট) পরিচালিত সাক্ষরতা ক্যানটীন থেকে খাবার সরবরাহ করবার ব্যাপারে আলোচনা করলাম। সেখান থেকে ত্রিপুবা বিশ্ববিদ্যালয়েব Asst. Registrar অধ্যাপক কল্যাণবিজয় জমাতিয়ার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি করে গেলাম জি.বি. হাসপাতালে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী দীলু জমাতিয়া ভর্তি আছেন, তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ। সেখান থেকে বেরিয়ে জমাতিয়া সাহেবের সঙ্গে এলাম তাঁর মামা ত্রিপুরার প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায়। মিঃ জমাতিয়া নগেন্দ্র বাবুর ভাগ্নে। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু ছিলেন না তখন। তিনি গিয়েছিলেন ADC হোস্টেলে তাঁদের পার্টির মিটিং করতে। সেখান থেকে বেরিয়ে জমাতিয়া সাহেবের সঙ্গে গেলাম বিজয়কুমার চৌমুহনীর করবী দেববর্মার বাড়ি। ডঃ নীলমণি দেববর্মা ও তাঁর স্ত্রী করবী দেববর্মণ তাঁকে খুব আপ্যায়ন করলেন। মিঃ জমাতিয়া চলে যেতেই আমি শুরু করলাম ককবকর ক্লাস করবীদির বাড়ির দোতলায়। ক্লাস সেরে রাত ৮টায় আবার ঢু মারলাম নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায়। তাঁকে বললাম, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাব জরুরি কাজ আছে, তাই আগামীকাল অম্পির শান্তিমিছিলে আপনাদের সঙ্গে যেতে পারবো না।' তিনি বললেন, 'আজকের মিটিংয়ে ঠিক হয়েছে আমাদের পার্টি উপজাতি যুবসমিতি উগ্রপন্থী সমস্যার বিরুদ্ধে সারা রাজ্যে উপজাতি এলাকায় শান্তি মিছিল ও পদযাত্রা করবে।' নগেন্দ্র বাবু এবং আমার বান্ধবী পবিত্ররাণী জমাতিয়ার সঙ্গে আরো কিছু কথাবলে রাত ন'টায় বাসায় ফিরলাম।

১২ই জানুয়ারী ১৯৯৫। সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে বেরিয়ে স্ত্রীকে পূর্বাশায় নামিয়ে দিয়েছি। আজ সারাদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। আজ উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াই ডি পান্ডে শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকারের সঙ্গে গিয়েছিলেন সদর দক্ষিণের উপজাতীয় গ্রাম গামছা কবরা পাড়ায়। ফিরলেন বিকেল ৫টায়। তিনি ফিরতেই তাঁর সঙ্গে দেখাকরে আমার Extension -এর ব্যাপারে Application দিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের Research Analyst হিসাবে আমাকে ৬ মাস অন্তর Extention দেয়া হয়। তিনি আমার Application-এ সই দিয়ে সেটাকে Assistant Registrar Mr. K. B. Jamatia'র

কাছে দিতে বললেন Syndicate meeting -এ তোলার জন্যে। এর আগে ৩-৩০ থেকে ৪-৪৫ পর্যন্ত ককবরক ক্লাস নিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গেলাম Asst. Registrar-এর কোয়ার্টারে। সেখান থেকে বেরিয়ে হেঁটে লোডশেডিংয়ের মধ্যে দিয়ে চলে এলাম ত্রিপুরা দর্পণ-এ। সেখান থেকে টেলিফোনে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর সঙ্গে সূর্যমণিনগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাক্ষরতা ক্যানটিন চালানোর বিষয়ে আলোচনা করে বাড়ি ফিরলাম রাত ৮টায়।

১৩ই জানুয়ারী ১৯৯৫ঃ খুব ভোরে উঠে 'হাচুক খুরিঅ' অনুবাদ করছি, তখন ৫.৩০ এর মতো হবে, হঠাৎ বাইরে থেকে নগেন্দ্র জমাতিয়া ডাক দিলেন। কুমুদ বাবু! আমি গেট খুলে দিয়ে তাঁকে ও তাঁর Body-guard প্রমোদ বাবুকে দোতলায় নিয়ে এলাম। নগেন্দ্র বাবুকে বললাম, 'আপনাকে দেখে নিরুদ্বিগ্ন হলাম, গতকাল শান্তি মিছিল তাহলে শান্তিতে কেটেছে ?' তিনি বললেন, 'এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। উগ্রপন্থীদের ভয় উপেক্ষা করে শান্তি-সম্প্রীতির জন্যে এতো লোক বেরোলো, এটা ভাবাই যায়না। প্রথম দিকে পাঁচ-ছশো লোক নিয়ে মিছিল শুরু হলো, এরপর পদযাত্রা যত দীর্ঘ হতে থাকল, তত লোক বাড়তে লাগল, মিছিলের সিংহভাগ ছিলেন উপজাতি মহিলারা, তাঁরাই অগ্রভাগে ছিলেন। তবে ভয় ছিল সর্বত্র। দৈনিক সংবাদের রিপোর্টার প্রদীপ এবং ফটোগ্রাফার সুমন দেবরায় ভয় পেয়ে মাঝেমধ্যে পেছনে চলে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যে খবর রটে যায়, আমি, নগেন্দ্র জমাতিয়া আক্রান্ত হয়েছি। খবর পেয়ে তুইদু বাজার থেকে পাঁচ-ছশো লোক বাঁধ ভাঙা জলের মতো উপজাতি এলাকায় ঢুকে পড়ে। মোট ১৫টা গ্রাম পরিক্রমা করি আমরা। তারপর বিকেল ৩টায় তুইদু বাজারে এসে মিছিল শেষ হয় এবং সেখানে জনসভা হয়। ভেতরে পদযাত্রার সময় মোট ৪ টে জনসভা হয়।' নগেন্দ্র বাবুর অভিজ্ঞতার কথা শুনে ৬.৩০ এর সময় তাঁকে নিয়ে গেলাম উপজাতি যুব সমিতির চাণক্যসদৃশ নেতা শ্যামাচরণ ত্রিপুরার কর্ণেল বাড়ির বাসায়। গিয়ে দেখি অতো সকালে তিনি গরম ভাত খাচ্ছেন। রোজই নাকি ভোরে উঠে গরমভাত খান এবং তারপর লিখতে বসেন। এটা তাঁর অভ্যেস। শুনে বেশ আশ্চর্য লাগল। নগেন্দ্রবাবু ও শ্যামাচরণবাবুর মধ্যে তাঁদের পার্টির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আলোচনা শুরু হলো। শুরুতেই শ্যামাচরণবাবু তাঁদের পার্টির জাঁদরেল নেতা শ্রীযুত হরিনাথ দেববর্মার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলেন। আমি দেখলাম, উপজাতি যুব সমিতির আভ্যন্তরীণ কলহের বিষয়ে কোনোকিছু শোনা আমার পক্ষে উচিত হবে না। তাই বন্ধুবর নগেন্দ্র জমাতিয়াকে শ্যামাচরণবাবুর বাসায় রেখে আমি বিদায় নিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসে বিকেল ২.৩০ টায় স্ত্রী, দু' কন্যা নন্দিনী ও দেবযানীকে নিয়ে স্ত্রীর গ্রাম হেরমাবাড়ি রওনা দিলাম। ঐদিন গ্রামের বাস ছিল না। চড়িলাম থেকে আমরা হেঁটে হেরমা গেলাম সন্ধ্যে বেলায়। আমার স্ত্রীর শরীর দুর্বল, খুব কষ্ট হলো তাঁর। আমরা গ্রামে এসেছি হাঙরাই (পৌষ সংক্রান্তি) পালন করার জন্যে। আগামীকাল সংক্রান্তি, খুব ভোরে স্নান করতে হবে। রাতের বেলায় একটু এদিক-ওদিক গেলাম। দেখলাম, উপজাতি ছেলেরা 'কুইপু' দের মতো করে ঘর বেঁধেছে ভোরবেলায় পুড়িয়ে দেয়ার জন্যে। মোট ৪টে ঘর করেছে তারা গ্রামের বিভিন্ন দিকে। রাত্রে শূকরের মাংস খেয়ে আনন্দ -ফূর্তি করবে। মাইক বাজলো সারা রাত ধরে। কাক ভোরে উঠে স্নান করে ঘর পুড়িয়ে আগুন পোহাতে লাগলো গ্রামের ছেলেরা শীতে তুরতুর করতে করতে।

১৪ই জানুয়ারী. ১৯৯৫। আজ পৌষ সংক্রান্তির ভোর। সারা রাত হেরমা গ্রামের ছেলেরা তাদের বয়েস অনুসারে তাদের নিজেদের তৈরী 'কুইপু' টাইপের ঘরে হৈ হল্লা করেছে, শূকরের মাংস রান্না করে খেয়েছে। মাইক বাজছে, তালে তালে হিন্দী গান, বাঙলা গান ও ককবরক গান গাইতে গাইতে নাচছে তারা। পাশের গ্রাম ধারিয়া থল। সেখানকার অবস্থাও একই রকম। সেখান থেকেও মাইকের গান

শোনা যাচ্ছে। যেখানেই থাকি, প্রতি বছর স্ত্রীর গ্রামে এসে পৌষ সংক্রান্তির নানান মজার জিনিষ উপভোগ করি। উঠেছি কাকভোরে। কিছুক্ষণ কান পেতে রইলাম ঘর পোড়ানোর ফটফট শব্দ শোনার জন্যে। গ্রামের উত্তর দিকে কবিরাজের পুকুর। সেই দিক থেকে ঘর পোড়ার ফটফট শব্দ কানে আসতেই এগিয়ে গেলাম সেখানে। দেখলাম, একটা ঘর পুড়িয়ে দিয়ে ছেলেরা পুকুরে স্নান সেরে আগুন পোহাচ্ছে, কাঁপছেও তুরতুর করে। তবে মাইকের হিন্দী গান তাদের চাঙ্গা করে রেখেছে। কম বয়েসের মেয়েরাও ওই কাক ভোরে স্নান করলো, আর নিজেরা কুটোর আগুন জ্বেলে আগুন পোহাতে লাগলো শীতে হিহি করতে করতে। আমিও স্নান করবো। কিন্তু কোথায় করি? পুকুরে করবো না গ্রামের দক্ষিণে আঁদি নদীতে করবো এনিয়ে ইতস্তত করতে লাগলাম। কবিরাজের পুকুর পাড় থেকে গেলাম আঁদি নদীর কাছে। তখনও খুব ভোর, কুয়াশাও পড়েছে বেশ, দূরের কোনো জিনিসই দেখা যাচ্ছে না। নদীর পাড়ে গিয়ে দেখি নদীর জল খুব কম, ডুব দিয়ে স্নান করা যাবে না। তাছাড়া, নদীর পাড়ে এবার ছেলেরা ঘর তৈরী করেনি নানা কারণে। চোর-ডাকাত ও উগ্রপন্থীদের ভয়, এক মাস ধরে রাতের বেলায় এই ঘরে থাকতে হয় , কাজেই খোলা জায়গায় নদীর ধারে 'হাঙরাই-নক' (সংক্রান্তি-ঘর) বাঁধতে সাহস করেনি তারা। অন্য বছরগুলোয় দেখেছি এই আঁদি নদীর পাড়ে ছেলেদের হাঙরাই-নক বাঁধতে এবং এক মাস ধরে রাতের বেলায় সেখানে থাকতে। আগে দেখেছি, সংক্রান্তির দু'দিন আগেই নদীতে বাঁধ দেয়া হয়, কানায় কানায় ফুলে-ফেপে ওঠে নদীর জল। সংক্রান্তির ভোরে গ্রামের সকলে সেই জলে স্নান সেরে আগুন পোহায় ছেলেদের ঘর পুড়িয়ে দেয়া আগুনে।

ডুব দিয়ে স্নান করা যাবে না ভেবে এবং স্নানের পর আগুন পোহানো সম্ভব নয় বুঝে ফিরে গেলাম বাড়িতে। ঢুকলাম রান্না ঘরে। শিশিতে করে সরষের তেল নিলাম বেশ খানিকটা, গামছা ও জামা-কাপড় নিলাম সঙ্গে। কবিরাজের পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখি দ্বিতীয় ঘরটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি করে বুকে-পিঠে তেল মাখতে লাগলাম আমার খুড়শ্বশুর বীরকুমার দেববর্মার পাকা ঘরের বারান্দায় বসে। আচ্ছা করে তেল মেখে ছুটে গিয়ে পুকুরে নেমে পরপর পাঁচটা ডুব দিয়ে শীতে তুরতুর করতে করতে শ্বশুরের দাওয়ায় গিয়ে পৌঁছলাম। আমার খুড়শাশুড়ি জ্যোৎস্না দেববর্মা জামাইয়ের এই অবস্থা দেখে হাসতে লাগলেন বেশ মজা করে। কোনো রকমে জামা-প্যান্ট পরে এবার ছুট দিলাম ছেলেদের ওই পোড়া ঘরের দিকে। সেখানে গিয়ে গনগনে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে সেঁকতে লাগলাম শরীরকে। আমার শীত কাতুরে অবস্থা দেখে হাসতে লাগলো আমার শালার দল। হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেলো তাদের মাইকটা। ভাবটা যেন মাইকে গান না বাজলে শীত ধরে বেশী। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললো মাইকটা তারা, আর হিন্দী গানের সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়ে কোমর দুলিয়ে নাচতে লাগলো এ-এ-শব্দ করে।

বেশ খানিকক্ষণ আগুন পুইয়ে ভেজা-কাপড় চোপড় আর তেলের শিশি নিয়ে ফিরে গেলাম ঘরে। দেখলাম শাশুড়িমা সংক্রান্তির পিঠে তৈরী করার কাজে ব্যস্ত। আমি প্রণাম করলাম তাঁকে। তিনি 'আয়ুক লকথুন' (আয়ু লম্বা হোক) বলে ককবরকে আশীর্বাদ করলেন আমাকে। উপজাতিদের নিয়ম অনুযায়ী হাঙরাই-এর ভোরে স্নান সেরে গুরুজনদের প্রণাম করতে হয় ধূপ-ধুনো জ্বেলে। শ্বশুর মশায়কে পেলাম না, তিনি বোধহয় গুরুজনদের প্রণাম করতে বেরিয়ে গেছেন। গেলাম পাশের ঘরে দাদা শ্বশুর কামিনী দেববর্মার ঘরে। ঘরে ঢুকে দেখি দাদা (দাদা শ্বশুর) নেই, তিনিও বেরিয়ে গেছেন তাঁর গুরুজনদের প্রণাম করতে। নানা (দা কামিনীর স্ত্রী) অধিনী কড়াইতে ভাজা পিঠে করছেন। নানাকে প্রণাম করতেই আমাকে কড়াই থেকে একখানা তেলে ভাজা গোল পিঠে দিলেন তিনি। সংক্রান্তির ভোরে সকালে এই প্রথম পিঠে খেলাম, কি স্বাদ, বিন্নি চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী পিঠে সরষের তেল

দিয়ে ভাজা। আগে এই নানা (ককবরকভাষীরা ঠাকুরমা ও দিদিমাকে 'নানা' বলে ডাকে। এটা বোধহয় ইসলামী প্রভাব) সংক্রান্তির দিনে শূকরের তেল দিয়ে ভেজে আমাদের পিঠে খাওয়াতেন। এখন গরীব হয়ে গিয়ে শূকরের তেল দিয়ে তৈরী পিঠে আর খাওয়াতে পারেন না। যারা উপজাতি পরিবারের শূকরের তেলে ভাজা পিঠা খায়নি, তারা বিশ্বাস করবে না কী তার স্বাদ!

দা কামিনীর (কামিনী দার — ককবরক ভাষায় সম্বোধন-শব্দ বিশেষণ হিসেবে নামের আগে বসে) ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম মাস্টার মশায় যোগেন্দ্র দেববর্মার ঘরে। হেরমায় ডঃ সুহাস চ্যাটার্জীর সঙ্গে তাঁর ঘরেই প্রথম এসেছিলাম। তাঁর সঙ্গে ককবরক অভিধানের কাজ শেষ করেছি এখান থেকে ২৫ বছর আগে। যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার দু'দিকের আত্মীয়তা। এক, তিনি হলেন আমার আপন দিদি শাশুড়ির সাক্ষাৎ খুড়তুতো ভাই, এই গ্রামে জামাই উঠেছেন প্রয়াত গিরিমণি কপরার মেয়ে বিয়ে করে। দুই, তাঁর স্ত্রী চাঁদলক্ষ্মী দেবী, যাঁকে আমি মাসিমা বলে ডাকি, তিনি আমার শ্বশুর মশায়ের জ্যাঠতুতো দিদি। সেইদিক থেকে যোগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী আমার বৌয়ের পিসিমা এবং যোগেন্দ্রবাবু পিসেমশায়। কাজেই যোগেন্দ্রবাবু আমারও পিসশ্বশুর। ঘরে ঢুকে দেখি যোগেন্দ্রবাবু ও তাঁর স্ত্রী বসে আছেন। মাস্টার মশায় মাসিমাকে কবিরাজী ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছেন। আমি প্রণাম করলাম তাঁদের দু'জনকে। ইতিমধ্যে গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্নান সেরে দল বেঁধে প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে গুরুজনদের প্রণাম করতে বেরিয়ে পড়েছে। যোগেন্দ্রবাবুর ঘরে প্রথম ঢুকলেন তাঁর বড় পুত্রবধূ রমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্মার স্ত্রী ধুনুচি ও ধূপকাঠি হাতে নিয়ে। তিনি প্রণাম করলেন শ্বশুর-শাশুড়িকে। যোগেন্দ্রবাবুর বড় পুত্রবধূ সম্পর্কে আমার বৌদি। আমিও প্রণাম করলাম তাঁকে। বৌদি বেরিয়ে যেতেই ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে ঢুকে পড়লো যোগেন্দ্রবাবুর ঘরে। তারা প্রণাম করলো আমাকে।

প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির সকালে হেরমা গ্রামে অন্যান্য উপজাতি গ্রামের মতো হরিসংকীর্তনের দল বেরিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করে। তবে এখানে স্বরূপানন্দর শিষ্যরা বেশী হওয়ায় গ্রাম পরিক্রমার সময় 'হরিওম' গাইতে গাইতে গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। আজও গ্রামে হরি সংকীর্তনের দল বেরোনোর কথা। কিন্তু গ্রামটা ধর্মের দিক দিয়ে কিছুটা ভাগ হয়ে যাওয়ায় জটিলতা দেখা দিয়েছে। গ্রামের কিছু শিক্ষিত ছেলে খ্রীষ্টান হয়েছে। আমার এক খুড়শ্বশুর সুভাষ দেববর্মা ব্যাঙ্কের অফিসার খ্রীষ্টান। তিনি বি. এ. পাশ। আমার খুড়তুতো শালা টি.ভি. মেকানিক, নাম শান্তিকুমার, খ্রীষ্টান; আগরতলায় টি. ভি সেন্টারে চাকরি করে। আমার এক জেঠতুতো শালীর ছেলে কার্ত্তিক কুমার খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক। আমার এক জ্যেঠা শ্বশুর নরেন্দ্র দেববর্মার ছেলেরা খ্রীষ্টান, তারা সকলেই শিক্ষিত, কলেজে পড়ে বা চাকরি করে। এইসব শিক্ষিত ছেলের দেখাদেখি কিছু অশিক্ষিত কৃষক ছেলেও খ্রীষ্টান হয়েছে। আমার এক খুড়তুতো শালার মেয়ের রিকেট হয়েছিলো। মেয়েটি যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন তার পবিবারের সকলেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। আমার শালাকে বলা হয়েছিলো যে তার পরিবারের লোকেরা যদি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, তাহলে তার রিকেটগ্রস্ত মেয়েটি ভালো হয়ে যাবে। ধর্মপ্রচারকের কথা শুনে সে (উমেশ) সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টান হয়ে যায় মেয়েটাকে বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার ধর্মান্তরিত হবার ক'দিনের মধ্যেই মেয়েটি মারা যায় এবং তাকে খ্রীষ্টীয় প্রথায় কবর দেয়া হয়। এই প্রথম, আমাদের হেরমা গ্রামে হিন্দু ধর্মের বাইরে খ্রীষ্টীয় প্রথায় কবর দেয়া। হেরমা গ্রামের ৫০/৬০ পরিবারের মধ্যে ৬/৭ পরিবার আংশিকভাবে খ্রীষ্টান হয়ে গেছে। আংশিক এই জন্যে যে, বাবা হয়তো খ্রীষ্টান হয়নি, ছেলেরা খ্রীষ্টান হয়েছে। একই পরিবারে হিন্দু ও খ্রীষ্টান সহাবস্থান করছে। আমার এক ভায়রাভাই চিকন্দ্রী দেববর্মা। তিনি গোঁড়া হিন্দু এবং নামসংকীর্তন দলের পুরোধা। সুন্দর কীর্তন গান তিনি, খোলও বাজাতে পারেন। চমৎকার অচাই হিসেবে উপজাতীয় প্রথায় পুজো-পালি দেন তিনি গ্রামের প্রতিটি ঘরে। কবিরাজ

হিসেবেও তাঁর নাম। তাঁর শিক্ষিত ছেলে কার্ত্তিক কুমার খ্রীষ্টান হয়ে ধর্মপ্রচারকের কাজ করছে। এই খ্রীষ্টান হয়ে যাবার ব্যাপারটাকে গ্রামের বেশীরভাগ লোক ভালো চোখে দেখছে না। কিন্তু তারা আটকাতেও পারছে না। কারণ, শিক্ষিত ছেলেরা আয়রোজগার করে, তাদের ওপর সংসার নির্ভর করে, তাছাড়া খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ছেলেরা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক করে বেশ ভালোই। মাঝেমধ্যে খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা সভাও করে গ্রামের মধ্যে। আগরতলা থেকে খ্রীষ্টান ছেলে-মেয়েরা আসে কাঁধে গীটার ঝুলিয়ে। যুবতী মেয়েদের সাজ-গোজও অত্যাধুনিক। ককবরক ও বাংলায় প্রার্থনা সভায় গান করে তারা। প্রভু যীশুর ভজনা তারা এমন সুন্দরভাবে করে যে মানুষকে আকৃষ্ট না করে পারে না। যে পরিবারের শিক্ষিত ছেলেরা খ্রীষ্টান হয়েছে, তারা তাদের পরিবারকে নিয়ন্ত্রিত করে বলা যায়। তাই গ্রামে বিয়ে, শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য পূজা-পার্বণে ওঅসব পরিবারের লোক অংশগ্রহণ করে না বলা যায়। ইতিমধ্যে গ্রামে আমার শালা যে আগরতলা টি. ভি. সেন্টারে চাকরি করে, সে বিয়ে করলো আমাদের গ্রামের এক হিন্দু মেয়েকে। মেয়েটি সম্পর্কে আমার শালী। শালা শালীর ঠাকুরদাদারা আপন মামাতো পিসতুতো ভাই। এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে থাওয়া হয় না। প্রায় ওই একই সময়ে এক অঘটন ঘটলো। আমার বড়ো ভায়রা চিকন্দ্রী দেববর্মার খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক ছেলেটি তার মায়ের আপন খুড়তুতো পিসি অমিয়বালাকে বিয়ে করে বসলো । অমিয়বালা ছেলে (কার্ত্তিক কুমার) টির সম্পর্কে দিদিমা হয়। নাতি ও দিদিমার মধ্যে এই বিয়ে নিয়ে গ্রামের মধ্যে রীতিমতো গণ্ডগোল বেঁধে গেলো। অনেকে সমাজের নিয়ম বহির্ভূত বিয়ে আটকানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। অমিয়বালা বয়েসে কম হলেও সম্পর্কে আমার শাশুড়ি, আমার শ্বশুর মশায় গণেশ দেববর্মার আপন খুড়তুতো বোন ; কাজেই অমিয় বালা আমার পিসশাশুড়ি, আমি তাকে পি অমিয়বালা (অমিয়বালা পিসি) বলে ডাকি। ইস্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতেই তার সম্পর্কে নাতি কার্ত্তিক কুমারের সঙ্গে তার কীভাবে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রথমে সকলে মনে করেছিলো, নাতি-দিদিমার এই ঘনিষ্ঠতা নেহাত-ই রসিকতার। দিদিমা বাস্তবিকই সুন্দরী। ধর্মপ্রচারক নাতি শেষ পর্যন্ত প্রেমে পড়ে গেলো দিদিমার, দিদিমাও আপত্তি করলো না নাতির আহ্বান। এই ঘটনা ঘটে যাবার পর গ্রামে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হলো। আপন আত্মীয়রা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লো। অনেকে বলতে লাগলো, খ্রীষ্টধর্মে বাছ-বিচার নেই, এরা রক্তের সম্পর্ক মানে না। আপন রক্তের লোককেও বিয়ে করে। তবে, এই অভাবিত ঘটনার পর, গ্রামে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব আস্তে আস্তে কমতে থাকলো। দিদিমা-নাতির বিয়ের পরে হেরমা গ্রামে এখনো পর্যন্ত আর কেউ খ্রীষ্টান হয়নি।

এদিকে, গ্রামে খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব দেখে সনাতনপন্থীরা তাঁদের হরিনাম সংকীর্তন আরো জোরদার করে শুরু করেছেন। শিক্ষিত চাকরিজীবী ও গ্রামের কৃষকদের নিয়ে আমাদের হেরমা গ্রামে হরিনাম সংকীর্তন কমিটি তৈরী হয়েছে এবং তাঁরা সাধন-ভজন করে চলেছেন ঠিক মতোই। হেরমার হরিনাম সংকীর্তন কমিটির নামও ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। শ্রাদ্ধে হরিনাম সংকীর্তন করতে তাদের ডাক পড়ে অন্য গ্রাম থেকেও। আর এই হরিনাম সংকীর্তন কমিটির প্রধান পরিচালক হলেন আমার খুড় শ্বশুর বীরকুমার দেববর্মা। যিনি আগরতলার সেক্রেটারিয়েটে চাকরি করেন এবং গ্রাম থেকে রোজই আগরতলার অফিসে যাতায়াত করেন। পৌষ সংক্রান্তির দিন সকালে স্নান সেরে এসে কাকাশ্বশুর বীরকুমারবাবুকে প্রণাম করবার সময় জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা কাকা, 'আজ কি অন্য বছরের মতো সংকীর্তনের দল গ্রাম পরিক্রমায় বেরোবে ?' উনি বললেন, 'নিশ্চয়ই বেরোবে, এবার দক্ষিণ হেরমা পর্যন্ত সংকীর্তনের দল যাবে। তুমিও থাকো, তুমি তো প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির দিন এই গ্রাম পরিক্রমায় যোগ দাও, আজও থাকো।' দক্ষিণ হেরমা থেকে সংকীর্তনের দল হরিওম গাইতে গাইতে হেরমা বাজার দিয়ে যখন আমার দাদা শ্বশুর ব্রজকুমার মাস্টারের উঠোনে গেছে, তখন আমি তাদেরকে ধরে ফেললাম। সংকীর্তনের

দলে কম বয়েসের ছেলেমেয়েরাই বেশী। তারা আনন্দ করে লুট কুড়োচ্ছে কাড়াকাড়ি করে। আমার বড়ো শালা বিশ্বকুমারের বড়ো মেয়ে গৌরীও লুট কুড়োচ্ছে মহা আনন্দ করে। সে আমাকে দেখে বললো, 'পিয়া (পিসা), তুমি লুট কুড়িয়ে আমার ব্যাগে দিও।' আমি বাড়ি বাড়ি লুট কুড়িয়ে তার ব্যাগে রাখতে লাগলাম, কী খুশী সে! প্রতিটি ছেলে-মেয়ের হাতে একটা করে কাপড়ের ব্যাগ। সকলে লুটের বাতাসা, কদমা, কলা, কমলা লেবু কুড়িয়ে ব্যাগের মধ্যে রেখে দেয়। যেই না সংকীর্তনের দল এক এক বাড়ির উঠোনে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে সংকীর্তনের দলকে স্বাগত জানাচ্ছে। তারপর মোড়কে পোরা বাতাসা-কদমা আর কলা-লেবু একটা ছোটো ডালার ওপর রেখে কীর্তনের দলের মূল গায়কের হাতে তুলে দিচ্ছে। তিনি আবার তার থেকে কিছু অংশ অন্যপাত্রে রেখে বেশীর ভাগই উঁচু করে উঠোনের চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন ছেলে-মেয়েদের সামনে। তারা কাড়াকাড়ি করে লুট কুড়োতে থাকে পরমানন্দে। ব্রজকুমার মাস্টার প্রতি বছরের মতো এবারও পুরো এক ঝুড়ি কলা-বাতাসা, কদমা-লেবু লুট দিলেন। আগের থেকে প্রতিটি বাড়ির (খ্রীষ্টান বাড়িছাড়া) মেয়েরা উঠোনের মাঝখানে গোবর দিয়ে লেপে একটা জায়গা তৈরী করে রাখে। সংকীর্তনের দল এলে সেই লেপা জায়গায় ধূপ-ধুনো জ্বেলে দেয় এবং লুটের জিনিস সেখানে রেখে দেয়। সংকীর্তনের মূল কর্ণধার তখন সেখান থেকে লুটের দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে সমবেত ভক্তবৃন্দের চারদিকে ছড়িয়ে দিতে থাকেন।

হেরমার প্রতিটি বাড়ি গিয়ে সংকীর্তনের দল সব শেষে এসে পৌঁছলেন সংকীর্তন কমিটির মূল পরিচালক বীরকুমার দেববর্মার বাড়ি। সেখানেও আমার খুড় শাশুড়ি (বীরকুমারবাবুর স্ত্রী) লুটের কলা-বাতাসা ভোগ হিসেবে দিলেন প্রচুর পরিমাণে। আমি লুট কুড়িয়ে গৌরীর ব্যাগে পুরে দিলাম। দেখলাম, তার ছোট্ট ব্যাগ পূর্ণ হয়ে গেছে পৌষ সংক্রান্তির কলা-বাতাসায়। বেজায় খুশী সে। যাবার সময় বলে গেলো, পিয়া, আমি বাড়ি গেলাম। কী ফুটফুটে মেয়ে এই গৌরী। মাত্র ছ'বছরে পড়েছে, ধারিয়া থল স্কুলে যায় ভোরে উঠে। লেখাপড়ায় দারুণ আগ্রহ। সম্পর্কে ত্রিপুরা উপজাতি যুবসমিতির প্রেসিডেন্ট ও ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের বর্তমান Chief Executive Member হরিনাথ দেববর্মার নাতনী। হরিনাথবাবু আমার শালার সাক্ষাৎ মামা শ্বশুর। কাজেই আমারও মামা শ্বশুর তিনি।

সংকীর্তনের মূল দলকে কাকা বীরকুমার ও কাকী শাশুড়ি জ্যোৎস্নাদেবী সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বারান্দায় শীতলপাটি বিছিয়ে দেয়া হলো। আমরা সব বসলাম সেখানে। হিসেব করে দেখা গেলো, গ্রাম পরিক্রমায় বেরিয়ে নগদ ৩৬ টাকা পাওয়া গেছে, আর মদ পাওয়া গেছে দু'বোতল। আমার কাকী-শাশুড়ি জ্যোৎস্না দেববর্মা (বীরকুমারবাবুর স্ত্রী) ও এক বোতল মদ বের করে দিলেন। আমার পাশে বসেছিলেন সম্পর্কে আমার বড়ো ভায়রা মনমোহন দেববর্মা। আমি তাকে কুমুই (জামাইবাবু) মনমোহন বলে ডাকি। তিনি আমার বড়ো শালী কুচুঙতী (মনমোহনবাবুর স্ত্রী)কে এক বোতল মদ এনে দিতে বললেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে এক বোতল মদ এনে দিলেন তাঁর ঘর থেকে। আমরা দলে ছিলাম বারো-চৌদ্দ জনের মতো। সংকীর্তনের মূল গায়ক চিকন্দ্রী দেববর্মা ওই দিন গ্রাম পরিক্রমায় বেরোননি। তাঁকেও ডেকে আনা হলো। এরপর পানপাত্রে মদ পরিবেশন করা হলো সকলকে। ইতিমধ্যে আমার কাকী শাশুড়ি সংক্রান্তির পিঠে আর তার সঙ্গে তেতো শাক এনে দিলেন কলার পাতায় করে। মদ আর সংক্রান্তির পিঠে খাওয়া শুরু হলো একই সঙ্গে। কাকা বীরকুমার এই পান আসরে হেরমা গ্রামের সংকীর্তন দলের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন। তাঁর কথা হলো, সরকারী কর্মচারী দিয়ে হরি সংকীর্তন দলের পরিচালনা চলে না। কাজেই, এবার কৃষকদের মধ্য থেকে কেউ এই দায়িত্বভার গ্রহণ করুক। তাছাড়া, সারা রাত ধরে মাঝে-মধ্যে হরি সংকীর্তন করা নিয়ে বাস্তব কতকগুলো অসুবিধে দেখা দিয়েছে। শ্রাদ্ধ, লুট ও কীর্তন করতে গিয়ে রাত ভোর হয়ে যায়। কীর্তনীয়ারা পরের দিন আর কাজ

করতে যেতে পারে না, বাড়ির মেয়েরা রাগ করে। কারণ, কীর্তনীয়ারা প্রায়ই গরীব, পরের ক্ষেতে বা বাড়িতে মজুরি করতে যেতে হয়। একদিন কাজ বন্ধ হলে উপোস করে থাকা। কাজেই বীরকুমারবাবু প্রস্তাব করলেন, যার বাড়িতে সংকীর্তন হবে, তিনি কীর্তনের দলকে ২৫০ টাকার মতো দেবেন। ওই টাকা থেকে এক অংশ কীর্তন দলের ফাণ্ড হিসেবে রাখা হবে এবং বাকী অংশ গরীব কীর্তনীয়াদের দিয়ে দেয়া হবে, যাতে করে ঘরে ফিরে মেয়ে মানুষের গঞ্জনা সহ্য করতে না হয়, আর উপোসের হাত থেকে বাঁচা যায়। সকলেই কাকা বীরকুমারের এই প্রস্তাব সমর্থন করে তাঁর কাছে মদ চাইলেন। আমার কাকী শাশুড়িও তাঁর ভাণ্ডার থেকে আরেক বোতল মদ এনে আসরের মাঝখানে রেখে দিতেই সকলে উ-হু-হু করে আনন্দের ভাব প্রকাশ করলেন। আমার শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে কাকী শাশুড়ির রান্না ঘরে মেয়েদের এক দলও হাঙরাই-আউআঙ (সংক্রান্তির পিঠে) খেতে ব্যস্ত। তাঁরাও পানপত্র নিয়ে বসেছেন। কাকী- জ্যোৎস্না তাঁদেরকেও আপ্যায়ন করছেন রীতিমত সামাজিক কায়দায়। ইতিমধ্যে কাকীর রান্না ঘর থেকে কষা মাংসের গন্ধ এসে লাগছে প্রত্যেকের নাকে। ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন হবার জো, নাকে হাত দিচ্ছেন সকলে। আসলে কাকা বীরকুমার কাকীকে হাঁসের মাংস রান্না করতে বলেছেন সংকীর্তন দলের জন্যে। একটু বাদেই কাকী কলার পাতায় করে কষা মাংস এনে দিলেন প্রত্যেককে মদের চাট হিসেবে খাবার জন্যে। কাকী কষা মাংস দিতেই আবার কীর্তনের দল চেপে ধরলো কাকীকে মদ দেয়ার জন্যে। কাকীর ভাণ্ডার বোধ হয় অফুরন্ত, আরেক বোতল মদ এনে দিলেন হাসিমুখে। ঠিক এই সময়ে অনেকের কথা জড়িয়ে এসেছে। আমার এক শালা দীনেশ, স্কুল মাস্টার সে, তার কথা জড়িয়ে গেছে পুরোপুরি, বো বো করছে সে। সে-ই হরিসংকীর্তনের আর এক কর্ণধার। সংকীর্তন দলের আসর যখন ভাঙলো তখন বেলা প্রায় আড়াইটে। আমার কাকী শাশুড়ি আরেকটু থেকে যেতে বললেন, আমাকে হাঁসের মাংস দেবেন বলে। আমার স্ত্রী ফুলকুমারীর বাত, হাঁসের মাংস নাকি বাতের পক্ষে ভালো। রান্নার পর এক বাটি হাঁসের মাংস নিয়ে বাড়ি ফিরে স্বামী-স্ত্রীতে খেতে বসলাম রান্নাঘরে। খেতে খেতে সন্ধ্যে হয়ে গেলো, তাই রাতে আর ভাত না খেয়ে শুয়ে পড়লাম। উঠলাম ভোর ছ'টায়।

১৫ই জানুয়ারী ১৯৯৫। ভোরে উঠেই দেখি গৌরী পায়খানা করছে ঘরের সামনেই একটা মাত্র জামা গায়ে দিয়ে এই কনকনে ঠান্ডায়। তার চোখ-মুখ দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। চোখে মুখে বিষণ্নতার ছাপ, চোখ দুটো যেন একেবারে বসে গেছে। আমি নদীর ধারে গিয়ে পায়খানা সেরে এসে বড়ো শালা (গৌরীর বাবা) কে বললাম গৌরীর কী হয়েছে? উত্তরে সে বললো, "গৌরী রাতের বেলায় বার কয়েক পায়খানা গেছে তার সঙ্গে বমিও করেছে।" আমি তাকে যোগেন্দ্র মাস্টারের কাছ থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ এনে খেতে দিতে বলতেই সে বললো "যোগেন্দ্র বাবুর নাতি সেনাপতির কাছ থেকে ট্যাবলেট এনে খাইয়ে দিয়েছি, সে এখন একটু ঘুমুচ্ছে।" গৌরীর জন্যে তবু আমার উদ্বেগ গেলো না, তার চোখ-মুখের অবস্থা আমার ভালো ঠেকেনি। যা হোক, ভাবলাম যখন ঘুমুচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই একটু ভালো। আমি একটু গেলাম হেরমার পুর্বদিকে বাঁশতলী গ্রামে আমার ভায়রা ভাই কৃষ্ণকান্তর সঙ্গে দেখা করতে। সংক্রান্তির দিন তাকে হেরমায় পাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু সে আসেনি। ভায়রাভাই ও শালী ভারতীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে যেইমাত্র হেরমা বাজারে এসে বসেছি, দেখি আমার স্ত্রী ছুটে আসছেন আমার দিকে। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার, তুমি ছুটে এলে যে?' "শোনো, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো, গৌরী কেমন করছে তাকে এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।' "তুমি বাড়ি যাও, আমি কৃষ্ণকান্তকে এক দৌড়ে ডেকে নিয়ে আসি।"

আমি বাজার থেকে ছুটে বাড়ি গিয়ে দেখি গৌরীকে কোলে করে বসে আছে তার বাবা। তার চোখ-মুখের অবস্থা মোটেই ভালো না, মাঝে মাঝে ওক ওক করে গলা টানছে। এদিকে আমার ছোটো শালা

বিমল গেছে চড়িলামে ডাক্তার আনতে। চৌমুহনী থেকে ডাক্তার এলেন। সেনাপতির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হলো। ঠিক হলো গৌরীকে এক্ষুণি বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। গৌরীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার তোড়জোড় শুরু হলো। আমি মাথায় এক খামছা তেল দিয়ে ছুটে গেলাম আঁদি নদীতে স্নান করতে। স্নান সেরে পড়ি-কি-মরি করে ফিরে এলাম বাড়ি। জামা-কাপড় পরে রান্নাঘরে ঢুকে এক মুঠো মুখে দিয়ে নিলাম। এর মধ্যে কৃষ্ণকান্তকে নিয়ে আমার স্ত্রী ফিরে এসেছে। আমরা গৌরীকে নিয়ে চড়িলামের দিকে রওনা দিলাম। দেখলাম, সমস্ত বাড়িটা থমথম করছে। গৌরীকে নিয়ে যেতে দেখেই আমাব ছোটো মেয়ে দেবযানী কাঁদতে লাগলো দূরে দাঁড়িয়ে। দক্ষিণ চড়িলাম চৌমুহনীতে পৌঁছয়েই একখানা রিক্সা পেয়ে গেলাম। ওই রিক্সায় গৌরীকে নিয়ে তার বাবা বিশ্বকুমার উঠলো, সেনাপতিব সাইকেল ছিলো, সে-ও গেলো রিক্সার পেছনে পেছনে। আমি বলেদিলাম, 'আমারা (কৃষ্ণকান্ত ও আমি) হেঁটে আসছি তোমরা চড়িলাম থেকে বাসে একেবারে চলে যাও বিশালগড় হাসপাতালে, সেখানে গিয়ে আগে রোগীকে ভর্তি করে দাও।' তারা চলে যেতেই আমরা দু'জনে হেঁটে চড়িলামে এসে বাসে করে চলে গেলাম বিশালগড় হাসপাতালে। গিয়ে দেখি গৌরীকে ডাঃ পি.কে. দেবের আন্ডারে ভর্তি করা হয়েছে, তখনো কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। আমি সেনাপতিকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে যেতেই তিনি বললেন, 'এক্ষুণি সেলাইন দেয়া হবে, গৌরীর আন্ত্রিক হয়েছে।' একটু পরে নার্স এসে সেলাইন দিলেন এবং একটা ইনজেকশান করলেন। কিন্তু আমাদেব দুর্ভাগ্য, সামান্য একটু সেলাইন টেনে আর টানতে পাবলো না গৌরী। তার সেলাইন দেয়ার জায়গায় রক্ত জমাট বেধে ফুলে উঠছে। আমি সেনাপতিকে নিয়ে আবার ছুটে গেলাম ডাক্তার বাবুর কাছে। ডাক্তার বাবু এসে গৌবীকে দেখলেন। নার্স তখন পুনরায় সেলাইন দেয়ার চেষ্টা করছিলেন। ডাক্তারবাবু গৌরীকে একটা ইনজেকশন দিতে বলে চলে গেলেন. কিন্তু তিনি নিজে সেলাইন দেয়ার কোনো চেষ্টা করলেন না। ইনজেকশান দিতেই গৌরীব সারা শরীর কাঁপতে লাগলো থব থব করে, মনে হলো প্রচন্ড জ্বর হয়েছে তার। এর মধ্যে ককববক ভাষায় বললো— 'বাবু খিকা' (বাবা হেগেছি)। জ্বরের মধ্যে প্রলাপ বকতে লাগলো সে। একবার গলা টানলো, বেরিয়ে এলো কালো রক্তের মতো কি যেন। নার্স আমাকে বললেন, "তাড়াতাড়ি গিয়ে ডাক্তার বাবুকে একটু ডেকে নিয়ে আসুন।" আমি ডাক্তার বাবুকে গৌরীর অবস্থা বলতেই তিনি কেমন যেন বিরক্ত হলেন। বললেন— এই ওষুধটা এনে খাইয়ে দিন। ছুটে গেলাম ওষুধের দোকানে কিন্তু ওই ওষুধ নেই। আবার ছুটে গেলাম ডাক্তার বাবুর কাছে। তিনি বিকল্প একটা ওষুধ লিখে দিলেন। খাইয়ে দিলাম সেই ওষুধ গৌরীকে। কিন্তু গৌরীর অবস্থা খারাপের দিকেই যেতে থাকলো, মনে হলো এক্ষুণি সে একটা অঘটন ঘটাবে। আমি আবার ছুটে গেলাম ডাক্তার বাবুর কাছে। এবার ডাঃ দেব সত্যিই বিরক্ত হলেন আমার ওপর। বললেন, "আপনারা যদি এতই ভয় পান, তাহলে নিয়ে যান ভি.এম. হাসপাতালে। আমি হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সে করে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।" হাসপাতাল থেকে রিলিজ অর্ডার বার করতে করতে গৌরীর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেলো। অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়ালো গৌরীকে আগরতলায় নিয়ে যাবাব জন্যে। আমাব ভায়রাভাই কৃষ্ণকান্ত হেরমায় ফিরে গেলো আমার শাশুড়ী ও অন্যান্যদের খবর দিতে। সেখান থেকে তারা আগরতলার ভি.এম. হাসপাতালে যাবে।

অ্যাম্বুলেনস্ ছেড়ে দিলো গৌরীকে নিয়ে। পাশে তার বাবা ও কাকা বিমলের কোলে শুয়ে সে। পাশে সেনাপতি ও আমি। আমি মাঝে মধ্যে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। গৌরীর বাবা ও কাকা অঝোরে কাঁদছে, আমি সান্ত্বনা দিয়ে চলেছি তাদেরকে। অ্যাম্বুলেনস্ যখন সেকেরকোট পেরিয়েছে, তখন আমার শালা চিৎকার করে বললো—দ্যাখো দ্যাখো গৌরীর চোখ দুটো যেন উল্টে যাচ্ছে।'

আমি বললাম, "এই তো আরেকটু পরে আগরতলায় পৌঁছে যাচ্ছি ।" "না, কুমুই (জামাইবাবু) তার জিভ এঁটে আসছে, একটু জল দেও আমার গৌরীর মুখে" আমার চোখে জল এলো । এ্যাম্‌বুলেন্‌সের ড্রাইভার গৌরীকে জল দিতে বারন করলেন । কিন্তু গৌরীর বাবার কেমন যেন মনে হলো । সে বললো, 'তুমি একটু জল দেও, কুমুই' আমার গৌরীকে খাওয়াই ।" বাবা তার মুমূর্ষু মেয়েকে একটু জল খাওয়াবে। আমি বারণ করে আর কী করবো । ফ্লাসক্ থেকে একটু জল সে আঙুলে নিয়ে তার জিভের ওপর দিতেই গৌরী একবার যেন তাকিয়ে দেখলো আমাদেরকে । তারপর চোখ-বুঝলো । মনে হলো তার যেন একটু ভালো লাগছে । কিন্তু আগরতলায় বটতলাতে পৌঁছতেই তার সারা শরীরটা যেন দুলে উঠলো । আমার শালা কেঁদে উঠলো চিৎকার করে । ভি.এম এর ইমারজেন্‌সিতে নিয়ে যেতেই ডাক্তাররা বললেন তাকে ছুটে নিয়ে যেতে ডাইরিয়া ওয়ার্ডে । আমাকে বললেন, "আপনি থাকুন, এ্যাডমিশান কার্ডটা নিয়ে যাবেন ।" তাড়াতাড়ি কার্ডটা হাতে দিয়ে আমাকে বললেন, 'ছুটে যান ডাইরিয়া ওয়ার্ডে, আপনাদের রোগীর অবস্থা ভালো নয় । আমি ছুটে গিয়ে ডাইরিয়া ওয়ার্ডের বারান্দায় উঠতেই সেনাপতি ককবরকে বললো—গৌরী রাকছাউই ফাইকা ফুন (গৌরীর শারীর শক্ত হয়ে গেছে বলে ডাক্তার বলেছে) আমি ওয়ার্ডে ঢুকতেই দেখি গৌরীর বাবা ও কাকা গৌরীকে ধরে চিৎকার করে কাঁদছে । আমি তখনো বুঝতে পারিনি গৌরী আমাদের ছেড়ে চলে গেছে । ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতেই বললেন— "She has already expired । আমাদের আর কিছুই করার নেই, আপনারা যদি আধঘন্টা আগেও আনতে পারতেন তাহলে আমরা শেষ চেষ্টা করে দেখতাম ।"

আমি গৌরীর মৃতদেহের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাত দিলাম । দেখলাম, তার কপাল তখনও গরম । কেবল জিভটা কামড়ে ধরে রয়েছে । আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম—'একি হলো, গৌরী আমাদের ছেড়ে চলে গেলো ?' গৌরীর বাবা আর তার ছোটো কাকা বিমল আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে । গৌরী তার বাবা-মার প্রথম সন্তান । বিয়ের বেশ ক'বছর পরে হয়েছে সে প্রাণের ধন একেবারে । সে-ই চলে গেলো এতটুকু সময়ের মধ্যে । আমি সান্ত্বনা দিতে লাগলাম গৌরীর বাবাকে। তখনো সে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আছে । আমি বললাম, 'যা হবার হয়েছে, এখন বাড়ি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে, বেলা পড়ে আসছে ।'

আমার কথায় সে যেন সম্বিত ফিরে পেলো। বললো, "তুমি আগে যাও, মামা-মামীকে খবর দেও" । মামা-মামী মানে এডিসির Chief Executive Member হরিনাথ দেববর্মা ও তাঁর স্ত্রী কৃপারানী । আমি বললাম, "তোমাকে কিছু ভাবতে হবেনা, আমি সব কোরবো, তোমরা শুধু ধৈর্য ধরে থাকো ।"

ডাইরিয়া ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে সেনাপতিকে বললাম, "তুমি মুক্তি (আমার ছেলে, তার ভালো নাম সুবঞ্জন)'র কাছে চলে যাও, তাকে সব বলো, তাকে নিয়ে এখানে চলে এসো, আর হ্যাঁ, তাকে বলো দিলীপ বাবু (আমার বাসাব মালিক)'র কাছ থেকে ৩০০ টাকা আনতে, একটা গাড়ি রিজার্ভ করে গৌরীকে তো নিয়ে যেতে হবে ।"

সেনাপতি চলে যেতেই আমি হেঁটে গেলাম মেলার মাঠে হরিনাথ বাবুর কোয়ার্টারে। গিয়ে দেখি তাঁরা নিজেদের গ্রাম সুতারমোড়ায় যাবেন বলে গাড়ির জন্যে স্বামী-স্ত্রীতে অপেক্ষা করছেন । আমি তাঁদেরকে দুঃসংবাদটা দিতেই তাঁরা মর্মাহত হলেন । আমি চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাঁদের নাতনী গৌরীর মৃত্যুর কথা বললাম । মামী কৃপারানী সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হলেন আমার সঙ্গে হাসপাতালে যাবার জন্যে । মামা হরিনাথ বাড়ির একজন পুলিশকে পাঠিয়ে দিলেন বটতলা থেকে একখানা গাড়ি ভাড়া করে আনার জন্যে । কিছুক্ষণের মধ্যে একখানা জীপ এসে দাঁড়ালো হরিনাথ বাবুর কোয়ার্টরের

সামনে। গাড়ি আসতেই মামীকে নিয়ে ডাইরিয়া ওয়ার্ডে গেলাম। মামীকে দেখে গৌরীর বাবা ডুকরে কেঁদে উঠলো। মামীও কাঁদতে লাগলেন গৌরীকে ধরে।

গৌরী মাঝে-মধ্যে তার মায়ের সঙ্গে তাব দাদামশায় ও দিদিমার কাছে আসতো। মামী তাকে পছন্দ করতেন তার ফুটফুটে চেহারা আর বুদ্ধির জন্যে।

আমি ডাক্তারের কাছে মামী কৃপারানীকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলাম ADC'র Chief Executive Member এর স্ত্রী হিসেবে। মামী ডাক্তারকে গৌরীর Death Certificate দিতে বললেন। ডাক্তার বললেন, 'Death Certificate দেয়া একটু অসুবিধে আছে। কারণ ওয়ার্ডে ভর্তি করবার আগেই রোগী মারা গেছে। কাজেই Death Certificate দিতে হলে, রোগীকে পোস্টমর্টেম করতে হবে।' পোস্ট মর্টেমে আমার শালা অর্থাৎ গৌরীর বাবা রাজী হলো না। তার কথা— "গৌরীকে আমি কাঁটা-ছেঁড়া করতে দেবো না। Death Certificate নেয়ার দরকার নেই, আমরা এমনিতেই গৌরীকে নিয়ে যাবো।"

ওয়ার্ডের ডাক্তার ইতিমধ্যে ইমারজেন্সির ডাক্তারকে ডেকে এনে কি যেন পরামর্শ করলেন। তারপব একখানা সাদা কাগজে সই করে লিখে দিলেন। তাতে লেখা আছে ঃ

Certificate of Death
Name of the deceased - Gouri Debbarma - 8yrs.- H/F -ch
Address - C/o Biswa Kumar Debbarma
Herma. Ramnagar. Charilam
D.O A - 15 1.95 at 2-15 PM.
Date of Expiry - 2.45 PM. on 15.1.95
Disease - A.G.E.C shock came of death - C.R.F.

গৌরীর ডেথ সার্টিফিকেটের Receipt Copy তে আমি সই করে দিলাম Kumud Kundu Choudhury। তারপর ডাক্তার গৌরীর ডেথ সার্টিফিকেট তুলে দিলেন আমার হাতে। গৌরীর মৃতদেহ নিয়ে জীপ গাড়িতে উঠলাম আমরা। গৌরীকে কোলে নিয়ে বসলো তার বাবা আর কাকা, পাশে সেনাপতি। মামী ও আমি বসলাম জীপের সামনে। গৌরীর ডেথ সার্টিফিকেট নিতেই সেনাপতির সঙ্গে আমার ছেলে মুক্তি(সুরঞ্জন) এসে হাজির হলো। গৌরীর পাশে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকলো সে। বড্ড ভালো বাসতো সে গৌরীকে। দিলীপ বাবুর দেয়া ৩০০ টাকা দিয়ে দিলো সে আমাকে। জীপ ছাড়তেই গৌরীর বাবা বললো তাকে, 'বটতলা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, সেখানে বাড়ি থেকে লোক এলেই হেরমায় পাঠিয়ে দিস।' তার মামার কথা শুনে মুক্তি চলে গেলো বটতলায়।

গৌরীকে নিয়ে জীপ এসে দাঁড়ালো মেলারমাঠে হরিনাথ বাবুর কোয়ার্টারের সামনে। গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। গৌরীকে দেখে,তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আমার শালা তার মামা শ্বশুরকে দেখে আবার কেঁদে উঠলো ফুঁপিয়ে। মামী আমার হাতে জীপভাড়া ৩০০ টাকা আর গৌরীর জন্যে নতুন জামাকাপড় কেনার জন্যে ১০০ টাকা দিয়ে দিলেন। এবার জীপ ছেড়ে দিলো হেরমার দিকে গৌরীর মৃতদেহ নিয়ে।

জীপের সামনে আমি। ভেতরে গৌরীর শক্ত সটান নিথর দেহটাকে দু'ভাইয়ে ভাগ করে নিয়ে বসে আছে, গৌরীর মাথা তার বাবার কোলে, আর পা দু'খানা তার কাকা বিমলের কোলে; সেনাপতি তাদের পাশেই রয়েছে বসে বিমর্ষভাবে। সেনাপতির ভালো নাম বিপ্লব, স্কুল ফাইনাল পাশ করা যুবক; কিছুদিন আগে সরকারীভাবে ফার্মাসিস্ট হিসেবে যোগ দিয়েছে। সেই প্রথমে ওষুধ দিয়েছিলো গৌরীকে, তারপর পরামর্শ দেয় বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে। ভেবেছিলো, বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে

গিয়ে পাশকরা ডাক্তারের হাতে ফেললে গৌরী ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু ডাঃ পি.কে. দেবেব সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব তার ভালো লাগেনি। সে একবার ককবরকে আমাকে বললো— মোয়া, ম'হাই ডাক্তার নুগয়াখু (মেসো এমন ধরনের ডাক্তাব আর দেখিনি)। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও গৌরীর এই মর্মন্তুদ মৃত্যু ভালো লাগেনি তার। একটা অপরাধ বোধ নিয়ে সে তাকিয়ে ছিলো গৌরীব নিথর মুখখানার দিকে।

জীপ বটতলা পেরিয়ে চড়িলামের দিকে রওনা দিতেই গৌরীর কথা মনে পড়লো আমার। এই সেই গৌরী, যাকে নিয়ে আমি পৌষ সংক্রান্তিতে গতকাল প্রায় সারাদিন গ্রাম পরিক্রমা করেছি। লুটের কলা-বাতাসা কুড়িয়ে তার ব্যাগ ভর্তি করে দিয়েছি, আজ আর তার মৃতদেহ নিয়ে তার বাবা-কাকার সঙ্গে যেতে হচ্ছে আমার। তার সেই শিশু কন্ঠের একটা কথা বারবার কাঁটার মতো বিঁধছে আমাকে- – পিয়া, লুট খচাউই আনি ব্যাগ' দাইরুদি, দো (পিসা, লুট কুড়িয়ে আমার ব্যাগে ভরে দিয়ো, কেমন)। মনে পড়ছে গোলাপফুলের রঙের মতো তার মুখখানা। আব লুট কুড়িয়ে কাকা বীরকুমারের বাড়ি থেকে যাবার সময় সে আমাকে শেষ কথা বলে গেলো—পিয়া, আঙ থাঙকা দো (পিসা, আমি গেলাম, কেমন)। সত্যিই সে চলে গেলো আমার সঙ্গে শেষ কথা বলে। তাব সেই শেষ কথা হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে লাগলো বারবাব—পিয়া, আঙ থাঙকা দো।

গৌরীকে হৃদয় দিয়ে ভালো বাসতাম আমি। তাব জন্মও হয়েছিলো প্রায় আমাব হাতে। গৌবীব শবদেহ নিয়ে জীপ চলেছে হুহু করে, আর কতো কথাই না স্মৃতিতে উঁকি মারতে লাগলো বেদনাবিধুর ভাবে। গৌরীর বাবা বিশ্বকুমাব আমার বড়ো শালা, বি.এস.এফ-এ চাকরি করে। তখন বদলি হয়ে আগরতলার শালবাগানে এসেছে সে। আগবতলায় আমাদের কৃষ্ণনগব বাসার কাছে কদমতলায় অনিল দেববর্মার বাসায় বৌকে নিয়ে বাসা বেঁধেছে সে। বৌও খুশী দীর্ঘদিন পরে স্বামী-স্ত্রীতে থাকছে। কিন্তু তাদের অখুশির একটা ব্যাপার ছিলো, বিয়ের ছ'সাত বছব পবেও তাদের ছেলে-পিলে হচ্ছেনা। ওরা স্বামী-স্ত্রীতে বাসা বাঁধার পর আমবা স্বামী-স্ত্রীতে ভি.এম. হাসপাতলে নিয়ে গিয়ে দেখালাম শালার বৌকে। শালার সিমেনও পরীক্ষা করলো ডাক্তাবরা। আমার শালার বৌ ও শালা দু'জনকেই চিকিৎসা করলো গাইনোকোলোজিব ডাক্তাবেবা কিছুদিন ধরে। আমার বেশ মনে আছে, এক লেডী ডাক্তার আমার শালাকে বলেছিলেন ধূমপান কম করে করতে। চিকিৎসার বছর খানিক মাথায় ফল ফললো, অন্তঃসত্ত্বা হলো আমার শালার বৌ। সে কী আনন্দ! খবর পেয়ে আমার শাশুড়ীব আনন্দ আর ধরে না। তিনি যে কতো মানত করেছিলেন, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। হেরমা থেকে ক'দিন তিনিও এসে থেকে গেলেন শালার বাসায়। একদিন আমরা স্বামী-স্ত্রীতে সন্তান সম্ভবা শালার বৌকে ভি.এম. প্রসূতি বিভাগে নিয়ে গিয়ে কার্ড করেছিলাম। তারপর থেকে গৌরী না হওয়া পর্যন্ত তারিখ অনুসারে সে যেতো শালাকে নিয়ে। ডেট অনুযায়ী প্রসব বেদনা হতেই নিয়ে গেলাম ভি.এম. হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে। সেখানে আমার জানাশুনা নার্স শচীদিকে পেলাম। শচীদি তখন থাকতেন এ্যাডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়ি। সেখানেই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। শচীদিকে পেতেই আমার মনোবল বেড়ে গেলো। বললেন—"কিচ্ছু ভাববেন না, কুন্ডু বাবু, আমি আছি, ভালোয় ভালোয় সব হয়ে যাবে। তবে, রাতের বেলায় আপনারা থাকবেন, আমার মনে হয় স্বাভাবিক ভাবেই ডেলিভারি হয়ে যাবে।" শালার বৌ বীণাকে ভর্তি করেছিলাম বিকেলের দিকে। শচীদির কথা অনুযায়ী আমরা নিচের চত্বরে বসে রইলাম সারা রাত। আমার শালা মাঝেমধ্যে গিয়ে খবর নিয়ে আসছিলো, প্রসব বেদনা কমছে-বাড়ছে, এইভাবে চলছে। ভোর হতেই আমি নিজে গেলাম ওপরে। শচীদের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন, "কুন্ডু বাবু, বোধ হয় সিজার করতে হবে, ব্যাথাটা খুব একটা বাড়ছেনা।"

শচীদির কথা শুনে বললাম আমি, "নর্মাল ডেলিভারি হলেই ভালো হতো, তবে যা করলে ভালো হয়, তাই করবেন আপনারা।"

আমার স্ত্রী রাতের বেলায় বাসায় গিয়েছিলেন। তিনি সকাল আটটা নাগাদ এলেন হাসপাতালে। তিনি আসতেই তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম শচীদির কাছে হালফিল খবর জানতে। আধ ঘন্টার মতো ওপরে থেকে তিনি ফিরে এসে বললেন, 'শচীদি বলেছেন সিজার করতে হবে।'

সিজারেব কথা শুনে আমার শালার মনটা গেলো খাবাপ হয়ে। পেট কেটে সন্তান বের করা! সে ইতস্তত করতে লাগলো যেন। আমি বললাম, "চলো, ওপরে যাই, শচীদির সঙ্গে ভালো করে কথা বলা যাক, তারপর সিদ্ধান্ত কবা যাবে একটা।"

ওপরে উঠতেই শচীদি বললেন, "আমিই নিচে যাচ্ছিলাম আপনাদের খুঁজতে, শুনুন, সিজারই করতে হবে, একটু বেশি বয়েসে ছিলেপিলে হচ্ছে তো আপনার শালার বৌয়ের, চিন্তা কি, এখন তো হামেশাই সিজাব করা হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনার শালা আছে তো ?' তারপর আমাব শালার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি এখানে থাকুন, আমি ডাক্তোববাবুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করে আসি।" বলেই তিনি ঢুকলেন ডেলিভারি রুমে।

আমরা বাইরেব বারান্দায় অপেক্ষা কবতে থাকলাম উদ্বেগেব সঙ্গে। কি জানি কি হয়! একটু পরে শচীদি এসে আমাব শালাকে বললেন, "চলুন আমার সঙ্গে, ডাক্তাব বাবু বলেছেন, সিজাব কবার আগে স্বামী হিসেবে আপনাকে সই কবতে হবে।"

শালা বিশ্বকুমার শচীদিব সঙ্গে গিয়ে সিজার কবাব সম্মতি পত্রে সই দিয়ে ফিরে এলো। তখন সকাল দশটা। আমবা অপেক্ষা কবছি বাইবে, চোখে-মুখে চিন্তাব ছাপ আমাদের। সিজাব সম্পর্কে আমারও তেমন কোনো ধারণা নেই। পেট কেটে সন্তান বেব করা বিপদই তো বটে। শালাকে বললাম আমি, 'গৌরচাঁন ঠাকুরকে ডাকো, তিনিই সব বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। গৌরচাঁন ঠাকুর আমার দাদা শ্বশুর, শ্বশুর মশায়ের পিতৃদেব। বেশ ক'বছব হলো তিনি প্রয়াত হয়েছেন। ঋষিতুল্য লোক ছিলেন তিনি। বিপদে পড়লেই আমরা তাঁব কথা স্মরণ করি বিপদ থেকে উদ্ধার হবার জন্যে। দেখলাম, আমাব স্ত্রী বেশ নার্ভাস হয়ে গেছেন। তিনি ককবরক ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন আমাকে--তাম' উঙনাই ?(কী হবে ?)। আমি বললাম, "সব ঠিক হয়েযাবে, অতো ভেবোনা। কতো বড়ো বড়ো ডাক্তার আছেন এখানে, তাছাড়া শচীদি রয়েছেন, ভালোয় ভালোয় হয়ে যাবে সব।"

প্রায় ঘন্টাখানিক পর, প্রায় এগারোটা নাগাদ আমাদের সব চিন্তা নিবসন করে দিয়ে শচীদি এসে আমাকে জোরে ডেকে বললেন, "কুন্ডু বাবু, আপনাব শালার মেয়ে হয়েছে।" তারপব আমার শালার দিকে তাকিয়ে বললেন কি, "মেয়ের বাপ হলেন তো এখন, গ্যাছে তো সব চিন্তা ? একটু অপেক্ষা করুন আমি এনে দ্যাখাবো ফুটফুটে বাচ্চাটাকে, মেয়ের মা ভালো আছে। কোনো চিন্তা নেই।" সত্যিই আমরা খুশী। আমার স্ত্রী ফুলকুমারীর আনন্দতো আর ধরেনা। বিয়ের কতো বছর পর ভাইয়েব একটা বাচ্চা হলো। আমাকে বললেন তিনি, "হেরমায় একটা খবর পাঠিয়ে দাও, বাড়িতে চিন্তার মধ্যে আছে সকলে।"

একটু বাদে একটা হলুদ রঙের তোয়ালেতে জড়িয়ে শচীদি নিয়ে এলেন দোলাতে দোলাতে আমার শালার মেয়েকে। সদ্যোজাত গৌরীকে দেখে অবাক হলাম আমরা। যেমন রঙ, তেমনি হৃষ্টপুষ্ট। গৌরী নামটা তখনই দিয়েদিলাম আমি তাকে। মেয়েকে দেখে আমার শালার চোখে-মুখে কেমন যেন লজ্জালজ্জা ভাব। আমি তাকে হাসতে হাসতে বললাম, "এই যে মেয়ের বাপ, যাও এখন কিছু সন্দেশ নিয়ে এসো মিস্টি মুখ করার জন্যে।"

আমার কথা শুনে পাশের প্যারাডাইস চৌমুহনী থেকে পঞ্চাশ টাকার সন্দেশ নিয়ে এলো সে। আমি শচীদিকে ডেকে সন্দেশের প্যাকেটটা তুলে দিলাম তাঁর হাতে। তিনি তা থেকে আমাদের হাতে করে সন্দেশ দিয়ে বাকিটা নিয়ে গেলেন ভেতরে সবাইকে দেয়ার জন্যে। কিন্তু একদিন বাদেই সদ্যোজাত গৌরী আমাদের চিন্তায় ফেলে দিলো সাংঘাতিকভাবে, তার জন্ডিস হয়েছে। শচীদিকেও বেশ উদ্বিগ্ন দেখলাম, আমার স্ত্রী ও শালার হাত-পা সেধিয়ে গেলো গভীব আশঙ্কায়। গৌরীকে নিয়ে যাওয়া হলো ইনটেনসিভ কেয়ারের মতো আলাদা একটা ঘরে, আমরা কেউ যেতে পারছিলাম না সেখানে; শুধু ডাক্তারের কথামতো ওষুধ এনে দিচ্ছিলাম বাইরে থেকে। আমাদের সকলকে উদ্বেগ থেকে উদ্ধার করলো গৌরী প্রায় সাতদিন পরে। আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকলো সে।

দশ কি বারো দিনের মাথায় গৌরী আগরতলার বাসায় গেলো মায়ের কোল আলো করে। আমার শাশুড়ী অর্থাৎ গৌরীরর ঠাকুরমাও এসে গিয়েছিলেন সেখানে আগের থেকে নাতনীকে দেখার জন্যে। গৌরী বাসায় ফিরলে তিনি গৌরী ও তাব মাকে অশৌচান্ত করলেন ট্রাইবাল আচরণ-রীতিতে। ছোটখাটো ভোজও হলো তখন। সেদিন কী না আনন্দ উপভোগ করলাম আমরা। আমার তিন শালার ঘরে গৌরীই প্রথম এলো নতুন প্রজন্মের সদস্য হিসেবে।

মাস খানেক বাদে গৌরী গেলো হেরমায় নিজের বাড়িতে তার প্রপিতামহ গৌরচান ঠাকুরের ভিটেয়, আমার শালাও বাসা তুলে দিলো আগরতলার। যাবার আগে আমার একান্ত পরিচিত শিশুচিকিৎসক ডাঃ সুজিৎ দের কাছে একদিন নিয়ে গেলাম গৌরীকে। গৌরীকে ট্রিপল এন্টিজেন, পোলিও ইত্যাদি দেয়ার পরামর্শ দিলেন তিনি। তাঁর পবামর্শক্রমে মাঝে মধ্যে গৌরীকে নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে হেরমা থেকে আমি আসতাম ডাঃ দের কাছে। ট্রিপল এন্টিজেন ও পোলিও দেঁয়া শেষ হবার পরেও অনেকবার নিয়ে এসেছি গৌরীকে ডাক্তার দে'র কাছে, একদিনও তিনি ফিস নেননি গৌরীর জন্যে। শুধু তাই নয়, আমি কোনো ট্রাইবাল পেশেন্ট নিয়ে গেলে কোনো দিন ফিস নেন না ডাঃ দে, সত্যিই মহানুভব তিনি।

দেখতে দেখতে বড়ো হলো গৌরী। তার পিঠে একভাই অমিত কুমার ও বোন সৌরি। চার বছরের মাথায় আমার শালা ধারিয়াথল স্কুলে ভর্তিকরে দিলো তাকে। দু'বছর ধরে পড়ছে সে এই স্কুলে। খুব চালাক-চতুর, পটাপট উত্তর দিতে পারে সে মাস্টার মশায়কে অবাক করে দিয়ে। মাঝে মধ্যে আগরতলায় আসতো সে তার মায়ের সঙ্গে আমাদের বাসায়। আমাদের বাসা থেকে বেড়াতে যেতো তার মায়ের মামা দাদামশায় হরিনাথ দেববর্মার কোয়ার্টারে। দিদিমা কৃপারানী খুব আদর করতেন তাকে। একদিন হেরমায় গিয়েছি আমি। সকালবেলায় ইংরিজি শিখাচ্ছি তাকে। হঠাৎ সে ককবরকে বললো আমায়--পিয়া, ব্যাগ কাইছা পাইবৃদি আন', বই দাউই ইস্কুল' তিলাঙনানি (পিসা, একটা ব্যাগ কিনে দাও আমাকে, আমি বই ভরে ইশকুলে নিয়ে যাবো)। উত্তরে আমি বললাম—ইঁ, পাইরহরানু আগুলিনি(হ্যায়, কিনে পাঠিয়ে দেবো আগরতলা থেকে)।

আমি আগরতলায় ফিরে এসে গৌরীর বই রাখার ব্যাগের কথা বলতেই আমার ছোটমেয়ে দেবযানী বললো—'বাবা, তোমার আর নতুন করে ব্যাগ কিনতে হবেনা গৌরীর জন্যে, আমার স্টীলের ব্যাগটা তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।' সেই ব্যাগে বই নিয়ে সে স্কুলে যেতো খুব সকালে অন্যান্যদের সঙ্গে। আমার খুব ইচ্ছে ছিলো, গৌরী আরেকটু বড়ো হলে আগরতলায় এনে আমার কাছে রেখে পড়াবো তাকে, তাকে ডাক্তারী পড়ানোর সখ ছিলো আমার।

কুমুই (জামাইবাবু) বলে আমাকে গৌরীর বাবা ডাকতেই সম্বিত ফিরে পেলাম আমি। কখন যে গৌরীর মৃতদেহ নিয়ে জীপ গাড়ি বিশালগড়, সিপাইজলা পেরিয়ে চড়িলামের বাজারের দিকে মোড়

নিয়ে বিজয় মজুমদারের দোলমঞ্চের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে খেয়াল নেই আমার।

—'জিজ্ঞেস করলাম, কি বলছো ?'

—'চড়িলাম বাজার থেকে গৌরীর জন্যে মার্কিন থান কিনতে হবে, আর নতুন জ্যামা-প্যান্ট ও লাগবে।'

—'কিছু ধূপ-ধুনো, বিড়ি, শাবানও কিনতে হবে। বললাম আমি।'

ঠিক হলো, সেনাপতি গৌরীর জন্যে তিন মিটার মার্কিন থান, জামা-প্যান্ট, ধূপ-ধুনো, বিড়ি-সাবান নিয়ে তার সাইকেলে যাবে, আর আমবা জীপ গাড়ি কোথাও আর না থামিয়ে সোজা চলে যাবো রাঙাপানিয়া নদী পেরিয়ে দক্ষিণ চড়িলামের মধ্য দিয়ে হেরমা বাড়ি।

চড়িলাম থেকে হেরমা মাত্র চার-পাঁচ কিলোমিটাবের মতো। সাঁ সাঁ করে জীপ এগিয়ে চলেছে। আমি শুধু ভাবছি জীপ তো এসে গেলো হেরমায়, এখন কী করবো, কী করে সামলাবো আমার শালার বৌ গৌরীর মাকে, কী-ই বা বলবেন আমাকে আমার শ্বশুর-শাশুড়ী। তাঁরা ভাবছেন, শিক্ষিত সচেতন জামাই গৌরীকে সঙ্গে করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে, নিশ্চয়ই গৌরী ভালো হয়ে উঠবে। আর আমি কিনা গৌরীর মৃতদেহ নিয়ে তাঁদের সামনে উপস্থিত হচ্ছি। ভয়ে দুঃখে আমার দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছে দরদর করে। জীপ গাড়ি হেরমাব কবিরাজের পুকুর পাড়ে আসতেই গৌরীর বাবা আর কাকা চিৎকাব করে কেঁদে উঠলো। তাদেব কান্না শুনে হেরমার ছেলে-মেয়েরা ছুটে এসে জীপের সামনে এসে ভীড় কবলো সবাই। আমি কাঁদতে কাঁদতে তাদেরকে বললাম—'(গুটিবাই গৌরীর ডাক নাম ছিলো গুটিরাই) মাবা গেছে, তোমবা খবর দাও আমাদের বাড়িতে, আমরা মূতাই কতব (কালীতলা) দিয়ে জীপ নিয়ে বাড়ির কাছে যাচ্ছি।'

জীপ গ্রামেব ভেতবে ঢুকে মূতাই কতর(বুড়ো দেবতার থান/কালী দেবতার থান) দিয়ে আমাদের বাড়ির কাছে যেতেই দেখি-গৌরীর মা তার পিঠে সৌরি ও ছেলে অমিত কুমারকে নিয়ে বুড়ো দেবতার থানেব দিকে আসছে। একেবারে জীপের মুখের ওপর সে। এমন যে হবে ভাবতে পারিনি, এখন কী করি? গৌরীর মাকে দেখে গৌরীর বাবা আর কাকা আরো চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। গৌরীর মা কি যেন ভেবে ককবরকে চিৎকার করে বললো—তাম' তাম' তাম' উঙখা? (কি, কি, কি হয়েছে?) এরই মধ্যে গৌরী শক্ত সটান দেহ দেখে ফেলেছে সে তার স্বামীব কোলে। শরবিদ্ধ হরিণীর মতো পিঠে সৌবিকে নিয়ে গৌরীকে ছুঁতে যেতেই দু'হাত দিয়ে আমি টেনে জড়িয়ে ধরলাম তাকে, মাটিতে পড়ে ও গুটিরাই, ও গুটি বলে গড়াগড়ি দিতেই সৌরিকে আমি নিয়ে নিলাম তার কাছ থেকে। এব মধ্যে পাড়ার মেয়েবা ছুটে এসে ধরলো গৌরীর মাকে। গৌরীর বাবা গৌরীকে কোলে করে চললো বাড়ির দিকে পেছনে পেছনে আসতে লাগলো সবাই। পাড়ায় মেয়েরা কোনোক্রমে টানতে টানতে নিয়ে এলো গৌরীর মাকে বাড়ির উঠোনে। গৌরচাঁন ঠাকুরের উঠানে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো মুহূর্তের মধ্যে। গৌরীর মৃতদেহ নিয়ে সোজা ঢুকে পড়েছে গৌরীব [illegible] ঘরের ভেতর। গৌরীকে সে কিছুতেই ছাড়বে না, উন্মাদ অবস্থা তার। হঠাৎ আমার জ্যাঠতুতো বড়ো শালা দা বীরেন্দ্র এসে প্রায় জোর করে গৌরীকে ছিনিয়ে নিলো তার ছোটোভাইয়ের কোল থেকে, তারপর চিৎকার করে কেঁদে উঠলো ও আনি রাঙচাক (ও আমার সোনামনি) বলে। আমার স্ত্রী হাইপোথাইরয়েডইজমেব রোগী, এমনিতে দুর্বল ও গুটিরাই বলে তিনি পশ্চিম ঘরের বারান্দা থেকে ছুটে গিয়ে গৌরীর বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন হাউমাউ করে।

ইতিমধ্যে বাঁশতলী থেকে আমার ছোট ভায়রা ও শালী ছায়ারানী এসেগেছে। তাদের আগরতলায় যাবার কথা হাসপাতালে গৌরীকে সেবা শুশ্রূষা করার জন্যে। তারাও কাঁদতে লাগলো হায় হায় করে।

এদিকে আমার দুই মেয়ে নন্দিনী ও দেবযানী আর শাশুড়ীকে নিয়ে আমার মেঝো শালা তুইয়া গেছে আগরতলায় দুপুরের দিকে। ভি.এম. হাসপাতালে তাদের যাবার কথা। এখন কি করা ? সবই নির্ভর করছে আমার ছেলে সুরঞ্জনের ওপর। তার মামা (গৌরীর বাবা) তাকে বলেছিলো বটতলায় থাকার জন্যে। সেখান থেকে তার নানা (আমার শাশুড়ী)কে হেরমায় পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে। কাজেই অপেক্ষা করতে থাকলাম আমরা।

গৌরীর মৃতদেহ হেরমায় এসেছে ঠিক গোধূলি বেলায়। সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠানো হলো তার দাদামশায় ও দিদিমাকে খবর দেয়ার জন্যে সুতার মোড়ায়। ঠিক হলো, রাতেই গৌরীকে দাহ করা হবে সব দিক থেকে আত্মীয়-স্বজন এসে গেলে। সন্ধ্যে উৎরিয়ে যেতেই গৌরীর মৃতদেহ নামিয়ে আনা হলো উঠোনে। উঠোন ভর্তি লোক, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে কাঁদছে, গৌরীর মা-বাবাকে সমলাতে পারছেনা কেউ। ঠিক এই সময় গৌরীর ঠাকুরমা (আমার শাশুড়ী) এসে পৌঁছলেন বাড়ি। বসে পড়লেন গৌরীর পাশে, চিৎকার করে কাঁখ ছেড়ে কেঁদে উঠলেন বায়াঙতী বায়াঙতী বলে। আমার শাশুড়ী গৌরীকে আদর করে বায়াঙতী বলে ডাকতেন। নাতনীতে ছাড়া থাকতে পারতেন না তিনি, গৌরী ছিলো তার চোখের মণি। সবসময় নানা, নানা বলে ঘুর ঘুর করতো তাঁর পিছু পিছু, তাঁর পাতে ভাত না খেলে কিছুতেই মন উঠতো না তাঁর। সেই বায়াঙতী নেই একথা মেনে নিতে পারছিলেন না কিছুতেই। আমার শ্বশুর মশায়ের এমন বুকভাঙা কান্না আমি কখনো দেখিনি আগে। কোনো দুঃখে ভেঙে পড়তে দেখিনি তাঁকে। বরঞ্চ আমাদের সান্ত্বনা দিতেন তিনি সবসময়। তাঁর মা (আমাদের দিদি শাশুড়ী) মারা গেলেও এত কাঁদতে দেখিনি আমরা। কিন্তু আজ তিনি শিশুর মতো কাঁদছেন ভেউ ভেউ করে। আমার খুড়শ্বশুর, কাকা বীরকুমার, তিনি ও কাঁদতে লাগলেন। গতকালই সে তাঁর উঠোনে লুট কুড়িয়েছিলো ছুটোছুটি করে। কিছুতেই নিজেকে প্রবোধ দিতে পারছিলেন না তিনি।

চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে আকাশে, জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে চার ভিটের মাঝখানে গৌরচাঁন ঠাকুরের উঠোন, এই উঠোন থেকে ছ'বছরের গৌরীকে নিয়ে যাওয়া হবে আঁদি নদীর পারে শ্মশানে। কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার ট্রাইবেল বাড়ির জামাই হয়ে, এই একই উঠোন থেকে দেখেছি গৌরীর ঠাকুরদাদার ঠাকুর দাদা (আমার দাদা শ্বশুর গৌরচাঁন ঠাকুরের বাবা) রামহরি ঠাকুরকে ১২৯ বছরে শ্মশানে নিয়ে যেতে। আমার সঙ্গে তাঁর প্রপৌত্রী ফুলকুমারীর বিয়ের সম্মতি দিয়ে মঙ্গলাচরণের পরেই মারাযান তিনি। তখন আমি পাশের বাড়ি যোগেন্দ্র দেববর্মার ঘরে থেকে ভাষার কাজ করি। রাজার আমলের দু'নম্বর মন্ডলের দ্বিতীয় সর্দার ১২৯ বছরের রামহরি ঠাকুরকে যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় তখনও উঠোনটা কাঁদেনি এতোটা, সারা এলাকার মানুষ এসে ভীড় করেছিলো আঁদি অঞ্চলের প্রাচীনতম ট্রাইবাল সর্দারকে হাসিমুখে শেষ বিদায় জানাতে, তাঁর নিজের কয়েক শ' নাতি নাতনী নেচেছিলো সেদিন আনন্দে। কাঁদার কেউ ছিলো না বললে চলে, ছেলেরা সব বুড়ো, এক ছেলে তো আমার স্ত্রীর ঠাকুরদা। একমাত্র মেয়ে যাকে আমরা 'নানা কুফুরতী' বলে ডাকতাম, তিনিও তখন বুড়ী থুড়থুড়ি, আশির মতো বয়েস, তিনি কেঁদেছিলেন কিছুটা। শ্মশানগামী অতিবৃদ্ধ রামহরি ঠাকুরের প্রথম নাতি রাজেন্দ্র দেববর্মার বয়েস তখন পঞ্চান্ন। আর আজ, সেই উঠোনটা কাঁদছে হাউহাউ করে রামহরি ঠাকুরের প্রপৌত্রের ছ'বছরের মেয়েকে শেষ বিদায় জানাতে, কোথায় ১২৯ বছর আর ৬ বছর। রামহরি ঠাকুর কি গৌরীর মতো ট্রিপল এন্টিজেন আর পোলিও ইনজেকশান নিয়েছিলেন ? তিনি বাঁচলেন ১২৯ বছর আর গৌরী, তার মায়ের কোল জোড়ানো ধন পরমায়ু বাড়াতে ট্রিপল এন্টিজেন আর পোলিও দিয়ে বাঁচলো মাত্র ছ' বছর। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র কী জবাব দেবে ?

গৌরীকে এবার নিয়ে যাওয়া হবে শ্মশানে। চেয়ারে বসিয়ে চোখের জলে তেল-সবান মাখালেন

তাকে হেরমা পাড়ার তার ঠাকুরদিদিরা, স্নান করালেন তাকে। তারপর মোঙ্গলীয় প্রথায় সাজানো হলো গৌরীকে। সাদা ধবধবে সালোয়ার-কামিজ পরানো হলো। গলায় দেয়া হলো ফুলের মালা। আতরের গন্ধে ভরানো হলো তার শরীর। তারপর নকশাকাটা নৌকার মতো চেলি (পরপারের পারের খেয়া) তে শোয়ানো হলো তাকে। ফুলে ফুলে শরীর তার ঢাকা। চারদিকে ধূপ-ধুনো জ্বলছে। ইতিমধ্যে আমার বড়ো ভায়রা কুমুই চিকন্দ্রী ও ছোট কাকাশ্বশুর হরিচরণ বাবু খোল করতালের আওয়াজ তুলতেই ক্রন্দনের বোল পড়ে গেলো। কে কাকে সামলায়। গৌরীব মা পাগলের মতো চেলির বাঁশ ধরে বসে রইলো, কিছুতেই সে যেতে দেবেনা তার আদরের সন্তান গৌরীকে। গৌরীকে চেলির ওপর রাখা হয়েছিলো ঠিক আমি যে ঘরে উপজাতীয় প্রথায় জামাই হয়ে উঠেছিলাম, তার সামনে। ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছিলাম আমি। হঠাৎ আমার এক জ্যাঠী শাশুড়ী (সুনীলের মা) আমাকে এসে সজোরে জড়িয়ে ধরে প্রবোধ দিতে গিয়ে বুকে দিলেন প্রচন্ড আঘাত। জড়িয়ে ধরে বললেন আমাকে, 'বাবু, তা কাবদি, কাবখে নিনি গৌরী তাই ফাইগ্লাক, তা কাবদি বাবু, তা কাবদি' (বাবা, আর কেঁদোনা, কাঁদলে তোমার গৌরী আর আসবেনা, বাবা, আর কেঁদোনা, আর কেঁদোনা)। এবার অতিকষ্টে পাড়ার গৌরীর ঠাকুরমা-দিদিমারা গৌরীর মাকে টেনে হেঁচড়ে চেলির কাছ থেকে সরিয়ে নিলো। উপস্থিত সকলে টাকা-পয়সা এনেছে শ্মশান খরচের জন্যে, সেই টাকায় মদ কেনা হবে। আমার মেজো শালা তুইযাব হাতে সকলেই টাকা দিলো।

এবার গৌরী উঠলো তাঁর ঠাকুর দাদাদের কাধে। বল হরি হরি বোল বলে যাত্রা শুরু হলো শ্মশানে। আমার জামাই-ওঠা ঘরের সামনে দিয়ে চললো গৌরী আঁদি নদীর ধারে শ্মশানে। আগের থেকে সেখানে উপজাতীয় প্রথায় গ্রামের সব বাড়ি থেকে কাঠ নিয়ে চিতা সাজানো সেখানে। মোঙ্গলীয় প্রথা অনুযায়ী মেয়েরা আগে গিয়ে গৌরীর চিতায় কাঠের টুকরো দিয়ে এলেন সকলে। এই শীতের রাতে কেউ যেতে দিলেন না আমাকে। গৌরীকে নিয়ে যাবার পর আঝোরে কাঁদছিলাম আমি। আমার মতো সচেতন পিসেমশায়ের কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো সে। আমার শুধু আফশোস, কেন আমি তাকে বিশালগড়ের হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে সোজা আগরতলায় জি.এম. হাসপাতালে নিয়ে গেলামনা। সে-খানে নিয়ে গেলে হয়তো আমার সাধের গৌরী তার পিসেমশায়কে এভাবে ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারতো না। আমি তাকে আগরতলায় ডাক্তার সুজিৎ দের চেম্বারে নিয়ে গিয়ে পোলিও খাইয়েছি, ট্রিপল এন্টিজেন দিয়েছি তার মাকে সঙ্গে করে। আজ কেন সোজা আগরতলায় নিয়ে গেলামনা গৌরীকে? সেখানে কতো পরিচিত ডাক্তার আছে আমার। আফশোসের আর সীমা নেই আমার।

আমাকে এই অবস্থায় দেখে আমার ছোটো দিদি শাশুড়ী পারিনা দেবী (কাকা বীরকুমারের মা) প্রায় জোর করে পশ্চিমের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে একখানা চৌকির ওপর বসিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে গৌরীর চিতায় কাঠ দিয়ে এসে আমার শাশুড়ী, দিদিশাশুড়ীরা কয়েক বোতল মদ নিয়ে বসলেন টাইগ্লাস নিয়ে। এবার চুয়াক (মদ) খাওয়া শুরু হলো মনের কষ্ট ভুলবার জন্যে। আমার ছোটো দিদি শাশুড়ী আমাকে এক কাপ মদ দিয়ে বললেন, 'সোনা, ইঁ, কিছা চুয়াক নুঙছিদি, তাই তা কাবদি, নিনি গৌরী ছরগ থাঙকা' (*সোনা, এইযে, কিছু মদ খাও, আর কেঁদোনা, তোমার গৌরী স্বর্গে গেছে*)। বুঝলাম, দিদি শাশুড়ীদের উদ্দেশ্য আমাকে মদ খাইয়ে কোনোকরমে ঘুম পাড়ানো। সত্যি সত্যি, কয়েক পাত্র মদ খাওয়ার পরে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। সারাদিন কিছুই খাইনি, টেনশন আর টেনশন। শেষরাতে ঘুম ভাঙতে দেখি আমার পাশে শুয়ে রয়েছেন আমার স্ত্রী। তখনো আমার বড়শালা (গৌরীর বাবা)'র ঘরে কাঠের গুঁড়ি জ্বালিয়ে আগুন পোহাতে পোহাতে হরে কৃষ্ণ হরে রাম গাইছেন আমার বড়ো ভায়রাভাই

কুমুই চিকন্দ্রী। আর গৌরীর মা ‘ও ছাজুকমা নুঙ রিয়াং থাঙকা আন’ খিবুই, আঙ বাহাইকে তঙনাই ?’ (ও আমার আদরের মেয়ে, তুই কোথায় চলে গেলি আমাকে ছেড়ে, আমি কীভাবে থাকবো ?) বলে চিৎকার করে কাঁদছে।

এদিকে কাকভোর হয়েছে। সূর্য ওঠার আগে কাককে মৃতের উদ্দেশে পিন্ডি দিতে হবে। আমার মেঝো শালা তুইয়া ও তার স্ত্রী রাত থাকতে পিণ্ডি রান্না করেছে। ইতিমধ্যে আমার স্ত্রীও উঠে পড়েছেন। বললাম তাকে, ‘চলো, এক্ষুণি আগরতলায় যেতে হবে। চড়িলামের প্রথম জীপ ধরে সকাল সাতটার মধ্যে আগরতলায় পৌঁছতে হবে। আমার স্ত্রীও তৈরী হয়ে নিলেন গৌরী গৌরী করে কাঁদতে কাঁদতে। শ্বশুর-শাশুড়ীকে বলে উঠোনে পা দিয়ে দেখি আমার জামাই-ওঠা ঘর ও আমার দাদা শ্বশুর গৌরচাঁন ঠাকুরের ঘরের ফাঁকে বসে কতকগুলো বাঁশের চোঙা পুতে তার সামনে কলার পাতায় আমার মেঝো শালা তুইয়া ও তার স্ত্রী বাসনা কাককে পিণ্ডি দিচ্ছে। মোঙ্গলীয় প্রথায় গৌরীর উদ্দেশ্যে আমার শালা বাঁ হাতে কবে পিণ্ডি দিচ্ছে উবু হয়ে বসে, আর পিণ্ডির দিকে না তাকিয়ে জল ঢালছে পিণ্ডির ওপোর। আমাদেব হাতে আর সময় নেই। গৌরীকে পিণ্ডি দেওয়া দেখতে দেখতে চোখের জল ফেলতে ফেলতে স্বামী-স্ত্রীতে রওনা দিলাম আমরা। তখনো গৌরীর মা ‘ও ছাজুকমা, নুঙ রিয়াঙ থাঙকা আন’ খিবুই (ও আমার আদরে মেয়ে তুই কোথায় গেলি আমাকে ছেড়ে) বলে বিলাপ করতে করতে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

পথে যেতে যেতে মনে মনে বললাম, ভারতীয় আর্যবা তো এই পিণ্ডদান পদ্ধতি জানতো না। পিণ্ডি বা পিণ্ড শব্দ অনার্য-আর্য নয়। তাহলে কি ভারতীয় আর্যরা এই পিণ্ডদান পদ্ধতি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মোঙ্গলীয় জাতি গোষ্ঠীর কাছ থেকে ধাব করেছে ? যদিও পিণ্ড শব্দটিকে পণ্ডিতেরা দ্রাবিড় বলে দাবী করেছেন। তবু আমি হলফ করে বলতে পারি, পূর্ব বঙ্গের হিন্দু বাঙালীদের বাসিবিয়ে প্রথা ও মেয়েদের উলুধ্বনি উত্তর-পূর্ব ভারতের তিব্বত-বর্মীয় বোড়ো সভ্যতার দান। ককবরক ভাষায় উলুধ্বনির ক্রিয়াপদ হল ‘জগলু’। আর এই জগলু থেকেই পূর্ববঙ্গে ‘উলু’ শব্দটি এসেছে-এটা লেখক সৈয়দ মুস্তফা সিবাজ কথিত আরব দেশের মুসলমান ট্রাইবদের আমদানী নয়।

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫। আজ উঠতে একটু দেবি হয়েছে। গতকাল অঘোর দেববর্মা ও ডাঃ নীলমণি দেববর্মার সঙ্গে চড়িলাম ও চন্ডীঠাকুর পাড়ার ট্রাইবাল এলাকায় গিয়েছিলাম। সকাল ন'টায় ডাঃ দেববর্মার ‘নীলকরবী’ কুটির থেকে বেবিয়ে সন্ধ্যে ছ'টায় ফিরেছি। আমি ছিলাম ডাঃ দেবর্মার প্রাইভেট কারের পেছনে একা। আর, অঘোর বাবু সামনের সীটে নীলমণি বাবুর পাশেই ছিলেন বসে; গাড়ী চালাচ্ছিলেন নীলমণি বাবু-ই। পেছনে বসে থেকে এতোটা রাস্তা যাতায়াত করায় আমার গা-গত-পা খুব ব্যথা করেছিলো রাত্তিরে, তাই উঠতে একটু দেরি।

সকালে উঠেই স্ত্রীর অর্ডার পেলাম কেরোসিন আনার। তিনি পঞ্চাশ টাকার একখানা নোট বের করে দিয়ে বাজারে পাঠালেন। আস্তাবল বাজারে গিয়ে সেই পরিচিত কিশোর হিন্দুস্থানী ছেলেটার সন্ধান পেলাম বাজারের প্রথম গলিটার মুখে। সে গলিটার মুখে দাঁড়িয়ে পরিচিত খদ্দেরদের টানবার চেষ্টা করছিলো ইশারা করে। আগে সে রাস্তায় বসে প্রকাশ্যে চোরাবাজারে বিক্রি করতো কেরোসীন, এখন সে সরকারী রেশন দোকানের নীল কেরোসিন বিক্রি করার জন্যে গলির ভেতরে ঢুকছে একটু। সে ইশারা করতেই পিছ পিছ গেলাম তার সঙ্গে। সে কেরোসিনের টিন লুকিয়ে রেখেছিলো জ্বালানী কাঠের গাদার পাশে। পুরোনো খদ্দেরকে দেখে বললো, “লইয়া যান বাবু একটু বেশি করে কেরাসিনের দর আরো বাড়বো।” জিজ্ঞেস করলাম, “কতো ?’ বলতেই কিশোর হাসলো, ‘কতো আর হইবো, দশ টাকা কইরা বিক্রি করতাছি বাবু।” তারিফ করলাম ছেলেটিকে, আগরতলায় এসে এখানকার

বাঙলা উচ্চারণ বেশ রপ্ত করে কথা বলার চেষ্টা করছে সে। জ্বালানী কাঠের পাশে একটা দু'হাত পাশের ঘর নিয়ে মুদিখানা খুলেছে সে। আগে তার কোন দোকান ছিলো না এরকম, লেপ-তোষকের দোকানে থাকতে থাকতে মাঝে মধ্যে কেরোসিন বিক্রি কবতো। বুঝলাম, গত ক'মাসে চোরাবাজারে রেশনের নীল কেরোসিন বিক্রি করে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে একটা স্থায়ী মুদিখানা খুলে বসতে পেরেছে সে।

বাসায় ফিরে কেরোসিনের দাম দশটাকা বলতেই গৃহিনী শ্রীমতী ফুলকুমারী দেববর্মা বেশ চটে গেলেন আমার ওপরে। তাঁর মেজাজটার ওপোর ঠান্ডা জল ঢালার জন্যে একটু রসিকতা করলাম আমি। বললাম, 'রাজা দশরথের রাজত্বে কেরোসিনের দর একটু কমেছে কালোবাজারে, গত সপ্তায় তো পনেরো টাকায় কিনেছিলাম এক লিটার, এখন তো পাঁচটাকা কমেছে তবু।'

—'চেঙরা তা থুঙদি আঙ বাই' (আমার সঙ্গে চেঙড়ামি করোনা), আমাব স্ত্রী রেগে গেলে তাঁর মাতৃভাষা ব্যবহার করেন আমার সঙ্গে। এরপর ককবরক থেকে আমার মাতৃভাষায় নামলেন তিনি— 'কবে থেকে বলছি তোমায় একটা গ্যাসের ব্যবস্থা করো, বামফ্রন্ট করো, এতো মন্ত্রীর সঙ্গে জানাশুনো তোমার, তবু একটা গ্যাসের ব্যবস্থা করতে পারো না?'

গ্যাসের জন্যে প্রায়-ই গঞ্জনা শুনতে হয় আমার। এখনো কোনো দরখাস্তই করা হয়নি, অথচ ট্রাইবাল বেল্ট থেকে আগরতলায় এসেছি বছর আটেক হয়ে গেলো। গাফিলতি আমারই, একটা তো দবখাস্তও করতে পাবতাম কোনো এজেন্সিব কাছে। আবার ভাবি, গ্যাস যে নেবো, টাকা পাবো কোথায়, দরখাস্ত করেই বা কি হবে? মাস দুয়েক আগে অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যের বোনের বিয়েতে গিয়েছিলাম বামনগরে স্বামী-স্ত্রীতে। আমাদেব সামনেই খেতে বসেছিলেন খাদ্যমন্ত্রী ব্রজগোপাল রায়, তাঁর পাশেই ছিলেন নগেন্দ্র জমাতিয়া। ভুরিভোজ সেরে পান খাবার সময় ব্রজবাবুকে একটু স্মিত হাসি হেসে বললাম, 'আমার স্ত্রী বেশ কিছুদিন ধরে বলছেন আপনাব কাছে যাবার জন্যে, একটা গ্যাস না হলেই নয় আমাদের।'

ব্রজবাবু যেতে বলেছিলেন আমাকে একটা দরখাস্ত নিয়ে। কিন্তু আজ যাই কাল যাই করে আর যাওয়া হয়নি। স্ত্রীর রাগ থামতে বললাম, 'কাল-ই যাবো ব্রজবাবুর কাছে, দেখাযাক, তিনি ভি.আই.পি. কোটায় একটা গ্যাসের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কিনা।'

দশটার সময় বেরিয়ে পড়লাম স্বামী-স্ত্রীতে। কথা হলো, অফিসে সই করেই বেরিয়ে আসবেন তিনি, সেখান থেকে আমরা যাবো ধলেশ্বরে ভগীরথ নায়েবের বাড়ি। ভগীরথ দেববর্মা ছিলেন আমার শাশুড়ীর আপন কাকা। ক'দিন হলো প্রয়াত ভগীরথ দেববর্মাব স্ত্রী অর্থাৎ আমার দিদিশাশুড়ী মারা গেছেন, তাই যাবো দেখাসাক্ষাৎ করতে। ভগীরথ নায়েবেব চাব ছেলে —গৌরচন্দ্র, নিতাইচন্দ্র, দিনমণি ও গুণমণি। এঁরা সকলেই আমার স্ত্রীর মামা, তাই তাঁরা সম্পর্কে মামা শ্বশুরও আমার। এঁদের মধ্যে নিতাই মামা বিয়ে করেছেন এক মণিপুরী মেয়ে, আর বাঙালি মেয়ে বিয়ে করেছেন দিনমণি মামা, এই মামী শাশুড়ী হলেন সম্পর্কে 'দৈনিক সংবাদ' এর সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। ট্রাইবাল বাড়িতে আমার দুই মামী শাশুড়ী মনিপুরী ও বাঙালি, দিব্যি সহাবস্থান করছেন তাঁরা। আমরা যেতেই মেয়ে ও জামাইকে বেশ আদর-যত্ন করলেন তাঁরা। সেখানে ঘন্টা খানিক জামাই আদরে থেকে দিদিশাশুড়ীর শ্রাদ্ধশান্তির খবরাখবর নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রিকসায় চাপলাম আমরা। আমার স্ত্রী আমাকে মঠ চৌমুহনীতে নামিয়ে দিয়ে চলেগেলেন তাঁর পূর্বাশা অফিসে, আর আমি হেঁটে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা গবেষণা কক্ষ (Language Laboratory)-এ ঢুকে দুখানা চিঠি পেলাম-

—একখানা এসেছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাসিসট্যান্ট রেজিস্ট্রার কে. বি. জমাতিয়া (কল্যাণ বিজয় জমাতিয়ার) কাছ থেকে। চিঠিখানা আমার ভাষাগবেষণা কাজের এক্সটেনশান সংক্রান্ত। চিঠিতে লিখেছেন কে.বি.জমাতিয়া --

Sir,

You are hereby appointed as Research Analyst in Language Laboratory, Department of Bengali on a fixed pay of Rs.3650/- (Rupees three thousand six hundred fifty) per month for a period of 6 (six) months w.e.f. 7.2.95.

Yours faithfully

K. B. Jamatia

(Assistant Registrar, Tripura University)

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে আমি এ্যাডহক এ্যাপয়েন্টমেন্টে লেকচারার ছিলাম। তৎকালীন উপচার্য অধ্যাপক ডঃ জে.বি.গাঙ্গুলী আমাকে লেকচারার পদে বহাল করেন। পরে সিন্ডিকেট আমাকে ল্যাঙ্গুয়েজ লেবরাটরির দায়িত্ব দিয়ে Research Analyst (গবেষণা বিশ্লেষণকারী) নিযুক্ত করেন। প্রতি ছ'মাস অন্তর মাননীয় সিন্ডিকেট আমাকে একস্টেনশন দেন। এই চিঠিটা তারই অঙ্গ।

দ্বিতীয় চিঠিখানা এসেছে কলকাতাব Asiatic Society'র Research Fellow শ্রীমতী প্রতিভা মন্ডলের কাছ থেকে। তিনি তাঁর ২৩.১.৯৫'ব চিঠিতে লিখেছেন ঃ প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় কুমুদ দা, গত দু-তিন বছর ধরে এক তরফা চিঠি লিখে চলেছি। আপনি অন্যদিকে একদম চুপচাপ। কি ব্যাপার? খুব ব্যস্ত কাজে? নাকি চিঠিগুলো পাচ্ছেন না? ঝোটনদির হাতে যে পেপারটা পাঠিয়েছিলাম সেটা পেয়েছিলেন তো?

যা হোক যত ব্যস্তই হোন—এই চিঠিটা পেলে উত্তর দেবেন। দুটি ইনফরমেশন চাই—নওয়াই পাখীর বাংলা এবং ইংরেজি প্রতিশব্দ কি হবে? এছাড়া ধনেশ পাখিব কিছু বিশেষত্ব জানা আছে কি? ধনেশ কি ইংরেজি hornbill?

চিঠি বড় করছিনা, অযথা আপনার সময় নষ্ট করতে চাইনা বলে।

তারপর? বৌদি কেমন আছেন? ছেলেকে আমার সঙ্গে এশিয়াটিকে যোগাযোগ করতে বলবেন। আমি এশিয়াটিকে জয়েন করেছি। পূর্ণ ঠিকানা Sender's name and address-এর জায়গায় দিলাম। ইতি

শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধাসহ

প্রতিভা

প্রতিভা মন্ডলের একটা কাহিনী আছে। বছর তিনেক আগে এসেছিলো আগবতলায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রূপকথা নিয়ে গবেষণার কাজে, ছিলো আমার বাসায় দিন পনেরোর মতো। তখন সে এশিয়াটিক সোসাইটির রিসার্চ ফেলো। তাকে নিয়ে কয়েকটি ককবরক-উপভাষা এলাকায় গিয়েছিলাম আমি রূপকথা সংগ্রহ করতে তার গবেষণা কাজের জন্যে।

খুব সাহস তাব। একদিন আমার বন্ধু ডাঃ যুধিষ্ঠির দাসের গাড়ি করে তাকে নিয়ে গেলাম চম্পকনগরের কাছে রূপিনী ভাষাভাষী ভৃগুদাস রূপিনী পাড়ায়। রাতে সে ছিলো ডাঃ দীনমণি রূপিনীর বাড়ি। সেখানে থেকে রূপিনীদের রূপ কথা সংগ্রহ করেছিলো সে। অথচ তখন ওইসব এলাকায় ছিলো উপজাতীয় দামাল ছেলেদের দারুণ দৌরাত্ম্য।

ভৃগুদাস রূপিনী গ্রামে রূপকথা সংগ্রহের পর তাকে পাঠিয়ে ছিলাম বিলোনিয়ার রিয়াঙ এলাকায় ট্রাইবাল রিসার্চের প্রফুল্ল রিয়াঙের সঙ্গে। প্রফুল্ল বাবুর সঙ্গে দিব্যি বেশ ক'দিন কাটিয়েছিলো সে রিয়াঙ

এলাকায় রূপ কথা সংগ্রহের কাজে। সেখানেও ভয় পায়নি সে ধনঞ্জয় রিয়াঙের বাহিনীর কাছে। অথচ এই প্রতিভা পালিয়ে এসেছিলো সুদূর আমেরিকা থেকে ইজ্জতের ভয়ে। আমেরিকায় রূপকথা গবেষণা করতে গিয়েছিলো। সে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো, সেখানে তাকে নিগ্রো মেয়ে বলে টিজ করতো শ্বেতাঙ্গ বন্ধুরা। অভিমানে আমেরিকা ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এসে এশিয়াটিক সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলো রিসার্স ফেলো হিসেবে। আগরতলা ছাড়ার আগে তাকে রবীন্দ্রপরিষদে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রূপকথার ওপর একটা টক দেয়ার ব্যবস্থা করেদিয়েছিলাম আমি। চমৎকার বলেছিলো সে সেদিন। দেখছি, এখনো সে যোগাযোগ রাখছে আমার সঙ্গে, আমি তো ফসিল প্রায়, তবু আমার সঙ্গে যোগাযোগ?

বেলা আড়াইটে নাগাদ ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদ, ডঃ কমল কুমার সিংহ ও অধ্যাপিকা শিপ্রা রায়ের সঙ্গে গেলাম আগরতলার প্রেস ক্লাবে। সেখানে ছিলো একলব্য গোষ্ঠী আয়োজিত কবিতা বিষয়ক এক আলোচনা চক্র। আসন্ন উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাহিত্য উৎসবকে সামনে রেখে এই আয়োজন। আলোচনার বিষয়ঃ 'কবিতা পড়ুন, কবিতা পড়ান, কবিতা ছড়ান।' ঠিক তিনটের সময় এই আলোচক্রের উদ্বোধন করলেন শিক্ষামন্ত্রী ও বিশিষ্ট ছড়াকার অনিল সরকার মশায়। তিনি বললেন, তাঁর সদ্য প্রকাশিত হীরাসিং হরিজন কবিতার বইটি ইতিমধ্যে পনেরো হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছে এবং এই বইয়ের টাকা দিয়ে তাঁর বাড়ির ঝি সোনার গয়না কিনেছেন বেশ ক'খানা। মন্ত্রী মহোদয় অতঃপর কবিতা পড়লেন বেশ ক'টি। চড়িলামের প্রয়াত কমরেড রাখাল দেবনাথের ওপোরও স্বরচিত কবিতা পাঠও করলেন তিনি। আলোচনা চক্রে তাঁর হীরাসিং হরিজন কবিতাটি এরপর পাঠ করলেন দু'জন তরুণ-তরুণী।

তারপর শুরু হলো কবিতার ওপর আলোচনা। শ্রীমতী অপরাজিতা রায় কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একেবারে হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন। বাঙলা কবিতার দুর্বোধ্যতা আলোচনা করার শেষে তিনি এলেন ত্রিপুরার কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে। বাঙলা ও ককবরক কবিতার মান নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন বেশ মননশীল ভাবে। তারপর কবিতা বিষয়ক আলোচনা-চক্রের 'কবিতা পড়ুন, কবিতা পড়ান, কবিতা ছড়ান' প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন, "অধ্যাপক সিরাজুদ্দীন আমেদ 'পুবের হাওয়া'র ভূমিকায় বলেছেন, এ রাজ্যের কবিতা সংকলন গুলে বামপন্থী কবিদের তেমন উল্লেখ করা হয়না, তাঁরা অবহেলিতই থেকে যাচ্ছেন। কিন্তু এ রাজ্যে একটা বামফ্রন্ট সরকার ছিলো দশ দশটা বছর আলো করে, আমার প্রশ্ন, সে সময়ে বামপন্থী কবিরা কেন বামপন্থী কবিদে একাধিক কবিতা সংকলন বের করেননি, কেন তারা 'কবিতা পড়ুন, কবিতা পড়ান, কবিতা ছড়ান বিষয়টাকে নেহাত স্লোগান সর্বস্ব করে রেখেদিলেন? অবামপন্থীরা কিন্তু কোনো স্লোগানের ধার না ধেরে তাঁদের কবিতা চর্চা, সাহিত্য চর্চা, সংকলনের কাজ খুব আর্থিক অনটনের মধ্যে থেকেও করে চলেছেন। তাঁদের হাতে কোনো সরকার নেই, তথচ তাঁরা একাজটা নিষ্ঠার সঙ্গে করছেন, আর তিন তিনটে সরকার বামপন্থীরা পেয়েছেন, তাঁরা করে দেখান, যা কিনা অবামরা পাবেননি, শুধুমাত্র দোষারোপ করলে কিছু হবে না।"

শ্রীমতী রায়ের এমন দুঃসাহসিক বক্তৃতায় হল থেকে গরম হাওয়ার হল্কা বেরোতে লাগলো। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী উপস্থিত, তিনি বামফ্রন্ট সরকারের প্রচারপর্বের শিরোমণি, ঠিক তাঁরই সামনে বামপন্থী কবি ও সাহিত্যিকদের কর্মকান্ডকে এমন চাঁছাছোলাভাবে সমালোচনা করা! শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একটা উসখুস ভাব দেখা গেলো। ঠিক আমার সামনের চেয়ারে বসে ছিলেন অধ্যাপক আমেদ, আমি তাঁকে বললাম, 'এবার কিছু বলুন ডঃ আমেদ।' কিন্তু তিনি অসম্মতি প্রকাশ করলেন কিছু বলতে।

শ্রীমতী রায় বামবর্গের কবি-সাহিত্যিকদের শাণিতভাবে সমালোচনা করেও যেন শান্তি পাচ্ছিলেন না, এবার তিনি হুল ফোটালেন মহিলা কবিদের প্রসঙ্গ নিয়ে। গতবছর অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্ব সাহিত্য

সম্মেমলনের পঞ্চবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে কবি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি ত্রিপুরার মহিলা কবিদের কটাক্ষ করেছিলেন । ত্রিপুরার মহিলা কবিদের কবিতা চর্চা তেমন কোনো উল্লেখের দাবি রাখে না, একটা প্যারাগ্রাফেই তাঁদের কথা শেষ হয়ে যায় । আবার শ্রীমতী রায় নাকি আড়িপেতে শুনেছিলেন সে কথা । কবি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়েব মুখ থেকে নাকি একটা বেফাঁস কথাও বেরিয়ে পড়েছিলো—ওই যে করবী-ফরবী আছে না, তাঁদের কবিতার কথা নিচে একটা প্যারাগ্রাফেই লিখলে চলবে ।

আমি কবি করবী দেববর্মণের মুখ থেকেও এমন অনুযোগের কথা শুনেছি । আজকের আলোচনা চক্রে কবি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত, তাছাড়া করবী দেববর্মণ তো একেবারে সামনে সারিতেই সকলের চোখ আলোকরে বসে আছেন । আমি মনে মনে বললাম, এই খেয়েছে, এবার বোধ হয় লেগে যাবে একটা কিছু, অপরাজিতা আর করবীর একেবারে মুখে পড়েছেন সত্যেন বাবু, কটাক্ষ যে তাঁর প্রতি সেটা তো বেশ বুঝতেই পারছিলেন তিনি । না, তেমন কিছু হলো না, মাত্রবোধের গন্ডি পেরোলেন না কবিত্রয । শ্রীমতী রায় কটাক্ষটা ছুঁড়ে মেরে কিছুটা ঠান্ডা মেজাজে মহিলাদেব কবিতা লেখার অবসর প্রসঙ্গে আত্মমুখীন বলেন । আমি মনে মনে বললাম, যাক বাঁচা গেলো ।

শ্রীমতী রায়ের পরে ঘোষক শ্রী দেবব্রত দেবরায়ের ঘোষণা মাফিক একে একে উঠলেন ডঃ শিশির কুমার সিংহ, ডঃ কমল কুমার সিংহ, ডঃ মহাদেব চক্রবর্তী এবং সব শেষে কবি কল্যাণব্রত চক্রবর্তী । কবিতার ওপর আলোচনাব পব শুরু হবে কবিতা পাঠ। চা-বিস্কুট খাচ্ছি আমবা । এমন সময ককবরক ভাষার কবি চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং একটু উদভ্রান্তভাবে এসে বসলেন আমার পাশে । জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, বলতে পারেন, ক'টা করে কবিতা পড়েছে সব এখানে ?" বললাম, "এইতো সবে শুরু হতে যাচ্ছে । ইচ্ছে মতো পড়ুন না আপনি ।"

কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠ আর শোনা হলোনা আমার । অধ্যাপিকা শিপ্রা রায়কে নিয়ে যেতে হবে ত্রিপুরা দর্পণে সমীরণ রায়ের কাছে । অধ্যাপিকা রায় আসন্ন বইমেলা উপলক্ষে একখানা বই বেব করবেন, তাঁকে একটু সাহায্য কবতে হবে । সিঁড়ি দিয়ে নামতেই শ্রীমতী অপরাজিতা বায়ের সঙ্গে দেখা প্রেসক্লাব চত্বরে । দেখি, তিনি অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য, কবি রাতুল দেববর্মাব সঙ্গে মিটি মিটি হাসতে হাসতে কি যেন বলছেন, তাঁর দিকে মাথা নুইয়ে আমিও হাসলাম একটু । তারপর চলেগেলাম অধ্যাপিকা রায়কে নিয়ে ত্রিপুরা দর্পণে । ত্রিপুরা দর্পণে শ্রীযুক্ত সমীরণ রায়ের ছোটো ভাই বাদলের সঙ্গে বই ছাপানোর ব্যাপারে আলোচনা করে আমি বিদায় নিলাম অধ্যাপিকা রায়ের কাছ থেকে ।

অধ্যাপিকা রাযের সঙ্গ ছেড়ে সোজা চলে গেলাম করবী দেববর্মণের বাড়ি রাধামোহন ঠাকুর এ্যাকাডেমীতে ককববক ক্লাস নিতে । সেখানে পৌঁছে দেখি আমার দুই ছাত্রী শ্রীমতী আভা বর্মণ রায় ও শ্রীমতী দে অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে । শ্রীমতী বর্মণ রায় আগরতলার উইমেনস্ কলেজ থেকে ভাইস-প্রিন্সিপাল হিসেবে রিটায়ার করেছেন সম্প্রতি । তাঁর এক ইঞ্জিনিয়ার ছেলে ব্যাঙ্ককে থাকেন। ব্যাঙ্কক হলো থাইল্যান্ডেব রাজধানী । থাইল্যান্ডের থাই ভাষা ককবরকের দূরবর্তী আত্মীয় বলে আমাব ধারণা । কথাটা বলছি এই জন্যে, একবার শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবের সময় রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের বিখ্যাত জাপানী নর্তকী মীনা কাণ্ড এসেছিলেন বসন্তসেনার ভূমিকায় অভিনয় করতে । পরের দিন পিয়ার্সন পল্লীর আমার বাসার পাশের বাড়িতে আমার ইহুদী বন্ধু রিচার্ড সলোমন ও তাঁর বাউলগানের গবেষক পত্নী কেরোলী মীনাকাণ্ড ও তার স্বামীকে সান্ধ্যভোজে আপ্যায়ন করেছিলেন । আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম সেখানে । ইহুদি সাহেবের সান্ধ্যভোজে বীরভূমের বিখ্যাত তালের তাড়ি চুমুক দিতে দিতে সলোমান পরিচয় করিয়ে দিলেন মীনা কাণ্ড ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে । স্বামীটি ইংরেজ, থাকেন ব্যাঙ্ককে, গবেষণা করেন থাইভাষা নিয়ে । আমি তিব্বত-বর্মীয় ভাষা গোষ্ঠীর ককবরক ভাষার গবেষক জেনে বেশ

তারিফ করলেন তিনি । মীনা কাঙের ইংরেজ স্বামীকে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'আচ্ছা বলুন তো, থাইভাষায় ক'টা টোন আছে?' উত্তরে বললেন, 'তিব্বত-বর্মীয় ভাষার সঙ্গে থাইভাষার মিল থাকারই কথা, কেননা থাইভাষা চীন-তিব্বতীয় (Sino-Tibetan) ভাষা বংশেরই ভাষা।' আনন্দের আতিশয্যে সলোমনের ফ্রিজে রাখা ঠাণ্ডা তালের তাড়িতে চুমুক দিতে দিতে মীনা কাঙকে বললাম, 'জানেন ম্যাডাম, আপনার নামের কাঙ অংশটির ককবরক অর্থ কি?' গতকালের বসন্তসেনা তালের তাড়িতে ঠোঁট ভিজিয়ে আমার দিকে আমার স্ত্রীর মতো জাপানি চোখ তুলে বললেন, 'না, জানিনা আমি, বলুন না ইপনি, জাপানি কাঙের ককবরক অর্থটা।' বললাম, 'ককবরকে কাঙ অর্থ পিপাসা পাওয়া। আমি যদি বলি, আঙ মীনা কাঙগ, তার অর্থ হলো আমার মীনাকে তৃষ্ণা পেয়েছে।' আমার কথা শুনে বন্ধু সলোমন, কেরোলী, মীনার ইংরেজ স্বামী হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, কাঙ কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেছেন। মীনা কাঙের স্বামীকে অনুরোধ করেছিলাম থাই ভাষায় একখানা বই পাঠাতে আমাকে।

স্মৃতির পর্দায় কড়া নেড়ে আভাদিকে বললাম, 'জানেন, আভাদি, ককবরক ভাষার সঙ্গে থাই ভাষার মিল আছে। আপনি আপনার ছেলেকে লিখে দিন থাই ভাষার একখানা বই পাঠাতে।' চিঠি লিখে থাই ভাষার বই পাঠাতে সম্মতি জানালেন তিনি। এরপর ককবরক ক্লাস করলাম পুরো এক ঘন্টা। আটটা বাজতেই করবীদি এলেন প্রেসক্লাব থেকে স্বরচিত কবিতা পড়ে। তাঁর গায়ে অভিজাত নাগা শাল। আমাদের সামনে বসতেই জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে, 'কেমন হলো করবীদি, 'কবিতা পড়ুন, কবিতা পড়ান, কবিতা ছড়ান' পর্ব।'

—'আপনি তো ছিলেন সেখানে, জানেন তো সব-ই।' বলেই নয়নমনোহর নাগা শাল জড়াতে জড়াতে চায়ের কথা বলতে চলে গেলেন কিচেনে। মনে হলো, করবীদি মুখ খুলবেন না তেমন। তাই বেরিয়ে পড়লাম সেখান থেকে। 'নীলকরবী' থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলাম ত্রিপুরা দর্পণে। সম্পাদক সমীরণ রায়ের ঘরে ঢুকে দেখি প্রেস ক্লাবে সদ্য অনুষ্ঠিত 'কবিতা পড়ুন, কবিতা পড়ান, কবিতা ছড়ান' বিষয়ে মুখরোচক আলোচনা করছেন সব চানাচুর খেতে খেতে। কবিতা চর্চা না পরচর্চা—ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরলাম রাত ন'টায়।

৩১ শে জানুয়ারী, ১৯৯৫। অঘোরবাবু আর ডাঃ নীলমণি দেববর্মা যখন আমাদের গ্রামে যান যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে, সেই দিন দুপুর বেলায় সম্পর্কে আমার দাদা শ্বশুর কোশাচন্দ্র দেববর্মার শ্রাদ্ধ হচ্ছিলো। আমি অঘোরবাবু আর ডাঃ দেববর্মাকে যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়ে চলে এলাম দা কোশা (কোশাদা)'র শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে। তখন হরিসভা হচ্ছিলো সেখানে। সুন্দর করে মণ্ডপ করা হয়েছিলো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে লিখে। মনে হচ্ছিলো, একেবারে বাঙালি-বাড়িতে হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে। এ-যে একটা ট্রাইবাল বাড়ির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, এঁরা যে পরম হিন্দু, এঁরা যে বৈদিক আচার-আচরণ করেন, তা দূর থেকে বোঝা যায় না কখনো। হরিসভার মণ্ডপ সাজানো হয়েছিলো উপজাতীয় কায়দায়। তার চারপাশে রঙিন কাগজ কেটে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" তৈরী করে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিলো সুন্দরভাবে। আমি যখন গেলাম, তখন মনশিক্ষা গাওয়া হচ্ছিলো। মূল গায়ক ছিলেন আমার জ্যাঠাশ্বশুর দশরথ দেববর্মা। দেখলাম, আমার খুড়শ্বশুর কাকা বীরকুমার ও কাকা সুবল নেচে নেচে অন্যদের সঙ্গে মনশিক্ষা গাইছেন, অথচ তাঁরা দু'জনেই বি. এ. পাশ, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সরকারী অফিসার। মেরতেঙ (মৃদঙ্গ) বাজাচ্ছিলেন আমার দুই বড়ো ভায়রা, আমার শালা প্রয়াত গৌরীর বাবা বিশ্বকুমার বাজাচ্ছিল করতাল।

হরি সংকীর্তনের মণ্ডপের সামনে দা কোশার ভাইপো কাকা চিন্তাহরণের বারান্দায় আত্মীয় স্বজনেরা

বসে হরিনাম শুনছেন একনিষ্ঠভাবে। বারান্দার পাশে উঠোনে একটা বেঞ্চে বসে আছেন আমার এক দাদা শ্বশুর ব্রজকুমার মাস্টার। তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম আমি। আমিও মনশিক্ষা শুনতে লাগলাম তাঁর পাশে বসে। তখন স্মৃতিতে ভেসে এলো একটা কথা। এই যে দা কোশা, যার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে আমরা সমবেত হয়েছি, বছর দুয়েক আগে তাঁরই সম্পর্কে এক নাতনী (সম্পর্কে আমার শালী)'র বিয়ে হলো এক খ্রীষ্টান ছেলে (সম্পর্কে আমার ছোটো শালা)'র সঙ্গে খ্রীষ্টান মতে। এই উঠোন থেকে চলে গিয়েছিলো সে চার্চে। একই পরিবারে হিন্দু-খ্রীষ্টানের এই যে সহিষ্ণুতার বাতাবরণ তা কত দিন থাকবে? প্রশ্ন দেখা দিলো আমার মনে। এমন সময় মেয়েরা এসে কলার পাতায় প্রসাদ দেয়ার মতো করে শ্রাদ্ধের পিঠে ও রান্না করা তিতো শাক দিয়ে গেলেন সকলকে। উপজাতীয় পরিবারে শ্রাদ্ধের সময় সমবেত আত্মীয় স্বজনকে প্রথমে এই পিঠে ও তিতো শাক খাওয়ানো হয়, তারপরে খাওয়ানো হয় ভাত। শ্রাদ্ধের পিঠে ও তেতো শাক খেয়ে সংকীর্তনের মণ্ডপের দিকে তাকিয়ে মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করে আমি চলে গেলাম যোগেন্দ্রবাবুর বড়ো ছেলে, ধারিয়াথল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্মার বাড়ি, সেখানেই হয়েছিলো ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের দুই পথিকৃৎ অঘোর দেববর্মা ও ডাঃ নীলমণি দেববর্মার খাওয়ানোর ব্যবস্থা।

কাকা বীরকুমারের কাছ থেকে দাদা কোশার শ্রাদ্ধের অন্যান্য কিছু খবর শুনে চলে গেলাম আমি মেলারমাঠে বিপ্লবী দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর বাড়ি। গিয়ে দেখি, তিনি ভারতের মহিলা ফেডারেশনের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির রিপোর্ট তৈরী করছেন তাঁর স্ত্রী সাহানা সেনগুপ্তর সঙ্গে। ওঁরা দিল্লী যাবেন ফেব্রুয়ারির দু'তারিখে, সঙ্গে যাবেন লালসিংমোড়া গাঁওসভার সি. পি. আই. প্রধান মন্দোদরী দেববর্মা।

আমি যেতেই দেবুদা সাপ্তাহিক কালান্তর দিলেন আটখানা। দেবুদা এই চুরাশি-পঁচাশি বছর বয়েসে দশখানা সাপ্তাহিক কালান্তর চালান। ওঁরা স্বামী-স্ত্রীতে পায়ে হেঁটে পত্রিকা দিয়ে আসেন বাড়িবাড়ি গিয়ে। আমি তাঁর কাছ থেকে চারখানা পত্রিকা নিয়ে হক করি। পত্রিকা ব্যাগের ভেতর পুরে ডিসেম্বর মাসের জমা থাকা পত্রিকার দাম দিলাম চল্লিশ টাকা। টাকা নিয়ে দেবদা বললেন -'ব্রাদার, একটা কাজ করতে হবে আপনার।'

—'বললাম, কি কাজ ?'

—'আমরা যতোদিন না দিল্লী থেকে ফিরি, ততোদিন আপনি কালান্তরগুলো পৌঁছে দেবেন গ্রাহকদের বাড়ি।'

—'ঠিক আছে, যেভাবে হোক দায়িত্ব পালন করবো আমি।' আমার কথা শুনে বেশ খুশী হলেন তিনি।

এরপর সাহানাদি দিলেন আরেকটা দায়িত্ব। আমাদের একটা সাক্ষরতা ক্যানটিন আছে। পরিচালনা করে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর ম্যাস এডুকেশন এণ্ড ডেভালপমেন্ট রাজ্য কমিটি। এই সাক্ষরতা ক্যানটিনের লভ্যাংশ থেকে দুঃস্থ নিরক্ষর মেয়েদের সাহায্য করা হয়। ক্যানটিনটার ব্যবস্থাপনায় আছেন সাহানাদি, রাজলক্ষ্মী দেবী, অধ্যাপিকা আলপনা সিনহা, অধ্যাপিকা গৌরী দাশ প্রমুখ সাক্ষরতা সমিতির সদস্যারা । সাহানাদির অনুপস্থিতিতে সাক্ষরতা ক্যানটিনের দেখভালের বাড়তি দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। আমাদের এই ক্যানটিন থেকে দুপুরের টিফিন পাঠানো হয়ে থাকে সূর্যমণিনগর ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। সেখানে অধ্যাপকেরা এবং অন্যান্য স্টাফ সাক্ষরতা-লাঞ্চ খুব পছন্দ করেন। প্রথম যেদিন সেখানে দুপুরের খাবার নিয়ে যাওয়া হয়, সেদিন অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও সাহানাদির সঙ্গে আমিও ছিলাম।

সাহানাদিকে বললাম, "তথাস্তু, এই দায়িত্বও আমি পালন করবো ।" —"শুনুন, বললেন

সাহানাদি, অপর্ণাদি (নরেন্দ্র দেবের বোন) থাকবেন, হিসেব-টিসেব তিনি রাখবেন, কাজেই আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না।"

অপর্ণাদিকে আমি চিনি। তাঁর ট্রাইবেল এলাকায় গিয়ে কাজ করার অভ্যাস আছে। দীর্ঘদিন ধরে মেলাগড়ের কাছে লক্ষ্মণঢেপায় এক মলসুম ট্রাইবাল পাড়ায় সেবামূলক কাজ করেছেন তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের তরফ থেকে। নিরক্ষর মলসুম মেয়েদের লেখাপড়াও শিখিয়েছেন তিনি সেখানে। অপর্ণাদির সাহায্য পাওয়া বেশ গর্বের ব্যাপার। বেশ ভালোই লাগলো আমার।

দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর বাড়ি থেকে বেরিয়ে মহারাজগঞ্জ বাজারের পাশের রাস্তা দিয়ে সোজা হেঁটে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে সাড়ে তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ককবরক ক্লাস নিয়ে একটা রিক্সায় চেপে সটান ফিরে এলাম বাসায়।

বাসায় ফিরে দেখি, আমার স্ত্রী শ্রীমতী ফুলকুমারী অপেক্ষা করছেন আমার সঙ্গে ডাঃ এস আর দেবের চেম্বারে যাবেন বলে। তাড়াতাড়ি করে একটা রিক্সায় চেপে বসলাম দু'জনে, আগের থেকে টিকিট নেয়া হয়নি, ডাক্তারের দেখা পাবো কিনা, ভয় হচ্ছিলো মনে। প্রায় চেম্বার বন্ধের মুখে ডাঃ দেবের ওখানে ঢুকলাম আমরা। আমার স্ত্রী পুরোনো রোগী দেখে ছেড়ে দিলেন ডাঃ দেবের সাহায্যকারী। শ্রীমতী ফুলকুমারী হাইপোথাইরয়েডইজিমের রোগী, গলা ফোলা, জানুয়ারির প্রথম দিকে ডাঃ দেব দেখে এলট্রকসিন খেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ডাঃ দেব প্রথম প্রেসার চেক করলেন। তারপর আমার স্ত্রীর শারীরিক সংবাদ নিয়ে বললেন, "আরেকবার ইসিজি করে দেখলে ভালো হয়, তাহলে হার্টের অবস্থাটা বোঝা যায়।"

বললাম আমি, "করুন, ওঁর জন্যে যা দরকার সবই করুন।" ডাক্তার দেব নিজেই ইসিজি করলেন। ফিরে টেবিলে তিনি পড়তে লাগলেন ইসিজির চক্র রেখাগুলো। খানিকটা উৎকণ্ঠায় বুকের ভেতর টিপ টিপ করছিলো আমার। হাইপোথাইরয়েডইজিম মানেই হার্টের সর্বনাশ। কিন্তু না, ডাঃ দেব আশ্বস্ত করলেন আমায়; বললেন, 'হার্ট আগের থেকে ভালো, আগে মুভমেন্টগুলো ছিলো খুব স্লো, এখন অনেক ভালো হয়েছে। কাজেই, এলট্রকসিন এখন থেকে দিনে তিনটে করে খেতে হবে। তবে পনেরো দিন বাদে আবার দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।'

ডাঃ দেবের দিকে তাকিয়ে বলাম, "আজও কি ফিস দিতে হবে ?" স্ত্রীকে বললাম, "কতো এনেছো তুমি !" একশ' টাকার একখানা নোট বের করে ককবরকে বললেন —ছিমি ম কাঙছা তুবখা (শুধু এই একখানা এনেছি)। ডাক্তারবাবু বললেন ঠিক আছে, "ইসিজির একশ' টাকা দিয়ে যান আজ, পরের ডেটে একটা ফিস দিয়ে দেবেন ।"

হাঁফ ছেড়ে বাচলাম আমি। পরের ডেটে আশি টাকা দিলে চলবে চল্লিশ চল্লিশ করে। আসলে ডাঃ দেবের ফিস আশি টাকা। মনে হলো পুরনো রোগীর কাছ থেকে অর্ধেক ফিস নিয়ে থাকেন। ডাঃ দেবের চেম্বার থেকে বেরোতে বেরোতে স্ত্রীকে বললাম, 'ডাঃ দেবের ফিসটা খুব বেশী। আমাদের গরীব রাজ্যে সব রোগী আসতে পারবে না এঁর কাছে।'

ডাঃ দেবের শঙ্কর চৌমুহনীর চেম্বার ছেড়ে লোডশেডিঙের ঘুটঘুটে অন্ধকারে একটা রিক্সায় কোনোরকমে চড়ে আমরা রওনা দিলাম বিজয় কুমার চৌমুহনীর দিকে বংশী ঠাকুরের স্ত্রীর বাড়ি নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায়।

বন্ধুবর নগেন্দ্র জমাতিয়ার দাওয়ায় উঠলাম অন্ধকারের মধ্যে, ডাকলাম তাঁকে জোরে জোরে; কোনো উত্তর নেই। বন্ধুর কাছ থেকে কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে এবার ডাকলাম বান্ধবী পবিত্ররাণী জমাতিয়াকে মারে মারে বলে। না, কোনো টুঁ-শব্দ নেই। ব্যাপারটা কী ? দেখলাম, এক ঘর থেকে

ভেজানো দরজার ভেতর দিয়ে অল্প অল্প আলো আসছে। দরজা ঠেলে স্বামী-স্ত্রীতে ঢুকে পড়লাম ঘরের মধ্যে সসঙ্কোচে। দেখলাম, ঘরের এক কোণে একটা আধপোড়া বাতি জ্বলছে নিবু নিবু ভাবে, আর, খাটের ওপর কারা যেন শুয়ে আছে। লজ্জা পেলাম একটু, ভাবলাম এই লোডশেডিঙের মধ্যে শুয়ে শুয়ে বন্ধু ও বন্ধুপত্নী ঘুমিয়ে পড়েছে অঘোরে। আমার স্ত্রী তাঁর মুখে আঙ্গুল চেপে ইশারায় আমাকে শব্দ করতে বারণ করে দরজা ভেজিয়ে বেরোতেই লেপের ভেতর থেকে কে যেন ককবরক ভাষায় জড়ানো গলায় বললেন — 'ছাব (কে ?) ?'

—'চুঙছে, মাউই দা ?' (আমরাই, মাউই নাকি ?)

—'ইঁ' (হ্যাঁ)

—'য়ারছঙ কৃরূই দা?' (বন্ধুরা নেই নাকি ?)

—'কৃরূই, বরগ অমরপুরনি ছকফাইয়াখু' (নেই, তারা অমরপুর থেকে এখনো এসে পৌঁছয়নি)।

—'নরগ তাঙগৃই হাইকে তঙছূলা ?' (আপনারা এমনভাবে আছেন কেন ?)

'তাম' খূলাইছিনাই ? কেরচি-ব থপছাফান' কৃরূই নগ', মোম থূইতূই থূইতূই, হাইকে রকউইতঙগতা হামারিছঙন তৃইউই ।' (কি আর কোরবো, এক ফোঁটা কেরোসিন নেই ঘরে, মোম ও নিবু নিবু, তা এভাবেই শুয়ে আছি হামারীদের নিয়ে)।

এরপর আমার মাউই নগেন্দ্রবাবুর মা লেপের ভেতর থেকে উঠে বসলেন কোনোরকমে, তাঁর দু'পাশে নগেন্দ্রবাবুর ছেলে কাহামনুক (সুদর্শন) ও মেয়ে হামারী (কল্যাণময়ী)। কপালের কাছে হাত রেখে আমার স্ত্রীকে চেনার চেষ্টা করলেন তিনি, তারপর জিজ্ঞেস করলেন - 'বাহাই তঙ মাইঅ, আগিনি ছাই কাহাম দি বা ?') (কেমন আছো মা, আগের থেকে ভালো তো ?)

উত্তর দিলেন আমার স্ত্রী 'আগিনি হাই বৃলা' (আগের মতোই তো)। তারপর আমার স্ত্রীকে আধো অন্ধকার আধো আলোয় তাঁর কাছে চোখ এনে বললেন, "আগিনিছাই কিছা কাহাম নুক বৃলা নন', মুখাঙরগ রামপূরা রামপূরা উঙখা কিছা, খরাঙ-ব আগিনি হাই হিলিক কৃরূই, হামদি হামদি, দাতি হামবাইছিদি' (আগের চেয়ে কিছুটা ভালো দেখছি তো তোমায়, মুখটাও শুকনো শুকনো হয়েছে কিছু, গলার স্বরও আগের মতো ভার নেই, ভালো হও ভালো হও, তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠো)।

এরপর মাউইকে বললাম আমি, " চুঙ থাঙচিনু দ, মাউই, তিনি হর' মাইমুই ছঙলিয়া দা তাম?' (আমরা গেলাম আর কি মাউই, তা আজ রাত্তিরে ভাত-টাত রান্না করবেন না না কি) ?"

"ইক' থুবাইখাবৃলা বুছুকরগ, চাদা চান' ছিদ', চাতি ফাইকে নাইগূরানা' (এই তো ঘুমিয়ে পড়েছে নাতি-নাতনীরা সব, খাবে কি খাবে না ঠিক নেই, আলো এলে দেখবো আর কি)।"

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে অন্ধকারে পা বাড়ালাম আমরা। বংশী ঠাকুরের বৌয়ের বাইরের গেট দিয়ে রাস্তায় পড়তেই বললাম আমি আমার স্ত্রীকে -'দ্যাখো, ঘরে একটুও কেরোসিন নেই, বুড়ো মা আর বাচ্চা-কাচ্চা ছেলেমেয়েকে এভাবে রেখে নগেন্দ্রবাবু স্বামী-স্ত্রীতে শান্তির পদযাত্রা করতে গেছেন অমরপুরে? কী মন্ত্রিত্ব করলেন পাঁচ-পাঁচটা বছর ধরে ?'

" নুঙ হাই বৃলা কিচিঙ, কুনো ছারেগামা কৃরূই ' (তোমার মতোই তো বন্ধু, কোনো সারেগামা নেই)।"

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ । ভোর পাঁচটায় উঠে লিখলাম কিছুক্ষণ । ছ'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম ধলেশ্বরের দিদিশাশুড়ীর শ্রাদ্ধের চিঠি দিতে । অভয়নগরে বুদ্ধ দেববর্মার বাড়ি ভাড়া থাকেন আমার বড়োমামা শ্বশুরের ছেলে দা অমূল্য । দা অমূল্য (অমূল্য দা) ছিলেন না বাসায়, ছিলো তাঁর ছেলে পিতর । আমার বড়োমামা শ্বশুরের পরিবার খ্রীষ্টান হয়েছেন আমার বিয়ের সময় থেকে । তাই পৌত্রের

নাম হয়েছে পিতর। খ্রীষ্টান পিতরের হাতে তার হিন্দু প্রপিতামহীর শ্রাদ্ধের চিঠি দিয়ে বাসায় ফিরে দেখি অঘোর দেববর্মা বসে আছেন আমার অপেক্ষায়। তিনি এসেছিলেন এ পাড়ায় কিছু চাঁদা তুলতে লালসিংমোড়া গাঁওসভার মহিলা প্রধান মন্দোদরী দেববর্মাকে দিল্লী পাঠানোর জন্য। মন্দোদরী ফেব্রুয়ারীর ৬ তারিখে সাহানা সেনগুপ্ত ও দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তের সঙ্গে দিল্লী যাবেন ভারতের গণতান্ত্রিক মহিলা ফেডারেশনের সম্মেলনে যোগ দিতে।

অঘোরবাবু বললেন, 'এ ক'খানা ছবি পেয়েছি গোপাল ঠাকুরের জামাই সুরেশ মাস্টারের কাছ থেকে। ছবিতে রামঠাকুরের সঙ্গে উঁআখিরাই ঠাকুরের ছবি আছে ত্রিপুরা বোর্ডিঙের। ১৯৩৬ সালের তোলা ছবি। ছবিখানা আমার গণমুক্তি পরিষদের ইতিহাসের সঙ্গে দিতে হবে। তাঁকে পেলাম না, বলবেন আমি এসে গেছি, তাড়াতাড়ি যেন দিয়ে দেন।' বলেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দোতলা থেকে নেমে চলে গেলেন নাজির পুকুর পাড়ে উপজাতিদের শিক্ষার পথপ্রদর্শক রামকুমার ঠাকুরের পৌত্র প্রমোদ দেববর্মাব বাড়ি।

এগারটা নাগাদ বেরিয়ে চলে গেলাম সেক্রেটারিয়েটে আমার খুড়শ্বশুর বীরকুমার দেববর্মার সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে দেখেই বললেন তিনি — 'সেদিন অঘোর দেববর্মা আর ডাঃ নীলমণি দেববর্মা কেন গিয়েছিলেন হেরমায়?'

—'গণমুক্তি পরিষদের মিটিং করতে গিয়েছিলেন বাঁশতলীতে সেনকুমার দেববর্মার বাড়ি। ফিরে যাবার পথে হেরমায় এসে যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করে গেলেন। যোগেন্দ্রবাবু তো গণমুক্তি পরিষদের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির মেম্বার ছিলেন।'

—'আচ্ছা, যাকগে সে কথা, সেদিন কাকা কোশা (কোশা কাকা)'র শ্রাদ্ধে কত মাইরুঙ (চাউল) উঠেছে আমাদের গ্রাম থেকে জানো? প্রায় আড়াই মন। এতো যে উঠবে ভাবতেই পারিনি। সুবল আর আমি নেমে পড়েছিলাম মাইরুঙ তুলতে।' উত্তরে বললাম, "আপনারা হলেন হেরমা গ্রামের মূল লোক, আর তো সব ঘরজামাই, আমিও তাই। আপনাদের দেখলে চাউল একটু বেশী করে দেয় সবাই।" হাসলেন তিনি আমার কথা শুনে।

৪ঠা মার্চ, ১৯৯৫। ভোর সাড়ে পাঁচটায় রাস্তা থেকে ডাক দিলেন নগেন্দ্র জমাতিয়া। 'কুমুদবাবু উঠেছেন?' তখনো আমি বিছানায়, ধড়মড় করে উঠে একতলায় নেমে গেট খুলে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন বুঝি?'

—'না, যাবো একটু বঙ্গ দেওয়ানের বাড়ি, জয়ন্তকে বাড়িভাড়ার টাকাটা দিয়ে আসি। তা আপনি যাবেন নাকি আমাদের সঙ্গে? আর, কালতো গেলেন না প্রেসক্লাবে বীরেন দত্তর স্মরণসভায়?'

'না, মানে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি।'

—'জানেন, যা বললাম ভূপেন দত্ত ভৌমিক আর আমি। আমরা দু'জনে অনেকক্ষণ বলেছি। আর কই, অঘোরবাবুও তো তেমন কিছু বললেন না, ভেবেছিলাম, বীরেনবাবুর ওপর অনেক কিছু বলবেন তিনি। শুধু অঘোরবাবু না, ডাঃ নীলমণি দেববর্মাও বীরেন দত্তর ওপর আলোকপাত করলেন না বিশেষ কিছু।'

—'গতকাল ত্রিপুরা দর্পণে তো নীলমণিবাবুর বড়ো একটা লেখা বেরিয়েছে বীরেন দত্তর ওপর, তাই বোধহয় বেশী কিছু বলেননি।'

—'তা হতে পারে। আমরা তাহলে যাই, যাবেন নাকি, দেওয়ান বাড়ি, একসঙ্গে মজা করে চা খাওয়া যাবে।'

—'আপনারা এগোন একটু, বাথটা সেরে ধরবো আপনাদের।'

নগেন্দ্র জমাতিয়া তাঁর বডিগার্ড নিয়ে পা বাড়ালেন সুপুরিবাগানে দেওয়ান বাড়ির দিকে। খুব তাড়াতাড়ি বাথরুমের কাজ সেরে সোজা চলে গেলাম বঙ্গ ঠাকুর দেওয়ানের বাড়ি। গেটের সামনে পৌঁছতেই দেখি বঙ্গ দেওয়ানের নাতি (পৌত্র) জ্যোতিষবাবু বেড়ার গেটের তালা খুলছেন।

—'আরে কুণ্ডু সাহেব, নমস্কার নমস্কার।'

—'নমস্কার নমস্কার, প্রাতঃনমস্কার দেওয়ান সাহেব; তা কী ব্যাপার বলুন তো, নগেন্দ্র জমাতিয়া এলেন আমার আগে আগে, কোথায় উধাও হলেন তিনি।'

—'কোথায় আর উধাও হবেন, লোকটা তো মূল্যবান, কেউ দেখেছে হয়তো প্রাক্তন মন্ত্রীকে, ডেকে নিয়ে গেছে চা খাওয়াতে। ভেতরে আসতে আপনার আজ্ঞা হোক, ঠিক এসে যাবেন নগেন্দ্র জমাতিয়া ত্রিপুরার ভাবী মুখ্যমন্ত্রী।'

—'কি করে বুঝলেন ভাবী মুখ্যমন্ত্রী ?'

—'দশরথের পরে আর ট্রাইবেল নেতা কই ? নগেন্দ্র জমাতিয়াই তো। পারবে পারবে, লোকটা বাঙালি-উপজাতি নিয়ে চলতে পারবে। আর যে লেখা লিখেছে দৈনিক সংবাদে ক'দিন আগে উপজাতি সমস্যার সমাধান নিয়ে, মুখ্যমন্ত্রীর পদ আর যায় কোথায় ?'

—'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু কোথায় গেলেন তিনি আপনার ভাবী মুখ্যমন্ত্রী, এখনো তো এলেন না।'

—'এই নিন চেয়ার, উঠোনে খোলা জায়গায় বসে ভোর বেলার হাওয়া খান। আমি ততক্ষণ দেওয়ান গৃহিণীকে তুলে চায়ের অর্ডার দিই। নগেন্দ্র জমাতিয়া বলে কথা।'

দেওয়ান পৌত্র জ্যোতিষ দেববর্মা ঘরে ঢুকতেই আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পাশ দিয়ে একটু এগিয়ে গেলাম অন্দরের দিকে দেওয়ান পুত্র জয়ন্তর পোল্ট্রি ফার্ম দেখতে। মাস দুয়েক আগে নগেন্দ্রবাবু আর আমি তার কাছ থেকে মোরগ নিয়েছিলাম তরতাজা দেখে। জয়ন্ত ইঞ্জিনীয়ার, পোল্ট্রি করা তার হবি। নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তার খুব ভাব। বংশী ঠাকুরের বৌয়ের বাড়িভাড়া সে-ই নেয় নগেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে। বংশী ঠাকুরের প্রথম বৌ মারা গেছেন গত বছর। তারপর থেকে সে-ই বিজয়কুমার চৌমুহনীর বাড়িটার তত্ত্বাবধায়ক। বংশী ঠাকুরের প্রথম পক্ষের একটি মাত্র মেয়ে। কোনো ছেলে নেই প্রথম সংসারে। মেয়ের বিয়ে হয়েছিলো সি. পি. এম-এর বজবজের জাঁদরেল এম. এল. এ ক্ষিতি বর্মণের সঙ্গে। তিনি থাকেন নিউ আলিপুরের বাড়িতে। জয়ন্তর বাবা জ্যোতিষ দেববর্মার আপন মাসী হলেন বংশী ঠাকুরের প্রথম বউ। সেদিক থেকে জয়ন্ত হচ্ছে তাঁর নাতি। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম জয়ন্তর বাঁশের ঘরের পোল্ট্রি ফার্ম। এমন সময় জ্যোতিষবাবু এসে ডাকলেন, 'আসুন কুণ্ডু সাহেব, দেওয়ান গৃহিণী শয্যাত্যাগ করেছেন, চলুন ঘরে গিয়ে বসুন।'

ঘরে গিয়ে বসতেই একটা টেলিগ্রাম চোখে পড়লো টেবিলের ওপর। টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছে জ্যোতিষবাবুর ছোটো ছেলে বিহারের সিন্ধ্রি আই. আই. টি কলেজ থেকে। ছোটো ছেলে জগদীশ সেখানে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে।

—' আচ্ছা, দেওয়ান সাহেব, জগদীশ কবে আসছে, ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে ?'

—'জগদীশ দেববর্মা আর আসবে না ত্রিপুরার এই কাটাকাটির দেশে। ইঞ্জিনীয়ারদের বড়ো ভয় ত্রিপুরায়, কখন উগ্রপন্থীরা কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় তার ঠিক আছে ? আমরা গরীব মানুষ, রাজার দেওয়ান বঙ্গ ঠাকুরের দশ কানি জমির মধ্যে আছে মাত্র পাঁচ গণ্ডা জমি, কিডন্যাপিঙের লক্ষ লক্ষ টাকা দেবো কোত্থেকে ? জয়ন্তও এম. ই. দেবে, চাকরি পেলে সেও চলে যাক ত্রিপুরার বাইরে। আমরা সব চলে যাবো, তিপ্রা-বাঙাল কাটাকাটি, কবে গলা কাটা যায় তার ঠিক আছে ? জানেন, আশির দাঙ্গার

পর ছ'মাস ঘরে থেকে বেরোয়নি আমি। জয়ন্ত, জগদীশ আর চন্দ্রা, ছোটো ছোটো তখন, মরো মরো অবস্থা তাদের। জানেন ডাঃ সুজিৎ দে বাঁচায় তাদের, বুঝলেন, ভগবানতুল্য ডাক্তার, শিশুদের ডাক্তার তাঁর মতন একজনও নেই আগরতলায়।'

এমন সময় জ্যোতিষবাবুর মেয়ে চন্দ্রা চা নিয়ে আসে।

'কি চন্দ্রা, তুমি ও কি চলে যাবে ত্রিপুরা ছেড়ে?'

— ' চন্দ্রা যাবে কি করে এদেশ ছেড়ে, নগেন্দ্র জমাতিয়া যে চাকরি দিয়েছে' তা সে শুধু থাকুক এখানে, আমরা মেয়ের বাড়ি আসবো আগরতলায়।' দেওয়ান গৃহিণী পানের বাটা নিয়ে আসেন আমার সামনে।

— 'কি, দেওয়ান সাহেবের কথা শুনেছেন? আপনি বাঙালি, দেওয়ান সাহেব তিপ্‌রা, আছেন তো ভালোই, তিপ্‌রা-বাঙালি এক সঙ্গে ঘর করছেন, তবে আর এদেশ ছাড়া কেন ? এভাবেই চলুক।'

—'আপনার দেওয়ান সাহেব উড়ুন, বাঙালির দেশে যান, রাজার দেওয়ানের ত্রিপুরায় আমি থাকবো।'

— ' আপনাদের রসিকতা সবই বুঝলাম, কিন্তু দেওয়ান সাহেবের ভাবী মুখ্যমন্ত্রীর তো পাত্তা নেই, আমি উঠলাম, আমারও তো তিপ্‌রা বৌ নিয়ে সংসার, পান থেকে চুন খসলে উপায় নেই, বাজার-ঘাট আছে, চলি, কেমন ?'

বঙ্গ ঠাকুর দেওয়ানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলাম ত্রিপুরা দর্পণ অফিসে। গতকাল কমিউনিস্ট নেতা বীরেন দত্তর ৮৫তম জন্ম দিবসে প্রেস ক্লাবের স্মরণসভায় কে কী বলেছেন, বিশেষ করে নগেন্দ্র জমাতিয়া ও ভূপেন দত্ত ভৌমিক কী বলেছেন প্রয়াত নেতা সম্পর্কে তা জানার জন্যে পত্রিকা খানা খুললাম খুব আগ্রহ সহকারে। খুলে দেখি, কাগজের প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো করে লেখা হয়েছে 'বীরেন দত্তর ৮৫তম জন্মদিবস পালিত ঃ যুব সমিতির বর্তমান নেতৃত্বের অনেকেই একসময় কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলেন' — নগেন্দ্র জমাতিয়া। হেডিংটি দেখে ভেতরের খবরটা পড়তে শুরু করলাম সোৎসাহে — ''বর্তমানে যাঁরা যুব সমিতির নেতৃত্বে রয়েছেন তাঁদের অনেকেই একসময় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা কমিউনিষ্ট পার্টি ছেড়ে চলে যান। কমিউনিষ্ট পার্টির দুর্বলতার কারণেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিলো। রাজ্যে জাতি-উপজাতি ঐক্যের জন্য আজ থেকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে বীরেন দত্ত যা ভেবেছিলেন রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে তা আবার নতুন করে ভাবার সময় হয়েছে।' এ কথাগুলো বলেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও যুব সমিতির প্রবীণ নেতা নগেন্দ্র জমাতিয়া। রাজ্যের প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা বীরেন দত্তর ৮৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় অন্যতম বক্তা হিসাবে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় রাজনৈতিক দলগুলি শুধু ভোটের রাজনীতিই করে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই চায় ক্ষমতায় টিকে থাকতে। অর্থ সরকারী প্রশাসনকে এই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ব্যবহার করা হয়। কি করে নির্বাচনে জেতা যায় তার চেষ্টা চলে। সাধারণ মানুষের কথা ভাবে না। এই আলোচনাসভায় বিষয় ছিলো 'সমকালীন রাজনীতির দ্বন্দ্ব উত্তরণের প্রয়াস'। প্রেসক্লাবে আজ বিকেলে এই স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত । স্মরণসভার শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তিথি দেববর্মণ। বীরেন দত্তের স্মৃতিচারণা করে ও সমকালীন রাজনীতির দ্বন্দ্ব ও তার উত্তরণের পথ নির্দেশ করে আলোচনা করেন রাজ্যের জনশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম রূপকার আঘোর দেববর্মা, যুবসমিতির নেতা নগেন্দ্র জমাতিয়া, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নীলমণি দেববর্মা ও দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিক ।

অঘোর দেববর্মা জনশিক্ষা আন্দোলনের দিনগুলিতে বীরেন দত্তের ভূমিকার বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বীরেন দত্ত ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও অন্যতম রূপকার। ডাঃ নীলমণি দেববর্মাও জনশিক্ষা আন্দোলনের সময় বীরেন দত্তর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বীরেন দত্ত চাইতেন ত্রিপুরায় জাতি ধর্ম বর্ণ উপজাতি নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ যেন এক হয়ে বসবাস করেন। বীরেন দত্তের সম্পাদিত 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথা' পত্রিকাতেও এধরনের একটি লেখা ছাপা থাকতো। তিনি আরো বলেন, বীরেন দত্ত শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্বই ছিলেন না, তিনি একাধারে নাট্যকার, গল্পকার ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। ডাঃ দেববর্মা বলেন, আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বীরেন দত্তের সাহিত্যগুলো নিয়েও আলোচনা প্রয়োজন। দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিক স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট বিচার করে ত্রিপুরার আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করেন। তিনি এই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, উগ্রবাদী সমস্যা, আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় নিয়েও বিচার বিশ্লেষণ করেন।

সভাপতির ভাষণে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত বীরেন দত্তের কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচারের সাহসী ভূমিকার উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রস্তাব করেন রাজ্যে যেন অবশ্যই বীরেন দত্তের স্মরণে একটি ইনস্টিটিউশান স্থাপন করা হয়। এই ইনস্টিটিউশনে ত্রিপুরাব আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো, উপজাতি সমস্যা নিয়ে গবেষণা করা যাবে। তাছাড়া রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের উত্তরনের উপায় নিয়েও গবেষণা হবে।"

এক লহমায় বীরেন দত্তর ৮৫তম জন্মদিন পালনের খবরটা পড়ে দর্পণ পত্রিকাখানা বগলদাবা করে বাসায় ফিরে এলাম একটা কথা ভাবতে ভাবতে— বীরেন দত্তর স্মরণসভায় সি.পি.আই(এম)-এর কোনো বক্তা বক্তব্য রাখলেন না কেন? তাঁর হাতে গড়া সাধের সি.পি.আই পার্টিকে ভেঙে নতুন পার্টি সি.পি.এম করেছিলেন, এম.পি -মন্ত্রীও ছিলেন ওই পার্টির, তাঁর পার্টি রাজ্যক্ষমতায় আবার ফিরে এসেছে, অথচ তাঁর স্মৃতিতর্পণের দিনে কমরেড-বন্ধুরা অনুপস্থিত কেন? কেমন যেন হিসেবের গরমিল হচ্ছিলো আমার।

বাসায় ফিরে এসে গতকালের দৈনিক সংবাদ ও ত্রিপুরা দর্পণ নিয়ে বসলাম আবার। একইদিনে দুটি পত্রিকাতেই বীরেন দত্তর ওপর একাধিক লেখা বেরিয়েছে। ভাবলাম, লেখাগুলো পড়া দরকার আর ফাইলের মধ্যে গুছিয়ে রাখারও প্রয়োজন আছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে। দেখলাম দৈনিক সংবাদ-এ এই লেখাগুলো বেরিয়েছে ঃ

১। কমরেড বীরেন দত্ত ঃ একটি প্রাতঃস্মরণীয় নাম—শ্যামাচরণ ত্রিপুরা

২। কমিউনিস্ট আন্দোলনে আদর্শগত সংগ্রাম ও বীরেন দত্ত—অজয় বিশ্বাস

৩। বীরেন দত্ত ঃ কমিউনিস্ট আনোদলনের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব-সরোজ চন্দ

৪। সে দিনের ত্রিপুরায় যারা চাঞ্চল্য এনেছিলো—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

আর, ত্রিপুরা দর্পণে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত লেখাগুলো সমেত আরো দুটো লেখা প্রকাশ করা হয়েছে। তার মধ্যে দীর্ঘ লেখাটি লিখেছেন ডাঃ নীলমণি দেববর্মা, নাম, ' ত্রিপুরার প্রথম সারির কমিউনিস্ট নেতা বীরেন দত্ত।' অপরটি নিখেছেন নকুল দাস, 'বীরেন দত্ত যে জন্যে স্মরণীয়।'

লেখাগুলো পড়ে ফাইলবন্দী করছি, এমন সময় 'কুমুদ বাবু' বলে কে যেন ডাকছেন মনে হলো। দু'তলার বারান্দা দিয়ে রাস্তায় তাকিয়ে দেখি সঙ্গীত-শিল্পী মহেন্দ্র দেববর্মা আমার বাসা পেরিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমি জোরে ডাক দিলাম তাঁকে ঃ

—'মহেন্দ্র বাবু, ও মহেন্দ্র বাবু, কোথায় যাচ্ছেন ?'

—'আপনার বাসাটা খুঁজছি, ঠিক বের করতে পারছি নে।'

—'আসুন আসুন, এই বাড়িটাই তো, এইটাই তো দিলীপ দেবরায়ের বাড়ি।'

থামলেন মহেন্দ্র বাবু, পায়জামা-পরা হাতে ছাতা। নিচে নেমে গেলাম আমি। চোখ কাটিয়েছেন কিছুদিন হলো, ঠিক ঠাওর করতে পারেন না। হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে এলাম জ্ঞানতাপস ব্যক্তিটিকে। চেয়ারে বসতে দিলাম, আমি বসলাম চৌকিতে, দু'জনে মুখোমুখি আমরা।

—'আমি এলাম একটা পরামর্শ করতে।'

—'পরামর্শ করতে এলেন আমার সঙ্গে, তা কী ব্যাপার ?'

—'না, মানে, এ.ডি.সি সিদ্ধান্ত করেছে তারা রোমান হরফে ককবরক চালু করবে। আর রাজ্যসরকার ককবরকের বইপত্র লিখছে বাঙলা হরফে। তা কেমন যেন একটা বেসুরো ব্যাপার হয়ে গেলো না।'

—'বেসুরোই বটে। একই ভাষার দুটো আলাদা আলাদা লিপি।'

—'আমি বলছিলাম কি, আসুন আমরা বুদ্ধিজীবীরা রোমান হরফের বিরুদ্ধে একটা বিবৃতি দিই। বাঙলা হরফ দীর্ঘদিনের পরিচিত হরফ আমাদের, সেই হরফ ছেড়ে রোমান হরফ নিলে ককবরকভাষীদের ক্ষতিই হবে। কাজেই' —'দেখুন, মহেন্দ্র বাবু, আমরা যে দিন থেকে এই ভাষার গবেষণা করছি, সেই দিন থেকেই ককবরকের জন্যে সংশোধিত আকারে বাঙলা হরফের সুপারিশ করে আসছি আমরা। ১৯৭২ সালে ডঃ সুহাস চ্যাটার্জীর নামে 'ত্রিপুরার ককবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ' যে বই বেরোয়, সেখানে ককবরকের জন্যে বাঙলা হরফ কেন প্রয়োজন, তার ব্যাখ্যা দিয়েছি আমরা। কাজেই, নতুন করে আর কি বলবো, বলুন ?'

—'না, মানে, আমি বলছিলাম আরকি, বই-পত্রে যা লিখেছেন, সেটাই বলুন একটা বিবৃতির মাধ্যমে, সকলে জানুক, বিষয়টা ভালো করে।'

—'দশরথ কী বলেন ? উনিই তো রোমান হরফের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে পারেন একটা; তাছাড়া, উনি মুখ্যমন্ত্রী; ওঁর বিবৃতিই সবথেকে কাজে লাগবে; আপনি বরঙ যান ওঁর কাছে।'

—'ভালোই বললেন কথাটা, কিন্তু দশরথও তো আপনার মতো বলবেন, আমিও তো বই লিখেছি একখানা রোমান হরফের বিরোধিতা করে, নতুন করে আর কী বলার আছে ?'

—'দেখুন, মহেন্দ্রবাবু, ককবরকের জন্যে বাঙলা হরফ না রোমান হরফ—এ দ্বন্দ্বটা বহুদিনের। শুধু ককবরকের জন্যে বাঙলা হরফ চাই বা রোমান হরফ চাই একথাটা বলাই যথেষ্ট নয়। আমরা ফলিত ভাষা বিজ্ঞানের আলোকে বলেছি ককবরকের জন্যে বাঙলা বর্ণমালার সব অক্ষর দরকার নেই, সংশোধিত আকারে বাঙলা বর্ণমালা নিতে হবে; আর, সেটা হবে ককবরকের নিজস্ব বর্ণমালা। তাছাড়া, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে গবেষণা করে আমরা ককবরকের জন্যে সুন্দর একটা বানান পদ্ধতি করেছিলাম, কিন্তু সেটা দশরথ বাবু মানলেন কই ? উনি পাল্টা একটা বই লিখলেন 'ককবরক-ছৗরৗঙ' নামে। তাতে 'অদ্ভুত সব অক্ষর নিয়ে এলেন, আর বানান পদ্ধতি করে ফেললেন কিম্ভুত কিমাকার; আর সেটাই চলে গেলো ককবরকের বই-পত্রে—তা দিয়ে না পারে ছাত্ররা পড়তে, না পারে মাস্টাররা পড়াতে। আমার ধারণা, ডঃ চ্যাটার্জীর 'ত্রিপুরার ককবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ' বইটা যদি দশরথ অনার করতেন, আর বই-পত্র যদি সেইভাবে লেখা হতো, তাহলে রোমান হরফের ব্যাপারটা এতটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো না।'

এমনসময়, আমার ছোটো মেয়ে দেবযানী চা এনে দিলে মহেন্দ্র বাবুর জন্যে। চায়ের কাপে চুমুক

দিতে দিতে বললেন তিনি —'বুঝলাম আপনার কথাসব, কিন্তু এখন যে বড়ো বিপদ, ককবরক তো মারা যায় হরফ-দ্বন্দ্বে পড়ে। রাজ্য সরকার পড়াবে বাঙলা হরফে, আর স্বশাসিত জেলা পরিষদ পড়াবে রোমানে, এটা তো হয়না; এই করে আমরা তো দুটো শিবির করে ফেলছি। বাঙলা ককবরক পাশাপাশি থাকবে, আর তার জন্যে একই হরফ তো ভালো, কতো পরিচিত হরফ বাঙলা আমাদের। এই হরফ দিয়ে সারা জীবন ককবরক লিখলাম, ইয়াপ্রি পত্রিকা চালালাম, এতো পরিচিত হরফ ছেড়ে দিয়ে রোমান হরফ নিলে ককবরকের ক্ষতি হবে; একটাই হরফ দিয়ে আমরা ট্রাইবাল-বাঙালি লেখাপড়া করবো, মিলঝুল করে থাকবো, আমাদের একটা ঐতিহ্য আছে, সেই ঐতিহ্য নষ্ট করা উচিত হবেনা, কুমুদ বাবু।'

—'মহেন্দ্র বাবু, আপনার যুক্তি, আপনার আবেগ সবটাই ঠিক, কিন্তু ভুলভাবে ককবরক চালু করে এখন যে ঢাকী সমেত মনসা বিদায় হতে যাচ্ছে।'

হঠাৎ পাশেব পর্দার আড়াল থেকে আমার খুড়শাশুড়ী সি.পি.এম-এর নেত্রী জ্যোৎস্না দেববর্মা ককবরকে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন— 'নরগ বাই মালাইনা ফাইমানি, আ ছমিতিনি বেপার তাম' উঙখা' বুই জালগীইতঙগ' বীলে আন' (তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, সমিতিটার ব্যাপার কী হোলো, লোকেবা জ্বালাতন করছে আমাকে)।

মহেন্দ্র বাবু আমার গ্রাম থেকে আসা আমার শাশুড়ীর কথা শুনে বললেন—'শাশুড়ী জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চান, কাজেই আমাকে উঠতে হয়। যাই, দেখি, রবি চক্রবর্তীর বাড়ি; তার কাছ থেকেও রোমান হরফের বিরুদ্ধে একটা সই নিতে হবে।'

—'ঠিক আছে, মহেন্দ্র বাবু, আপনি তো আমাদের স্ট্যান্ড জানেন, এগিয়ে যান, আপনি তো সান অফ্ দা সয়েল, এগিয়ে যান।'

দামী ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে পড়লেন তিনি। নিচের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিদায় জানালাম তাঁকে। উনি চললেন এ্যাডভাইসর চৌমুহনীর দিকে রবি চক্রবর্তীর সন্ধানে।

ওপরে উঠে বসলাম শাশুড়ীর মুখোমুখি। —'দ, ছাদি কাকী, তাবুক আঙ তাম' খীলাইছিনাই ?' (আচ্ছা, বলুন কাকী, এখন আমি তাহলে কী করবো ?)

—''নরগ(ককবরক ভাষায় শাশুড়ী জামাইকে বা জামাই শাশুড়ীকে সম্বোধন করার সময় গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করে থাকেন। নূঙ (তুমি) না বলে নরগ (তোমরা) বলেন।)তিনি থাঙদি বিছালগর' কিছা নিনি কাকা বাই। আ ইনদাছতিরি অফিচার বাই মালাইউই, ব তাম' হীন, ছমিতিনি ছামুঙরগ বাহাইকে দাতি মানাই, আ ককরগ ছালাই ফাইছিদি। নহালা, চিনি কামিনি বীরীইরগ আন' জালকছকখা'' (তুমি আজ তোমাব কাকার সঙ্গে বিশালগড়ে একটু যাও। ওই ইন্ডাস্ট্রি অফিসারের সঙ্গে কথা বলে দেখ সে কি বলে ? সমিতির কাজকর্ম কীভাবে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়, সেইসব বলে এসো। দেখনা, আমাদের পাড়ার মেয়েরা আমাকে জ্বালাতন করে শেষ করছে।'

৭ই জুন ১৯৯৫। আজ আমার পুত্র শ্রীমান সুরঞ্জনকে নিয়ে সকাল ৬.৩০ এ আগরতলা-গৌহাটির বাসে গৌহাটির দিকে রওনা হবো। সুরঞ্জনের কানের চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় যাচ্ছি। সে তার M.A. (in English)'র বইপত্রও কিনবে কলকাতা থেকে। খুব ভোরে আমার স্ত্রী উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বড়ো মেয়ে তানিয়াও। উদ্দেশ্য একমুঠো গরমভাত খাইয়ে আমাদেরকে রওনা করিয়ে দেবেন। ঠিক ছ'টায় বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে মাত্র দু'হাজার টাকা। আমার স্ত্রী শ্রীমতী ফুলকুমারী ও বড়োমেয়ে তানিয়া ও ছোটমেয়ে দেবযানী আমাদের হাসিমুখে রওনা করেদিলে। তবে আমার স্ত্রীকে কিছুটা বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। আমার ছোট শালা বিমল আমাদের কৃষ্ণনগরের TRTC স্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিলে।

সেখানে গিয়ে আমাদের লেখক বন্ধু শ্রীযুক্ত সন্তোষ রায়ের সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী-কন্যা ধর্মনগর যাচ্ছিলেন। তেলিয়মোড়ার চাকমাঘাটে এসে পুলিশ প্রহরা নিয়ে সব গাড়ি একসঙ্গে যাত্রা করল। বিকেল ২.৩০ এ বাগবাসায় একটা হোটেলে ভাত খেয়ে আসাম-মেঘালয়ের দিকে আবার যাত্রা শুরু হল। শিলচরের কাছাকাছি এসে আমাদের বাস জয়ন্তীয়া পাহাড়ে আস্তে আস্তে উঠতে থাকলো। জয়ন্তীয়া পাহাড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য দিনের শেষে অপূর্ব লাগছিল। সুরঞ্জন তার ক্যামেরা দিয়ে এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ও তুলল চলন্ত বাস থেকে। বৃষ্টি ও উগ্রপন্থীদের ভয় মাথায় নিয়ে রাত ১.৩০ নাগাদ আমরা শিলং পৌঁছলাম। তারপর সারারাত ধরে বাস চলল গৌহাটির পথে।

৮ই জুন ১৯৯৫ । খুব ভোরে ঝিমুনি ভাঙতেই দেখি গারো পাহাড় থেকে আমাদের বাস গৌহাটির পথে নিচে নামছে। দু'পাশের পাহাড় অনেকটা ন্যাড়ান্যাড়া লাগছিল, সেই সবুজের পাহাড় আর নেই। রাস্তার মাঝে ২ 'গরিব' গারো উপজাতিদের টংঘর খুব জীর্ণদশায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। মেঘালয়েব শেষ সীমা ও গৌহাটিব কাছাকাছি আসতেই কিছু ভাল বাড়ি-ঘর দেখা গেল। দেখা গেল একটা অতি সবুজ রাবার বাগান, ত্রিপুবারই মতো। সকাল সাড়ে ছ'টায় আমরা নেমে পড়লাম উলুবাড়িতে ত্রিপুরা ভবনে যাব বলে। সেখানে গিয়ে দেখি অব্যবস্থার চূড়ান্ত। ত্রিপুরা ভবনে Resident Commissionar Mr. S. K. Nandi দিল্লী পাড়ি দিয়েছেন। ভারপ্রাপ্ত অফিসার আসবেন ১০-৩০ টায়। Care taker ও নাকি ছুটিতে। জল নেই ৪দিন ধরে। একেবারে হতাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে গৌহাটি স্টেশানের কাছে বন্দনা হোটেলে উঠলাম। ময়ূর হোটেলে চেষ্টা করেছিলাম বন্ধুবর শান্তনু রায় চৌধুরীব কথামতো। কিন্তু সেখানে জায়গা পাইনি। হোটেল এসে স্নান সেরে বেলা ১১.৩০ টায় চলে গেলাম কামাখ্যা মন্দিরের বাসে করে। সুরঞ্জন অনেকগুলে ছবি তুলল মন্দিরের। মন্দিরের পশ্চিমে গেটের ছবি তুলতে বললাম তাকে। এই গেট ধরে মন্দিরের রাস্তা নেমে গেছে ব্রহ্মপুত্রের দিকে। পূর্বে নদীপথে এসে তীর্থযাত্রীরা এই রাস্তা দিয়ে কামরূপ-কামাখ্যার মন্দিরে আসতো। এখন এই রাস্তা প্রায় পরিত্যক্ত। মন্দির থেকে ফিরতে কাছারীতে নেমে পড়লাম। সুরঞ্জন ব্রহ্মপুত্রের তীরের কয়েকটা ছবি তুলল। শুষুক উঠতে দেখলাম ব্রহ্মপুত্রের জলে। ব্রহ্মপুত্রকে দেখে সুরঞ্জন তো অবাক। আমি তাকে বললাম, 'জানিস, এই ব্রহ্মপুত্রের ধাবে একসময় বোড়ো সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তোর মায়ের পূর্বপুরুষবা যিশুখ্রীষ্টের জন্মেরও আগে এখানে ছিলেন। তোর মাতৃভাষা ককবরক বোড়ো ভাষারই সহোদরা বোন। এই যে গৌহাটি শহর দেখছিস, এই শহরে আগে বোড়োরা থাকতেন। গৌহাটির এখন নতুন নাম হয়েছে গুয়াহাটি। ককবরকের কোয়াই বোড়োতে উচ্চারিত হয় গুয়াই। গুয়াই অর্থ সুপুরি। বোড়োরা আগে এই শহরে সুপুরির চাষ করতেন। আর হাতির প্রাচীন অর্থ ছিল বাগান। কাজেই গুয়াইহাতির অর্থ সুপুরির বাগান। পরে নৌকো করে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক এসে ব্রহ্মপুত্রের ধারের এই বোড়োদের কাছ থেকে সুপুরি নিয়ে যেত। আস্তে আস্তে বোড়োদের সুপুরি বাগানের কাছে সুপুরির হাট জমে গেল। কাজেই গুয়াইহাতির অর্থ পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল সুপুরিব হাট।' এই কথা শুনে সুরঞ্জন আমার দিকে তাকিয়ে রইল কৌতূহলী দৃষ্টিতে। হাঁটতে হাঁটতে গৌহাটি হাইকোর্টের কাছে চলে এলাম। পাশে সুন্দর একটা লেক দেখলাম।

৯ই জুন ১৯৯৫ । রাতটা বন্দনা হোটেলে কোনোমত কাটিয়ে সকাল ৫.৩০-এ গৌহাটি স্টেশনের দিকে রওনা দিলাম। কামরূপ একসপ্রেস ছেড়েছিলো ৭টায়। গাড়ি ইন করলো ৬.৩০-এ। এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো, কিন্তু লাভ হলো। দিমাপুর কলেজের এক বিহারী অধ্যাপক তার এক বন্ধুকে ইংরেজিতে নাগাল্যান্ডের অনেক কথা বলতে লাগলেন, আমি পাশে দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে সে-সব কথা শুনছিলাম। তাঁর মূল কথা ছিলো নাগারা বহিরাগতদের কাছে কীভাবে ঠকছে।

বাইরের ব্যবসাদার ও মহাজনরা কী নির্মম ভাবে তাদের না শোষণ করছে। পাশের ট্রাইবেল রাজ্যগুলোতে ওই একই অবস্থা এবং এই জন্যেই চারদিকে উপজাতি বিদ্রোহ হচ্ছে। গাড়ি ছাড়লো। আমরা ৬নং কোচের ৪০ ও ৪১ নং বার্থ পেয়েছিলাম। আমাদের পাশে ছিলেন ত্রিপুরার এগ্রি-অফিসার ধ্রুব পাল। ধর্মনগরে থাকেন, রবীন্দ্রনাথ প্রামানিক (দুর্গানগর, দমদম ক্যান্টনমেন্ট), আশিস চক্রবর্তী (শিলং সেক্রেটারিয়েট অফিসার)। রবীন্দ্রনাথ বাবু কাছাড়ের পাঁচগ্রাম পেপারমিলে ইনটারভিউ দিতে গিয়ে ছিলেন। সাড়ে ১১টায় নিউবনগাঁও এলো-পাশেই কোকরাঝাড়, বোডো আন্দোলনের জায়গা। পুত্র সুরঞ্জনকে বললাম, আমার কী মনে হয় জানিস, ত্রিপুরার 'কক' (ভাষা) শব্দের সঙ্গে কোকরাঝাড়ের 'কোকরা'র মিল আছে। তোর মাতৃভাষা ককবরকে 'কক-কৃরাক' এর অর্থ শক্ত শব্দ। এই 'কক-কৃরাক'ই ককবরকের সহোদরা ভাষা বোডোতে 'কোকবা' হয়েছে। সে আমার কথা শুনে বলল, বাবা, আমি ইংলিশে এম এ পাশ করার পর Linguistics (ভাষাবিজ্ঞান)-এ আবার একটা এম পড়বো। বিকেলের দিকে এলো নিউকুঁজবিহার- কোচ উপজাতিদের রাজ্য। ত্রিপুরা থেকে কুঁজবিহার পর্যন্ত উপজাতি রাজ্যগুলোর ভৌগলিক অবস্থান বেশ পরপর মনে হলো। উত্তরবঙ্গের মাটি বেশ কালো। শুধু পাট আর পাট। রাত ১১-৩০টায় ফারাক্কায় এলো। সুরঞ্জনকে ফারাক্কা দেখালাম। বিকেলের দিকে আমাদের পাশের একটি নাগা মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো অতিরিক্ত গরমে মেয়েটি যাচ্ছিল হায়দ্রাবাদে বাইবেল নিয়ে পড়াশুনো করতে।

১০ই জুন ১৯৯৫। ভোর পাঁচটায় আমাদের ট্রেন নবদ্বীপধামে এলো। নবদ্বীপ ধাম আসতেই ধর্মনগরের শ্রীযুক্ত কব তার ভাগ্নেকে নিয়ে সেখানে নামলেন। তিনি নবদ্বীপবাসী হবেন বলে জানালেন। ব্যান্ডেল আসতেই ধ্রুব পাল নেমে গেলেন। তিনি যাবেন কল্যানী তার ছোট বোনের কাছে, বোন সেখানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। সকাল ৮টায় কামরূপ একসপ্রেস হাওড়ায় ইন করলো। আশিসবাবু ও তার স্ত্রী-পুত্র-শ্যালিকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীযুক্ত প্রামানিকের সঙ্গে সুরঞ্জন ও আমি বেরিয়ে পড়লাম শিয়ালদার বাস ধরতে। তারপর শিয়ালদা থেকে দত্তপুকুর লোকালে রওনা দিলাম নববারাকপুর। রবীন্দ্রবাবু দুর্গানগরে নেমে গেলেন, আমরাও একটু পবে নামলাম নববারাকপুর। নববারাকপুরের মাড়োয়ারী বাগানের বাড়ি ঢুকতেই সকলে তো অবাক। বিকেলে রূপাদের বাড়ি গেলাম। রূপার আগরতলায় বিয়ে হয়েছে শ্রীমান জয়ন্ত গুপ্তর সঙ্গে। সে আমাদের মেয়েব মতো।

১১ই জুন ১৯৯৫। আজ রবিবার। সকালে উঠে নববারকপুর স্টেশনে গিয়ে টেলিগ্রাফ পত্রিকা কিনলাম। তারপর মুক্তি (সুরঞ্জন) ও আমি স্নান সেরে পাশে সেজদার বাড়ি গিয়ে ফেনা ভাত খেলাম। তারপর মেজদার বাড়ি ফিরে এসে বারসতের ট্রেন চেপে গেলাম ছোটদি (নীলিমা পাল)'র বাড়ি। ছোটদি ও ভাগ্নেরা (ধ্রুব ও গোবিন্দ) আমাদের দেখে তো অবাক। দুপুরে ভাগ্নী সন্ধ্যার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেলাম। বিকেলে এলাম বালিগঞ্জ গার্ডেনস-এর ১১৫ এ'র বন্ধুবর স্বপন বসুর বাড়ি। সেখানে সরস্বতী (সরস্বতী মিশ্র) দির সঙ্গে আগের থেকে Appointment ছিলো। বৃষ্টিতে আমাদের পৌছতে দেরি হওয়ায় সরস্বতীদি অপেক্ষা করে বাড়ি চলে গেছেন। স্বপন বসুর বাড়িতে আমাদের বাপ-পুতের ঠিকানা এখন। স্বপনের মেয়ে চিনি ও তার মা (বৌমা) আপ্যায়ন করলো আমাদের। স্বপন এলো সাহিত্য পরিষৎ থেকে রাত ৮ টায়। রবি মামা না থাকায় তাঁর ঘরেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। রাত্তিরে বাপ-বেটায় দারুণ ঘুম দিলাম।

১২ই জুন ১৯৯৫। আজ সোমবার। স্বপন বসুর বাড়ি। বৌমা (স্বপনের স্ত্রী)'র থেকে চা-জলখাবার খেয়ে সকাল ৭.৩০ -এ গেলাম আমার বন্ধু অধ্যাপক কমলেন্দু গাঙ্গুলি ও বন্ধুপত্নী উষা

গাঙ্গুলিব বাড়ি (২৪/GC Garcha 1st Lane)। কমলদা আমাব ছেলেকে দেখেই বললেন, 'তোমাব ছেলে তো নকশাল। সে ক'মাস আগে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিল। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস কবেন সে।' তাবপব কমলদা তাকে কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো থেকে শুরু কবে বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলন বোঝালেন। পবপব লোক আসতে থাকায় আমবাও তাডাতাডি উঠে পডলাম সেখান থেকে। একটু পবেই এলাম স্বপন বসুব বাড়ি। স্বপন বললো, 'তোমবা একবাব নন্দনে যাও, সেখানে শক্তি চটোপাধ্যাযেব কবিতাব ওপব ছবি এঁকে পূর্ণেন্দু পত্রী exhibition কবছেন, আজই শেষ দিন।' দুপুবে খেয়েই নন্দনেব দিকে পা বাডালাম। নন্দনে যেতে বাসেব মধ্যে আমাব শান্তিনিকেতনেব CRESSIDA'ব কলিগ ডাঃ উদিতা চ্যাটার্জিব সঙ্গে দেখা হলো। উদিতা কবি বীবেন্দ্র চট্টোপাধ্যাযেব পুত্রবধূ। নন্দনে গিয়ে দেখি গতকালই Exhibition শেষ কবে পূর্ণেন্দু পত্রী ছবিগুলো নিযে আমেবিকা পাডি দিযেছেন। নন্দনেব পাশে বাঙলা আকাদমি। সেখান থেকে সুকুমাবী ভট্টাচার্যেব লেখা সুনীতি কুমাবেব জীবনী কিনলাম। তাবপব হাঁটতে হাঁটতে গেলাম পার্কস্ট্রিটেব মোডে এশিযাটিক সোসাইটিতে। সেখানে গিয়ে বিসার্চ স্কলাব প্রতিভা মন্ডলকে খুঁজলাম। কিন্তু পেলাম না। সেখান থেকে বেবিযে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম নিউ মার্কেট। সুবঞ্জনকে নতুন-পুবনো নিউ মার্কেট ঘুবে ঘুবে দেখালাম। নিউ মার্কেট এব চাব তলায এশিযাটিক সোসাইটিব Sales Counter খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। নিউ মার্কেট থেকে বেবিযে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম নিউ সিনেমা'ব কাছে ২নং মদন স্ট্রিট (Madan St)-এ Dr B K Roy Choudhury'ব চেম্বাবে। তিনি সুবঞ্জনেব কানদেখে বললেন তাব বাম কানেব পর্দাব মাঝখানে একটা বডো ফুটো হযেছে, operation কবতে হবে। আব এই ফুটোব জন্যে সে কানে কম শোনে। তাবপব পাঠালেন নিচে C C Saha'ব দোকানে সুবঞ্জনেব Hearing Test কবাব জন্য। সেখানে Audiologist দেবাশিস সাহা তাব Hearing test কবে বললেন, ডান কান খুবই ভালো, কিন্তু বাম কান বেশ খাবাপ। ওপবে এসে ডাক্তাব বাবুকে Hearing test এব বিপোর্ট দেখালাম। ডাক্তাব বাবুকে বলে এলাম, '২০ শে জুন আগবতলা থেকে আমাব টাকা আসবে। তাবপবেই আপনাব সঙ্গে যোগাযোগ কববো।' সুবঞ্জন বললো, 'বাবা এখন operation থাক। পুজোব সময এসে কববো।' ডাক্তাববাবু শুনে বললেন, 'এখন কান dry আছে, এখনই কবে নেযা ভালো।' আমি বললাম, 'আমি তাকে বোঝাবো।' তাবপব চলে এলাম যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালযে অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তীব জনসেবা পবিষদেব অফিসে। এবং তাঁকে সব জানালাম।

১৩ই জুন, ১৯৯৫। সকাল বেলায স্বপনেব বাড়ি থেকে বেবিযে যাদবপুব এলাম। তাবপব জনসেবা পবিষদে বসে একান্তে গোপাল বাবুব সঙ্গে সুবঞ্জনেব operation এব ব্যাপাবে আলোচনা কবলাম। তাবপব সেখান থেকে চাডলামেব ববীন্দ্র চক্রবর্তীব হাতে হাত চিঠি পাঠালাম আগবতলায সমীবণ বায ও ফুলন ভট্টাচার্যকে শ্যামল ভট্টাচার্য ও কবি নকুল দাসেব কাছে সুবঞ্জনেব operation এব জন্যে টাকা পাঠাতে। বাডিতেও চিঠি পাঠালাম আমাব স্ত্রী সুকুমাবী দেববর্মাব কাছে। সব জানিযে লিখে দিলাম, ২০শে জুন লেখক শ্যামল ভট্টাচার্যেব কাছে দশহাজাবেব মতো টাকা পাঠাতে। আব আমি সমীবণ বাযকে ট্রাঙ্কলে সব বলবাব চেষ্টা কবলাম। কিন্তু লাইন পেলাম না।

১৪ই জুন, ১৯৯৫। আজ সুবঞ্জনকে নিযে স্বপনেব বাড়ি থেকে বেবিযে সকাল ৮টা নাগাদ গেলাম যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালযে অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তীব ওখানে। গিযেই তাকে পেযে গেলাম জনসেবা পবিষদেব অফিস ঘবে। খবব নিলাম আগবতলা থেকে ত্রিপুবা দর্পণের সম্পাদক সমীরণ রায কোনো ফোন কবেছিলেন কিনা। সমীবণ ফোন না কবায খুব উদ্বেগেব মধ্যে বইলাম। কিছুক্ষণ পবে ৯টা নাগাদ সুবঞ্জনেব আগবতলা (সুপুবি বাগান)'ব বন্ধু পলাশ বণিক এসে সুবঞ্জনকে তাদেব সন্তোষপুবেব

মেসে নিয়ে গেলো। আজ রাতে সে সেখানে থাকবে। পলাশ জর্জটেলিগ্রাফে পড়ে। দুপরের খাওয়া-দাওয়া সেরে স্বপনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিকেলে সুরঞ্জনের কানের ডাক্তার ডঃ বারীন কুমার রায় চৌধুরীর চেম্বারে গেলাম। তিনি সুরঞ্জনের কান অপারেশন করবেন ২৬/৬/৯৫ তারিখে গ্লোব নার্সিং হোমে জানালেন এবং একখানা slip দিলেন। রাতে যাদবপুরে এসে অধ্যাপক গোপাল বাবুকে সব জানালাম।

১৫ই জুন, ১৯৯৫। আজ সকাল ১০.৩০টায় সুরঞ্জন Tet. Vac. ইনজেকশন নিলো তার কান operation-এর জন্যে। আবার এই ইনজেকশন নিতে হবে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ পরে। আজ সকালে উঠে বৌমা (স্বপনের স্ত্রী)'র হাত থকে চা-জলখাবার খেয়ে যাদবপুর গেলাম সাড়ে সাত টার মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪নং গেট থেকে আগরতলায় সমীরণ রায়ের সঙ্গে S.T.D-তে কথা বলার চেষ্টা করলাম কয়েকবার। শুধু রিং হয়ে যায় কিন্তু কেউ ধরেনা। হতাশ হয়ে গোপাল বাবুর জনসেবা পরিষদের অফিসে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে সুরঞ্জন এলো পলাশের মেস থেকে। তাকে নিয়ে ৯-৩০ নাগাদ গেলাম যাদবপুর ৯নং কালী বাড়ি লেনের কবি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে। সত্যেন বাবুর সঙ্গে সুরঞ্জনের আজ appointment ছিলো। সত্যেন বাবু ত্রিপুরার জিরানিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের Geology'র অধ্যাপক। তিনি এবার আগরতলার বইমেলায় 'পাঁচজনের কবিতা' সংকলন করেছেন। সুরঞ্জন সেই পাঁচজন কবির মধ্যে একজন। সত্যেন বাবু সুরঞ্জনের কান operation-এর কথা শুনলেন এবং বললেন, '২৬ তারিখ যখন সুরঞ্জনের কান operation, তখন তার পরেই আগরতলা ফিরে যাবো। সুরঞ্জনের কান operation-এর সময় থাকবো আমি।' তাতে সুরঞ্জন অনেকটা অভয় পেলো। আবার ২৪শে জুন সুরঞ্জনকে তার ওখানে যেতে বললেন। সত্যেন বাবুর ওখান থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে সমীরণকে STD করলাম। টাকা-পয়সা পাঠানোর ব্যাপারে আলোচনা হলো। তাঁর সঙ্গে কথা বলে অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। গোপাল বাবুকে সমীরণের সঙ্গে কথাবার্তার কথা জানালাম। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে স্বপনের বাড়ি থেকে তিনটের সময় বেরিয়ে গ্লোব নার্সিং হোমে গিয়ে সুরঞ্জনের operation-এর জন্য ১০০ টাকা আগাম জমা দিলাম। তারপর সেখান থেকে পায়ে হেঁটে চলে গলোম কলেজস্ট্রিটের কফি হাউসে। সেখানে কফি খেয়ে আমরা বেবিদার 'Books'এর দোকানে গেলাম সুরঞ্জনের English M.A.'র বই কিনতে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে সেজদার শিয়ালদার Style Wear দোকানে এলাম। সেজদা সেখানে ছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে ৮.৩৭ এর লোকাল ধরে নববারাকপুরের বাড়ি ফিরে এলাম।

১৬ই জুন, ১৯৯৫। নববারাকপুরের মেজদার বাড়ি। সকালে মেজে বৌদির হাত থেকেচা খেয়ে নববারাকপুর রেলস্টেশনে গেলাম খবরের কাগজ কিনতে। একখানা 'আজকাল' ও একখানা 'Asian Age' কিনলাম। হকারের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, Asian Age নাকি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের। পত্রিকা নিয়ে সেজদার বাড়ি ফিরতেই মেজদার ছেলে নাড়ু (ইন্দ্রনাথ) এলো সুরঞ্জন ও আমাকে তাদের বাড়িতে দুপুরের নিমন্ত্রণ করতে। সকাল ৮.৪৭ এর মধ্যমগ্রাম লোকাল চেপে আমি গেলাম বিধাননগর (উল্টোডাঙায়)-এ। সেখান থেকে অটোয় চেপে গেলাম সল্টলেকের সেচভবনের কাছে Institute of Reproductive Medicine (c/o Dr. Vaidyanath Chakraborty Institute) কেন্দ্রে আমার স্ত্রীর রক্ত পরীক্ষার বিষয়ে আলোচনা করতে। আমার স্ত্রী hypothyroidism এর রোগী। ২০ শে জুন তাঁর রক্ত আসবে আগরতলা থেকে। রক্ত এলে এই গবেষণা কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে হবে। সল্ট থেকে বাড়ি ফিরলাম দুপুর ১২টায়। ১টা নাগাদ সুরঞ্জনকে নিয়ে আমাদের বাড়ি পাশেই রূপা সেনগুপ্তর বাড়ি গেলাম। রূপা ও তার স্বামী জয়ন্ত এসেছে আগরতলা

থেকে। সেখান থেকে গেলাম সেজদার প্রাসাদোপম বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে। সেখানে গিয়ে দেখি বড়দা, ছোটদি, ছোটো জামাইবাবু, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য সকলেই আছেন। উপলক্ষ, সেজদার ছোট মেয়ে মিঠুর বিয়ের ব্যাপারে ঘরোয়া আলোচনা। মেয়ে Philosophy অনার্স নিয়ে B.A. পড়ছে। আলোচনার পরে ভুরিভোজ খেলাম। খাবার টেবিলে বড়দা, সেজদা, ছোটজামাইবাবু, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও আমি। সুরঞ্জন তার বড় জ্যাঠা ও সেজ জ্যাঠার মাঝখানে বসেছিলো। দুপরের খাওয়া সেরে বিকেলে গেলাম আগরতলাব লেখক দেবব্রত দেবের মামা শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র রায়ের বাড়ি।

১৭ই জুন, ১৯৯৫ শনিবার। আজ সুরঞ্জন নববারাকপুর মেজদার বাড়িতে থেকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিলে, আর বেশকিছু চিঠি লিখলে ত্রিপুরার বন্ধুবান্ধবদের। মার কাছেও ইনল্যান্ড লেটারে চিঠি লিখলে। আমি গেলাম অধ্যাপিকা শিপ্রা রায়ের ব্যাপারে সল্টলেকে তাঁর অধ্যাপক ডঃ অশোক চ্যাটার্জীর কাছে। কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেলো না—পুরী চলেগেছেন। সেখান থেকে গেলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসেবা পরিষদ অফিসে এবং তারপর নববারাকপুর ফিরে এলাম রাত ১০টার পরে।

১৮ই জুন, ১৯৯৫ রবিবার। সুরঞ্জনকে নিয়ে সি. পি. আই. নেত্রী ইলা মিত্রর বাড়ি গেলাম। তিনি সুরঞ্জনের কানের ব্যাপারে ডাঃ আবীরলাল মুখার্জীকে একখানা চিঠি লিখেদিলেন। কিন্তু সুরঞ্জন বললো— 'বাবা আর আমাকে আবীরলালকে দেখিয়ো না, শেষে চিকিৎসা বিভ্রাট দেখা দেবে।' 'ইলাদির বাড়ি থেকে গেলাম মুকুন্দপুরের জনসেবা পরিষদের নিজস্ব বাসভবনে। সুরঞ্জন চলে এলো তার বন্ধু বর্দ্ধনের সঙ্গে সন্তোষপুর। আমি মুকুন্দপুর নতুন বাজারওপুরোনো বাজারে বসে ওই এলাকার প্রচীন সব তথ্য সংগ্রহ করলাম। মুকুন্দপরের এলাকা ছিলো কলিকাপুরের বিহারী মন্ডল ও সাঁপুই জমিদারদের। এখানকার পুরোনো বাসিন্দারা হলো বাগদী ও ডোম, কিছু সাঁওতাল উপজাতিও আছে এখানে। আজ রাতে স্বপনের বাড়ি থাকলাম।

১৯শে জুন, ১৯৯৫ সোমবার। সুরঞ্জনকে স্বপনের বাড়ি রেখে সকালে আমি গেলাম গর্চা ....ফার্স্ট লেনে অধ্যাপক কমলেন্দু গাঙ্গুলির বাসায়। যাবার সময় দেখি বৌমা (স্বপনের স্ত্রী) তাঁর টিয়াপাখিকে বুলি শেখাচ্ছেন। কমলদা ৮.৩০ নাগাদ আমাকে নিয়েগেলেন চেতলা সি.পি.আই.অফিসে। সেখানে ৮২ নং ওয়ার্ডে সি.পি.আই. প্রার্থী শ্রীমতী অলিভা কুমকুম দাশ পুরসভার প্রার্থী হয়েছেন। কমলদা এই ওয়ার্ডের Charge-এ আছেন। দেখলাম কমলদার জন্যে প্রার্থী সহ সকলেই অপেক্ষা করছেন। আফিসঘরে নির্বাচনী কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করলেন তিনি। তারপরে চেতলা হাটের একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন প্রাতরাশ সারতে। অপূর্ব স্বাদের কচুড়ি খেলাম সেখানে। চেতলাহাট থেকে বেরিয়ে ১০টায় আমি গেলাম যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসেবা পরিষদের অফিসে। সেখান থেকে ১২টায় ফিরে এলাম স্বপনের বাড়ি। আবার সেখান থেকে যাদবপুর গিয়ে সন্ধ্যায় গোপাল বাবুর হাতে চিঠি-পত্র দিলাম আগরতলার জন্যে। তিনি আগামীকাল আগরতালা যাচ্ছেন। রাতে ফিরলাম নববারকপুর। রাতে বাথরুমে আমার মুখে আঘাত লাগলো। মেজেবৌদি বোরোলিন লাগিয়ে দিলেন।

২০শে জুন, ১৯৯৫ মঙ্গলবার। আজ লেখক বন্ধু শ্যামল ভট্টাচার্য আগরতলা থেকে আমার স্ত্রীর রক্ত নিয়ে আসবেন। আগরতলা থেকে ১১টার সময় প্লেন ছাড়বে। সাড়ে ১১টার মধ্যে দমদম এয়ার পোর্টে যেতে হবে। শ্যামল ভট্টাচার্য আমার স্ত্রীর রক্ত নিয়ে যথাসময়ে IC ৭৪৪ বিমানে আগরতলা থেকে এলেন। সুরঞ্জনকে নিয়ে আমি আগের থেকেই অপেক্ষা করছিলাম। স্ত্রীর রক্ত এলো কিন্তু ছেলের কান অপারেশনের টাকা এলো না। শ্যামল বললেন, '২৬ তারিখে কবি নকুল দাসের কাছে সমীরণ টাকা পাঠিয়ে দিবেন, কিন্তু যতটাকা (আট হাজার) আপনি চেয়েছেন, ততোটা নাও পাঠাতে

পারে। আমাদের এই কথা সুরঞ্জন overhear করে। পরে তার মার রক্ত নিয়ে যখন সল্টলেকে Institute of Reproductive Medicine -এ যাই তখন সে বলে, 'বাবা ভিক্ষে করে আমার কান অপারেশন করোনা। আমি M.A. পাশ করে টাকা জমিয়ে নিজের টাকার জোরে কান অপারেশন করবো। তুমি সমীরণ কাকুকে টাকা পাঠাতে বারণ করে দাও।' এই কথাগুলো সে বলে তা মাতৃভাষা ককবরকে। সল্টলেকে রক্ত জমা দিয়ে আমরা যাই কলেজস্ট্রিটের কফিহাউসে। তার আগে একটা ওষুধের দোকানে গিয়ে একটা 'টকসাইড ইনজেকশান' নিয়ে নিই চোখের আঘাতের জন্যে। কফি হাউসের গিয়ে বসতেই 'দিবারাত্রির কাব্য' গোষ্ঠীর অফিফ ফোয়াদ এসে যান আমাদের টেবিলে। একটু পরে আসেন ত্রিপুরার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক দীপক দেব। তিনি কলকাতায় কিছুদিন থাকবেন বললেন এবং পুজোসংখ্যায় নাগাদের সমস্যা নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখবেন। একটু পরেই এলেন ত্রিপুরার প্রখ্যাত ছোট গল্পকার শ্যামল ভট্টাচার্য। রাত ৭.৩০ নাগাদ কফিহাউস থেকে বেরিয়ে দীপক বাবুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এলাম শিয়ালদা স্টেশনে। দীপক বাবু গেলেন চাম্পাহাটী আর আমরা নববারাকপুরে।

২১ শে জুন, ১৯৯৫। আজ সকালে সুরঞ্জনকে নববারাকপুরে মেজদার বাড়িতে রেখে আমি গেলাম বালিগঞ্জে স্বপন বসুর বাড়ি। স্বপনকে বললাম, "ত্রিপুরা থেকে সুরঞ্জনের কান operation এর টাকা আসেনি, ২৬ তারিখে কবি নকুল দাস যে টাকা আনবেন তাদিয়ে operartion করা যাবেনা। ত্রিপুরার A.D.C থেকেও তোমার বৌমা (আমার স্ত্রী) operation -এর জন্যে ৩০০০ টাকা তুলতে পারেন নি। তাছাড়া Chief Minister Relief Fund থেকেও ৫০০০টাকা এই সময়ে তোলা যাবে বলে মনে হয় না। কাজেই সুরঞ্জনের কান operation এখন বন্ধ থাক" আমার কথা শুনে স্বপন বললো, "অপারেশনের টাকা আমি তোমাকে দিয়ে দিতে পারি, পরে তুমি ওই সরকারি টাকা পেলে দিয়ে দিযো।" আমি বললাম। কিন্তু সুরঞ্জন বলছে, "বাবা Don't beg money for my operation। আমি M.A. পাশ করে টাকা জমিয়ে কান operation করাবো।" স্বপন শুনে বললো, 'দেখছি তোমার ছেলের আত্মমর্যাদা আছে।' স্বপনকে বললাম, '১০০০ টাকা দাও, মুক্তিকে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দিই।' স্বপন ১০০০ টাকা দিতেই আমি গেলাম Airlines Corporation Office-এ। সেখানে লেখক বন্ধু শঙ্কর সেনগুপ্ত সুরঞ্জনকে ২৩/৬/৯৫ -এর একখানা টিকিট দিয়েদিলেন। শঙ্কর বাবুকে আমার লেখা ত্রিপুরার রূপকথার বই ও ককবরক লিপিবিতর্ক বানান বিতর্ক বইখানা দিলাম। তিনি Computer-এ বসে সুরঞ্জনের কিছু কবিতাও পড়লেন। টিকিট নিয়ে আমি প্রফুল্ল চিত্তে নববারাকপুর ফিরে এলাম। প্লেনের টিকিটের খুব Crisis ছিল। টিকিট পেয়ে সুরঞ্জনের আনন্দ আর ধরে না।

২২শে জুন, ১৯৯৫। সকালে উঠেই সুরঞ্জনকে নিয়ে বারাসতে ছোটদির বাড়িগেলাম। ছোটদিকে সুরঞ্জনের ত্রিপুরায় যাবার কথা বললাম এবং বললাম ১০টার মধ্যে খেয়ে বেরিয়ে যাবো। ছোটদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে ন'পাড়ায় গেলাম আমার খুড়তুতো দাদা শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ কুন্ডু চৌধুরীর বাড়ি। তাঁর কাছ থেকে আমাদের বংশ পরিচয়ের অনেক কথা জানলাম। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ আমাদের জায়গিরদারির একখানা তাম্রপত্র দিয়েছিলেন। আমার পিতামহের পিতামহ নসিরাম ছিলেন রাজা প্রতাপাদিত্যের নৌ সেনাপতি। সুরঞ্জন বসে বসে তার পিতৃবংশের কৌলিন্যের কথা শুনতে লাগলো খুব relish করে। সত্যপ্রসাদ দার বাড়ি পাশে থাকেন আমার মামাতো দিদি আরতি হোড়। তাঁদের সঙ্গেও দেখা করলাম। আরতিদির ছেলে চিন্ময় হোড় ক'দিন আগে রেঙ্গুন থেকে আসতে গিয়ে জাহাজ ডুবিতে পড়েছিলো। এই খবর কাগজে খুব ফলাও করে বেরিয়েছিলো। চিন্ময় বেঁচে যায়। সুরঞ্জন তার Camera দিয়ে চিন্ময়ের ছবি তুললো। কাগজেও তার ছবি বেরিয়েছিলো। ছোটদির বাড়ি থেকে খেয়ে চলে গেলাম বালিগঞ্জ স্বপনের বাড়ি। ছোটদি সুরঞ্জনকে ২০০ টাকা দিল বই কিনতে। বালিগঞ্জ থেকে যাদবপুর

জনসেবা পরিষদের অফিসে, তারপর কলেজ স্ট্রিট। কলেজ স্ট্রিটে দেবীদার কাছ থেকে সুরঞ্জন তার M.A 'র বই কিনলো। তারপর ফিরলাম নববারাকপুর।

২৩শে জুন, ১৯৯৫। নববারাকপুর মেজদার বাড়ি। খুব ভোরে সুরঞ্জনকে ঘুম থেকে তুললাম, ৯.২০ তে ফ্লাইট, সে আগরতলায় যাবে, টাকার অভাবে তার কান অপারেশন হলো না। যদিও বন্ধু স্বপন বসু অপারেশনের সব টাকাই হাওলাৎ দিতে চেয়েছিলো, কিন্তু সুরঞ্জন এভাবে অপরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তার কান অপারেশন করতে চায়নি। মেজ বৌদি চিঁড়ে-আম দিয়ে তাকে খাইয়ে দিলেন ভালো করে। একটু পরে পাতু এলো তার আমের প্যাকেট নিয়ে। ঠিক ৭টার সময় আমরা ৩ জন রওনা দিলাম দমদম এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে পাতু চলে এলো। আমি সুরঞ্জনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। সুরঞ্জনের Flight No.IC 743. রিপোর্টিং শেষ করে বসতেই প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার P.A. Mr. Bose-এর সঙ্গে দেখা। ত্রিপুরার নানান কথা নিয়ে আলোচনা হলো তাঁর সঙ্গে। সুরঞ্জনের ফ্লাইট ছাড়লো একটু লেটে ৯-৪৮-এ। তাকে বিদায় দিয়ে ফিরে এলাম নববারাকপুর। বিকেলে এলাম কলকাতায় ২০ পটুয়াটোলার নিরক্ষরতা দুরীকরণ অফিসে। সেখানে ফুলরেনু গুহর সঙ্গে দেখা হলো। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম Globe Nursing Home এ। সুরঞ্জনের Operation Cancelled করে দিলাম। সেখান থেকে ইলা মিত্রর বাড়ি। ইলাদিকে সব জানালাম। রাতে ফিরলাম স্বপন বসুর বাড়ি।

২৪শে জুন, ১৯৯৫। ভোরে উঠেই শুনি স্বপনের স্ত্রী পুষ্প টিয়াপাখিকে বুলি পড়ানো শেখাচ্ছে। যশোদা দির হাত থেকে চা খেয়ে স্বপনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ৭.৩০ নাগাদ গেলাম সেলিমপুরে চোখের ডাক্তার Dr. Jyotirmoy Gupta'র সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকেই আমি বরাবর চোখ দেখাই। আমার মা-র চোখও তাঁকে দিয়ে দেখিয়েছিলাম। জ্যোতির্ময়দার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে জ্যোতির্ময়দা, জ্যোতির্ময়দা বলে ডাকতেই তাঁর ছোট ভাই বেরিয়ে এসে বললেন, দাদা গত বছর ১৫ই জানুয়ারী মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে মনে বড় আঘাত পেলাম। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৬৬ সাল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত 'ক্লস পিপল সেমিনার'-এর মধ্য দিয়ে বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্তর মাধ্যমে। জ্যোতির্ময়দা ছিলেন দমদম অস্ত্রাগার (কাশিপুর গান অ্যাণ্ড সেল ফ্যাক্টরী) লুণ্ঠনে পান্নালাল দাশগুপ্তর ডানহাত। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি 'দমদম-বশিরহাট' বই লিখেছিলেন দমদম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের রোমহর্ষক কাহিনী নিয়ে। অনেকদিন আমি তাঁকে দেখেছি সি পি আই নেতা মোহন চৌধুরীর সঙ্গে আর্মস নিয়ে গোপন কথা বলতে রমেশ চ্যাটার্জীর শিয়ালদার রাণী স্টুডিওতে। সেখান থেকে গেলাম জনসেবা পরিষদ অফিসে। সেখান থেকে কবি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাদবপুরের ৯ কালিবাড়ি লেনে গিয়ে তাকে বললাম, সুরঞ্জন চলে গেছে।

২৫শে জুন, ১৯৯৫। সকালে স্বপনবসুর ১১৫ এ, বালিগঞ্জ গার্ডেনস-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে শিয়ালদা দিয়ে নববারাকপুর মেজদার বাড়ি গিয়ে দেখি আমার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ছেলে সত্যেন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে বাঙলাদেশে আমাদের খাজরা গ্রামের ভিটেতেই আছে। সে বললো, আমাদের ভিটেতে সে 'বিশ্বকল্যাণ গীতা আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেছে। তার কাছ থেকে আমাদের গ্রাম ও আশপাশের গ্রামের অনেক খবর পেলাম। হাঙর-কুমীরে ভরা আমাদের খরস্রোতা বিশাল কপোতাক্ষ নদী নাকি শুকিয়ে গেছে অবদা কোম্পানির বাঁধ দেয়ায়।

২৬শে জুন, ১৯৯৫। আজ সুরঞ্জনের কান অপারেশন হবার কথা ছিলো। Name of Dr. - Dr. B.K. Roy Choudhury. Name of Nursing Home - Globe Nursing Home, 91A Dr. Lalmohan Bhattacharjee Rd. Near Philips Bus Stop gt Moulali, Calcutta. Phone

1) 244-9486 2) 244-9279.

আজ সুরঞ্জনের কান অপারেশন হলো না। ২০ শে জুন ত্রিপুরা থেকে টাকা আসার কথা ছিলো, কিন্তু সমীরণরা টাকা পাঠাতে না পারায় সুরঞ্জন ২৩ তারিখেই ত্রিপুরায় চলেগেছে। আজ কবি নকুল দাস ত্রিপুরা থেকে কলকাতায় আসবেন IC 744 Flight -এ। ১১.৫০-এ আগরতলা থেকে বিমান এসে নামলো। শ্যামল ভট্টাচার্যও এসেগেছেন কবি নকুল দাসকে নিয়ে যাবার জন্যে। নকুল বাবু এসে আমার হাত সুরঞ্জনের পাঠানো একখানা খাম দিলেন। খাম খুলে দেখি সুরঞ্জনের চিঠি ও ২৭০০.০০ টাকা। সে লিখেছে, মা তাঁর আপিস থেকে সুদে করে টাকা পাঠিয়েছেন। টাকা পেয়ে হাঁপ ছাড়লাম, টাকা না এলে কলকাতায় আটক পড়ে থাকতে হতো। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে চলে এলাম বালিগঞ্জে স্বপনের বাড়ি, সেখানে সরস্বতীদির থাকার কথা। সরস্বতী মিশ্র আমার ১ বছর আগে M.A. পাশ করেছিলেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে। আমার পরম হিতৈষী বন্ধু। সবসময় আমাদের সকলকে জামাকাপড় দেন। সরস্বতীদি আজ একটা সুন্দর ব্যাগ দিলেন। রাত ৭টার সময় বাঙলা দেশ থেকে লেখক সুকুমার রায় এলেন স্বপনের বাড়ি। তিনি ১ মাস থাকবেন স্বপনের ডেরায়। রাত ৭.৩০ এ স্বপন আর আমি সরস্বতীদিকে বাসে তুলে দিয়ে এলাম গোল পার্কে গিয়ে।

২৭শে জুন, ১৯৯৫। স্বপন বসুর বাড়ি রবি মামার খাটে ঘুম ভাঙলো খুব ভোরে। উঠেই বৌমার (স্বপন বসুর স্ত্রী) সুন্দর মুখ চোখে পড়লো। বললেন, ছাদে গিয়ে পায়চারি করুন আয়ুব দা। স্বপন বসুর বাড়িতে আমি আয়ুব বলে পরিচিত। ৬০ সালে তদনীন্তন পূর্বপাকিস্তান থেকে কলকাতায় এসে ছিলাম পড়তে। কিন্তু ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁর দেশ থেকে এসছিলাম বলে কলেজে আমাকে সকলে আয়ুব বলে ডাকতো। স্বপনেব বাড়িতে এখনো সেই নামটি বেঁচে বয়েছে। সকাল ৭টা নাগাদ গেলাম গর্চা ফার্স্টলেনে অধ্যাপক কমলেন্দু গাঙ্গুলির বাসায়। তাঁব সঙ্গে প্রায় ৩০ বছরের সম্পর্ক। তিনিই আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কমিউনিস্ট পার্টিতে নিয়ে আসেন। এখন সি. পি. আই. এর তাত্ত্বিক নেতা। তাঁর স্ত্রী উষা গাঙ্গুলি হিন্দি নাটক কবে খুব নাম করেছেন। উষা-ও আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু। উষা পান্ডেব সঙ্গে কমলদাব বিয়েতে আমি খুব খেটেছিলাম। আমি ছিলাম ভাঁড়ায়ের দায়িত্বে। কমলদা-উষার একটিই ছেলে হীরকেন্দু, ডাক নাম মুঙ্কা, ইংবিজি অনার্স নিয়ে পড়ছে। কমলদাকে দেখলাম কলকাতা কর্পোবেশনের নির্বাচন নিয়ে খুব ব্যস্ত। কমলদার বাসা থেকে স্বপনের বাড়ি ফিবে আসতেই বৌমা আমাকে নিয়ে বেরোলেন গড়িয়াহাটে কেনা-কাটা করতে। আমাব দুই মেয়ে তানিয়া-দেবযানীব সালোয়ার-কামিজ ও আমার স্ত্রীব শাড়ি কিনে দিলেন তিনি। প্রত্যেকবার কলকাতায় এলে বৌমা ও সরস্বতী দি (সরস্বতী মিশ্র) আমার ছেলে-মেয়ে-বৌয়ের জামা-কাপড় কিনে দেন। বৌমাকে তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি গেলাম Airlines Corporation -এর Office-& Plane tiket -এর জন্যে। বন্ধুবর লেখক শঙ্কর সেনগুপ্ত আগামী কাল যেতে বললেন। সেখান থেকে গেলাম কলেজ স্ট্রিটে। সুরঞ্জন ও তানিয়ার বই কিনলাম। তারপব গেলাম কফি হাউসের 'দিবারাত্রির কাব্য'র আড্ডায়। আফিফ ফোয়াদ, শ্যামল, কবি নকুল দাস, ঔপন্যাসিক দীপক দেব, কবি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি শুভ বসু সকলকেই পেলাম। কফি হাউস থেকে বেরিয়ে শ্যামল ভট্টাচার্য, নকুল দাস, দীপক দেব ও আমি গেলাম শিয়ালদা স্টেশনে। নকুল দাস চলেগেলেন শ্যামল বাবুর সঙ্গে। দীপক বাবু ও আমি গেলাম গাড়িতে। বালিগঞ্জে নামলাম আমি, দীপক বাবু নামলেন কালিকা পুর। স্বপনের বাড়ি ফিরে দেখি সরস্বতী দি আমাকে ১ খানা শার্টের পিস দিয়ে গেছেন। রাত্রে ঘুমোলাম স্বপনের পাশে শুয়ে।

২৮ শে জুন, ১৯৯৫। স্বপন বসুর বাড়ি খুব সকালে মান্না-মাসী ও যশোদাদি চা করে দিলো। সনকা নিচের থেকে জল এনে দিতেই স্নানটা সেরেনিলাম। যাবো ক্যানিং লাইনের কালিকাপুরে।

বালিগঞ্জ থেকে ট্রেনে চেপে কালিকাপুর নামলাম। সেখান থেকে রিকসা চেপে গেলাম দক্ষিণ গড়িয়ার জমিদার নাট্যকার ও অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে। সেখান থেকে খুঁজে গেলাম পুরোহিত ফটিক চ্যাটার্জির বাড়ি। এই বাড়িতেই থাকেন ত্রিপুরার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক দীপক দেব। দীপক বাবুর ঘরে ঢুকতেই দেখি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন চাম্পাহাটির রানার গোষ্ঠীর তরুণ কবিদের নিয়ে দিবারাত্রির কাব্য গোষ্ঠীর অন্যতম সংগঠক লেখক আফিফ ফোয়াদ। আফিফ তার জাডদহ-এর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে দীপক বাবু ও আমি গেলাম কালিকাপুরের কাছে আফিফ ফোয়াদের বাড়ি। আফিফেরা পুরনো ধনী লোক ওখানকার, তিন পুরুষ ধরে শিক্ষার পাঠ তাঁদের। পাশের বেনে পুকুর কিনে নেন তাঁরা। পাশের গ্রামের নাম বেনে বৌ। আগে এখানে বেনেরা থাকতো। আফিফের বাড়ি থেকে বিকেল ৪.৩০-এ এলাম স্বপনের বাড়ি, সরস্বতীদি অপেক্ষা করছিলেন। তিনি সুরঞ্জনের জন্যে গেঞ্জি আর আমার জন্যে জুতো কেনার টাকা দিলেন। তারপর ৬ টায় গেলাম Airlines Corporation এর অফিসে। লেখক বন্ধু শঙ্কর সেনগুপ্ত ৩০শে জুনের একখানা টিকিট পাইয়ে দিলেন আগরতলায় যাবার জন্যে।

জুনের ২৯ তারিখ, ১৯৯৫। স্বপন বসুর বাড়ি। স্বপনের পাশ থেকে ঘুম থেকে উঠলাম খুব চুপিসাড়ে। বৌমা উঠলেন আমার পরই। তারপর টিয়াপাখিকে বুলি পড়া শেখাতে লাগলেন। ৬.৩০ নাগাদ মাসীমা চা দিলেন খেতে। চা খেয়ে ৭টা নাগাদ বেরিয়ে গেলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসেবা পরিষদ অফিসে। গিয়ে দেখি জনসেবা পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী ত্রিপুরা থেকে ফিরেছেন গতকাল। তার সঙ্গে একটু কথা বলে গেলাম যাদবপুর ৯ নং কালিবাড়ি লেনে কবি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। সত্যেন বাবু তাঁর স্ত্রী লেখিকা মীনাক্ষী সেনকে একখানা চিঠি দিলেন আগরতলায়। সেখানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপিকা শিপ্রা রায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনটারভিউ দিতে এসেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এলাম স্বপনের বাড়ি। বৌমা আমাকে সব গুছিয়ে দিলেন আগরতলায় যাবার জন্যে। স্বপনের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে এলাম কলেজ স্ট্রীট। সেখানে দেজ পাবলিশিঙে দেখা করলাম সুধাংশু বাবুর সঙ্গে 'অক্ষর' এর বই রাখার ব্যাপারে। তারপর গেলাম ৬০ পটুয়া টোলা লেনে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অফিসে। তারপর মনীষায় এসে কিছু বই কিনলাম। তারপর এলাম শিয়ালদায় সেজদার Style Wear দোকানে। সেখান থেকে ৪.৪০ এর দত্তপুকুর লোকাল ধরে নবাবাকপুর মেজদার বাড়ি।

৩০শে জুন, ১৯৯৫। ভোর ৪টায় উঠলাম, আজ ৯.২০'র ফ্লাইট আগরতলায় যেতে হবে। মেজো বৌদি উঠে চিড়ে ভিজিয়ে দিলেন। আমি স্নান সেরে রেডি হলাম। সাতটায় পাতু এসে গেলো তার দিদির বাড়ি আম, বেলপাতা, গঙ্গাজল পাঠাবে বলে। মেজদার ছোটমেয়ে ইনু আমাকে Airport -এ তুলে দিয়ে আসতে চাইল। ইনু ও পাতুকে নিয়ে ৭.৩০-এ দমদম এয়ারপোর্ট রওনা দিলাম। এয়ারপোর্টের ভেতরে ঢোকার জন্যে ১০ টাকা করে টিকিট কাটলাম। আমার রিপোর্টিং হয়ে যাবার পর পাতু ও ইনু নববারাকপুর চলে গেলো। রিপোর্টিং সেরে বসতেই ত্রিপুরা বিধানসভার ডেপুটি সেক্রেটারী নরেশ দেববর্মার সঙ্গে দেখা। তিনি ফিরছেন দিল্লি থেকে Tribal-দের ওপর Seminar সেরে। দেখা হলো কপিল ভট্টাচার্যের স্ত্রী দীপ্তা দেববর্মা সঙ্গেও। তিনি যাচ্ছেন বম্বে, নাসিকে তাঁর ছেলে থাকে। দীপ্তা হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ধন্য লালুকর্তার নাতনী, কৃষ্ণ কর্তার মেয়ে। একটু পরেই দেখা হয়ে গেলো ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সিরাজুদ্দীন আমেদের সঙ্গে। তিনি সস্ত্রীক ফিরছেন, গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে। তাঁর শালী মিঠু এসেছে তাঁদেরকে See off করতে, মিঠু

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে Economics-এ M.A. পড়ে। প্লেন ছাড়লো ১.৩০ এ। আগরতলায় বাসায় ফিরতে ৩ টে হয়ে গেলো। একটু বিশ্রাম করে গেলাম মেলার মাঠে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর বাড়ি। তাঁকে কালান্তর আনার ব্যাপারে সব জানালাম। শুনলাম ত্রিপুরার বর্তমান রাজনীতি। তারপর সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ বাসায় ফিরে স্ত্রী ফুলকুমারী দেববর্মার মুখোমুখি হলাম ভয়ে ভয়ে।

১লা জুলাই, ১৯৯৫। আগরতলা, চিত্রশিল্পী দিলীপ দেববর্মার বাসভবন। গতকাল কলকাতা থেকে ফিরেছি। আবার আগরতলার রুটিন মাফিক জীবন। সকালে উঠেই শাক-সবজির জমা ময়লা রাস্তায় গিয়ে ফেলে দিলাম। সকাল ৭টা নাগাদ বেরিয়ে কর্নেল চৌমুহনী থেকে একখানা ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা নিয়ে অটোয় চেপে চলে গেলাম ইন্দ্রনগরে। সেখানে তরুণ লেখক প্রবুদ্ধসুন্দর করের সঙ্গে দেখা করে লেখক দীপক দেবের একখানা চিঠি দিলাম। সেখান থেকে বাসায় ১০টা নাগাদ ফিরে দেখি সি.পি.আই নেতা প্রশান্ত কাপালী অপেক্ষা করছেন। তিনি বললেন, 'কুঞ্জ দেববর্মা ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জিলা পরিষদের ইলেকশনে চড়িলাম-গোলাঘাটি কেন্দ্র থেকে দাঁড়াচ্ছেন আপনি তাঁর প্রস্তাবক হোন।' দুপুর ২টোয় আমরা স্বামী-স্ত্রী বেরিয়ে পড়লাম হেরমায়। হেরমা বাজারে অনেকে আমাকে বললেন, অঘোর দেববর্মাকে দাঁড় করানো উচিত ছিলো।

২রা জুলাই, ১৯৯৫ রবিবার, হেরমাবাড়ি-শ্বশুরবাড়ি। সকালে ঘুম থেকে উঠে গেলাম কাকা বীরকুমারের বাড়ি। পায়খানা গেলাম কাকাশ্বশুরের পাকা পায়খানায়। কাকী জ্যোৎস্না দেববর্মা দুধ রুটি খাইয়ে দিলেন আমাকে। সেখান থেকে গেলাম হেরমা বাজারে। দেখি, সেখানে কাকা বীরকুমাররা ADC (Autonomous District Council)'র রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। যুবসমিতির বিশিষ্ট কর্মী রাধাকুমার দেববর্মাও আছেন, তিনি সম্প্রতি হরিনাথ দেববর্মার নতুন দল TTNC -তে যোগ দিয়েছেন। CPI ক্যানডিডেট কুঞ্জ দেববর্মা এবার অনায়াসে জিতে যাবেন বলে সকলের ধারণা। এরপর গেলাম দাদা শ্বশুর নরেন্দ্র বাবুকে দেখতে। ডাঃ নীলমণি দেববর্মা তাঁকে চিকিৎসা করছিলেন। জানলাম, তাকে ক্যানসার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখান থেকে গেলাম বাঁশতলী ভায়রাভাই কৃষ্ণকান্তর সঙ্গে দেখা করতে। দুপুরে বাড়ি ফিরে এসে আন্দি নদীতে স্নান করলাম। দুপুরে খেলাম খারপানি-বাঁশের কড়ুল শুয়রের মাংস দিয়ে রান্না করা চাখুই (ছাই চোয়ানো জল দিয়ে রান্না করা হজমকারক একপ্রকার উপজাতীয় তরকারি বা ব্যঞ্জন)। শাশুড়ীই রেধেছিলেন। বিকেলে চড়িলাম হয়ে আগরতলায় ফিরে এলাম স্বামী-স্ত্রীতে।

জুলাই ৩রা, ১৯৯৫ সোমবার, আগরতলা। ভোরে ঘুম ভাঙতেই দেখি তানিয়া তার দাদার টেবিলে পড়ছে। আমাকে দেখে বললো, 'বাবা বাজার থেকে রুই মাছ নিয়ে এসো, নারকেল দিয়ে রান্না করবো।' চা-টা খেয়ে গেলাম বাজারে, আনলাম রুইমাছ, নারকেলের দুধ দিয়ে রুইমাছ রান্না করলো তানিয়া, স্বাদ হলো তারিফ করার মতো। দশটা নাগাদ আমরা স্বামী-স্ত্রীতে বেরিয়ে পড়লাম, ফুলকুমারীকে তাঁর পূর্বাশা অফিসে নামিয়ে দিয়ে আমি গেলাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বেতন নিলাম ৩৬০৮ টাকা। Asst. Registrar Mr. K.B. Jamatia'র সঙ্গে আমার Extension-এর বিষয়ে আলোচনা করে ফিরে গেলাম Language Laboratory তে।২.৩০-এ ভাষাতত্ত্বের ক্লাশ। ক্লাশে যেতেই ছাত্র-ছাত্রীরা বললো, 'স্যার, আজ ক্লাশ করবো না। ৩ টে থেকে টিভিতে দীপক ভট্টাচার্যের 'পিলাক' দেখাবে, তাই দেখবো আমরা।' সঙ্গে সঙ্গে আমি গেলাম বিভাগীয় প্রধান ডঃ আমেদের কোয়ার্টারে। সেখানে ডঃ আমেদের সঙ্গে বসে 'পিলাক' দেখলাম টিভিতে। ছবিটার মূল পরিকল্পনা যৌথভাবে করেছিলাম আমরা। এবং ত্রিপুরার মগ এলাকায় আমিই প্রথম নিয়ে গিয়েছিলাম দীপক ভট্টাচার্যকে। একদিন সন্ধ্যের ঠিক আগেই আমরা দু'জনে পৌঁছে গেলাম দক্ষিণ ত্রিপুরার মগ অধ্যুষিত

কলসী গ্রামের বাসু মগের বাড়ি। ঠিক সেই সময় বাসু মগের সুদর্শনা ঋজুদেহী স্ত্রী আম্রপলী বন থেকে জ্বালানি কাঠ নিয়ে এলেন 'লাঙ্গা' ভরে পিঠে চাপিয়ে। দীপকবাবু তাঁকে দেখে বললেন, 'কুমুদদা, বাসুবাবুর এই স্ত্রীকে আমি মগ সিনেমার নায়িকা করবো।' এরপর বাসু মগের বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন উপজাতি যুব সমিতির নেতা শিক্ষক চংথং মগ। চংথংবাবু আমাদের দু'জনকে নিয়ে কলসী বাজারে এলেন। তারপর আমাদের নিয়ে গেলেন বাজার সংলগ্ন লাবরেছাই মগের বাড়িতে। লাবরেছাই মগের পাকা দালান বাড়ি দেখে আমারা অবাক হয়ে গেলাম দু'জনে। আর দেখলাম, তাঁর বাড়িতে রয়েছে এক বিরাট বৌদ্ধ মঠ। এই মঠও পাকা। বৌদ্ধ মঠে প্রবেশ করে দেখলাম বুদ্ধের পিতলের মূর্তির সামনে রয়েছে বৌদ্ধ ত্রিপটক। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আমাদেরকে প্রসাদ দিলেন খেতে। এইবার আমরা এসে বসলাম লাবরেছাই মগের স্ত্রীর ঘরে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের জন্যে জল খাবার নিয়ে এলেন লাবরেছাইবাবুর ছোট ছেলে। লাবরেছাই মগের স্ত্রীর কাছ থেকে শুনলাম তাঁর স্বামী কিছুদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন। এবং তাঁদের পরিবারের অতিতের অনেক কথাই বললেন তিনি আমাদের সঙ্গে। জল খাবার খেয়ে আমরা উঠে পড়লাম সেখান থেকে। এবার চংথংবাবু বাজার সংলগ্ন লাউগাঙ নদীর সামনে নিয়ে এলেন আমাদেবকে। নদীতে তখন অল্প জল। আমরা প্যান্ট গুঁটিয়ে নদীর ওপর গেলাম খুব সন্তর্পণে, আমরা যাবো দেবদারু বাজারের কাছে বনের ভেতব এক বৌদ্ধ মঠে। ঐ মঠের বৌদ্ধভিক্ষুর বয়েস নাকি একশ বছরের মতো। যেতে যেতে চংথংবাবু বললেন, "জানেন কুমুদবাবু, লাবরেছাই মগ আগে খুব ধনী ছিলেন। কলসী বাজারে ছিল তাঁর বিশাল শুকনো মাছের দোকান। তিনি সোজা সুদূর বার্মা থেকে শুকনো মাছ নিয়ে আসতেন কলসী বাজারে। এবং বাঙালী মাছের ব্যবসায়ীরা তাঁর কাছ থেকে শুকনো মাছ কিনে বিক্রি করতেন কলসী এবং অন্যান্য ট্রাইবেল এলাকার বাজারে। একশ বিঘের ওপর তাঁর ধানের জমি ছিল। কিন্তু লাবরেছাই মগ মারা যাওয়ার পর পরিবারটা গরীব হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো অদব-কায়দা ঠিকই আছে। দেখলেন না আপনাদেরকে কী রকম জল খাবার খাওয়ালেন।" চংথংবাবুব কথা শুনে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেলো। বললাম, 'আচ্ছা চংথংবাবু, এই লাবরেছাই মগের ভাইঝির বিয়ে হয়েছে কি মনুবনকুল মগ এলাকায় ?' চংথংবাবু বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন, কুমুদবাবু। লাবরেছাই মগের এক ভাইঝির বিয়ে হয়েছে অঞ্জু মগ এম. এল. এ.-র বাড়ির পাশে ছদু মগের ছেলের সঙ্গে।" আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি মধু মগের কথা বলছেন চংথংবাবু ?' আমার কথা শুনে চংথংবাবু গভীর আগ্রহ সহকারে বললেন, 'আপনি কি করে পেলেন এই খবর ?' বললাম, 'এক সময় আমি কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার চিঠি নিয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা কাজে যাই ওই গ্রামে। তখন আমাকে অঞ্জু মগ ওই মধু মাস্টারের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এবং সেখানে গিয়ে মধু মগের স্ত্রীর কাছ থেকে তাঁর ভাগ্য বিপর্যয়ের সব কথা শুনি।' আমার কথা শুনে দীপকবাবু জিজ্ঞাস করলেন, 'কী ধরণের ভাগ্য বিপর্যয় কুমুদবাবু?' আমি বললাম, 'সেই কাহিনী শুনলে আপনি শিউরে উঠবেন দীপকবাবু। একদিন কাক ভোরে মধু মাস্টার অঞ্জু মগের মনুবনকুল বাজারে বুদ্ধ মন্দিরে অন্নভোগ নিয়ে নদী পেরিয়ে ওপারে যাচ্ছিলেন। রাতের বেলায় খুব বৃষ্টি হয়েছিল। মনু নদীতে তখন বানের জোয়ার। মধু মাস্টার অঙ্গাবরণ খুলে ভগবান বুদ্ধের অন্নভোগ হাতে উঁচু করে নিয়ে নদী পেরোতে গিয়ে এক অসতর্ক মুহূর্তে ভেসে গেলেন নদীর বানের জলে। সকাল সাতটায় তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল নদীর উজানে চরের কাদায়।' আমার কথা শুনে দীপকবাবু সোৎসাহে জিজ্ঞস করলেন, ' তারপর?' আমি বললাম, 'তারপর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল মধু মাস্টারের বানের জলে ভেসে গিয়ে মৃত্যুর খবর। তখন দো-অঙ-মগ গ্রামের সকলে ছুটল মধু মগের মৃত্যুদেহ দেখতে। ছুটলেন মধু মগের স্ত্রীও। নিজের চোখে স্বামীর এই মর্মান্তিক মৃত্যু দেখে হাউ হাউ করে কাঁদতে

লাগলেন তিনি। দেখা গেল মধু মগের হাতে তখনও বৌদ্ধের অন্ন ভোগ বাঁধার কাপড় খানা মুষ্টিবদ্ধ রয়েছে। মধু মগের ছেলে-মেয়েরা তখন খুবই ছোট। মধু মগের স্ত্রী দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পর বিয়ে করে ফেললেন তাঁর দেইরকেই ।' দীপকবাবু আমার কথা শুনে বললেন, 'এতো খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা দেখছি কুমুদদা?' উত্তরে আমি বললাম, 'ইন্টারেস্টিং তো বটেই, আরো ইন্টারেস্টিং হল মধু মাস্টারেব বড় ছেলে থইঅ মগের লেখাপড়া শেখার কথা। থইঅ এখন ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের রিসার্চ স্কলার। দীপকবাবু আমার কথা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'থইঅ মগ তাহলে একজন তরুণ পরমাণু বিজ্ঞানী ! আমি বললাম, 'সে আগরতলা নেতাজী ইস্কুল থেকে ভালো রেজাল্ট করে স্কলারশিপ নিয়ে দক্ষিণ ভারতে পড়তে যায়। সেখানে সে স্ট্যাণ্ড করে। পরে স্কলারশিপ পেয়ে ভাবা পরমাণু বিজ্ঞান কেন্দ্রে গবেষণা করতে যায়। বিশ্বাস কববেন না দীপকবাবু, থইঅ মগের ইংরেজী কবিতা বোম্বের A Class ইংলিশ ম্যাগাজিনে বের হয়। আমার কথা শুনে চংথংবাবু ততক্ষণে নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, 'কুমুদবাবু, আপনি দেখছি আমার থেকেও থইঅ মগ সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। "উত্তরে আমি বললাম, 'জানেন চংথংবাবু, থইঅ-র সঙ্গে আমার মনুঘনকুল হাসপাতালের ডাক্তার বিজয় দেববর্মার কোয়ার্টারে যখন প্রথম দেখা হয় তখন তার মুখ দিয়ে খই ফোটার মত ইংরেজী বের হচ্ছে। ছোট খাটো এই মগ ছেলেটাব মুখ থেকে বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। তখন ডাক্তার বিজয় দেববর্মা থইঅ-র সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন।" এর মধ্যে আমরা এসে পৌঁছে গেলাম ঘন জঙ্গলে ঘেবা সেই অতি বৃদ্ধ মগ ভিক্ষুর বৌদ্ধ মঠে। দেখলাম একটা টঙ ঘব সদৃশ খড়ের ছাওনি দেওয়া বৌদ্ধ মঠে শতবর্ষীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু বসে আছেন তাঁর অদ্ভুত পরিপক্ক গোঁফ-দাড়ি নিয়ে। আমাদেরকে দেখেই চংথংবাবুর সঙ্গে তিনি মগ ভাষায় কি যেন কথা বললেন। তারপর পবে বাংলা ভাষায় আমাদেরকে আহ্বান করলেন তাঁর টঙ ঘর সদৃশ বৌদ্ধ মঠে উঠতে। বন্ধুবর দীপক ভট্টাচার্য তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছ থেকে পিলাক সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্য জানতে চাইলেন। তাদেব আলোচনা থেকে দেখা গেল পিলাক সভ্যতা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগদেরই সৃষ্টি। এবং জোলাইবাড়ির কাছে যে সাগরঢেপায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রাচীন স্থাপত্য শিল্প পাওয়া যাচ্ছে, তা একদিন মুসলমানদের আক্রমণেব হাত থেকে বাঁচাতে ওই সাগরঢেপায় জলমগ্ন করে দিয়েছিলেন মগেরাই। তাই দেখা যায় এখনো পিলাকের আশেপাশে মগদের প্রাচীন বসতি। মগবা বহুবার এই অঞ্চল ছেড়ে কখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম, কখনো সুদূর বার্মায় চলে গিয়েছিল। অনুকূল পরিবেশে আবার তারা ফিরে এসেছিল তাদের পুরোনো জায়গা পিলাকেই। গভীর রাত হয়ে গিয়েছিল তখন। আমবা আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লাম কলসীর দিকে।'

টিভিতে দীপক ভট্টাচার্যের 'পিলাক' সিনেমা দেখে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরতে ঢুকলাম বনমালীপুরে অঘোর দেববর্মার বাড়ি। সেখানে দেখি সি পি আই নেতা ধনমণি সিং ও কমরেড মোহন চৌধুরীর ছেলে অমিত চৌধুরীর সঙ্গে অঘোরবাবু ADC'র নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছেন। দেখলাম, আমতলি-গোলাঘাটী কেন্দ্রে কুঞ্জ দেববর্মা C.P.I.-এর প্রার্থী হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ।

৪ঠা জুলাই, ১৯৯৫ মঙ্গলবার। সকালে চা খেতে যাবো এমন সময় এলেন অনুরূপা মুখার্জীর ভাইপো জগদীশ দেববর্মার স্ত্রী। বললেন, 'আগরতলার টি ভিতে Serial করবো ত্রিপুরার উপজাতীয় পূজা-পার্বণের ওপর। আপনি ত্রিপুরার উপজাতিদের পূজা-পার্বণের একটা তালিকা করেদিন এবং কোন পূজা কখন হয়, তার উদ্দেশ্য ও নীতিদীর্ঘভাবে লিখে দিন।' বললাম, 'ক'দিন বাদে নিয়ে যাবেন। তৈরী করে রাখবো।' দশটায় ফুলকুমারী চলে গেলেন অফিসে। ছেলে সুরঞ্জন গেলো বটতলায় হেরমার বাস attend করতে। হেরমার বাস আসবে ১০টায়। সেই বাসে তার ছোটমামা বিমল দেববর্মা চাল

নিয়ে আসবে। আমার স্ত্রীর হেরমার বাপের বাড়িতে কানি (এক বিঘা থেকে ১ গন্ডার মতো বেশি) চারেক ধানের জমি আছে। সেখান থেকে মাঝেমধ্যে চাল আসে। ১২-৩০-এ বেরোলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। পথে কামান চৌমুহনীতে গিয়ে কমরেড তৈয়ভী ইসলামের ছেলের কাছ থেকে ছাতি মেরামত করলাম। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে ফুলকুমারীকে তাঁর অফিস থেকে নিয়ে গেলাম বনমালীপুর অঘোর দেববর্মার বাড়ি। অঘোরবাবুর স্ত্রী সি পি আই পার্টিতে অঘোরবাবুকে কোণঠাসা করার বিষয়টা খুব অনুযোগের সঙ্গে তুললেন এবং আমার অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বললেন, 'আপনার সঙ্গে পরিচয় দীর্ঘদিনের, সেই ভাষার কাজ শুরু করার সময় থেকে। দেখেছেনতো কী কষ্ট করেই না পাঁচ-পাঁচটা ছেলেপিলে মানুষ করেছি। তখন আপনাদের অঘোর দেববর্মা মাত্র ১৫০ টাকা পেতেন পার্টি থেকে। আর পার্টি ভাঙ্গার পরে কী অবস্থা আমাদের, সব চলে গেছে নতুন পার্টি সি পি ই এম-এ। অঘোর দেববর্মা একা। আর এখন সেই অঘোর দেববর্মাকেই কিনা পার্টিতে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে। ADC-তে তাকে দাঁড়াতে দিলো না। আপনি অঘোর দেববর্মার পাশে থাকবেন কিন্তু।' অঘোরবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রীতে চলে গেলাম গোলবাজারে। সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে আমি গেলাম 'অক্ষর' -এর শুভব্রত দেবের Caxton প্রেসে। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায়। সেখানে দেখা হলো সি পি এম-এর প্রাক্তন M.L.A. প্রয়াত ক্ষিতি বর্মণের স্ত্রী গীতা দেববর্মার সঙ্গে। গীতা হলেন, ত্রিপুরার প্রাক্তন M.P. বংশী ঠাকুরের মেয়ে। নগেন্দ্র জমাতিয়া এই গীতার বাড়িতেই ভাড়া থাকেন। নগেন্দ্রবাবুর ঘরে ঢুকতেই তিনি একটা তাঁর লেখা দিলেন পড়তে। দৈনিক সংবাদে বেরিয়েছে লেখাটা। সেই লেখায় তিনি ত্রিপুরার উপজাতীয় দলগুলির ভারতের জাতীয় দলে মিশে যাবার সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি তার করণ ও ব্যাখ্যা করলেন আমার সঙ্গে। আমার বান্ধবী পবিত্ররাণী জমাতিয়াও অংশ নিলেন আলোচনায়। আলোচনা দীর্ঘ হলো। ADC'র নির্বাচনে অংশ নিতে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী খার্চি পুজোর পরের দিন অম্পি বেরিয়ে যাবেন বললেন। বান্ধবী বললেন, 'অম্পির সিটটা যুব সমিতিই পাবে।' ওখান থেকে রাত ১০ টায় ফিরলাম বাসায়।

৫ই জুলাই, ১৯৯৫. বুধবার। সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যাকে বলে আষাঢ় মাসের বৃষ্টি। ফুলকুমারী কোনোমতে আফিসে গেলেন। আমি গেলাম না বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বৃষ্টি মাথায় তানিয়া বেরোলো কলেজে, সুরঞ্জন ছবি তুলতে। বিকেলে আমি গেলাম নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায়। যেতেই আমার মারে (বান্ধবী) পবিত্ররাণী জমাতিয়া কাঁঠাল বিচির গোদক (ককবরকভাষী উপজাতিদের রান্না করা এক প্রকার সুস্বাদু তরকারি। অতীতে কাঁচাবাঁশের চোঙার ভেতরে এটি রান্না করা হতো) আর আওয়াঙ ছকবাঙ (এক প্রকার fried rice বা একপ্রকার পিঠে। এই পিঠে রান্না করতে দুটো হাঁড়ি লাগে। ওপরের হাঁড়িতে থাকে মসলামাখা বিন্নি চাল। এই চালের সঙ্গে কষা মাংসও দেয়া যায়। অনেক সময় ঘি দিয়ে এই বিননি চাল মাখা হয়। যার যেমন সঙ্গতি, সেইভাবে এই পরম সুস্বাদু পিঠে করতে পারে। প্রথম হাঁড়ির তলায় চালনির মতো ছেঁদা থাকে। দ্বিতীয় হাঁড়িতে থাকে জল। নীচের হাঁড়ির জলের ভাপে ওপরের হাঁড়ির চাল সিদ্ধ হয়) এনে দিলেন খেতে। গোদক দিয়ে ত্রিপুরী পিঠে খেতে দারুণ লাগলো। আমার বন্ধু নগেন্দ্রবাবু বাইরে গিয়েছিলেন, একটু পরে এলেন। বললেন, 'পাহাড়ে মিশনারীরা প্রচুর স্কুল খুলেছেন ইংলিশ মিডিয়ামে। পাশাপাশি চার্চ ও করছেন তাঁরা। আর আমাদের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। কাজেই খ্রিষ্ট ধর্মের দিকেই ঝুঁকবে সবাই, আর চাইবে Roman Script শ্যামাচরণ ত্রিপুরা তাঁর একটা লেখায় বলেছেন এভাবে চলতে থাকলে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ত্রিপুরার সব উপজাতি গোষ্ঠীর লোক খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে।'

৬ই জুলাই, ১৯৯৫, বৃহস্পতিবার। ২১শে আষাঢ় উপজাতিদের খার্চি পূজা। আজ পুরোনো

আগরতলায় চতুর্দশ দেবতার পুজো অর্থাৎ খার্চি পুজো। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে যাবো ঠিক করলাম। সকাল ৭টা নাগাদ গেলাম কর্নেল চৌমুহনীতে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা আনতে। পত্রিকা অফিসের পাশে চায়ের দোকানে বসে আছেন কবি নন্দকুমার দেববর্মা। তাঁকে দেখেই তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। জানতে পারলাম, গত মাসে কবি চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং ও তিনি গিয়েছিলেন কোহিমায় সাহিত্য অকাদেমির মিটিংয়ে। আসাম থেকে কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, শিলং থেকে খাসি কবি দেসমণ্ড খার্মাফ্লেং প্রমুখ ওই মিটিংয়ে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা প্রথম উঠেছিলেন দিমাপুর এক হোটেলে, তারপর সেখান থেকে নাগাল্যাণ্ডের সাহিত্য অকাদেমির লোকেরা এসে তাঁদেরকে নিয়ে যান। তাঁদের কোহিমায় দু'দিনের অবস্থানের সময় খুব দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছিলো। দোকান-পাট প্রায় সব ছিলো বন্ধ। কোনোরকমে একটা ছোট্ট ঘরে তাঁদের মিটিং হয়। নাগা বা মিজো সাহিত্যিকরা সকলেই ইংরিজিতে তাঁদের সাহিত্য পাঠ করেন। নাগা বা মিজো ভাষায় কোনো সাহিত্য গড়ে ওঠেনি। কোহিমায় সবই Western culture। মনে হয়েছে কোহিমাকে লণ্ডন শহর। নাগা শিল্পীরা বেটোফেনের সুর বাজিয়ে শোনালেন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক শেকড় থেকে দূরে সরে গেছে। মিটিংয়ের পরে নন্দবাবু ছাড়া সকলেই আকণ্ঠ সুরা পান করলেন। অথচ নাগাল্যাণ্ডে মদ নিষিদ্ধ। নাগারা মদ খেলে মেয়ে-পুরুষে উলঙ্গ নৃত্য করে। তাই নাগাল্যাণ্ড সরকার মদ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কোহিমায় জলের খুব অভাব। প্রায় শিলংয়ের মত উঁচু শহর কোহিমা। পাইন গাছ আছে সেখানে শিলংয়ের মতো।

১০টা নাগাদ আমরা স্বামী-স্ত্রীতে পুরোনো আগরতলায় খার্চি পুজোয় গেলাম। চতুর্দশ মন্দিরে সব পুরোহিতই ট্রাইবেল। এই পুরোহিতদেব বলা হয় চন্তাই। ত্রিপুরাব রাজারা ব্রহ্মপুত্রেব উৎসমুখে বসবাসকারী চুতিয়া উপজাতিদের থেকে চতুর্দশ দেবতার মন্দিরেব পুরোহিতদের এনেছিলেন। ত্রিপুরার ককবরকভাষার সঙ্গে চুতিয়া ভাষার বেশ মিল আছে। আসলে ককবরক ও চুতিয়া একে অন্যের সহোদরা। আর, খার্চি শব্দটি আসলে ককবরক ভাষায় খার-ছি। অর্থাৎ পালাতে জানা। ককবরকে খার অর্থ পালানো ও ছি অর্থ জানা। যে দেবতাদেব পুজো করলে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ভালোভাবে পালানো যায়। তাঁরাই হলেন খারছি দেবতা। অবশ্য এটা আমার নিজস্ব ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। প্রতি মিনিটে একটা করে পাঁঠা বলি হচ্ছিলো। খার্চি পুজোর প্রথম দিনে উপজাতিদের ভিড়ই ছিলো সমধিক। যাঁরা পাঁঠা বলি দিচ্ছিলেন, তাঁরা সকলেই ট্রাইবেল। আমি ঘুরে ঘুরে পুরনো রাজবাড়িব ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। বাসায় ফিরে বিকেলে গেলাম স্বামী-স্ত্রীতে অসুস্থ বীরচন্দ্র দেববর্মাকে দেখতে। দেখলাম মশারির মধ্যে তিনি আপন মনে কথা বলে চলেছেন। তাঁর মাকেও আমি দেখেছি এইভাবে বিড়বিড় করতে।

৭ই জুলাই, ১৯৯৫ ২২শে আষাঢ়, শুক্রবার। সকাল ৭টায় আমার স্ত্রী ফুলকুমারী দেববর্মাকে নিয়ে গেলাম এ্যাডভাইসর চৌমুহনীর ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরার্টরিতে। সেখানে তাঁব রক্তের TC DC BLH এর জন্যে রক্ত দেয়া হলো। এই রিপোর্টও তাঁর কলকাতায় করানো T3 T4 TSH-এর রিপোর্ট নিয়ে যেতে হবে ডাঃ এস আর দেবের কাছে। বাড়ি ফিরে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা নিয়ে এলাম। পুত্র সুরঞ্জনের ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ, সে বেরোলো ৯.৩০-এ। কন্যা নন্দিনীও কলেজে গেলো ওই একই সময়ে। কনিষ্ঠা কন্যা দেবযানী বেরিয়ে গেছে সকাল ৮টায় তাঁর ইংরিজির মাষ্টার মণিলাল চ্যাটার্জির কাছে। আমরা দরজা-জানলা বন্ধ করে স্বামী-স্ত্রীতে বেরোলাম ঠিক ১০টায়। স্ত্রীর পূর্বাশা অফিস থেকে আমি হেঁটে চলে গেলাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ক্লাশ ছিলো ১১.৩০-এ। ক্লাশে গিয়ে দেখি চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ বাঙলা বিভাগে ভাষণ দিচ্ছেন। সভাপতি উপাচার্য অধ্যাপক যমুনাধর পাণ্ডে। কাজ পরিচালনা করলেন বিভাগীয় প্রধান ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদ। ত্রিপুরা সরকারের প্রচার বিভাগের প্রাক্তন অফিসার অগ্নি আচার্য গৌড়ীয় মঠের সাধুদের সঙ্গে সকলের

পরিচয় করেদিলেন। সভার ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অধ্যাপক ডঃ কমল কুমার সিংহ। ক্লাশের পরে লাইব্রেরীতে বই আনতে গিয়ে দেখা হলো ডঃ কানুলাল ধরের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে চা খেলাম। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে ঢুকলাম বনমালীপুরে কমরেড অঘোর দেববর্মার বাড়ি। দেখলাম তাঁর স্ত্রীর খুব অসুখ। অঘোর বাবুর সঙ্গে বিক্সায় ৭টায় এলাম বিদ্যুরকর্তা চৌমুহনীতে। তিনি যাবেন সমীর বর্মণের বাড়ি প্রাক্তন বিধায়ক নকুল দাস ও তাপস দেকে নিয়ে পেনসন বাড়ানোর ব্যাপারে আলোচনা করতে। বাসায় ফেরার কিছুক্ষণ পরে এলেন কমরেড প্রশান্ত কপালী। তিনি ADC'র নির্বাচনে চড়িলাম এ কাজ করতে বললেন। আমি বললাম, 'অঘোর দেববর্মার সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিন ও তাঁকে ফিল্ডে নামান। পরপর চারবার বিধানসভায় তিনি জিতেছেন ওই এলাকা থেকে। ওই এলাকার বাঙালী-উপজাতিদের নাড়িনক্ষত্র জানেন অঘোরবাবু। তাঁকে নেগলেক্ট করবেন না।' তিনি আমার স্ত্রীর দেয়া কড়া জর্দা দিয়ে পান চুবুতে চুবুতে আমার কথা শুনতে লাগলেন।

৮ই জুলাই, ১৯৯৫ ২৩শে আষাঢ়, শনিবার । আজ সেকেণ্ড সেটার ডে। স্ত্রীর অফিস নেই, তাই তিনি আস্তাবল বাজারে বাজার করতে যাবেন বললেন। আমি সঙ্গে যেতে চাইলেও নিলেন না। বেশ দামী এক খানা কাপড় পরে বাজারে গেলেন। আমিও বেরিয়ে প্রথমে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা নিয়ে গেলাম দৈনিক সংবাদ পত্রিকা নিতে বিদুরকর্তা চৌমুহনীতে। ফিরে এসে দেখি ফুলকুমারী ৯০ টাকা খরচ করে দারুণ বাজার করে এনেছেন। মাছ দু'রকম - ইলিশ ও কুচো চিংড়ি. টাইবালদেব কাছ থেকে শাকপাতা এনেছেন প্রচুর। আমি স্নান সেরে চিংড়ি মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে গেলাম ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার বাড়ি ফুলকুমারীর রক্তের রিপোর্ট নিতে। সেখান থেকে গেলাম করবী দেববর্মণের বাড়ি বিজয় কুমার চৌমুহনীতে। দোতলায় উঠে দেখি করবী দেববর্মণের জামাই প্রাক্তন মন্ত্রী রতন চক্রবর্তী গেস্ট রুমে বসে পত্রিকা পড়ছেন। একটু পরে ডাঃ নীলমণি দেববর্মা তাঁর জামাইয়ের পাশে একটা চেয়ারে বসলেন। শুরু হলো আসন্ন ADC নির্বাচনের কথা। কংগ্রেস-যুব সমিতি সিট ভাগাভাগি হওয়ার কথা। রতন বাবু বললেন, 'কংগ্রেস যে উপজাতিদের মধ্যে একটা নিজস্ব কংগঠন করতে পারলোনা, এটা খুব দুঃখের । শুধুমাত্র উপজাতি যুবসমিতির ওপর নির্ভর কবলে ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে কংগ্রেস কখনোই নিজস্ব সংগঠন কবতে পারবেনা ।' ডাক্তার বাবু বললেন, 'সকালে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সাহানা সেনগুপ্ত, প্রশান্ত কপালী দিনেশ সাহা ও মিহির দত্ত এসেছিলেন সি পি আই ক্যানডিডেট কুঞ্জ দেববর্মার নির্বাচনের জন্যে চাঁদা নিতে । তবে আমতলী গোলাঘাটী কেন্দ্রে কুঞ্জ দেববর্মাকে না দিয়ে অঘোর দেববর্মাকে দেয়া উচিত ছিলো । আফটার অল তাঁর একটা ইমেজ আছে ।' করবী দি একটু বাদে চা এনে দিলেন এবং পরে আম কেটে এনে তার জামাই ও আমাকে দিলেন খেতে । ওখান থেকে বেরিয়ে পাশেই গেলাম নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায়, তাঁকে কিছুটা সুস্থ দেখলাম । বিকেলে ডঃ এস. আর. দেবের কাছে গেলাম স্ত্রীকে নিয়ে । সেখান থেকে জগন্নাথ মন্দিরে রথের বাজারে । সেখান থেকে বাড়ি ।

৯ই জুলাই, ১৯৯৫। ২৪ শে আষাঢ়, রবিবার, একাদশী । আজ সারাদিন নিরম্বু উপবাস থাকলাম । রাত্রে সাগু-কলা-গুড এবং তিন খানা আটার রুটি খেলাম । সকালে এলেন সি.পি.আই -এর ও বি সি নেতা সুরেন্দ্র দেবনাথ । তিনি আমতলি গোলাঘাটী-কেন্দ্রে এ ডি সি'র নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করলেন । সি.পি.আই পার্টির ত্রিপুরায় দুর্বলতার কারণের জন্যে বর্তমান নেতৃত্বকে সমালোচনা করলেন এবং অদূর ভবিষ্যতে এই পার্টি নাও করতে পারেন এমন ইঙ্গিত দিলেন । সন্ধ্যের দিকে ছেলেমেয়েরা বাইরে, আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে । আমার স্ত্রী বললেন, 'দ্যাখো, দু'দুটো মেয়ে বড়ো হয়ে এসেছে; একটাও পয়সা নেই আমাদের, ওদের বিয়ে দেবে কী করে, সারাজীবন তো আয়

রোজগার করলে না। তানিয়ার জন্যে একটা মুড়াসিং (ককবরক ভাষার উপভাষাভাষী এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়) ছেলে এসেছে, ছেলেটি এগ্রিকালচারের গেজেটেড অফিসার, প্রদীপ এনেছে সম্পর্কটা।' আমি বললাম, 'এখন মেয়েদের বিয়ে নয়। আগে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করিয়ে দিই, যাতে ভবিষ্যতে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে ওরা।' স্ত্রী বললেন, 'একটা বাড়িও নেই আমাদের, বয়েস হয়েছে, এখন নিজের বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে আমার। তোমার কলকাতার দাদাদের কাছে টাকা চাওনা এক লাখ, পরে আমি শোধ করে দেবো।' আমি বললাম, 'কলকাতা দাদাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছি আমি। তাঁরা আমার ওপর মোটেই সন্তুষ্ট নন, কিছুই করতে পারিনি আমি-তাঁদের আফসোস। কাজেই কলকাতার বাড়িতে টাকা চাওয়া নয়।'

১০ই জুলাই, ১৯৯৫। ২৫শে আষাঢ় সোমবার। আজ সকালে ৬.৩০ এ জগন্নাথ বাড়ির দিঘিতে গিয়ে সাঁতার দিয়ে স্নান করলাম। তারপর গেলাম দৈনিক সংবাদ পত্রিকা নিতে বিদুরকর্তা চৌমুহনীতে। কাগজের হেডিংয়ে পড়লাম কলকাতার পুর্নির্বচনে বামফ্রন্টের শোচনীয় বিপর্যয়। ১৪১ টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট বিরোধী হাওয়া লক্ষ্য করেছিলাম। দেখলাম সি পি এম খুব discredited হয়ে গেছে। কলকাতা বা পঃ বঙ্গের বাঙালিরা আমেরিকা বা ইংলন্ডের বহু জাতিক কর্পোরেশনের সঙ্গে হবনবিং পছন্দ করছেন না। অনেককে বলতে শুনলাম, সিপিএম-এর বাংলায় আবার ইংরেজরা কলোনি করতে আসছে। ৯.৩০ এ সুরঞ্জন বেরিয়ে গেলো ত্রিপুরা অবজার্ভার অফিসে তাঁর একটা ইংরাজি লেখা টাইপ করতে। তানিয়া বেরোলো ৯.৪৫ এ। আমরা স্বামী-স্ত্রী ১০টায় বেরিয়ে পূর্বাশায় গেলাম। সেখান থেকে গেলাম মঠ চৌমুহনীতে ব্যাঙ্ক অফ বরোদায়। সেখানে ফুলকুমারী তাঁর ২৪১ নং এ্যাকাউন্টে ১০০ টাকা জমা দিলেন। মঠ চৌমুহনী থেকে ফুলকুমারী গেলেন পূর্বশায়। আমি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি খুলে গেলাম ডঃ আমেদের কোয়ার্টারে। ককবরকের সার্টিফিকেট কোর্সের সেসন শুরু করবার notification করার জন্যে তাঁর দরকার। এর মধ্যে দেখলাম অধ্যাপক কমল কুমার সিংহ ক্লাস নিয়ে ফিরছেন। তাঁর সঙ্গে ফিরে গেলাম বাঙলা ডিপার্টমেন্টে। হঠাৎ করে ডঃ আমেদ এলেন সেখানে। বললেন, V.C 'র বিল্ডিংয়ে গিয়েছিলেন গাড়ির জন্যে ককবরকের পরীক্ষার খাতা পরীক্ষকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে। আমি বাদে ককবরকের পরীক্ষক হলেন বিধানসভার নরেশচন্দ্র দেববর্মা, আকাশবানীর নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা এবং বেসিক ট্রেনিং কলেজের নিতাই আচার্য। বুধবারে গাড়ি পাওয়া যাবে। ডঃ আমেদের সঙ্গে কথা সেরে কমলবাবু ও আমি গেলাম V.C. 'র বিল্ডিংয়ে। কমল বাবুর লাইব্রেরী কমিটির মিটিং ২ টোয়। আর আমার বাঙলার ভাষাতত্ত্বের ক্লাস ২-৩০-এ। আমরা দু'জনে সময় কাটাতে লাগলাম Asst Registrar K.B. Jamatia'র রুমে। জমাতিয়া সাহেব তখন ছিলেন না। আমি বললাম, 'এবার কলকাতায় গিয়ে অধ্যাপক স্বপন বসুর কাছ থেকে জানলাম, কলকাতার বহু অধ্যাপক নাকি দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা নিচ্ছেন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ডক্টরেট করার ব্যাপারে। আমাদের এক বন্ধু অধ্যাপক ব্যানার্জি নাকি পনেরো হাজার টাকার কমে কাউকে তাঁর কাছে গবেষণা করতে দেন না।' কমলবাবু বললেন, 'সে রোগ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়েও ধরতে শুরু করেছে।' কমলবাবুর কথা শুনে আমার চোখ কপালে উঠলো। কমলবাবু লাইব্রেরী কমিটির মিটিংয়ে গেলেন, আর আমি গেলাম ক্লাসে। দেখলাম ডঃ দুলাল চক্রবর্তী ক্লাস নিচ্ছেন। আমি ওয়েটিং রুমে বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। ক্লাস শেষে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরাটরি বন্ধ করে গেলাম MBB কলেজের পেছনে অধ্যাপক সত্যেন পালের কোয়ার্টারে। অধ্যাপক পালের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় প্রখ্যাত গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগলের নব বারাকপুরের বাড়িতে। সেই ৬৪-৬৫ সালে। তাঁর গবেষণার কাজে তিনি প্রায়ই যেতেন যোগেশ

বাগলের কাছে। যোগেশবাবু অধ্যাপক পালকে সিরিয়াস ধরনের গবেষক মনে করতেন। দু'জনে মিলে পুরোনো দিনের অনেক কথা হলো। সেখান থেকে ৪-৩০ এ উঠে চলে এলাম পূর্বাশায়। দেখলাম আমার স্ত্রী বেরিয়ে পড়েছেন। ২ টাকায় একটা রিক্সা নিয়ে তাঁকে সুখময় সেনের বাড়ির কাছে ধরে ফেললাম। তারপর আমরা তুলসীবতীর বাজারে গিয়ে বাজার করে বাসায় ফিরলাম ৬.১৫তে। ফিরেই দেখি শ্যালক সুনীল দেববর্মা সস্ত্রীক হাজির। তার সঙ্গে এ ডি সির নির্বাচন নিয়ে কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি করলাম পরে ৭টায় বেরিয়ে একুশ শতক পত্রিকার অফিসে গিয়ে হাচুক খুরিঅ'র অনুবাদ দিলাম সম্পাদক শুভব্রত দেবকে। সেখান থেকে নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায়। সেখানে আবার দেখা হলো সি.পি..এম পার্টির প্রয়াত MLA ক্ষিতি বর্মণের স্ত্রী গীতা দেববর্মার সঙ্গে। তিনি মায়ের বাড়ি বিক্রি করতে এসেছেন। দালান সমেত এককানি একগন্ডা বাড়ি। কমপক্ষে ২৫-৩০ লাখে বিক্রি হবে। সবকারের সঙ্গে দরাদরি হচ্ছে। গীতা চা খাওয়ালেন। নগেন্দ্র বাবুও যোগ দিলেন। গীতা বললেন, তিনি আর রাজনীতি করবেন না। রাজনীতির পার্টি মানে এখন প্রস কোয়ার্টার। তবে তিনি সিপিএম কে সমর্থন করেন। ঘড়ি দেখলাম, রাত ন'টা।

১১ই জুলাই, ১৯৯৫। ২৬ শে আষাঢ় - মঙ্গলবার। খুব ভোরে স্ত্রীর পাশ থেকে চুপিচুপি উঠতেই হাসি রায়ের আলেখ বাবার মন্দির থেকে মধুর প্রভাতী সঙ্গীত কানে এল। সকাল৬.৩০ টায় এলেন নগেন্দ্র জমাতিয়া তাঁর বডিগার্ড যুগল কে নিয়ে। তিনি আমার কাছ থেকে পুরনো দেশ পত্রিকা নিলেন বেশ ক'খানা বিশেষ করে অন্নদা দত্ত ও নীরদ. সি. চৌধুরীর লেখা যেগুলোতে আছে। যাবার সময় বললেন, 'দ্রাহুদা (প্রাক্তন মন্ত্রী দ্রাহু কুমার রিয়াং) আপনার কাছাকাছি কোথায় চলে এসেছেন। পেনসনের ভাতা আটক করে রেখেছে সিপিএম সরকার, ১৫ হাজার বাড়ি ভাড়া টাকা বাকী পড়েছে, মালিক ১০দিনের নোটিশ দেয় এবং বলে ১০ দিনের মধ্যে এই ১৫ হাজার টাকা দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে। মালিক কংগ্রেস-ই, কিন্তু মালিক তো, কতদিন আর বাড়ি ভাড়া ফেলে রাখতে পারবেন'? পরে সুধীর মজুমদার (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) বাড়িঅলাকে ১০ হাজার টাকা দিয়ে দ্রাহুদার মান বাঁচিয়েছেন। বলেছেন, আর পাঁচ হাজার টাকা উনিই ব্যবস্থা করে দেবেন। বামফ্রন্ট সরকার দ্রাহুদাকে ৮২ হাজার টাকার নোটিশ দিয়েছেন মন্ত্রীর কোয়ার্টার ছাড়ার সময়। এই টাকা শোধ করে না দেওয়া পর্যন্ত MLA ভাতা আটক থাকবে। আমাদের উপজাতি যুবসমিতির সব প্রাক্তন MLA-র ভাতা আটক করে রেখেছে সরকার, আমরা নাকি কোয়ার্টার ছেড়ে দেওয়ার সময় হাজার হাজার টাকার সরকারি সম্পত্তি নিয়ে গিয়েছি, তার জন্যে আমাদের MLA ভাতা আটক? সিপিএম সরকারের এ কী ভিনডিকটিভ এ্যাটিচিউড বলুন না?'

সাড়ে ১০টায় বড় মেয়ে তানিয়াকে নিয়ে গেলাম মোটরস্ট্যান্ডের মনোজ তলাপাত্রের হোমিওপ্যাথিক দোকানে। তানিয়া বাথরুমে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে, মনুজবাবু ওষুধ দিয়ে দিলেন। পরে তানিয়াকে তার women's college-এ দিয়ে আমি চলে গেলাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যাপক সুদীপ বসুর সঙ্গে দেখা হতেই বল্লেন, 'কুমুদ দা, Syndicate আপনার ছুটি Sanction করে নি, Regretted বলে Syndicate মন্তব্য করেছে, কাজেই আপনার ২৭ দিনের বেতন কেটে নেবে। সুদীপ এর কথা শুনে আমার ত মাথায় হাত। তাড়াতাড়ি গেলাম ডঃ সিরাজউদ্দীন আমেদের কাছে। তাঁকে গিয়ে বিপদের কথা বলতেই, তিনি বললেন, 'আপনার এই ব্যাপার নিয়ে আমি Registrar রায় চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলেছি, আপনি Fixed pay Employee, তাই আপনারও কোন ছুটি নেই, কামাই করলেই বেতন কেটে নেবে। তবে Syndicate বা V.C. বিশেষ ক্ষমতা বলে আপনার জন্যে বিশেষ ছুটি মঞ্জুর করে দিতে পারতেন।'

সিরাজ সাহেবের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে লাইব্রেরী যেতেই দেখি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ পাল আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, তাঁকে নিয়ে যেতে হবে দৈনিক সংবাদ অফিসে । হেঁটেই গেলাম আমরা। দৈনিক সংবাদে ঢুকতেই গবেষক-লেখক জহর আচার্যের সঙ্গে দেখা । দেখা হতেই বললেন, 'আরে কুমুদ বাবু, আপনার বাসায় যাচ্ছিলাম, কিছু সুখবর আছে ।' বললাম, 'আগে ওপরে চলুন, মৃণালবাবু (মৃণাল কান্তি কর)'র সঙ্গে সত্যেন বাবুর আলাপ করিয়ে দিয়ে আমরা বেরিয়ে সব শুনব সুখবর ।' মৃণাল বাবুর সঙ্গে অধ্যাপক পালের পরিচয় করিয়ে দিয়ে জহর বাবু ও আমি বেরিয়ে পড়লাম। জহরবাবুকে বললাম, 'ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খেতে হবে ।' উনি আখাউড়া রোডের নির্মল রেষ্টোরেন্টে গিয়ে বিরিয়ানির অর্ডার দিলেন । তারপর বললেন, 'কে.এল.ফার্মা আমার পুরাতনী ত্রিপুরা বইখানা ছাপতে রাজী হয়েছে আর মুদ্রা বিশেষজ্ঞ বসন্ত চৌধুরী ভূমিকা লিখে দেবেন ।' সুসংবাদটা শুনে খুব খুশি হলাম আমি । তারপর দুজনে বেরিয়ে এলাম পুরনো RMS চৌমুহনীর STUDIO CLICK -এ দিলীপ দেববায় (আমার বাসার মালিক) এর ওখানে। স্টুডিওতে ঢুকতেই কবি দিব্যেন্দু নাগ আমাকে বললেন, 'আপনিত এক লাখ টাকা পুরস্কার পাচ্ছেন, অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা এখবরটা একমাস আগে আমাকে বলেছেন ।' আমি বললাম, 'মেঘ জমতে শুরু করেছে, কিছু বৃষ্টি হবেই ।' আমার কথা শুনে হেসে উঠলেন সকলে। এরপর দিলীপবাবু মহেন্দ্র মাস্টার (মহেন্দ্র দেববর্মা, বিজয়কুমার পাঠশালার প্রাক্তন শিক্ষক) এর ছবি দিলেন আমাকে । ছবিখানা বিজয় কুমার স্কুলের শতবার্ষিকী স্যুভিনিরে ছাপা হবে ।

১২ই জুলাই, ১৯৯৫। ২৭ শে আষাঢ়, বুধবার । সকালে উঠে ছাদ ঝাঁট ও চোখের ব্যয়াম করার পরে চা খেলাম তানিয়ার হাতের । আমাকে বাজারে যেতে না দিয়ে ফুলকুমারী নিজেই গেলেন বাজারে । আমাকে বললেন, 'তুমি দেখে-শুনে শাক-পাতা কিনতে পার না ।' তিনি আস্তাবল বাজার থেকে কচু ফুল ও বাঁশেব কড়ুল নিয়ে এলেন এবং তা দিয়ে রান্না করলেন গোদক । এক অবিশ্বাস্য ধরনের স্বাদ হয়েছিলো । দশটায় তিনি ছেলে সুরঞ্জনকে নিয়ে অফিসের দিকে বেরিয়ে পড়লেন । সুরঞ্জন তার মাকে পূর্বাশায় নামিয়ে দিয়ে যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস করতে । সে ইংরেজিতে M.A পড়ছে । তানিয়া (নন্দিনী) ও কলেজে চলে গেল ১-৩০ এ । ছোট মেয়ে দেবযানী ও আমি থাকলাম। দেবযানী তলস্তয়ের আন্না কারেনিনা প্রথম খন্ড পড়ে শেষ করেছে গতকাল, আজ রেস্ট নিচ্ছে, কাল থেকে শুরু করবে দ্বিতীয় খন্ড । আজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইনি, ক্লাস হচ্ছিল না । আড়াইটেয় বেরিয়ে সেক্রেটারিয়েটের Translation Cell - এ গেলাম কাকা শ্বশুর বীরকুমার দেববর্মার সঙ্গে দেখা করতে । আমার শ্বশুর বাড়ির এলাকা হলো এডিসি'র আমতলী-গোলাঘাটী কেন্দ্রে । এই কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছেন C.P I-এর কুঞ্জ দেববর্মা। ভোট ২৯শে জুলাই । প্রতিপক্ষ হলেন T.N. V. দলের প্রার্থী অনন্ত দেববর্মা । কাকা বীরকুমার বললেন, 'উপজাতি যুবক-যুবতীদের ভোট T.N. V'র দিকে বেশীর ভাগ চলে যেতে পারে । কুঞ্জ দেববর্মকে Candidate না করে অঘোর দেববর্মাকে দাঁড় করালে তিনি তাঁর Personal image -এ অনেক ভোট টানতে পারতেন ।' আমি বললাম, 'শনিবারে আমি হেরমায় যাবো, তখন বুঝবো এলাকাব সার্বিক অবস্থা ।' কাকার অফিসে পঞ্চরাম রিয়াং আমাকে ধন্যবাদ জানালেন তাঁব ছোট বোনকে বিজয়কুমার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার জন্যে। কাকা শ্বশুরের অফিস থেকে বেরিয়ে গেলাম Employment Exchange Office-এ জহর আচার্যির সঙ্গে দেখা করতে । আমার শালা বিমলের O.N.G.C তে একটা Interview পাবার ব্যাপারে আলোচনার জন্যে। জহর বাবুর ওখান থেকে বেরিয়ে রওনা দিলাম মেলারমাঠে দেবপ্রদাস সেনগুপ্তর বাড়ির দিকে । রাস্তায় দেখা হলো Tribal Language Cell -এর প্রধান সুরেন্দ্র দেববর্মার সঙ্গে । তিনি এই Cell কে SERT

'র সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অনুযোগ করলেন। আমাকে বললেন, 'আপনি তো এই Cell এর Advisory Committee তে আছেন, আপনি এর প্রতিবাদ করুন।' আমি বললাম, 'শ্যামলাল দেববর্মার সঙ্গে এবিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করবো।' দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর বাড়িতে গিয়ে আমতলী-গোলাঘাটী কেন্দ্রের নির্বাচন নিয়ে কিছু তর্কাতর্কি করে গেলাম C.P.I Office এ। পার্টির সেক্রেটারি সুনীল দাশগুপ্তর হাতে আমার একখানা চিঠি দিয়ে গেলাম অঘোর দেববর্মার বাড়ি। তিনি বললেন, তাঁর পক্ষে আমতলী-গোলাঘাটী কেন্দ্রে কুঞ্জ দেববর্মার পক্ষে প্রচারে যাওয়া কোন মতে সম্ভব হবে না। অঘোর বাবুকে বললাম, 'হেরেমায় ১৬ই জুলাই নির্বাচনী মিটিং, আপনি চলুন, মানিক সরকারও থাকবেন।' তিনি বললেন, 'আমাকে টানার চেষ্টা করবেন না, পারলে আপনি যান।' আঘোর বাবুর বাড়ি থেকে এলাম ISCUS ভবনে। ISCUS সেক্রেটারি হরিহর বাবু একখানা চিঠি দিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীতে দেওয়ার জন্যে।

১৩ ই জুলাই, ১৯৯৫। ২৮শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার। সকাল ৬.৩০ এ কমরেড দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত এলেন রিক্সায় চেপে। ৮৪ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামীকে যুবকের মতো জমা-পেন্ট পরে আসতে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললেন, 'আগামী কাল C.P.I অফিসে এ.ডি.সি'র নির্বাচন কমিটির মিটিং, ব্রাদার, অবশ্যই যাবেন। আর, পারলে সুপারি বাগানে প্রত্যূষ চক্রবর্তীকে বলবেন, আজ আমাদের বাড়ি যেতে; পার্টিব কতগুলো নির্বচনী ফেস্টুন করতে হবে।'

দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর কমরেড আঘোর দেববর্মা এলেন। অঘোর বাবু দেবুবাবুর চল্লিশের দশকের মার্কসবাদী শিষ্য। বললেন, 'পার্টি আমাকে আমতলী-গোলাঘাটী কেন্দ্রে না দাঁড় করিয়ে কুঞ্জ দেববর্মাকে দাঁড় করাল, কুঞ্জ এ.ডি.সি'র ব্যাপারে কী বুঝবে, অথচ আমি এ.ডি.সি'র বিষয় নিয়ে লেখা-লেখি করছি, এ.ডি.সি কে গড়ার কথা ভাবছি, আর দেববাবু কি না শেষ পর্যন্ত আমাকে সমর্থন না করে কুঞ্জকে সমর্থন করলেন! আমি হলাম পার্টির সেনাপতি, তাত্ত্বিক নেতা, আমাকে যখন বধ করা হয়েছে, তখন আমি আর নির্বাচনী প্রচারে নামব না। আমতলী-গোলাঘাটী কেন্দ্র ট্রাইবেল্ল ইনটেলেকচুয়ালদের জায়গা, কুঞ্জকে সেখানে গেলানো যাবে না। এ এলাকায় আমি ৫২ সাল থেকে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছি, চারবার এম.এল.এ হিসাবে জিতেছিও এই এলাকা থেকে আমি এই এলাকার নাড়িনক্ষত্র জানি, কি আর বলব বলুন! ভেবেছিলাম সি.পি.আই পার্টিটাকে আবার গড়ে দিয়ে যাব, ক'বছর-ই বা আর বাঁচব বলুন, কিন্তু সে সুযোগ প্রশান্ত কপালীরা আমাকে দিল না। আমি হলাম ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম ট্রাইবেল কমিউনিস্ট কমরেড। পি সি যোশী আমার হাতে লাল কার্ড তুলে দেন। আমার দোষ হচ্ছে সি. পি. এম.কে আমি কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে মেনে নিতে পারিনে। সি. পি. এম. ও তা বোঝে, তাই আমাকে তারা গার্ড দেয়। কিন্তু আমি বামফ্রন্ট বিরোধী নই। কিন্তু বামফ্রন্ট মানে কি শুধু সি. পি. এম -এর নেতৃত্ব? এ-ভাবে চললে সি. পি. আই. এ-রাজ্য থেকে মুছে যাবে। বীরচন্দ্র দেববর্মণ যে বলতেন জুনু দাশ আর সুনীল দাশগুপ্তরা ত্রিপুরায় সি. পি. আই. পার্টিকে লিকুইডিশনে দিয়েছে, কথাটা তো মিছে নয়। আমতলী-গোলাঘাটী কেন্দ্র টি.এন.ভি খুব স্ট্রং, কাজেই কী হয় বলা যায় না।'

অঘোরবাবু চলে যাবার পর এলেন আমার স্ত্রীর পিসতুত দাদা রমেন্দ্র নারায়ণ দেববর্মা। তিনি ধারিয়াথল হাই-স্কুলের হেড মাস্টার। বললেন, 'অঘোর দেববর্মাকে দাঁড় করানো উচিত ছিল, পুরোনো নাম করা নেতা, কুঞ্জ দেববর্মাকে দাঁড় করানো ভুল হয়েছে, টি.এন.ভি'র পার্থি অনন্ত দেববর্মা এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন। আজ সকালে দেখলাম, মারুতি গাড়ি করে চারজন টি.এন.ভি নেতাকে এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে। হরিনাথের টি.টি.এন.সি পার্টির প্রার্থীর সঙ্গে যদি বিজয় রাঙ্খলের গোপন

আঁতাত হয়, তবে উপজাতি জাতীয়তাবাদী ভোট সব টি.এন.ভি পেয়ে যাবে। কাজেই সি.পি.আই পার্থীর বিপদ আছে।'

১১টা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। সিরাজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ককবরকের খাতা দেখার জন্যে মার্কস-স্লিপ আনতে গেলাম ভি.সি'র বিল্ডিং'এ। ককবরক পরীক্ষার আমি ছাড়া ৩ জন পরীক্ষক -- অল ইন্ডিয়া রেডিও আগরতলা স্টেশনের ডিরেক্টর এন.সি.দেববর্মা, ত্রিপুরা বিধান সভার ডেপুটি সেক্রেটারি নরেশচন্দ্র দেববর্মা ও বেসিক ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক নিতাই আচার্য। তাঁদের কাছে ককবরক সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষায় খাতা পৌঁছে দিতে হবে। এদিকে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ককবরক সার্টিফিকেট কোর্সের নতুন সেসান শুরু হবে আগস্ট থেকে, তারও নোটিফিকেসন আজ হবে। বিকেল চারটে নাগাদ অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য এলেন সিরাজ সাহেবের কোয়ার্টারে। ভি.সি. বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর সিরাজ উদ্দিন আমেদ ডক্টর কমল কুমার সিংহ, অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও আমাকে নিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের একটা কমিটি করেছেন। রামেশ্বর বাবু সে বিষয়ে আলোচনা করলেন। এরপর রামেশ্বর বাবুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এলাম স্যন্দন পত্রিকায়। সেখানে ককবরক প্রশ্নের জন্যে বিজ্ঞপ্তির চিঠি দিলাম। তারপর দুজনেই এলাম জহর আচার্যির খোঁজে দিলীপ দেবরায়ের স্টুডিও ক্লিক'এ। জহর বাবুর মিউজিয়ামের ২৫ তম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হবে, সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে। কিন্তু জহরবাবুকে পেলাম না। আমরা রবীন্দ্রপরিষদের দিকে পা বাড়ালাম। যেতে যেতে রামেশ্বর বাবু বললেন তাঁর এক ঠাকুরদা সংস্কৃতে একখানা বই লিখে গেছেন। সেখানে ত্রিপুরার রাজাদের প্রশস্তি আছে এবং মিথিলার ব্রাহ্মণদের ত্রিপুরার রাজারা ত্রিপুরার কুকী উপজাতীয় এলাকায় ভূমিদান করে বসতি স্থাপন করে দিয়েছিলেন, তারও উল্লেখ আছে। বিদুরকর্তা চৌমুহনী থেকে রামেশ্বরবাবু বাড়ি গেলেন সাইকেলে, আমি এলাম কর্ণেল চৌমুহনীতে ত্রিপুরা দর্পণে দর্পণ-সম্পাদক সমীরণ রায়ের সঙ্গে দেখা করে ককবরকের বিজ্ঞপ্তি দিলাম। রাত সাড়ে আটটায় বাড়ি ফিরে শুনি জহর আচার্য এসেছিলেন।

১৪ই জুলাই, ১৯৯৫। ২৯ শে আষাঢ় শুক্রবার। সকাল ৬ টায় বড় মেয়ে তানিয়া বেরিয়ে গেল তাঁর ভূগোলের প্রাইভেট টিউটর নিবেদিতা ম্যাডামের কাছে কলেজ টিলায়। ফিরল সে সকাল ৯.৩০ এ পায়ে হেঁটে। ছোট মেয়ে দেবযানী বেরিয়ে গেল ৭টায় তার ইংরিজি শিক্ষক মণিলাল চ্যাটার্জির কাছে ছাত্র সংঘের দিকে। ছেলে সুবঞ্জনের আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস ছিল না। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে বেরিয়ে পড়লাম দশটায়। ফুলকুমারীকে পূর্বাশায় নামিয়ে দিয়ে আমি গেলাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরী খুলে চলে গেলাম ডঃ আমেদের কোয়ার্টারে। আজ ককবরক পরীক্ষার খাতাগুলো বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে দিয়ে আসতে হবে। আমরা খাতার প্যাকেট গুলো গুছিয়ে নিয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের Assistant Registrar অধ্যাপক কল্যাণ বিজয় জমাতিয়ার কাছে গাড়ি চাইলাম। পেয়েও গেলাম গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে। ড্রাইভার মেঘনাদ দেববর্মা। প্রথমে গেলাম আমরা জি.বি হাসপাতালের কাছে বেসিক ট্রেনিং কলেজে। সেখানে নিতাই আচার্যকে খুঁজলাম। তারপর গেলাম তাঁর কোয়ার্টারে। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। তাঁর স্ত্রীর হাতে ককবরক 1st Paper 1st Half 'এর প্যাকেটটা তুলে দিলেন ডঃ আমেদ। বেসিক ট্রেনিং কলেজ চত্তর থেকে বেরিয়ে আমরা এলাম রেডিও স্টেশনে। সেখানে স্টেশন ডিরেক্টর এন.সি. দেববর্মাকে খুঁজলাম। তিনি ছিলেন না, গৌহাটি গেছেন। তারপর তাঁর পি.এর কাছে ককবরক 2nd Paper 1st Half এর পেকেটটা তুলে দিলেন ডঃ আমেদ এন.সি.দেববর্মাকে দিয়ে দেওয়ার জন্যে। রেডিও স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম ত্রিপুরা বিধানসভায়। সেখানে ডেপুটি সেক্রেটারি নরেশচন্দ্র দেববর্মাকে

পেয়ে গেলাম। ডঃ আহ্‌মেদ তাঁর হাতে তুলে দিলেন ককবরক 2nd Paper 2nd Half এর খাতার প্যাকেট। নরেশ বাবু চা খাওয়ালেন এবং ভারতবর্ষের ট্রাইবেল প্রব্লেম নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা করলেন আমাদের সঙ্গে। তারপর রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আমরা সোজা চলে এলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরী থেকে Attendance Register ও বই পত্র বগল দাবা করে সোজা চলে গেলাম ভাষাতত্ত্বের ক্লাসে। সেখানে ১২-৩০ থেকে ১.৩০ পর্যন্ত 1st Year এর ক্লাস নিয়ে ঢুকে পড়লাম 2nd Year এর ক্লাসে। ২-৩০ পর্যন্ত ক্লাস নিয়ে গেলাম ডঃ আমেদের কোয়ার্টারে। সেখানে যেতেই দেখি দূরদর্শনের লোকেরা ডঃ আমেদের কাছ থেকে সদ্য প্রয়াতা লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর ওপর নানা রকম তথ্য রেকর্ড করছেন। আমি ফিরে গেলাম ভি.সি'র বিল্ডিংয়ে। সেখানে এ্যাসিস্টেন্ট রাজিস্টার কে.বি.জমাতিয়ার সঙ্গে আমার ২৭ দিনের বেতন কেটে নেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করলাম। তারপর গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারি নেতা মানিক ধরের কাছে ককবরক কোর্সের নোটিফিকেশান ডেইলি দেশের কথায় ছাপার জন্যে বলতে। তিনি পত্রিকায় স্পেস-এর সমস্যার কথা বললেন। ফের ফিরে এলাম ডঃ আমেদের কোয়ার্টারে। তিনি আমাকে ৩৫১ টাকা দিলেন গতবার ককবরক পরীক্ষার পেপার সেটিং ইত্যাদির ব্যাপারে আমার পাওনা টাকা। তারপর তাঁর কাছ থেকে বই রাখার একখানা র‍্যাকের হিসেব জেনে নিলাম। এই টাকায় আমার শ্বশুর মশায়কে দিয়ে বইরাখার একখানা র‍্যাক করে নেব ঠিক করলাম। তারপর এলাম ৬টায় কামান চৌমুহনীতে সি.পি.আই অফিসে। সেখানে এ.ডি.সি'র আমতলী-গোলাঘাটী কেন্দ্রের নির্বাচন নিয়ে ইলেকশন কমিটির মিটিং ছিল। প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মিহির দত্ত, কানু সেন, সাহানা সেনগুপ্ত, অখিল দেববর্মা, সুনীল দাশগুপ্ত ও প্রশান্ত কপালী। ফটিক ভৌমিকও ছিলেন। সেখান থেকে রাত ৮.৩০ এ এলাম প্রেস ক্লাবে। প্রেস ক্লাবে ককবরকের একটা কোর্স শুরু হবে ১লা আগস্ট থেকে। সেই ব্যাপারে সেক্রেটারি সুজিত চক্রবর্তী ও সাংবাদিক শেখর দত্তর সঙ্গে আলোচনা করলাম।

১৫ ই জুলাই, ১৯৯৫। ৩০ শে আষাঢ় শনিবার। সকাল সাতটায় বেরিয়ে বিদুরকর্তা চৌমুহনী গিয়ে দৈনিক সংবাদ পত্রিকা নিয়ে এলাম। সকাল ৯.৩০ এ বেরিয়ে পড়লাম ছোট মেয়ে দেবযানীকে নিয়ে হেরমার দিকে। চড়িলাম নেমে শ্রীযুক্ত বিজয় মজুমদারের বাড়ি ঢুকলাম। সেখানে পেয়ে গেলাম চড়িলামের বামফ্রন্টের বিভিন্ন শরীক পার্টির নেতাদের। এদের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টির নেতাই বেশী। বিজয় বাবু এখন কংগ্রেস ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লক করেন। সেখানে পেয়ে গেলাম মলিন দেবনাথ, ধীরেন্দ্র কবিরাজ, কেশব চক্রবর্তী, সাধন শীল, বিজয় বাবুর ছোট ভাই হিরু বাবু প্রমুখকে। তাদের সঙ্গে আসন্ন আমতলী-গোলাঘাটী কেন্দ্রে এ.ডি.সির নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করে আমার শ্বশুর বাড়ি উপজাতি গ্রাম হেরমার দিকে পা বাড়ালাম। চড়িলাম থেকে হেরমা চার কিলোমিটার। হেঁটেই এলাম দুজনে। বিকেলে হেরমা বাজারে বামফ্রন্টের নির্বাচনী মিছিলের নেতৃত্ব দিলাম। রাতে বড় পিসি শাশুড়ি সোমরস পান করতে করতে ওর ছেলে সুভাষের তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির ব্যাপারে অনেক কিছু বললেন। সুভাষ সি আর পি এফ-এ চাকরি করে। তাঁর বৌ নিজেদের মধ্যে আরেকজনের সঙ্গে ভালবাসা জমিয়েছে। পি সি শাশুড়ির দেয়া দু'কাপ সোমরস আমাকেও পান করতে হলো। তারপর শুকরের মাংস দিয়ে ভাত খেলাম।

১৬ ই জুলাই, ১৯৯৫। রবিবার। সকালে উঠে হেরমা বাজারের দিকে গেলাম। আজ বিকেলে সি.পি.আই প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মার সমর্থনে বামফ্রন্টের জনসভা। সি.পি.এম এর গণমুক্তি পরিষদের সেক্রেটারি যুগল দেববর্মার সঙ্গে নির্বাচনী অফিসে বসে জনসভার বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম।

তারপর বামফ্রন্টের কর্মীদের নিয়ে বাজার সেড়ে জনসভার মঞ্চ করার কাজে লেগে গেলাম । এর মধ্যে কমরেড ভানুলাল সাহা এসে গেলেন গাড়ি করে । তিনি এসে নির্বাচনী অফিসে ঢুকে সি.পি.আই এর নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন আঁকা বেশ কটা ফেস্টুন দিলেন কর্মীদের হাতে । তিনি কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে নির্বাচনী খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে চলে গেলেন বিশ্রামগঞ্জের মূল নির্বাচনী অফিসে এবং বলে গেলেন ২.৩০ এর সময় কমরেড দুর্গাদাস শিকদার ও একটা ট্রাইবাল কালচারাল স্কোয়াড নিয়ে তিনি চলে আসবেন । বেলা ৪টে বাজতেই মিছিল আসতে শুরু করল । প্রথম মিছিলটি এল ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে রংমালা থেকে । তারপর বাঁশতলী, গর্জনতলী, দক্ষিণ চড়িলাম ও রামনগর থেকে পরপর জঙ্গি মিছিল এলো । আগেই প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মা এসে গেছেন । কিছুক্ষণ বাদে সি পি এম পার্টির মন্ত্রী রঞ্জিত দেবনাথ এলেন । মিটিং শুরু হলো ৫টায় । ভানুবাবু জনসভার সভাপতির নাম হিসেবে আমার এক দাদা শ্বশুর প্রাক্তন শিক্ষক ব্রজকুমার দেববর্মার নাম প্রস্তাব করতেই আমি তা সমর্থন করলাম । ভানুবাবু প্রথমে জনসভার সূচনামুলক ভাষণ দিলেন । তারপর সি.পি.আই এর রাজ্য সম্পাদক সুনীল দাসগুপ্ত, সি.পি.এম এর যুগল দেববর্মা, আ.এস.পি.র প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ও বামফ্রন্ট এর মন্ত্রী রঞ্জিত দেবনাথ-পরপর ভাষণ দিলেন । জনসভা বেশ বড়ই হলো । তবে শুনা গেল, রামনগর থেকে মিছিল আসার সময় ক্যাপ্টেন নাকি বাধা দিয়েছে । ভানুবাবু বললেন, ২২.৭.৯৫ তারিখে আমাকে নিয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলবেন ।

১৭ ই জুলাই, ১৯৯৫। সোমবার । কাকভোরে সকালে উঠে হেরমা বাজারের দিকে গিয়ে প্রাতর্ভ্রমণ করলাম এবং আমার স্ত্রী বাড়িব মাঠে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম । শাশুড়ি মায়ের রান্না করা গোদক ও চাখুই দিয়ে ভাত খেয়ে সকাল ৭টায় ছোট মেয়ে দেবযানীকে নিয়ে আগরতলায় আসার জন্যে পা বাড়াতেই শাশুড়ি মা বললেন আমার দুই শালা বৌ সারা রাত ধরে ভেদ বমি করেছে, আগরতলায় গিয়ে কাকা বীরকুমারের হাত দিয়ে ওষুধ পাঠাতে । আমবা চড়িলামেব দিকে রওনা হয়ে দক্ষিণ চড়িলামে প্রয়াত কমবেড রাখাল দেবনাথের বাড়িতে ঢুকলাম আগের কথা মতো । রাখাল বাবুর স্ত্রী অনুযোগ কবলেন, পার্টির লোকেরা কোন খোঁজ-খবর নিচ্ছে না । খুব আর্থিক সংকটে আছেন । শুধুমাত্র কমরেড দুর্গাদাস শিকদার ২০০ টাকা করে পাঠাচ্ছেন । বললেন, পার্টির আদর্শ আর আগের মতো নেই। আমি বললাম, 'চিন্তা কববেন না, আমরা সুখে-দুঃখে আপনার পাশে থাকবো।' আগরতলা এসে ৩টে নাগাদ কাকা শ্বশুর বীর কুমার দেববর্মার অফিসে গিয়ে দেখা করলাম এবং বটতলায় গিয়ে ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনে শাশুড়ির কাছে দিয়ে দেবার জন্যে তাঁব হাতে দিলাম । তারপর তাঁকে বাসে তুলে দিয়ে এলাম মেলারমাঠে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর বাড়ি । সেখানে আমতলী-গোলাঘাটি কেন্দ্রের সি.পি.আই প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মার নির্বাচনী প্রচারের বিষয়ে আলোচনা করে এলাম প্যারাডাইস চৌমুহনীতে ডাঃ এইচ.দের ই.এন.টি'র ক্লিনিকে । পুত্র সুরঞ্জনের কানের অপারেশন নিয়ে ডাঃ দের সঙ্গে আলোচনা সেরে চলে এলাম প্রেস ক্লাবে সন্ধ্যে ৭টায় । সেখানে জহর আচার্যির রাজেন্দ্র কীর্তি শালার ২৫বছর পূর্তি উপলক্ষে মিটিং । মিটিংএ সভাপতিত্ব করলাম আমি । রাজেন্দ্র কীর্তি শালার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটা অরগানাইজিং কমিটি তৈরী হলো আমাকে সভাপতি করে । আজকের এই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন-কবি কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, দর্পণ- সম্পাদক সমীরণ রায়, সংবাদিক শেখর দত্ত, কবি দিব্যেন্দু নাগ, লেখক মানস বটব্যাল, অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য, জয় নারায়ণ ভট্টাচার্য, আলোক চিত্র শিল্পি দিলীপ দেবরায় প্রমুখ । ঠিক হলো, আগামী ৫ই আগষ্ট কর্যকরী কমিটির প্রথম মিটিং অনুষ্ঠিত হবে । আর, মহারাণী বিভুকুমারী দেবী, সহদেব কর্ত্তা প্রমুখকে নিয়ে একটা উপদেষ্টা মন্ডলী করা হবে এবং মাননীয় রাজাপাল, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রমুখকে নিয়ে একটা Patron

Body থাকবে। বসন্ত চৌধুরী, ডঃ এ. এন. লাহিড়ী প্রমুখ পুরাতত্ত্ব বিদরা আসবেন রাজেন্দ্র কীর্তি শালার ২৫ বছর পূর্তি উৎসব পালন করতে।

১৮ ই জুলাই, ১৯৯৫ মঙ্গলবার। সকালে উঠে নাজির পুকুরপাড়ে আমতলী-গোলাঘাটী কেন্দ্রের এ.ডি.সি নির্বাচনের সি.পি.আই প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মার বাড়ি গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তাঁকে পেলাম না, রাত্রে ফিরে O.N.G.C কোয়ার্টারে মেয়ের ওখানে চলে গেছেন থাকার জন্যে। কমরেড কুঞ্জের পুত্রবধু আমাকে চা করে খাওয়ালেন। পুত্রবধুটির বাপের বাড়ি হলো চম্পকনগর প্রয়াত মন্ত্রী অভিরাম দেববর্মার বাড়ির কাছে। বললেন, অভিরাম দেববর্মারা খুব গরীব ছিলেন একসময়। অভিরামের মা পরের দোরে দোরে মাছ বিক্রি করতেন চালের বিনিময়ে। মাগুর মাছ শিঙ্গি মাছ দিয়ে চাল আনতেন, তখন অভিরাম পড়তেন স্কুলে। মন্ত্রী হয়ে যাবার পরেও অভিরাম মোটেই গোছাতে পারেন নি। বাড়ি ঘর দেখলে মনেই হবে না যে এটা একটা মন্ত্রীর বাড়ি।

১০টায় বেরিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুইজনে পূর্বাশায় নামলাম। তারপর আমি হেঁটে মঠচৌমুহনীর বাজারের ভিতর দিয়ে পথ দিলাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ আমেদের সঙ্গে প্রেস ক্লাবের পাশে পশ্চিম জেলা সাক্ষরতা অফিসে এলাম চারটের সময় সাক্ষরতার মিটিং করতে। মিটিংএ ডঃ জলধর মল্লিক, ডঃ ব্রজ গোপাল মজুমদার, ডঃ কমল কুমার সিংহ ও অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষরতা কমিটির মিটিং ছিল এটা। আমাদের উপর দায়িত্ব পড়ল, পশ্চিম জেলাব সদ্য সাক্ষর, যাঁরা প্রথম পাঠ শেষ করেছেন, তাঁদের পরীক্ষা নেয়া। ঠিক হলো, আগামী ২৫শে জুলাই কের পুজোর দিন সকাল নটায় প্রেস ক্লাবে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র লেখা হবে।

সাক্ষরতার মিটিং সেরে আমি গেলাম প্রেস ক্লাবে। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলাম বনমালীপুরে অঘোর দেববর্মার বাড়ি। তাঁকে আমলতী-গোলাঘাটী কেন্দ্রের এ.ডি.সি নির্বাচনের হাল-ফিল খবর জানালাম। তিনি বললেন, 'পার্টি অফিস থেকে সুনীল দাশগুপ্ত ফোন করেছিলেন নির্বচনী মিটিং-এ বক্তৃতা করার জন্যে। কিন্তু আমি বলে দিয়েছি, আমার পক্ষে সম্ভব হবে না কুঞ্জ দেববর্মার সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা করতে।' অঘোর বাবুর বাড়ি থেকে গেলাম সি.পি.আই অফিসে। সেখানে যেতেই কুঞ্জ দেববর্মা ও প্রশান্ত কপালীকে আমতলী-গোলাঘাটী নির্বাচন কেন্দ্র থেকে ফিরতে দেখলাম। ঠিকহলো, কুঞ্জ বাবু আগামীকাল ভোর ৬ টায় গাড়ী নিয়ে আমার বাসায় আসবেন এবং তাঁর সঙ্গে বিশ্রামগঞ্জ যেতে হবে নির্বাচনী প্রচারে। রাত ৮.৩০ নাগাদ লোডশেডিংয়ের ভেতর দিয়ে প্রশান্ত কপালীর সঙ্গে পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

১৯ শে জুলাই, ১৯৯৫ বুধবার। ভোর পাঁচটায় উঠে তৈরী হতে থাকলাম কুঞ্জ দেববর্মার সঙ্গে বিশ্রামগঞ্জ যাবার জন্যে। কুঞ্জ বাবু ভোর পাঁচটা ত্রিশ'এ এসে পড়লেন। আমরা ৪.৪৫ এ বেরিয়ে পড়লাম বিশ্রামগঞ্জের দিকে। এত ভোরে ছোট মেয়ে দেবযানী আমাকে সব গুছিয়ে দিলে। সকাল ৭ টায় বিশ্রামগঞ্জে সি.পি.আই.এম এর অফিসে পৌঁছে গেলাম। সেখানে দেখলাম রামু ভৌমিক, দিলীপ রায় ও অন্যান্যরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। পাশেই সি. পি.আই এর নির্বাচনী অফিস। সেখানে ঢুকে কমরেড অমূল্য শর্মাকে পেলাম। চড়িলামের মনুও ছিল সেখানে। সকাল ৭.৩০ টায় কুঞ্জ দেববর্মাকে নিয়ে আমরা ২০ জনের মত যুবকর্মী নিয়ে বরকুবাড়ি গেলাম বিজয় নদী পেরিয়ে। বরকুবাড়ির পাশ থেকে গতকাল টি.এন.ভির জঙ্গি বাহিনী কংগ্রেস প্রার্থী দিনেশ দেববর্মা ও ক্যাপটেন চ্যাটার্জিকে কিডনাপ করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বলে খবর পেয়েছিলাম। তাই আমরা বেশ সতর্কতার সঙ্গে এই গ্রামে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলাম। বরকুবাড়িতে ৬০ পরিবার উপজাতি। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে গেলাম, সামনে প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মা, পেছনে লাল বাহিনী। গ্রামটা রাজ নীতিগত ভাবে

উপজাতি যুবসতিমির ঘাঁটি। কিন্তু সম্প্রতি উপজাতি যুবসমিতি দু'টুকরো হয়ে যাওয়ায় বামফ্রন্টের সুবিধে হয়েছে। তবে টি.এন. ভি বেশ ভোট পাবে এই গ্রাম থেকে বলে মনে হলো। গ্রামের বেশ কয়েকজন লোক আমাদের সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিলেন এবং বললেন ... দেববর্মাকে চেখরা মাইতাং (কাস্তে-ধানের শীষ)'এ ভোট দিতে। বরকুবাড়ি ৮০ জুনের দাঙ্গার কবলে পড়েছিল। দেখলাম, আগের সব পুরোনো বাড়ি আর নেই, ছোট ছোট বাড়ি হয়েছে সরকারী সাহায্যে। তবে আস্তে আস্তে উপজাতি-বাঙালির সম্পর্ক ফিরে আসছে। একটা বর্ধিষ্ণু উপজাতি গ্রামের এমন হতদরিদ্র চেহারা দেখে খুব খারাপ লাগল। ডঃ সুহাস চ্যাটার্জীর সঙ্গে আমি যখন খেঙরা বাড়িতে ভাষা ক্যাম্প করেছিলাম, তখন বরকুবাড়িতে বেড়াতে এসেছিলাম গুরুদাশ দেববর্মার সঙ্গে। সেসময়কার বরকুবাড়ি সঙ্গে এখনকার বরকুবাড়ির আকাশ পালাত পার্থক্য আমার চোখে পড়ল।

৯.৩০ এ আমরা আবার ফিরে এলাম বিশ্রামগঞ্জ বাজারে। নির্বাচনী অফিসে বিশ্রাম করে ১০ টার সময় আবার বেরিয়ে পড়লাম আদিবাসী কলোনীতে। আমাদের সঙ্গে এবার থাকলেন কবি নন্দকুমার দেববর্মার ছোট ভাই নির্মল। খুব জঙ্গি ছেলে সে। আমার বড় মেয়ে তানিয়ার বান্ধবী লক্ষ্মী দেববর্মাও আমাদের সঙ্গে প্রচারে থাকল। কলোনিতে ঢুকতেই সম্পর্কে আমার দুই শালী কালনবালা ও খেলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আদিবাসী কলোনি ঘুরে কুঞ্জ বাবুকে নিয়ে আমরা এলাম সি.পি.এম এর নারী সমিতির সেক্রেটারি কুমারী দেববর্মার বাড়ি। সেখানে নির্বাচন নিয়ে নারী সমিতির ঘরোয়া সভা ছিলো। কুমারীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেলা ১২টায় আমারা পৌঁছোলাম পদ্মনগরের মহিলা প্রধান দুর্লভী দেববর্মার বাড়িতে। সেখানে দুপুরে আমরা খাওয়া দাওয়া করলাম। দুর্লভীর ছোটমেয়ে গত জুন মাসে শ্বেত করবীর বিচি খেয়ে মারা গেছে। মেয়েটি আগরতলার তুলসীবতী স্কুলে ক্লাস VII -এ পড়তো। অথচ দুর্লভী ও তার স্বামী মনীন্দ্রবাবুকে এই ভাবে নির্বাচনী কাজ করতে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দুর্লভীর বড় মেয়ে স্বর্ণলতা আমার বড় মেয়ে তানিয়ার সঙ্গে Women's College এ বি.এ পড়ে। বিকেলে আমরা এলাম পদ্মনগর স্কুলের জনসভায়। প্রথমে ভাষণ দিলেন দুর্লভী নিজেই। পশ্চিম জেলার জেলাধিপতি কমরেড ভানুলাল সাহাও ভাষণ রাখলেন। বৃষ্টির মধ্যেই নির্বাচনী মিটিং হলো বেশ ভালই। কমরেড অমূল্য শর্মাও ভাষণ রাখল। মিটিং শেষে বিশ্রামগঞ্জ নির্বাচনী অফিস হয়ে রাত ৮.৩০ এ আগরতলায় ফিরে এলাম প্রার্থী কুঞ্জ বাবুর গাড়ীতেই।

২০ শে জুলাই, ১৯৯৫. বৃহস্পতিবার। আজ ভোর ৩ টেয় উঠে জরুরি কিছু লেখা লিখলাম। সকাল ৬টায় কুঞ্জ দেববর্মার গাড়ী করে আসতেই আমি বেরিয়ে পড়লাম তাঁর সঙ্গে বিশ্রামগঞ্জে। সি.পি.আই এর নির্বাচনী অফিস ও সি.পি.এম এর পার্টি অফিস থাকলাম সকাল ৯টা পর্যন্ত। তারপর জীপ গাড়িতে চেপে প্রমোদ নগর বাজারের দিকে যাত্রা করলাম। জীপে সি.পি.এম এর জঙ্গি যুবকর্মী সব। টি.এন.ভি আক্রমণ করলে তারা তা মোকাবিলা করবার সাহস রাখে। বিশ্রামগঞ্জ বাজার ছাড়িয়ে ইট ভাট্টার পাশ দিয়ে হারুং পাড়ার মাঝ দিয়ে প্রমোদ নগরের রাস্তা। বিজয় নদী পেরিয়ে টিলার ওপর উঠতেই সকলে সতর্ক হয়ে গেল। গত পরশু এই জায়গা থেকে টি.এন.ভির লোকেরা কংগ্রেস প্রার্থী দিনেশ দেববর্মা ও ক্যাপটেন চাটার্জীকে কিডনাপ করার চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের জীপ যেতে দেখে অনেক বাড়ির উপজাতি লোকেরা উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, বিশেষ করে মেয়েরা। পরে যখন এই রাস্তা দিয়ে আমরা কুঞ্জ দেববর্মার সঙ্গে পায়ে হেঁটে ফিরি, তখন দেখি আসাম রাইফেলসের বাহিনী টহল দিচ্ছে। প্রমোদ নগর বাজারে বামফ্রন্টের নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করলেন প্রার্থী নিজেই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিলেন কমরেড অমূল্য শর্মা, কেশব দেববর্মা ও প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মা নিজে। নির্বাচনী অফিসে অনেক মুসলমান কর্মীও ছিলেন। অঘোর দেববর্মার ঘনিষ্ঠ কমরেড সুরেন্দ্র দেববর্মা (লাইপো)

ও মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন । নির্বাচনী অফিস থেকে বেরিয়ে আমরা মিছিল করে গেলাম মুসলমান পাড়ার জাহেদ মিঞার বাড়ি । সেখানে ঘরোয়া মিটিং হলো । মিটিং চলার সময় আমাদের ক্যাডাররা পুরোপুরি তৈরী হয়েই ছিল যেকোন রকমের হামলা প্রতিরোধ করতে । আমাদের মিছিলে ছিলেন শ্রীমতী সূর্যমুখী দেববর্মা । তিনি মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রার্থীর প্রতীক চিহ্ন 'ধানের ছড়া কাঁচি'র পোষ্টার দেখাতে লাগলেন । ঘরোয়া মিটিং সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম মুসলমান পাড়ায় ডোর-টু-ডোর ক্যাম্পেনে। প্রায় ৪০ টি মুসলমান পরিবার আমরা কভার করলাম । তারপর দু-তিনবার নদী পেরিয়ে নির্বাচনী অফিসে এলাম ফিরে । সেখানে প্রার্থী কুঞ্জ বাবু চা খাওয়ালেন সকলকে । নির্বচনী অফিসে ফেরার পথে আমরা মজিদ মিঞার বাড়ির সামনের গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করেছিলাম কিছুক্ষণ । জায়গা এত ভালো যে ভাবাই যায় না । নির্বাচনী অফিস থেকে এবার আমরা ফিরে গেলাম প্রমোদ নগর স্কুলের পাশে সর্বজয় কপরা পাড়ায় । সেখানে বিশু দেববর্মার বাড়িতে দুপুরের খাওয়া সারলাম শূকরের মাংস ও ডাল দিয়ে । ৫০ জনের মতো খেলাম আমরা । ট্রাইবেল মহিলা-পুরুষ কী সুন্দরভাবে খাওয়ালেন আমাদেরকে । খাওয়া দাওয়া সেরে শুরু হলো ঘরোয়া সভা । খেংরা বাড়ির কমরেড অশ্বিনী দেববর্মা ও আমি বক্তৃতা করলাম । আমার বক্তৃতা খুবই ইমপ্রেসিভ হয়েছিল বলে অমূল্য শর্মা ও কেশব দেববর্মা বলল ' ঘরোয়া মিটিং সেরে আমরা মিছিল করে বিশ্রামগঞ্জের বাজারের দিকে রওনা হলাম । পথে আমতলীর হারুং পাড়ায় সূর্যমুখী দেববর্মার বাড়িতে কিছুক্ষণ হল্ট করলাম । কী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ি সূর্যমুখীর। বাড়ির দক্ষিণ দিকে কী সুন্দর ফুলের বাগান । সূর্যমুখীর বাড়ির দক্ষিণ দিকের বিরাট পুকুর-ওয়ালা বাড়িটি হলো আমার এক পিসি শাশুড়ীর । মিছিল করে স্লোগান দিতে দিতে আমরা বিশ্রামগঞ্জ বাজারে ঢুকে পড়লাম । অনেকদিন পর বিশ্রামগঞ্জের লোকেরা আমাকে রাজনৈতিক মিছিলে দেখলো । নির্বচনী অফিসে কিছুক্ষণ বসে গেলাম সিপিএম এর পার্টি অফিসে। সেখানে কমরেড ভানুলাল সাহাকে আজকের কর্মসূচী রূপায়ণের সাফল্য সম্পর্কে অবহিত করলাম। নির্বাচনী পোস্টার এসেছে শুনে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করলেন । আমি এক ফাঁকে বেরিয়ে বাজারে ঢুকে ৫ টাকা দিয়ে তিন কেজি বাঁশের কড়ুল কিনে ব্যাগে ঢোকালাম । কুঞ্জবাবুর সঙ্গে রাত ৮টায় আগরতলায় পার্টি অফিসে ফিরলাম । ফিরে দেখি কমরেড দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সাহানা দি, প্রশান্ত কপালী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে । পার্টি অফিস থেকে বাসায় ফিরলাম রাত ৯ টায়। তখনো পুত্র সুরঞ্জন ফেরেনি ।

২১ শে জুলাই, ১৯৯৫ শুক্রবার । সকালে উঠে নিজের জামা-কাপড় নিজে কাচলাম । তারপর কর্নেল চৌমুহনী গিয়ে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা নিয়ে এলাম । ১.৩০ এ বড় মেয়ে তানিয়াকে নিয়ে মটর স্ট্যান্ডে আমেরিকান হোমিও হলে গেলাম এবং ডাঃ মনোজ তলাপাত্র তাকে তার কোমর ব্যথার ওষুধ দিলেন । তানিয়াকে মহিলা কলেজ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে হেঁটেই গেলাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে । দেখলাম ককবরক কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্যে ভিড় করে সব ফর্ম নিচ্ছে । ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরাটরিতে আমার এক ছাত্র সমীর ও ছাত্রী চন্দনা ভদ্র দেখা করতে এলো ককবরকে ভর্তি হওয়ার জন্যে আলাপ করতে । অধ্যাপক শম্ভু রক্ষিতও ফর্ম নিলেন তাঁর স্ত্রীকে ককবরক কোর্সে ভর্তি করার জন্যে । ১২.৩০ থেকে ২.৩০ পর্যন্ত পর পর বাঙলা ভাষা তত্ত্বের দুটি ক্লাস নিয়ে গেলাম অধ্যাপক আমেদের সঙ্গে দেখা করতে । সেখান থেকে বেরিয়ে ৪.৫০ এ এলাম পূর্বাশার গেটে । স্ত্রী ফুলকুমারী অফিস থেকে বেরোতেই তাঁকে নিয়ে গেলাম বনমালিপুর অঘোর দেববর্মার বাড়ি । দেখি অঘোর বাবু একতলায় বৈঠক খানায় কমরেড ধনমণি সিংয়ের সঙ্গে কথা বলছেন । অঘোর বাবুর স্ত্রীও এলেন সেখানে । আমি আমতলী-গোলাঘাটী এ.ডি.সি নির্বাচন কেন্দ্রের হালফিল খবর জানালাম তাঁকে । বললাম, আপনার কথা সকলে

বলছে, আপনার অভাব অনুভূত হচ্ছে নির্বাচনী এলাকায়।

অঘোর বাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে হেঁটেই চলে এলাম বাসায় রাজবাড়ির পাশ দিয়ে। আমি স্ত্রীকে বললাম, 'দ্যাখো, রাজপতাকা উড়ছে রাজা এসেছেন বোধ হয়।' ফুলকুমারী রেগে বললেন, 'রাজ্য নেই আবার রাজা। রাজা যে বাড়িটায় থাকেন, সেটা অন্তত রঙ-টঙ করে ফিটফাট রাখতে পারেন তো, চারদিকে চুন- সুরকি খসে পড়ছে, কি রাজা আমার! রাজা নিজের মর্যাদা রাখতে জানেন না। হাজার হোক আমাদের রাজবাড়িতো, রাজবাড়ির এই দৈন্যদশা দেখলে সত্যিই খুব দুঃখ হয়।' বাসায় ফিরে খবর পেলাম একুশ শতকের সম্পাদক শুভব্রত দেব বলে গেছেন সন্ধ্যে ৭ টার মধ্যে তাঁর Caxton Printers-এ যেতে। সেখানে সুধন্বা দেববর্মা আমার জন্যে বসে থাকবেন। Caxton 'এ যেতেই রতুবাবু (শুভব্রত দেবের ডাক নাম রতু) বললেন, 'সুধন্বা বাবু তাঁর জামাই ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার বাড়িতে আছেন, আপনি সেখানে যান, তাঁর 'হাচুক খুরিঅ' উপন্যাসের নাট্যরূপ ছাপার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে জরুরী কথাবার্তা বলবেন।' Caxton থেকে উঠে প্রথমে গেলাম ডঃ কমল কুমার সিংহর বাড়ি। সেখান থেকে এলাম ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার বাড়ি। দেখলাম, সুধন্বা বাবু আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। তিনি বললেন, 'হাচুক খুরিঅ উপন্যাসের নাট্যরূপ লিখেছি, তা ছাপতে হবে, আপনাকে প্রুফ দেখতে হবে।' আমি বললাম, 'প্রথমে নাট্যরূপের পাণ্ডুলিপি পরিষ্কার করে লিখতে হবে, আর আমি তা করে দেব। তবে এই নাট্যরূপ ছাপতে সাত আট হাজার টাকা লাগবে। আপনি শুভব্রত দেবকে তিন হাজার টাকা দিয়েছেন, আরো পাঁচ হাজার দিতে হবে। আর, প্রুফ আমি দেখে দেব, আমার ছেলে সুরঞ্জনকেও দেখে দিতে বলবো।' এর পর সুধন্বা বাবুর কাছ থেকে জনশিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে অনেক তথ্য জানলাম। একদিন খোয়াইয়ের রাম কুমার ঠাকুর মহারাজ বীরবিক্রমকে বললেন, 'মহারাজ, আপনি তিপ্‌রা নন।' মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?' তখন রামকুমার ঠাকুর বললেন, 'আপনি যদি তিপ্‌রা হতেন, তাহলে পাহাড়ে তিপ্‌রারা এমন অশিক্ষিত থাকত না, পাহাড়ে একটাও ইস্কুল নেই।' এই কথা শুনে মহারাজ অন্দরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, 'শোনো রামকুমার, পাহাড়ে তিপ্‌রারা লেখাপড়া শিখলে আমার রাজ্য চলে যাবে, তুমি কি তা চাও আমাব তেরশো বছরের রাজত্ব চলে যাক?'

২২শে জুলাই, ১৯৯৫, শনিবার। সকালে উঠে ৬.৪৫ এর সময় চড়িলামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। চড়িলামে যেতেই দেখি প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মা সিপিএম এর অফিসের সামনে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে অমূল্য শর্মা, সমী রঞ্জন দেববর্মা, টাকারজলার অখিল দেববর্মাও রয়েছেন। চড়িলাম থেকে কুঞ্জ বাবুকে নিয়ে কামরাজ কলোনি হয়ে আমরা এলাম হেরমা বাজারের নির্বাচনী অফিসে। আমরা যাব রামনগরে নির্বাচনী প্রচার করতে। নির্বাচন অফিস থেকে মানিকলাল দেববর্মা কয়েকখানা লাল ঝান্ডা দিয়ে দিলেন রামনগরের নির্বাচনী অফিসের জন্যে। রামনগর বাজারে গিয়ে দেখি সিপিএম নেতা সুধন বাবু, সুনীল দেববর্মা, সুবোধ (ক্যাপটেন) সকলে নির্বাচনী অফিসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আগের থেকে কর্মসূচী ঠিক ছিল। প্রথমে আমরা গেলাম পাকলি বাড়ির দিকে। সেখানে বেশ কয়েকটি পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঢুকলাম আমরা। জয়দুর্লভ দেববর্মা, প্রয়াত নবকুমার দেববর্মা ও লিগিলাগাইয়ের বাড়িতে গেলাম। নবকুমার দেববর্মা আমার আপন মামা শ্বশুর। ক'বছর হলো তিনি ক্যানসারে মারা গেছেন। বিরাট অবস্থা, পনেরো কানির লেক আছে। মামাতো শালা রতন কুমার আমাদের আপ্যায়ন করল। বলল, এদিকটার বেশিরভাগ ভোট বামফ্রন্ট পাবে। দাদা লিগির বাড়িতে এসে আমার আপন পিসতুতো শালী বীণাপাণির সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর মেয়ে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। বললাম, 'তোমার মেয়েকে ডাক, দেখি।' উত্তরে সে বলল, 'সে বাড়ি

নেই, বাঁশের কুড়ুল সংগ্রহ করতে জঙ্গলে গেছে।' বীণাপাণি তার মাতৃভাষা ককবরকে বলল, 'কুমুই, খুরিছা চুআক নূংগূই থাঙদি' (জামাইবাবু, এক খুরি মদ খেয়ে যাও) আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আরেকদিন আসবো তোমার বাই (দিদি) কে নিয়ে, তখন খাওয়া যাবে চুআক।' পাকলি থেকে আমরা এলাম তুইদু বাড়ি। সেখানে মামা রাধা কৃষ্ণের বাড়ি বসলাম আমরা। প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মাকে সেখানে রেখে সমীরঞ্জনকে নিয়ে আমি গেলাম আমার বড় মামা শ্বশুরের ছেলে অমূল্য দেববর্মার সঙ্গে দেখা করতে। দা অমূল্য উপজাতি যুবসমিতির কর্মী। কিন্তু বললেন এবার ভোট দেবেন বামফ্রন্টকে, কেননা যুবসতিমি দু'ভাগ হয়ে গেছে। দুপুরে আমরা মাছ আব শূকরের মাংস দিয়ে ইচ্ছে মতো ভাত খেলাম ক্যাপটেন (সুবোধ) এর বাড়ি । সুবোধ আমার মামাতো শালী বাই (দিদি) পরিমলের ছেলে। বিকেলে রামনগর বাজারে জনসভা হলো। বীণাপাণি মিছিল নিয়ে এলো। জনসভায় বক্তৃতা করলেন সুধন দেববর্মা কমরেড ভানু লাল সাহা, রামু ভৌমিক. আমার খুড়ী শাশুড়ী রমা দেববর্মা। আমি ককবরক ভাষায় ভাষণ দিলাম।

২৩শে জুলাই, ১৯৯৫, রবিবার। সকাল ৯.৩০ এ প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মাকে নিয়ে রঙমালার চন্দ্রমোহন চৌধুরী পাড়ায় মিটিংয়ে গেলাম হেরমা বাজারের নির্বাচনী অফিস থেকে। সঙ্গে মানিক লাল দেববর্মা, দক্ষিণ হেরমার দশরথ দেববর্মা প্রমুখ। এই পাড়ায় টি.এন.ভির শক্ত ঘাঁটি। অনেক পরিচিত লোক পেলাম এই পাড়ায়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের ছেলেরাই এখন টি এন ভি করছে। আমার এক জ্যাঠতুতো শালা সুবোধ দেববর্মাব ঘরে নির্বাচনী ঘরোয়া মিটিং করলাম। মিটিংয়ে এই পাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তি শম্ভু-কার্তিক দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। মিটিং সেরে জীপে তকসা পাড়ার পাশ দিয়ে রঙমালার ভেতর দিয়ে আমরা হেরমা বাজারে এলাম দুপুর ১.৩০ মিনিটে। দুপুরে খেলাম গৌর কপরা পাড়ার আমাদের প্রার্থীর আত্মীয় যতীন্দ্র দেববর্মার বাড়ি। সেখান থেকে বেলা ৩ টের সময় আমরা গেলাম পাশের গর্জনতলী বাজারের জনসভায়। গিয়ে দেখি বাজার শেড়ে সমবেত জনগণ নিয়ে কমবেড ভানুলাল সাহা বসে আছেন। মিটিং শুরু হলো ননীগোপাল দেববর্মাকে সভাপতি করে। কমরেড হারাধন দেবনাথ মিটিং পবিচালনা করলেন। প্রথমে ভাষণ দিলেন ব্রজগোপাল (রামু) ভৌমিক। তারপর কমরেড ভানুলাল সাহা ইমপ্রেসিভ এক বক্তিতা রেখে অন্য আরেকটি মিটিংয়ে চলে গেলেন। এরপর কমরেড হারাধন আমার নাম ঘোষণা করলেন। আমাব পরে প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মা ককবরক ভাষায় বক্তিতা করলেন। মিটিং শেষ করে আমরা চলে গেলাম জোততলী পাড়ায় বিধিরাম দেববর্মার বাড়ি। সন্ধ্যেবেলায় সেখানে একটা ঘরোয়া মিটিং সেরে জীপে করে আমরা গেলাম বিশ্রামগঞ্জ নির্বাচনী অফিসে। সেখানে প্রার্থী কুঞ্জ বাবু কর্মীদের নিয়ে বসলেন। সেখান থেকে রাত আটটার সময় আমরা গেলাম বাঁশতলী গাঁও সভার রামদাস পাড়ায়। সেখানে ডাঃ মঙ্গল দেববর্মার ছোট ভাই বসন্ত দেববর্মা এক ঘরোয়া মিটিং এর আয়োজন করেছিলেন। কামরাজ কলোনি থেকে এই মিটিংয়ে সি. পি. আই.-এর পঞ্চায়েত মেম্বার গোপাল দেবনাথ, জহরলাল দেবনাথ শচিরানী দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কমরেড প্রশান্ত কপালী ছিলেন প্রধান বক্তা। মিটিং সারতে সারতে রাত বারটা বেজে গেলো। আমার এক পিসি শাশুড়ীর ঘরে শূকরের মাংস ও গোদক দিয়ে খেয়ে শুয়ে পরলাম। সেনকুমার দেববর্মা, কমরেড অমূল্য শর্মা ও আমি শুলাম এক খাটে। আর প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মা ও প্রশান্ত কপালী অন্য খাটে। রাত্রে সকলে মিলে আমাদেরকে পাহারা দিলে।

২৪শে জুলাই, ১৯৯৫, সোমবার। খুব ভোরে উঠে পিসি শাশুড়ী (রেবতী দেববর্মার স্ত্রী)'র কাছ থেকে তেল-গামছা নিয়ে ওদের শান বাঁধানো পুকুরে স্নান করে নিলাম ভাল করে। চা-বিস্কুট খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বিশ্রামগঞ্জে, সঙ্গে বসন্ত দেববর্মাও গেলেন। নির্বাচনী অফিসে প্রশান্ত

কপালীকে নামিয়ে দিয়ে আমরা চলে গেলাম ব্রজপুর হয়ে বাথান মোড়ায় লালসিং মোড়া গাঁও সভার সি পি আই এর মহিলা প্রধান মন্দোদরী দেববর্মার বাড়ি । সেখানে আমার এক পিস শ্বশুরের ঘরে ঢুকে দেখি কংগ্রেস প্রার্থী দীনেশ দেববর্মার কর্মীরা আমার পিস শ্বশুর জাহ্নবী দেববর্মার সঙ্গে আলোচনা করছেন । আমাকে দেখে তাঁরা একটু ঘাবড়ে গেলেন । এই পাড়াটা আগে উপজাতি যুবসমিতির ঘাঁটি ছিলো । এখন যুবসমিতি ভেঙ্গে যাওয়ায় টি এন ভি 'র ঘাঁটি হয়েছে । মন্দোদরী দেববর্মাকে নিয়ে প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মা জীপের সামনে বসলেন । আমরা রওনা দিলাম ধারিয়াথল গ্রামে । সেখানে শ্রীযুক্ত গদাধর দেববর্মার বাড়ি গিয়ে আমাদের নির্বাচনী-জীপ থামলো । গদাধর বাবুর পুত্রবধূ (সুনীল দেববর্মার স্ত্রী) তুলসী দেববর্মা সি পি আই (এম) এর নারী নেত্রী এবং ব্লক এডভাইজারী কমিটির সদস্যা । তিনি আমাদের প্রধান কর্মী । তাঁর স্বামী সুনীল বাবু এবং দেবর শান্তি বাবু আমার সঙ্গে ধারিয়াথল গাঁও সভার নির্বাচনী পরিস্থিতি ও কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করলেন । এর মধ্যে আমার এক পিসি শাশুড়ী (গদাধর বাবুর স্ত্রী) এসে আমাকে বাংলায় বললেন, জামাই পান খাইছো নি । ইতি মধ্যে সি পি আই (এম) এর গণমুক্তি পরিষদের আঞ্চলিক সেক্রেটারি যুগল দেববর্মা এসে গেলেন । তিনি ধারিয়াথলেরই বিশিষ্ট ব্যক্তি । কুঞ্জ বাবু এতক্ষণ গদাধর বাবুর সঙ্গে পুরনো দিনের কথা নিয়ে আলাপ আলোচন করছিলেন। যুগলবাবু আসতেই তিনিও বেরিয়ে এলেন । নির্বাচনী কর্মসূচী শুরু হলো ধারিয়াথল নির্বাচনী অফিস থেকে । আমাদের সামনে থাকলেন প্রার্থী কুঞ্জবাবু , যুগল দেববর্মা, তুলসী দেববর্মা ও প্রধান মন্দোদরী দেববর্মা-পেছনে আমার সঙ্গে ২৫/৩০ জন ট্রাইবেল যুবক । প্রথমে গেলাম ভক্তকপরা পাড়ায়, তারপর গয়ারামকপরা পাড়ায়, তারপরে গেলাম পুরনো লেম্বুথলে আমাব এক দাদাশ্বশুরের বাড়ি । সেখান থেকে আমবা টিলা-টংকর ডিঙ্গিয়ে চলে এলাম চাঁদুরামকপরা পাড়ায় । চাঁদুরামকপরা পাড়া একসময় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি (সি. পি. আই.)'র জঙ্গি ঘাঁটি ছিল । সেখানে ছিল শান্তি সেনার সেক্রেটারি জেনাবেল কমরেড মোহন চৌধুবীর জঙ্গি ঘাঁটি । এই পাড়ার শশীকুমার দেববর্মার বাড়িতে বর্তমান সি পি এম নেতা সমব চৌধুরী দীর্ঘদিন অবস্থান করে এই এলাকায় উপজাতি মেয়েদের নিয়ে কালচারাল সংগঠন গড়েছিলেন । চাঁদুরামকপরা পাড়ায় এসে আমরা শশীবাবুর বড় ছেলে গোপাল দেববর্মাব ঘরে এক ঘরোয়া সভা হলো । বক্তৃতা করলেন যুগল দেববর্মা ও কুঞ্জ বাবু । যুগল বাবু তাঁর বক্তৃতায় এই গ্রামের টি এন ভি ভোট ব্যাঙ্ক ভাঙ্গতে চেষ্টা করলেন । মিটিং সেরে আমবা আবার ফিরে এলাম ধারিয়াথলে যেখানে আমাদের জীপ দাঁড়িয়ে ছিল । কড়া রৌদ্রে ঘুরে সবাই ক্লান্ত । রৌদ্রে দেখলাম তুলসী দেববর্মার সুন্দর মুখ কালো হয়ে গেছে । আমরা জীপে চেপে গেলাম নতুন লেম্বুথলে। সেখানে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে আমার এক পিস শ্বশুর প্রয়াত ভগীরথ দেববর্মার বাড়ি । এই পাড়ায় উপজাতি যুবসমিতির জন্মের পর আর কমিউনিস্টরা মিটিং করতে পারেনি । অথচ এই পাড়ার প্রায়ত কার্তিক কুমার দেববর্মা ছিলেন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক সেক্রেটারি ও জাঁদরেল নেতা । তিনি বাঘে মহিষে একঘাটে জল খাওয়াতে পারতেন । তিনি ছিলেন সি পি আই নেতা অঘোর দেববর্মাব একান্ত ভক্ত ও সোভিয়েত পন্থী। অঘোরবাবু তাঁর বাড়িতেই থেকে চড়িলামের উপজাতি এলাকায় সংগঠন করতেন। পার্টি যখন ভাঙে তখন সি পি আই-এর লোকাল কমিটি নতুন পার্টি সি পি এম-এ যোগ না দিয়ে মূল পার্টিতে রয়ে যায়। নতুন পার্টিতে যোগ দেয়া না দেয়া নিয়ে বিশ্রমাগঞ্জের কাছে গর্জনতলীতে কমরেড শশীকুমারের বাড়ির কাছে এক মিটিং হয়। ওই মিটিঙে কমরেড দশরথ দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। মিটিঙে নতুন পার্টিতে যোগ দেয়ার ব্যাপারে দশরথ প্রস্তাব করলে সোভিয়েতপন্থী কার্তিক কুমার দেববর্মা চড়িলাম লোকাল কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে চীনপন্থী দশবথকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে সি পি আই পার্টিতেই চড়িলাম লোকাল কমিটি

থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেন। এতে কমরেড দশরথ চরম অপমানিতবোধ করে ওই মিটিং ত্যাগ করে কমরেড শশীকুমারকে নিয়ে চলে যান। আর তখন থেকেই চড়িলাম বিধানসভা উপজাতি এলাকায় কমরেড দশরথের পার্টি ও কমরেড অঘোরের পার্টি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে — সি পি আই-সি পি এম হিসেবে নয়। কমরেড কার্তিককুমারেরই ছেলে বরদাকান্ত দেববর্মা পরবর্তীকালে হয়ে যান উপজাতি যুবসমিতির জাঁদরেল নেতা। তিনি একবাব এম পি ভোটেও দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ছিলেন উপজাতি যুবসমিতির নেতা হরিনাথ দেববর্মার ডান হাত। আজ এই পাড়ায় দীর্ঘ ২৮ বছর পর এই মিটিংয়ের আয়োজন দেখে অবাক লাগল আমাব। আমাব এই পিস শ্বশুরের বাড়িতেই ১৯৬৭ সালে ডঃ সুহাস চ্যাটার্জিকে নিয়ে ককবরক ভাষাব গবেষণার কাজ করেছিলাম। আজ অনেক কথাই মনে পড়তে লাগলো। পিস শ্বশুরের ছেলেবা অনেক কথা বললেন আমার সঙ্গে। দুপুরে মাছ, শূকরের মাংস, ডাল ও গোদক দিয়ে খেয়ে আমরা এই গ্রামেব সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে আয়োজিত মিটিংয়ে যোগ দিলাম। আমাকে সভাপতি কবলেন সকলেই। মেয়েরা সংখ্যায় ছিলেন বেশী-পুরুষরাও এসেছেন। দেখলাম মেয়েবা বড় বড় জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটছেন এবং অনেকেই পান তৈরী করছেন মিটিঙে উপস্থিত সকলকে লেম্বুথলেব বিখ্যাত 'গাছপান' খাওয়াবেন বলে। অনেক অনেক দিন পর কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী মিটিং। গ্রামটা দীর্ঘ ২৮ বছব পব একেবারে খাড়াখাড়ি ভাগ হয়ে গেছে। গ্রামের মানুষ অনেক ভেবে চিন্তে আবার বামফ্রন্টের দিকে ঝুঁকছে। মিটিংয়ে এই গ্রামের সুশীল বাবু চমৎকার এক বক্তৃতা কবলেন। প্রার্থীর বক্তৃতার পর তুলসী দেববর্মা ও মন্দোদরী দেববর্মা নির্বাচনী ভাষণ রাখলেন। আমি ককবরক ভাষায় সমাপ্তি ভাষণ দিলাম। মিটিং শেষে চড়িলাম বাজার হয়ে সন্ধ্যে ছটায় আমরা গিয়ে পৌঁছুলাম চণ্ডীঠাকুব পাড়ায়। পাড়া প্রদক্ষিণ করলাম আমরা প্রার্থীকে নিয়ে। এই গ্রামের উপজাতি লোকেরা সম্পর্কে সবাই আমার শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়। অনেকদিন পবে চণ্ডীঠাকুর (চণ্ডী দেববর্মা) পাড়ায় এসে অনেক কথাই মনে পড়তে লাগলো একে একে। ১৯৭০ সালে হেরমা গ্রামে উপজাতীয় পরিবারে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রী ফুলকুমারী দেববর্মাকে নিয়ে এই গ্রামে বেড়াতে আসি। চণ্ডী ঠাকুবেব বড়ো ছেলে সুরেন্দ্র দেববর্মার মেয়ে তরুবালা দেববর্মার বিয়ে হয়েছে আমার শ্বশুর বাড়ির গ্রামে সম্পর্কে আমাব বড়ো দাদাশ্বশুব বাঁশিচন্দ্র দেববর্মার সঙ্গে। সেই হিসেবে তরুবালা হলেন আমার বড়ো দিদিশাশুড়ী। আমার জ্যাঠতুতো শালা সুশীল দেববর্মার মামার বাড়িও এই গ্রামে। আমার মামাতো শালী শম্পিনীর বিয়ে হয়েছে এই গ্রামের হরেন্দ্র মাস্টারের ছোট ছেলে শচীন্দ্রের সঙ্গে। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে এই বিখ্যাত গ্রামে যখন বেড়াতে আসি, তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমার ওই বড়ো দিদিশাশুড়ী তরুবালা। নানা (ককবরকভাষাভাষী অনেক এলাকায় দিদিমা বা ঠাকুরমাকে নানা বলে ডাকা হয় যদিও এটি ককবরক ভাষার নিজস্ব শব্দ নয়, সম্ভবত এই শব্দের মূলে ইসলামীয় প্রভাব আছে) তরুবালার সঙ্গে তাঁর বাপের বাড়ির গ্রামে পা দিতেই আমি বিস্মিত হয়ে যাই এই গ্রামেব নৈসর্গিক পরিবেশ দেখে। লাটিয়াছড়া (আগে লাটিয়াছড়াব নাম ছিলো 'লাইতা তুইছা'। 'তুইছা' এই ককবরক শব্দের অর্থ হলো ছোটোনদী বা স্রোতঃস্বিনী। 'তুইছা'কে ত্রিপুরায় প্রচলিত বাংলা ভাষায় বলে 'ছড়া'। বাঙালীর মুখে 'তুইছা' শব্দটি সঠিকভাবে উচ্চারিত হতে পারেনা ধ্বনিগত জটিলতার জন্যে। তাই তাঁবা 'তুইছা'র বাংলা অনুবাদ 'ছড়া' করে নিয়েছেন ও 'লাইতা তুইছা'কে বলে থাকেন লাটিয়াছড়া। এখন লাটিয়াছড়া নামটারই বাড়বাড়ন্ত, এমনকি ককবরক ভাষীরাও এখন তাঁদের আদিকালের নাম 'লাইতা তুইছা' না বলে লাটিয়াছড়াই বলছেন। 'লাইতা তুইছা'ব নামের মূলে ছিলো সম্ভবত যে ছড়ায় ল্যাঠা মাছ পাওয়া যায়। ককবরক ভাষীরা ল্যাঠা মাছকে বলেন 'আ লাইতা'। 'আ' অর্থ মাছ এবং 'লাইতা' অর্থ ল্যাঠা। লাটিয়াছড়ার প্রচলিত উচ্চারণ হলো লাইটা ছড়া। এই নামেও একটা ট্রাইবাল গ্রাম আছে চণ্ডীঠাকুর

পাড়ার কিছু দূরে গোলাঘাটির দিকে। সি পি আই নেতা অঘোর দেববর্মার নিজের গ্রাম হলো লাইটাছড়া। এমনকি তাঁর ঠাকুর দাদার বড়ো ভাই এবং বিখ্যাত কবি ও লেখিকা আগরতলা মহিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা শ্রীমতী করবী দেববর্মণের প্রপিতামহ রাধামোহন ঠাকুর (দেববর্মা)ও এই গ্রামের সন্তান। তিনি ছিলেন ককবরক ভাষার প্রথম পুস্তক প্রণেতাদের অন্যতম। তাঁর লিখিত 'কক্-বরক্-মা' (ত্রিপুরী ব্যাকরণ) একশ' বছর আগে ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়)। স্রোতঃস্বিনীর কূলে অবস্থিত এই গ্রামের সামনে উন্মুক্ত বিশাল ধান ক্ষেত। দক্ষিণ দিকে বিশ্রামগঞ্জ, আর উত্তরে রয়েছে চড়িলামের বিখ্যাত বনভূমি — চড়িলাম রিজার্ভ ফরেষ্ট, যে বন থেকে পার্শ্ববর্তী উপজাতি জনপদগুলোর মানুষেরা রোজই হরিণ, বন শূকর ও বন মোরগ শিকার করে আনেন দলবদ্ধভাবে। চন্তী ঠাকুর ও তার পাশের গ্রাম রঘুনাথ ঠাকুর পাড়ার মানুষদের এমন দিনও গেছে, যখন তাঁরা মাংস ছাড়া ভাতই খেতেন না। আর মাংসের সঙ্গে ছিলো বাড়িতে তৈরী করা সুগন্ধী সোমরস (house wine) এর প্রাচুর্য। চন্তী ঠাকুর পাড়ায় ঢুকতেই প্রথম আমার নজর কেড়ে নেয় খড় বা টিনের ছাউনি দেয়া বিশাল বিশাল মাটির ঘর। আমাদের পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলোতে এত বড়ো বড়ো ঘর আমি দেখিনি। প্রতিটি বাড়িতে যত্নে লালিত নয়ন মনোহর ফুল বাগান দেখে অবাক হয়ে যাই আমি। কতরকমের ফুল যে সে বাগানে আছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। লাল গোলাপ, সাদা গোলাপ — কত বিচিত্র রকমের গোলাপ ফুল, তা কী আর বলবো। চন্তী ঠাকুর পাড়ার বাহারী ফুল বাগানে সর্বপ্রথম আমি দেখি 'খুমপুই' ফুল, যে ফুলের নামে ককবরক ভাষায় রোমহর্ষক রূপকথা আছে। কামিনী, জুঁই ও বেল ফুলের গন্ধ যদি এক করা যায়, তাহলে 'খুমপুই' ফুলের মন মাতানো গন্ধের সমান হয়।

আমরা নানা তরুবালার সঙ্গে প্রথমে যখন বেড়াতে যাই তাঁর বাপের বাড়ির গ্রামে, তখন অগ্রহায়ণ মাস। মাঠ থেকে ধান এনে মেয়ে-পুরুষে উঠোন ভর্তি করে ফেলছেন। কোথাও কোথাও মাড়াইও করছেন মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে। বিশাল উঠোনের এক পাশে সুবৃহৎ গোয়াল ঘর (গৈনক), ছাগলের সিঁড়ি দেয়া উঁচু ঘর (পুন নক); ছাগলের ঘরের পাশে মোরগ-মুরগির ঘর। সেই ঘরে একপ্রকার বিশেষ খাঁচা (তাখুম)র ভেতর মোরগ-মুরগি। রান্না ঘরের কাছেই রয়েছে জ্বালানী কাঠের ঘর (বল নক), প্রতিটি বাড়িতে ঢোকার মুখে রয়েছে সুসজ্জিত বারবাড়ি। সেখানে রয়েছে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, চৌকি, পিঁড়ি, বাঁশের হুঁকো। এখনো ছবির মতো আমার চোখের সামনে ভাসছে সব। অনেক বাড়িতে দেখেছি যুবতী মেয়েরা সজারুর কাঁটা খোপায় গুঁজে নিজেদের ট্রাইবাল তাঁতে পাছড়া (উপজাতি মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র), রিত্রাক (গায়ের বা বিছানার চাদর), বক্ষ বন্ধনী (রিয়া বা রিছা) বুনছেন। বৃদ্ধারা জুমের তুলোর বিচি ছাড়াচ্ছেন 'চখা' দিয়ে। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে সকলের চরখার 'এঙ এঙ কুকাই' শব্দে। রাতের বেলায় অল্প শীতে যে রঙিন বাহারী ত্রিপুরী চাদর আমি গায়ে দিয়েছিলাম তা আমি কখনো ভুলবো না। কত রকমের ফুল তোলা, কত রকমের ডিজাইন সেই চাদরে। স্ত্রীর পাশে শুয়ে শুয়ে ওই সব ডিজাইনের ককবরক ভাষার নাম শুনেছিলাম সেদিন।

প্রথম যেদিন সন্ধ্যের দিকে এ পাড়ায় বেড়াতে আসি, সেদিন ছিলো চড়িলামের বাজারবার। নানা তরুবালার সঙ্গে আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে যেতে দেখে চন্তী ঠাকুর পাড়ার আমার শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়রা আমাদের বসিয়ে চা খাইয়ে ছিলেন চড়িলামের পুরানো বাজারে মনোমোহন সাহার চায়ের দোকানে। কলকাতার এম এ পাশ করা বাঙালী ছেলে তাঁদের গ্রামের কারোর জামাই, কারোর নাত জামাই, কত ভালোবাসার ধন আমি। রাতে খেতে বসে কী খাবো আর কী খাবো না। দু'ধরনের শূকরের মাংস — বন শূকরের ও বাড়ির পালা শূকরের, 'লাইতা তুইছা'র টাটকা মাছ ভাজা ও ঝোল ত্রিপুরী গোদক ও চাখুই। সর্বশেষে বাঙালী নাত জামাইয়ের বাঙালী খানা ডাল। খাবার আগে মোঙ্গলীয় সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে

আমার দাদাশ্বশুর দা খগেন্দ্র, নানা তরুবালার ছোটভাই, আমাকে সঙ্গে নিয়ে বসলেন সোমরসের বোতল নিয়ে। কলকাতার নাতজমাইয়ের সঙ্গে বসে পুরোনো দিনের কথা বলতে শুরু করলেন। আমাকেই সরাব পরিবেশন করতে হলো দাদাশ্বশুরের সম্মানার্থে। প্রথমে দিতে শুরু করলেন তাঁদের বংশ পরিচয় ঃ শোনো, নাতিন জামাই, আমাদের গ্রামের নাম চন্ডী ঠাকুর। চন্ডী ঠাকুর ছিলেন আমার ঠাকুর দাদা। আর, ঠাকুর দাদার নামেই এই গ্রাম। জানো দাদু, চন্ডী ঠাকুরের হাতি ছিলো। আর সেই হাতি চড়ে আগরতলায় রাজদরবারে যেতেন তিনি। খুব নাম ডাক ছিলো আমার ওই বড়োবাপের। চন্ডীঠাকুরের যে হাতি ছিলো, সেই হাতি চড়ে রাজার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, বুঝলে দাদু, আমাদের গ্রামেব পাশের রিফুজিরা তা বিশ্বাসই করতে চায় না।

—'বিশ্বাস করতে চায় না?'

— 'আরে না, বিশ্বাসই করে না। তারা ভাবে ট্রাইবেল বাড়ির আবার হাতি। আরও কি বলে জানো?'

— 'কি বলে, দাদা?'

— 'বলে, ট্রাইবেলদের আবার ঠাকুর উপাধি হয় কী করে?'

— 'দাদা, প্রশ্নটা কিন্তু আমারও।'

দা খগেন্দ্র (আমি এর মধ্যে নামের আগে আত্মীয়তার শব্দের ব্যবহার রপ্ত করে ফেলেছি। খগেন্দ্র দাদা হয়ে গেছেন দাদা খগেন্দ্র, তার থেকে দা খগেন্দ্র) আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে খালি টাই গ্লাসটা এগিয়ে দিলেন। আমিও সোমরসে ভর্তি করে দিলাম সেটা। উপচে পড়া টাইগ্লাসটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিতেই তিনি বললেন, 'নাতিন জামাই এবার তোমার পালা।'

—'আমি তো চুআক (মদ) খাইনা দাদা।'

—'আরে ট্রাইবেল বাড়ির জামাই চুআক খাওনা, এটা একটা কথা হলো। ঠিক আছে তোমার নানা (দিদি শাশুড়ী)রা তোমারে খাওয়াবে। ঠিক আছে, আমিই খাই তাহলে। হ্যাঁ। কি যেন জিজ্ঞাসা করেছিলে তুমি?'

— 'আমার জানতে ইচ্ছে করে ঠাকুর উপাধি ট্রাইবেলরা পায় কী করে?'

— 'শোনো, দাদু। পাহাড়ের গণমান্য লোকেদের ঠাকুর উপাধি দিতেন আমাদের রাজারা।'

— 'দারুণ ব্যাপার তো। আমরা বাঙালীরা ঠাকুর বলতে বুঝি ব্রাহ্মণদের।'

—' না না, আমরা সে ঠাকুরনা। এটা একটা উপাধি। জানো দাদু, আগরতলায় বারো ঘর ঠাকুর ছিলো প্রথমে। সেই বারোঘর থেকে আগরতলায় এখন কয়েকশ' ঠাকুর পরিবার হয়েছে। এই ঠাকুর পরিবার সবই ট্রাইবেল।'

দাদা শ্বশুর খগেন্দ্র দেববর্মার কথা শুনে আমার কৌতূহল বেড়ে গেলো। বললাম, 'আগরতলায় প্রথমে বারো ঘর ট্রাইবেল ঠাকুর পরিবার ছিলো?'

— 'শোনো, নাতিন জামাই। রাজ পরিবারের মেয়েদের রাজারা আগে যেখানে-সেখানে তো আর বিয়ে-শাদি দিতে পারতেন না। তাই পাহাড় থেকে ভালো ভালো ছেলে নিয়ে গিয়ে রাজকন্যাদের বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রাখতেন। তারপর তাদেরকে ঠাকুর উপাধি দিয়ে আলাদা বাড়িঘর-দোর করে দিতেন রাজারা। এবার বুঝলে?'

— 'তাহলে আপনার ঠাকুরদা চন্ডী ঠাকুরও কি রাজবাড়ির জামাই ছিলেন?'

— 'আরে না না। আমার ঠাকুরদার নাম ছিলো চন্ডীচরণ দেববর্মা। পরে তিনি রাজদরবার থেকে ঠাকুর উপাধি পান। পাহাড়ের প্রভাবশালী ট্রাইবেল সর্দারদের আমাদের রাজারা তখন ঠাকুর উপাধি

দিতেন। তুমি শোনোনি পেকুয়াজলার ওয়াখিরাই ঠাকুর আর খোয়াইয়ের রামকুমার ঠাকুরের নাম?'

—'না, এখনো শুনিনি। এই তো বিয়ে করলাম আপনাদের সমাজে সবেমাত্র।'

— 'আরে বলো কী? তাঁরা দু'জনে ছিলেন আমাদের পাহাড়ের মস্তবড়ো সমাজপতি। পাহাড়ের ট্রাইবেল ছেলেদের আগরতলায় নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখাতেন তাঁরা। মহারাজার কাছে দরবার করতেন এর জন্যে। শুনলে তুমি অবাক হবে নাতিন জামাই, আমাদেব পাহাড়ের ট্রাইবেল ছাত্রদের জন্যে তাঁরা দু'জনে দুটো আলাদা আলাদা বোর্ডিং করেছিলেন আগরতলায় উমাকন্ত একাডেমীর সঙ্গে। দু'জনে ছিলেন দুটো বোর্ডিংয়ের গার্জেন।'

— 'তাহলে তো দেখছি তাঁরা দু'জনে নমস্য ব্যক্তি।'

—'নমস্য ব্যক্তি মানে, খোয়াইয়ের রামকুমার ঠাকুর আর সদরের ওয়াখিরাই ঠাকুর আগরতলায় আমাদের ট্রাইবেল ছাত্রদের জন্যে বোর্ডিং না খুললে কি আমাদের নেতারা জনশিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলতে পারতো?'

— 'নেতারা মানে কোন নেতাদের কথা বলছেন আপনি, দাদা?'

— 'কোন নেতারা আবার। আমাদের দশরথ, সুধন্বা, হেমন্ত, অঘোর এই চার নেতার কথা বলছি আমি। ওরা তো ওই ট্রাইবেল বোর্ডিংয়ের ছাত্র। নাম শোনোনি এদের তুমি?'

— 'নাম তো শুনেছি। তবে অঘোর দেববর্মার সঙ্গে ছাড়া আর কারোব সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।'

— 'অঘোবের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

— 'তিনিই তো আমাকে আপনাদের ভাষার কাজে বাজ্যেব বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গেছেন।'

—' তাই নাকি! তা অঘোরের গ্রাম তো আমাদের গ্রামের কাছেই, একটু খামা (ককবরক ভাষায় ভাটিপথ)'ব দিকে। 'আব জানো চৌধুরী' (আমাব দাদাশ্বশুরেরা আমাকে অনেক সময শুধু চৌধুরী বলে ডাকেন) বলেই সোমরসেব শূন্য পাত্রটা আবার আমাব দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। আমি সেটা পূরণ করে দিতেই চুমুক দিয়ে বললেন, 'আব জানো সুধন্বাব মামাববাড়ি হলো এই চন্ডীঠাকুর পাড়ায়। চন্ডীঠাকুবের ভাগ্নে হলো সুধন্বা, আমাব বাবার পিসতুতো ভাই।'

— 'তাহলে দেখছি, অঘোর-সুধন্বা এই এলাকারই।'

— 'শুধু অঘোর-সুধন্বা কেন, উপজাতি যুব সমিতির প্রেসিডেন্ট বুদ্ধ দেববর্মা তো সাক্ষাৎ খুড়োতে ভাই আমার। কাকা নবেন্দ্রর ছোট ছেলে। আর বুদ্ধ তো এখন তোমার কাকা শ্বশুর ধীরেন্দ্রর শ্বশুর, বুদ্ধও তোমাব দাদাশ্বশুর পড়ে, বুঝলে নাতিন জামাই।'

— 'আচ্ছা, দাদা, একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে করছে আমাব।'

— 'কী কথা?'

— 'আমি শুনেছি, চন্ডীঠাকুর পাড়ার লোকেরা কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে দিয়ে এখন সব উপজাতি যুব সমিতির দলে ঢুকেছে। ব্যাপারটা কী বলবেন একটু।'

আমার এ-ধরনের প্রশ্ন শুনে দা খগেন্দ্র কী যেন একটু ভাবলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'শোনো চৌধুরী, একসময়তো আমবা সবাই 'কৃচাক' পার্টি (লাল পার্টি) করতাম। আমাদের এলাকা থেকে অঘোব দেববর্মা দাঁড়াতো। চার-চারবার দাঁড়িয়েছে সে এই চড়িলাম এলাকা থেকে। কাস্তে ধানের ছড়ায় ভোট দিয়ে তাকে আমরা চারবারই জিতিয়েছি। জানো চৌধুরী, আমাদের এই চন্ডীঠাকুর পাড়ায় একবার সি পি আই-এর রাজ্য সম্মেলন হয়েছিলো। অতো বড়ো সম্মেলন পার্টি ভাঙার আগে আর কখনো হযনি। সেই সম্মেলনে কে এসেছিলো জান?'

— 'কে এসেছিলেন?'

— 'কমরেড ভূপেশ গুপ্ত।'

—' তাই নাকি?'

—'ভূপেশ গুপ্ত আর কমরেড দশরথকে আমরা রেখেছিলাম উপজাতি যুব সমিতির নেতা বুদ্ধ দেববর্মার বাড়িতে খুব আরামে। দশরথ তখন এম পি। আমরা তাকে তখন 'লাম্প্রা' (লাম্প্রা দেবতা) বলতাম। কমরেড ভূপেশ গুপ্ত আর দশরথকে দেখার জন্যে লোকের ভিড় হতো খুব। তারপর মজার কথা কি জানো, ভূপেশ গুপ্তর এক কানে ছিলো মেশিন লাগানো। পুলাপান সব জড়ো হয়ে ভূপেশ গুপ্তর কানের ওই মেশিনের দিকে তাকিয়ে থাকতো, নড়তে চাইতো না তারা।'

— 'তাহলে দেখছি ভূপেশ গুপ্ত চিড়িয়াখানার জীব হয়ে গিয়েছিলেন!'

— 'আর বলো না। পুলাপানদের নিয়ে কী বিপদেই না পড়েছিলাম আমরা।'

— 'আচ্ছা, দাদা, ওই সম্মেলনে কী কী খাইয়ে ছিলেন আপনারা?'

-- 'শোনো, নাতিন জামাই। তখন ট্রাইবেল মানেই তো কমুনিস্ট। আরো ট্রাইবেল এলাকায় কমুনিস্ট পার্টির সম্মেলন হচ্ছে। কাজেই শূকরের মাংসতো থাকবেই। সম্মেলনের চারদিনেই চারটে বড়ো বড়ো শূকর মারা হয়েছিলো। তারপর মুসলমানদের জন্যে একরকম খানা। মণিপুরীদের জন্যে অন্যরকম। সে এক এলাহি ব্যাপার। আর কমরেড অঘোর তখন এই এলাকার এম এল এ, সে-ই ছিলো সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক। তারই নেতৃত্বে সব হয়েছিলো। খুব খেটেছিলাম আমরা ওই সম্মেলনে। যুবক-যুবতীদের আলাদা আলাদা ভলিন্টিয়াব গ্রুপ করেছিলাম আমরা। আমাদের ট্রাইবেল মেয়েদের সাজগোজ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন কমরেড ভূপেশ গুপ্ত।'

— 'আচ্ছা, দাদা, ওই সম্মেলনেব আলোচনার কোনো কথা কি আপনার মনে আছে এখন, বলতে পারেন?'

— 'শোনো চৌধুরী, সব কথা মনে নেই। তাছাড়া, সম্মেলনের খাটাখাটুনির কাজেই বেশী ব্যস্ত ছিলাম আমবা। তবে একটা কথা এখনো মনে আছে। সেটা হলো, কমরেড দশরথের সঙ্গে কমরেড বিদ্যা আর উদয়পুরের কমরেড নরেশ ঘোষের সঙ্গে কি বিষয়ে যেন খুব তর্কাতর্কি হয়েছিলো।'

— 'কোন বিষয়ে তর্কাতর্কি হয়েছিল' একটু মনে করতে পারেন না?'

— 'যতটুকু মনে পড়ে রিফুজিদের ব্যাপার নিয়ে।'

তাকিয়ে দেখি দাদা শ্বশুরের পানপাত্র খালি হয়ে গেছে। আবার বোতল উপুড় করলাম তার ওপর। দা খগেন্দ্র আবার গলা ভেজাতেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, দাদা পুরোনো কথাটা আবার জিজ্ঞেস করি, কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়লেন কেন আপনারা? যে পার্টির জন্যে আপনারা এতো করেছেন, সেই পার্টিটা শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন!'

— 'দ্যাখো, নাতিন জামাই, লাল পার্টি আমরা কক্ষনোই ছাড়তাম না। এ রাজ্যের রিফুজি যদি না আসতো, তাহলে আমরা সারা জীবনই কমুনিস্ট পার্টি করতাম।'

— 'ঠিক বুঝতে পারছিনে দাদা, এ রাজ্যে রিফুজি আসার সঙ্গে আপনাদের কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়ার কী হলো? আর রিফুজিরা তো সর্বহারা, আপনারাতো সর্বহারাদের পার্টি করতেন।'

— 'তুমি ঠিক বলেছো নাতিন জামাই, কমুনিস্ট পার্টি সর্বহারাদেরই পার্টি। বাঙালী রিফুজিরা সর্বহারাই। আর ওই সর্বহারাবা যখন সব দিক থেকে ঘেরাও করে ফেললো আমাদের এলাকাকে তখন আর আমাদের বেরুনোর কোনো পথ থাকলোনা। আমাদের জুম করার জায়গায়, বাঁশ, ছন, লাকড়ি আনার জায়গায় বসানো হলো রিফুজিদের । আমাদের ট্রাইবেল মেয়েরা, জানো তো তুমি, তারা

অনেকটা রে-আব্রু থাকে, তারা খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেলো।'

— 'তা এইসব সমস্যা নিয়ে আপনারা আলোচনা করেননি পার্টির মধ্যে?'

— 'আলোচনা কী আর হয়নি, খুবই হয়েছিলো। কোনো নেতা যায় রিফুজিদের পক্ষে, কোনো নেতা যায় ট্রাইবেলদের পক্ষে, শেষ পর্যন্ত কোনো মীমাংসা হলো না, নাতিন জামাই। আস্তে আস্তে আমরা দেখলাম, আমাদের জমি জায়গা সব চলে যাচ্ছে রিফুজিদের হাতে। আমাদের গ্রামের মতো বড়জলার অতো বড়ো মাঠটার অর্দ্ধেক ধানের জমি তখন রিফুজিদের হাতে, হয় রেহান (বন্দক), না হয় বেআইনী হস্তান্তর।'

— 'কিন্তু দাদা, রিফুজিরা তো গরীব। এই গরীব লোকেরা আপনাদের জমি-জায়গা নিয়ে নিলো কী করে, আমারতো মাথায় ঢোকেনা।'

— 'শোনো, রিফুজিরা সব এক ধরনের ছিলো না। যারা আমাদের রাজ্যে উদ্বাস্তু হয়ে এসে ক্যাম্পে ছিলো, তারাই ছিলো সত্যিকারের রিফুজি। তাদের অবস্থা খুব শোচনীয় ছিলো প্রথম দিকে। তাদের ক্যাম্পের জীবন আমরা তো দেখেছি। সরকারের কাছ থেকে যে ডোল পেতো, তাতে তারা রোজ আধপেটাও খেতে পেতো না। পুনর্বাসন পাবার পরেও তাদের অবস্থা ইতর বিশেষ হয়নি। আমরাই তাদেরকে টেনে নিয়েছি। ট্রাইবেল বাড়ির ভাত আর কাঁঠাল তাদের পেটে না গেলে ঠাই মরে যেতো তারা। আমরাই তাদেরকে ক্ষেতের মুনি মুজুরির কাজে নিয়েছি। অনেক সময় ক্ষেত বর্গা করতে দিয়েছি। গরু নেই গরু কিনে দিয়েছি। এমনকি নিজেদের গ্রামের ভেতর জায়গা দিয়েছি, কাল সকালে তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ো, তোমাকে দেখাবো আমাদের গ্রামের মাঝখানেই রিফুজি রয়েছে।'

—' তাহলে কোন ধরনের রিফুজি আপনাদের ক্ষেতের জমি দখল করে নিলো ?'

— 'আমাদের ক্ষেতের জমি আস্তে আস্তে দখল করে নিচ্ছে যারা এজবদল করে এসেছে মুসলমানদের সঙ্গে। আমাদের গ্রামের আশেপাশে আগে মুসলমান ছিলো, বুঝলে। হিন্দুস্তান-পাকিস্তান হবার পর অনেক মুসলমান পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেছে। আর সেখানে এসেছে ধনী রিফুজি পরিবার। তাদের হাতে অঢেল টাকা। তারাই সুযোগ পেলে আমাদের জমি জায়গায় টান দেয়। আর এক ধরনের রিফুজি হলো বাজারের দোকানদাররা। ধারে তারা ট্রাইবেলদের কাছে জিনিষপত্র বিক্রি করে। তারপর ওই টাকা না পেলে তারাও জমির ওপর ভাগ বসায়। আর প্রতিদিন নতুন নতুন জিনিষ কিনতে কিনতে আমরাও গরীব হয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে । আব কিছু ধানের জমি ছাড়া আমাদের আর আছেই কি বলো? কাজেই ওই জমিই রেহান পড়ে যাচ্ছে দোকানদার রিফুজিদের হাতে। কখনো বেআইনীভাবে জলের দামে জমি কিনে দখলে রাখছে তারা। আমাদের গ্রামে এরকম বেআইনী হস্তান্তর করা জমি নিয়ে গন্ডগোলও বাধছে মাঝেমধ্যে। এই হলো বাস্তব অবস্থা, বুঝলে চৌধুরী।'

—' তা এসব ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টি কিছু করেনি?'

— 'আগেই তো তোমাকে বললাম, চৌধুরী, কমুনিস্ট পার্টি সর্বহারাদের পার্টি। তার থেকে বড়ো কথা, কমুনিস্ট পার্টি ট্রাইবেল-বাঙালীদের উর্দ্ধে। শুধু ট্রাইবেলদের কথা বললে তো আর কমুনিস্ট পার্টি থাকে না, তাকে তো বাঙালীদের নিয়েও চলতে হবে। কাজেই শুধুমাত্র ট্রাইবেলদের পার্টি আর থাকলো না আমাদের কূচাক পার্টি (লাল পার্টি)। তাই আমাদেরও খুঁজতে হলো ট্রাইবেলদের জন্যে একটা নতুন পার্টি। আর তাছাড়া, তোমাকে আর একটা কথা বলি চৌধুরী। চৌষট্টি সালে কমুনিস্ট পার্টি গেলো ভেঙে। হলো নতুন একদল যার নাম সি পি এম। আগে আমরা করতাম সি পি আই। তারপর হলো সি পি এম। তখন অঘোর করে টানাটানি, দশরথ করে টানাটানি। আমরা কোনদিকে যাই বলো? এই দোটানোর মধ্যে শেষে ১৯৬৭ সালে জন্ম হলো আমাদের ট্রাইবেল পার্টি-টি ইউ জে এস।'

দা খগেন্দ্রর কথা শেষ হতেই আমার স্ত্রী একেবারে শকুন্তলার পোশাকে আমাদের মধ্যে হাজির হলেন। নিজেদের বাড়িতে তিনি স্বল্পবাসই থাকেন। কিন্তু অন্যদের গ্রামে এসেও তিনি উলুপী-চিত্রাঙ্গদা হয়ে যাবেন ভাবতেই পারিনি। ফুলকুমারী আসতেই দা খগেন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, আমাদের নাতিন জামাইয়ের চোখ আছে, আমাদের এমন সুন্দরী নাতনী তার চোখে পড়েছে।

তাঁর কথা শুনেই আমরা স্বামী-স্ত্রীতে হোঃ হোঃ করে হেসে ফেললাম। আমি বললাম, 'দাদা, কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে গেছি, শুনতে চেয়েছিলাম আপনাদের বংশের ইতিহাস, এবার বলুন শুনি।'

— 'কিন্তু রসদ তো ফুরিয়ে গেছে। আরেকটু না খেলে কথা বেরুবেনা। বলেই তিনি তাঁর নাতনীর দিকে তাকালেন।'

নাতনী ও দাদুর কথা বুঝতে পেরে গেলেন তার নানার কাছে।

— 'বুঝলে দাদু চুআক (মদ) আমাদের জাতীয় খাদ্য। এটা বাঙালীরা অন্যরকম মনে করে। কিন্তু এতে খারাপ ভাবার কিছু নেই। এ হচ্ছে রাজসিক খাবার। আমরা তো রাজার জাতি বুঝলে না। আত্মীয়-স্বজন এলে এই চুআক দিয়ে আমাদের আদর-যত্ন করতে হয়। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে চুআক ছাড়া আমাদের ট্রাইবেলদের চলে না।'

দাদা শ্বশুরের কথা শেষ হতেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে নানা আধা বোতল মদ এনে বসে পড়লেন আমাদের মধ্যে।

— 'বুড়া তুমি নাতিন জামাইকে না খাইত দিয়া একা একা খাওনি চুআক।'

— 'নাতিন জামাই তো কইলকাতার লোক, চুআক খায়না।'

— 'তিপরাবাড়ির জামাই চুআক খাইত না কিতা খাইত,' বলেই তিনি আমার দিকে এক কাপ সোমরস এগিয়ে দিলেন। তারপর আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ফুলকুমারী "নৃছাইরগন' কিছা-মিছা চুআক খারুদি, উলখাই লয় উঙগূই থাঙগানৃ, তাই খারলিয়ানৃছাইরগ" (ফুলকুমারী তোমার স্বামীকে কিছু কিছু মদ খাওয়াও, শেষে অভ্যেস হয়ে যাবে, আর পালবেনা তোমাব স্বামী) বলেই হাসতে লাগলেন তিনি।

এরপর দাদাশ্বশুর সোমরস গলাধঃকরণ করে বললেন, 'শোন চৌধুরী, আমার ঠাকুরদা চন্ডীঠাকুর ছিলেন এক ভাই। আর তার ছিলো সাত বোন। আবার চন্ডীঠাকুবের সাত ছেলে দুই মেয়ে। প্রথম ছেলে সুবেন্দ্র দেববর্মা, আমার বাবা। দ্বিতীয় ছেলে নরেন্দ্র দেববর্মা, বুদ্ধ দেববর্মাব বাবা। তৃতীয় ছেলে যোগেন্দ্র দেববর্মা। এই যোগেন্দ্র দেববর্মার ছেলে বলাই দেববর্মা পড়তো রবি ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে। একবার সে বাড়ি এসে কলেরা হয়ে মারা যায়। বুজলে নাতিন জামাই, বলাই বেঁচে থাকলে সেও ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মার মতো একজন কেউকেটা হতো। চতুর্থ হলো উমেশ দেববর্মা। পঞ্চম হরেন্দ্র দেববর্মা। আমার এই কাকা করতেন মাস্টারি গোলঘাটীর কাছে হীরাপুর ইস্কুলে। একদিন সকাল বেলায় ইস্কুল সেরে বাড়ি ফেরার পথে হীরাপুরের জঙ্গলে খুন হন তিনি।'

— 'আচ্ছা দাদা, চন্ডী ঠাকুরের দু' মেয়ের কথা বলছিলেন না আপনি.......।'

— 'বলছি, চন্ডী ঠাকুরের প্রথম মেয়ে লবঙ্গলতা। আর দ্বিতীয় মেয়ে হলো স্বর্ণলতা। আমার ঠাকুরদাদা তাঁর এই দু'মেয়েকেই বাইরে থেকে জামাই এনে ঘরে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রেখেছিলেন। পি (এখন ককবরক ভাষীরা কোথাও কোথাও পিসিমাকে 'পি' বলেন। ককবরক ভাষায় পিসিকে বলে 'য়ঙবূরুই') লবঙ্গলতার স্বামী কুলচন্দ্র ঠাকুর ছিলেন তোমার শ্বশুরবাড়ির গ্রাম হেরমাবাড়ির লোক। সেখান থেকে জামাই এনে চন্ডীঠাকুর মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। পি লবঙ্গলতার তিন ছেলে। কার্তিক,

রমেশ আর সুধাংশু। আর, পি স্বর্ণলতার ছেলে হলো মুরারি মাস্টার।'

ঠিক এই জায়গায় এসে আমি দাদা খগেন্দ্রর কথায় বাধা দিলাম।

— 'আচ্ছা, দাদা, দা বুদ্ধ (বুদ্ধ দেববর্মা)'র কাছ থেকে শুনেছি চন্ডী ঠাকুরের বাবা, মানে আপনার ঠাকুরদার বাবার নাম রামবাবু জমাদার। তার নাকি দু'সংসার ছিলো। প্রথম সংসারের ছেলে হলো আমতলীর ক্ষেত্র ঠাকুর ও বেজমোহন ঠাকুর। আর দ্বিতীয় সংসারের ছেলে এই চন্ডী ঠাকুর।'

— 'দেখ, চৌধুরী, বুদ্ধ যদি বলে থাকে তাহলে ঠিকই বলেছে। তবে রামবাবু জমাদারের প্রথম সংসারের কথা আমি খুব একটা জানিনে।'

— 'দাদা আরেকটা কথা আমি গোপাল ঠাকুরের নাতি ধনু দেববর্মার কাছ থেকে শুনেছি...।'

— 'কি কথা?'

— 'তিনি বলেছেন, রামবাবু জমাদারের ভালো নাম ছিলো রামনারায়ণ ঠাকুর। আর তাঁর বাবা ছিলেন গজভীম নারায়ণ। একবার ত্রিপুরার কোন এক রাজা নাকি গজভীম নারায়ণকে নিয়ে জঙ্গলে গিয়েছিলেন শিকার করতে। জঙ্গলে রাজা বসবেন কোথায় ? তখন গজভীম নারায়ণ একটানে একটা হাতির দাঁত উপড়ে রাজাকে তার ওপর বসতে দেন।'

— 'গল্পটা আমরাও শুনেছি চৌধুরী। এই গজভীম নারায়ণের আগে নাম ছিলো শুধু ভীম নারায়ণ। ভীমের মতো চেহারা ছিলো তাঁর। রাজাকে হাতির দাঁত উপড়ে বসতে দেওয়াই রাজা তাঁর নাম দিয়েছিলেন গজভীম নারায়ণ।'

ঠিক এমন সময় আমার দিদিশাশুড়ী উঠে পড়লেন মদের বোতল হাতে নিয়ে।

— 'চলো বুড়া, নাতিন জামাইকে নিয়ে ভাত খাইবা। তিপরাদের বংশপালা আর কত শোনাইবা? গজভীম নারায়ণের তিপরা এখন হইছে পিঁপড়া, বুঝলে বুড়া। এখন আর সে জঙ্গলও নাই হাতিও নাই। এখন রির্ফুজিরা শুধু কিলবিল কিলবিল করতাছে। বলি, গজভীম নারায়ণের বংশপালিরা এমন 'গুরুমা' (নপুংসক) হইল কি কৈবা ?'

খাওয়া-দাওয়া সেরে স্ত্রীর পাশে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম এই গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের আর্য নামের কথা। কি সুন্দর নাম। লবঙ্গলতা, স্বর্ণলতা, গজভীম নারায়ণ। অথচ আমার শ্বশুরকুলের এই জাতিগোষ্ঠী মোঙ্গলীয়, আর্যদের থেকে একেবারে আলাদা। ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, প্রায় সব কিছু আলাদা। কিন্তু মিল হচ্ছে শুধুমাত্র নামের বেলায়। ত্রিপুরার ককবরক ভাষীদের নামগুলো প্রায় বাঙালীদের নামের মতো। এখানকার মগ উপজাতিদের মধ্যে দেখেছি তাদের নিজস্ব নাম। যা শুনলে আমি ঠিক উচ্চারণ করতে পারিনে। কিন্তু ত্রিপুরী উপজাতিদের নিজস্ব নাম হারিয়ে গেলো কখন থেকে ? মনে পড়ে গেলো ভাষাচার্য সুনীতি কুমারের 'কিরাত-জন-কৃতি' (KIRATA-JANA-KRITI) বইয়ের সেই কথা ঃ The earlier Tripura kings show Sanskrit name where these names are traditional and fictitious: and Bodo (Tipra) names which are plentiful upto the 14th Centrdly appear to be genuine." তাহলে দেখা যাচ্ছে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিপুরার ককবরক ভাষাভাষী ত্রিপুরীদের তাঁদের নিজস্ব নাম ছিলো।

খুব ভোরে দাদাশ্বশুরের ডাকে ঘুম ভেঙে গেলো— "আমার সুন্দরী নাতিনের সঙ্গে কত ঘুমাও চৌধুরী ? বাইরে এসে দেখো, মূছূই কগূই তুপখা (হরিণ শিকার করে এনেছে)।"

দা খগেন্দ্রর কথা শুনে ফুলকুমারীকে জাগিয়ে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এলাম। দেখি দাদাশ্বশুর বাঁশের হুকোয় পুড়ুত পুড়ুত করে তামাক টানছেন তিপরা গামছা পরে বেঞ্চির ওপর উবু হয়ে

বসে। আমাকে দেখেই বললেন, "নাতিন জামাই, তোমরা এসেছো বলে রাতের বেলায় তোমার শ্বশুরের দলবল চড়িলামের জঙ্গলে হরিণ শিকার করতে গিয়েছিলো। তোমাদের ভাগ্য ভালো, একটা হরিণ পেয়েছে তারা; চোখ মুখ ধোও, তোমাকে নিয়ে গিয়ে একটা আচানক জিনিষ দেখাবো।"

দা শ্বশুরের কথায় তাড়াতাড়ি চোখমুখ ধুলাম। 'থ চৌধুরী, গানতি নগ' — (চলো চৌধুরী রান্না ঘরে)। বলেই তিনি আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। শিকার করা আস্ত হরিণ দেখবো, কৌতূহলের সীমা নেই আমার। কিন্তু রান্না ঘরে নিয়ে গিয়ে কলার পাতার ওপর রাখা একপ্রকার পাতা দিয়ে মোড়া রক্তমাখা চার পাঁচটা পুঁটলি দেখিয়ে দা খগেন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, "দেখ চৌধুরী শিকার করা হরিণ।"

আমি রক্তমাখা পুঁটলিগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবতে লাগলাম দাদাশ্বশুর কি নাতিন জামাইয়ের সঙ্গে রসিকতা করছেন। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে হাসতে হাসতে বললেন, "আস্ত হরিণ না দেখে তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে চৌধুরী, তাই না? হরিণ খুব দূরে মিললে ছুলে টুকরো টুকরো করে 'আমাঙ বূলাই' (আমাঙ পাতা) -এর পাতা দিয়ে মুড়ে পুঁটলি বেঁধে যে যার মতন নিয়ে আসে। তোমাকে বলেছিলাম না একটা আচানক জিনিষ দেখাবো। এইবার পুঁটলিগুলো খুলি, অবাক হয়ে যাবে দেখে।

এরপর একটা একটা করে হরিণের মাংসের পুঁটলি খুললেন তিনি। বললেন, দেখো চৌধুরী মাংসের টুকরোগুলো সব জোড়া লেগে আছে, টুকরোগুলো আর আগলা আগলা করে ছাড়াতে পারবে না। তুমি দেখো না একটু চেষ্টা করে ছাড়াতে পারো কিনা।"

দাদা শ্বশুরের কথায় কৌতূহল আমার আর ধবেনা। সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা পুঁটলির ভেতর দু'হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হরিণের মাংসের টুকরোগুলি টেনে ছাড়াতে চেষ্টা করতেই সত্যিই আচানক বনে গেলাম আমি। তখন দা খগেন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, "বিশ্বাস হলো এখন, চৌধুরী? এ হলো ওই আমাঙ পাতাব গুণ। সদ্য সদ্য টুকবো করা মাংস আমাঙ পাতা দিয়ে বাঁধলে আবার জোড়া লেগে যায়। বুঝলে চৌধুরী, বাড়িতে আমাদের হাড়গোড় ভেঙ্গে গেলে আমরা আমাঙ পাতা বেটে আরো অন্য কিছু মিশিয়ে জাবের মতো করে লাগিয়ে দিই, তাতেই ভাঙা হাড়গোড় জোড়া লেগে যায়। তুমি বিশ্বাস করবে না, অনেক হাসপাতাল ফেরত হাড়গোড় ভাঙা রোগী আমাদের পাহাড়ী কবিরাজের কাছে এসে ভালো হয়।'

সত্যিই আচানক বনে গিয়েছিলাম দাদা শ্বশুরের কাছ থেকে পাহাড়ী আমাঙ পাতার শক্তির কথা শুনে। আনন্দে বলে উঠলাম আমি, "এ-তো বিশল্যকরণী নয়তো, যার কথা রামায়ণে আছে? লক্ষ্মণকে শক্তিশেলের আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্যে হনুমান গন্ধমাদন পর্বত থেকে বিশল্যকরণী এনে দিয়েছিলো?"

— "হাসালে চৌধুরী, হাসালে। কোথায় সাগরপারের লঙ্কা, আর কোথায় ত্রিপুরা। তবে গন্ধমাদন পর্বতের বিশল্যকরণী আর ত্রিপুরার পাহাড়ের 'আমাঙ বূলাই' এক কিনা জানিনে। তবে তুমি তো নিজেব চোখে দেখলেতো এর গুণাগুন। আর, চৌধুরী, আমাদের মেয়েরা বাড়িতে যখন মদের পিঠে তৈরী করে তখন তাতে ওই আমাঙ পাতা বেটে দেয়। আমাদের বাড়িতে যে মদ তৈরী হয়, বুঝলে চৌধুরী, তাতে আমাঙ পাতার মতো আবো অনেক পাতা লাগে। এর জন্যে আমাদের তিপ্‌রাবাড়ির মদ ওষুধের কাজ করে।"

সকালে প্রাতরাশ সারলাম 'আওয়াঙ ছকরাঙ' দিয়ে। তারপর দাদা শ্বশুরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম চন্তীঠাকুরের পাশের গ্রাম রঘুনাথ ঠাকুর পাড়ায় যাবার জন্যে। প্রথমে এলাম বুদ্ধ দেববর্মার বাড়ির পাশে। পাশে লাগায়ো তাঁর পিসেমশায় কুলচন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি। বাড়িগুলো বিরাট বিরাট বেশ সাজানো-

গোছানো, সামনেই বাহারী ফুলবাগান। দা খগেন্দ্র বললেন, 'চৌধুরী এই বাড়িতেই কমরেড ভূপেশ গুপ্তকে রেখেছিলাম আমরা।' একটু এগোতেই চোখে পড়লো চার-পাঁচটা বাঙালী বাড়ি, সঙ্গে দোকান। কারোর মুদিখানার দোকান, কারোর চায়ের স্টল। ছোট্ট একটা বাজারের মতো মনে হচ্ছিলো জায়গাটাকে। দোকানগুলোর সামনে কিছু শাক-সব্জি বিক্রি করার জন্যে রাখা হয়েছে দেখলাম। দেখলাম একজন বাঙালী কিছু সিঁদল নিয়ে বসে আছে। বাঙালী বাড়িগুলো ছাড়িয়ে যেতেই আমি দাদা শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, দাদা, আপনারা আপনাদের গ্রামের একেবারে মাঝখানে বাঙালীদের বসিয়েছেন, এটা কি খুব ভালো কাজ করেছেন? রিফুজিদের সঙ্গে তো আপনাদের সম্পর্ক ভালো না।"

দাদা খগেন্দ্র আমার কথায় বাধা দিয়ে বললেন, 'না চৌধুরী এরা সে-ধরনের রিফুজি না। হিন্দুস্তান-পাকিস্তান হবার আগে এরা কসবা কালীবাড়ির দিক থেকে এসে বিশালগড়, লালসিংমোড়া, চড়িলাম বাজারে সিঁদল-শুঁটকি, পান-সুপুরি বিক্রি করতো। তখন সপ্তায় একদিন বাজারবার। চড়িলাম বাজার সেরে রাতে এসে এদের বাপ্-কাকারা আমাদের চন্ডীঠাকুর পাড়ায় এসে আমাদের বাড়িতে থাকতো। তা দেশ ভাগের পর যখন এরা এলো, তখন এদের ফেলি কী করে? কাজেই আমাদের গ্রামের 'অক্‌রা-চাক্‌রা' (মুরুব্বি-মাতব্বর)রা বসে আলোচনা করে চন্ডীঠাকুর আর রঘুনাথ ঠাকুর পাড়ার মাঝখানের এই খোলা জায়গায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলো। এরা খুব ভালো লোক চৌধুরী, কেউ কাকা বলে ডাকে, কেউ মামা বলে ডাকে, আমরা বেশ মিলেমিশে আছি।"

— "কিন্তু দাদা, কাল রাতে আমাদের নানা আপনাদেরকে 'গুরুমা' বলে ঠাট্টা করেছেন, লক্ষ্য করেছেন সেটা?"

— "শোনো নাতিন জামাই, শুধু তোমার নানা বলে নয়, আমাদের ট্রাইবেল মেয়েরা রিফুজিদের একদম পছন্দ করেনা, কারণ জানো?"

— "কী কারণ?"

— "শোনো, চন্ডীঠাকুর পাড়ার দক্ষিণ দিকে যে বাঙালীবস্তি একেবারে বিশ্রামগঞ্জ বাজার অব্দি চলে গেছে, এই বিরাট জায়গাটা ছিলো আমাদের মেয়েদের জুম করার জায়গা। সেখান থেকে তারা লাকড়ি (জ্বালানী কাঠ), বনের নানারকম আলু আনতো। জায়গাটার প্রতি তাদের খুব মায়া। জায়গাটায় রিফুজিরা এসে বসায় আমাদের গ্রামের মেয়েদের চড়িলামের বাঘ-ভাল্লুকের জঙ্গলে যেতে হয় এখন। তাই আমাদের গ্রামের মেয়েদের রিফুজিদের ওপর খুব রাগ। কমরেড অঘোর খুব চেষ্টা করেছিলো জায়গাটায় রিফুজি পুনর্বাসন বন্ধ করতে, কিন্তু পারেনি।"

এবার দা খগেন্দ্র হাত দিয়ে দেখালেন, 'চৌধুরী ওই দেখো আমাদের চন্ডীঠাকুর পাড়ার ইশকুল। ওই ইশ্‌কুলের মাঠে লাল পার্টির সম্মেলন হয়েছিলো। আমাদের চন্ডীঠাকুর আর রঘুনাথ ঠাকুর পাড়ার মেয়ে-পুরুষ জান দিয়ে খেটেছিলো ওই সম্মেলনে। আর অতি দুঃখে আমরা এখন করি যুব সমিতি পার্টি।'

একটু পরেই আমরা রঘুনাথ ঠাকুর পাড়ায় এসে পৌঁছলাম। দাদা নিয়ে গেলেন আমাকে জিতুমোহন দেববর্মার বাড়ি। এক কথায় বিশাল বাড়ি, বিশাল ঝকঝকে উঠোন বাড়িটার। জিতুমোহনবাবু আগের থেকেই আমাকে চিনতনে। বিশ্রামগঞ্জের কাছে খেঙরা বাড়িতে যখন ডঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে ককবরক ভাষার কাজ করি তখনই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। অঘোরবাবুর কাছ থেকে শুনেছিলাম কমিউনিস্ট পার্টি দু'ভাগ হবার পরে জিতুমোহন চলে যান নতুন পার্টিতে, সুধন্বা দেববর্মার ভক্ত হিসেবে। আর, তাঁর ছোটো ভাই নিবারণ দেববর্মা থেকে যান পুরনো পার্টিতে তাঁর (অঘোর দেববর্মার) ভক্ত হিসেবে।

জিতুমোহনবাবু আমাকে দেখে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। 'চৌধুরী, আপনি এসেছেন আমাদের

গ্রামে, কতদিন পরে দেখা। তা আমাদের ডাঃ সুহাস চ্যাটার্জী কেমন আছেন, আমাদের ভাষার কাজের কী হলো? হেরমার গৌরচাঁন ঠাকুরের নাতিনকে বিয়ে করেছেন, এখন আপনি আমাদের আত্মীয়।'

বেশ কিছুক্ষণ জিতুমোহনবাবুর বাড়িতে থেকে পুরনো আমলের অনেক কথা শুনে চলে এলাম দা খগেন্দ্রর বাড়ি। দুপুরে আমাঙ পাতায় মোড়া হরিণের মাংস দিয়ে ভুরিভোজ সেরে আবার বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম আমার কাকাশ্বশুর বসন্ত দেববর্মার মা নানা তরুবালার সঙ্গে আমরা স্বামী-স্ত্রী হেরমা বাড়ির দিকে।

প্রথমবারের মতো চন্ডীঠাকুর পাড়ায় পরিচিত হবার পর থেকে আমি মাঝেমধ্যে পুনিরাম ঠাকুর পাড়া ও পেকুয়ারজলায় যেতাম চন্ডীঠাকুর ও লাটিয়াছড়ার ভেতর দিয়ে। পুনিরাম ঠাকুর পাড়ার স্কুল শিক্ষক হরচন্দ্র দেববর্মা সম্পর্কে আমার কাকাশ্বশুর। তাছাড়া আমার শ্বশুর বাড়ি হেরমাপাড়ার বহু আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন এই গ্রামে। পেকুয়ারজলা গ্রাম আমার শ্বশুর বাড়ি হেরমা ও পাশের গ্রাম ধারিয়াথলের আত্মীয়-স্বজনে একেবারে ভর্তি। ওই গ্রামে গেলে কার বাড়ি উঠবো আর কারবাড়ি উঠবো না এমন অবস্থা হতো আমার। আমার সম্পর্কে দুই শালীর বিয়ে হয়েছে পেকুয়ারজলায়। এক শালী তো ঝুনুরাণী হেরমার যোগেন্দ্র দেববর্মার মেয়ে। কিন্তু পেকুয়ারজলা গ্রামে গেলে প্রথমে আমার উঠতে হতো সি পি আই নেতা শচীন্দ্র দেববর্মার বাড়ি। ফেরার পথে আমি চন্ডীঠাকুর পাড়ায় ঢুকতাম কখনো দাদা শ্বশুর খগেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি, কখনো আমার মামাতো শালী শম্পিনীর বাড়ি। শম্পিনীর স্বামী শচীন্দ্র আবার হরেন্দ্র ঠাকুরের ছেলে, চন্ডীঠাকুরের সাক্ষাৎ নাতি।

১৯৮০ সনে জুন মাসে ত্রিপুরার দাঙ্গা শুরু হবার মাত্র ক'দিন আগে আমি শান্তিনিকেতনে চলে যাই একাই বৌ-ছেলে-পিলে রেখেই।

ত্রিপুরীর জাতি-উপজাতির মহাদাঙ্গার খবর পেয়েই ত্রিপুরায় চলে আসি আমি। এবং নৃপেন চক্রবর্তী, অঘোর দেববর্মা (সি পি আই নেতা) ও সমর চৌধুরীর সহায়তায় কোনোরকমে বৌ-ছেলে-মেয়েদের হেরমা থেকে উদ্ধার করে আগরতলায় বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে নিয়ে আসি। তখনই হেরমা থেকে খবর পেলাম চন্ডীঠাকুর পাড়ার দাঙ্গায় বিধ্বস্ত হবার খবর। জানতে পারলাম, চন্ডীঠাকুরের পাশের গ্রাম রঘুনাথ ঠাকুর পাড়াও দাঙ্গাকবলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে লাবণ্যলতার ছোট ছেলে সুধাংশু দেববর্মা (দাঙ্গার সময় গোলাঘাটী তহশিল কাছারীর তহশিলদার) আমাকে যা বলেছিলেন ঃ সে-দিন জুনের ন' তারিখ। তিনি সকালে ফকিরামোড়ার সন্তোষ দাশ ও কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোককে নিয়ে তাঁদের গ্রামের পুব দিকে একটা জায়গায় শান্তি কমিটির মিটিং সেরে বাড়ি ফিরেছেন সাড়ে ন'টা নাগাদ। এমন সময় খবর আসে পাশের গ্রাম রঘুনাথ ঠাকুর পাড়ায় বাঙালীরা আগুন দিয়েছে। ঘরপোড়ার শব্দ ও লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। তখন চন্ডীঠাকুর পাড়ার লোকজন যে যেমনভাবে পারে পালাতে শুরু করলো লাটিয়াছড়ার দিকে। মেয়েরা বাচ্চা-কাচ্চাদের নিয়ে পালাতে লাগলো। বুড়োবুড়িদের অসুবিধা সত্ত্বে টেনে-হেঁচড়ে কোনরকমে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলা হলো। সুধাংশুবাবু ও তাঁর স্ত্রী কুঞ্জেশ্বরী প্রায় এক কাপড়ে ছুটলেন বিরাট বিরাট ঘরবাড়ি খোলা রেখে। বাঙালীরা চন্ডীঠাকুর পাড়ায় এসে প্রথমে এই বর্ধিষ্ণু গ্রাম লুট করলো। ধান-চাল, রাজার আমলের মূল্যবান তৈজসপত্র, গোরু-বাছুর, শূকর-ছাগল মোরগ-মুরগী-হাঁস যা পেলো নিয়ে গেলো সব। প্রায় একশ'র মতো শূকর লুট হলো এই গ্রাম থেকে। সুধাংশুবাবুর গোলায় তখন দু'শ মনের মতো ধান। সবে ইরি ধান কেটে গোলাভর্তি করেছেন। তার সঙ্গে আছে শীতকালের পুরনো ধান। দাঙ্গাকারী ও লুটেরারা সব ধান নিয়ে যেতে না পেরে শেষে ধানের গোলায় আগুন ধরিয়ে দিলো. ক'মাস ধরে নাকি সেই ধানের গোলা থেকে ধোঁয়া বেরুতো। চন্ডীঠাকুর পাড়ায় আগুন ধরানোর আগে বহু বাড়ির দরজা-জানালা খুলে নিয়ে

যায় দাঙ্গাকারীরা। লুট করা শেষ হলে গ্রামের সব বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। লাটিয়াছড়া স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চন্ডীঠাকুর-রঘুনাথ ঠাকুরের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাঁদের গ্রাম পুড়তে দেখে বুক চাপড়ে কাঁদতে থাকেন। সেই দিন থেকেই চন্ডীঠাকুর-রঘুনাথ ঠাকুর পাড়ার লোকেরা লাটিয়াছড়া স্কুলের সরকারী শরণার্থী শিবিরে দিন কাটাতে লাগলেন। এই অবস্থা চলেছিলো তিন-চার মাসের মতো। চড়িলামের বিজয় মজুমদার ও তাঁর বাবা নৃপেন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে সুধাংশুবাবুদের ছিলো প্রায় আত্মীয়ের সম্পর্ক। বিজয়বাবুরা এই মহাবিপদে সুধাংশুবাবুদের পাশে এসে দাঁড়ান এবং নানাভাবে সাহায্য-সহায়তা করেন।

আমি ১৯৮৩ সনে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে চন্ডীঠাকুর পাড়ায় যাই। কিন্তু গিয়ে দেখি রাজার আমলের সেই বনেদী উপজাতি জনপদের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। রাজার আমলের সেই বড়ো ঘরবাড়ি আর নেই। তার বদলে চারদিকে দেখা যাচ্ছে সরকারের তৈরী করে দেয়া একই ধরনের টিনের ঘর। খোঁজ নিয়ে জানলাম চন্ডীঠাকুর পাড়ার বুকের ওপর বসানো বাঙালী পরিবারগুলোর ভূমিকা দাঙ্গার সময় খুব একটা ভালো ছিলো না।

চন্ডীঠাকুব পাড়ার সামাজিক জীবনেও দেখলাম নানারকম পরিবর্তন এসেছে। কুলচন্দ্র ঠাকুর-লাবণ্যলতার দু'ছেলে রমেশ দেববর্মা ও সুধাংশু দেববর্ম ভগবান যীশুর পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছেন। এককালের নামকরা কমিউনিস্ট যুবকর্মী ও স্কুল শিক্ষক ককবরক ভাষার প্রখ্যাত কবি রমেশ দেববর্মা কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোকে শেষ লাল অভিবাদন জানিয়ে অরুন্ধতীনগর মিশনে বসে ককবরক ভাষায় নিউটেস্টামেন্ট অনুবাদ করছেন প্রায় ধ্যানমগ্ন হয়ে। চন্ডীঠাকুর পাড়ার বনেদী পরিবারের ছেলে-মেয়েরা সব শিলংমুখী। দেখলাম এই শিলংগামী ছেলে-মেয়েরা বাঙলা ভাষায় আর কথাবার্তা বলতে চাইছে না। বাঙলায় প্রশ্ন করলে ইংরিজিতে উত্তর দিচ্ছে তারা।

চন্ডীঠাকুর পাড়ার দ্বিতীয় ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলো ১৯৮৭ সনের প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের রাতে একটা মর্মান্তিক হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে। ফকিরামোড়ার নিচে লাটিয়াছড়ায় যাবাব বাস্তার পাশে ছিলো মরণ ভৌমিকের বাড়ি। ২৫শে জানুয়ারী সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ তথাকথিত টি এন ভি দলের জঙ্গীবাহিনী মরণ ভৌমিকের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ পাঁচজনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ওই এলাকার এম এল এ ছিলেন চন্ডীঠাকুরের নাতি বুদ্ধ দেববর্মা। তিনি থাকেন আগরতলার অভয়নগরে পাকাপাকিভাবে। তিনিও ঘটনার খবর পেযে ঠিকসময়ে যথাযথ হস্তক্ষেপ করতে পারেননি। তখন বামফ্রন্টের সময়কাল। বামফ্রন্ট সবকারের মন্ত্রী ও প্রশাসকরাও ওই হত্যাকান্ড সম্পর্কে ছিলেন অনেকটা নির্বিকার। সরকারের তরফ থেকে কেউ-ই মরদেহ দেখতে যাননি বলে এলাকার লোকজনের অভিযোগ ছিলো। তাই যা হবার তাই হলো। চড়িলাম-বিশ্রামগঞ্জের সাধারণ বাঙালী আইন তাঁদের হাতে তুলে নিলেন। আক্রমণ করে চন্ডীঠাকুর পাড়ায় অগ্নিসংযোগ করলেন। ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জীর নেতৃত্বও তখন ব্যর্থ হয়ে গেলো এলাকার নেতা হিসেবে। চন্ডীঠাকুর পাড়ার লোকেরা ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে যেভাবে ডরায় ঠিক সেইভাবে ডরালেন। তাঁরা নারী ও শিশুদের ওই ঘটনার রাত্রেই লাটিয়াছড়া-চিকনছড়ার দিকে পাঠিয়ে দিলেন বিপদের আশঙ্কা করে। দ্বিতীয়বার চন্ডীঠাকুর পাড়া পুড়লো। সব লুট হলো। আবার সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন সুধাংশু দেববর্মা।

মরণ ভৌমিকের পরিবাবেব হত্যাকান্ডের পর চড়িলাম-ছেছরীমাইয়ের বাঙালী জনসাধারণ যেমন চন্ডীঠাকুর-রঘুনাথ ঠাকুর-লাটিয়াছড়া উপজাতি এলাকায় যাওয়া বন্ধ করে দিলেন, তেমনি এই এলাকার উপজাতিরাও চড়িলাম বাজারে আসা বন্ধ করে দিলেন। চড়িলাম হাইস্কুলের ট্রাইবেল বোর্ডিং-এর ছাত্ররা বোর্ডিং ছেড়ে পালালো। স্কুলেও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা যাতায়াত বন্ধ করে দিলো। আবার

বাঙালী-উপজাতির ভেতর ৮০'র দাঙ্গার ভেদাভেদ শুরু হয়ে গেলো।

আগরতলায় থেকেই আমার মতো কিছু লোক মরণ ভৌমিকের পরিবারের বিপর্যয় ও তার পরবর্তী ঘটনার ওপর লক্ষ্য রাখতে লাগলেন। একদিন রবীন্দ্র পরিষদে বসে আছি। তখন রবীন্দ্র পরিষদের কর্ণধার অধ্যাপক বিজন চৌধুরী বললেন, 'চলুন, কুমুদবাবু, আমরা দু'একদিনের ভেতর চড়িলাম থেকে ঘুরে আসি। অবস্থা যে দিকে যাচ্ছে তাতে আবার কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।' তাঁর এই প্রস্তাব উপস্থিত সকলে সমর্থন করলেন। একটা টিমও হলো অধ্যাপক বিজন চৌধুরী, অধ্যাপক সত্যব্রত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক কার্তিক লাহিড়ী, সাংবাদিক সত্যব্রত চক্রবর্তী, অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র পরিষদের সদস্য গোপীনাথ ঘোষ প্রমুখকে নিয়ে। আমার ওপর দায়িত্ব পড়লো চড়িলামের বাঙালী-উপজাতি এলাকার লোক হিসেবে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া ও বাঙালী-উপজাতি এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ করে দেয়ার।

আলোচনামাফিক আমরা একদিন সকালে রওনা দিয়ে চড়িলাম ও ছেছরীমাইয়ের পরিমল চৌমুহনীতে নেমে ফকিরামোড়া দিয়ে চন্ডীঠাকুর পাড়ার দিকে যেতেই মরণ ভৌমিকের ভস্মীভূত বাড়ি দেখলাম। চন্ডীঠাকুর পাড়ায় যাবার পথে আমরা ফকিরামোড়ার মরণ ভৌমিক ও অন্যান্য বাঙালীদের সঙ্গেও কথা বলে গেলাম। চন্ডীঠাকুর পাড়ায় গিয়ে আমার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে মরণ ভৌমিকের পরিবারের হত্যাকান্ড সম্পর্কে যে তথ্য পেলাম তা শুনে আমাদের সকলের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেলো। তথ্যটা এইরকম : আশির দাঙ্গার আগে মরণ ভৌমিক হরেন্দ্র ঠাকুরের ছেলেদের কাছ থেকে পাঁচ কানির মতো জমি রেহান (বন্দক) রেখেছিলেন এবং ওই জমি চাষ-বাস করে খেতেন। কিছুদিন পরে তাঁর মনে হলো, এতোটা টাকা মুখে মুখে রয়েছে, কোন্‌দিন হরেন্দ্র ঠাকুরের ছেলেরা অস্বীকার করে জমির দখল নিয়ে নেয় কে জানে! তখন তিনি বুদ্ধি করে চন্ডীঠাকুরের নাতি শান্তিকুমার দেববর্মার নামে নাকি ওই জমি বেনামী কবলা করে রাখলেন। শান্তি কুমারের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে এবং মাঝেমধ্যে তাঁকে শূকরের মাংস খাইয়ে খুশী রেখে খানিকটা নিরুদ্বিগ্নভাবে ভোগ-দখল করতে লাগলেন জমিটা। কিন্তু চন্ডীঠাকুর পাড়ার জমির নামজারি প্রক্রিয়া শুরু হতেই দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়লেন তিনি। তিনি দেখলেন ওই জমির নামজারি করতে হলে শান্তিকুমার দেববর্মার নামেই করতে হবে। কাজেই জমির আসল মালিক হয়ে যাবেন শান্তিকুমারবাবু — আসলে তিনি কিছু না। যে-কোন দিন শান্তিকুমার দেববর্মা তাঁকে জমি থেকে উৎখাত করতে পারেন। এই অবস্থায় খুব ফ্যাসাদে পড়ে একটা বুদ্ধি এলো তাঁর মাথায়। তিনি ওই জমি মেলাগড়ের একজন পরিচিত লস্কর উপজাতির নামে পুনর্কবলা করে দিলেন। কিন্তু তাতেও তিনি যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। এদিকে জমির নামজারির দিন এগিয়ে আসছে। তখন তিনি মরিয়া হয়ে নিজেই লস্কর-উপজাতি হবার কথা ভাবলেন। গেলেন কোর্টে। সেখানে উকিল-মুহুরীদের সঙ্গে কথা বলে যেভাবেই হোক এফিডেবিট করে নাম বদল করলেন তিনি। ছিলেন মরণ ভৌমিক, হলেন মরণ লস্কর। তারপরেই করলেন জমি নিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হবার আসল কাজটা। মরণ লস্করের নামে এবার ওই জমি পুনর্কবলা করে নিলেন তিনি। কাগজেপত্রে এখন তিনি জমির মালিক। আইনের দিক থেকেও তিনি একজন লস্কর, যা উপজাতির সমতুল্য। এদিকে মরণ ভৌমিকেরমরণ লস্কর হয়ে যাবার কথা চন্ডীঠাকুর পাড়ায় ছড়িয়ে পড়লো নিমেষের মধ্যে। জানা গেলো, তলে তলে হস্কা ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাঙালী মরণ ভৌমিক উপজাতি মরণ লস্করের নামে হরেন্দ্র ঠাকুরের ছেলেদের জমি নামজারি করে নিতে চলেছেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়ায় চন্ডীঠাকুর পাড়ার লোকেদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করলো। এইভাবে কিছুদিন চলার পরেই নাকি মরণ ভৌমিক ওরফে মরণ লস্করের পরিবারে সেই ভয়ঙ্কর দিন ঘনিয়ে এলো।

মরণ ভৌমিকের পরিবারের হত্যাকান্ডের পেছনে উদ্বাস্তুর উদগ্র ভূমি ক্ষুধাই যে দায়ী এ-সত্য মেনে নিলাম আমরা অনেকেই। এবং একজন ব্যক্তি বিশেষের ভূমি ক্ষুধার শিকার হলো নিরীহ উপজাতি-বাঙালী উভয় অংশেরই মানুষ। এখন এই ক্ষত শুকোবে কী করে? ঠিক হলো, উপজাতি-বাঙালী উভয় অংশের মানুষ নিয়ে চন্ডীঠাকুর পাড়ার জনসভা হবে এলাকায় উপজাতি-বাঙালী সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্যে। আমরা উপজাতি এলাকায় কথাবার্তা সেরে চলে এলাম চড়িলাম নতুন বাজারের মালিক বিজয় মজুমদারের বাড়ি। আমাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালেন তিনি। এর সপ্তাখানেক পরে চন্ডীঠাকুর পাড়ার স্কুলমাঠে বাঙালী-উপজাতির সম্মিলিত মিটিং হলো। সেখানে আগরতলার কলেজের অধ্যাপক ও রবীন্দ্র পরিষদের কর্মকর্তারা বক্তৃতা করলেন বাঙালী-উপজাতির মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে। এলাকার বাঙালী ও উপজাতিদের মধ্য থেকে মুরুব্বী ব্যক্তিরাও আহ্বান রাখলেন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্যে। ভাবতে অবাক লাগে, সম্পূর্ণ একটা বেসরকারী উদ্যোগ সত্যি সত্যি সফল হলো। পরের দিন থেকেই উপজাতি এলাকার লোক বাঙালী এলাকায় আসতে শুরু করলেন, বাঙালী এলাকার লোকও অনেকদিন পরে উপজাতি এলাকায় ঢুকতে পেরে আয়-রোজগারের মুখ দেখতে শুরু করলেন।

অনেক দিন পরে চন্ডীঠাকুর পাড়ায় এসে অতীতের স্মৃতিগুলো একে একে ভেসে উঠছিলো। এখন চোখ মেলে দেখি চন্ডীঠাকুরের মেয়ে লাবণ্যলতার ছেলে সুধাংশু দেববর্মা প্রোমোশন পেতে পেতে তহশিলদার থেকে ডেপুটি ক্যালেক্টর হয়েছেন। তাঁর ছেলে সুখেন্দু দেববর্মা এখন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের খ্যাতিমান অধ্যাপক। প্রায়শঃ আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিতে ভারতবর্ষেকর বাইরে যান তিনি। সে-সব জায়গায় গিয়ে হিউম্যান রাইটস-এর ওপর বক্তৃতা করেন ত্রিপুরার উপজাতিদের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে। লাবণ্যলতার আর এক ছেলে রমেশ দেববর্মা তাঁর মাতৃভাষা ককবরককে নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদের কাজ শেষ করেছেন। আগরতলা অরুন্ধতীনগর ব্যাপটিস্ট মিশন তা বই আকারে প্রকাশ করে তার মাধ্যমে পাহাড়ের ঘরে ঘরে ভগবান যীশুর বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই ত্রিপুরার ট্রাইবেল পরিবারের জামাই হিসেবে অনেক কিছুরই সাক্ষী থাকবো আমি। রাত আটটায় ফিরে এলাম বিশ্রামগঞ্জে। সেখানে সরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের সঙ্গে নির্বাচনী ঘরোয়া জনসভা। সভায় উপস্থিত হয়ে দেখি কমরেড ভানুলাল সাহা বক্তৃতা করছেন। প্রার্থী বক্তৃতা করলেন ককবরক ভাষায়। ৯.৩০'এ বেরিয়ে আমরা রাত ১০.৩০'এ আগরতলায় পৌঁছলাম। আমাদের সঙ্গে লালসিং মুড়া গাঁও সভার প্রধান মন্দোদরী দেববর্মা। প্রার্থী আমাকে আমার বাসায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন তাঁর নাজির পুকুরের বাড়িতে।

২৫শে জুলাই, ১৯৯৫ মঙ্গলবার। আজ সকালে ন'টায় প্রেস ক্লাবের পাশে পশ্চিম জেলা সাক্ষরতা অফিসে লিটারেসি ইভালুয়েশান কমিটির মিটিং ছিল। মিটিংয়ে আমি ছাড়া ছিলেন ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদ, ডঃ কমল কুমার সিংহ, অধ্যাপক সুদীপ বসু, অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য এবং ডঃ জলধর মল্লিক। ঠিক হলো, সাক্ষরতার 'প্রথম পাঠ'এর পরীক্ষা হবে। ডঃ মল্লিক আগের থেকে প্রশ্ন পত্রের একটা মডেল করে রেখেছিলেন। আমরা সেগুলোর ঈষৎ পরিবর্তন করে অনুমোদন করে দিলাম। সাক্ষরতার মিটিং সেরে ১২.৩০ নাগাদ রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও আমি গেলাম মৃণালকান্তি করের বাড়ি। সেখান থেকে মৃণাল বাবুর সঙ্গে এলাম আমরা 'দৈনিক সংবাদ' এর আফিসে। কথা প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার কথা উঠতেই ভূপেন বাবু (ভূপেন দত্ত ভৌমিক 'দৈনিক সংবাদ' এর সম্পাদক) ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টদের নিধন যজ্ঞের বাস্তব কারণ বললেন এই ভাবেঃ একবার তিনি সাংবাদিক হিসেবে কলকাতায় ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর সঙ্গে বিরল সাক্ষাৎকারের সুযোগ পেয়েছিলেন

৬০ এর দশকের শেষপা‍ে । তখন সেখানে ডঃ সুয়োকর্ণ সরকারের পতন ঘটেছে । সুয়োকর্ণ ছিলেন কমিউনিস্ট প্রভাবিত । ভূপেন বাবু প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর কাছে জানতে চাইলেন কীভাবে এবং কী কারণে মাত্র তিনদিনে ইন্দোনেশীয়ায় ৬ লক্ষ কমিউনিষ্টকে তাঁরা মারলেন । প্রেসিডেন্ট সোহার্তো বললেন যে তাঁর সরকার মিলিটারী দিয়ে কমিউনিষ্টদের গুলি করে মারেননি, মেরেছে জনসাধারণ। কমিউনিষ্টরা সেদেশের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে গিয়ে জনরোষের কবলে পড়ে এবং জনগণই তাদেরকে পিটিয়েই মেরেফেলে । ভূপেন বাবুকে প্রেসিডেন্ট সোহার্তো বলেন সুযোগ পেলে একবার তাঁর দেশে গেলে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে । পরবর্তীকালে ভূপেন বাবু আন্তর্জাতিক প্রেস কনফারেন্সে ইন্দোনেশিয়ায় যান এবং প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর সঙ্গে দেখা করেন এক মসজিদে নমাজ পড়ার সময় । প্রেসিডেন্ট তাঁকে বিলক্ষণ চিনতে পারেন । ভূপেন বাবু তখন কমিউনিস্ট নিধনের কথা তোলেন । প্রেসিডেন্ট সুহার্তো তখন ভূপেন বাবুকে একটা পাশের ব্যবস্থা করে দেন । যে 'পাশ' দেখালে তিনি ইন্দোনেশিয়ার যেকোনো জায়গায় যেতে পারবেন এবং খেতে পারবেন বিনা পয়সায় । এই 'পাশ' দেয়ার অর্থ হলো একেবারে স্বাধীনভাবে তিনি কমিউনিষ্ট নিধনের কারণগুলো জানতে পারবেন । তিনি প্রথম গেলেন বালি দ্বীপে । সেখানকার গভর্নরের অতিথি হলেন তিনি । বালির গভর্নরের কাছে জানতে চাইলেন কমিউনিস্ট নিধনযজ্ঞের কথা । গভর্নর তাঁকে বললেন, ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টরা কমিউনিস্ট নেতা আইদিতের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ায় আর্য ও ইসলামীয় মিলনধারার ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে গিয়ে সাধারণ মানুষের রোষানলে পড়েছিলেন । আর্মির লোকেরা তাদের মারেনি । ৬ লক্ষ কমিউনিস্টকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো সাধারণ মানুষ নদীর ধারে । সেখানে বেগতিক দেখে তারা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ৩ দিন নদীতে থাকা অবস্থায় ওই ৬ লক্ষ কমিউনিস্ট মারা যায়—সরকারকে কিছু করতে হয়নি । ভূপেন বাবু বললেন, ইন্দোনেশীয়ায় আর্যসভ্যতা ও ইসলামিক সভ্যতা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস সুন্দরভাবে পাশাপাশি সহবস্থান করছে । একই দোকানে ছাগল-শূকর-গরুর মাংস পাশাপাশি বিক্রি হচ্ছে । ইন্দোনেশিয়ার মানুষের নাম দেখলে বোঝাযায় সেখানে ইসলামিক নাম আর্য নামকে গ্রাস করতে পারে নি । আমি বললাম ঠিকই বলেছেন, সুয়োকর্ণ হলো সুকর্ণ, সুহার্ত হলো সৌহার্দ্য, আর আইদিত হলো আদিত্য । এই আলোচনার সময় টেলিগ্রাফ পত্রিকার রিপোর্টার শেখর দত্ত উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি খুব রেলিশ করে ভূপেন বাবুর কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞের কথা শুনছিলেন ।

২৬শে জুলাই, ১৯৯৫, বুধবার । আজ বিকেলের দিকে হেরমায় গিয়ে পৌঁছলাম চড়িলাম হয়ে।

২৭শে জুলাই, ১৯৯৫, বৃহস্পতিবার । আজ এ.ডি.সি'র নির্বাচন উপলক্ষে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে মহামিছিল হবে । আম্দি অঞ্চল থেকে মিছিল যাবে । আমি খুব ভোরে উঠে গেলাম পাশের গ্রাম ধারিয়াথলে । গতকাল এই গ্রামে বামফ্রন্টের কর্মীরা টি.এন.ভি'র পোস্টার ছিঁড়ে দেওয়ায় গন্ডগোল হয়েছে । রাতে টি.এন.ভি'র জঙ্গি কর্মীরা বামফ্রন্টের প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মার পোস্টার ছিঁড়ে দিয়েছে । আমি ধারিয়াথলে গিয়ে কমরেড যুগল দেববর্মার সঙ্গে দেখা করলাম । যুগলবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন ধারিয়াথলের নির্বাচনী অফিসে । সেখানে বসে বামফ্রন্ট কর্মীদের নিয়ে সব আলোচনা হলো । নেত্রী তুলসী দেববর্মাও এলেন । তিনি আজকের বিশ্রামগঞ্জের মিছিলে অংশগ্রহণ করবার জন্যে সকলকে বললেন । আমি সি পি আই এর গোপাল দেববর্মার সঙ্গে একান্তে কিছু আলোচনা সেরে হেরমায় ফিরে এলাম । হেরমায় আসার আগে ধারিয়াথলের কমরেড রণ দেববর্মার সঙ্গেও নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনা করলাম । হেরমায় ফিরে কাকী শাশুড়ী জ্যোৎস্না দেববর্মার সঙ্গে মিছিল নিয়ে যাবার ব্যাপারে আলোচনা সেরে বাড়ি গেলাম । শাশুড়ীমা আমাকে সকালের ভাত খেতে বললেন । গোদক ও বেরমা (সিধলের)

ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে আমি হেরমা বাজারে গেলাম । সেখানে বামফ্রন্টের নির্বাচনী অফিসে বসে আজকের বিশ্রামগঞ্জের মহামিছিল নিয়ে আলোচনা হলো । ঠিকহলো, ধারিয়াথল, হেরমা, ও গৌরকপরা পাড়ার লোকেরা জমা হবে রংমালার দূরন্তকপরা পাড়ায় । সেখানে রামনগর ও চাঁদুরামকপরা পাড়ার লোকেরাও সমবেত হবে । সেখান থেকে মিছিল করে একসঙ্গে বিশ্রামগঞ্জে যাওয়া হবে । দুপুর একটার সময় হেরমা ও গৌরকপরা পাড়ার লোকেরা হেরমা বাজারে সমবেত হলেন । কিন্তু ধারিয়াথলের লোকেরা আসতে দেরি করল । এদিকে খবর এলো, রামনগর-রঙমালার লোকেরা দূরন্তকপরা পাড়ায় জড়ো হয়ে আমাদেব জন্যে অপেক্ষা করে মিছিল নিয়ে বিশ্রমগঞ্জে চলে গেছে । আমাদের মিছিলের ব্যান্ড পার্টির বাজনাও কানে এলো । ধারিয়াথলের লোকেদের অপেক্ষা না করে আমরাও লাল ঝান্ডায় সুসজ্জিত মিছিল নিয়ে রওনা হলাম বিশ্রামগঞ্জের দিকে পুবের মোড়ার ভেতর দিয়ে । পুবের মোড়ার লোকেরা বেশীরভাগ যুবসমিতির-টি.এন.ভি'র সমর্থক । মিছিলে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী । আমি লাল ঝান্ডা নিয়ে পুরোভাগে । আমার ঠিক পেছনে আমার পিসি শাশুড়ী বিতু, তাঁরপরে আমার এক শালার বিধবা বৌ, তাঁরপরে আমার নিজের শালী ছায়া বাণী । জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কাঠফাটা রৌদ্রে মিছিল চলতে চলতে এলো জাঙ্গালীয়া পাড়ায় । এই পাড়াও টি.এন.ভি'র ঘাটি । দুপুরের কাঠ ফাটা রৌদ্রের মধ্য দিয়ে গর্জনতলী বাজার, নলজলা, আদিবাসী কলোনী হয়ে মিছিল চলে এলো বিশ্রামগঞ্জ বাজাবের সড়কে । আমি মিছিলের পুরোভাগে থেকে খুব সতর্কভাবে বিশ্রামগঞ্জ বাজারের লোক সামলিয়ে মিছিল নিয়ে উপস্থিত হলাম বিশ্রামগঞ্জ ইস্কুলেব মাঠে । সেখানে পৌঁছে দেখি মিটিংয়ে ধরা গলায় বক্তৃতা করছেন কমবেড ভানুলাল সাহা । পরপর মিছিল আসতে লাগলো । সবথেকে বড় মিছিল এলো ইটভাট্টার দিক দিয়ে প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মার নেতৃত্বে । মিছিলে মিছিলে বিশ্রামগঞ্জ বাজার জনসমুদ্র । আজ ছিলো বাজারবার, তার ওপর মিছিলের এতো লোক । মিটিংয়ে যোগ দিতে আমার স্ত্রী ফুলকুমারীও এসেছেন আগরতলা থেকে । তাঁকে নিয়ে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে বক্তৃতা শুনতে লাগলাম নেতাদের । সি.পি.আই'এর সুনীল দাশগুপ্ত, ফরোয়ার্ডব্লকের শম্ভু চক্রবর্তী, আর.এস.পি'র প্রাণ কৃষ্ণ আচার্য, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান কমবেড মানিক সরকাব ও প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মা পরপর বক্তৃতা করলেন । মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কমরেড দুর্গাদাস শিকদার, কমরেড প্রশান্ত কপালী ও কমবেড সাহানা সেনগুপ্ত। কমরেড অমূল্য শর্মা সবসময় আমার পাশেই ছিলেন । প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে মিটিং শেষ হলো । আমরা স্বামী-স্ত্রী ভিজতে ভিজতে গেলাম শূকরের মাংসের বাজারে । সেখান থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে ৫০০ গ্রাম মাংস নিয়ে এলাম নির্বাচনী অফিসে । নির্বাচনী অফিসের সামনে বাঁশের কড়ুল বিক্রি হচ্ছিল । আমার স্ত্রী ২ কেজি বাঁশের কড়ুল নিলেন চার টাকা দিয়ে । নির্বাচনী অফিসে এসে দেখি প্রার্থী কুঞ্জবাবু, প্রশান্ত কপালী ও সাহানা সেনগুপ্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আগরতলায় চলে গেছেন । নির্বাচনী অফিসে বসে কমরেড অমূল্য শর্মা, মনোরঞ্জন দেবনাথ, কমরেড কালা মিঞা, সমীরঞ্জন দেববর্মা ও সেনকুমার দেববর্মার সঙ্গে নির্বাচন সংক্রান্ত জরুরী কথা সেরে আমরা স্বামী-স্ত্রীতে শূকরের মাংস আর বাঁশের কড়ুল নিয়ে বাসে করে আগরতলায় ফিরলাম রাত ৮ টায় । বিশ্রামগঞ্জ থেকে বাসে উঠে দেখি চড়িলামের শ্রীযুক্ত বিজয় মজুমদার ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কবিরাজ । তাঁরা বিশ্রামগঞ্জের মিটিংয়ে গিয়েছিলেন।

আজ ২৮ শে জুলাই, ১৯৯৫, শুক্রবার। আজ হেরমা যেতে হবে, আগামীকাল এ.ডি.সি'র ভোট । আমার ছেলে-মেয়েরা সকলেই ভোটার, হেরমাবাড়ির ভোটার লিস্টেই আমাদেব নাম । কাজেই সেখানেই প্রতিবার ভোট দিই আমরা । সুরঞ্জন-তানিয়া-দেবযানী কেউ-ই ভোট দিতে যেতে চাইলো না । সুরঞ্জন তো ভোটের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে । অগত্যা আমারা স্বামী-স্ত্রীতেই ভোট দিতে যাবো ঠিক হলো । সকালে আমি একবার গেলাম মেলারমাঠে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর বাড়ি ।

দেবুদাকে বললাম, "দেবুদা, আমার মনে হচ্ছে আগামীকাল কংগ্রেস, যুবসমিতি, টি.টি.এন.সি, টি.ইউ. জে. এস, টি.এস.এফ সবাই একযোগে টি.এন.ভি প্রার্থী অনন্ত দেববর্মাকে ভোট দেবে বামফ্রন্টের সি.পি.আই প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মাকে হারানোর জন্যে। আমতলী-গোলাঘাটী কেন্দ্রের অবাম উপজাতীয় বুদ্ধিজীবীরা এই কেন্দ্রে একটা আঞ্চলিক দলকে জেতাতে চাইছে।" আমার কথা শুনে দেবুদা বললেন, 'ব্রাদার, এটা হতে পারে, কারণ তাদের জাত্যাভিমানে ঘা লেগেছে। কাজেই সেইদিক দিয়ে তারা ত্রিপুরায় একটা ট্রাইবেল দল চাইছে।" দেবুদার সঙ্গে কথা-বার্তা সেরে আসার পথে বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়ি গেলাম। বীরচন্দ্র বাবুকে সব জানালাম আর কমরেড ললিতাকে বললাম কমরেড কুঞ্জর জেতার সম্ভাবনা আছে। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রীতে হেরমার দিকে রওনা দিলাম। সন্ধ্যের একটু আগে গ্রামে পৌঁছুলাম। কমরেড অমূল্য শর্মা ও ডাঃ চিত্তরঞ্জন মোহন্ত দাস রাত্রে হেরমায় থাকলেন রমেন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে।

২৯ শে জুলাই, ১৯৯৫, শুক্রবার । খুব ভোরে উঠে রমেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি গিয়ে কমরেড অমূল্য শর্মা ও ডাঃ চিত্তরঞ্জন মোহন্তদাসকে ডেকে তুলে বীরকুমার দেববর্মার বাড়ি নিয়ে গেলাম। তাঁরা সেখানে প্রাতঃকৃত্যাদি সারলেন এবং বীরকুমার বাবুর স্ত্রী কমরেড জ্যোৎস্ন দেববর্মা তাদেরকে স্নানের ব্যবস্থা করে দিলেন। স্নানের পর আমার কাকী শাশুড়ী জ্যোৎস্না দেববর্মা তাদেরকে চা মুড়ি খাওয়ালেন। তারপর কমরেড অমূল্য শর্মা ও ডাঃ চিত্তরঞ্জন মোহন্তদাস হেরমা বাজারে ভোট কেন্দ্রে চলে গেলেন। একটু পরে আমার স্ত্রী ফুলকুমারীকে নিয়ে হেরমা বাজারের পঞ্চায়েত অফিসের ভোট কেন্দ্রে ৭.৩০ এর সময় লাইনে দাঁড়ালাম। সামনে মেয়ে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। ভোটদিয়ে আমি এলাম বিভিন্ন পার্টির নির্বাচনী শিবির দেখতে। দেখলাম, টি.এন.ভি-টি.টি.এন.সি এবং কংগ্রেস-যুবসমিতি মিলে একটাই শিবির করেছে। দেখেই আমি তাজ্জব বনে গেলাম। আরো লক্ষ্য করলাম, টি.টি.এন.সি এবং কংগ্রেস-যুবসমিতি জোট তাদের ভোটারদের শুধুমাত্র টি.এন.ভি'র প্রার্থী অনন্ত দেববর্মাকে ভোট দিতে বলছে। টি.এস.এফ-টি.ইউ.কে.এস-এর কর্মীরাও দেখলাম টি.এন.ভি প্রার্থীকে ভোট দিতে বলছে। কাজেই বোঝা গেল, অ-বাম ট্রাইবাল ভোট ভাগাভাগি না হয়ে সব টাই যাচ্ছে টি.এন.ভি. প্রার্থীর পক্ষে। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ভোট কেন্দ্র থেকেও ওই একই রকম খবর আসতে লাগলো। এই অবস্থা দেখে বামফ্রন্ট সমর্থিত যুবক হেরমার যোগেন্দ্র দেববর্মার নাতি লোটন এসে এক লাথিতে টি.এন.ভি শিবিরের টেবিল ফেলে দিল। বাঁধলো গন্ডগোল। টি.টি.এন.সি'র নেতা রাধাকুমার দেববর্মা ও আমি ছুটে এলাম। পুলিশ পজিশান নিল। বেঁধে গেল ধুন্দুমার কান্ড। আমি লোটনকে টেনে নিয়ে বামফ্রন্টের নির্বাচনী অফিসে নিয়ে গিয়ে বসালাম। ঠিক এই মুহূর্তে এসে গেল ইলেকশান অবজারভারের গাড়ি সি.আর.পি নিয়ে। তারা পজিশান নিল। ভয় পেয়ে গেলাম সকলে। অবজারভাররা চলে যেতেই উত্তপ্ত পরিবেশ অনেকটা শান্ত হলো। একটু পরেই এসে গেলেন টি.এন.ভি প্রার্থী স্বয়ং অনন্ত দেববর্মা। জঙ্গি নেতা অনন্ত বাবু আসতেই যুবসমিতি-কংগ্রেস, টি.টি.এন.সি, টি.এস.এফ, টি.ইউ.কে.এস'র লোকেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন পার্টিগত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে। আমি প্রমাদ গুণলাম কি জানি হয়। কিন্তু না, বাড়তি কোনো ঝামেলা হলো না। অনন্ত বাবু রঙমালা-রামনগরের দিকে চলে গেলেন। একটু পরে এলেন কমরেড ভানুলাল সাহা। তিনি এসেই বামফ্রন্টের নির্বাচনী অফিসে বসে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রের খবর দিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এই কেন্দ্রের অবস্থা সম্পর্কে। আমি বললাম, 'এই কেন্দ্রে টি.এন.ভি'র সঙ্গে অ-বাম শিবির হাত মিলিয়েছে।' উনি বললেন, 'এই লক্ষণ সব কেন্দ্রে দেখা যাচ্ছে। তবে আমরা জিতবো, মার্জিন কম হলেও হতে পারে।' ভানুবাবু চলে যেতেই বামফ্রন্টের সি.পি.আই প্রার্থী এলেন গাড়ি করে কমরেড প্রশান্ত

কপালীকে নিয়ে। কুঞ্জ বাবুকে দেখে বামফ্রন্টের কর্মীরা দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। এ.ডি.সি'র বাইরে থেকেও কর্মীরা এসেছে বুকে কাস্তে ধানের শীষ ব্যাজ ঝুলিয়ে, মেয়ে কর্মীদের লাল শাড়ি আর ছেলেদের লাল টুপি লক্ষ্য করবার মতো। ভোট শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলতে লাগলো। মনে পড়লো ১৯৯০ সালের এ.ডি.সি'র নির্বাচনের কথা। এই কেন্দ্রে বামফ্রন্টের প্রার্থী এই কুঞ্জ দেববর্মা আর যুবসমিতি-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী হরিনাথ দেববর্মা। ঠিক বেলা ৯.৩০ এর সময় তৎকালীন জোট সরকারের জনৈক প্রাক্তন মন্ত্রী এলেন বিরাট দলবল নিয়ে। তিনি হেরমা বাজারের শেডে আমার টেবিলটা দখল করে নিয়ে তার ওপর বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ভোট কেন্দ্রের মধ্যে রিগিং। আমি কোনরকমে আত্মরক্ষা করলাম। বুথের ভেতর আমার ছেলে সুরঞ্জন ছিল কুঞ্জ দেববর্মার পোলিং এজেন্ট। সে বাধা দিতেই ছুরি দেখালো রিগিং পার্টি। আমার স্ত্রী তখন ভোট দিচ্ছিলেন। তিনি কিছু বলতেই তাঁর হাত মুচড়ে দিল একজন। ঠিক এইসময় সি.আর.পি ও পুলিশের সাহায্যে মন্ত্রীর দলবল তেড়ে এলো বামফ্রন্টের কর্মীদের দিকে, তছনছ করলো বামফ্রন্টের নির্বচনী অফিস। বামফ্রন্টের কর্মীরা পুলিশ ও সি.আর.পি'র বন্দুকের মুখে দাঁড়াতে সাহস না করে ছুটে পালাতে লাগলো। আমি ছুট দিলাম আমার এক দাদা শ্বশুরের বাড়ির দিকে। আমি এক কাঁঠাল গাছের আবডালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম সব। আমার বুক ধড়ফড় করছিল উত্তেজনায়। মন্ত্রীর সামনে রিগিং ? এ যেন বিশ্বাস করা যাচ্ছিল না। ভাবলাম ত্রিপুরায় সংসদীয় গণতন্ত্রের শেষ অবস্থা ! চারিদিকে এক ছত্রভঙ্গ অবস্থা। টানটান উত্তেজনা। এইসময় আমার কর্তব্য কর্ম কী হবে এই নিয়ে ভাবছিলাম। কারণ আমিই ছিলাম সেই সময় কুঞ্জ দেববর্মার ইলেকশান এজেন্ট। কাজেই আমার একটা দায়িত্ব ছিল। আমি ছুটে গিয়ে এক দাদা শ্বশুরের বাড়িতে ঢুকে ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে একখানা দরখাস্ত লিখলাম প্রিজাইডিং অফিসারকে দেবো বলে। কিছুক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে ভোট কেন্দ্রের সামনে আসতেই সি.আর.পিরা আমার দিকে রাইফেল তাক করে এলো, তখন আমি আমার পকেট থেকে বের করে কুঞ্জ দেববর্মার ইলেকশান এজেন্টের আইডেনটিটি কার্ডটা দেখালাম, তারপর তারা আমাকে পথ ছেড়ে দিতেই ঢুকে পড়লাম বুথ অফিসে এবং প্রিজাইডিং অফিসারের হাতে প্রতিবাদ পত্রখানা দিলাম। কিন্তু এম. বি.বি. কলেজের জনৈক অধ্যাপক এই প্রিজাইডিং অফিসার আমার প্রতিবাদ পত্র নিতে অস্বীকার করলেন। আমি বিনীত ভাবে বললাম, 'আমি বামফ্রন্টের প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মার ইলেকশান এজেন্ট, কাজেই আপনার দায়িত্ব হলো আমার প্রতিবাদ পত্র গ্রহণ করা। আপনি যদি এই প্রতিবাদ পত্র গ্রহণ না করেন তা হলে আমরা ইলেকশান কমিশনের কাছে আপনার বিরুদ্ধে জানাব।' আমার এ কথার পরেও তিনি আমার প্রতিবাদ পত্র নিতে অপারগ বলে দুঃখ প্রকাশ করেলেন। আমি প্রতিবাদ পত্রখানা হাতে নিয়ে একরকম চোরের মতো পালিয়ে এলাম। সামনে দেখি বামফ্রন্টের কর্মীরা কেউ নেই। নেই জোট সরকারের ওই তরুণ মন্ত্রীর জঙ্গি দলবলও। কিন্তু এবারের ভোট গণতান্ত্রিক ভাবেই হলো এই কেন্দ্রে। ভাগ্যের পরিহাস, হরিনাথ বাবু এবার এই কেন্দ্রে দাঁড়াতেই পারলেন না। ভোট শেষ করে আমরা স্বামী-স্ত্রী আগরতলায় পৌঁছলাম রাত ৭ টায়।

৩০ শে জুলাই, ১৯৯৫, রোববার। আজ এ.ডি.সি'র নির্বাচনের ভোট গণনার দিন। সকাল ৯.৩০ এ আমরা স্বামী-স্ত্রীতে গেলাম উমাকান্ত একাডেমীতে ভোট গণনা দেখতে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে উমাকান্ত ইস্কুল মাঠের তাঁবুর মধ্যে আমরা সব দাঁড়িয়ে রইলাম। জানাগেল, আমতলী-গোলাঘাটী কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে সব থেকে শেষে - গণনা শুরু হতে হতে সন্ধ্যে ৬ টা হয়ে যাবে। কাজেই স্ত্রী ফুলকুমারীকে একটা রিক্সা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আমি গেলাম ২ নম্বর এম. এল. এ হোস্টেলে। সেখানে গিয়ে দেখি বড় হল ঘরে আমাদের প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মা তাঁর কাউন্টিং এজেন্টদের নিয়ে বসে

আছেন । আর সেখানে আছেন বক্স নগরের এম.এল.এ সহিদ চৌধুরী, সি.পি.এম.এর বিশালগড় লোকাল কমিটির সেক্রেটারি মানিক ঘোষ, প্রশান্ত কপালী, অমূল্য শর্মা, সচী দেবনাথ প্রমুখ । কুঞ্জ বাবুর এবারকার ইলেকশান এজেন্ট সি.পি.এম.এর গোরা চক্রবর্তীকে দেখলাম মেঝের শতরঞ্জিতে হাত পা ছেড়ে একেবারে বেহুঁশের মত ঘুমোচ্ছেন - ইলেকশানের ধকলে তিনি বড়ই ক্লান্ত । একটু পরে সেখানে এলেন এডিসির নারায়ণ রূপিনী। তিনি রহস্য করে আমাদের প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কত ভোটে জিতছেন ?' কুঞ্জবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'ভোটের বাক্সই না বলতে পারে, আমি কী করে বলবো ?' ৬.৩০ নাগাদ ২ নম্বর এ.এল.এ হোস্টেল থেকে আমরা চলে এলাম উমাকান্ত একাডেমীর ভোট গণনা কেন্দ্রে । এ পর্যন্ত সারা রাজ্য থেকে যা খবর আসতে লাগল, তাতে দেখা গেল, বামফ্রন্টের প্রার্থীরা সব কেন্দ্রেই জিতছে । ঘোষিত ১৮ টি কেন্দ্রের ফলাফলের ভেতর সবকটি বামফ্রন্ট পেয়েছে । বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর কাছে কংগ্রেস-যুবসমিতি তাদের শিবির করেছিল । সন্ধ্যের আগেই সেই শিবির থেকে সকলকে চলে যেতে দেখলাম বেশ নিরাশ হয়ে । খবর এলো জম্পুই জলা -টাকারজলা কেন্দ্র থেকে ললিত দেববর্মা জয়ী হয়েছেন । ললিত বাবু সিপিআই (এম)এর প্রার্থী এবং সম্পর্কে আমার তালুই (আমার শ্বশুর মশায়ের বাল্য বন্ধু) মশায় । এবার শুরু হয়ে গেল আমতলী-গোলাঘাটী কেন্দ্রের গণনা । আমি বেশ টেনশানে ছিলাম । ভেতর থেকে যা খবর আসতে লাগল, তাতে জানা গেল, টি.এন.ভি'র সঙ্গে ভাল লড়াই হচ্ছে । কমরেড সুরেন্দ্র দেবনাথ আমার পাশে বসলেন উমাকান্ত একাডেমীর পাঁচিলের ওপর । আমি বললাম, 'দেখবেন, টিএনভি সদরের অংশে আমাদের বামফ্রন্ট প্রার্থীর সঙ্গে প্রায় সমান সমান চলবে ।' একটু বাদে ভেতর থেকে খবর এলো ১৯ টি বুথে আমাদের প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মা টি এন ভি প্রার্থী অনন্ত দেববর্মার চেয়ে এক হাজার ভোটে এগিয়ে আছেন । কিছুক্ষণ বাদে খবর এলো ভোটের মার্জিন কমে ৮০০য় এসেছে । টেনশান বাড়তে লাগলো আমার । ইতিমধ্যে কমরেড প্রশান্ত কপালী গণনা কেন্দ্র থেকে বাইরে এলেন । বললেন, 'ভাববেননা, অন্যান্য কেন্দ্রে যা ট্রেন্ড, তাই আমতলী-গোলাঘাটী কেন্দ্রে প্রতিফলিত হবে ।' উমাকান্ত একাডেমীর দোর গোড়ায় আমারা দাঁড়িয়ে আছি ভেতর থেকে খবর পাবার আশায় । এমন সময় একটা জীপ ঢুকলো লাল ঝান্ডা শোভিত হয়ে । জীপটা এসেছে আমতলী-গোলঘাটী কেন্দ্রের রামনগর গাঁওসভা থেকে । জীপ থেকে ১৫-২০ জন উপজাতি যুবক লাল টুপি মাথায় নামলো । তাদের নেতা সুবোধ (ক্যাপটেন) কে অনেকটা চে-গুয়ে ভারার মতো লাগছিল । তাঁরা এসে ঘিরে ফেললো আমাদের । সুবোধ আমাকে বললো " মুয়া, চুঙ মা পাইনাই তা উআনাদি' (মেসো চিন্তা করো না আমরা জিতবই) । " সুবোধ আমার আপন মামাত শালির ছেলে । একটু বাদেই খবর এলো আমাদের প্রার্থী পনেরো'শ ভোটে এগিয়ে আছেন। একথা শুনে সুবোধের লাল বাহিনী উত্তেজনায় ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে ফেললো। আমরা থামালাম তাদেরকে । রাত দশটার সময় লালসিং মোড়া গাঁও সভার সি.পি.আই প্রধান শ্রীমতী মন্দোদরী দেববর্মার সঙ্গে ধারিয়াথল গ্রামের সিপিএম এর মহিলা নেত্রী তুলসী দেববর্মা এসে আমাদের পাশে দাঁড়ালেন । এতো রাত্রে তাঁরা এলেন খবর নিতে ! নির্বাচনের সময় তাঁদের দুজনকে নিয়ে প্রার্থী সমেত আমি ধারিয়াথল গাঁও সভার প্রতিটি পাড়ায় ঘুরেছি । যুগল দেববর্মা আমাদের নেতা । যুগলবাবু চাঁদুরামকপরা পাড়ায় গোপাল দেববর্মার ঘরে দারুণ একটা বক্তৃতা করেছিলেন । রাত ১১.৩০ এর সময় হঠাৎ কুঞ্জ দেববর্মার ইলেকশান এজেন্ট গোরা চক্রবর্তী গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এলেন কিছু কাগজ পত্র হাতে । প্রশান্ত কপালীকে দেখে বললেন, 'তোমাদের প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মা তিন হাজার ভোটে জিতে গেলো ।' এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সুবোধের বাহিনী মুহুর্মুহুঃ বাজি ফোটাতে শুরু করলো । একটু বাদেই বিজয়ী কুঞ্জ দেববর্মা বেরিয়ে এলেন । কমরেড চপলা বিশ্বাস তাঁকে অভিনন্দিত করে

ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। কুঞ্জ বাবুকে নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে ২ নং হোস্টেলের দিকে চলতে শুরু করলো দামাল ছেলেরা। আমি সুবোধকে বললাম, 'তোমরা আগরতলায় থেকে যাও এত রাত্রে যেও না চড়িলামে।' উত্তরে সে বললে, '২০ কেজি শূকরের মাংস কেনা রয়েছে, গিয়ে খেতে হবে সকলে মিলে। কাজেই আমাদের যেতেই হবে।' বলেই সে আবেগের মাথায় বলে ফেললো তার মাতৃভাষা ককবরকে — চুঙ কিরিয়া মুয়া, চুঙ কিরিযা' (আমরা ভয় করিনে মেসো, আমরা ভয় করিনে)।

৪ঠা আগস্ট, ১৯৯৫, শুক্রবার। গতকাল (৩রা আগস্ট) রাত্রে ১০.২০ মিনিটে ত্রিপুরার প্রখ্যাত আইনবিদ বীরচন্দ্র দেববর্মা তাঁর নিজ বাসভবনে মারা গেছেন। তিনি পারকিনসন রোগে বছর তিনেক ধরে ভুগছিলেন। প্রতিদিনকার মতো কমরেড ফটিক ভৌমিক তাঁকে রাতের খাবার খাইয়ে দিয়ে গেছেন। শুয়ে পড়েছেন বীরচন্দ্রবাবু। হঠাৎ কাশি লাগে, দম ফেরাতে পারছিলেন না তিনি। কমরেড ললিতা সিং এসে তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু শ্বাসকষ্ট দেখা দিল। ভাগ্নে মানস দেববর্মাকে খবর দেন তাঁর জামাই বিশিষ্ট আইনজীবী শুভাশিস তলাপাত্র। ডাক্তারকেও খবর দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে। ডাক্তার আসার আগেই বীরচন্দ্রবাবু কমরেড ললিতা সিং, মানস দেববর্মা, মানসের স্ত্রী কৃষ্ণা, বীরচন্দ্র দেববর্মার নাতজামাই শুভাশিস তলাপাত্র ও হরলাল দেবনাথেব হাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গতকাল রাত্রে এসে লেখক দেবব্রত দেব বীবচন্দ্রবাবুর মৃত্যুর খবর দিয়ে গেছেন আমাকে। আজ সকালে উঠে তাঁর কথা মনে পড়তেই নীরবে কাঁদলাম কিছুক্ষণ। স্মৃতিতে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা ভেসে উঠতে লাগলো। সেই ১৯৬৭ সালে শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য আর আমি ককবরক ভাষার গবেষণাব ক াজে এসে তাঁর বাড়িতে উঠেছিলাম। তিনি যে ঘরে মারা গেলেন, ঠিক তার পাশের ঘরেই ছিলাম আমরা। এই ঘরে থেকেই পরবর্তীকালে ডঃ সুহাস চ্যাটার্জি কগবরকের গবেষণার কাজ করেছিলেন। ডঃ চ্যাটার্জি দু'বার ছিলেন এই ঘবেই। সেই থেকে বীরচন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। তিনি ছিলেন ককবরক উন্নয়নপরিষদের সভাপতি। ককবরক উন্নয়ন পরিষদের আমন্ত্রণেই আমরা এসেছিলাম ককবরক ভাষার গবেষণা করতে। আর তখন থেকেই বলা যেতে পারে আমি ত্রিপুবায় আছি, বিয়ে-থা করেছি পাহাড়ে ট্রাইবাল পরিবারে। সুখে-দুঃখে বীরচন্দ্রবাবুকে আঁকড়ে থাকতাম আমি। তিনি ছিলেন আমার 'কেয়ার অফ'। আজ তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। বোজ ভোরবেলা তাঁর সঙ্গে প্রাতভ্রমণ করতে করতে আগরতলাব কত পুরনো কথা শুনতাম আমি। গত পরশুও তাঁর বাসভবনে যাই, দেখি তিনি একটা লাঠি ভর দিয়ে বারান্দায় অতি কষ্টে পায়চারি করছেন। আর আজ তিনি নেই, মনটা বিষাদে ভরে গেল। খুব ভোরে উঠে গেলাম আমার প্রতিবেশী কমল চক্রবর্তী কে খববটা দিতে। কমলবাবু ও তাঁর দাদা সূর্য চক্রবর্ত্তী বীরচন্দ্রবাবুর একনিষ্ঠ ভক্ত। কমলবাবুর গেট থেকে বেরিয়ে গেলাম সুপুরি বাগানে দেওয়ান বাড়িতে খবর দিতে। দেওয়ান বাড়ি থেকে খবর দিয়ে গেলাম ত্রিপুরা দর্পণে। একখানা দর্পণ পত্রিকা হাতে নিয়ে দেখি, প্রথম পাতার প্রথম খবর "বীরচন্দ্র দেববর্মার জীবনাবসান, আজ শেষ কৃত্য।" মৃত্যু শয্যায় শায়িত বীরচন্দ্র দেববর্মার পাশে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান মানিক সরকার ও সি.পি.এম নেতা ভানু ঘোষ, পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন কমরেড ফটিক ভৌমিক-এই ছবি রযেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে একমুঠো গরম ভাত খেয়ে একটা রিক্সা নিয়ে রওনা দিলাম বীরচন্দ্র বাবুর বাড়ির দিকে। পথে দেখা হলো কমরেড অঘোর দেববর্মার সঙ্গে ডাঃ নিলমণি দেববর্মার বাড়ির কাছে। তিনি বীরচন্দ্র দেববর্মাকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে ফিরছিলেন। বীরচন্দ্র বাবুর বাড়ির গেটে যেতেই কমরেড প্রশান্ত কপালীর সঙ্গে দেখা। তিনি সারারাত

বীরচন্দ্রবাবুর শবদেহ আগলে রেখেছিলেন। আস্তে আস্তে অনেকেই শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এলেন। এলেন বামফ্রন্টের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমর চৌধুরী। কমরেড সরোজ চন্দ আগের থেকেই এসে গেছেন। তিনি বসেছিলেন শুভাশিস তলাপাত্রের ঘরে। একটু বাদেই রিক্সা চেপে এলেন বিতর্কিত জননেতা নৃপেন চক্রবর্তী। তিনি বীরচন্দ্রবাবুর দেহে ফুল ছিটিয়ে দিয়ে মিনিট দুয়েক চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন সব বললেন। বীরচন্দ্র দেববর্মার মরদেহের সামনে নৃপেন চক্রবর্তীর বিড়বিড় করে মন্ত্রের মত কিছু আওড়াতে দেখে আমার মন চলে গেল অতীতের দুটো ঘটনায়। তখন সি. পি. আই. পার্টি সবেমাত্র আইনী হয়েছে, ত্রিপুরার সব কমিউনিস্ট নেতাই ফিরে এসেছেন বিহারের হাজারীবাগ জেল থেকে। জেলের ভেতরেই সি. পি. আই. পার্টি দু'ভাগ হয়ে গেছে। সোভিয়েত ও চীনা লাইনে। জেলে বন্দী ত্রিপুরাব বেশীর ভাগ নেতাই সমর্থন করেছেন চীনা লাইনকে, আর তাদের তাত্ত্বিক নেতা হলেন কমঃ সরোজ চন্দ। অন্যদিকে, নৃপেন চক্রবর্তী তখন একেবারে কোণঠাসা তাঁর সোভিয়েত লাইনের জন্যে; কোনোরকমে টিকে আছেন অঘোর দেববর্মা, বীরচন্দ্র দেববর্মা, আতিকুল ইসলাম ও মোহন চৌধুরী প্রমুখকে নিয়ে। জেল থেকে বেরিয়ে ত্রিপুরায় এসে তাঁর ভাল লাগছিল না। বুঝতে পারছিলেন, ত্রিপুরাতে পার্টি দু'ভাগ হয়ে যাবে সোভিয়েত ও চীনা লাইনে। পশ্চিমবঙ্গে কি হচ্ছে তা জানবার জন্যে হঠাৎ করে তিনি চলে গেলেন কলকাতায়। গিয়ে দেখেন, কমঃ প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টিকে পুরো কব্জা করে ফেলেছেন চীনা লাইনে। ভবানী সেন, সোমনাথ লাহাড়ীর মত তাত্ত্বিক নেতারা একেবারে এক ঘরে। জ্যোতি বসু তখন মৌনব্রত পালন করে চোক কান খোলা রেখে পর্যবেক্ষণ করছেন পাল্লা ভারী কোন দিকে। নৃপেনবাবু উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বললেন তাত্ত্বিক প্রবক্তা হিসাবে। ভবানী সেন ও সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে একটু বেশী কথা হল তাঁর। কিন্তু এটা অনুভব করলেন যে সি. পি. আই ভাঙছেই পশ্চিমবঙ্গে এবং প্রমোদ দাশগুপ্তর নেতৃত্বে নতুন পার্টি হচ্ছে, আর সেই পার্টিই হবে ঘাড়ে-গর্দানে বড।

ত্রিপুরায় ফিবে এসেই তিনি অন্য কারুব সঙ্গে কথা না বলে সোজা চলে এলেন অ্যাডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার কাছে। ত্রিপুরাব কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যে একমাত্র বীরচন্দ্র দেববর্মাকেই তিনি একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁকে ছাড়া বিধানসভার সি. পি. আই -এর এম. এল. এ -দের তোতা পাখির মতো যা শিখিয়ে দিতেন তা-ই বলতেন তারা। ব্যতিক্রম ছিলেন একমাত্র বীরচন্দ্র দেববর্মা। তাঁকে কোনও দিন ডিকটেট করতেন না তিনি, বরঞ্চ পরামর্শই করতেন তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন জটিল বিষয়ে। তিনি এটা বুঝতেন. বীবচন্দ্র দেববর্মা ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন; ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের বেদান্তের ছাত্র। তারপব আইনের মূর্তিমান কিংবদন্তী ত্রিপুরার। পশ্চিমবঙ্গের পার্টি ভাঙা-ভাঙির হালফিল অবস্থার কথা শোনালেন তিনি বীবচন্দ্র উকিলকে। উকিলবাবু চিরাচরিতভাবে চোখ বুজে তাঁর কথা শুনে হঠাৎ চোখ মেলে নৃপেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি কবতেন চান আপনি নৃপেনবাবু ?'

- 'না, আমি বলছিলাম, দশরথ, বীরেন দত্ত, সরোজ চন্দ সব নতুন পার্টিতে চলে যাচ্ছেন.....।'

-'নতুন পার্টিতে চলে যাচ্ছেন, যান তাঁরা, আপনি আমাদেব পার্টির তাত্ত্বিক নেতা, এই বিপদে আপনি শক্ত করে দাঁড়ান, পার্টিকে রক্ষা করুন, আমরা সব আপনার পাশে আছি। হাজারীবাগ জেলে তো আপনি আমাদের নিয়েই ছিলেন, এখনও তাই থাকুন।'

-'দেখুন বীরবাবু, (নৃপেন চক্রবর্তী বীরচন্দ্রবাবুকে সবসময় বীরবাবু বলে ডাকতেন) দশরথ ছাড়া এই রাজ্যে কি পার্টি হবে, এতদিনের পলিটিক্যাল কেরিয়ারটাকে কি হারাবো ? আমি নতুন পার্টিতেই যাই।' বলেই তিনি বীরচন্দ্রবাবুর সামনে থেকে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। কাহিনীটা বলে বীরচন্দ্রবাবু আমাকে বললেন, "জানেন কুমুদবাবু, আসলে লোকটার মেরুদণ্ড বলতে কিছুই নেই। তিনি জীবনে

কম পার্টি পাল্টাননি। প্রথমে করেছেন কংগ্রেস, তারপরে সি. পি. আই এবং এখন করছেন সি. পি. এম পার্টি। আবার পার্টি বদল করবেন কিনা কে জানে? তবে হ্যাঁ, যে-পার্টি যখন করেছেন, তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই করেছেন এবং সেই পার্টির স্বার্থে যদি মিথ্যেও বলতে হয়, তা থেকে পিছপাও হননি তিনি। এই হলেন আমাদের নৃপেন ঠাকুর, বুঝলেন ?"

অন্য ঘটনাটা নৃপেন চক্রবর্তী সম্পর্কে বীরচন্দ্রবাবু আমাকে বলেছিলেন এ-ভাবে ঃ 'বুঝলেন কুমুদবাবু, সেবার লোকসভার ত্রিপুরার পূর্ব আসনে সি. পি. আই -এর ক্যানডিডেট হয়ে দাঁড়ালাম আমি। আমার বিরুদ্ধে দশরথ। আমি গেলাম কমলপুর শহরে মিটিং করতে। ওই দিন সি. পি. এমেরও মিটিং ওই একই মাঠে। দুটো মিটিং একই সময়ে পড়ায় এস ডি ও ঠিক করলেন প্রথমে মিটিং করবে সি. পি. এম পার্টি, তারপরে করবে সি. পি. আই পার্টি। জানতে পারলাম, নৃপেন চক্রবর্তীই সি. পি. এম পার্টির প্রধান বক্তা। আমি যখন কোর্টের সামনে দিয়ে দুপুরের দিকে কমলপুর শহরের দিকে যাই, তখন কোর্টের একজন আর্দালি এসে আমাকে বললো, 'স্যার, আপনাকে হাকিমবাবু ডাকছেন।' গিয়ে দেখি আগরতলা বারের আমার একজন জুনিয়র উকিল কমলপুর কোর্টের হাকিম হয়েছেন। তিনি আমাকে দেখে এজলাশ থেকে নেমে আমাকে তাঁর কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে আদর-আপ্যায়ন করে জলখাবার খেতে দিলেন। আমি বিশ্রামও করলাম সেখানে দুপুরটা। বিকেলে সি. পি. পার্টির মিটিং শুরু হতেই নৃপেনবাবু বললেন, 'জানেন বন্ধুগণ, সি. পি. আই প্রার্থী বীরচন্দ্র দেববর্মা কমলপুরে এসে হাকিমের সঙ্গে পরামর্শ করে কমলপুরেব চা-বাগান শ্রমিকরা যাতে কেসে না জিততে পারে সেই জন্যে ষড়যন্ত্র করেছেন।' আমি নৃপেনবাবুর বক্তৃতা শুনে তো অবাক, কি করে এমন ডাহা মিথ্যে কথা বলতে পারলেন তিনি! হাকিম একসময় আমার আণ্ডারে জুনিয়র উকিল ছিলেন আগরতলা বারে, আমাকে দেখে তাঁর কোয়ার্টারে নিয়ে আদার-আপ্যায়ন করেছেন। আর সেই ঘটনাটিকে কীভাবে নৃপেনবাবু বিকৃত করে বক্তৃতা করলেন !"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কীভাবে সম্ভব হলো বীরচন্দ্রবাবু ?' উত্তরে তিনি বললেন, 'বুঝলেন, নৃপেনবাবু যার নুন খান তাঁর জন্যে সব কিছু করতে পারেন তিনি। প্রয়োজন হলে মিথ্যাও বলতে পারেন।' এবার বীরচন্দ্রবাবু একটু উত্তেজিতভাবে বললেন, 'জানেন, কুমুদবাবু, এই মিথ্যে ঘটনার পরও নৃপেনবাবু কি বললেন ?'

— 'কী বললেন ?' আমাব গলায় একটু বিস্ময়ের সুর!'

—' বললেন,' শোধনবাদী সি. পি. আই পার্টির হাত থেকে লালঝাণ্ডা কেড়ে নিন বন্ধুগণ, শোধনবাদী সি. পি. আই -এর প্রার্থী বীরচন্দ্র দেববর্মাকে একটিও ভোট নয়।'

বীরচন্দ্রবাবুর কথা শুনে কৌতূহল বেড়ে গেলো আমার। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা বীরচন্দ্র বাবু, সি. পি. এম -এর মিটিঙের পর সি. পি. আই -এর মিটিঙে এসব কথার জবাব দেননি আপনি ?'

— 'জবাব তো দিতে হলো। গলা চড়িয়ে বললাম, বন্ধুগণ, নৃপেনবাবু আপনাদের ডাহা মিথ্যে কথা বলে গেছেন আমার সম্পর্কে। চা-বাগান শ্রমিকদের যে কেসের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি, তার বিন্দুবিসর্গ জানিনে আমি। হাকিম আমার পূর্ব পরিচিত বলে ডেকে নিয়ে আদর-আপ্যায়ন করেছেন। তিনি চা-বাগান শ্রমিকদের কোন কেসের কথাও বলেননি আমাকে, ষড়যন্ত্র করাতো দূরে থাক। আর, আপনারাই বলুন বন্ধুগণ, আমিও একটা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি করি, কেনই বা আমি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে যাবো? চিরদিন তো কোর্টে শ্রমিকদের পক্ষে লড়ে গেলাম, কমঃ নৃপেন চক্রবর্তী কি সেই কথা জানেন না ? আর তিনি আপনাদের বলেছেন, শোধনবাদী পার্টির হাত থেকে লালঝাণ্ডা কেড়ে নিতে। কিন্তু কারোর হাত থেকে লালঝাণ্ডা কেড়ে নিতে চাই না আমরা,

আমরা চাই সকলের হাতে লালঝাণ্ডা তুলে দিতে ।'

নৃপেনবাবুর বিরুদ্ধে এই কথা বলতে বলতে বীরচন্দ্র উকিলের চোখ দিয়ে যেন আগুন ফুলকি বেরুচ্ছিল। আর আজ সেই নৃপেন চক্রবর্তী বীরচন্দ্র উকিলের মরদেহে ফুল ছিটাতে ছিটাতে বিড় বিড় করে কি যেন সব বললেন। তিনি কি বীরচন্দ্র দেববর্মার কাছে ক্ষমা চাইছিলেন ?

এলেন আলেখ বাবা সংঘের হাসি রায় আদিবাসী মহিলা সমিতির তরফ থেকে। তড়িৎ দাশগুপ্ত পায়জামা-খদ্দরের পাঞ্জাবী পরে উপস্থিত হলেন। উকিল মিহির দত্ত সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে তদারকি করছিলেন। বীরচন্দ্র বাবুর মৃতদেহ ঘর থেকে বের করলেন সকলে। বাইরে একটা চেয়ারে বসিয়ে ট্রাইবাল রীতিতে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা স্নান করিয়ে পরিষ্কার ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়ে খাটে শুইয়ে দিলেন । তারপর তাঁর কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিলেন তাঁর আদরের ভাগ্নী মঞ্জু দেববর্মা। আত্মীয়-স্বজন প্রিয়জনেরা সব কাঁদছিলেন। সবথেকে বেশী কাঁদছিলেন বীরচন্দ্র বাবুর দীর্ঘ দিনের সঙ্গিনী কমরেড নবকুমার সিংয়ের বিধবা পত্নী কমরেড ললিতা সিং ও মঞ্জুদি। হরলাল দেবনাথকে উদভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছিলো। হরলাল একেবারে বাল্যকাল থেকেই বীরচন্দ্র বাবুর বাড়িতেই মানুষ হয়েছে। সে বীরচন্দ্রবাবুর বাবা ও মায়ের মৃত্যুও দেখেছে এই বাড়িতে। দেখেছে তার একান্ত প্রিয়জন বীরচন্দ্র দেববর্মার বড় ভাই মণিবাবুর মৃত্যুও। হরলালকে সকলে বীরচন্দ্র বাবুর বড় ভাইয়ের পালিত পুত্র বলে জানত।

বেলা ৯.৩০ মিনিটে একটা লরিতে করে বীরচন্দ্র বাবুর শবদেহ নিয়ে যাত্রা শুরু হলো। পুরোভাগে থাকলেন মিহির দত্ত, আর্টিস্ট রবি সেন ও প্রশান্ত কপালী প্রমুখ। সাংবাদিক ফুলন ভট্টাচার্য ও ত্রিপুরা দর্পণ-দম্পাদক সমীরণ রায় লরির পেছনে। ললিতা সিং, সাহানা সেনগুপ্ত ও ইলা দাশগুপ্ত পাশাপাশি, ইলা দাশগুপ্ত ললিতা সিংয়ের হাত ধরে ছিলেন। শবদেহ প্রথম গেলো কামান চৌমুহনীর সি.পি.আই অফিসের সামনে। সেখানে সি.পি.আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড সুনীল দাশগুপ্ত, কমরেড দেবপ্রসাদ সেন গুপ্ত, কমরেড প্রশান্ত কপালী, সাহানা সেনগুপ্ত,কমরেড কানু সেন, আ.এস. পি পার্টির কমরেড প্রবোধ কর প্রমুখ বীরচন্দ্র দেববর্মার শবদেহে মালা দিলেন। এরপরে শবদেহ গেলো রাজবাড়ির ভেতর একেবারে রাজপ্রাসাদ তথা বিধান সভার সামনে। সেখানে রাজপ্রাসাদের শ্বেত পাথরের সিঁড়ির ওপর অপেক্ষা করছিলেন বিধান সভার অধ্যক্ষ বিমল সিনহা, বিরোধী নেতা সমীর বর্মণ, কৃষি মন্ত্রী বাজুবন রিয়াং, বিধান সভার উপাধ্যক্ষ নিরঞ্জন দেববর্মা, এ.ডি.সি'র সদ্য নির্বাচিত সদস্য সি.পি.আই-এর দুর্বাজয় রিয়াং প্রমুখ। তাঁরা একে একে সব মাল্যদান করলেন বীরচন্দ্র দেববর্মার শবদেহে। সেখান থেকে পশ্চিম গেট দিয়ে বেরিয়ে শবযান গেলো প্রেস ক্লাবের সামনে। সেখানে প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে ফুলন ভট্টাচার্য, সুজিৎ চক্রবর্তী, রাজ্যপালের প্রতিনিধি কিশোর দেববর্মা প্রমুখ শবদেহে মাল্যদান করলেন। হাঠাৎ করে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন প্রাক্তন মন্ত্রী রতন চক্রবর্তী। তিনিও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন বীরচন্দ্র দেববর্মার শবদেহে। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনের সামনে যেতেই সমীরণ রায় ও রতন চক্রবর্তী চলে গিয়ে রবীন্দ্রভবনের গেটে গিয়ে বসে পড়লেন। শবযান এগিয়ে চললো হাইকোর্টের দিকে। আখাউড়া রোডে হাইকোর্টের সামনে বীরচন্দ্র দেববর্মার মরদেহ দাঁড়াতেই হাইকোর্টের জজ ও উকিল বাবুরা কালো কোট গায়ে দিয়ে একে একে শবদেহে মালা দিলেন। এরপর শবযান গেল কোর্টের ভেতর বার এসোসিয়েশানের সামনে। সেখানে লোকে লোকারণ্য-কোর্ট ভেঙ্গে পড়েছে যেনো। বীরচন্দ্র বাবু এখানে পঞ্চাশ বছর যাবৎ ওকালতি করেছেন। এই দৃশ্যের ছবি তুললেন সুমন দেবরায়। এরপর শবদেহ এগিয়ে চললো বটতলার রাজ-শ্মশানের দিকে। শবযান থেকে নামিয়ে বীরচন্দ্র বাবুর মরদেহ পাঁচিলঘেরা রাজ-শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো। বীরচন্দ্রবাবুর মরদেহ শ্মশান পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বেশীরভাগ শবযাত্রী চলে গেলেন। থেকে গেলেন মিহির দত্ত, রবি সেন, প্রশান্ত কপালী, শুভাশিস

তলাপাত্র, ফটিক ভৌমিক আর হরলাল দেবনাথের সঙ্গে বীরচন্দ্রবাবুর আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা। বীরচন্দ্রবাবুকে এখন দাহ করা হবে। দামী খাটের ওপর পুষ্প স্তবকে পরিবৃত হয়ে রয়েছে তাঁর মরদেহ। বুকের ওপর কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকা। ধুতি-পাঞ্জাবী পরে শ্মশানে শুয়ে আছেন উকিল বাবু। রবি সেন গালে হাত দিয়ে উকিল বাবুর মাথার কাছে বসে রইলেন কিছুক্ষণ, উকিলবাবুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কী যেন দেখছিলেন তিনি। এবার উকিল বাবুর মরদেহ পরিবৃত হয়ে ছবি তোলালেন মিহির দত্ত, বেশ ক'খানা ছবি। এখন চিতায় ওঠার সময় হলো বীরচন্দ্রবাবুর। পুরোহিত এসে পিন্ডদানের ব্যবস্থা করলেন। বীরচন্দ্রবাবুর মেজদার পৌত্র পিন্ডদান করলো। চিতায় উকিলবাবুকে চিৎ করে রাখা হবে না উপুড় করে রাখা হবে এনিয়ে রবি সেনের সঙ্গে হরলাল দেবনাথের কথা কাটাকাটি হলো। রবি বাবু বললেন উপুড় করে দিতে, হরলাল বললো, উকিল বাবুর বাবাকে চিৎ করে পুড়িয়েছি, উকিলবাবুকেও চিৎ করেই পোড়াব। হরলালের কথাই বহাল থাকলো। চিতা জ্বলে উঠলো বীরচন্দ্র ঠাকুরের। পাহারারত তিনজন পুলিশ নিয়ে শুভাশিস তলাপাত্র, প্রশান্ত কপালীও ফটিক ভৌমিককে নিয়ে আমি বাঁধের ওপর রাখা বাঁশের ওপর এসে বসলাম। বীরচন্দ্রবাবুর শ্মশানের খাট বিক্রি হলো তিনশ কুড়ি টাকায়। তা দিয়ে যুবকেরা কিঞ্চিত সুরা পান করে এলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে বীরচন্দ্র উকিলের মাথা ফাটলো সশব্দে। আমি হেসে বললাম, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের দর্শনের প্রিয় ছাত্র বীরচন্দ্র দেববর্মার মাথাটা ফাটতে বেশ দেরী হলো। হঠাৎ দেখি একজন বাঙালিভক্ত ছুটে এসে বীরচন্দ্রবাবুর চিতায় প্রণাম করে কাঁদতে লাগলো। সব শেষে শুভাশিস তলাপাত্রের সঙ্গে ফিরলাম সদ্য প্রয়াত বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে।

৬ই আগস্ট, ১৯৯৫ রোববার। আজ সকালে সারাদিন জি. বি. হাসপাতালে ছোটাছুটি করলাম। সেখানে আমার এক মামাতো শালা ননীগোপাল দেববর্মা এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি আছেন। প্রক্তন মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়াকে দিয়ে ডাঃ বিমল ভৌমিককে টেলিফোন করলাম। ডাঃ ভৌমিকের আন্ডারে ভর্তি আছেন THPP নেতা ননী বাবু।

৯ই আগস্ট, ১৯৯৫ বুধবার। আজ রাজ-দর্শন হলো। উজ্জয়ন্ত বাজ প্রসাদে গিয়ে মহারাজ কিরীট বিক্রমের সঙ্গে দেখা করলাম জহর আচার্যির সমভিব্যাহারে। এক ঘন্টা ছিলাম সেখানে।

১২ই আগস্ট, ১৯৯৫ শনিবার। সকাল ৭.৩০-এ কবি ফকর উদ্দিন এলেন আমার বাসায়। তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। তিনি ওয়াকফ বোর্ডে দরখাস্ত করেছেন চিকিৎসার জন্যে আর্থিক সাহায্য পেতে। এখন ডাক্তারের সার্টিফিকেট দরকার। ফকর সাহেবকে নিয়ে গেলাম এ্যাডভাইজার চৌমুহনীতে ডাক্তার সত্যরঞ্জন দেববর্মার চেম্বারে। কিন্তু গিয়ে দেখি ডাক্তার বাবুর প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরাটরিতে খুব ভিড়। তাই ঢুকলাম না। তারপর ফকরকে ত্রিপুরা দর্পণে রেখে তাঁর স্ত্রীর দরখাস্ত নিয়ে গেলাম পুরনো RMS চৌমুহনীতে ডাক্তার পার্থসারথি চক্রবর্ত্তীর কাছে। তাঁকে দরখাস্ত খানা দিতেই তিনি বললেন, *'ফকরের স্ত্রীকে হাসপাতালের আউটডোরে দেখিয়ে সার্টিফিকেট নিতে হবে, তা না হলে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে না।'* দর্পণে ফিরে এসে ফকর সাহেবকে সব কথা বললাম। তিনি আমাকে নিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকে চা- সিঙ্গাড়া খেলেন। আমার হাতে ছিল ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা। দর্পণের খবর পড়ে তিনি বললেন, 'উদয়পুরের লক্ষ্মীপতি গ্রামে হিন্দু-মুসলমান মিলে উগ্রপন্থী কর্ণ জমাতিয়াকে দা দিয়ে *কুপিয়ে মেরে ফেলেছে। যৌথভাবে এরকম প্রতিরোধ হওয়া দরকার।* আসলে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা বোকা। তারা যেভাবে নীরবে উগ্রপন্থীদের সমর্থন করে যাচ্ছে, তাতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া অন্যদিকে মোড় নিলে উপজাতিদের খুব ক্ষতি হবে। উচিত দশরথ, অঘোর, শ্যামাচরণ, নগেন্দ্রদের একমত হয়ে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে বসে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করা। উগ্রপন্থীরা এরাজ্যের মুসলমান যুবকদের সঙ্গে পেতে চেয়েছিল, আমরা সাফ না করে দিয়েছি।

তারপর থেকে তারা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছে। এমনকি মুসলমান মেয়েদেরকেও কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে দুবাই থেকে টাকা আসছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুসলিম যুবকদের বিভ্রান্ত করতে।'

কবি ফকরুদ্দিন সাহেব চলে যেতেই আমি বাসায় চলে গেলাম। তারপর সকালের খাওয়া সেরে আমরা স্বামী-স্ত্রীতে গেলাম জি.বি. হাসপাতালে। হাসপাতালে গিয়ে দেখি আমার মামাত শ্যালক দা ননীকে ডিসচার্জের অর্ডার দিয়েছে। আমি একটা টেম্পো ডেকে এনে দা ননীকে তুলে দিলাম, তারা গেলেন অরুন্ধতী নগর চার্চে তাঁর দাদা রেভারেণ্ড জং বাহাদুর দেববর্মার কাছে। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে চলে এলাম বাসে করে। বীরচন্দ্র দেববর্মার সর্বদলীয় শোকসভায় যোগ দিলাম প্রেস ক্লাবে বিকেল ৫ টায়। শোকসভায় বক্তৃতা করলেন সি.পি.আই-এব সুনীল দাশগুপ্ত, সি.পি.এম-এর মানিক সরকার, ফরওয়ার্ড ব্লকের অবনী কর, আর.এস.পি'র কালাচাঁদ জমাতিয়া, জনতা দলের অরুণ ভৌমিক, বীরচন্দ্র বাবুর বাল্য বন্ধু তড়িৎ দাশগুপ্ত, উকিল মিহির দত্ত। অঘোর দেববর্মা ও সরোজ চন্দ বসেছিলেন। তাঁদেরকে কিছু বলার জন্যে ডাকা হলো না। শোকসভায় সভাপতিত্ব করলেন কমরেড দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত। কমরেড ললিতা সিং ও মঞ্জুদি (বীরচন্দ্র দেববর্মার ভাগ্নী) দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে বক্তাদের দিকে তাঁকিয়ে ছিলেন। কংগ্রেস ও উপজাতি-যুবসমিতির তরফ থেকে কেউ আসেননি। আমি নিজে গিয়ে যুবসমিতির সেক্রেটারি রবীন্দ্র দেববর্মাকে চিঠি দিয়ে এসেছিলাম। কমরেড দীনেশ সাহা শোকসভার ঘোষকের ভূমিকা পালন করলেন। অঘোর বাবুর স্ত্রী দুলালী দেববর্মাকে আসতে দেখলাম। একপাশে হরলাল দেবনাথকে খুব বিমর্ষ হয়ে শোকসভায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, তাঁর মধ্যেও প্রেস ক্লাবের দোতলার হল ঘর ভর্তি হয়ে গিয়েছিল বীরচন্দ্র ঠাকুরের স্মৃতি তর্পণ করতে।

নিচের হল ঘরে জহর আচার্যির রাজেন্দ্র কীর্ত্তি শালার মিটিং হবার কথা ছিলো। মিটিংয়ের আহ্বায়ক যুগ্মভাবে ছিলাম সাংবাদিক সত্যব্রত চক্রবর্তী ও আমি। কিন্তু বৃষ্টির জন্যে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আসতে না পারায় মিটিং স্থগিত রাখা হলো। মিটিংয়ে এসেছিলেন রাজকুমার কমলজিৎ সিং, ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাশশাস্ত্রী, শ্রীমতী অসীমা দেববর্মা, সমীরণ রায়, দুলাল চক্রবর্তী, শংকর দাশ, ফুলন ভট্টাচার্য প্রমুখ। সহদেব কর্ত্তাও নাকি সময়মতো এসে চলে গেছেন। জহর আচার্যি চা খাওয়ালেন আমাদেরকে।

১৩ই আগস্ট, ১৯৯৫ রবিবার। খুব সকাল থেকে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে আজ। ঠিক করলাম আজ আর কোথাও বেরোবোনা; সুধন্বা দেববর্মাব 'হাচুক খুরিঅ' উপন্যাস অনুবাদ করবো। সারাদিন অনুবাদ শুরু করলাম। দুপুর ১২.৩০ এর সময় কমবেড অমূল্য শর্মা এলো। সে সি.পি.আই পার্টির আভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলো। বললো, আসাম থেকে কমরেড প্রমোদ গগৈ এসেছিলেন, কমরেড অঘোর দেববর্মা নাকি তাঁকে আনিয়ে ছিলেন পার্টির কিছু আভ্যন্তরীণ সমস্যা আলোচনা করতে।

বিকেলে আমারা স্বামী-স্ত্রীতে প্রয়াত বীরচন্দ্র দেববর্মার বাসভবনে গেলাম। সেখানে কমরেড ললিতা সিং, হরলাল দেবনাথ, মিহির দত্ত ও শুভাশিস তলাপাত্রের সঙ্গে দেখা হলো। মিহির দা একটা এলবাম খুলে বীরচন্দ্রবাবুর মরদেহের অনেক ছবি দেখালেন।

বীরচন্দ্রবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম বংশী ঠাকুরের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর বাড়ি নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায়। গিয়ে দেখি প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী বাড়ি থেকে আনা ল্যাটা মাছ কুটছেন। মাছ কুটে আমাদের জন্যে চা বসালেন। এর মধ্যে এসে গেলেন আমার মারে (বান্ধবী-নগেন্দ্রর বাবুর স্ত্রী) পবিত্র রাণী জমতিয়া। তিনিই চা করে খাওয়ালেন। পরে আসার সময় বংশী ঠাকুরের মেয়ে গীতা পিসির সঙ্গে

দেখা করে এলাম।

১৪ ই আগস্ট, ১৯৯৫ সোমবার । সকালে আস্তাবল বাজারে গিয়ে ৭০ টাকা দরে ৪০০ গ্রাম ইলিশ মাছ কিনলাম। বাজার থেকে ফেরার পথে সুপুরি বাগানের মানিক চক্রবর্তীর মুদিখানা থেকে কিনে আনলাম ২ টাকার পেঁয়াজ। সকাল ৮ টার সময় এলেন কবি নকুল রায় । বড় মেয়ে তানিয়া কবিকে চা করে খাওয়ালো। তাঁর সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্য সম্মেলন নিয়ে কথাবার্তা হলো। পরে তিনি কবি সুরঞ্জনের সঙ্গে কবিতার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন । ৯টার সময় তিনি আমার বাড়ির মালিক দিলীপ দেবরায়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। সকাল ৯.৩০ এ আমার প্রাক্তন ছাত্র উদয়পুরের বিষ্ণুপদ গোস্বামী এলো ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরক সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি হবার জন্য আলোচনা করতে।

সকাল ১০ টায় স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম তাঁর অফিস পূর্বাশার দিকে। পূর্বাশা থেকে আমি হেঁটে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে । বাংলা বিভাগে অনেকক্ষণ সময় কাটলো বিভাগীয় প্রধান ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদের সঙ্গে। তিনি আমাকে ডক্টরেট করতে বললেন। আমি বললাম, "ঠিক আছে, ককবরক-দিমাছা-বোড়ো'র ওপর তুলনামূলক গবেষণা করবো।" এই আলোচনার সময় ডঃ কমল কুমার সিংহ উপস্থিত ছিলেন। কমলবাবু চলে গেলে সিরাজ সাহেব আমাকে ত্রিপুরার পটভূমিতে গান্ধীজীর ওপর একখানা বই লিখতে বললেন। ৩.৩০'এ ক্লাস শেষ করে এ্যাসিস্টান্ট রেজিস্টার কল্যাণ বিজয় জমাতিয়ার সঙ্গে দেখা করলাম। তারপর তাঁর সঙ্গে ৫ টার সময় বেরিয়ে পড়ে কলেজ টিলায় কবি সত্যেন বন্দোপাধ্যায়ের কোয়ার্টারে গেলাম। তিনি ত্রিপুরার উপজাতিদের উগ্র জাতীয়তাবাদের নেগেটিভ দিক নিয়ে আলোচনা করলেন। সাতটার সময় এলাম ত্রিপুরা দর্পণে। সেখানে পেয়ে গেলাম পার্থসারথি চক্রবর্তীকে। তিনি আমার অসুখ-বিসুখ এর কথা শুনে ব্লাডসুগার পরীক্ষা করতে বললেন।

১৫ ই আগস্ট, ১৯৯৫ মঙ্গলবার । ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। বীরচন্দ্র দেববর্মার শ্রাদ্ধের দিন আজ। তাঁর শ্রাদ্ধের ৩ খানা চিঠি ছিলো আমার কাছে। সেগুলো নিয়ে সকালে বেরোলাম । ১ম চিঠিখানা প্রাক্তন মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার, ২য় চিঠি খানা বংশী ঠাকুরের মেয়ে গীতা দেববর্মার, ৩য় চিঠি খানা দূর্বাজয় বিয়াংয়ের। চিঠি গুলো দিয়ে নরেশ দেববর্মার বাড়ি গেলাম ককবরকের পরীক্ষার খাতা আনতে, কিন্তু দিল্লিতে Export-Import ব্যাঙ্কে চাকরিরতা তাঁর মেয়ে বললো তিনি বাড়ি নেই। আমার ব্যাগে নগেন্দ্র জমাতিয়া কিছু ডাঁটা শাক দিয়েছিলেন, সেগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরলাম । এসে দেখি আমার স্ত্রী গেছেন বাজারে। তিনি আস্তাবল বাজার থেকে ৭০ টাকা দরে মুরগীর মাংস নিয়ে এলেন স্বাধীনতা দিবস সেলিব্রেট করতে। আমি বললাম, 'বাহবা, বাহবা আজ ভারতের ৪৯ তম স্বাধীনতা দিবসে কত লোক খেতেই পারেনা, আর আমরা খাচ্ছি মুরগীর মাংস , বাহবা, বাহবা।'

আমার স্ত্রী ফুলকুমারী স্নান সেরে মাংস রান্না করার ভার তানিয়া ও দেবযানীর ওপর দিয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন বীরচন্দ্র দেববর্মার শ্রাদ্ধে। সেখানে গিয়ে দেখি আমাদের ছেলে সুরঞ্জন ক্যামেরা নিয়ে বসে আছে বীরচন্দ্র বাবুর শ্রাদ্ধের ছবি তুলবে বলে। রবি সেন তাঁকে সাহায্য করলেন ছবি তুলতে। বারান্দায় চন্দন চর্চিত দুখানা ছবি ছিল বীরচন্দ্রবাবুর । ঐ দুখানা ছবির সামনে উঠোনে শামিয়ানার নিচে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মিহির দত্ত, প্রশান্ত কপালী, কানু সেন, অমূল্য শর্মা, সুরেন্দ্র দেবনাথ, সাহানা সেনগুপ্ত প্রমুখ বসেছিলেন। সুরঞ্জন বীরচন্দ্র দেববর্মার শ্রাদ্ধ বাসরে আগত ওই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি তুললো। শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত সকলকে একটি করে মিস্টির প্যাকেট দেওয়া হচ্ছিল । মণি চন্দ্র দেববর্মাকে দোকান থেকে মিস্টি আনতে দেখলাম। মণিচন্দ্রকে বীরচন্দ্রবাবু খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁর কাছে রেখেই লেখাপড়া শিখিয়ে ছিলেন। বংশী ঠাকুরের মেয়ে গীতা দেববর্মা (সি.পি.এম এর বজবজ

এর এম.এল.এ ক্ষিতি বর্মণের স্ত্রী) অনেক ফুল ও মিস্টি নিয়ে শ্রাদ্ধে এসেছিলেন । বংশী ঠাকুর ও বীরচন্দ্র ঠাকুর ছিলেন মাসতুতো ভাই পরস্পরের । আমার স্ত্রী ফুল কুমারী, সম্পর্কে বংশী ঠাকুর ও বীরচন্দ্র ঠাকুরের নাতনি । আমি ঘরের ভেতর ঢুকে দেখি আমার স্ত্রী কমরেড ললিতা সিং, হরলাল দেবনাথের স্ত্রী সবিতা (কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মনমোহন দেববর্মার মেয়ে) ও মঞ্জু দির সঙ্গে বসে বসে বীরচন্দ্রবাবুর স্মৃতিকথা নিয়ে আলোচনা করছেন । ললিতা দি দুটো মিস্টির প্যাকেট দিয়েদিলেন আমার স্ত্রীকে বাসায় নিয়ে যেতে । এরপর আমরা স্বামী-স্ত্রীতে বীরচন্দ্র বাবুর শ্রাদ্ধ বাসর থেকে বাসায় ফিরে এলাম ।

সন্ধ্যে বেলায় আমি পুনরায় গেলাম বীরচন্দ্র বাবুর বাড়ি কীর্ত্তন শুনতে । গিয়ে দেখি কীর্ত্তনের দল তখনও আসেনি । মিহির দত্ত ঘরের ভেতর বীরচন্দ্রবাবুর ফটোর সামনে বসে ললিতা সিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করছেন । আমি পাশের বাড়ি (ঘর) শুভাশিস তলাপাত্রের সঙ্গে উড়িয়া ও অসমীয়া ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করছি, এমন সময় কীর্ত্তনের দল এলো অভয়নগর থেকে । কীর্ত্তনের দলের সকলেই ট্রাইবাল ঠাকুরলোক পবিবারের । কীর্ত্তনের দলের মূল গায়ক ছিলেন বীরচন্দ্রবাবুর মুহুরী প্রয়াত শ্রীশ দেববর্মার খুড়তোত দুই দাদা-সুরেন্দ্র দেববর্মা ও মনীন্দ্র দেববর্মা । সুরেন্দ্রবাবুর বয়েস ৮৬ আর মনীন্দ্র দেববর্মার বয়েস ৮২ । কিন্তু এই বয়েসে তাঁদের এতো সুন্দর শরীর দেখে আমি তো অবাক । আমি একেবারে মোহিত হয়ে গেলাম তাঁদের কীর্ত্তন শুনে । বীরচন্দ্র বাবুর নয়ন মনোহর ছবির সামনে ধূপ-ধুনো জ্বেলে তাঁরা কীর্ত্তন করছিলেন, সবই বৈষ্ণবীয় কীর্ত্তন । মঞ্জুদি ও ললিতাদি কীর্ত্তনের আসরে চা সিগারেট দিতে ব্যস্ত ছিলেন । চা খাবার সময় মনীন্দ্রবাবু বাইরে আমার পাশে এসে চেয়ারে বসলেন । তিনি সরকারী চাকরি ৩০ বছর করে অবসর নিয়েছেন ১৯৭২ সালে । তাঁর কাছে জানতে চাইলাম বীরচন্দ্র বাবুর আরেকজন মুহুরী সুখেন্দু বাবুর কথা । বললেন, সুখেন্দু দেববর্মা মারা গেছেন বেশ ক'বছব হলো । তিনি বিয়ে- থা করেন নি । তাঁর এক ছোট ভাই আছেন বোম্বে । সেখানে তিনি এক মহারাষ্ট্রী মেয়েকে বিয়ে করে ভালই আছেন কল-কারখানা করে । মহারাষ্ট্রী বৌকে নিয়ে মাঝে তিনি আগরতলায় এসেছিলেন বেড়াতে । বৌটা দেখতে শুনতে বেশ ভাল । বললেন, সুখেন্দু বাবুব আরেক ভাই মহারাজ বীরবিক্রমের রাজদরবারে বাঁশি বাজাতেন । মহারাজ তাকে খুব ভালবাসতেন তাঁর বাঁশির বাজনার জন্যে । কীর্ত্তন শেষ না হতেই আমি চলে এলাম বীরচন্দ্র বাবুর মামাতো ভাই (ইন্দু ঠাকুরের ছেলে) অজয়বাবুকে বলে । তিনি বিমর্ষ হয়ে বসেছিলেন ।

১৬ ই আগস্ট, ১৯৯৫ বুধবার। আজ বীরচন্দ্র দেববর্মার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে জ্ঞাতি ভোজন। ভেবেছিলাম সকাল থেকে গিয়ে কাজকর্ম করবো । কিন্তু সকাল ৮.৩০ এ বাঁশতলির হরমণি দেববর্মা তাঁর অসুস্থ স্ত্রী পঞ্চলক্ষ্মীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন । সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরকে নিয়ে জি.বি. হাসপাতালে গেলাম । আউট ডোরে পঞ্চলক্ষ্মীকে দেখানো হলো, তাঁর অবস্থা খুব খারাপ । গলগন্ড রোগে বিশেষভাবে আক্রান্ত । আমি ভেবেছিলাম ক্যানসার হয়েছে । পঞ্চলক্ষ্মীর পায়ে জল নেমেছে, রোগা পাট-কাঠির মতো চেহারা । তাঁকে হাসপাতলে ভর্তি করানো হলো দোতলায় ১নং ফিমেল মেডিকেল ওয়ার্ডে ৩০ নং বেডে । নার্সকে অনুরোধ করলাম একটা বিছানার চাদর দেওয়ার জন্যে । কিন্তু ক্ষেত মজুর এই উপজাতি রোগীর জন্যে কোন বিছানার চাদর পাওয়া গেল না । পঞ্চলক্ষ্মী নিজের গায়ের ওড়না পেতে কোন রকমে শুয়ে পড়লেন । ককবরকে তাঁর স্বামী হরমণিকে বললেন, 'মূনামজাগ' তঙগৃইমানগৃলাক' (দুর্গন্ধ লাগছে, থাকতে পারবো না) । আমি হরমণি বাবুকে নিয়ে পঞ্চলক্ষ্মীর ওষুধ কিনে দিয়ে বাসায় ফিরে এলাম বেলা ১.৩০ এর সময় । তারপরেই তার গ্রামে খবর পাঠানোর জন্যে বেরিয়ে পড়লাম

সেক্রেটারিয়েটে । সেখানে আমার কাকা শ্বশুর হেরমা বাড়ির বীরকুমার দেববর্মার হাতে চিঠি পাঠালাম । সেখান থেকে ফিরে বীরচন্দ্রবাবুর বাড়ি এলাম । তখন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা খেয়ে চলে গেছেন, ভিখিরিরা বসে খাচ্ছেন । রাত ৮ পর্যন্ত ১০০'র মতো ভিখিরি খেলেন । হরলাল দেবনাথ, মঞ্জুদি পরিবেশন করছিলেন । কমরেড অমূল্য শর্মাকে নিয়ে ভাঁড়ারে ঢু মারলম । দেখি কমরেড প্রশান্ত কপালী ভাঁড়ার আগলে বসে আছেন । মঞ্জুদি এসে প্রশান্ত বাবুর মুখের ভেতর একটা পান পুরে দিলেন । এর মধ্যে এসে গেলেন দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী সাহানা সেনগুপ্ত । আমি বাসায় ফিরলাম স্ত্রীকে নিয়ে আসার জন্যে । স্বামী-স্ত্রীতে আমরা ফিরে এলাম ৭-৩০ এ । এসে দেখি সুরেন্দ্র দেবনাথ সস্ত্রীক বসে আছেন । আমরা ছাদের ওপর খেতে গেলাম । মণিচন্দ্র আমাদের পরিবেশন করলো । মিহির দত্ত ও সাহানা সেনগুপ্ত তদারকি করছিলেন । আমাদের সঙ্গে আমাদের ছোট মেয়ে দেবযানীও ছিল । গোদক, মুড়িঘন্ট, মাছ ও মুরগীর মাংস দিয়ে আচ্ছা করে খেলাম বীরচন্দ্র বাবুর শ্রাদ্ধের খানা । তারপর রাত ৮.৩০ নাগাদ ললিতাদিকে বলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম । তখনও কাঙ্গলী-ভোজন চলছে বীরচন্দ্র দেববর্মার শ্রাদ্ধের ।

১৭ ই আগস্ট, ১৯৯৫ বৃহস্পতিবার । সকাল সাড়ে সাতটায় বীরচন্দ্রবাবুর বাড়ি উপস্থিত । সকাল আটটায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদর বিভাগীয় পরিষদ বীরচন্দ্রবাবুর বাড়ি দখল নেবে । বীরচন্দ্রবাবু পার্টির নামে উইল করে দিয়ে দান পত্র লিখে দিয়ে গেছেন । তিনটে ঘর সমেত পাকা দালান, পাকা পায়খানা সব । সকাল ১২টার মধ্যে হরলাল দেবনাথ ঘরখালি করে দিয়ে নিজের বাড়িতে চলে যাবে, ললিতা সিংও বিদায় নেবেন ৩৫ বছর পরে বীরচন্দ্র দেববর্মার সংসার থেকে। হরলাল দেবনাথকে পালন করেছেন বীরচন্দ্র বাবুর বড় ভাই ও বীরচন্দ্রবাবু । ৪০ বছর ধরে সে এই সংসারে পোষ্য পুত্রের মতো । হরলাল পিতৃ জ্ঞানে এই দুই ভাইকে সেবা শুশ্রূষা করেছে । এই বাড়িতে সে বিয়ে করে এনেছে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মনোমোহন দেববর্মার মেয়ে সবিতাকে । হরলালই একরকম এই বাড়ির মালিক । এবং প্রয়াত নবকুমার সিংয়ের স্ত্রী ললিতা সিং বীরচন্দ্র দেববর্মার সংসারের কর্ত্রী । এই দুইজনকেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের হাতে বীরচন্দ্রবাবুর স্থাবর-অস্থাবর সব বুঝিয়ে দিতে হবে । এর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি কমরেড সুনীল দাশগুপ্ত, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সাহানা সেনগুপ্ত, প্রশান্ত কপালী, চিরব্রত রায় বর্মণ, ধনমণি সিং, অমূল্য শর্মা, তপন দত্ত, সুরেন্দ্র দেবনাথ ও মিহির দত্ত প্রমুখ সব এসে গেছেন । হরলাল ও ললিতা সিং একে একে সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছেন মিহির দত্ত এবং প্রশান্ত কপালীকে । এই দু'জন ব্যক্তি বীরচন্দ্রবাবুর খুব ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাস ভাজন । একটা আলমারিতে বীরচন্দ্রবাবুর বিশেষ কোট-প্যান্ট রয়েছে । মস্কোর দামী দামী কোট সেগুলো । ললিতা সিং এই আলমারির চাবিটা প্রশান্ত কপালীকে দিলেন । হরলাল বহু আলমারি ও বাক্সের চাবি তুলে বুঝিয়ে দিলো মিহিরবাবুকে । নিয়ে এলো সকলের সামনে দুটো রেডিও, একটা টি.ভি., বীরচন্দ্রবাবুর ব্যবহৃত ঘড়ি । বললো, গ্যাস সিলিন্ডার আছে দুটো- পার্টি কমরেডদের রান্না-বান্নার কাজে অসুবিধে হবে না । বীরচন্দ্রবাবুর পান্থ শালায় থালা-বাসন ছিলো প্রচুর । পার্টির কমিউনে যারা থাকবে, তাঁদের কোন থালা-বাসন কিনতে হবে না । শুনলাম, খুব সকালে বীরচন্দ্রবাবুর ঘর থেকে তাঁদের পৈত্রিক পুজোর বাসন-পত্র নিয়ে গেছেন ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির দেববর্মার স্ত্রী । বীরচন্দ্রবাবু পুজোর বাসন-কোসন তাদেরকে দিয়ে যেতে বলে গিয়েছিলেন । সেই মতো সব দেয়া হয়েছে । দেখলাম, দুখানা সাইনবোর্ড-একখানা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সদর বিভাগীয় পরিষদ, অপরখানা বীরচন্দ্র দেববর্মা শিশু পাঠাগার-ঘরের মধ্যে এনে রাখা হয়েছে । পার্টির তরফ থেকে বীরচন্দ্রবাবুর জিনিসপত্র হরলাল দেবনাথ ও ললিতা সিংয়ের কাছ থেকে বুঝে নেয়ার পর পার্টির উপস্থিত নেত্রীবৃন্দ বীরচন্দ্র বাবুর বাড়ির রাস্তার ধারে ছাদের

কার্নিসে পার্টির ও শিশু পাঠাগারের সাইনবোর্ড দুখানা লাগালেন পরম তৃপ্তি সহকারে। এতদিন পরে সি.পি.আই'এর আকটা বাড়ি হলো, এই বাড়িতে পার্টির সদর বিভাগীয় অফিসও চলবে, কমিউনও থাকবে, নেত্রীবৃন্দের চোখে মুখে আনন্দের ছাপ। ঠিক এমন সময় বীরচন্দ্র দেববর্মার অসুস্থ ভ্রাতুষ্পুত্র (মেজ ভাই ফণি বাবুর ছেলে) শিশির দেববর্মা লাঠিতে ভর দিয়ে এসে বললেন, 'আপনারা এসব কী করছেন, কাকার ঘরে পার্টির সাইনবোর্ড লাগিয়ে তার বাড়ি দখল করছেন ? এসব-ঠিক করছেন না আপনারা। আমি কাকার একমাত্র ওয়ারিশ, আমি কেস করব আপনাদের বিরুদ্ধে।' উত্তরে প্রশান্ত কপালী বললেন, 'আপনার কাকাতো এই বাড়ি আমাদের পার্টিকে উইল করে দিয়ে গেছেন, আর সে উইলে আপনার সইও আছে।' উত্তরে শিশির দেববর্মা বললেন, 'জানেন, ট্রাইবেলের জমি নন-ট্রাইবেলকে দেওয়া যায় না, আমি কেস করবো।' উত্তরে কমরেড কপালী রেগে বললেন, 'যান, কেস করুন গিয়ে আপনি, কেস করবার অধিকার আপনার আছে।' শিশির দেববর্মা লাঠি ভর দিয়ে চলে যেতেই সি.পি.আই নেতৃবৃন্দ একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেননা, ইতিপূর্বে বীরচন্দ্র দেববর্মা তাঁর বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা জায়গায় পার্টিকে একটা বাড়ি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজীব গান্ধীর মৃত্যুব পরে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তাই চিন্তা।

আজ **১৮ই আগস্ট, ১৯৯৫ শুক্রবার**। খুব সকালে প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া নিচের থেকে হাঁক দিলেন, 'কুমুদ বাবু আছেন নাকি ?' আমি সঙ্গে সঙ্গে দোতলা থেকে নেমে গেট খুলে দিয়ে ওপরে নিয়ে এলাম, সঙ্গে তাঁর বডিগার্ড প্রমোদ বাবু। নগেন্দ্র বাবুকে বসালাম ভালো করে। তাঁর হাতে ছিলো অনেক গুলো দেশ পত্রিকা - আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন পড়তে। আমি সেগুলো নিয়ে আরো কিছু দেশ পত্রিকা দিলাম তাঁকে। অনেক কথা বলতে লাগলেন তিনি রাজনীতি নিয়ে। এর মধ্যে আমার দু'মেয়ে নন্দিনী-দেবযানী চা করে নিয়ে এলো। চা খেতে খেতে নগেন্দ্র বাবু বললেন, 'এ.ডি.সি তে বাঙলা হরফে কগবরক চালু করার যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তা আমি সমর্থন করি।' আমি বললাম, 'আপনাদের যুবসমিতিব অনেক নেতাই ককবরকের জন্যে বাঙলা হরফের সমর্থক, কিন্তু প্রকাশ্যে এ'কথা বলতে পারছেন না। দেখুন, নগেন্দ্রবাবু, রাজ্য সরকার বাঙলা হরফে কগবরক চালু করেছেন, আর আপনারা এ.ডি.সি.তে করলেন রোমান হরফে, এভাবে চলতে পারেনা।' কিছু দেশ পত্রিকা নিয়ে নগেন্দ্রবাবু উঠলেন।

দশটায় বেরিয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালযে। সেখানে ১২ ১৫ থেকে ২.১৫ পর্যন্ত ক্লাস নিলাম। এরপর ডঃ আমেদের কোয়ার্টারে যেতে শুনলাম ডঃ কমল কুমার সিংহ ও ডঃ আমেদ শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকারের কাছে গেছেন। ডঃ আমেদ ফিরে এলে আমি আবার গেলাম। তিনি বললেন, 'আপনার ব্যাপারে অনিল বাবুর সঙ্গে কথা হলো। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে খুব আগ্রহী, তাড়াতাড়ি কিছু একটা করবেন বললেন।' ডঃ আহ্‌মেদের ওখান থেকে উঠে আমি এলাম প্রেস ক্লাবে। সেখানে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার মিটিং। জহর আচার্যির রাজেন্দ্র কীর্তিশালার মিটিংয়ের সভাপতিত্ব করলেন শ্রীযুক্ত তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত। তড়িৎ বাবুর পাশে বসেছিলেন মহারাজকুমার সহদেব বিক্রম, সাংবাদিক সত্যব্রত চক্রবর্তী, জহর আচার্য। আমি রিপোর্টিং করলাম। পরে হাউস থেকে ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাশশাস্ত্রী, অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট লেখক বনবিহারী মোদক, প্রভু বাড়ির বেণুধর গোস্বামী প্রমুখ রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তী পালনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেন। ঠিক হলো, মূল কমিটির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সাব-কমিটির কনভেনার ও চেয়ারম্যানদের মিটিং হবে ২৩ শে আগষ্ট প্রেস ক্লাবে। তড়িৎ বাবু খুব সুন্দর ভাবে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। উপস্থিতদের মধ্যে অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা, জগৎ জ্যোতি রায়, অরুন্ধতী

রায়, রমাপ্রসাদ দত্ত প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। দর্পণ-সম্পাদক সমীরণ রায়ও উপস্থিত ছিলেন। আইনজীবী শংকর দাশও বক্তৃতা করেন।

১৯ শে আগস্ট, ১৯৯৫ শনিবার । সকাল ১০.৩০-এ গেলাম জি. বি. হাসপাতালে। সেখানে কমরেড হরমণি দেববর্মার স্ত্রী পঞ্চলক্ষ্মী ভর্তি রয়েছেন। হাসপাতালে ঢোকার আগে গেলাম ট্রাইবাল রোগীদের রেস্টহাউসে। সেখানে গিয়ে হরমণি বাবুর স্ত্রীর আর্থিক সাহায্যের জন্যে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফরম সংগ্রহ করে ফিরে এলাম পঞ্চলক্ষ্মী বেডে। সেখানে পেয়ে গেলাম বন্ধুবর ডা: পার্থসারথী চক্রবর্তীকে। তিনি আর্থিক সাহায্যের ফরম পূরণ করে দিলেন এবং তার বন্ধু ডাক্তারদের পঞ্চলক্ষ্মীকে ভালো করে অ্যাটেণ্ড করতে বললেন। কিন্তু ডা: চক্রবর্তী চলে যেতেই ডা: গেবরায় পঞ্চলক্ষ্মীকে ডিসচার্জ করে দিলেন। আমি তো অবাক। কি ব্যাপার ? অন্যান্য ডাক্তারদের কাছে জানতে চাইলাম ব্যাপার কি ? মাত্র ৩/৪ দিন ভর্তি হয়েছে পঞ্চলক্ষ্মী, হাইপোথায়রয়েডেজিমের সিরিয়াস পেশেন্ট। রোগীর পাশের ঘরে বসেই কথা হচ্ছিলো। ডা: সুকুমার দাস ও ডা: সুধন্য দেববর্মা বললেন, এই রোগের তো এখানে চিকিৎসা নেই। কলকাতা থেকে রক্তপরীক্ষা করতে হবে T3, T4. প্রাইভেটে কলকাতায় রক্ত পাঠিয়ে দিন। আমি বললাম, 'পঞ্চলক্ষ্মী দেববর্মা ক্ষেতমজুরি করে খায়, কলকাতায় রক্ত পাঠাতে হলে ৫০০/৬০০ টাকা দরকার। আপনারা তো হাসপাতাল থেকে সেই ব্যবস্থা করতে পারতেন।' ডা: সুধন্য দেববর্মা বললেন, 'রোগীটাকে যে আমরা ভর্তি করেছি সেটাই যথেষ্ট।' আমি বললাম, 'ভর্তি করে চিকিৎসা না করেই ছেড়ে দিলেন। এই ভর্তি করার কী অর্থ?' ডা: দেববর্মা আমার ওপর একটু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'রোগী আপনার কি হয়, আপনি কি করেন ?' বললাম, 'রোগী আমার সম্পর্কে শাশুড়ী, আর আমি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরক পড়াই।' তিনি আমার দিকে একটু বিরক্তি সহকারে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আমাদের ট্রাইবেলরা খুব ফাঁকিবাজ হয়ে গেছে তারা চিকিৎসার জন্যে শুধু টাকা চায়।' ডা: দেববর্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ডাক্তারবাবু, আপনার বাড়ি কোথায় ?' কামালঘাটে বলে উঠে গেলেন। ডা: দেববর্মার এই ব্যবহারে খুব মর্মাহত হলাম আমি। আমার অনেকদিনের লালিত একটা ধারণা বদলে গেলো। আমার ধারণা ছিলো ট্রাইবেল ডাক্তাররা তাঁদের স্বজাতীয় রোগীদের প্রতি একটু বেশি যত্নবান হবেন। বিশেষ করে তাঁরা রোগীদের ককবরক ভাষা জানেন, তাঁদের রোগীব অনুভূতিগুলো বুঝতে পারেন, যেটা বাঙালী ডাক্তাররা পারেন না। অনেক ট্রাইবেল রোগী ভালো করে বাঙলা বলতে পারেন না বলে বাঙালী ডাক্তারদের বেশ অসুবিধা হয়। ভেবেছিলাম, ট্রাইবেল ডাক্তাররা এই অসুবিধে দূর করবেন। কিন্তু হা হতোস্মি! অগত্যা পঞ্চলক্ষ্মীকে বটতলার বাসে তুলে দিয়ে আমি বাসায় ফিরলাম দুটোর সময়। ৩.৩০ এ প্রেস ক্লাবে গেলাম। সেখানে আজ ককবরকের ক্লাস শুরু হলো। প্রতি রবিবার বিকাল ৪টায় হবে। ক্লাস শেষ করে ৭টার সময় প্রেস ক্লাবের নিচের তলায় প্রয়াত বিজন চৌধুরীর ৪র্থ মৃত্যু বার্ষিকী এটেন্ড করলাম। পরে কমরেড ললিতা সিংকে নিয়ে বাসায় এলাম রাত ৮ টায়।

২০ শে আগস্ট, ১৯৯৫ রবিবার। আজ মুক্তির কান দিয়ে পুঁজ পড়েছে। জহর আচার্য এলেন সকাল ১০টায়। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম প্রথমে ফাল্গুনী দেববর্মার বাড়ি। শচীন কর্তার গান গেয়ে ফাল্গুনী খুব নাম করেছেন। ফাল্গুনী দেববর্মার সঙ্গে দেখা করে গেলাম 'একুশ শতক' পত্রিকায় লেখক দেবব্রত দেবকে ধরতে। দেবব্রত দেব বাড়ি ছিলেন না। একুশ শতকের সম্পাদক শুভব্রত দেবের ঘরে বসে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তী নিয়ে আলোচনা হলো। শুভব্রতবাবু জহরবাবুকে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার ওপর একটা বড় লেখা দিতে বললেন একুশ শতকের জন্যে। আর আমার কাছে চাইলেন একুশ শতকের পুজো সংখ্যার জন্যে একটা লেখা। 'একুশ শতক' থেকে বেরিয়ে জহর বাবু আমাকে

নিয়ে গেলেন প্যালেস কম্পাউন্ডে মহারাজকুমার সহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্মার প্রাসাদে। এর আগে সহদেব কর্তার বাড়ি আমি যাইনি। কর্তা বাইরেই ছিলেন। কর্তার মাথায় ছিলো এক বিশেষ ধরনের টুপি। আমাদের আপ্যায়ন করে নিয়ে গেলেন বৈঠকখানা ঘরে। মনে হলো সত্যিকারের রাজপুত্রের বৈঠক খানা। হাতির পায়ের একখানা সুসজ্জিত মোড়া। রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্য জয়ন্তী কমিটির একজন উপদেষ্টা হলেন সহদেব কর্তা। রৌপ্য জয়ন্তীর স্মারক গ্রন্থে লিপির ওপর একটা লেখা দেবেন তিনি। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর প্রচীন লিপির কিছু নিদর্শন দেখালেন তিনি। সহদেব কর্তা এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত। ভাষাচার্য সুনীতি কুমারের সঙ্গেও তাঁর আলাপ ছিলো। সুনীতি বাবু তাঁকে ত্রিপুরার তন্ত্রশাস্ত্রের ওপর গবেষণা করতে বলেছিলেন। কিছুদূর এগিয়েও ছিলেন তিনি। আমাকে বললেন, 'একদিন সময় করে আসবেন, অনেক কিছু প্রচীন তথ্য দেখাবো। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের হাতে লেখা কিছু কাগজপত্র আছে, সব দেখানো যাবে।' আমারা বৈঠকখানা থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। তিনি আমাদের অভিনন্দন জানালেন। সামনের লনে দাঁড়িয়ে জহরবাবু সহদেব কর্ত্তার নিজের হাতের তৈরি কিছু পাথরের মূর্তি দেখালেন। একটা মূর্তিকে বুদ্ধমূর্তি বলে মনে হলো। জহর বাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কর্তার কে কে আছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'কর্তা অকৃতদার', তাঁর মাতা মহারানী থাকেন বৃন্দাবনে। কর্তার অন্দরে জনাকয়েক জমাতিয়া মেয়ে আছে, তারাই কর্তাকে দেখে। কর্তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রেস ক্লাবের পাশ দিয়ে এলাম দৈনিক সংবাদে ভূপেন বাবুর সঙ্গে দেখা করে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্য জয়ন্তী নিয়ে আলোচনা করতে। দোতদলায় উঠে দেখি তখনো তিনি তাঁর সম্পাদকের ঘরে বসেন নি। শুনলাম তিনি তাঁর ছেলে-মেয়ের চুল কাটার ব্যাপারে ব্যস্ত। কাজেই আমারা চলে এলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম পুরোনো আর.এম. এস. চৌমুহনীতে স্টুডিও ক্লিকে। স্টুডিয়োর মালিক দিলীপ দেবরায় আমাদের বসতে বললেন। জহরবাবু রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তী উপলক্ষে কয়েকজন গুণী ব্যক্তিকে সংবর্দ্ধনা জানাবেন, তাই নিয়ে আলোচনা হলো। ঠিক হলো, শিল্পী ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ, রাজকুমারী কমলপ্রভা, রমাপ্রসাদ দত্ত-কলকাতার বসন্ত চৌধুরী, প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ এ. কে. লাহিড়ী প্রমুখকে অঙ্গাবরণ দিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানানো হবে। আলোচনার পর চা খেয়ে বাড়ি এলাম বেলা ১.৩০ টায়। বিকেলে গেলাম ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার কাছে। তিনি বললেন, কাল সকালে খালিপেটে আসুন ব্লাডসুগার করতে।' আজ ছেলে সুরঞ্জন হেরমায় গেলো বিকেলের দিকে।

২১শে আগস্ট, ১৯৯৫ সোমবার। সকালে ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরাটরীতে গিয়ে রক্ত দিলাম খালি পেটে ব্লাডসুগার পরীক্ষা করতে। ফেরার পথে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। শরীরটা খারাপ লাগায়, আর বাঁ পায়ের পাতা ফোলায় আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলামনা। খগেন্দ্র দাশগুপ্তর লেখা 'আর্য সভ্যতার সন্ধানে' বইখানা পড়লাম কিছুদূর। দুপুর শেষে বিশ্রামগঞ্জের ননীগোপাল দেববর্মা (মাস্টার) সস্ত্রীক এলেন তাঁদের মেয়ে সুরদিতাকে শ্রীমতী অনুরূপা মুখার্জির স্কুলে ভর্তি করার ব্যাপারে আলোচনা করতে। বিকেলে আমি ডাঃ দেববর্মার চেম্বারে গেলাম ব্লাড সুগারর রিপোর্ট আনতে। ডাঃ দেববর্মা রিপোর্ট হাতে দিয়ে বললেন, আপনার ব্লাড সুগার নর্মাল ৮৭ mg. ৬০ থেকে ১১০ mg. normal value, রিপোর্ট পেয়ে মনোবল বেশ বেড়ে গেলো। আমার পায়ের পাতা ফোলার জন্যে তিনি ডাঃ শ্যামল রায়কে দেখাতে বললেন। ডাঃ দেববর্মার ল্যাবরাটরি থেকে বেরিয়ে গেলাম শ্রীমতী অনুরূপা মুখার্জির বাড়ি সুরদিতার ভর্তির ব্যাপারে আলোচনা করতে। মিসেস মুখার্জী তখন রাতের গাউন পরে আদিবাসী মহিলা সমিতির কর্মী মিসেস চক্রবর্তীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন তার শোবার ঘরে। আমি যেতেই বললেন, মিস্টার কুন্ডু বসুন।' সুরদিতার ভর্তির

কথা বলতেই তিনি বললেন, 'আপনি নিজে এসে মিসেস মজুমদারের সঙ্গে দেখা করে ভর্তি করে দিয়ে যাবেন।' আমি বললাম, 'তথাস্তু'। বাসায় ফিরতেই জহর আচার্য এলেন রাজেন্দ্র কীর্তি শালার রৌপ্য জয়ন্তী নিয়ে আলোচনা করতে।

২২শে আগস্ট, ১৯৯৫ মঙ্গলবার । গতরাতের কথা মতো সকাল ৮টায় আমি গেলাম ম্যাগনেট ক্লাবের কাছে ডঃ কমল কুমার সিংহের বাড়ি। সেখানে সাড়ে আটটায় জহর আচার্যের আসার কথা। আমি যেতেই রমাপ্রসাদ দত্ত এলেন। বললেন, 'লিপির ওপর আপনার বই পেয়েছি, কিন্তু ত্রিপুরী রূপকথার বই পেলাম না। আমার সংগ্রহ শালায় ত্রিপুরী রূপকথার বইখানা রাখতে চাই।' রমাপ্রসাদ বাবু কমল বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে মানস দেববর্মার বাড়ি গেলেন। একটু পরে সাইকেল চড়ে হাতে কেরোসিনের ডিব্বা নিয়ে এলেন রাজেন্দ্র কীর্তি শালার জহর আচার্য। কমল বাবুকে কীর্তিশালার রজতজয়ন্তী পালন সম্পর্কে অবহিত করলেন জহরবাবু। কমল বাবু বললেন, 'তিন জন লোককে কীর্তিশালার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে পেলে সবদিক থেকে সুবিধে হবে। শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার, উপাচার্য অধ্যাপক পান্ডে এবং রাজ্যপাল সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ- এঁরা থাকলে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রজত জয়ন্তী উৎসব ভালোভাবে পালন করা যাবে।' কথা হলো, ২৬ শে আগস্ট ও ২৭ শে আগস্ট শিক্ষামন্ত্রী বিজয় কুমার বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন করতে আসবেন, তখন এ ব্যাপারে আলোচনা করা যাবে। ২৬ শে আগস্ট রাজ্যপাল সিদ্ধেশ্বর প্রসাদও থাকবেন। আমরা তথাস্তু বলে চলে এলাম। এদিকে কমল বাবুর জন্যে গাড়ি চলে এসেছে, বিজয় কুমার বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ বেরচ্ছে, তাঁকে প্রেসে যেতে হবে।

বাড়ি ফিরে রেস্ট নিতেই হেরমা থেকে মধুসূদন (দুয়া) এলো উত্তরা বলে একটা মেয়েকে নিয়ে। তাকে মিসেস অনুরূপা মুখার্জির আদিবাসী স্কুলে ভর্তি করে দিতে হবে। খবর নিয়ে জানলাম, সে সুরদিতার মায়ের আগের পক্ষের সন্তান। গতবার ধাবিয়াথল স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে। সুবদিতাকে চেনে কিনা জানতে চাইলে লজ্জা পেয়ে গেলো সে। উত্তরার বাবা বাঙালি, কিন্তু সে লেখে দেববর্মা। বাবা তার মাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে, আর খবরাখবর নেয়না। কাজেই সে মায়ের পদবীই গ্রহণ করেছে।

দুপুরে এলেন এ.ডি.সি'র প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা। তিনি এসে মোহন চৌধুরী লিখিত '**পঞ্চম তপছিল কি ও কেন**' বইখানা আমার কাছে আছে কিনা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, 'আমি ১৯৬৭ সালে সি.পি.আই.-এর কামান চৌমুহনীর অফিসে ওই বই দেখেছিলাম। এখন আমার কাছে নেই, তবে মোহন বাবুর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ-খবর করে দেখতে হবে।' রবীন্দ্রবাবু বললেন, 'ডেবর কমিশন ও হনমন্তিয়া কমিশনের রিপোর্ট দু'খানাও আমার দরকার।' এরপর তিনি বললেন, 'কুমুদ বাবু, আমি ত্রিপুরী প্রবাদের ওরপ একখানা বই প্রকাশ করতে চাই, আপনি যদি একজন পাব্লিশার দেখে দেন' তাহলে আগামী বইমেলায় বইখানা প্রকাশ করবো।'

সন্ধ্যেবেলায় খবর এলো আমার মামাতো শালী পরিমলদির মেয়ে ছায়ারাণী একসিডেন্টে আজ মারা গেছে। এখন আছে জি.বি. তে। আমার স্ত্রী অফিস থেকে এসেই দেবযানীকে নিয়ে নাজির পুকুর পাড়ে গেলেন ছায়ারানীর দিদি উষারাণীর বাড়ি খবর নিতে। ছায়ারাণীর মা বাই পরিমল (পরিমল দিদি) থাকেন চড়িলামের রামনগরে।

২৩ শে আগস্ট, ১৯৯৫ বুধবার । খুব ভোরে চলে এলেন নগেন্দ্র জমাতিয়া। আমার স্ত্রী তেল দিয়ে মুড়ি ভেজে চায়ের সঙ্গে খেতে দিলেন আমাদের। এসেই বললেন, 'আমার মা বেশ অসুস্থ, এখানে এসেছেন, আপনি মারেকে (বান্ধবী- আমার স্ত্রীকে)। নিয়ে একবার দেখে আসবেন। বড্ড

কাশি। ডাঃ অবনী মজুমদারের কাছ থেকে ওষুধ খেয়েও রাতে ঘুম হয় না, শরীরের ভেতর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলেন। রাত ৮ টের সময় গিয়ে ডাঃ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করি। তিনি ওষুধের ডোজ একটু কমিয়ে দিয়েছেন, এখন একটু ভালো। গতকাল ডাঃ পার্থ সাহা এসে দেখে গেছেন।' ওঁর এই কথা শেষ হবার পর বললাম, 'দৈনিক সংবাদ ও ত্রিপুরা দর্পণে ককবরকের হরফ বিতর্কের ওপর খবর বেরিয়েছে দেখেছেন কি?' বললেন, 'জানেন কুমুদ বাবু, মিস্টার ডায়াস যখন ত্রিপুরার রাজ্যপাল, আমরা টি.এস.এফ-এর তরফ থেকে ককবরক চালু করার ব্যাপারে ডেপুটেশান দিয়েছি তাঁর কাছে, ডঃ জি.এন. চাটার্জিও রয়েছেন। ডায়াস জি.এন. চাটার্জিকে বললেন, 'সব স্কুলে ককবরক চালু করার উদ্যোগ নিন। সংবিধানে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়ার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।' তখন আমি বললাম, "স্যার, সব স্কুলে ককবরক চালু করা হয়তো সম্ভব হবে না, শুধুমাত্র উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় চালু করলে চলবে। ডায়াস স্যারের কাছে ডঃ চ্যাটার্জী একেবারে কেঁচো হয়ে গিয়েছিলেন, আমার এই কথায় তিনি একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। ডায়াসের সামনে জি. এন. চাটার্জি ককবরকের ব্যাপারে টু শব্দটি করতে পারতেন না। যেই ডায়াস সাহেব বদলি হয়ে গেলেন এবং রাজ্যপাল হিসেবে এলেন বালেশ্বর প্রসাদ, তখন তিনি ককবরকের ব্যাপারে রাজ্যপাল প্রসাদের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করতেন।"

নগেন্দ্র বাবু কয়েকটা টেলিগ্রাফ পত্রিকা নিয়ে চলে গেলেন। আমিও একটু পরে বেরোলাম ছায়ারাণীর অ্যাকসিডেন্টের খবর নিতে নাজির পুকুর পাড়ে ছায়ারাণীর দিদি ঊষারাণীর কাছে খবর নিতে। গিয়ে দেখি ঊষারাণী গতকালই বিশ্রামগঞ্জ চলেগেছে ছায়ারাণীর বাড়িতে। ঊষার স্বামী হরিপদ গেছে জি.বি. হাসপাতালে, কখন ভি.এম. হাসপাতালের মর্গে ডেডবডি পাঠাবে জানতে। আমার ইচ্ছে ছিলো মর্গে যাবার কিন্তু পায়ের ব্যথার জন্যে যেতে পারলাম না। সকাল ১০টায় স্ত্রীর আফিসের রিক্সায় চড়ে গেলাম মটরস্ট্যান্ডে ডাঃ তলাপাত্রের হোমিওপ্যাথির দোকানে। ডাঃ তলাপাত্র আমার পায়ের ব্যাথার ওষুধ দিয়ে দিলেন। তারপর আকন্দ পাতা খুঁজতে খুঁজতে বাসায় ফিরলাম, কিন্তু কোথাও আকন্দ পাতা পেলাম না। প্যালেস কম্পাউন্ডের আসেপাশে আকন্দ গাছ নেই, আশ্চর্য। বাসায় ফিরে প্রায় সারাদিন 'হাচুক খুরিঅ'র বাংলা অনুবাদ করলাম। সন্ধ্যে ৬ টায় স্ত্রী ফিরে আসতেই গেলাম প্রেস ক্লাবে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার মিটিংয়ে। শ্রীযুত তড়িৎ মোহন দাশগুপ্তই সভাপতিত্ব করলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জহর আচার্য, সমীরণ রায়, আইনজীবী শঙ্কর দাশ, জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য, দুলাল চক্রবর্তী, ডাঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী, সাংবাদিক শেখর দত্ত, অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য, অরুন্ধতী রায়ের বোন স্বাতী সাহা ও তাঁর ছোট মেয়ে। রাজেন্দ্র কীর্তিশালা সেলিব্রেশন কমিটি ১৯৯৫' এই নামে প্যাড ছাপানোর সিদ্ধান্ত হলো। এই কমিটির পেট্রন রাজ্যপাল সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ, শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার, উপাচার্য অধ্যাপক প্যান্ডে, মহারাজা কিরীট বিক্রম ও তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত। মূল কমিটির চেয়ারম্যান হলেন কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক হলেন সত্যব্রত চক্রবর্তী, জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য ও জহর আচার্য, কোষাধক্ষ্য হলেন স্টুডিও ক্লিকের দিলীপ দেবরায়। এই নামগুলো প্যাডে ছাপানো হবে। ঠিক হলো, আগামী ২৫ শে আগস্ট স্যুভিনির সাব কমিটির প্রথম মিটিং হবে নন্দলাল কর্তার বাড়ির ত্রিপুরা দর্পণ অফিসে। রাত ৮.৪৫'এ বাসায় ফেরার পথে দর্পণে ঢুকলাম। দর্পণ সম্পাদক সমীরণ বাবুকে বললাম, 'বীরচন্দ্র দেববর্মার ওপর কিছু লিখতে চাই 'আমার স্মৃতিতে বীরচন্দ্র দেববর্মণ' এই বিশেষ নামে।' সমীরণ উত্তরে বললেন, 'লিখুন না।'

২৪শে আগস্ট, ১৯৯৫, বৃহস্পতিবার। আজ সকালে উঠে দেবযানীকে কৃমির ওষুধ খাইয়ে গেলাম নাজির পুকুরের পাড় দিয়ে বংশীঠাকুরের মেয়ের বাড়ি নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায়। নগেন্দ্র বাবুর

মার কাশি হয়েছে। বললেন, আজ বিকেলে মাকে নিয়ে যাবেন ডঃ পি.আর. লস্করের কাছে। নগেন্দ্র বাবুকে বললাম, "আপনার মারে কিছু ডাঁটাশাক চেয়েছেন, আপনার ডাঁটার নাকি খুব স্বাদ।" নগেন্দ্র বাবু তাঁর নিজের হাতে লাগানো ডাঁটা ক্ষেত থেকে ডাঁটা তুলে এনেদিলেন কিছু। এমন সময় অ্যানিমাল হাসবেন্ডারি বিভাগের পদস্থ অফিসার মনিলাল ভট্টাচার্য এলেন ল কলেজে তাঁর এক আত্মীয়ের ভর্তির ব্যাপারে পরামর্শ করতে। আমি চলে এলাম ডাঁটা নিয়ে বাসায়। ডাঁটা রেখে গেলাম কর্নেল চৌমুহনীতে ত্রিপুরা দর্পণ আনতে। পায়ের ব্যথার জন্যে আজো গেলাম না বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রায় সারাদিন 'হাচুক খুরিঅ'র ২১ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অনুবাদ করলাম। বিকেল তিনটের সময় এলেন ডঃ সত্যেন পাল রামঠাকুর কলেজের। ডঃ আমেদের কাছ থেকে আমার অসুস্থতার কথা শুনে দেখতে এসেছিলেন। বললেন, "আমি একটা লেখা দিয়েছিলাম দৈনিক সংবাদে 'মার্কসীয় চেতনায় প্রেম'-এখনো ছাপা হয়নি, মৃণালকান্তি বাবুকে একটু জিজ্ঞেস করবেন। আর, দৈনিক সংবাদ থেকে Human Rights Commission-এর দিল্লীর ঠিকানাটা একটু এনে দেবেন।' অধ্যাপক পাল আমার পুরনো বন্ধু। নববারাকপুর থাকতে তাঁকে যোগেশ বাগলের কাছে আসতে দেখেছি। তিনি চলে যেতেই ৪টের সময় আমি রওনা দিলাম একুশ শতক পত্রিকার অফিসের দিকে। পথে এ্যডভাইজর চৌমুহনীর ফুলন ভট্টাচার্যের বাসার কাছে ঝুলন ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হলো। ঝুলন হলো বীবচন্দ্র দেববর্মার জ্যাঠতুতো দিদি বসন্তলতার পালিতা কন্যা। বসন্তলতা ৯৮ বছরে মারা গেছেন। বসন্তলতার স্বামী ছিলেন উমেশ দেববর্মা। তিনি ছিলেন সেরেস্তাদার। উমেশ ঠাকুর ছিলেন বীবচন্দ্র দেববর্মার জ্যাঠামশায় কামিনী ঠাকুরের জামাই। কামিনী ঠাকুরের ছোটভাই ছিলেন বীরচন্দ্র উকিলের বাবা সতীশ ঠাকুর — এই তথ্যগুলো ঝুলন আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, বলতে পারেন, আপনার বীরচন্দ্র মামার কোনদিন বিয়ের কথা উঠেছিলো কিনা ?' ঝুলন বললেন, 'আমি তখন ছোটো, শুনেছি জয়সিং ঠাকুরের মেয়ে বাসনা দেববর্মার সঙ্গে বীবচন্দ্র মামার বিয়ের কথা হয়েছিলো। বাসনা দেববর্মার বাড়ির লোক খুব রাজী ছিলো। শেষে মামাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতেই বললেন, 'সকলে যদি বিয়ে করে, তবে দেশের কাজ করবে কারা ?' আর জানেন, বীরচন্দ্র মামা মারা যাবার ৫/৬ দিন আগে দেখতে গিয়েছিলাম, আমাকে দেখে বললেন, 'আমার বৌ নেই, ছেলে নেই, কেউ নেই আমার'—বলে কাঁদতে লাগলেন। ঝুলন ভট্টাচার্য কথা শেষ করলে আমি বললাম, "জানেন ঝুলন, আপনার বীরচন্দ্র মামার ললিত ঠাকুরেব মেয়ে বীথিকা দেববর্মার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে আমি একটা গল্প জানি।" আমার কথা শুনে ঝুলন বললেন, 'কেমন?' তখন আমি বললাম, "জানেন একবার ১৯৫৬ সালে না ৫৭ সালে ললিত ঠাকুর আর বীরচন্দ্র ঠাকুর গেলেন দিল্লী, সঙ্গে বীথিকা দেববর্মা। তাঁরা দিল্লী গেলেন আগরতলার ট্রাইবেল ঠাকুর-কর্তারা যাতে ? Scheduled tribe-এর লিস্ট থেকে বাদ না পড়ে তার দরবার করতে। তখন পার্লামেন্টে বিল আসবে আগরতলার ঠাকুর-কর্তা লোকদের Scheduled tribe-এর লিস্ট থেকে বাদ দেয়ার জন্যে। অঘোর দেববর্মা চাঁদা-টাদা তুলে তো ললিত ঠাকুর আর বীরচন্দ্র ঠাকুরকে পাঠালেন দিল্লি। বুঝলেন, দু'জনে আবার এম.এ., বি. এল। তা তাঁরা দিল্লিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কক্ষে দেখা করে আগরতলার ঠাকুরলোকেরা যাতে সিডিউলড্ ট্রাইবের লিস্ট থেকে বাদ না পড়ে সে ব্যাপারে দরবার করলেন। তারপর দেখা গেলো ললিত ঠাকুর আবার রাষ্ট্রপতি ড: রাজেন্দ্রপ্রসাদের বন্ধু। একসঙ্গে দু'জনে কলকাতায় ল পড়তেন। কাজেই দরবার করতে সুবিধেই হলো। তা দরবার সেরে সুদর্শনা কন্যা বিথিকা ও বীরচন্দ্র ঠাকুরকে নিয়ে ললিত ঠাকুর গেলেন আগ্রার তাজমহল দেখতে। ললিত ঠাকুরের তো বয়েস হয়েছে, খুব একটা ঘুরতে পারলেন না, এক জায়গায় বসে রইলেন। আর বীরচন্দ্র দেববর্মা সুদর্শনা বিথিকার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ছোটাছুটি করতে

করতে তাজমহল দেখলেন দারুন মজা করে। দু'জনে আবার ছবিও তুললেন রোমান্টিকভাবে। বুঝলেন, ঝুলন, তারপর কি হলো ? আগরতলায় ফিরে ললিত ঠাকুর আপনার বীরচন্দ্র মামার সঙ্গে বিথিকার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু আপনার মামা সেই প্রস্তাবে সাড়া দিলেন না। দু'জনে বিয়ে না করেই থাকলেন। তার অনেক অনেক বছর পরে বীরচন্দ্র দেববর্মা কি যেন ভেবে বিথিকা দেববর্মার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তখন বিথিকা দেবী সেই প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিলেন। শোনা যায়, তারপরে বীরচন্দ্র বাবু নাকি নিজেই চলে যান বিথিকা দেবীর কাছে। তখন নাকি বিথিকা দেববর্মা বিরক্ত হয়ে বলেন, বীরচন্দ্র ঠাকুর, এতদিন পরে আপনার বিয়ের সখ হলো, আমি যখন রাজি ছিলাম, তখন আপনি না করলেন, এখন দু'জনের চুলে পাক ধরেছে, বিয়ের বয়েস চলে গেছে আমাদের।

আমার কথা গোগ্রাসে গিলে এরপর ঝুলন ঢুকে পড়লেন ফুলন ভট্টাচার্যের বাসায়। ঝুলনকে ছেড়ে আমি এলাম বিজয়কুমার চৌমুহনীর কাছে একুশ শতক পত্রিকার অফিসে। সেখানে কমলাদি (কমলা সূত্রধর)'র কাছে 'হাচুক খুরিঅ'র অনুবাদ জমা দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। বাড়ি আসার পথে অ্যাডভাইজর চৌমুহনীতে হীরালালের চায়ের দোকান থেকে দৈনিক সংবাদ নিয়ে শ্যামাচরণ ত্রিপুরার লেখা 'ঝাড়খণ্ড অটোনোমাস কাউন্সিল ঃ নূতন আশার দিশারী' প্রবন্ধটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম, লেখাটা বেশ ভালো হয়েছে, তবে লেখাটায় 'ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ জয়পাল সিং মুণ্ডার কথা না থাকার কারণ বুঝতে পারলাম না। বাসায় ফিরেই স্ত্রীকে নিয়ে গেলাম নাজির পুকুর পাড়ে ঊষারাণীর বাড়ি। ঊষারাণীর কাছ থেকে ছায়ারাণীর অ্যাকসিডেন্টের কথা সব শুনলাম। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছিলো অনবরত। তিনটি মেয়ে ছায়ারাণীর—নাইন, এইট, সিক্সে পড়ে পরপর। এত তাড়াতাড়ি চলে গেলো। রামনগর বাপের বাড়ি থেকে বিশ্রামগঞ্জে বাসা করেছিলো স্কুল মাস্টার স্বামীকে নিয়ে। স্বামী ছিলো ঘরজামাই। ঊষারাণীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভেতরের রাস্তা দিয়ে গেলাম নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায় তাঁর মাকে দেখতে। তাঁর মা কাশিতে খুব ভুগছেন। নিয়ে গিয়েছিলেন ডা: পি. আর. লস্করের কাছে। ডা: লস্কর রক্ত পরীক্ষা ও এক্স-রে করতে বলেছেন। আমি বললাম, 'ডা: এস. আর. দেববর্মার প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতেই রক্ত পরীক্ষা করুন, কাল সকাল ৭টার সময় আমি সেখানে থাকবো, মাউইকে নিয়ে যাবেন।' তা-ই ঠিক হলো। আমার স্ত্রীর সঙ্গে মাউই (নগেন্দ্রবাবুর মা) ককবরকে কথাবার্তা বললেন। নিমন্ত্রণও করলেন। তাঁদের গ্রাম ততায় যেতে। নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসা থেকে বেরিয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রী করবী দেববর্মণের বাড়ির পাশ দিয়ে এলাম একুশ শতক অফিসে। সম্পাদক শুভব্রত দেবের সঙ্গে কথা হলো আমার কিছু বই প্রকাশ করার ব্যাপারে। আমার স্ত্রী ফুলকুমারী বললেন, 'এবাব ত্রিপুরার রূপকথা (কেরেঙ কথমা) ২য় খণ্ড বার করুন, আর তাতে ত্রিপুরার জনপ্রিয় রূপকথাগুলো ঢোকান। শুভব্রত বাবু ওরফে রতুবাবু বললেন, 'তাই করলে ভালো হবে।' একুশ শতক পত্রিকা অফিসে আগামী রোববার এসে বই প্রকাশনার ব্যাপারে আলোচনা করবো বলে চলে এলাম।

২৫শে আগষ্ট, ১৯৯৫ শুক্রবার। সকাল সাতটায় অ্যাডভাইজার চৌমুহনীতে ডা: সত্যরঞ্জন দেববর্মার প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে অপেক্ষা করতে থাকলাম নগেন্দ্র জমাতিয়ার মায়ের জন্যে। কিছুক্ষণ বাদে নগেন্দ্র বাবু মাকে নিয়ে এলেন হাঁটতে হাঁটতে। রক্ত নিলেন বিকাশ ভট্টাচার্য। ডা: দেববর্মার সঙ্গে কথা বললেন নগেন্দ্রবাবু। ডা: বাবু বললেন, 'আপনার মা গান্ধীকন্যার রক্তের রিপোর্ট আজ বিকেল ৫টায় পেয়ে যাবেন।' এরপর নগেন্দ্র বললেন, 'মাকে নিয়ে জি.বি. হাসপাতালে যেতে হবে এক্স-রে করার জন্যে, সেখানে সুপারিনটেনডেন্ট ডা: এস. পি. মজুমদার সব ব্যবস্থা করে দেবেন, বাইরে করলে ১০০ টাকা লাগবে।'

এরপর আমি চলে গেলাম বন্ধুবর মানস দেববর্মার বাড়ি। তাঁর স্ত্রীর কাছে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার

মিটিংয়ের খবর রেখে এলাম, মানস ঘুম থেকে ওঠে সকাল ৯.৩০ সময়। বাড়ি ফিরতে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা নিয়ে এলাম বগল দাবা করে। বেশ ক'দিন পরে স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ক্লাস নিলাম। মাঝে অধ্যাপক সুদীপ বসু বললেন, 'স্বপন বসু আসছেন, এই দেখুন চিঠি।' স্বপন আসবে বাঙলা বিভাগ আয়োজিত বিভূতিভূষণ শতবর্ষের সেমিনারে বক্তৃতা করতে। একটু পরেই এলেন শিপ্রা ম্যাডাম। তাঁর সঙ্গে গেলাম ডঃ আমেদের সঙ্গে দেখা করতে; তিনি একটা 'রেডিও টক' রেকর্ড করে এই মাত্র ফিরলেন। শিপ্রা ম্যাডামকে ছেড়ে এলাম লাইব্রেরীতে। সেখানে অধ্যাপক সত্যেন পাল অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে নিয়ে গেলাম দৈনিক সংবাদে মৃণাল বাবুর কাছে। তাঁর একটা প্রবন্ধ বেরোবে 'মার্ক্সীয় চিন্তায় প্রেম' নামে। দৈনিক সংবাদে দেখলাম মৃণাল বাবুর জন্যে একটা আলাদা ঘর দেয়া হয়েছে। ঘরটা বেশ সুন্দর, সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছেন ফাইল-বন্দী বিভিন্ন লেখা। দৈনিক সংবাদ থেকে বেরিয়ে ৪ টের সময় বাসায় ফিরলাম। ফিরে দেখি পত্র সুরঞ্জন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্লাস করে ফিরেছে, তানিয়া তখনো কলেজ থেকে ফেরেনি। দেবযানীর সঙ্গে টিফিন সেরে টেলিগ্রাফ পড়তে পড়তে বিশ্রাম করলাম কিছুক্ষণ। তারপর স্ত্রী ফুলকুমারী অফিস থেকে ফিরলেন ৬টা নাগাদ ভিজতে ভিজতে। ৭ টার সময় বেরিয়ে নন্দলালকর্তার বাড়ি গেলাম রাজেন্দ্র কীর্তিশালার স্যুভেনির সাব কমিটির মিটিংয়ে। কর্তার গেটে দেখা হয়ে গেলো ডাঃ পার্থসারথি চক্রবর্তীর সঙ্গে। তাঁকে নিয়ে 'প্যাঁক' ভাঙতে ভাঙতে ঢুকলাম কর্তার বাড়ির ভেতরে। ঢুকে দেখি কেউ আসেননি মিটিঙে।

২৬ শে আগস্ট, ১৯৯৫, শনিবার। আজ সকাল ৭ টার সময় বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়ি সি.পি.আই. অফিসে গেলাম কমবেড প্রশান্ত কপালী খবর দেয়ায়। সেখানে কমরেড অমূল্য শর্মা ও কপালীর সঙ্গে দেখা হলো। সি.পি.আই এর রাজ্য সম্মেলনের জন্যে চাঁদা তোলার বিষয়ে আলোচনা হলো। বলে এলাম, 'কাল এসে আপনাদের সঙ্গে চাঁদা তুলবো।' বাড়ি ফিরলাম ত্রিপুরা দর্পণ নিয়ে। সকাল ১০.৩০ এর সময় সুরদিতাকে নিয়ে গেলাম অনুরূপা মুখার্জীর বাড়ি আদিবাসী মহিলাসমিতির স্কুলে ভর্তি কবাতে। মিসেস মুখার্জী বললেন, 'লোকাল MLA বা ADC Member এর সার্টিফিকেট লাগবে।' সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম বিজয় কুমার স্কুলের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদিতে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অনিল সককার, খাদ্যমন্ত্রী ব্রজগোপাল রায়, ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদ, ডঃ কমল কুমার সিনহা, হায়াব এডুকেশনের ডাইরেকটর প্রমুখ ব্যক্তি বিদ্যালয়ের গেটে ছাত্রী সমবেত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজ্যপাল সিদ্ধেশ্বর প্রসাদকে স্বাগত জানাতে। একটু বাদেই এলেন উপাচার্য ডঃ ওয়াই. ভি. পান্ডে। রাজেন্দ্র কীর্তিশালার জহর আচার্যকে একটু দুরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। এডুকেশন ডাইরেক্টর আমাকে বললেন, 'ককবরক ভাষায় গান্ধীজীর একখানা জীবনী লেখা হচ্ছে, ট্রাইব্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ সেলের সুকান্ত দেববর্মা লিখছেন, কথা হয়েছে আপনি একটু পান্ডুলিপিটা দেখে যাবেন,' বললাম, 'ঠিক আছে।' এর মধ্যে রাজ্যপাল সিদ্দেশ্বর প্রসাদ এসে গেলেন। সকলে বাদ্যসহকারে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বিদ্যালয়ের ভেতরে নিয়ে গেলেন। ছোট্ট অনুষ্ঠান হলো, আজ ছিলো রাজ্যপালের বিদ্যালয় পরিদর্শনের দিন। মূল অনুষ্ঠান আগামীকাল টাউন হলে শুরু হবে। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিলেন রাজ্যপাল ছাড়া শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার, খাদ্যমন্ত্রী ব্রজগোপাল রায়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি প্রতিমা ভট্টাচার্য। রাজ্যপাল বিদ্যালয়ে সংস্কৃতি ভবন গড়ার জন্যে অর্থ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ট্রাইব্যাল মেয়েবা 'লেবাং নৃত্য' করলো উপভোগ্যভাবে। রাজ্যপাল চলে যেতেই শিক্ষামন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, উপাচার্যের সঙ্গে চা খেতে বসলাম। অনিল বাবু বললেন, 'কুমুদবাবু লিপি বিতর্কের ওপর আপনার একটা লেখা দিতে হবে জনপদ পত্রিকায় বাংলা হরফের পক্ষে।' এরপর

শিক্ষামন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী ও উপচার্যের সঙ্গে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার সিলভার জুবিলি নিয়ে আলোচনা হলো। তাঁরা পেট্রন হতে রাজী হলেন।

২৭ শে আগষ্ট, ১৯৯৫ রবিবার। আবার বেশ কদিন বাদে খুব সকালে রাজবাড়ির দীঘিতে স্নান করতে গেলাম। স্নান করবার আগে জহর পার্কের কচিঘাসের ওপর খালি পায়ে হাঁটলাম কিছুক্ষণ। সাঁতার দিয়ে স্নান সেরে বাড়ি এলাম ৬.৩০ এর মধ্যে। আসার সময় ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা নিয়ে এলাম। বাড়ি এসে ৭ টার সময় গেলাম বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়ি সি.পি.আই অফিসে। সেখান থেকে গেলাম বটতলায় সি.পি.আই এর রাজ্য সম্মেলনের চাঁদা তুলতে। সঙ্গে ছিলেন কমরেড প্রশান্ত কপালী, ফটিক ভৌমিক, অমূল্য শর্মা ও সুরেন্দ্র দেবনাথ। বটতলা থেকে সুরেন্দ্র দেবনাথের স্কুটারে সুরেন্দ্রবাবু, অমূল্য শর্মা ও আমি ফিরলাম পুনরায় বীরচন্দ্রবাবুব বাড়ির অফিসে। সেখান থেকে আমি গেলাম বিজয় কুমার চৌমুহনীর কাছে একুশ শতক পত্রিকা অফিসে। সেখানে অসুস্থ লেখক দেবব্রত দেবের সঙ্গে কথা বললাম আগামী বই মেলার আগে আমার গবেষণা মূলক কয়েকখানা বই ছাপার ব্যপাবে। সেখান থেকে এলাম এ্যাডভাইজার চৌমুহনীর অনুরূপা মুখার্জীর বাড়ি সুরদিতা দেববর্মার ভর্তির বিষয় নিয়ে। সেখানেই দেখা হয়ে গেলো ত্রিপুরার সোস্যাল এজুকেশন ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন ডাইরেকটর শোভা বসুব সঙ্গে। মিস বোসের বয়েস এখন ৭০-এর মতো। ১৯৫০ সালে ত্রিপুরায় এসেছিলেন ঢাকা থেকে। কলকাতায় পড়াশুনো করেছেন ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনে। কলেজে পড়ার সময় ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে আসেন। ডঃ রায় ছিলেন তখন ওই কলেজের একজন হর্তাকর্তা। বিধান রায় তাঁকে চিকিৎসাও করেন বছর দুয়েক ধরে। মিস বোস চট্টগ্রামের যে স্কুলে পড়তেন, সেখানকার হেড মিস্ট্রেস ছিলেন কুমারী সুপ্রভা দাশগুপ্ত। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নাকি বিয়ে করতে চেয়ে ছিলেন তাঁকে। কিন্তু সে বিয়ে হয় নি। সারজীবন নাকি রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-কন্যা সুপ্রভাকে মনে রেখেছিলেন এবং তাঁর নামে শান্তিনিকেতনে দুবিঘে জমি রেখে গিয়েছিলেন। বেশ রসিয়ে রসিয়ে এ-সব মুখরোচক গল্প বললেন মিস বোস মিসেস অনুরূপা মুখার্জীর পাশে বসে। দেখালাম, এই দুই লেডি উভয়ে উভয়কে তুমি বলে সম্বোধন করেন। মিস বোস ১৯৮১ সালে রিটায়ার করে এখন কল্যাণীতে ইংরিজি মিডিয়ামের একটি ইস্কুলের দায়িত্বে আছেন। আফসোস করে বললেন, "কুমুদ বাবু, আমার এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত হয় নি, আমার ইচ্ছে ছিলো অবসর গ্রহণের পর আট-দশটা ট্রাইব্যাল গ্রাম নিয়ে কাজ করবো। কিন্তু বাইরে থেকে একটা ভালো অফার পেয়ে চলে গেলাম, এখন আফসোস হয়।" মিস বোসের কাছ থেকে তাঁর কর্মজীবনের বহু ঘটনা জানা যায়। তাঁর সময় ত্রিপুরার উপজাতীয় এলাকায় সমাজ-শিক্ষার কী পরিবেশ ছিলো, উপজাতীয় মেয়েরা তাঁকে কীভাবে নিতেন, তাঁরা কেন তাঁকে সুভাষ বোস বলে ডাকতেন সুতোর লোভ দেখিয়ে উপজাতীয় মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে তাঁদের মনের ভেতর ঢুকতে পেরেছিলেন, সমাজ শিক্ষা দপ্তরের নানা রকম চাঞ্চল্যকর তথ্য- এসবই মিস বোসের কাছ থেকে শুনলাম। মিস বোসকে অনুরোধ করলাম, ত্রিপুরায় তাঁর কর্ম জীবন সম্পর্কে স্মৃতি কথা আকারে দৈনিক সংবাদ ব. ত্রিপুরা দর্পণে লিখতে। আমি তাঁর কল্যানীর ঠিকানা নিয়ে নিলাম-Sobha Basu. B 13/38 Kalyani, Nadia. Pin 741235. মিস বোস আগামীকাল কলকাতায় চলে যাবেন। এবার আগরতলায় এসে উঠেছিলেন অনুরূপা মুখার্জীর বাড়ি। তারা দুজনে বন্ধু। মিস বোসের কাছ থেকে ফিরে এলাম বাসায়।

বিকেল চারটের সময় প্রেস ক্লাবে গেলাম ককবরকের ক্লাস নিতে। এই ক্লাসে সাংবাদিক শেখর দত্ত, সুজিত চক্রবর্তী, বুদ্ধশংকর দাশগুপ্ত প্রমুখ ছিলেন। সেখান থেকে গেলাম টাউন হলে, সেখানে বিজয় কুমার বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান চলছিলো। সেখানে আমার মেয়ে দেবযানী উপজাতীয়

পোষাকে তাদের ক্যান্টিন চালাচ্ছিলো। রাত ৮ টায় বাসায় ফিরলাম।

২৮ শে আগস্ট, ১৯৯৫ সোমবার। সকালে সুরদিতাকে ভর্তির ব্যপারে গেলাম অনুরূপা মুখার্জীর বাড়ি। ১০ টায় স্ত্রী ফুলকুমারীর সঙ্গে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে অধ্যাপিকা তপতী চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা চম্পা দাশগুপ্ত, অধ্যাপক সিরাজুদ্দীন আমেদ ও অধ্যাপক কমল কুমার সিংয়ের সঙ্গে একটা গাড়ি করে এলাম টাউন হলে। গাড়ি ওঁদের নামিয়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে গেল কামান চৌমুহনীতে। সেখানে সি.পি.আই আফিসে রাজ্য সম্মেলন নিয়ে মিটিং ছিলো। মিটিংয়ে কমরেড অঘোর দেববর্মা, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সাহানা সেনগুপ্ত, কানু সেন, সুনীল দাশগুপ্ত, মিহির দত্ত প্রমুখ ছিলেন। মিটিং সেরে সুরেন্দ্র দেবনাথ ও অমূল্য শর্মার সঙ্গে মসজিদ পট্টির কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেলাম। সেখান থেকে সুরেন্দ্র দেবনাথের স্কুটারে চেপে এলাম চিলড্রেন পার্কের সুকান্ত একাডেমীতে। সেখানে চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে একটি সেমিনার ছিলো। সেমিনার ঘন্টা খানেক চলেছিলো, খুব একটা জমে নি। সেখান থেকে সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে গেলাম টাউন হলে বিজয় কুমার বিদ্যালয়ের শত বার্ষিকী অনুষ্ঠানে। সেখানে আমার মেয়ে দেবযানীর সঙ্গে দেখা করলাম। আজ সে আর উপজাতীয় পোষাক পরেনি, পরেছে শাড়ি। সেখান থেকে সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে গেলাম হরিহর সাহার জনসেবা পরিষদ অফিসে। দেখলাম রোগীদের অভিভাবকদের খুব ভিড়। হরিহর বাবু খুব ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁকে মার্কসবাদের বইও বিক্রি করতে দেখলাম দুই মহিলাকে। এরপর আবার টাউনহলে। সুরেন্দ্রবাবু তাঁর প্রতিবেশী এক মেয়েকে তাঁর স্কুটারে নিয়ে চলে গেলেন তাঁর ছাত্র সঙ্ঘের কাছের বাসায়। আমিও টাউন হলে দেবযানীকে রেখে ফিরে এলাম বাসায়। দেবযানী ফিরলো রাত সাড়ে আটটায় আমাদের চিন্তা দুর করে।

২৯ শে আগস্ট, ১৯৯৫ মঙ্গলবার। আজ খুব ভোরে উঠে রাধা সাগরে স্নান সেরে কর্ণেল চৌমুহনী থেকে ত্রিপুরা দর্পন পত্রিকা নিয়ে বাসায় ফিরলাম। বাসায় ফিরে John Beams-এর A Comparative Grammar of the Mordern Aryan Languages of India বই খানা পড়তে শুরু করলাম। মহা মূল্যবান এই বইয়ের Introduction অংশের ৪২ পাতায় ভাষার Syntactical, Agglutinative, Synthetical or Inflectional ও Analytical Stage গুলো পড়লে ভাষার শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

দশটায় স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঠিক হলো, বাংলা বিভাগীয় প্রধান ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদের কাছে আমি ডক্টরেট করবো। প্রথম কথা ছিলো, আমার থিসিস হবেঃ A Comparative Grammar of Kakbarak, Dimasa and Bodo Languages -এর ওপর। পরে ডক্টর আমেদ বললেন, 'এই বিষয়টা আপনি ডিলিট এর জন্যে রেখে দিন। আর Origin and Development of Kakbarak Languages-এই নামে পি.এইচ. ডি 'র জন্যে করুন।' ঠিক হলো, আমার ১২ই সেপ্টেমবরের মধ্যে থিসিসের Work-Plan জমা দিয়ে দিতে হবে। এই আলোচনার সময় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সুদীপ বসু ছিলেন। ডঃ আমেদ আমার পি.এইচ.ডি করার বিষয়টা বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শিশির কুমার সিংহকেও বললেন। গত বছর ডঃ সিংহর কোয়ার্টারে আমার কলেজ জীবনের অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমাব বসু আমার 'ককবরক ভাষা শিক্ষার আসর' -এর পান্ডু লিপি দেখে বলেছিলেন, 'এ-তো ডিলিট এর কাজ।' আমাকে শিশির বাবুর সামনে ডক্টরেট করার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিলেন। আজ বোধহয় তা বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে। বিকেল পাঁচটা ডঃ আমেদের কোয়ার্টরের সামনে ভি.আই. পি গাড়ি এসে দাঁড়ালো একখানা। সেই গাড়িতে করে ডঃ আমেদ ও মিসেস আমেদের সঙ্গে টাউন হলে গেলাম বিজয় কুমার বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। আজ

ছিলো সমাপ্তি অনুষ্ঠান । সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অধ্যাপক যমুনাধর পান্ডে । বেশ মনোজ্ঞ ভাষণ রাখলেন তিনি ইংরেজীতে । আমি টাউন হলের দোতলায় উঠে ছোট মেয়ে দেবযানীর সঙ্গে তাদের ক্যানটিনে দেখা করে বাড়ি চলে এলাম হারাধন সংঘের পাশ দিয়ে । বাসায় ফিরে দেখি বড় মেয়ে নন্দিনীও টাউনহলে চলে গেছে , আমার মঙ্গোলিনী স্ত্রী ফুলকুমারী একা একা বসে কচুর লতি কুটছেন । আমাকে একা পেয়ে তিনি সাংসারিক অভাব অনটনের কথা বলতে শুরু করলেন । বললেন, 'বিছি কাইছা উঙখা আনি জুতা কৃরূই, অফিছঁ থাঙনানি বাগৃই রি-ব কাহাম কৃরূই, তাই তাম ছানানি' (এক বছর ধরে আমার জুতো নেই, অফিসে যাবার ভালো কাপড়ও নেই কি আর বলবো) ।

৩০ আগস্ট, ১৯৯৫ বুধবার । রাজবাড়ির দীঘি থেকে স্নান সেরে সাড়ে ৭ টার মধ্যে বাসায় ফিরলাম ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা হাতে নিয়ে । এসে দেখি কমরেড অমূল্য শর্মা আসেনি, তাকে নিয়ে দঃ চড়িলামের কামরাজ কলোনীতে মিটিং করতে যাবার কথা সি.পি. আই-এর পঞ্চদশ রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে । ৮.১৫ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম । কর্নেল চৌমুহনী থেকে টেম্পো করে বটতলা, সেখান থেকে সোনামোড়ার ৯২৭ নং বাসে ৬ টাকা দিয়ে চড়িলাম । চড়িলাম নেমে গেলাম শ্রীযুক্ত বিজয় মজুমদারের বাড়ি । তখনও তাঁর বাড়ির বারান্দায় প্রাতঃকালীন আমদরবার চলছে, আড্ডাই বলা চলে মুরুব্বী লোকদেব । বিজয় বাবুর পাশে বসে আছেন রেশনশপের ডিলার কেশব চক্রবর্তী, ফরওয়ার্ড ব্লকেব প্রভাত দেবনাথ, কংগ্রেসের সুরেশ চৌধুরী, সাধন শীল প্রমুখ । দেখি, তাঁরা স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সাংবাদিক জিতেন পালের একটা লেখা নিয়ে মুখরোচক সব আলোচনা করছেন । সেই লেখায় মহারাজ বীরবিক্রমের আমলে ১৯৩১ সালে যে সেনসাস রিপোর্ট বেরিয়েছে, তাতে ট্রাইবালদের থেকে বাঙালিদের সংখ্যা বেশী দেখানো হয়েছে । কাজেই বলা যেতেপারে পার্বত্য ত্রিপুরাতেও মহারাজের আমলে বাঙলিই বেশী ছিলো । আমি বললাম, 'জিতেন পালের এই তথ্য ঠিক নয়, মহারাজার আমলে বাঙালীদের থেকে ট্রাইবালরা বেশী ছিলেন-এই তথ্যই আছে ওই রিপোর্টে, আমি একদিন ওই সেনসাস রিপোর্ট এনে আপনাদের দেখিয়ে যাবো ।' তারপর কথা উঠলো, নৃপেন ঠাকুর বাঙালিদের থেকে সংখ্যায় কম ট্রাইবালদের জন্যে এ.ডি.সি. এলাকায় বেশী জায়গা দিয়ে গেছেন, এটা কেমন হলো ? এখন এ.ডি.সি এলাকায় ইনারলাইন পারমিট চালু হলে ত্রিপুরায় হিন্দুস্থান-পাকিস্তান এর মতো অবস্থা হবে । বিজয় বাবু বললেন, 'এ.ডি.সি তুলে দিয়ে সব সমান করে দিলে কি হয় ?' আমি বললাম, 'বাঙালীরা যদি দায়িত্ব নেন এ.ডি.সি এলাকায় বাঙালিরা আর নতুন করে ঢুকবেননা, তাহলে এ.ডি.সি এলাকার আর দরকার হবেনা ।' উপস্থিত সকলে বললেন, 'না, সে দায়িত্ব নেয়া যাবেনা ।' একজন বললেন, 'ধরুন কুমুদ বাবু, আবার যদি দাঙ্গা হয়, আর যদি আপনি ট্রাইবাল এলাকায় থাকেন, তখন কী করবেন ?' আমি বললাম, দাঙ্গাব সময় যদি আমি ট্রাইবাল এলাকায় থাকি, আমি সেখান থেকেই চেষ্টা করবো ট্রাইবাল-বাঙালিদের মধ্যে মৈত্রী আনার, আর বাঙালি এলাকায় থাকলে সেই একই চেষ্টা কোরবো ।'

এইসব মুখরোচক আলোচনার আসর থেকে ১০.৩০ এ বেরিয়ে পড়ে গেলাম কামরাজ চৌমুহনীতে। কামরাজ চৌমুহনীতে যেতে যেতে একটা ঘটনার কথা মনে পড়লো। ঘটনাটা বলেছিলেন বিজয়বাবু জিতেন পাল প্রসঙ্গে। ঘটনাটা এরকম ঃ দক্ষিণ চড়িলামে মোহন সাহা নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। একসময় সেখানে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। মোহন সাহা এক মুসলমান রমণীর প্রেমে পড়ে গিয়ে তাঁর পাণিগ্রহণ করেন ইসলামীয় শাস্ত্রমতে এবং তখন তাঁর নাম হয় মোহন মিঞা। মোহন মিঞার কমলা নামে একটি মেয়েও হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর যখন দক্ষিণ চড়িলাম থেকে মুসলমানরা বেশিরভাগ

বাঙলাদেশে চলে যান এবং তাঁদের জায়গায় আসেন হিন্দু উদ্বাস্তুরা, তখন মোহন মিঞা মুসলমান থেকে পুনরায় হিন্দু হতে ইচ্ছে প্রকাশ করলে জিতেন পাল মশায় আগরতলা থেকে গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা প্রমুখকে এনে বিরাট ভোজের মাধ্যমে মোহন মিঞাকে আবার হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করেন। তখন কমলার মা সুদর্শনা কমলাকেনিয়ে বাঙলাদেশে চলে যান। কামরাজ চৌমুহনীতে পৌঁছে দেখি, গোপাল মেম্বারের চায়ের দোকানে সি.পি.আই. এর সদস্যরা অপেক্ষা করছেন। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন— গোপাল দেবনাথ, গণেশ ভৌমিক, শচীরানী দেবনাথ, লোকাল সম্পাদক নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ডাঃ চিত্তরঞ্জন মোহন্ত দাস, রতি দেববর্মা, হরমণি দেববর্মা প্রমুখ। তাঁদের সঙ্গে মিটিং সেরে এলাম উত্তর চড়িলামে প্রভাত দেবনাথের বাড়ি বেলা একটার সময়। প্রাক্তন প্রধান প্রভাত বাবুর বড়ো ছেলে মনোরঞ্জন এখন সি.পি.আই পার্টি করে সি পি এম ছেড়ে। দুপুর বেলায় খেলাম প্রভাত বাবুর বাড়ি। প্রভাত বাবু চড়িলামের ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা হিসেবে বামফ্রন্টের কাজকর্মের খুব সমালোচনা করলেন। বিশেষ করে তিনি বললেন, উগ্রপন্থীদের বিষয়ে সরকার কঠোর না হলে আবার দাঙ্গা বেধে যেতে পারে, গ্রামের পরিস্থিতি খুব ভালো নয়। প্রভাত বাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম বিশ্রামগঞ্জে। সেখানে পি.ডাব্লিউ. ডি অফিসের পেছনে কমরেড সমীরঞ্জন দেববর্মার বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পার্টির ১৫শ রাজ্য সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা সেরে তাঁকে নিয়ে গেলাম তকছাপাড়ার সড়কের ধারে শিক্ষক ননী দেববর্মার বাড়ি। দা ননীকে বললাম, "সুরদিতাকে অনুরূপা মুখার্জীব স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি, এখন M.L.A., অশোক দেববর্মার কাছ থেকে একখানা Character Certificate দরকার, পাঠিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে দা-ননীর স্ত্রী, আমার বৌদি, আমাদের জন্যে চা এনে দিলেন রসগোল্লা-নিমকি সহযোগে। বৌদি বললেন, 'তোমাদের বাসায় আজ মুরগীর মাংস পাঠিয়ে দিয়েছি অরিন্দুকে দিয়ে।' আমি বল্লাম. 'আগরতলায় ফিরে আজ মজা করে খাওয়া যাবে।' দা-ননীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম বিশ্রামগঞ্জ বাজারে। সেখান থেকে ঝিঙ্গা ও কচি চালকুমড়ো নিয়ে আগরতলায় ফিরলাম রাত ৭.৩০ এ। বাসায় ফিরে দেখি ঊষারানী বসে আছে, ছায়ারানীর শ্রাদ্ধ হবে আগামী বুধবারে, তার নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। রাত ৮.৩০ এ সুরঞ্জন ফিরলো কানে ব্যথা ও জ্বর নিয়ে। চিন্তায় পড়ে গেলাম আমি।

৩১শে আগস্ট, ১৯৯৫ বৃহস্পতিবার। বেশ সকালে রাজ-দীঘি থেকে স্নান সেরে ত্রিপুরা দর্পণ নিয়ে বাসায় ফিরলাম। তারপর গেলাম ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার কাছে আমার স্ত্রীর অসুখের কথা জানাতে। তিনি ১ খানা প্রেসকিপশন করেদিলেন। ডাঃ দেববর্মার চেম্বার থেকে বেরিয়ে ঢুকলাম পাশের আদিবাসী মহিলা সমিতির সভানেত্রী মিসেস মুখার্জীর বাড়ি উত্তরা দেববর্মার ভর্তির ব্যাপারে। দেখলাম, অনুরূপা মুখার্জী শিলং চলে গেছেন, ফিরবেন ৪/৫ দিন পরে। এবার গেলাম ম্যাগনেট ক্লাবের কাছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ডঃ কমল কুমার সিংহর বাড়ি। তাঁর সঙ্গে আমার ডক্টরেটের বিষয়ে আলোচনা করে চা খেয়ে বিজয় কুমার বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ১ খানা হাতে নিয়ে তাঁর ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম মহেন্দ্র দেববর্মার বাড়ির কাছে একটা ওষুধের দোকানে। সেখান থেকে ট্যারামাইসিন ক্যাপসুল ও লেমোলেট ট্যাবলেট কিনে নিয়ে হেঁটে টি.আর.টি.সির ভেতর দিয়ে কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্যের পাশ দিয়ে এ্যাডভাইজার চৌমুহনী পেরিয়ে বাসায় ফিরে ফুলকুমারীকে ওষুধ খাওয়ালাম। ছেলে সুরঞ্জনেরও জ্বর, সে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছে। তার গলা ব্যথা, ভালো করে গার্গল করতে বললাম। সকাল ন'টার সময় কবি নকুল রায় এলেন আমার বাড়ির মালিক দিলীপ দেবরায়ের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে। নকুল বাবু বোধজং বয়েজ হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের কাছে একটা বইয়ের দোকান দিয়েছেন, রাতের দিকে কবি-সাহিত্যিকরা বেশ আড্ডা জমাচ্ছেন বললেন, সেখানে

যেতে আমন্ত্রণ জানালেন আমাকে। ১০ টায় ফুলকুমারী বেরিয়ে গেলেন অফিসে অসুস্থ শরীর নিয়ে। বড়োমেয়ে নন্দিনী কলেজে বেরোলো ১০.১৫ মিনিটে, ছোট মেয়ে দেবযানী সাড়ে দশটায় গেলো তার স্কুল বিজয় কুমার বালিকা বিদ্যালয়ে। ছেলে সুরঞ্জন শুয়ে রইলো জ্বর বলে। আমি আমার Doctoral Thesis -এর Work-Plan করার জন্যে পড়তে বসলাম সুনীতি কুমারের ও.ডি.বি.এল. নিয়ে। তারপর পড়তে শুরু করলাম ভাষাবিদ Gleason -এর An Introduction to Desriptive Linguistics বই খানি। দুপুরে খেয়ে একটু জিরিয়ে থিসিসের ওয়ার্ক-প্লানটা তৈরী করতে বসলাম। বিকেল ৫ টায় তানিযা (নন্দিনী) দুঃসংবাদ দিলো আমাদের কেরোগ্যাস-স্টৌভ খারাপ হয়ে গেছে। ফুলকুমারী অফিস থেকে ফিরে এই দুঃসংবার শুনে একেবারে ভেঙে পড়লেন। আমাকে গঞ্জনা করলেন গ্যাসের ব্যবস্থা করতে পারিনি বলে। তিনি গা-হাত-পা ধুয়ে বিশ্রাম নিয়ে বললেন, "চলো কামান চৌমুহনীতে স্টৌভ কিনতে।" বেরোলাম তাঁর সঙ্গে। কিন্তু 'নতুন' স্টৌভ পেলামনা. আইতরমায় গেলাম, সেখানেও না। পরে ৭৫ টাকা দিয়ে একটা জনতা স্টৌভ কিনে নিলাম। সুরঞ্জনের জন্যে কিনলাম একটা আপেল ৪ টাকা কুড়ি পয়সা দিয়ে। এরপর সি.পি.আই. অফিসে উঠে সুনীল দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে কামান চৌমুহনী থেকে বাসায় ফিরলাম রাত ৮ টায়।

১ লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ শুক্রবার। খুব ভোরে উঠে ছাঁদঝাঁট দিয়ে, একটু চোখের ব্যায়াম করে, রাত্রিকালীন উচ্ছিস্ট ফেলে দিয়ে গেলাম রাজবাড়ির দীঘিতে স্নান করতে। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়ে স্নান সেরে গেলাম দৈনিক সংবাদ পত্রিকার অফিসে। একখানা দৈনিক সংবাদ হাতে নিয়ে এলাম কর্ণেল চৌমুহনীর ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার অফিসে। সেখান থেকে আমার ছাত্র সুবীরশেখর অধিকারীর হাত থেকে একখানা দর্পণ নিয়ে বাসায় ফিরলাম। বাসায় ফিরে স্ত্রীকে ওষুধ খাওয়ালাম। তাঁর শরীর আজ ভালো ছিলোনা, তাই অফিসে গেলেন না। সকাল ন'টায় শ্যালক বিমল দেববর্মা এলো হেরমা থেকে। তাকে একখানা চিঠি লিখে দিলাম এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেঞ্জের অফিসার জহর আচার্যর কাছে। তারপর আমি গেলাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরার্টরীতে ঢুকলাম প্রথমে। তারপর ডঃ আমেদের সঙ্গে দেখা করে গেলাম ক্যাশ সেকশনে। সেখান থেকে চেক নিয়ে গেলাম কলেজ টিলার স্টেট ব্যাঙ্ক অফিসে। চেক ভাঙিযে ১২.১৫ মিনিটে ভাষাতত্ত্বের ক্লাস করলাম, ক্লাস চললো আড়াইটা পর্যন্ত। ক্লাস থেকে ফিরে দেখি লাইব্রেরীতে অধ্যাপক সত্যেন পাল বসে আছেন আমার অপেক্ষায়। তাঁর একটা লেখা ছাপাতে হবে ত্রিপুরা দর্পন পত্রিকায়। লাইব্রেরীতে কিছুক্ষণ Linguistic Survey of India'র Tibeto-Burman অংশ পড়লাম। বিকেল ৪ টে থেকে ককবরকের সার্টিফিকেট কোর্সের সেসন শুরু হবে, আজ এই সেসনের প্রথম ক্লাস। বিভাগীয় প্রধান ডঃ আমেদের থাকার কথা। কিন্তু তিনি আসতে পারলেননা, তাঁর কোয়র্টারে ডীন ডঃ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক মহাদেব চক্রবর্তীর সঙ্গে একটা জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। আমিই ককবরকের ক্লাস শুরু করলাম। আজকের ক্লাসে ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলো। ক্লাস নিয়ে ডঃ আমেদকে রিপোর্ট করলাম। তারপর আমার থিসিসের বিষয় আলোচনা সেরে বৃষ্টিতে ভিজে বাসায় ফিরলাম রাত ৭ টার সময়। ডঃ আহ্‌মেদের ওখান থেকে বেরোনোর আগে তিনি বললেন, 'দেখুন, শুধু ককবরকের ওপর থিসিস লিখবেন, না ককবরক-দিমাছা-বোডো'র ওপর থিসিস করবেন ?'

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, শনিবার। সারাদিন থিসিসের ওয়ার্ক প্লান করলাম। আজ তাল বড়া খেলাম বাসায়। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বিয়ন্ত সিং নিহত হওয়ায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে আজ ছিলো সরকারি ছুটি। সকালে উঠে প্রাতঃ ক্রিয়াদি সেরে গেলাম রাজবাড়ির দীঘিতে। স্নান সেরে ফেরার পথে দৈনিক সংবাদ ও ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। তারপর গেলাম আচার্য বাবুর দোকানে

মুসুরির ডাল আনতে। বাসায় ডাল রাখতেই স্ত্রী ফুলকুমারী ১০০ টাকার ১ খানা নোট দিলেন বাজার করতে। আস্তাবল বাজারে ঢুকে ৬০ টাকা কেজি দরে সাড়ে ছয়শ গ্রাম ইলিশ মাছ কিনলাম। ২ টাকা দিয়ে এক ট্রাইবাল বিক্রেতার কাছ থেকে মোচা কিনে নিয়ে বাসায় ফিরলাম। মোচা দেখে বৌ বললেন, যাদের কুকুরে কামড়িয়েছে তাদের ভাদ্রমাসে মোচা খেতে নেই। কাজেই মোচাটা আর খাওয়া হচ্ছে না। ভাদ্র মাসে মোচা খেলে জলাতঙ্ক দেখা দেয় কুকুরে কামড়ানো মানুষদের। এই বিশ্বাস ত্রিপুরার ককবরক ভাষাভাষী উপজাতিদের মধ্যে আছে জেনে অবাক হলাম আমি। দেবযানীকে নিয়ে গেলাম টকসাইড ইনজেকশান দিতে ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার কাছে, দেবযানীর পায়ে পেরেক ফুটেছে ।

৩ রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, রবিবার। আজ গেলাম বিশ্রামগঞ্জে স্বামী-স্ত্রীতে ছায়ারানীর শ্রাদ্ধে। দুপুর ১১.৪৫ এ পৌঁছলাম সেখানে বিশ্রামগঞ্জ থানার পাশে পদ্মকুমার দেববর্মার বাড়ি। পদ্ম কুমার স্কুলে মাস্টার -ছায়ারানীর স্বামী। যাবার পথে বটতলা থেকে আমারা ৬০০ জিলিপি নিয়ে গেলাম। আমারা গিয়ে দেখি সুন্দর করে সাজানো শ্রাদ্ধমন্ডপ। রামনগরের মেয়ে-পুরুষে মিলে কীর্ত্তন করছেন। উপজাতি মেয়ে-পুরুষে মিলে এমন কীর্ত্তন সারা ভারতে দেখা যাবে না। বারান্দায় একপাশে ছায়ারানীর বাবা- আমার মামাতো বড়ো শালীর স্বামী রামনগরের সুধন্য দেববর্মা বিষণ্ন হয়ে বসে আছেন। তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম আমি, আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে মৃতের উদ্দেশে 'মাইখ্‌লাই' দেওয়া শুরু হলো। মাইখ্‌লাই দিলো ছায়ারানীর বড়ো মেয়ে। চার কোনায় ৪ টি কঞ্চি দিয়ে তার ওপর পরিস্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। তার ভেতরে রান্না করা মাছ-মাংস, ফলফলারি, পিঠে-মিষ্টি সব রাখা হয়েছে। দু'জন পুরুষ লোক পাশে বসে তাকে দেখিয়ে দিচ্ছিলো কীভাবে মাইখ্‌লাই দিতে হয়। ছায়ারানীর বড়ো মেয়ে তার মৃতা মায়ের উদ্দেশে বাম হাত দিয়ে সব জিনিস আলাদা একটা পাত্রে বেড়ে দিচ্ছিলো। মাইখ্‌লাই দেওয়ার সময় ছায়ারানীর মা পরিমল ও অন্যান্য মেয়েরা কাঁদছিলেন বিলাপ করে। আমি ও কাদতে লাগলাম। মেয়েরা উলুধ্বনি দিতে থাকলো। মাইখ্‌লাই (পিন্ডদান ?) দেয়ার শেষে ছায়ারানীর মেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে সামনের দিকে তাকিয়ে হাত দুটো পেছনে নিয়ে আগুন জেলে দিয়ে, কলার পাতা ছিঁড়ে উঠে এলো পেছন দিকে না তাকিয়ে। তারপর সে স্নান করতে গেলো। তারপর আবার কীর্ত্তন শুরু হলো। এর মধ্যে আগরতলা থেকে একটা গাড়িতে করে বিখ্যাত লেখক শ্যামলাল দেববর্মা, ছায়ারানীর বড়ো ভগ্নীপতি হরিপদ, টিকাজী কর্তার ছেলে ছত্রজিৎ দেববর্মা (ছায়ারানীর খুড়তুতো বোনের স্বামী), ছায়ারানীর কাকা হরেন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত হলেন। সকলে মিলে আমরা শ্রাদ্ধ বাড়ির পিঠে খেলাম তিতো শাক সমেত। মাইখ্‌লাই শেষ হবাব পরে উপস্থিত সকলকে মাছ ও শূকরের মাংস যাচাই করেই খেতে দেয়া হলো। সবশেষে দেয়া হলো চিড়ে-দই। ছায়ারানীর ছোট বোন বেলারানীর স্বামী বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যকে দেখলাম রান্নায় খুব ব্যস্ত। সে আমাকে দেখে সিগারেট লুকিয়ে ফেললো। বিশ্বজিৎ হলো ত্রিপুরার রাজপন্ডিতের ছেলে গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার দৌহিত্র। ট্রাইবাল বাড়ির জামাই সে এখন। বিশ্বজিৎ বিশ্রামগঞ্জে শিক্ষকতা করে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাই পরিমলকে বলে আমরা বিশ্রাগঞ্জ বাজারে এসে বাস ধরলাম। বাসে ওঠার আগে আমার স্ত্রী কিছু বাঁশের কোঁড়ল কিনে নিলেন। সন্ধ্যে ৭ টায় বাসায় ফিরলাম স্বামী-স্ত্রীতে। একটু পরে ধূর্জটি গুপ্ত এলেন লিপি বিতর্কের ওপর একটা লেখা নিতে। পুজো সংখ্যায় ছাপাবে বলে। তাঁকে পাঠিয়েছেন কবি কল্যাণব্রত চক্রবর্তী। একটু বিশ্রাম করছি এমন সময় রাজেন্দ্র কীর্তি শালার জহর আচার্য এলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে রাত্রে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। বিশ্রামগঞ্জ থেকে ফেরার পর অসহ্য মাথার যন্ত্রণা করছিলো। বড়ো মেয়ে তানিয়া বললো, 'শ্রাদ্ধবাড়ি গিয়ে তুমি খুব কেঁদেছো, তাই এত মাথার যন্ত্রণা করছে।'

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, সোমবার। গতরাতে খুব মাথা ব্যথা করেছিলো। তাই খুব ভোরে উঠে রাজ দীঘিতে সাঁতার দিয়ে স্নান করলাম ভালো করে। তারপর ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ফিরতে মাথায় যন্ত্রণা বন্ধ হয়ে গেলো। দুপুর ১ টা পর্যন্ত থিসিসের ওয়ার্ক প্লান রেডি করলাম। এরপর নাজির পুকুর পাড়ে গেলাম এ.ডি.সি'র একসিকিউটিভ মেম্বার কুঞ্জ দেববর্মার সঙ্গে দেখা করতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম ২.১০ এ। ২.৩০ টায় ভাষাতত্ত্বের ক্লাস নিতে গিয়ে দেখি ছাত্র-ছাত্রীরা সব চলে গেছে Indoor games হচ্ছে বলে। তারপর ডঃ আমেদের সঙ্গে দেখা করে গেলাম ক্যাশে ককবরকের ভর্তির লিস্ট আনতে। সেখানে এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার কে. বি. জমাতিয়ার ঘরে বসে অধ্যাপক অরুণোদয় সাহার সঙ্গে বসে চা খেলাম। চা খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি এমন সময় উপাচার্য অধ্যাপক পান্ডের সঙ্গে দেখা। তিনি একটা খাম দিয়ে বললেন, 'আজই এটা ডঃ কমল কুমার সিংহর কাছে পৌঁছে দেবেন। খামের ভেতব মহাত্মাগান্ধীর সম্পর্কে একটা লেখা আছে।' ৪ টের সময় ককবরকেব ক্লাস নিয়ে প্রাক্তন মণিপুরী ছাত্রী অনুপমা সিনহাকে নিয়ে গেলাম ডঃ আমেদের ওখানে তার কমলপুর কলেজে পার্ট-টাইম চাকরির ব্যাপারে। সন্ধ্যে ৬.৩০ এ বাসায় ফিরে গেলাম ডঃ কমল কুমার সিংহর বাড়ি। তাঁকে উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াই.ডি.পান্ডের খাম ও চিঠি দিয়ে চা খেয়ে এলাম ত্রিপুরা দর্পণে। সেখান থেকে গেলাম নন্দলাল কর্তাব বাড়ি জহর আচার্যের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে শ্রী দুলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার কিছু কাজ করে বাসায় ফিরলাম রাত ১০ টায়। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ছিলো আমার বান্ধবী ঊষা গাঙ্গুলির নাটক 'বামা'। সুরঞ্জন নাটক দেখে এসে বললে বেশ ভালো হয়েছে। তাকে ঊষার সঙ্গে দেখা করতে বললাম। গতকাল ব্যস্ত থাকায় ঊষার নাটক দেখতে যেতে পারিনি। আগামী কাল খুব ভোরে আবাব হেরমা বাড়ি যেতে হবে, কাজেই ত্রিপুরায় ঊষা এলেও তার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না, ঊষা কী ভাববে জানিনা। কলকাতায় গেলে ঊষাদের বাসায় থাকি আমি। ঊষা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের বন্ধু। আগে ছিলো ঊষা পান্ডে, তারপর ছাত্রনেতা কমলেন্দু গাঙ্গুলিকে বিয়ে করে হয়ে গেলো গাঙ্গুলি। ৩০ বছর ধরে ঊষার সঙ্গে পরিচয়। ওদের অনেক সুখ-দুঃখেব সাক্ষী আমি। গত জুনমাসে কলকাতায় গিয়ে ঊষাদের বাড়ি গিয়ে দেখি সে অস্ট্রেলিয়ায় গেছে। আজ এলো নাটক করতে ত্রিপুরায়।

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, মঙ্গলবার। ভোর ৩.২০ তে উঠে জরুরি কিছু চিঠি লিখলাম, ছাঁদ ঝাঁট দিলাম, এঁটো ফেললাম, প্রাতঃ ক্রিয়া সারলাম। তারপর ৫টার সময় হেঁটে চলে গেলাম বটতলায়। সেখান থেকে ভোর ৫.৩০ এর বিলোনিয়ার বাসে গেলাম চড়িলাম, সেখান থেকে হেঁটে গিয়ে হেরমা বাড়ি পৌঁছলাম সকাল ৭.৩০ এ। এত সকালে আগরতলা থেকে যেতে দেখে আমার শাশুড়ী মা অবাক হয়ে গেলেন। আমা (আমা অর্থাৎ আমার মা— এটি ককবরক শব্দ) সিঙ্গি মাছ ও চিংড়ি মাছ ভাজা দিয়ে সকালের ভাত খেতে দিলেন আমার ছোট শালা বিমলের সঙ্গে। তারপর বিমল, ওয়াখিরাই ও গৌর কপরার সত্যরঞ্জন দেববর্মাকে নিয়ে হেরমা পাড়ায় সি.পি.আই. এর ১৫শ রাজ্য সম্মেলনের জন্যে চাল সংগ্রহ করতে বেরোলাম। মাত্র ২ ঘন্টার মধ্যে ২১ কেজি চাল তুলে ফেললাম। প্রত্যেক বাড়ি থেকে ১ মালা ২ মালা করে চাল দিয়েছে নির্দ্বিধায়। চাল দেখে শাশুড়ী বললেন তিনি চাল কিনে নেবেন। ২০০ টাকা দিয়ে তিনি ২১ কেজি চাল কিনে নিলেন। ট্রাইবাল বাড়ির চাল সত্যিই সুন্দর, পরিষ্কার ঝকঝক করছে। একটু বিশ্রাম করে আন্দি নদীতে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আশ মিটিয়ে সাঁতার দিয়ে স্নান করলাম। বাড়ি ফিরে বাঁশের কড়ুলের চাখুঁই দিয়ে ভাত খেয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলাম। শাশুড়ী মা একটা থলেতে ভরে শুকনো চিংড়ি মাছ ও চাল কুমড়োর কচি ডগা দিয়ে দিলেন আগরতলায় নিয়ে যেতে। বাড়ি (শ্বশুর বাড়ি) থেকে বেরিয়ে গৌরকপড়া পাড়ায় এসে শ্যালিকা ভারতীর সঙ্গে দেখা

করে গেলাম কামরাজ কলোনিতে পার্টি সম্মেলনের মিটিং করতে। মিটিংয়ে উপস্থিত হয়ে দেখি আগরতলা থেকে কমরেড প্রশান্ত কপালী গেছেন। মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করলেন বাঁশতলীর সেনকুমার দেববর্মা। শচী দেবনাথের উঠোনে বেশ ভালো মিটিং হলো। মিটিং সেরে রাত ৮টায় আগরতলায় ফিরলাম।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, বুধবার। সকালে উঠে The Kokborok Language : A Descriptive Analysis-এর Work-Plan তৈরি করছি, এমন সময় নগেন্দ্র জমাতিয়া এলেন সিকিউরিটি ছাড়া। বললেন, 'চলুন দেওয়ান বাড়ি যাই।' সুপুরি বাগানে তাঁর সঙ্গে গেলাম বঙ্গ ঠাকুর দেওয়ানের বাড়ি। দেওয়ানের পৌত্র জ্যেতিষ দেববর্মা আমাদের আপ্যায়ন করলেন। নগেন্দ্র বাবুকে দেখে তাঁর অদ্ভুত বাচন ভঙ্গিতে বললেন, 'আসুন, মন্ত্রী বাহাদুর আসুন।' নগেন্দ্র বাবু বললেন, 'এখন আর মন্ত্রী নেই।' জ্যেতিষ বাবু বললেন, 'মানলে শালগ্রামশিলা, না মানলে কিছু নয়।'

নগেন্দ্রবাবু বাড়ি ভাড়া দিলেন জ্যোতিষবাবুর ছেলে জয়ন্তর কাছে। বংশী ঠাকুরের মেয়ে গীতা বর্মণের বাড়ি ভাডা জয়ন্তর কাছে জমা দিতে হয়। গীতা হলেন জয়ন্তর পিসি। গীতার মা ও জ্যেতিষ বাবুর মা আপন দুই বোন। ওমলেটের সঙ্গে চা খেলাম। জ্যেতিষ বাবুর পাশে দু'জন ট্রাইবেল ছেলে বসেছিলো তাদের দেখিয়ে জ্যেতিষ বাবু বললেন, 'তারা হলো আমাদেব জ্ঞাতি. থাকে কান্তাকবরা পাড়ায়। আমার ঠাকুরদার বাবা রামকমল ঠাকুর পাহাড় থেকেই শহরে এসেছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষ উদয়পুব, অমরপুর হয়ে কান্তাকবরায় আসেন। তারপর পুরাতন আগরতলা হয়ে নতুন হাবেলীতে।' আমরা বেরিয়ে পড়লাম। নগেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সিকিউরিটি নেই কেন?' তিনি বললেন, 'সিকিউরিটি আর রাখছিনা, টাকা পয়সার খুব অভাব, সিকিউরিটি থাকলে খুব খরচ হয়। এখন থেকে একা একা চলবো।' বলে তিনি গেলেন কর্নেল বাড়ি লেখক নন্দ কুমার দেববর্মা ও পাদ্রী মহানন্দ জমাতিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। আমি ফিরে এসে আবার থিসিসের ওয়ার্কপ্লান তৈরি করতে লাগলাম। ২.৩০ এর সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ৪ টের সময় ককবরক ক্লাস নিলাম। তারপর ডঃ আমেদের সঙ্গে বসে থিসিসের ওয়ার্ক প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করলাম। ডঃ আহ্‌মেদ খুব পন্ডিত লোক, অনেক জায়গায় সংশোধন করে দিলেন। রাত ৮.১৫য় উঠলাম তাঁর কোয়ার্টার থেকে। ৫ টাকা দিয়ে একটা রিক্‌সা নিয়ে চলে এলাম নন্দলাল কর্তার বাড়ি। সেখানে জহর আচার্য রাজেন্দ্র কীর্তিশালার সিলভার জুবিলির চিঠিপত্র লিখছিলেন। আমিও কিছু চিঠি নিয়ে বাসায় এলাম রাত ৯.১৫য়।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, বৃহস্পতিবার। ৫.৩০ এ উঠে ছাঁদ ঝাট দিয়ে এঁটো ফেলে কিছুক্ষণ চোখের ব্যায়াম করলাম। তারপর একটা প্লাস্টিকের থলের মধ্যে গামছা, লুঙ্গি, সঃতেলের শিসি, চিরুনি নিয়ে চলে গেলাম রাধাসাগরে স্নান করতে। বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়ে কর্নেল চৌমুহনী থেকে ত্রিপুরা দর্পণ হাতে নিয়ে পডতে পড়তে বাসায় ফিরলাম। আজ ত্রিপুরা দর্পণের লিড নিউজ ছিলো নৃপেন চক্রবর্তীর জয়—আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন সংক্রান্ত মামলায় তিনি জিতেছেন। হাইকোর্ট অর্ডার দিয়েছে আগামী ডিসেম্ববের মধ্যে আগবতলা পুরসভার নির্বাচন করতে হবে। মামলাটি ছিলো রাজ্যসরকারের বিরুদ্ধে। মামলাটি পরিচালনা করেন তরুণ আইনজীবী শুভাশিস তলাপাত্র। অন্যদিকে সরকার পক্ষের উকিল ছিলেন মিহির দত্ত। আমি মনে মনে বললাম, নৃপেন চক্রবর্তীর জয় না শুভাশিস তলাপাত্রের জয়? বাসায় ফিরে ৫০ টি টাকা নিয়ে গেলাম বংশী ঠাকুরের মেয়ে গীতার বাড়ি নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায়। বেশ ক'মাস আগে নগেন্দ্র বাবুর মারফত অম্পির পরেশ কলইকে দিয়ে জুমের তুলো কিনেছিলাম, কিছু টাকা পরেশ বাবু পেতেন। নগেন্দ্র বাবু বললেন, 'উগ্রপন্থীদের বার বার শিকার হচ্ছে পরেশ কলই, বাড়ি থেকে ক্ষেত গিরস্থি তেমন করতে পারছেন না।' জিজ্ঞেস করলাম, 'মাউইমা (নগেন্দ্র বাবুর মা) কোথায়?' বললেন, 'ফুলকুমারী জমাতিয়ার বাড়ি বেড়াতে

গেছেন ।' গীতার বাড়ির পাশে উকিল শঙ্কর দেবের বাড়ির পাশে ফুলকুমারী জমাতিয়া থাকেন । ফুলকুমারী হলেন বাগমার কাছে বগাবাসার মেয়ে । ৮০'র দাঙ্গায় তাদের পরিবারের ৪২ জন মারা যায়, ফুলকুমারী বেঁচে যায় আগরতলায় ছিলো বলে । আমি ৮০'র দাঙ্গার সময় তাঁর বাসায় গিয়ে ওষুধ দিয়ে এসেছিলাম সি পি আই নেতা অঘোর দেববর্মা বলায় । আজ রাত ৯ টায় ডঃ সিরাজুদ্দীনের কোয়ার্টার থেকে ফিরলাম ।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, শুক্রবার। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস । ভোর ৪ টের সময় উঠে ছাঁদ ঝাঁট দিয়ে এঁটো কাটা ফেলে থিসিসের সিনপসিস লিখতে শুরু করলাম । থিসিসের নাম –The Kokborok language : A Descriptive Study । বুড়ো বয়েসে আমাকে এই থিসিস করতে হচ্ছে পি.এইচ.ডি. করার জন্যে । অথচ প্রায় ৩০ বছর ধরে ককবরক গবেষণা করছি, কবেই থিসিস করতে পারতাম, কিন্তু করিনি । আমার পরে যাঁরা ককবরক চর্চা শুরু করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কোন কালেই এই ভাষার ওপর থিসিস জমা দিয়ে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন । এই থিসিসের ব্যাপারে আমার চিরকাল ছিল একটা অনীহা বোধ । থিসিস করে কি হয় ? থিসিস না করেওত ভাষা চর্চা করে বই লেখা যায় । আর, ককবরক ভাষা আমি এমন ভাবে চর্চা করেছি, যা বোধহয়, কোন একটা থিসিসের পরিধির মধ্যে বাঁধা যায় না । তাছাড়া, সম্প্রতি ককবরকভাষী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ককবরকের ওপর অ-ককবরক ভাষীদের থিসিস দেখে হতাশ । ককবরকের ওপর ইতিমধ্যে তিনজন বাঙালি অধ্যাপক থিসিস করে ডক্টরেট হয়েছেন । তাঁদের মাতৃভাষায় (উপজাতি বুদ্ধিজীবীদের) এঁদের কাজের মান দেখে বিরক্ত । এঁরা বলছেন, 'এতো দিনে ককবরকের ওপর থিসিস-বাণিজ্য শুরু হয়েছে । ককবরককে দেখছি এঁরা গিনিপিগ বানিয়ে ছাড়বেন ।'

আমার থিসিসটা অনেকটা এই রকম : The Origin and Development of the Kokborok Language । সুপন্ডিত ডঃ সুহাস চ্যাটার্জীর সঙ্গে দীর্ঘদিন এই ভাষার ওপর কাজ করেছি, নিজে এই ভাষায় অভিধান সংকলন করেছি, ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছি, এবং আগরতলার 'দৈনিক সংবাদ' কাগজে ধারাবাহিক ভাবে পাঁচ বছর ধরে ককবরক ভাষা শিক্ষার আসর লিখেছি। ককবরক ভাষার সাহিত্যিক বিকাশ নিয়ে মেতে আছি। ১৯৮৩ সালে বইমেলা উপলক্ষে ককবরক কবিতা সংকলন বের করেছি, ককবরকের লিপি বিতর্কের ওপর তাত্ত্বিক বই লিখেছি, বানান বিতর্ক নিয়ে কলম ধরেছি, থিসিস লিখে ডক্টরেট করে কী লাভ ? তবু নানাদিক ভেবে, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুদ্দীন আমেদ আমাকে থিসিস করার অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন । কলকাতার শিক্ষকরাও আমাকে ককবরকের ওপর থিসিস লিখতে বলছেন। বলছেন, 'এতোদিন ধরে তুমি এই ভাষার ওপর কাজ করছো, তুমি ভাষা তত্ত্বের ছাত্র, থিসিস করা তো তোমার হক ।' এইসব চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত পি.এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্যে ককবরকের ওপর থিসিস লিখছি । জানিনে, আমার থিসিসের মধ্যে শুভানুধ্যায়ীরা কী পেতে চান ? যাহোক, থিসিসের সিনপসিস (Synopsis) টাইপ করে আজ আমার গাইড ডঃ আমেদের কাছে জমা দিয়ে এলাম । এই থিসিসের কথা মনে পড়তেই বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্তের একটা উক্তি আমার মনে পড়লো । পান্নালাল বাবু একদিন শান্তিনিকেতনে বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ ও ভারতের অন্যতম উপজাতি-বিশেষজ্ঞ ডঃ বি.কে রায়বর্মণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা রায়বর্মণ সাহেব, টনটন কাগজ তো থিসিস লিখলেন উপজাতিদের ওপর, তাতে উপজাতিদের কী হলো ?' এ-প্রসঙ্গে আরো একটি কথা আমার মনে পড়ে গেলো । একবার কলকাতার জাদুঘরে উপজাতি বিষয়ক একটা সেমিনারে উপস্থিত ছিলাম । ত্রিপুরা থেকে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ডঃ জে.বি. গাঙ্গুলীও ওই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন । প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিয় কিসকু মহোদয়ও উপস্থিত

ছিলেন সেখানে । অধ্যাপক বি. কে রায়বর্মণ সেমিনারের একটা সেসানের সভাপতিত্ব করছিলেন, এমনসময় সেমিনার হলোর মধ্য থেকে তাঁর নৃতত্ত্বের ছাত্র ডঃ পশুপতি মাহাতো উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'রায়বর্মণ সাহেব, আপনি আর কতদিন আমাদের উপজাতি করে রাখবেন ?' আজ আমার উপজাতিদের ভাষা ককবরকের ওপর থিসিস করতে গিয়ে এই সব কথা বারবারই মনে পড়ছিলো। আরো একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। ঐ সেমিনারে আমি সাঁওতাল নেতা প্রিন্সিপাল অমিয় কিসকুকে একসময় একান্তে পেয়ে গেলাম। আমি বললাম, 'স্যার, আপনারা এতো উচ্চ শিক্ষিত লোক রয়েছেন সাঁওতাল সমাজে। আপনারা সব বিভেদ ভুলে গিয়ে একটা ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠন করার চেষ্টা করছেন না কেন? জানেন স্যার, ভারতবর্ষ তো অনেক ভাষাভিত্তিক রাজ্য আছে। আর্য্যরা তো তাদের ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করে নিয়েছে। দ্রাবীড়ারাও করেছে দক্ষিণ ভারতে। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলেও অস্ট্রিক ও তিব্বত-বর্মীয় উপজাতিরাও যার যার রাজ্য করে নিচ্ছে। কেবল বাকী রয়েছে আপনাদের উপজাতিদের একটি অস্ট্রিক রাজ্য। আপনারা তো ভারতবর্ষের আদিমতম অধিবাসী। ভারতে আর্য্য এবং দ্রাবীড়ারা আসার আগে থেকে আপনারা এখানে রয়েছেন। অথচ আপনারা একটা নিজেদের রাজ্য করে নিতে পারলেন না। এটা খুব পরিতাপের বিষয়। পরবর্তীকালে আপনাকেও এই ব্যর্থতার জন্যে আপনাদের উপজাতি জনগোষ্ঠীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।' আমার কথা শুনে তিনি খুব আগ্রহ সহকারে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোন উত্তর দিলেন না। অথচ ত্রিপুরায় আশির মহা জাতি দাঙ্গার পর আমি যখন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই, তখন কিন্তু তিনি ত্রিপুরার উপজাতিদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্যে অনেক কিছু বলেছিলেন। অমিয় কিসকু সাহেব যেমন অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করেছেন তেমনি এক সময়কার সাঁওতাল পরগণার উপজাতিদের মুকুটহীন রাজা জয়পাল সিং মুণ্ডাও বিলেতে পড়াশুনা করেছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। প্রায় একটা ঝাড়খণ্ড রাজ্য করে ফেলেছিলেন তিনি। ঠিক এই সময় পণ্ডিত জহবলাল নেহরু তাঁকে লোভ দেখিয়ে কংগ্রেস পার্টিতে নিয়ে এলেন। তিনি এম. পি.ও হলেন কংগ্রেস পার্টির। কিন্তু ছেড়ে দিলেন ঝাড়খণ্ড রাজ্যের আপোষহীন রাজ্য গঠনের দাবী। যে ভুল একদিন জয়পাল সিং মুণ্ডা করেছিলেন, ঠিক একই ভুল করছেন বিলেতী ডিগ্রিধারী প্রিন্সিপাল অমিয় কিসকু। যাঁকে হাতছানি দিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে গঠনের আন্দোলন থেকে সরিয়ে নিয়েছেন খুব সুচতুর ভাবে। এখানে জহরলাল নেহরু ও তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী একই ভুল করেছিলেন। এই দুই উচ্চ শিক্ষিত নেতা ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনেব আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিলেও ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের আন্দোলন কিন্তু থেমে থাকেনি। একদিন না একদিন এই ঝাড়খণ্ড রাজ্য অস্ট্রিক উপজাতিদের জন্যেই গঠিত হবে। আর তখন জয়পাল সিং মুণ্ডা ও অমিয় কিসকু বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে ঝাড়খণ্ড বাসীদের কাছে চির ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরকের ক্লাস সেরে কলেজ টিলা থেকে লোডশেডিংয়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে যেই নন্দলাল কর্তার বাড়ির কাছাকাছি এসেছি, কবি নন্দ কুমার দেববর্মা কর্নেল বাড়ির দিক থেকে এসে একেবারে সামনাসামনি পড়লেন । বললেন, "চলুন কুমুদবাবু, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বাঙলা নাটকের দুশ'তম বার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার বিভাস চক্রবর্তী ভাষণ দেবেন ।" নাটক বিশেষজ্ঞ ও অভিনেতা বিভাস বাবুর মুখটা সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে ভেসে উঠলো । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় নান্দিকারের রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও বিভাস চক্রবর্তীর কাছে আমরা তালিম নিতাম । তাঁরা আমাদেরকে দিয়ে পিরানদেলোর একটা নাটক করিয়েছিলেন । রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে গিয়ে দেখি অধ্যাপক সরোজ চোধুরী নাটকের ওপর আলোচনায় সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করছেন । এরপর

বিভাস বাবু মনোজ্ঞ ভাষণ রাখলেন সারা ভারতের থিয়েটারের গতি প্রকৃতি নিয়ে। অধ্যাপক বামা পদ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনাও খুব জীবন্ত বলে মনে হলো আমাব কাছে। এরপর নন্দবাবু চা-কেক খাইয়ে আমাকে বাসায় পাঠিয়ে দিলেন, তখন রাত ৮ টা।

৯ ই সেপ্টেমবর, ১৯৯৫, শনিবার। আজ সি.পি. আই পার্টির পঞ্চদশ ত্রিপুরা রাজ্য সম্মেলন শুরু হলো, চলবে ১১ ই সেপ্টেমবর পর্যন্ত। আজ খুব ভোরে উঠে দেখি ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। বটতলা থেকে ৫.৩০ এর বিলোনিয়ার বাস ধরে চড়িলামে যাবার ইচ্ছে। বৃহত্তর চড়িলাম থেকে রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে উপজাতি-অ-উপজাতি জনসাধারণকে আনতে হবে। চড়িলামে যেতে একটু দেরি হলো, পৌছলাম সকাল ৮ টায়। বাস থেকে নেমে বাঙাপানী নদী পেরিয়ে খোলা ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পৌছে গেলাম বাল্লাছড়ি। বাল্লাছড়ি ঢোকার মুখেই পড়লো পুকুড়পাড়ে দীনবন্ধুর চায়ের দোকান। দীনবন্ধু খুব আদর-যত্ন কবে বসিয়ে চা খাওয়ালো আমাকে। তারপর উপস্থিত অন্যান্যদের সামনে ক্যাপটেন চ্যাটার্জী ও আমার গুণকীর্তন করতে শুরু কবলো সে। দীনবন্ধুর চা খেয়ে বাল্লাছড়ির মুসলমান বাড়িব পাশ দিয়ে চললাম কামরাজ কলোনির চৌমুহনীতে। বাল্লাছড়ি পাড়া সংলগ্ন ৫ নং ওয়ার্ডটি গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি.পি আই এব হাতে এসেছে, এই ওয়ার্ডের মেম্বার হলেন গোপাল দেবনাথ। কামবাজ চৌমুহনীতে ঢোকার মুখে সি.পি.আই -এর মহিলা-ফ্রন্টের নেত্রী শচী রানী দেবনাথের সঙ্গে দেখা, তিনি রাজ্য সম্মেলনের মিছিলে লোক আনার কাজে ব্যস্ত। চৌমুহনীতে গিয়ে সি.পি.আই এর ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি গণেশ ভৌমিক ও গোপাল মেম্বারের সঙ্গে মিছিলের ব্যাপারে আলোচনা কবে আমি গেলাম ট্রাইবাল এলাকার মণিরাম ঠাকুর পাড়ায়। সেখানে গিয়ে সেনকুমার দেববর্মা, শৈলেশ দেববর্মা, রতি দেববর্মা প্রমুখেব সঙ্গে বসে আগরতলায় আজকের মিছিল নিয়ে যাবার বিষয়ে আলোচনা কবলাম। তাবা বললেন, সি.পি.এম. ভেতরে ভেতরে সি.পি.আই. এব মিটিংয়ে না যাবার জন্যে প্রচার চালাচ্ছে। মণিরাম ঠাকুর পাড়া থেকে গেলাম পাশের উপজাতি গ্রাম গৌর কপরা পাড়ায়। সেখানে গিয়ে দেখি, যে-উপজাতি মহিলারা আজ সি.পি.আই. এর আগবতলায় জনসভায় যাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই সার্বিক সাক্ষরতা (টি এল. সি.) প্রোগ্রামে যোগ দিতে যাচ্ছেন। প্রচার করা হয়েছে, যারাই পরীক্ষা দেবে, তারাই কুড়ি টাকা করে পাবে। ভগ্নহৃদয় নিয়ে গৌব কপরা থেকে গেলাম নিজের গ্রাম হেরমা বাড়িতে (জনান্তিকে বলে রাখি, আমার শ্বশুর বাড়িব গ্রামকে নিজের গ্রাম বলেই মনে করতাম)। হেরমা বাজারে একটু বসলাম, চা খেলাম অনিল দেববর্মাব দোকানে। এখানে আগরতলায় সি.পি.আই.এর জনসভায় লোক নিয়ে যাবাব জন্যে বাস আসবে। বাড়ি গিয়ে শাশুড়ী মায়েব সঙ্গে মিছিলে যাবাব ব্যাপারে আলোচনা করতেই তিনি তাঁর মাতৃভাষা ককবরককে বললেন, "নরগনি মিটিঙগ বরক মাছাফান' থাঙনাই কৃরুই" (তোমাদের মিটিংয়ে একজন মানুষও যাবে না)। আমিও ককবরকে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "তাঙগৃই"? (কিসের জন্যে) তিনি বললেন, "নরগনি মিটিঙগ থাঙকে সি.পি.এম.নি বরকরগ জলিজাগনাই হুন নরগনি সি.পি.আই পার্টি কংগ্রেসনি খিতুঙ ফুন" (তোমদের মিটিংয়ে গেলে সি.পি.এম. এর লোকেরা রাগ করবে। তোমাদের সি.পি.আই পার্টি নাকি কংগ্রেসের লেজ) আমি হাসতে হাসতে বললাম, "চুঙ তো তাবুক বামফ্রন্টনি শরিক, বাহাইকে চুঙ কংগ্রেসনি খিতুঙ উঙখাবা?" (আমরা তো এখন বামফ্রন্টের শরিক, কী করে আমরা কংগ্রেসের লেজ হলাম?) আব' আঙ ছাইমাইয়া, নরগনি সি.পি.আই. পার্টি বামফ্রন্টনি শরিক উঙফান' চাকরি-বাকরি রুইমাইয়া, চুবাচু রিমাইয়া, নরগনি মিটিঙগ ছাব'থাঙনাই ছুলা" (তা আমি জানি নে তোমাদের পার্টি বামফ্রন্টের শরিক হলেও চাকরি-বাকরি দিতে পারে না, আর্থিক সাহায্য করতে পারে না, তোমাদের মিটিংয়ে কে যাবে?)। শাশুড়ী মায়ের কথা শুনে আমার মনে হলো সারা

এলাকায় একই ধরনের প্রচার চলছে, কাজেই বুঝলাম ট্রাইবেল এলাকা থেকে সি.পি.আই. এর আগরতলার রাজ্য সম্মেলনের মিটিংয়ে একজনও যাবেনা।

শাশুড়ী-মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে আমি স্নান করতে গেলাম আঁদি নদীতে। ফিরে এসে খেতে বসলাম রান্নাঘরে। শাশুড়ী-মা কার্ফু মাছের ঝোল ও শূকরের মাংস দিয়ে ভাত বেড়ে দিলেন। গতকাল শ্বশুর মশায় আঁদি নদী থেকে পোলো দিয়ে পাঁচ-ছটা কার্ফু মাছ ধরেছিলেন। তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে হেরমা বাজারে গিয়ে দেখি আগরতলায় মিছিলে যাবার বাস নিয়ে অপেক্ষা করছে চড়িলামের সি.পি.আই. এর লোকাল কমিটির সেক্রেটারী কমরেড নিরঞ্জন চক্রবর্তী। আমি আসতেই বাস ছেড়ে দিলো। বাসের ভেতরে নিরঞ্জনকে ট্রাইবাল এলাকার পরিস্থিতির কথা জানালাম। বাস এলো কামরাজ চৌমুহনীতে। সেখান থেকে বাঙালি কমরেডরা উঠলেন। বাস এলো চড়িলামে। চড়িলাম থেকে মিছিলের লোক নিয়ে বাস ছাড়লো ইনকেলাব জিন্দাবাদ দিয়ে। বনকুমারী গিয়ে লালসিংমুড়া থেকে আসা মিছিলের বাস পেলাম। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন থেকে ৩.৩০ এ মিছিল বের হলো। রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য জনসভা শুরু হলো বিকেল ৫ টায়। সি.পি.আই.এর কেন্দ্রীয় কমিটির দুই নেতা- কমরেড চতুরানন মিশ্র, কমরেড ফণী বরা, কমরেড সুনীল দাশগুপ্ত ও কমরেড দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত বক্তৃতা করলেন। অথচ সেখানে উপস্থিত ছিলেন কমরেড অঘোর দেববর্মা। উপজাতি-বাঙালি সকলেই তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যে খুবই উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু অঘোর দেববর্মাকে রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা করার জন্যে ডাকা হলো না। গুঞ্জন শুরু হলো উপজাতি জনগনের মধ্য থেকে। তাঁরা ককবরক ভাষায় অঘোর দেববর্মার কাছ থেকে বক্তৃতা শোনার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে মিটিং শেষ। মিটিং শেষ হতেই কমরেড বনোয়ারী ভট্টাচার্য এসে আমাকে বললেন, 'কুমুদবাবু, কমরেড ফণী বরা আপনাকে খুঁজছেন, যান, তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন।' কিন্তু বিভিন্ন কারণে অভিমানে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম না। আমার ওপর তাঁর অনেক প্রত্যাশা ছিল। তিনি চাননি আমি ত্রিপুরার পার্টির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু জড়িয়ে না পড়ে উপায় ছিলনা। রবীন্দ্র শতবর্ষিকী ভবনে সম্মেলন শুরু হলো সন্ধ্যে ৭ টায়। বাড়ি ফিরলাম রাত ৯টায়। বাড়ি ফিরে দেখি আমার ছোট শালা বিমল কয়েকটা কার্ফু মাছ নিয়ে হেরমা বাড়ি থেকে এসেছে। কার্ফু মাছের মুড়ো দিয়ে খুব তৃপ্তির সঙ্গে ভাত খেলাম স্ত্রী ফুলকুমারীর পাশে বসে।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, রবিবার। আজ সকাল ৮ টায় বীরচন্দ্র দেববর্মার দালানে সি.পি.আই পার্টির অফিস আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হলো। উদ্বোধন অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে গেলাম কলেজ টিলার অধ্যাপকদের কাছে সি.পি.আই. এর রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে চাঁদা তুলতে। এম. বি. বি কলেজ-চত্বরে অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সঙ্গে সহসা দেখা। তিনি এন.এস.এস. -এর ছাত্রদের সাফাইয়ের কাজ তদারকি করছিলেন। তিনিও গেলেন আমার সঙ্গে কয়েকজন অধ্যাপকের কাছে। তারপর তিনি সাইকেলে চলে গেলেন তাঁর রামনগরের বাড়ি। আমি কলেজটিলা থেকে ৩৪০ টাকা হাতে নিয়ে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে এসে কমরেড সাহানা সেনগুপ্তর হাতে ৩০০ টাকা জমা দিয়ে দিলাম। তারপর সম্মেলনের বক্তাদের ভাষণ শুনলাম ১২টা পর্যন্ত। সম্মেলনের বিরতি হলো ১২.৩০ এ। বিরতির পর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন থেকে বেরিয়ে গেলাম অধ্যাপক অমিতাভ সিন্হার কাছে চাঁদা আনতে। মুক্ত হস্তে দান করলেন তিনি। ফিরে এলাম বাসায় দু'টোর সময়। খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে ৪টের সময় গেলাম প্রেস ক্লাবে ককবরকের ক্লাস নিতে। গিয়ে দেখি পড়ুয়া-সাংবাদিকরা সবাই তখনো এসে পৌছান নি। ৫ টার সময় আসবো বলে চলে গেলাম রবীন্দ্রশত বার্ষিকী ভবনে সম্মেলনে যোগ দিতে। ৬ টা পর্যন্ত সেখানে থেকে আবার গেলাম প্রেস-ক্লাবে। যেতেই টেলিগ্রাফের

সাংবাদিক শেখর দত্ত ও প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি সুজিৎ চক্রবর্তী বললেন, 'কুমুদদা, আজ ককবরকের ক্লাস বন্ধ থাক, আপনাদের পার্টির সম্মেলন চলছে জানি, আপনি খুব ব্যস্ত, আগামী বুধবারে ক্লাস নেবেন।' প্রেস ক্লাব থেকে বেরিয়ে আবার এলাম রবীন্দ্র ভবনে। রাত ৮ টা পর্যন্ত থাকলাম সেখানে। সি.পি. আই এর এম.পি. কমরেড চতুরানন মিশ্রর ভাষণ শুনলাম খুব তারিফ করে। তারপর বাসায় ফিরলাম রাত ৯ টায়।

১১ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, সোমবার। আজ সি. পি. আই. এর ১৫শ রাজ্য সম্মেলনের শেষ দিন। সকাল ৭টায় বেরিয়ে গেলাম কিছু চাঁদা তুলতে। প্রথমে গেলাম ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার বাড়ি। গিয়ে দেখি তিনি রক্ত নিতে খুব ব্যস্ত। এসময় আর বিরক্ত না করে গেলাম ডঃ কমল কুমার সিন্হার বাড়ি। গিয়ে দেখি তিনি চলে গেছেন এয়ার পোর্টে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক মানস মজুমদারকে রিসিভ করতে। ফিরে এলাম বাসায়। বাসায় ফিরে থিসিসের সিনোপসিস সংশোধন করলাম আমার গাইড ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদের নির্দেশ অনুসারে। এরপর ৬ কপি জেরকস-কপি করলাম সিনোপসিসের। সাড়ে আটটায় গেলাম রবীন্দ্র ভবনে। ৯ টা পর্যন্ত বক্তাদের ভাষণ শুনে চলে গেলাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ডঃ আহ্মেদের সঙ্গে দেখা করে আমার থিসেসের সিনোপসিস কপি দিলাম। তিনি সেগুলো রেকমেন্ড করে পাঠিয়ে দিলেন ডীনের কাছে। ফিরে এলাম সাড়ে ১১টায় রবীন্দ্র ভবনে সম্মেলনে যোগ দিতে। একটার সময় সম্মেলনের খানা খেতে বসলাম রবীন্দ্র ভবনের চত্বরে। আমার সামনে বসেছিলেন সম্মেলনের প্রতিনিধি এক মগ মহিলা। তিনি রহস্য করে বললেন, "হ্ কমরেড, সম্মেলনে সব কইলো ট্রাইবেলরা উগ্রপন্থী, কিন্তু বাঙ্গালিরা যে উগ্রপন্থী সে-কথা তো কেউ কইলো না। উগ্রপন্থী তো আমাদের ঘরের পুলাপান এতান। তাদের ধইরা দিতে তো মায়া লাগে, ডরও লাগে।" খুব রেলিশ করে মহিলার কথা গুলো শুনলাম। সম্মেলনের খানা সেরে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলাম। সেখানে ২.১৫-৩.১৫ পর্যন্ত ভাষাতত্ত্বের ক্লাস নিয়ে আবার ৪ টে থেকে ককবরকের ক্লাস নিতে শুরু করলাম। ৫.১৫ পর্যন্ত ক্লাস নিয়ে ডঃ আমেদের সঙ্গে দেখা করে চলে এলাম আবার রবীন্দ্র ভবনে সম্মেলনে যোগ দিতে। গিয়ে দেখি, দিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য পার্টি কংগ্রেসের ডেলিগেট ঠিক হয়েগেছে। তবে কমরেড অঘোর দেববর্মা ডেলিগেট হতে পারেননি। এই নিয়ে দেখলাম ট্রাইবাল কমরেডরা বেশ ক্ষুব্ধ। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের গেটের পাশের চায়ের দোকানে বসে বসে ডাঃ যুধিষ্ঠির দাশ, কিরীট দত্ত, চড়িলামের প্রতিনিধি গোপাল দেবনাথ, নিরঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখের সঙ্গে বসে চা খেলাম। একটু বাদে সেখানে এলেন অধ্যাপক জলধর মল্লিক। তিনি আমাকে বললেন, " কুমুদবাবু, উষা গাঙ্গুলি কলকাতা থেকে আগরতলা এসেই আপনাকে খবর দিতে বলেছিলেন। আপনি তাঁকে একখানা চিঠি দেবেন"। উষার আগরতলা আসার কথা শুনেই আমার মন চলে গেল কলকাতায় অধ্যাপক কমলেন্দু গাঙ্গুলি ও উষা গাঙ্গুলির বাড়িতে। উষা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ব্যাচ মেট। সে পড়ত হিন্দী আর আমি তুলনামূলক ভাষা তত্ত্ব। ছাত্রনেতা কমলেন্দু গাঙ্গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় তার তারপরে বিয়ে। তাদের বিয়ের বৌভাতের ভাঁড়ারের দ্বয়িত্বে ছিলাম আমি। উষা বিশ্ববিদালয়ে থাকতে নাটক করতো। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কলেজে অধ্যাপনা করার সাথে সাথে সে তাঁর বন্ধুদের নিয়ে রঙ্গ কর্মী নামে এক হিন্দী নাট্য গোষ্ঠী গড়ে তোলে। পরবর্তী কালে রঙ্গকর্মী নাট্যগোষ্ঠী খুব নাম করে। সঙ্গে সঙ্গে উষারও নাম ছড়িয়ে পড়ে। আমি অনেক সময় রিহারসেলে উপস্থিত থাকতাম। মাঝে মধ্যে আসতেন তৃপ্তি মিত্র রিহারসেলে নির্দেশনা দিতে। আমি বিয়ে করে আমার উপজাতি বৌ নিয়ে উষা কমলদাদের ১১৮ নং বিবেকানন্দ রোডের বাসায় উঠি। তাঁরা আমাদের ফুল সজ্জার ব্যবস্থা করেছিলো। সেই উষা আগরতলা এলো, অথচ আমার সঙ্গে

দেখা হলো না মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল । আর যাঁরা আমাকে খবর দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁরাই বা তাঁদের দায়িত্ব পালন করলেন না কেন ? ঠিক করলাম কালই উষাকে কলকাতায় একখানা চিঠি দেবো অনুযোগ করে ।

আরো কিছুক্ষণ বসলাম, সদ্যসমাপ্ত সম্মেলনের ভালমন্দ দিক নিয়ে সবাই আলোচনা শুরু করলেন। আমাকে অনেকেই বললেন, খেয়ে যান কমরেড, শেষ খানায় মাংস আছে । সাহানা সেনগুপ্তও আমার কাছে টাকা চাইতে এসে খেয়ে যেতে বললেন । কিন্তু খেলেম না। সি.পি.আই.এর সদ্যসমাপ্ত সম্মেলনের বেসুরো কথা ভাবতে ভাবতে ডেরায় ফিরলাম রাত ৮.৩০ এ ।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, মঙ্গলবার । খুব ভোরে উঠে নন্দলাল কর্তার বাড়ির সামনে দিয়ে কচি ঘাসের ওপর পা ফেলতে ফেলতে স্নান করতে গেলাম প্রেস ক্লাবের পাশের রাজদিঘিতে । আজ অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার দিলাম । ক'দিন ধরে পার্টির সম্মেলনের কাজে ব্যস্ত থাকায় রাজদিঘিতে এসে আর নাওয়া হয়নি । স্নান সেরে দৈনিক সংবাদ ও ত্রিপুরা দর্পণ পড়তে পড়তে বাড়ি ফিরছি, তখন কর্নেল বাড়ির সামনের চায়ের দোকান থেকে কবি নন্দকুমার দেববর্মা দরাজ গলায় ডাকলেন, 'কুমুদবাবু চা খাবেন?' আমি গিয়ে তাঁর পাশে বসতেই বললেন, 'চলে গেলেন ধীরেন কৃষ্ণ ।' আমি বললাম, 'ত্রিপুরা দর্পণে আপনি ধারাবাহিক ভাবে লিখুন কিছু তাঁর সম্পর্কে ।' বললেন, 'হ্যাঁ অনেক চিঠি আছে তাঁর আমার কাছে ।' আমি বললাম,' সেইযে বছর ১৫ আগে আপনাতে-আমাতে গেলাম ধীরেন কৃষ্ণের শান্তিনিকেতনেব অবন পল্লীর বাড়ি, তখন থেকে শুরু করুন ।' এ-সময় একটা কথা মনে পড়লো । বছর ১৫ আগে পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির কর্ণধার পার্থ সেনগুপ্তর ডাকে গেলাম কলকাতায় নন্দবাবু আর আমি । সাক্ষরতার সেমিনার শেষ হলে পর নন্দবাবু বললেন, 'চলুন কুমুদবাবু, একবার শান্তিনিকেতন থেকে বেড়িয়ে আসা যাক, আপনি তো শান্তিনিকেতনে ছিলেন, সব চেনেন।' চলে এলাম একদিন শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী চেপে । উঠলাম পূর্বপল্লীর গেস্ট হাউসে । পরের দিন গেলাম শিল্পী ধীরেন কৃষ্ণের বাড়ি । শিল্পীর সঙ্গে কবি নন্দকুমারের পরিচয় করিয়ে দিলাম তাঁর আঁকার ঘরে । বেশ কিছুক্ষণ ছিলাম আমরা । নন্দবাবু বেশ খুঁটিযে খুঁটিয়ে ধীরেন কৃষ্ণের অনেক ছবি দেখলেন, তাঁর সঙ্গে ত্রিপুরাব নানা বিষয় নিয়েও কথা বললেন । শিল্পীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেষ্ট হাউসে আসার পথে নন্দ বাবু বেশ উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, 'এতোবড়ো শিল্পী ধীরেন কৃষ্ণ, কিন্তু একটা ছবিও দেখলাম না ত্রিপুরার ওপরে, ত্রিপুরার ট্রাইবালদের নিয়ে একটা ছবিওতো চোখে পড়ল না, তাহলে বলুন, তাঁকে নিয়ে আমাদের গর্ব করবার কী আছে ? আর বোধ হয় ককবরক ভাষাও জানেন না তিনি । এই তো আমাদের বিখ্যাত শিল্পী ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মা, যাকে নিয়ে ত্রিপুরার ট্রাইবালরা এত গর্ব করে । আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন । সারাজীবন এখানেই আছেন, ত্রিপুরার জন্যে আর কী করেছেন ? '

নন্দবাবুর এই কথা শুনে আমি বেশ ব্যথিত হলাম, একজন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা ! কিন্তু আগরতলায় ফিরে দেখি ব্যাপারটা অন্য । নন্দবাবু নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতে শুরু করেছেন ধীরেন কৃষ্ণকে, চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে নন্দবাবু বেশ ভক্তও বনে গেছেন শিল্পী ধীরেন কৃষ্ণের । একেই বলে কবির মন।

১৩ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, বুধবার । আজ ৭৪৩ নং ফ্লাইটে কলকাতা থেকে বন্ধুবর অধ্যাপক স্বপন বসু ও ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে । তাঁরা বিভূতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের শতবর্ষ উপলক্ষে বাঙলা বিভাগ আয়োজিত সেমিনারে ভাষণ দেবেন । তাছাড়া অসিত বাবু কিছু থিসিস দেখবেন । খুব ভোরে উঠে রাজ-দীঘি থেকে স্নান সেরে দৈনিক সংবাদের

হকারদের ভীড় ঠেলে একখানা দৈনিক সংবাদ বগলদাবা করে বাসায় ফিরলাম । ঠিক ৮.২৫ এ বেরিয়ে পড়লাম ডঃ কমলকুমার সিন্হার বাড়ির দিকে । ওখান থেকেএয়ারপোর্টে যেতে হবে । কমলবাবুর বাড়ি যাবার পথে শ্রীমতী করবী দেববর্মণের বাড়ি ঢুকে তাঁকে বিভূতিভূষণ-সেমিনারে যোগদানের নিমন্ত্রণ পত্র দিলাম । ডাঃ নীলমণি দেববর্মাকেও যেতে বললাম ম্যাডামের সঙ্গে । করবীদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা কমলবাবুব বাড়ি । গিয়ে শুনি কমলবাবু শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকারের জরুরী টেলিফোন পেয়ে চলে গেছেন । ফিরবেন ৯ টার মধ্যে । একটু বসতেই ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সুদীপ বসু এলেন তাঁর স্ত্রী মৌসুমীকে নিয়ে । তাঁরাও যাবেন এয়ারপোর্টে তাঁদের পরিচিত অতিথিদের স্বাগত জানাতে । সুদীপ আবার স্বপন বসুর ছাত্র । সুদীপের বাবা অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু আবার আমার মাস্টারমশায় । স্বপন বসু ও আমি শঙ্করী বাবুর কাছে বঙ্গবাসী কলেজে বাংলায় অনার্স পড়েছি সেই ৬০ এর দশকের একেবারে প্রথম পাদে । পরে আমি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে এম.এ. পড়তে চলে যাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে । স্বপন আমার ৩৪ বছরের বন্ধু, কলকাতায় গেলে তাঁদের বালিগঞ্জের বাড়িতেই থাকি । কমলবাবু এলেন ঠিক ৯.৩০ এ । আমরা আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম এয়ারপোর্টের দিকে । আমাদের যেতে একটু দেরী হয়ে গেছিলো, তাই টেনশনও ছিলো বেশ। কিন্তু না, গিয়ে দেখি, প্লেন এক ঘন্টার মতো লেট । ভেতরে ঢুকে দেখি, ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদ, ডঃ শিশির কুমার সিংহ ও ডঃ মঞ্জরী চৌধুরী অপেক্ষা করছেন ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বপন বসুকে স্বাগত জানাতে । আমি একটু বেরিয়ে গেলাম । কমলবাবু গাড়িতে বসে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেন। আমি যেতেই বললেন, 'চলুন কিছু খেয়ে আসি ।' এয়ারপোর্টের গেটের সামনে নতুন একটা বিরাট রেস্টুরেন্ট হয়েছে । সেখানে ঢুকে পড়লাম দুজনে । কমলবাবু ঘুগনি ও কোল্ড ড্রিংস-এর অর্ডার দিলেন । থাম্পসআপ-এ ঝোলা গুড়ের গন্ধ পেলাম । কমলবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'আগরতলায় তৈরী থাম্পসআপ ।' প্লেন ল্যান্ড করতেই আমরা অতিথিদের স্বাগত জানালাম । অসিতবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে একটা গাড়িতে ডঃ আমেদ, ডঃ সিংহ ও ডঃ চৌধুরী চলে গেলেন রাজর্ষি । কমলবাবুর সঙ্গে আরেকটা গাড়িতে ডঃ স্বপন বসু, সুদীপ, মৌসুমী ও আমি । কমলবাবু পথে রাজর্ষিতে নেমে গেলেন । আমাদের গাড়ি এলো প্রথমে আমার বাসায় । স্বপনের আনা সরস্বতী মিশ্রের দেওয়া মিষ্টির প্যাকাট পুত্র সুরঞ্জনের হাতে দিয়ে চলে গেলাম মেলার মাঠে সুদীপের বাসায় । সেখানে স্বপন দুপুরের খাবার খাবে । গাড়ি নিয়ে আমি চলে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসে । সেখানে অধ্যাপক মানস মজুমদার ও ডঃ কমলকুমার সিংহের সঙ্গে লাঞ্চ খেলাম । অধ্যাপক মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন বাংলা বিভাগের ক্লাস নিতে । গেস্ট হাউসের কুক মধুসূদন শর্মার রান্না খেয়ে প্রশংসায় একদম পঞ্চমুখ । লাঞ্চের পর বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা এসে কবিতা পড়ে শুনালো, ছাত্রীরা গানও গাইল । অধ্যাপক মজুমদার তারিফ করলেন তাঁদের গান । কমলবাবু শুয়ে শুয়ে একটু বিশ্রাম করছিলেন । সন্ধ্যের দিকে সুদীপ স্বপনকে নিয়ে এলো । আমরা গেস্ট হাউস থেকে ডঃ আমেদের কোয়ার্টারে গেলাম । বাড়ি ফিরলাম রাত ৯ টায় ।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, বৃহস্পতিবার । আজ বন্ধুবর স্বপন বসু দুপুরে আমাদের বাসায় খাবে। স্ত্রীও ছুটি নিলেন আজ, ছেলে-মেয়েরা কেউ-ই স্কুল কলেজে গেল না । ঠিক সাতটার সময় আমি বাজারে গেলাম, স্ত্রী ১০০ টাকার একখানা নোট দিলেন হাতে বাজার করতে । আস্তাবল বাজারে গিয়ে ৫০ টাকা দরে এক কেজি দুশ গ্রাম আস্ত মোরগ কিনে কেটে নিলাম । তারপর কাটা ইলিশ ৪৫০ গ্রাম ৮০ টাকা দরে কিনলাম, এরপর ৫০ টাকা দরে ১০০ গ্রাম পুঁটি মাছ কিনে দেখি ১০০ টাকা শেষ । বাসায় ফিরে ফুলকুমারীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আবার ফিরে এলেম আস্তাবল বাজারে । দুটো ছোলা

নারকেল নিলাম ৮ টাকা দিয়ে। ৪টে চালতে পেলাম ২ টাকায়, কাগজী লেবু ট্রাইবাল বাড়ির তিনটে কিনলাম ২ টাকায়। তারপর ১ টাকার পান নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। সকাল ১০টায় বেরোলাম আমি স্বপনকে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউস থেকে নিয়ে আসার জন্যে। গেস্ট হাউসে গিয়ে দেখি বন্ধুবর আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। দেখলাম অধ্যাপক মানস মজুমদার কলকাতার উদ্দেশে এয়ারপোর্ট চলে গেছেন। ইতিমধ্যে রামঠাকুর কলেজের অধ্যাপক সত্যেন পালও এলেন। স্বপনের সঙ্গে সত্যেনবাবুর আগের থেকে পরিচয়। স্বপন বলল, 'দ্যাখো আয়ুব, আমি ২.৩০ এ তোমাদের বাংলা ক্লাস নেব' সেইভাবেই তোমাদের বাসা থেকে আসতে হবে। স্বপন আমাকে আয়ুব বলে ডাকে। কলকাতার কলেজে পড়বার সময় আয়ুব খাঁর দেশ থেকে এসেছিলাম বলে এই অদ্ভুত নামটি দিয়েছিলো আমাদের সহপাঠি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ছেলে অরূপ। আমার সেই নাম এখনো বেঁচে আছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের মুখে। স্বপনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম একটা রিক্সায়। প্রথম এলাম কর্ণেল চৌমুহনীর ত্রিপুরা দর্পণের অফিসে। দর্পণ-সম্পাদক সমীরণ রায় ও ড. পার্থসারথি চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। ড. চক্রবর্তী স্বপনের লেখার সঙ্গে পরিচিত। দেশে প্রকাশিত অনেক লেখাই তিনি পড়েছেন তাঁর। তিনি সন্ধ্যেবেলায় নন্দলাল কর্তার বাড়ির গ্যালারি ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ-য় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সমীরণের ওখান থেকে কর্ণেল বাড়ির পাশ দিয়ে আসতে আসতে স্বপনকে বললাম, 'ওই দ্যাখো, কর্ণেল বাড়ি, ওখানে রবীন্দ্রনাথ এসে থাকতেন।' বললাম, 'রবীন্দ্রনাথ যে মহিলাকে দেখে "রজনী না পোহাতে জাগালে না কেন, বেলা হল মরি লাজে" লিখেছিলেন তিনি শতবর্ষ হয়ে মারা গেছেন ক'বছর আগে। স্বপনকে নিয়ে শ্রীযুত দিলীপ দেবরায়ের বাড়ি আমার বাসায় এলাম। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতেই আমার বড় মেয়ে নন্দিনী ও ছোট মেয়ে দেবযানী তাদের কাকাকে স্বাগত জানাল প্রণাম করে। আমার স্ত্রী ফুলকুমারীও এলেন। পুত্র সুরঞ্জন ক্যামেরা আনতে বেরিয়ে গেছে। স্বপনের সঙ্গে আমাদের পরিবারের ছবি তুলবে বলে। স্বপনকে আগরতলায় আমাদের বাসায় পেয়ে সে-যে কী আনন্দ! পঁয়ত্রিশ বছরের বন্ধুত্ব, স্বপনের বাড়িতে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করতাম। কলকাতায় গেলে থাকি তার বাড়ি, পুজোর সময় জামাকাপড় কিনে দেয় আমাদের। কিন্তু ত্রিপুরায় সে কখনো আসেনি—এই প্রথম আসা। আর স্বপনের বউ পুষ্প, যাকে আমি বউমা বলে ডাকি, গত জুন মাসে যখন আমার ছেলে সুরঞ্জনের কানের অপারেশনের জন্যে যাই, তখনও আমাকে নিয়ে বালিগঞ্জ বাজারে গিয়ে আমাদের পরিবারের সবরকমের পরিধেয় বস্ত্র কিনে দিয়েছিলো। আমার বাসায় আড়াই ঘন্টার মত রইল; আমার দু'মেয়ে প্রথম সরবত খাওয়ালো তাদের কাকাকে। আমরা দু'বন্ধুতে মিলে শিক্ষা জগতের নানা রকমের কথা বললাম, আমার ভাষার কাজ নিয়ে আলোচনা হল। স্বপন একবার বলেছিল, আমার ককবরক অভিধান পশ্চিমবঙ্গের বাংলা একাডেমী ছাপতে পারে। একটু পরে ডাইনিং টেবিলে ভাত বাড়া হল। স্বপনকে খেতে দেওয়া হয়েছে বাঁশকড়ুলের বড়া, বাঁশ-কড়ুলের গোদক পুঁটিমাছ দিয়ে—এগুলো ত্রিপুরার ট্রাইবাল খানা। আর তার সঙ্গে আছে বাঙালি খানা—ডাল, মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি। স্বপন ইলিশ মাছ খেলোনা ভাপানো বলে। অন্য সব কিছুই খেল কম কম করে। আসলে স্বপন বেশি খেতে পারে না — একেবারেই পরিমিত আহার। তার এই স্বল্পাহার দেখে আমার স্ত্রী হতাশ হলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের বাসা থেকে স্বপনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার পথে তাকে রাজবাড়িটা দেখিয়ে দিলাম। একেবারে ভেতরে নিয়ে গিয়ে। রাজবাড়ি দেখে খুব মোহিত হল সে। রাজবাড়ি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে স্বপন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্লাস নিল একটা। বিকেলে তাকে নিয়ে এম বি বি কলেজ দেখালাম, মুগ্ধ হলো সে। তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্টহাউসে রেখে বাড়ি ফিরলাম।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, শুক্রবার। খুব সকালে উঠে সাক্ষরতার উপর একটা প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলাম। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের ওপর ড. সিরাজুদ্দীন আমেদ একটা প্রবন্ধ লিখতে বলেছিলেন এবং আজই তা দিতে হবে। লেখাটা বাধাপ্রাপ্ত হলো পর পর বিভিন্ন অতিথির আগমনে। প্রথমে এলেন হেরমা গ্রাম থেকে আমার কাকিশাশুড়ী জ্যোৎস্না দেববর্মা। তিনি সি পি এম পার্টির ক্লাস করতে এসেছেন আর সি পি আই জামাই'র বাসায় এসেছেন স্নান সারতে। তিনি ককবরক ভাষায় বললেন, "রবিবারও' নগ ফাইদি, কোঅপারেটিভন তুইউই ককলাম ছালাইআনু"—আগামি রবিবারে বাড়ি এস, কোঅপারেটিভের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে। লেখা একটু এগোতেই এলেন এক মণিপুরী ভদ্রলোক, আমার ছাত্রী অনুপমা সিনহার দাদা। অনুপমা বাংলায় এম এ পাশ করে কমলপুর কলেজে ঢুকবার চেষ্টা করছে, সেই ব্যাপারে তাব দাদা আলোচনা করতে এসেছেন। লেখাটা প্রায় শেষ হবার মুখে, ঠিক তখন এলেন সিনেমা-পরিচালক দেবাশিস সাহা। তিনি ত্রিপুরার উপজাতিদেব ফোক ডিজাইনের উপর একটা ডকুমেন্টারি করতে চান। দেবাশিস বাবু চলে গেলে সাক্ষরতাব ওপর লেখাটা শেষ করলাম কোনরকমে। দশটার সময় রিক্সা চেপে বেরিয়ে পডলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। পথে পূর্বাশায় স্ত্রীকে নামিয়ে দিয়ে সোজা চলে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। বারোটা থেকে শুরু হবে বিভূতিভূষণ শতবর্ষের ওপর সেমিনার। আমি গেস্ট হাউসে ঢুকে স্বপনকে নিয়ে চলে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি দেখাতে। তার পব সেখান থেকে নিয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালযের কাউন্সিল রুমে। বারোটায় সেমিনার শুরু হলো। সেমিনার উদ্বোধন কবলেন উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াই ডি পাণ্ডে। সেমিনারেব সভাপতি হলেন বাংলা সাহিত্যেব ইতিবৃত্তের লেখক ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ড. স্বপন বসু বসলেন উপাচার্যের পাশে। উপাচার্য মহোদয় বিভূতিভূষণের ওপর লিখিত বক্তব্য পাঠ কবলেন বাংলাতেই। সুন্দর লাগলো তার বাংলা উচ্চারণ। বিভূতিভূষণের ওপর বক্তব্য রাখলেন শ্রীমতী অপরাজিতা রায়, ডঃ শিশির কুমার সিনহা, ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদ, ডঃ মঞ্জরী চৌধুরী, সবশেষে স্বপন বসু। বিশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ মহাদেব চক্রবর্তী, অধ্যাপক সত্যব্রত ভট্টাচার্য, শ্রীমতী করবী দেববর্মণ, ডাঃ নীলমণি দেববর্মা, ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাসশাস্ত্রী, অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা মণিকা নন্দী প্রমুখ। স্বপন বসু বললেন বিভূতি সাহিত্যে ইতিহাস চেতনাব উপর। বিদগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ তার বক্তব্য গভীর আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন। বিভূতি সাহিত্যে ইতিহাস চেতনা নিয়ে এধরনের আলোচনা এই প্রথম। ডঃ আমেদ শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভূতি সাহিত্য আলোচনা করলেন। অপরাজিতা রায় বললেন বিভূতিভূষণের সাহিত্যে আধুনিকতার ওপর। মঞ্জরী চৌধুরী বললেন বিভূতি সাহিত্যে নারী চরিত্র। ডঃ শিশির কুমার সিনহা আলোচনা করেন, 'বিভূতিভূষণের প্রকৃতি চেতনা এবং আরণ্যক উপন্যাসের অনন্যতা'- এই বিষয়ের ওপর। বক্তব্য শেষে আলোচনায় অংশ নিলেন শ্রীমতী করবী দেববর্মণ, ডঃ দাসশাস্ত্রী, অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও বাংলা বিভাগের একজন ছাত্র। সভাপতিব ভাষণে ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের ওপর এক মনোজ্ঞ আলোচনা কবলেন যা চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকবে। শেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখলেন ড. কমল কুমার সিংহ। সেমিনারের পুরো তদারকির দায়িত্বে ছিলেন তরুণ অধ্যাপক সুদীপ বসু। সেমিনার শেষ হলো মিষ্টিমুখ দিয়ে। সেমিনার শেষ হলে পর উপাচার্যের ঘরে গিয়ে ছবিও তোলা হল অসিত বাবুকে নিয়ে। গেস্ট হাউস থেকে স্বপন বসুকে নিয়ে গেলাম পূর্বাশায়। সেখানে আমার স্ত্রী স্বপনকে একটা মণিপুরী বিছানার চাদর—লাইসেম্পি উপহার দিলেন, স্বপনের মেয়ে চিনিকে দিলেন কলমদানি। সুদীপ ও সুদীপের স্ত্রী মৌসুমী স্বপনকে উপহার দিল বাঁশের ময়ূর। স্বপনকে নিয়ে ফিরলাম ডঃ আমেদের কোয়ার্টারে। সেখানে নৈশভোজ খেয়ে আমি পা বাড়ালাম বাড়ির দিকে।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, শনিবার। আজ বন্ধুবর স্বপন বসু কোলকাতায় চলে যাবেন। সকাল সাড়ে আটটায় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম। সেখানে গিয়ে দেখি ডঃ আমেদ তার সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁকে দিয়ে বিল সই করিয়ে নিচ্ছেন যাতায়াত ভাড়া দেয়ার জন্যে। একটু পরই ডঃ কমলকুমার সিংহ এলেন গাড়ি নিয়ে স্বপনকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম সুদীপ বসু ও তার স্ত্রী মৌসুমীর জন্যে। অধ্যাপক সুদীপ বসু স্বপনের ছাত্র। ৯.৪৫ বেজে গেল, তবু সুদীপ আসছে না। কাজেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। স্বপনকে একটু গুছিয়ে দিতে থাকলাম আমি। ডঃ আমেদ, কমলবাবু বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। স্বপন আমাকে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার পারিতোষিক হিসেবে পাওয়া পুরো টাকাটা আমাকে দিয়ে বললো, 'এটা রাখ, আয়ূব। তোমার দু'মেয়ের পুজোর জামাকাপড় কিনে দিয়ো।' স্বপন ডঃ আমেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলো। গাড়িতে কমলবাবু আর আমি। গাড়ি সুদীপকে খুঁজতে কমলবাবুর বাড়ি হয়ে মেলার মাঠে সুদীপের বাসায় গেল। কিন্তু তাদের পাওয়া গেলো না। দশটা কুড়িতে গাড়ি ছুটলো এয়ারপোর্টের দিকে, এগারটায় প্লেন ছেড়ে যাওয়ার কথা। এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি কোলকাতা থেকে প্লেন এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি ভেতবে ঢুকে দেখি সুদীপ ও তার স্ত্রী অপেক্ষা করছেন। স্বপন বিদায় নিয়ে প্লেনে গিয়ে উঠলো। এইসময় আমার চোখ পড়লো শ্রীমতী অসীমা দেববর্মার দিকে। চীন থেকে বিশ্ব মহিলা সম্মেলন সেরে ফিরছেন তিনি। এয়ারপোর্ট থেকে আমরা সোজা চলে এলাম রাজর্ষিতে। সেখান থেকে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে গেলাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. সেমিনারে যোগ দিতে। ঠিক বারোটায় সেমিনার শুরু হলো। অধ্যাপক মানিক দেব তাঁর "রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্য ঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক" নামীয় থিসিসের পাঁচ হাজার শব্দ সম্বলিত সন্দর্ভ পড়লেন। তিনি গবেষণা করছেন ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাসশাস্ত্রীর অধীনে। অধ্যাপক দেব তাঁর সন্দর্ভ পড়া শেষ করতেই ড. শিশির কুমার সিংহ, ডঃ দুলাল চক্রবর্তী, ডঃ আমেদ আলোচনায় অংশ নিলেন। আমিও বললাম কিছু। এবপর ডঃ আমেদেব কাছে গবেষণারত সখীচরণ স্কুলের হেডমাস্টাব সুধীর চন্দ্র মজুমদাব তাঁর গবেষণাপত্র পড়লেন। আলোচনায় অংশ নিলেন ডঃ শিশির কুমার সিংহ, ডঃ মঞ্জরী চৌধুরী, ডঃ দুলাল চক্রবর্তী এবং পরিশেষে আমি। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সবশেষে গবেষণাপত্র দু'টির খুঁটিনাটি আলোচনা করে তা গ্রহণ করলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পি. এইচ. ডি. কমিটিতে আলোচনাব জন্য বিভাগিয় প্রধান ডঃ আমেদের ঘরে ঢুকলেন। পি.এইচ.ডি. কমিটিতে বসে নতুন দু'জনের গবেষণার কাজ রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনুমোদিত হল। এই দু'জনের মধ্যে আমি একজন। আমার থিসিসের নাম The Kokborok Language : A Descriptive Study

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, রবিবার। আজ সকাল সাতটার সময় এলেন প্রাক্তন মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, সঙ্গে বডিগার্ড যুগল দেববর্মা। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে আমার এখানে এসেছেন বাসায় ফেরার পথে। আমিও বেরিয়ে পড়লাম তার সঙ্গে। নাজিরপুকুরের পাড়ে দ্রাহুকুমার রিয়াং-এর বাসার পাশ দিয়ে যেতেই সেখানে ঢুকে পড়লাম আমরা। প্রাক্তন মন্ত্রী আশ্রয় নিয়েছেন তেলের টিনের ছাউনি দেয়া একটা কাঁচাঘরে। অথচ শুনেছি, দ্রাহুকুমার মন্ত্রী থাকাকালীন লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছেন। তাঁর এই বাসা দেখে বিরোধীদের বক্তব্যকে বিশ্বাস করতে চাইলো না আমার মন। এই বাসার ভাড়া নাকি পাঁচশো টাকা। দ্রাহুবাবুর গারো স্ত্রী সুন্দর বাংলায় নগেন্দ্রবাবুকে বললেন, 'আমি যখনই রুটি তৈরি করি তখনই তুমি আস। বসো, রুটি খাও।' দ্রাহুবাবু আজ রবিবারে চার্চে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। মন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর কাছে অনেকবার গেছি আমি। তাঁর স্ত্রীকে সুন্দর বাংলা বলতেও শুনেছি। আসলে

তার স্ত্রী গারো মেয়ে—লক্ষ্মীছড়ায় বাপের বাড়ি । গারোরা বাংলা একটু ভালো বলতে পারেন । বামফ্রন্ট সরকার প্রাক্তন মন্ত্রী ও এম এল এদের পেনশন বন্ধ করে দেওয়ায় মারাত্মক বিপদে পড়েছেন উপজাতি যুব সমিতির মন্ত্রী এম এল এরা । নগেন্দ্রবাবু বললেন, 'যাক, নৃপেনবাবু আমাদের পেনশন বন্ধের কথা বিধানসভায় তুলে ভালই করেছেন, মনে হয় এবার কিছু একটা হবে।' দ্রাহুবাবু বললেন, 'কিছু একটা কর নগেন্দ্র, মরে গেলাম তো ।' দ্রাহুবাবুর বাসা থেকে চা-রুটি খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা । আমি গেলাম ডঃ কমলকুমার সিংহের বাড়ি, নগেন্দ্রবাবুর বাসার পাশ দিয়ে। যাবার সময় বলে গেলাম ফেরার পথে ঢুকব । কমলবাবুকে গিয়ে বললাম, 'মঞ্জরী ম্যাডামকে নিয়ে যাবেন গাড়িতে করে। তিনি ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার স্ত্রীকে সি-অফ করবেন এয়ারপোর্টে গিয়ে ।' কমলবাবু বললেন, 'ডঃ মঞ্জরী চৌধুরী যাবেন না আমাদের গাড়িতে, তিনি ফোন করে বলেছেন।' কমলবাবুর স্ত্রীর হাতে চা খেয়ে ফিরে এলাম নগেন্দ্রবাবুর বাসায় । আমার মারে (বান্ধবী) পবিত্ররাণী জমাতিয়া 'সিমের মহ্নদেঙ' (কাঁচালংকা দিয়ে সিমের ভর্তা) সমেত 'আওয়াঙ ছকরাঙ' (একপ্রকার উপজাতীয় পিঠে) এনে দিলেন আমাদেরকে এক থালা করে । কিন্তু ভর্তাটা এত ঝাল যে তা দিয়ে আমি পিঠে খেতে পারলাম না, শুধুই খেয়ে নিলাম লোভনীয় সুস্বাদু জমাতিয়া বাড়ির পিঠে । নগেন্দ্রবাবু দেখলাম চোখের জল ফেলতে ফেলতে দিব্যি খেয়ে নিলেন । আমি বললাম, 'হার মানলাম আমি, ট্রাইবেল বাড়ির জামাই হয়েও এমন সুস্বাদু ভর্তাটা খেতে পারলাম না আমি । ' আমার কথা শুনে হেসে ফেললেন তিনি। ইতিমধ্যে আমার বান্ধবী চা এনে দিলেন । আমি চা খেতে খেতে কোনরকমে ঝালের তীব্রতা কমালাম । আমাদের সামনেই একটা মুরগি ডিম পাড়ার জন্যে ঘরের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করছিল, পেছনে ছিল একটা মোরগ । আমাদের দেখেই তার অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল । আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ডিম পাড়ল মুরগিটা, আর সঙ্গে সঙ্গে তার সাথী মোরগটা কক্ কক্ করে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল । নগেন্দ্রবাবুকে বললাম আমি, একেই ককবরক প্রবাদে বলে — তকমা তুইথানি তগলা অচাই (মুরগি ডিম পাড়ার সময় মোরগ পুরোহিত) । নগেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা বলুন তো ? মুরগি ডিম পাড়ার সময় মোরগ এমন ছটফট করতে করতে কক্ কক্ করে ডাকে কেন ?' উনি আমার প্রশ্ন শুনে অবাক হলেন। আমি বললাম, 'আমার মনে হয়, ডিম পাড়ার সময় মুরগির প্রসববেদনার মতো কষ্ট হয়, আর তাই তার স্বামী-মোরগ অস্থির হয়ে কক্-কক্ করে সমবেদনা জানায় ।' নগেন্দ্রবাবু ব্যাখ্যার তারিফ করলেন । তবে তিনি বললেন, 'আমার কি মনে হয় জানেন কুমুদবাবু, মোরগ বোধহয় মুরগির ডিমগুলোকে পাহারা দেয় যাতে কাক বা বেড়াল কেউ এসে ওগুলো না খায় ।' আমিও নগেন্দ্রবাবুর যুক্তি ফেলতে পারলাম না। বললাম, 'তা-ও হতে পারে ।' নগেন্দ্রবাবুর বাসা থেকে ফিরে সারাদিন বাসায় থাকলাম । বাঁপায়ের পাতাটা আবার কাল থেকে ফুলেছে । রাতের বেলায় একুশ শতক পত্রিকার সম্পাদক শুভব্রত দেব এসে আগামিকাল বিশ্বকর্মা পুজোয় তাদের ক্যাপ্টন ছাপাখানায় যেতে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন ।

১৮ ই সেপ্টেম্বর , ১৯৯৫, সোমবার। আজ সারাদিন-ই ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ককবরক পরীক্ষার খাতা দেখলাম । সন্ধ্যে বেলায় আমরা স্বামী-স্ত্রীতে গেলাম শুভব্রত দেবের বাড়ি বিশ্বকর্মাপুজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, সঙ্গে আমাদের দু'মেয়ে-নন্দিনী ও দেবযানী । শুনলাম, পুত্র সুরঞ্জন একটু আগেই বিশ্বকর্মাপুজোর প্রসাদ নিয়েগেছে । রাত্রে ফিরে দেখি সুরঞ্জন ' North-Eastern Panorama' নামে শিলং থেকে প্রকাশিত একখানা News Magazine নিয়েও এসেছে সেপ্টেম্বর সংখ্যার । তাঁতে কক্বরক-লিপিবিতর্কের ওপর সাংবাদিক কে.সি.চৌধুরীর একটা লেখা আছে । আমার একটা ছবিও বেরিয়েছে তাতে ।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, মঙ্গলবার । বাঁ পায়ের ব্যথা নিয়েই একই রিকসায় চেপে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেরোলাম স্ত্রী ফুলকুমারীকে নিয়ে । তাঁকে জেলরোডের মহারাজ বীরবিক্রম সরণীর 'ত্রিপুরা হ্যান্ডলুম হ্যান্ডি ক্রাফটস্ ডেভোলপমেন্ট করপোরেশন' এ নামিয়ে দিয়ে আমি গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে । বাঙলা বিভাগের ল্যাঙ্গুয়েজ লেবরাটরিতে ঢুকে ককবরক পরীক্ষার খাতা দেখলাম কিছুক্ষণ । ১২.১৫ তে গেলাম ভাষাতত্ত্বের ক্লাস নিতে । ইন্দোইয়োরোপিয়ান ভাষা বংশের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও তার সঙ্গে ইন্দো-ইরানিয়ান বংশের ভাষগুলোর ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা পড়ালাম দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের । পাশের ক্লাসে ফার্স্ট-ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীদের বাঙলা ভাষা তত্ত্বের ক্লাস নিচ্ছিলেন বিভাগীয় প্রধান ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদ । ক্লাসে তিনি আজ বাঙলা ধ্বনির বিচার-বিশ্লেষণ শেখালেন প্লেস অফ্ আর্টিকুলেশন ও ম্যানাব অফ্ আর্টিকুলেশনের মানদন্ডে । ক্লাস শেষে দু'জনেই তাঁর বিভাগীয় প্রধানের ঘরে ফিরে এলাম । সেখানে ডঃ আমেদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাশশাস্ত্রী ও অধ্যাপক নিখিল দাশ অপেক্ষা করছিলেন । অধ্যাপক দাশ তাঁর ডক্টরেটের জন্যে ৪০০০ শব্দের সন্দর্ভ জমা দিয়েছেন সেদিন সেমিনারের মাধ্যমে। তিনি গবেষণা কবছেন ত্রিপুরা রাজ্যে ল্যাঙ্গুয়েজ প্লানিংয়ের ওপর । তাঁর গাইড হচ্ছেন অধ্যাপক ডঃ রমেন্দ্র বর্মণ । বিকেল ৪টে থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত ককবরক ক্লাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রাজেন্দ্রকীর্তিশালার রৌপ্য জয়ন্তী উপলক্ষে চিঠি বিলি করতে । প্রথমে গেলাম কলেজ টিলায় ডঃ মহাদেব চক্রবর্তীর কাছে । সেখান থেকে বেরিয়ে লেকের পাড়ে কোয়ার্টারে ডঃ দীপক চৌধুরীর কাছে, সেখান থেকে আগরতালর মিউজিয়ামেব কিউরেটর রত্না দাসের কোয়ার্টারে । তাবপর রিক্সায় চেপে এলাম প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তর বাড়ির সামনে অধ্যাপক হীরেন শূরেব বাড়ি । তাঁকে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার চিঠি দিলাম লেখা দেয়াব জন্যে । তরপর পায়ের ব্যাথা নিয়ে হেঁটেই ফিরলাম বাসায়, ৪ টাকা বাঁচলো ।

২০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, বুধবার । খুব ভোরে উঠে রাজ-দীঘিতে সাঁতার দিয়ে দৈনিক সংবাদ ও ত্রিপুরা দর্পণ বগলদাবা করে বাসায় ফিরে দেখি ইকোনমিক্স-এ এম.এ. পাশ করা বেকার যুবক পরিতোষ পাল অপেক্ষা করছে । তাঁকে নিয়ে গেলাম নাজির পুকুর পাড়ে রতন আচার্যের বাড়ি। রতনবাবু ট্রাইবেল রিসার্স ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার । লোকেন দাশ মশায় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর থাকা কালীন N I R D 'ব গৌহাটি সেন্টাব একটা কাজ করেছিলো ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্টের আর্থিক সহায়তায় । উপজাতীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্প গুলোর সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর এই কাজ । আমি এই কাজের ফিল্ড সুপারভাইজব ছিলাম । পরিতোষ ছিলো ইনভেস্টিগেটর । পরিতোষ ও ট্রাইবাল রিচার্সের অরুণ দেববর্মাকে নিয়ে আমি উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় গবেষণা মূলক অনুসন্ধান চালিয়ে ছিলাম । কিন্তু বেশ ক'বছব হয়ে গেলো, এন.আই. আর.ডি. এখনো ফাইনাল রিপোর্ট দেয় নি । পরিতোষ তার কাজের একখানা সার্টিফিকেট চায় । তাই রতন আচার্যের কাছে যাওয়া । তিনিও সরকারি অফিসার হিসেবে আমাদের সঙ্গে Schedule Canvass করেছিলেন । আমি রতনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা রতন বাবু, ট্রাইবাল রিচার্সের ম্যাগাজিন 'TUI' এর এডিটোরিয়াল বোর্ডের চিঠি পাইনে অনেক দিন, ব্যাপার কী ?' রতনবাবু বললেন, 'মানিকলাল রিয়াং ট্রাইবাল রিচার্সের ডিরেক্টর হবার পর মন্ত্রীর নির্দেশে কমিশনার 'TUI' ম্যাগজিনের এডিটোরিয়াল বোর্ড পুনর্গঠিত করেছেন ।' এই এই পুনর্গঠিত বোর্ডে আপনি বাদ পড়েছেন । আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কাদের নিয়ে এই বোর্ড পুনর্গঠিত করা হলো ?' উত্তরে তিনি বললেন, ডঃ বামাপদ মুখার্জী ও ডঃ মহাদেব চক্রবর্তী এই পুনর্গঠিত এডিটোরিয়াল বোর্ডে এসেছেন । আমি বললাম, 'খুব ভালো কাজ করেছেন কমিশনার সাহেব, এবার থেকে 'TUI' এর গুণগত মানের বেশ পরিবর্তন হবে ।'

রতন আচার্যের নাজির পুকুর পাড়েব বাড়ি থেকে নিজের ডেরায় ফিরে সারাদিন বাড়ি থেকে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের O.D.B.L (The Origin and Develompment of Bengali Language) পড়তে শুরু করলাম। সুনীতি বাবু Linguistic Survey of India- প্রণেতা জর্জা আব্রাহাম গ্রীয়র্সনের কাছ থেকে তাঁর জগৎবিখ্যাত এই বইয়ের ভূমিকা লিখে নিয়েছিলেন। গ্রীয়র্সন সাহেবের ভূমিকাটার দিকে আমার নজর গেলো। O.D.B L এর 'Foreward' এব এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "The palace of comparative grammar cannot be built without bricks. and the bricks are made up of the facts of each particular language' । ভূমিকার আরেক জায়গায় ভাষাচার্যকে প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন. 'Endowed with a thorough familiarity with Bengali, -his native tongue, -he has been able to bring together an amount of material which no European could ever have hoped to collect, and he has had the further advantage of pursuing his theoretical studies under the guidanc of some of the greatest European authorities on Indian philology". মন্তব্যে মনটা ভরে গেলো আনন্দে। অন্যদিকে ভাষাচার্য তাঁর এই অমূল্য গ্রন্থের Preface-এ লিখেছেন "While I was in England Sir George Grierson took a personal interest in my work, an interest which manifested itself in many ways and which he in his kindness and his love of science still retains. This has benefited me to the greatest degree imaginable, and the fellowship of common studies with this doyen of Indo-Aryan Linguistics wihch it has been my very great fortune to enjoy, has been, along with my coming in similar personal touch with Professor Jules Bloch, an inspiration in my studies and my labours; and I may say the same of my coming to know Professor Meillet, the savant and the teacher". ভাষাচার্য সুনীতি কুমারকে প্রণাম। আমরা যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে এম.এ. পড়ি, তখন তিনি জাতীয় অধ্যাপক। আমরা তাঁকে তাঁব জাতীয় গ্রন্থাগারের অফিস থেকে প্রতি মঙ্গলবারে নিয়ে যেতাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গথিক ভাষা পড়ানোব জন্যে। আমাদের 'Gothic' ক্লাসে আমাদেব সঙ্গে বসে পড়তেন তাঁবই জ্ঞানতাপস ছাত্র ডঃ সুকুমার সেন--আরেক ভাষাচার্য। আজ অতীতের কত কথাই না মনে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেব। সেখান থেকে ত্রিপুরায় পাড়ি, কাজ ককবরক গবেষণা।

২১শে সেপ্টেম্বর. ১৯৯৫, বৃহস্পতিবার। রাত ৪ টের সময় উঠে ছাদ ঝাঁট দিলাম। তারপরে খালি হাতে ব্যায়াম করলাম কিছুক্ষণ। ছাদ থেকে নেমে এঁটো-কাটা ফেলে দিলাম বাইরের ডাস্টবিনে। ভোর ৫.১৫-এ খালি পায়ে সুপুরি বাগানের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মানিক চক্রবর্তীর দোকানের পাশের গলিতে ঢুকে তেলাকুচোর পাতা সংগ্রহ করে ফিরে আসতেই দেখি কমল চক্রবর্তী মশায় তাঁর দালানের বারান্দায় পায়চারি করছেন খালি গায়ে। মুখোমুখি হতেই তাঁর লোহার গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললেন, 'বলুন,' স্যার, দেশের অবস্থা কেমন ?' বললাম, 'দেশের অবস্থা আর কী, আমাদের ত্রিপুরা সরকারকে নৃপেন চক্রবর্তী মশায় অসভ্য, বর্বর বলেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী- এম.এল.এ দের ভাতা আটকানোর জন্যে।' কমলবাবু বললেন, 'চমৎকার। তবে নৃপেনবাবুর কথা বলবেন না, রাজ্যটা যে কোনো অবস্থায় চলছে না তার জন্যে তিনিই তো দায়ী।' বললাম, 'তিনি তো আর সরকারে নেই।' উনি একটু গলা ঝাড়া দিয়ে বললেন, 'সরকারে না থাকলে কী হবে, সবাইতো তাঁর হাতে গড়া। তাঁরা এখন সরকার চালাতে পারেন না কেন ? বলি রাজ্যটায় চলছে কী, শুনি। মন্ত্রী অনিল সরকার বললেন, পাহাড়ে যদি উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চলতেই থাকে তবে বাঙালিরাও হাত গুটিয়ে বসে

থাকবে না। বলুন দেখি, এ-ধরনের সাম্প্রদায়িক কথা বলার পর তাঁর আর মন্ত্রী থাকা চলে ? দেখুন, যা খবর পাই এ.ডি.সি. এলাকায় অনেক বাঙালির ঘর-বাড়ি পুড়ছে, তারা ট্রাইবাল এলাকা ছেড়ে চলে আসছে। বাঙালি এলাকাতেও কেমন যেন থমথমে ভাব, পুলাপানরা ট্রাইবাল ছেলেদের দেখাদেখি যদি বাঙলাদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে, তবে কী হবে বলুন তো রাজ্যটার ?' আমি বললাম, 'নৃপেন ঠাকুর তো আছেন, ভয় কী ?'

দুপুরের দিকে উমাকান্ত একাডেমীতে গেলাম আমার এক শালার ডেট অব বার্থ সার্টিফিকেট বের করার জন্যে। তারপর গেলাম শিক্ষা বিভাগে আমাদের এক ছাত্রী অনুপমা সিনহার কমলপুর কলেজে পার্ট-টাইম লেকচারার হওয়ার ব্যাপারে ড: বামাপদ মুখার্জির কাছে দরবার করতে। নিজের লিঙ্গুস্টি পোস্টের ব্যাপারেও আলোচনা করলাম তাঁর সঙ্গে। তিনি পাঠালেন অধ্যাপক জে এম দাশের কাছে। অধ্যাপক দাশের সঙ্গে কথা বলে ৩.১৫ নাগাদ চলে এলাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরকের ক্লাস নিতে। ৫.১৫ মিনিটে ক্লাস শেষ হতেই চলে এলাম মহারাজ বীরবিক্রম স্টেডিয়ামের পাশে কবি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোয়ার্টারের কাছে। কোয়ার্টারে ঢুকতে যাবো, এমন সময় দেখি কবিবর সস্ত্রীক বসে আছেন স্টেডিয়ামের সিঁড়িতে যৌথভাবে দামাল ছেলেকে ধরে। পাশে গিয়ে বসলাম আমি কবি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'জেলের ভেতর জেল'-এর লেখিকা মীনাক্ষী সেনের পাশে। ছেলেটা বছরখানিক হয়েছে, বেশ দুরন্ত, মা-বাবার কোল থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে চায়। কথা বলতে লাগলাম আমি তার সঙ্গে। বেশ ভাব জমে গেলো মুহূর্তের মধ্যে। তার আগ্রহী শিশু-চোখ আমার চশমার দিকে। এর মধ্যে বাদামঅলা এলো সামনে। মীনাক্ষী দু'টাকার বাদাম কিনে ভাগ করে দিলেন। বাদাম খেতে খেতে কথাবার্তা চলতে লাগলো। ছেলেটার মুখেও বাদামের ছোট্ট ছোট টুকরো দিতে লাগলেন মীনাক্ষী। কবিবর আমার পুত্রকে বললেন ২৬ তারিখ কবিতা পাঠের আসরে আসতে, আকবরও যাবে সুরঞ্জনকে বলতে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে কলকাতায় যাবেন, বুজোতে ?' বললেন, '২৯ তারিখ (সেপ্টেম্বর) নাগাদ চলে যাবো।' বললাম, 'এর মধ্যে সুনীল (সুনীল দেববর্মা ককবরকের লেখক) কে নিয়ে আসবো একদিন ককবরক ছোটগল্প বাঙলায় অনুবাদ করার ব্যাপারে আলোচনা করতে।' এবার উঠে পড়লাম আমি। বললাম, 'এবার উঠি, আজ আমি আপনাদের ডেরায় ঢুকবো না।' সন্ধ্যে ঘোর হয়ে এসেছে, তাঁরাও উঠে পড়লেন। চেয়ে দেখলাম স্টেডিয়ামের সিঁড়িতে পাখি বসতে শুরু করেছে জোড়ায় জোড়ায়। একটা রিক্সায় বাসায় ফিরলাম। সত্যেনবাবুদের ছেড়ে রিক্সায় যেতে যেতে একটা কথা মনে পড়লো। বিয়ের অনেক বছর পর সত্যেনবাবু ও মীনাক্ষীর ছেলে হয়েছে। হামাগুড়ি দিতে শিখেছে সে। সত্যেনবাবু একদিন বললেন, 'কুমুদদা, ককবরক ভাষায় ছেলেটার সুন্দর একটা ডাকনাম রাখতে চাই। একটা মিষ্টি নাম দেবেন তো ককবরক ভাষায়।' আমি বলেছিলাম, 'কাহাম (ভালো) এই ডাকনামটা রাখুন পুত্রের।' সেই ছেলে আজ হাঁটতে শিখেছে। তরতর করে স্টেডিয়ামের সিঁড়ি বেয়ে ক্রিকেট মাঠে নামতে চায়। সে কি ভবিষ্যতে তার কাকা সম্বরণ ব্যানার্জি হতে চায় ?

২২ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, শুক্রবার। সকালে স্নান সেরে আস্তাবল বাজারে যাবার পথে সুনীলের বাসায় ঢুকে বললাম কবি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোয়ার্টারে যাবার ব্যাপারে। ঠিক হলো, আগামী রবিবার সকাল দশটা নাগাদ সুনীল ও আমি যাবো সত্যেন বাবুর কোয়ার্টারে ককবরক ছোটগল্প বাঙলায় অনুবাদ করার ব্যাপারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ক্লাস ছিলো ১২.১৫ থেকে। গিয়ে দেখি ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করে এয়ারলাইনস করপোরেশনের দিকে যাচ্ছে বিমান ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ করতে। ফিরে এলাম ডঃ আমেদের কোয়ার্টারে। আমি ঢুকতেই সুদীপ (অধ্যাপক সুদীপ বসু) ও এলো।

দেখলাম, ডঃ আমেদ একটা রেডিও টক্ লেখার ব্যাপারে খুব ব্যস্ত, ১.৩০ নাগাদ রেকর্ডিং। টক্‌টা- সাংবাদপত্রে সমাজ চেতনা-এমন একটা কিছু। সুদীপ বললো, 'চলুন কুমুদদা, আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরাটরিতে বসে একটা ক্যাসেট শোনাবো।' দিন কয়েক আগে অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো আগরতলা কেন্দ্র থেকে সুদীপের লেখা একটা সমীক্ষা প্রচার করেছিলো ত্রিপুরার লেখকদের হাল আমলের লেখা নিয়ে। সুদীপ তারই ক্যাসেট বাজিয়ে শোনালো। আগরতলা ও ত্রিপুরার মফঃস্বলের লেখকদের সাহিত্যচর্চা নিয়ে লেখা সমীক্ষাটা বেশ ভালোই লাগলো। সমীক্ষায় আমার ছেলে সুরঞ্জনের নাম দু'বার আছে। প্রথমবার আছে বাঙলা কবি হিসেবে, আরেকবার আছে ককবরকের লেখক হিসেবে। আমার নাম আছে একবার গবেষক-লেখক হিসেবে। সুদীপের ক্যাসেট শুনে আমি ককবরকের খাতা দেখতে শুরু করলাম। চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ককবরক ক্লাস নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

২৩ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, শনিবার। ভোরে উঠে রাধাসাগরে গিয়ে স্নান সেরে বাসায় না ফিরে সোজা চলে গেলাম আস্তাবল বাজারে। সেখান থেকে ১০ টাকা দিয়ে ঘুসো চিংড়ি কিনে নিয়ে সুনীলকে আরেকবার কবি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোয়ার্টারে যাবার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাসায় ফিরলাম। আজ সারাদিন ধরে একটা প্রবন্ধ লিখলাম- 'লিপিবিতর্কের গোলক ধাঁধায় ককবরক ভাষা,' বেরবে আগরতলার একটা পত্রিকার পুজো সংখ্যায়। বড়ো মেয়ে তানিয়া কলেজ থেকে ফিরলো সন্ধ্যে ৬ টায়। পায়ে হেঁটে কলেজ টিলা থেকে বাড়ি এসেছে প্রাইভেট পড়ে। স্ত্রীও ফিরলেন ওই একই সময় অফিস থেকে। এমন সময় এলেন বিধানসভার ডেপুটি সেক্রেটারি নরেশ দেববর্মা। তার সঙ্গে বেরিয়ে এ্যাডভাইজার চৌমুহনীতে গিয়ে হীরালালের দোকানে চা খেলাম, খাওয়ালেন আমার দাদাশ্বশুর নরেশ বাবুই। তারপর সেখান থেকে গেলাম বান্ধবী পবিত্ররানী জমাতিয়ার বাসায়। বন্ধু নগেন্দ্র বাবু ছিলেন না, গ্রামে গেছেন। বন্ধবীর বাসায় উমাকান্ত স্কুলের ছাত্র নকুলেন্দ্র মলসুমকে পেলাম। সে অম্পি ইস্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে সায়েন্স নিয়ে এগারো ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। তার সঙ্গে বসে মলসুম ভাষার ওপর কিছু ডেটা নিলাম। মলসুম ভাষায় আমি ভাত খাই --বুকু নেকেত, তুমি ভাত খাও-- বু নু নেকেত। বু অর্থ ভাত, কু অর্থ আমি, নেকেত অর্থ খাই। মলসুম ভাষায় বাক্যে প্রথম কর্ম, পরে কর্তা এবং তারপরে ক্রিয়া পদ ব্যবহৃত হয়। ককবরকের সঙ্গে এই প্যাটার্ন মেলেনা। ককবরকে আগে কর্তা, মাঝে কর্ম, শেষে ক্রিয়া-- অনেকটা বাঙলার মতো। বান্ধবী দুধ ছাড়া চা খাওয়াতেই বাসায় ফিরলাম আমি বান্ধবীর দেওয়া পান চিবুতে চিবুতে। ফেরার পথে আচার্য বাবুর দোকান থেকে ৪ টাকা দিয়ে রুটি কিনলাম বড় মেয়ে তানিয়ার জন্যে। কাল সকালে সে কলেজ টিলায় প্রাইভেট পড়তে যাবে।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, রবিবার, মহালয়া। ভোর ৪ টের সময় উঠে দেখি রেডিওতে মহালয়ার গান বাজছে। ৫টায় টি.ভি.তে মহালয়ার বিশেষ অনুষ্ঠান শুনে রাজ -দীঘিতে সাঁতার দিয়ে দৈনিক সংবাদ ও দর্পণ পত্রিকা নিয়ে বাসায় ফিরলাম। তার পর গেলাম আস্তাবল বাজারে মাছ আনতে। ১০ টাকায় ২০০ গ্রাম খেচকি মাছ ও ৫ টাকায় একভাগা কুচো চিংড়ি কিনে বাসায় এলাম। ফুলকুমারী হলদি পাতায় মুড়ে ট্রাইব্যাল কায়দায় খেচকি মাছ ভাপালেন। এই প্রকার ভাপানো ক্রিয়ার জন্যে ককবরকে 'ইক' ক্রিয়া পদ ব্যবহৃত হয়। দারুণ স্বাদ হলো খেতে 'ইকজাক' খেচকি মাছ। সন্ধ্যে বেলায় গেলাম সি.পি.আই. অফিসে, মিটিং ছিলো সেখানে। ফেরার পথে জহর আচার্যের সঙ্গে দেখা রবীন্দ্র পরিষদের সামনে। আগামীকালের মিটিংয়ে যেতে বললেন রাজেন্দ্র কীর্তিশালার। রবীন্দ্র পরিষদে ঢোকার ইচ্ছে ছিলো অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। উঁকি মেরে দেখি সেখানে বার্ষিক সভা চলছে পরিষদের। তাই আর ঢুকলাম না। কর্নেল চৌমুহনী এসে ডাক্তার তাপস

আচার্যের কাছ থেকে হোমিওপ্যাথিক-ওষুধ আনলাম পুত্র সুরঞ্জনের জন্যে। গতকাল থেকে তাঁর সর্দি হয়েছে।

২৫ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, সোমবার । কৃষ্ণ সাগরে সাঁতার দিয়ে দৈনিক সংবাদ ও ত্রিপুরা দর্পণ নিয়ে সাড়ে ছটার মধ্যে বাসায় ফিরলাম। ছেলেকে তুলে ওষুধ খাওয়ালাম। অভয়নগর থেকে প্রাইভেট পড়ে ছোট মেয়ে দেবযানী ফিরে এলো সকাল সাড়ে নটায়। তাকে আজ ইস্কুলে না গিয়ে বাসায় থাকতে বললাম তার দাদার অসুস্থতার জন্যে। তানিয়া কলেজে গেলো, তাঁর কি যেন পরীক্ষা চলছে। স্বামী-স্ত্রীতে দশটায় বেরিয়ে পড়লাম। ফুলকুমারীকে পূর্বাশায় নামিয়ে দিয়ে আমি গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে গিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরাটরির দরজা খুলতে গিয়ে দেখি দরজার আঙটায় একটা কাগজের মোড়কের মতো কী যেন বাঁধা। আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। আমি বাঙলা বিভাগের পিওন মজিদ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের পিওন সুভাষকে ডেকে এনে দেখালাম। মজিদ বেশ সাহস করে মোড়কটা আঙটা থেকে খুলে বের করতেই দেখা গেল তার ভেতর বেশ কিছু বেলপাতা ও ফুল রয়েছে। অবাক হয়ে গেলাম আমরা। আমি সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদকে জানালাম ব্যপারটা। ডঃ আমেদের কোয়ার্টারে তখন বসে ছিলেন খোয়াই কলেজের অধ্যাপক নিখিল দাশ। তিনি বললেন, 'ওভাবে খোলা উচিত হয়নি মোড়কটা, পুলিশকে খবর দেয়া উচিত ছিলো।' তাঁর কথা শুনে ডঃ আমেদ হেসে উঠলেন, বললেন, 'শেষে বোমা সন্দেহে পুলিশ দেখতো মোড়কের মধ্যে শুধুমাত্র ফুল আর বেলপাতা। খবরের কাগজে দারুণ নিউজ হতো-- ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা সন্দেহে ফুল ও বেল পাতার মোড়ক উদ্ধার।' এরপর ডঃ আমেদকে নিয়ে ভি.সি.'র বিল্ডিংয়ে গেলাম। লিঙ্গুয়িস্ট পোস্টের প্রোফর্মা পূরণ করতে। এস্টাব্লিশমেন্ট সেকশানের মৃণাল বাবুর সঙ্গে আলোচনা করে ডঃ আমেদ প্রোফর্মার ক'টা কলাম পূরণ করে দিলেন। তারপর আমি গেলাম ডঃ জগদীশ গণচৌধুরীর কোয়ার্টারে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার চিঠি দিতে গিয়ে দেখি তার ঘর বন্ধ, শুনলাম তিনি নাগপুর গেছেন দলীয় কাজে। ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাশ থেকে ৩০৬০ টাকার একখানা চেক নিয়ে অধ্যাপক সুখেন্দু দেববর্মার সঙ্গে গেলাম কলেজটিলার স্টেট ব্যাঙ্কে চেক ভাঙাতে। সুখেন্দু বাবু ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। সম্পর্কে আমার কাকা শ্বশুর। এম.এ করেছেন শিলংয়ে, এম.ফিল. ও করেছেন সেখানে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম উপজাতি-অধ্যাপক তিনি। ব্যাঙ্কের ক্যানটিনে চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম ককবরক ভাষায়, 'নিনি, এম.ফিলনি বিষয়বস্তু তাম' (আপনার এম. ফিল-এর বিষয় বস্তু কী ?) উনি ইংরেজিতে বললেন 'Christianity in Tripura'. । আমি বললাম, 'একেবারে নতুন বিষয় বস্তু।' তিনি বললেন, 'এই কাজে আমাকে বাঙলাদেশে যেতে হবে তথ্য সংগ্রহ করতে।' জিজ্ঞেস করলাম, আমি, 'আপনি ক্যাথলিক না ব্যাপটিস্ট ?' উত্তরে বললেন, 'ব্যাপটিস্ট।' সুখেন্দু বাবুর বাবা সুধাংশু দেববর্মা ডেপুটি কালেক্টর (ডি.সি.) বাড়ি চড়িলামের কাছে চন্ডীঠাকুর পাড়া। ৮০'র দাঙ্গা ও তার পরেও তাঁদের বাড়ি বিধ্বস্ত হয়। তাঁরা এখন গ্রামের বাড়ি ছেড়ে আগরতলায় কর্নেল বাড়ি বাসা করেছেন।

২.৩০-এ বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ক্লাস নিলাম। তারপর নিলাম ককবরকের ক্লাস ৪টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত। তারপর ডঃ আহ্মেদের হাতে ক্লাসরুমের চাবি দিয়ে এলাম প্রেস ক্লাবে। সেখানে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার এক জরুরি মিটিং সেরে ফেললাম। মিটিংয়ে ঠিক হলো, ১০ই আক্টোবর কীর্তিশালার রৌপ্য জয়ন্তী কমিটির এক বিশেষ সাধারণ মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন জহর আচার্য, সাংবাদিক সত্যব্রত চক্রবর্তী, সাংবাদিক শেখর দত্ত, কবি রাতুল দেববর্মণ, আইনজীবী শঙ্কর দাশ, ফুলন ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত রামলাল দত্ত, ব্যাঙ্কের অফিসার দুলাল চক্রবর্তী, দর্পণ সম্পাদক

সমীরণ রায় প্রমুখ। মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করলাম আমি। মিটিংয়ে স্টুডিও ক্লিকের মালিক তথা আলোক চিত্র শিল্পী দিলীপ দেববায়ও উপস্থিত ছিলেন। মিটিং সেরে রাত ন'টায় বাসায় ফিরলাম।

২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, মঙ্গলবার । সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। আজ আর স্নান করতে গেলাম না। স্ত্রীর হাত থেকে ১০০ টাকার একখানা নোট নিয়ে আস্তাবল বাজারে গেলাম। ৬০ টাকা দরে ৮০০ গ্রাম ইলিশ কিনলাম বাঙলাদেশের। জিজ্ঞেস করতে মাছওয়ালা বললো, চাঁদপুরের ইলিশ। বাতাবি লেবু একটা কিনলাম ২ টাকায়, ট্রাইবাল বাড়ির বেগুন কিনলাম ৯০০ গ্রাম ৫ টাকা দিয়ে। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরলাম ৮.১৫ মিনিটে। ১০ টায় একটা রিক্সায় ছোট মেয়ে দেবযানীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পূর্বশায় স্ত্রী ও মেয়েকে নামিয়ে দিয়ে সোজা চলে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরাটরি খুলে বসতেই সেখানে এলেন এম.বি.বি. কলেজের নৈশ বিভাগের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ডঃ পরেশ চৌধুরী। ডঃ চৌধুরী কেমিস্ট্রির অধ্যাপক। উভয়ে উভয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতেই তিনি বললেন, 'আপনার নাম তো খুবই শুনি, অধ্যাপক নীলমাধব সেন মারা যাবার ওপর আপনার একটা লেখা পড়েছিলাম দৈনিক সংবাদে ককবরকে জলবাচক শব্দ 'তৃই' নিয়ে।' আমি বললাম, 'লিখেছিলাম বটে, অধ্যাপক সেন জলবাচক শব্দ ককবরক 'তৃই' বা 'দৃই' কে সংস্কৃত তোয়ঃ-এব সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন তোয়ঃ শব্দটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেব তিব্বত-বর্মীয় ভাষার 'তৃই' অথবা 'দৃই' থেকে ধার করা-- দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবীড় ভাষা থেকে নয়। আমি তাঁর এই মত সমর্থন করি এবং তাঁর এই আবিষ্কারকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি লিখেছিলাম 'ডঃ নীলমাধব সেনের আবিষ্কার'। তাঁর এই আবিষ্কারকে আরো সম্প্রসারিত করে আমি লিখেছি ভারতের সব তিব্বত-বর্মীয় ভাষায় এবং নেপাল ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মোঙ্গলীয় ভাষাগুলোতে জলবাচক শব্দ 'তৃই' এবং চীনা ভাষায় এটি TSUI (সুই)। কাজেই মোঙ্গলীয় ভাষার তুই সংস্কৃতে তোয়ঃ হয়ে গেছে।' ডঃ চৌধুরী বললেন, 'জানেন, একবার ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় আগরতলায় এসে ডঃ সেনের পি.এইচ. ডি. থিসিস দেখে বলেছিলেন, 'আপনার কাজতো ডি.লিট-এর কাজ, আপনি ডি.লিট. হিসেবে আপনার থিসিস জমা দিন।' সুনীতি বাবুর কথা অনুযায়ী নীলমাধবদা ডি.লিট হিসেবে তাঁর থিসিস সাবমিট করে ডি.লিট ডিগ্রী পেয়েছিলেন। এবার একটু অন্য কথা হলো। বললেন, 'দেখুন, আমার জন্ম ত্রিপুরায়। আমার বাবা কমলপুব হাইস্কুলের প্রথম হেড মাস্টার ছিলেন, কমলপুবে এখনও আমাদের বাড়ি আছে। তবে কলেজটিলায় এখন একটা বাড়ি করেছি। কতো পবিবর্তন হলো এই রাজ্যের চোখের সামনে।'' ডঃ চৌধুরীব গলায় একটু আফসোসের সুর।

তিনি চলে যেতেই বাংলা ভাষা তত্ত্বের ক্লাসে গেলাম। বিকেল ৪ টা থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত ককবরকের ক্লাস সেরে এলাম ডঃ আমেদের কোয়ার্টারে। আজ সকালের প্লেনে ডঃ আমেদের ছোট শালি মিঠু (রেবেকা) এসেছে বর্ধমান থেকে। সঙ্গে তার ক্লাসমেট সেলিম। তারা দু'জনেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি নিয়ে এম.এ. পড়ছে। তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছে বর্ধমানের বিখ্যাত মিহি দানা। মিসেস আমেদ রাবেয়া খাতুন সেই প্রসিদ্ধ মিহি দানা খাওয়ালেন আমাদেরকে। ডঃ কানুলাল ধর ও আমি মিহি দানা খেয়ে খুব তারিফ করলাম। ঠিক হলো, পুজোর ছুটিতে ডঃ আমেদের পরিবারকে নিয়ে ট্রাইবাল এলাকায় বেড়াতে যাবো সঙ্গে থাকবেন ডঃ ধর। বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত ৮ টা বেজে গেলো।

২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, বুধবার । খুব ভোরে উঠে রাধা-সাগরে সাঁতার কেটে দৈনিক সংবাদ ও ত্রিপুরা দর্পণ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। তারপর পরিতোষ পালের জন্যে একটা চিঠি লিখলাম ট্রাইবাল রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের উদ্দেশে। পরিতোষ অর্থনিতির এম.এ, এন. আই. আর.ডি.'র হয়ে আমার সঙ্গে উত্তর ত্রিপুরায় আর্থ-সামাজিক গবেষণার কাজ করেছিলো ত্রিপুরা সরকারের উপজাতীয়

প্রকল্প গুলির সাফল্য ব্যর্থতা নিয়ে । এ গবেষণা প্রকল্পের সুপারভাইজার ছিলাম আমি । পরিতোষ, ট্রাইবাল রিসার্চের অরুণ দেববর্মাকে নিয়ে কমলপুর, কৈলাশহর, কাঞ্চনপুর মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় সরকারী বিভিন্ন উপজাতি প্রকল্প সমীক্ষা করেছিলাম । পি.জি.পি (প্রিমিটিভ গ্রুপ প্রোগ্রাম)'র গ্রামগুলো ছিলো আমবাসার কাছাকাছি । পি.জি.পি'র ডিরেক্টর শ্রীযুত রসময় দত্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন কয়েকটা গ্রামে । তাঁকে পি.জে.পি'র গ্রামগুলোয় খুব জনপ্রিয় দেখলাম । আমাদের সঙ্গে সঙ্গ দিতে দিতে দিব্যি বাঁশের হুকোয় তামাক খেতে লাগলেন তিনি । ট্রাইবেল মেয়েরাও নানা সমস্যার কথা বলতে লাগলেন তাঁর সঙ্গে অবলীলাক্রমে । আসলে পি.জে.পি. ডিপার্টমেন্ট তাঁরই হাতে খোলা, তাঁকে এর জনক বলা যায় । বিজয় রাঙখলের টি.এন.ভি. চুক্তির কাজ দেখলাম কমলপুর শহরের কাছাকাছি জামথুম এলাকায় । একদিন অরুণ দেববর্মা জামথুমের একেবারে ভেতরে চলে গেলেন উগ্রপন্থী এলাকায় । আমরা একটা হালাম বাড়িতে অপেক্ষা করছিলাম । তাঁর ফিরতে খুব দেরি হওয়ায় টেনশনে ছিলাম আমরা । সন্ধ্যের ঠিক আগে ফিরলেন তিনি । আমরা হালাম বাড়িতে নৈশ ভোজ সারলাম মুরগির মাংস দিয়ে । রাতে ফিরে এলাম কমলপুরের ডাকবাঙলোয় । এখানকার একজন দোকানদার বললেন, বর্তমান ডাকবাঙলোর জায়গায় আগে বাঘের ডেরা ছিলো । বাঘেরা পশু-মানুষ শিকার করে এনে এই ডেরায় বসে খেতো মড়মড় করে হাড়-গোড় চিবিয়ে । এখনো নাকি ডাকবাঙলোর অতিথিরা গভীর রাত্রে বাঘের হাড়-গোড় চিবিয়ে খাওয়ার শব্দ শুনতে পান ।

কমলপুর ডাকবাঙলো থেকে এলাম আমবাসা P.W.D 'র ডাকবাঙলোয় । ওখান থেকে গেলাম একদিন কর্ণমুনি পাড়ায় কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার কন্ট্রোল অফ শিফটিং কালটিভেশান-প্রজেক্ট দেখতে । কর্ণমুনি পাড়ার এক রিয়াং পরিবারের টংঘরে বসে তথ্য সংগ্রহ করছিলাম আমরা । এমন সময় ঐ পরিবারের একজন একটা বড় গোসাপ আধমরা অবস্থায় ধরে আমাদের সামনে আনতেই পরিতোষ লাপ দিয়ে উঠলো । অরুণবাবু আর আমি হেসে ফেললাম, কারণ ট্রাইবাল এলাকায় গোসাপ ধরা দেখতে অভ্যস্ত আমরা । কর্ণমুনি পাড়ার প্রজেক্ট-পরিবারের সাফল্য চোখে পড়ার মতো, বিশেষ করে তাদের কলা বাগান। কর্ণমুনি পাড়া থেকে ডাকবাঙলোয় ফিরে P.W.D 'র Executive Engineer শ্রীযুত কেশব ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হলো । কথাবার্তায় দারুণ লোক, তিনি থাকেন অনেকটা সাহেবী কায়দায়, চলাফেরাও তেমনি । তাঁর সম্পর্কে অনেক গল্প শুনলাম । তিনি নাকি একসময় আমবাসায় অনেক শূকর পুষে ছিলেন ।

আমবাসার কমলাছড়া গ্রামটি কন্ট্রোল অফ শিফটিং কালটিভেশানের একটি গ্রাম । বিজয় রাংখলের এই গ্রামে প্রজেক্টের কাজকর্ম মোটেই সফল বলে মনে হলো না । দুপুরের দিকে এক মলসুম পরিবারে মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খেলাম অপূর্ব তৃপ্তির সঙ্গে । এই গ্রামে আত্মসমর্পণ করা এক টি.এন.ভি. কর্মীর সঙ্গে আলাপ করেছিলাম বেশ নিভৃতে পরিত্যক্ত এক জুমঘরে বসে।

আমবাসার পাশে বলরাম কচুছড়ায় সমীক্ষা করতে গিয়ে বীরেন দত্ত রিয়াং নামে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হলো । কমিউনিস্ট নেতা বীরেন দত্তের নামে ছেলেটির নাম রাখা হয়েছে ।

কৈলাশহরে গিয়ে ডাকবাঙলো থেকে দেওরাছড়া গ্রামে সমীক্ষা করতে গেলাম । পাহাড়ের উঁচুতে গড়ে ওঠা এই গ্রাম থেকে ঊনকোটি দেখা যায় দূর থেকে । দেওরা ছড়ায় ডারলং উপজাতিরা পানের চাষ করেছে দেখে তাজ্জব বনে গেলাম । শুনলাম, এই গ্রামের একজন ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে আছে । এই খবর শুনে আমি তো অবাক, এই উপজাতি গন্ডগ্রামের ছেলে আই.এফ.এস হয়েছে ! দেওরাছড়া থেকে গেলাম কাঞ্চনপুরের কাংরাই উপজাতীয় গ্রামে । রাতের বেলায় অরুণ দেববর্মা থেকে গেলেন ওই গ্রামে । আমরা কৃষি বিভাগের অফিসার সুবিমল দত্তের সঙ্গে কাঞ্চপুরের ডাকবাঙলোয় থাকলাম

এক রাত্রি। রাত্রে শুয়ে শুয়ে 'কাংরাই' গ্রামটির ব্যুৎপত্তির কথা ভাবছিলাম। ককবরক ভাষায় 'কংরাই' হলো সর্দি। এই কংরাই-এর সঙ্গে কাংরাই-এর কেমন যেন একটা মিল পাচ্ছিলাম। হতে পারে পাহাড়ের চুড়োয় অবস্থিত এই গ্রামের লোকদের একসময় খুব সর্দি হতো। আর তা থেকে হয় কংরাই। পরবর্তীকালে হয়েছে কাংরাই। ১৯৯২ সালের এই সব কথা ভাবতে ভাবতে পরিতোষের জন্যে একটা চিঠি লিখছিলাম। এমনসময় পরিতোষ এসে গেলো। পরিতোষ চলে যেতেই আমি উমাকান্ত একাডেমী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলাম। সেখানে বেলা দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত একটানা ককবরকের ক্লাস নিয়ে ডঃ আমেদের হাতে চাবি দিয়ে খুব ক্লান্ত অবস্থায় বাসায় ফিরে এলাম রাত সাড়ে ছ' টায়। আজ থেকে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুজোর ছুটি পড়লো, খুলবে ২৬শে অক্টোবর।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, বৃহস্পতিবার। গত রাত্রে বাসায় ফিরে শুনি সি পি আই নেতা অঘোর দেববর্মা খবর পাঠিয়েছেন সুরেন্দ্র দেবনাথকে দিয়ে আজ সকালে তাঁর বনমালীপুর বাড়িতে যাবার জন্য। সকাল দশটায় তার বাড়িতে যেতেই বললেন, 'চলুন বিশ্রামগঞ্জে ইটভাট্টায় যাই। ২৪শে সেপ্টেম্বর সেখানে এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড হলো, যাওয়ার খুব দরকার বুঝলেন, দিন যাবে কথা রবে। পরে বিশ্রামগঞ্জের লোকেরা বলবে, কই অঘোর দেববর্মা তো এলেন না এলাকার লোক হিসেবে।' বললাম, "আমিও তো তাই ভাবছিলাম, আপনাকে নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ যাবো, আমিও তো ওই এলাকারই লোক, আগে তো কোন ঘটনা ঘটলেই বাঙালি উপজাতি সকল অংশের মানুষকে নিয়েই শান্তি কমিটি করতাম, আশি সালের দাঙ্গার আগে মে মাসের ২৪ তারিখে গুলিরাই বাজারে আপনাদেরকে নিয়ে মিটিং করেছিলাম মনে আছে ? চলুন, আজ বিশ্রামগঞ্জ বাজারবার, সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা যাবে।' বেলা ১২.৩০ টায় বেরিয়ে পড়লাম আমরা বিশ্রামগঞ্জ বাজারের দিকে। বিশ্রামগঞ্জ বাজারে গিয়ে প্রথম চলে গেলাম সি পি এম পার্টি অফিসে। সেখানে কমরেড দুর্গাদাস শিকদারের সঙ্গে ইটভাট্টার ঘটনা এবং পরবর্তী উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন অঘোরবাবু। আমি গেলাম বিশ্রামগঞ্জের সি পি আই কর্মী সমীরঞ্জন দেববর্মাকে ডেকে আনতে তার বাড়িতে। সমীরঞ্জনবাবুকে নিয়ে এলাম সি পি এম অফিসে। সেখান থেকে কমরেড শিকদারের পরামর্শ অনুসারে অঘোরবাবু ও সমীরঞ্জনবাবুকে নিয়ে একটা টেম্পোতে চেপে গেলাম ইটভাট্টায়। টেম্পোতে দেখা হল সি পি এমের মহিলা নেত্রী কমরেড সূর্যমূখী দেববর্মার সঙ্গে। অঘোরবাবু তার সঙ্গে ককবরকে ইটভাট্টার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলেন। সূর্যমূখীর বাড়ি ইটভাট্টার বাঙালি বাড়ির সঙ্গে। ইটভাট্টা বাজারে নেমে আমরা প্রথমে গেলাম রাইমোহন জমাতিয়ার নেতৃত্বে জেলপলাতক ডাকাতদলের আক্রমণে নিহত নৃপেন্দ্র বমণ ও তার পুত্র ভুলু বর্মণের বাড়ি। আজ শ্রাদ্ধ ছিল তাদের। অঘোরবাবুকে দেখে নৃপেন্দ্র বর্মণের বিধবা পত্নী কেঁদে ফেললেন হাউমাউ করে। অঘোরবাবুকে চেনেন তিনি অনেকদিন ধরে। তারপর ভুলু বর্মণের অষ্টাদশী স্ত্রী তার এক বছরের শিশুপুত্রকে অঘোরবাবুর কোলে তুলে দিয়ে ডুকরে কেঁদে ফেললেন। অঘোরবাবু তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি যথাসাধ্য করবেন বামফ্রন্ট সরকারকে দিয়ে—একথাও জানালেন। নৃপেন্দ্র বর্মণের ছোট ছেলে দিলীপ তাদের দোকানে এনে আমাদেরকে বসালো। দেখলাম, দোকানে মালপত্র তেমন কিছু নেই। দোকানের সামনে রাস্তার ঠিক ওপারে প্রমোদনগর-খেংরাবাড়ির ব্রিজে সি আর পি পাহারা দিচ্ছে দেখলাম। ডাকাত দলেরা ওই ব্রিজ দিয়ে এসে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল এবং দেবনাথ সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়—যার সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। ইটভাট্টা বাজারে বেশ ক'জন উপজাতি লোককে দেখলাম। মনে হলো, বাঙালি-উপজাতি উভয় অংশের মানুষ মিলে-মিশে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করছেন। বিশ্রামগঞ্জ বাজারে ফিরে আমরা

বাজারের বাঙালি-উপজাতি সব অংশের লোকের সঙ্গে আলাপ করলাম এলাকায় শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বজায় রাখার জন্যে। প্রবীণ সি পি আই নেতাকে দেখে অনেকে এগিয়ে এলেন আলাপ করতে। কংগ্রেস নেতা ডাঃ সুকুমার দেবের সঙ্গেও আলাপ করলেন অঘোরবাবু। তারপর দুর্গাদাসবাবুর সঙ্গে দেখা করে এলাকার উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি নিয়ে আলোচনা করলেন। দুর্গাবাবু বললেন, "আগামীকাল সি পি এম পার্টির নেতৃত্বে শান্তি মিছিল বাঙালি-উপজাতি এলাকা প্রদক্ষিণ করবে।" অঘোরবাবু বিশ্রামগঞ্জে একটা শক্তিশালী সি পি আই সংগঠন গড়ার উদ্যোগের বিষয় নিয়ে সমীরঞ্জনের সঙ্গে আলোচনা করলেন। অঘোরবাবু এই এলাকা থেকে চারবার এম এল এ হয়েছেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, শুক্রবার। সকালবেলা বাঁশের কড়ুল ছাড়াতে ছাড়াতে স্ত্রী ফুলকুমারী বললেন, 'আজ একবার পোস্টাফিসে যাও না, কলকাতা থেকে যদি দাদারা পুজোর টাকা পাঠিয়ে থাকেন।' প্রতিবারই পুজোর সপ্তাখানেক আগে সেজদা এক হাজার করে টাকা পাঠান পুজোর জামাকাপড় কিনতে। ধরে নেওয়া হয়েছিল এবারও সেজদা টাকা পাঠাবেন। স্ত্রীর কথা রাখতে হেড পোস্টাফিসে গিয়ে খবর নিলাম। পিওন সুবোধ সরকার বললেন, 'না, এখনও তো টাকা আসেনি। আর এলেই বা কোথায় ডেলিভারি দেবো, আপনার কেয়ার অফ বীরচন্দ্র দেববর্মা তো মারা গেছেন।' আমি বললাম, 'পাশের ঘরেই অ্যাডভোকেট শুভাশিস তলাপাত্র আছেন, তার ঘরেই খবর রাখলে আমি পেয়ে যাবো।' পোস্টাফিস থেকে ফিরে পুরনো আর এম এস চৌমুহনীতে স্টুডিও ক্লিক-এ ঢুকলাম। দেখি, সেখানে স্টুডিওর মালিক কথা বলছেন রাজার আমলের পুরনো নামকরা কন্ট্রাক্টর অবিনাশ চক্রবর্তীর এক ছেলের সঙ্গে। স্টুডিও ক্লিক অবিনাশ কন্ট্রাকটরের বাড়িতেই ভাড়া নেওয়া। অবিনাশবাবুর এই ছেলেও কন্ট্রাক্টর। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর ওপর খুব খাপ্পা। নৃপেনবাবু নাকি তাঁর কন্ট্রাক্টরির খুব ক্ষতি করেছেন দারুণ অন্যায়ভাবে। চক্রবর্তীবাবু রেগে বললেন, "সেতো রিফিউজি, আগরতলা শহরের কি জানে সে! হারাধন কন্ট্রাক্টর, গেদু মিঞা আর আমার বাবা অবিনাশ চক্রবর্তীকে দিয়ে মহারাজ বীরবিক্রম সিঙ্গারবিলে এয়ারপোর্ট তৈরি করান। অবিনাশ কন্ট্রাক্টরের বাড়ির একটা মর্যাদা আছে, নৃপেন চক্রবর্তী তার কী জানে? আমার কাজের বিরুদ্ধে সে কি না ভিজিলেন্স বসায়! কলকাতা থেকে তাড়া খেয়ে আমাদের রাজ্যে এসে ট্রাইবেল-বাঙালি সকলকে জ্বালিয়েছে লোকটা, একনম্বরের সাম্প্রদায়িক সে। জীবনে কটা পার্টি করলো সে? প্রথম করতো কংগ্রেস, তারপর করেছে সি পি আই, তারপর করলো সি পি এম, তারপর সি পি এমের তাড়া খেয়ে এখন ঢুকেছে দৈনিক সংবাদে, ভূপেন দত্ত ভৌমিক তাকে অক্সিজেন দিয়েই না বাঁচিয়ে রেখেছে। এক নম্বরের সাম্প্রদায়িক, বুঝলেন কুণ্ডুবাবু। আশির দাঙ্গা সেই বাঁধিয়েছে, এখন ট্রাইবেলদের জন্যে মায়াকান্না কাঁদে। আমরা পুরনো লোক, আগরতলার নাড়ি-নক্ষত্র চিনি। এখানে ট্রাইবেল-বাঙালি কিরকম মেলামেশা আমাদের ছিল। পাহাড়ে গেলে ট্রাইবেলরা অবিনাশ চক্রবর্তীর ছেলে বলে কত ভালবাসতো, আর এখন পাহাড়ে ঢোকা যায় না, সব দোষের মূলে এই নৃপেন চক্রবর্তী।" অবিনাশ চক্রবর্তীর ছেলেকে বললাম, "আগরতলার পুরনো ইতিহাস লেখা হলে অবিনাশ কন্ট্রাকটরের বাড়ির নাম তো থাকবেই।" ভদ্রলোক সমাদর করে আমাকে ৬০ জর্দা দিয়ে একটা পান খাওয়াতেই আমি বিদায় নিতে যাবো এমন সময় বললেন, "দেখুন, ক্লিকের মালিক দিলীপ দেবরায় নৃপেন চক্রবর্তীর একনম্বর ভক্ত, কি আর বলবো," বলে দিলীপবাবুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন।

বিকেল ৩টের সময় গেলাম এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের জহর আচার্যের কাছে। তারপর তাঁকে নিয়ে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তীর স্যুভেনিরে এডভার্টাইজমেন্টের জন্যে প্রথমে গেলাম স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিনহার কাছে। খুব ভালো ব্যবহার করলেন তিনি। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম ক্রীড়ামন্ত্রী

জিতেন্দ্র চৌধুরীর কাছে। তিনি ছিলেন না, লেখক সুধন্বা দেববর্মার ছেলে প্রশান্তবাবুর কাছে কাগজপত্র সব বুঝিয়ে দিয়ে এলাম। তারপর ঢুকলাম কৃষি মন্ত্রী অঘোর দেববর্মার ঘরে, কিন্তু মিটিঙে ব্যস্ত থাকায় তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না। এরপর চলে গেলাম বনমালীপুর বিগ-অঘোর দেববর্মার বাড়ি। সেখানে এলেন আম্বেদকর মেমোরিয়াল সোসাইটির নেতা সুরেন্দ্র দেবনাথ। ও বি সি'র বিষয় নিয়ে সি পি আই নেতা অঘোরবাবুর সঙ্গে আলোচনা করলেন তিনি। অঘোর দেববর্মার নেতৃত্বে এস টি, এস সি এবং ও বি সি সম্প্রদায়কে নিয়ে একটা দলিত মঞ্চ করতে চান তিনি। রাত সাড়ে আটটায় সুরেন্দ্র দেবনাথের স্কুটারে চেপে আমার বাসার মালিক দিলীপ দেবরায়ের বাড়িতে ফিরলাম।

৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, শনিবার। স্ত্রীর কাছ থেকে ১০০ টাকার একখানা নোট নিয়ে প্রথমেই একটা ইলিশ মাছ কিনে ফেললাম ৪০ টাকা দিয়ে। তারপর আস্তাবল বাজারের ট্রাইবাল পট্টিতে গিয়ে শাক আর বাঁশের কড়ুল কিনলাম। জুমের বেগুন কিনলাম বেশ সস্তা দরে 'বেরমা-বৃতুই' (সিঁদলের ঝোল) খাবার জন্যে। বাজার সেরে সুপুরি বাগান দিয়ে ফিরতে মানিক চক্রবর্তীর দোকান থেকে দুখানা ও.কে. সাবান কিনে বাসায় ফিরলাম। একটু পরে গ্রাম থেকে এলো আমার ছোট শালী ছায়ারানী ও ভায়রাভাই কৃষ্ণকান্ত। তারা আমার স্ত্রীর মারফত সুদে টাকা নিয়েছিলো গত মাসে তাই দিতে এসেছে। প্রায় একই সঙ্গে বড় কাঁঠাল থেকে আমার এক পিসশ্বশুর মনি দেববর্মা এলেন। একটু রেস্ট নিয়ে তিনি আমার ছোট মেয়ে দেবযানীকে নিয়ে হাকার্স কর্নারে পুজোর বাজার করতে গেলেন। পরে শুনলাম প্রায় ১৫০০ টাকার পুজোর কাপড়-চোপড় কিনে নিয়ে গেছেন তিনি- একেই বলে ট্রাইব্যাল মধ্যবিত্ত।

সাড়ে দশটায় বেরিয়ে গেলাম জহর আচার্যীর অফিসে। তাঁকে নিয়ে প্রথমে গেলাম শিল্প মন্ত্রী তপন চক্রবর্তীর কাছে রাজেন্দ্রকীর্তি শালার স্মারকগ্রন্থে বিজ্ঞাপন নিতে। তপনবাবু সঙ্গে সঙ্গে রেকমেণ্ড করে দিলেন। এরপর এলাম কৃষিমন্ত্রী অঘোর দেববর্মার ঘরে। আজও দেখালাম তিনি মিটিংয়ে ব্যস্ত। ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করে দেখি তিনি একফাঁকে বেরিয়ে গেছেন। আজও কাজ হলো না। বাসায় ফিরতে ফিরতে দুটো বেজে গেলো। বিকেল ৪.৩০ এ ছোট মেয়ে দেবযানীকে নিয়ে গেলাম তার মায়ের অফিসে। রাস্তায় দেখি জলে জলাকার-আগামীকাল দুর্গাপুজো, সবাই চিন্তিত। পূর্বাশায় গিয়ে শুনি আমার স্ত্রী বাসায় ফিরে গেছেন। দেবযানীকে রিক্সায় বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আমি গেলাম সি.পি.আই. নেতা অঘোর দেববর্মার বাড়ি। সেখানে এলেন সুরেন্দ্র দেবনাথ। রেডিওতে আমাদের ইটভাট্টায় যাবার খবর প্রচারিত হতেই বাড়ি ফিরলাম।

১ লা অক্টোবর, ১৯৯৫, রবিবার। **সপ্তমীপুজো**। খুব সকালে উঠে রাজ দীঘিতে স্নান করতে গেলাম রেড লোটাস ক্লাবের পাশের ঘাটে। দেখলাম, ক্লাবের ঘরে শুধু মেঝের ওপর একটা ছেলে শুয়ে অঘোরে রাত জাগা ঘুম ঘুমোচ্ছে। স্নান সেরে রেডলোটাস পুজো প্যান্ডেলে ঢুকে দুর্গা ঠাকুর দর্শন করলাম। তারপর দৈনিক সংবাদ ও ত্রিপুরা দর্পণ নিয়ে বাসায় ফিরার পথে কবি নন্দকুমার দেববর্মা চা খাওয়ালেন কর্নেল বাড়ির গেটে। সকাল দশটায় খেয়ে ছোট শালা বিমলকে নিয়ে ছাদের ওপর ২৮ বছরের পুরোনো ককবরক অভিধানের কার্ড রৌদ্রে দিলাম। স্ত্রীর চাপে পড়ে পুজোর ছুটিতে অভিধানের বাকী কাজ শেষ করবো বলে মনস্থ করেছি। দেখা যাক কতটা কী হয়।

বিকেল সাড়ে তিনটের সময় গেলাম নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায়। ভেবেছিলাম আজ আমরা দু'বাড়ির লোকেরা একসঙ্গে পুজো দেখতে যাবো। কিন্তু গিয়ে দেখি আমার মারে (বান্ধবী) পবিত্ররাণী জমাতিয়া পুত্র কাহামনুক ও কন্যা হামারী ও তাঁর দেওর সিন্ধুর ছেলে-মেয়ের হাত ধরে পুজো দেখতে বেরিয়ে পড়েছেন, গেটেই আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। বললেন, 'এই বাচ্চা-কাচ্চাদের তাড়াতাড়ি

কিছু ঠাকুর দেখিয়ে নিয়ে আসি, রাত হলে ভীড়ে আর হাঁটা যাবে না।' আমি ভেতরে ঢুকে বন্ধুবর নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে উগ্রপন্থী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলাম। তিনি বললেন, 'গতকাল খোয়াইয়ে নতুন ঘটনা ঘটেছে। কয়েকজন উপজাতি ছেলেকে বাঙালিরা অপহরণ করে নিয়ে যায়, তারপর পুলিশ নাকি তাদের উদ্ধার করেছে। আগে ট্রাইবাল উগ্রপন্থীরা একচেটে করতো, এখন বাঙালিরা করতে শুরু করলো। অনিলবাবুর বক্তৃতার ফসল ফলতে শুরু করেছে। যা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে, ত্রিপুরা প্যালেস্টাইন-ইজরাইল হতে যাচ্ছে।' তিনি আরো বললেন, 'বামফ্রন্টের উচিত উগ্রপন্থী সমাধানে এক্ষুণি সর্বদলীয় মিটিং ডাকা।' একটু ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'টাইগার ফোর্স নিয়ে কারা খেলা করছে তাতো আমরা জানি, কী বলবো বলুন। ত্রিপুরায় হয়তো আগের মতো স্বল্প দিনের দাঙ্গ হবে না, কিন্তু এই ধরনের অশান্তি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।'

নগেন্দ্রবাবুর বাসা থেকে ফিরে এসে রাত সাতটার সময় স্ত্রী, দু'মেয়ে ও শালা বিমলকে নিয়ে কর্নেল চৌমুহনী দিয়ে পুজো দেখতে বেরোলাম। প্রথমে গেলাম হারাধন সংঘের পুজো দেখতে। সেখান থেকে পোলস্টার, লালবাহাদুর ক্লাব ও দুর্গাবাড়ির দুর্গা প্রতিমা দেখে কর্নেল চৌমুহনী ফিরে এলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে শব্দ ও আলোর সাহায্যে 'মহিষ মর্দিনী দুর্গা' দেখে বাড়ি ফিরলাম।

২ রা অক্টোবর, ১৯৯৫, সোমবার, মহাষ্টমী। খুব ভোরে কৃষ্ণ সাগরে স্নান সেরে রেড লোটাস পুজো পন্ডপে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দেখলাম, অঞ্জলি দিচ্ছেন গুটি কতক দম্পতি। পুজো মন্ডপটির সামনে টবে করে ফুল বাগান সাজানো হয়েছে পুজো উপলক্ষে বেশ চোখে পড়ার মতো করে। বাসায় ফিরতে স্ত্রী ১০০ টাকার একখানা নোট দিলেন বাজারে যেতে। আস্তাবল বাজারে গিয়ে প্রথমে ব্ল্যাকে কেরোসিন কিনলাম পাঁচ লিটার ৭ টাকা দরে। পুঁটি মাছ ১০ টাকা দিয়ে ৫০০ গ্রাম, ৫ টাকার চিংড়ি ১৫০ গ্রাম, ট্রাইবেল সব্জিঅলার কাছ থেকে ৮ টাকায় জুমের বরবটি ১ কেজি, হেলাঞ্চা ১ টাকায় দুবান্ডিল, বেগুন ২ টাকায় ২৫০ গ্রাম, বাঙালি দোকান দারের কাছ থেকে ৫০০ গ্রাম পেঁয়াজ ও ১০০ গ্রাম কাচা লঙ্কা নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

১০ টার সময় গেলাম শঙ্কর চৌমুহনীব কাছে অধ্যাপিকা ডঃ আভা রায় বর্মণেব বাড়ি। গতকাল শ্রীমতী করবী দেববর্মণ একখানা চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন আমাকে অধ্যাপিকা রায় বর্মণের বাড়ি দিতে। আভাদি আমার ককবরকের ছাত্রী—রাধামোহন একাডেমীতে পড়েন। তিনি গিয়েছিলেন থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে ইঞ্জিনিয়ার ছেলের কাছে। আভাদির বাড়ির দোতালায় বসলাম সুন্দরভাবে সাজানো ঘরে। চোখে পড়লো ফুল সমেত একটা লতা। আভাদি বললেন, 'ব্যাঙ্কক থেকে এনেছি।' ব্যাঙ্ককে যাবার সময় আভাদিকে বলেছিলাম, 'আভাদি, ককবরক ভাষার মতো থাই ভাষাতেও টোন আছে, শান্তিনিকেতনে একবার রবীন্দ্র নৃত্য নাটকের বিখ্যাত জাপানী নর্তকী মীনা কাঙ-এর ইংরেজ স্বামী আমাকে বলেছিলেন, পারলে একখানা থাই ভাষার বই নিয়ে আসবেন।' যেতেই আভাদি আমার হাতে Thai for Travellers বই খানা তুলে দিলেন। বইখানার ওপর একখানা ছবি আছে ফ্লোটিং মার্কেটের। একখানা নৌকোয় এক বৃটিশ দম্পতি আরেকখানা নৌকো থেকে একটি থাই মেয়ের কাছ থেকে ফল-মূল কিনছেন। মেয়েটির মাথায় থাই টুপি, পরনে ত্রিপুরার ট্রাইবেল মেয়ের মতো পাছড়া। আভাদি বললেন, 'জানেন, ব্যাঙ্কক এয়ারপোর্টে নেমে দেখি সব যেনো আমাদের আগরতলার কৃষ্ণনগরের ঠাকুর-কর্তা পরিবারের ট্রাইবেল ছেলে-মেয়ে। আমি তো রীতিমতো অবাক।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, থাইদের গায়ের রঙ কেমন?' বললেন, 'খুব পরিষ্কার, তবে থাই-চাইনিজদের রঙ আরো পরিষ্কার। মেয়েদের রাজত্ব বুঝলেন, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, হোটেল-রেস্তোরাঁ সবই থাই মেয়েদের দখলে।' এরপর আভাদি ফ্লোটিং মার্কেটের এলবাম দেখালেন,

চোখ জুড়িয়ে গেলো আমার, থাই মেয়েদের নৌকোয় বসে বেচা-কেনা করতে দেখে মুগ্ধ হলাম আমি। মনে হলো, ত্রিপুরার অরণ্যক পরিবেশের পাহাড়ী নদীতে নৌকোয় বসে ত্রিপুরী মেয়েরা পাছড়া পরে জুমের ফল-মূল বিক্রি করছে।

আভাদির এলবামে বুদ্ধের মূর্তি দেখলাম বহুরকমের, দেশটা বুদ্ধের-ই, শতকরা ৮৫ জনই বৌদ্ধ। কিছু ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তি দেখতে পেলাম এলবামটায়। আভাদি একটা মূর্তি দেখিয়ে বললেন, 'এটা ব্রহ্মার মূর্তি, বুঝলেন।' আমি বললাম, 'বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করবার আগে থাইল্যান্ডের লোকেরা হয়তো আমাদের ভারতীয় আর্যদের মতো বহু দেব-দেবতায় বিশ্বাস করতো, অথবা ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিলো ওই দেশে।' আভাদি থাই ভাষার যে-বইখানা দিলেন তাতে ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপিতে থাই ভাষার উচ্চারণ দেয়া আছে। থাই লিপি অনেকটা আমাদের ওড়িয়া লিপির মতো, থাই বর্ণমালার 'ম' তো আমাদের বাংলা 'ম' এর কাছাকাছি। আভাদির পাশে বসে বইখানা পড়তে শুরু করলাম। দেখলাম একমাত্র বাক্য গঠন প্রণালী ছাড়া ককবরক ভাষার সঙ্গে থাই ভাষার তেমন কোন মিল নেই; যদিও ককবরক থাই ভাষার মতো বৃহত্তর অর্থে ভোট-চীনীয় ভাষা বংশের অন্তর্গত। বই খানা দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা ভারতীয় আর্য ভাষার শব্দ পেলাম ঃ- Peace - শান্তি, meeting - সভা, language - ভাষা, blood - লোহিত, air - আকাশ, announce - প্রকাশ, assembly hall - শলাপ্রশাখম, battle - সগ্রাম (সংগ্রাম ?), college - বিদ্যালয় (থাইভাষায় রোমান হরফে লেখা vithayalai), country - প্রথেশ (প্রদেশ ?), danger - অন্তরায়, deveil - পিশাচত (পিশাচ ?), enemy - শত্রু (sattrou), equipment - উপকরণ, favour - করুণা, fruit - ফোলমাই (ফলমূল ?), ghost - পিশাচত্ (pisast), guard - যম(yaam), habit - নিছ-ছাই (নেশা ?), happy - সুখ-সবাই (suk-sabaai), head - সি-সঃ(শীর্ষ ?), ideal - উদম-খাটি (উত্তম-খাঁটি?), identity - একলক্ষণ(ek-laksana) আরও এই রকম শব্দ চোখে পড়লো আমার। তখনই আমার মনে পড়লো বৌদ্ধ ত্রিপিটকের প্রভাবের কথা। আভাদির এলবামে একটা ছবি দেখলাম, 'The bridge on the river Kowai' - এই নামে ষাটের দশকে একটা সিনেমা দেখেছিলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায়। আভাদি বললেন, 'এই সেই অতি বিখ্যাত 'কোয়াই নদীর ওপর সেতু।' থাইল্যান্ডের কোয়াই নদীর কথা শুনে আমার ত্রিপুরার খোয়াই নদীর কথা মনে পড়লো। আভাদি বললেন, জানেন, 'আমার কানে ওটা খোয়াই শোনা যাচ্ছিল।' আমি বললাম, 'হয়তো দুটো নদী-ই খোয়াই।' তারপর আভাদিকে বললাম, জানেন, ককবরকে কোয়াই অর্থ সুপুরি। হয়তো থাইল্যান্ডের ওই নদীর ধারে অনেক সুপুরির গাছ ছিলো। যেমন আমাদের আসামের গৌহাটি (এখনকার উচ্চারণ গোয়াইহাটি) শহরটি নামকরন হয়েছে বড়ো শব্দ গোয়াই অর্থ সুপুরি থেকে। ওখানে আগে বড়ো জনগোষ্ঠীর লোকেরাই বসবাস করতো এবং তারা সুপুরির চাষ করতো বাগানের পর বাগান। এই গোয়াইহাটির হাটি শব্দটির বড়ো উচ্চারণ হাতি। হাতি অর্থ বাগান যা এখন বাজারে রূপান্তরিত হয়েছে। বড়োরা বহ্মপুত্রের ধারে এইসব সুপুরি বাগান থেকে সুপুরি বিক্রি করতো ভিন দেশ থেকে নৌকো করে আসা লোকদের কাছে। পরে সেখানে সুপুরি কেনাবেচার বাজার হয়ে গেলো। আভাদি আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আমার অদ্ভুত এই সব কথা শুনছিলেন।

আভাদির বাড়ি থেকে এলাম শ্রীমতী করবী দেববর্মণের বাড়ি। করবীদিকে দেখে বললাম, 'রাধামোহন একাডেমীতে ককবরক পড়াতে এসে একটা লাভ হয়েছে, ককবরকের ছাত্রীর কাছ থেকে একখানা থাই ভাষার বই পেয়েছি।' উনি আমার কথা শুনে হাসলেন, এবং থাই ভাষার বই খানা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। করবীদির স্বামী ডাঃ নীলমণি দেববর্মাও এসে পাশে বসলেন, তিনিও বইখানার পাতা

উল্টিয়ে দেখতে লাগলেন ককবরক ভাষার সঙ্গে থাই ভাষার কোন মিল আছে কিনা।

করবী দেববর্মণের বাড়ি থেকে এলাম পাশের নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায়। তাঁকে বইখানা দিয়ে বললাম, 'থাই ভাষার বই, দেখুন দেখি, আপনার মাতৃভাষার সঙ্গে কোন মিল আছে কিনা।' থাই লিপি দেখিয়ে বললাম, 'দেখুন আপনার মাতৃ ভাষার সমতূল্য ভাষা 'থাই' ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি গ্রহণ করেছে।' উনি একটু ভাল করে দেখে বললেন, 'আমার কাছে তো অনেকটা রোমান হরফের মতো মনে হচ্ছে।' আমি তাঁর কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেললাম। মনে মনে বললাম, 'ককবরকে রোমান হরফ রোমান হরফ করতে করতে ব্রাহ্মী লিপিকেও রোমান হরফ বলে মনে হচ্ছে নগেন্দ্র বাবুর।'

নগেন্দ্রবাবুর বাসা থেকে মনের আনন্দে বেলা দেড়টা নাগাদ বাসায় ফিরে দেখি পুত্র সুরঞ্জনের জ্বর হয়েছে, তাঁর মা পাখা করছেন, তাঁর বোন তানিয়া কপালে জল পট্টি দিচ্ছে, মুহূর্তে মনের আনন্দ উবে গেলো। গৃহিনী রাগতভাবে ককবরককে যা বললেন তার অর্থ, তুমি যেখানে যাও সেখানে কি তোমার শেকড়-পাকড় গজায়? বিকেলে ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার কাছ থেকে Quickgesic ট্যাবলেট এনে সুরঞ্জনকে খাওয়াতে লাগলাম, মহাষ্টমীতে আর পুজো দেখতে বেরোনো হলো না। সকালে ছোট মেয়ে দেবযানী তার ছোট মামা বিমলের সঙ্গে তার মামার বাড়ি হেরমায় চলে গেছে। হেরমা বাজারে এখন প্রতি বছর দুর্গা পুজো হচ্ছে বেশ ঘটা করে।

৩ রা অক্টোবর, ১৯৯৫, মঙ্গলবার, মহানবমী। আজ সারা দিনই বাসায় ছিলাম পুত্রের সেবাশুশ্রূষা করতে। সন্ধ্যে বেলায় একটু কর্নেল চৌমুহনীতে গিয়ে পুজোর অভাবনীয় ভীড় দেখতে লাগলাম। দর্পণ পত্রিকার শান বাঁধানো বসার জায়গায় হঠাৎ চোখে পড়লো প্রাক্তন আই-এ-এস অফিসার মানিক মজুমদারকে। তাঁর পাশে গিয়ে বসতেই ইতিহাসের কথা উঠলো, ভদ্রলোক ইতিহাস পাগল। কথায় কথায় বললেন, 'জিন্না ও রাজেন্দ্র প্রসাদের চিঠি চালাচালি পড়ে দেখবেন, মনে হবে রাজেন্দ্র প্রসাদ জহরলাল নেহেরু থেকে অনেকবেশী বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন।' হঠাৎ পুজো-মাইকে ঘোষণা হলো একটু বাদে রাজ্যপাল অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ভীড় সরাতে লেগে গেলো। আমিও মানিক বাবুর পাশ থেকে উঠে মাননীয় রাজ্যপালকে দেখতে যাবো বলে এগোতেই গায়ক-কমরেড হীরালাল সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা। বললেন, 'চলুন চা খাবো। শনি তলার কাছে একটা চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চের ওপর বসলাম আমরা। হীরালাল বাবুর একেতো খানদানী চেহারা, তার ওপর পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে মাথায় দিয়েছেন নেটওয়ালা মুসলমানী টুপি। দুর্গা পুজোর রাতে অদ্ভুত দেখাচ্ছিলো তাঁকে। বললাম, "আচ্ছা হীরালাল বাবু, পশ্চিমবঙ্গে সি.পি.এম. এর পার্টি নাকি সি.পি.এম কর্মীদের দুর্গা পুজোয় খুব একটা ইনভলবড্ না হতে বলেছে। এই নিয়ে সরিক দল গুলোর মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।' উনি বললেন, 'সব বুর্জোয়া কাগজ গুলোর অপপ্রচার, কই, গণশক্তি বা দেশের কথাতো কোন ফরমান জারি করেনি এ-সম্পর্কে। বুঝলেন, সব অপপ্রচার।' চা খেয়ে সারতেই হীরালাল বাবু বললেন, 'একটা রিক্সা নিয়েই বাসায় যাই, কি একটা হয়েছে কসমোপলিটান ক্লাবের দিকে।' আমিও উঠে বাসায় ফিরলাম দুটো গরম চপ হাতে নিয়ে স্ত্রী ও মেয়ের জন্যে। বাসায় যেতে যেতে মনে মনে বললাম, হীরালালবাবু তাঁর কাবুলীওয়ালাসদৃশ দশাসই চেহারায় ভয় পান? তাছাড়া তিনি জনপ্রিয় গায়ক ও সি. পি. এম.-এর ডাকসাইটে নেতা। হঠাৎ আমার যেন মনে হলো হীরালালবাবু তাঁর দশাসই চেহারা নিয়ে ভয় পেয়ে বাসার দিকে ছুটছেন। আর সকলেই অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখে মজা পাচ্ছে।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৯৫, বুধবার, বিজয়াদশমী। খুব ভোরে উঠে বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়ির সি.পি.আই. এর সদর বিভাগীয় পরিষদের অফিসে গিয়ে কমরেড অমূল্য শর্মাকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে

গেলাম ছাত্র সংঘের কাছে কমরেড সুরেন্দ্র দেবনাথের বাসায় । সেখানে বিজয়াদশমীর শুভেচ্ছা বিনিময় হলো । সুরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী চা পানে আপ্যায়িত করলেন আমাদেরকে । উঠলো দিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য সি.পি.আই এর পার্টি - কংগ্রেসের কথা । গতকাল প্রশান্ত কপালী প্লেনে গেছেন কলকাতায়, আরেকটা দল গেছে আসামের পথে দিল্লী । বিজয়াদশমীর শুভেচ্ছা বিনিময় করে অমূল্য আর আমি বেরিয়ে পড়লাম ।

রাজ-দীঘিতে সাঁতার সেরে বাসায় ফিরে নিচের থেকে জল তুললাম বেশ ক'বালতি স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে । তারপর গেলাম ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার চেম্বারে পুত্র সুরঞ্জনের শারীরিক অবস্থা জানাতে । সেখান থেকে ফিরে নাকে মুখে একমুঠো খেয়ে গেলাম কদমতলার পাল জেরক্সের দোকানে । সেখানে একটু বাদেই এলেন রাজেন্দ্র কীর্তিশালার কর্ণধার জহর আচার্য । পাল জেরক্স থেকে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে আমরা চলে গেলাম রিক্সা চেপে বড়দোয়ালীতে সাংবাদিক সত্যব্রত চক্রবর্তীর নয়ন মনোহর বাড়িতে । সত্য বাবুর বাড়ির সামনের ফুল বাগানের নধরকান্তি সব কালমেঘ গাছ দেখে আমি পুলকিত হয়ে উঠলাম । বাল্যকালে বাবা কালমেঘের বড়ি খাওয়াতেন । জ্যাঠামশয় ছিলেন কলকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের কবিরাজ, আর আমাদের বাড়িতে ছিলো কালমেঘের বাগান । অনেকদিন পরে সেই কথা মনে পড়লো । রাজেন্দ্র কীর্তিশালার নিমন্ত্রণ পত্রে সত্যবাবু আর আমি সই করলাম কীর্তিশালার রৌপ্য জয়ন্তী উদযাপন কমিটির পক্ষে । সত্যবাবুর স্ত্রী চা বিস্কুট খাওয়াতেই বেরিয়ে পড়লাম জহর বাবু আর আমি । জহর বাবুর এমপ্লয়মেন্ট একস্চেঞ্জ অফিসে একটু বসে ফিরলাম বাসায় বেলা ১.৩০ এ । দেখলাম সুরঞ্জন সুবোধ বালকের মতো গা স্পঞ্জ করে খাবার জন্যে আমার অপেক্ষায় আছে । স্ত্রী- পুত্র-কন্যাকে নিয়ে খেচকি মাছের ভর্তা দিয়ে খুব রেলিশ করে খেলাম । খেয়ে একটু ঘুমোলাম । ঘুম থেকে উঠতেই সুরঞ্জন বায়না ধরলো পেয়ারা খাবার । গেলাম তুলসীবতী বাজারে, পেলামনা সেখানে পেয়ারা । গেলাম আবার কামান চৌমুহনীতে, না সেখানেও পেয়ারা নেই। শেষ পর্যন্ত একটা আপেল নিয়ে বেগে পুরে হাঁটতে শুরু করলাম বাসার দিকে । নন্দলাল কর্তার বাড়ির সামনে আসতেই হঠাৎ শিক্ষক কুমুদ সাহার সঙ্গে দেখা । কুমুদবাবু ককবরকের অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার জানেন । পাহাড়ে যুব বয়সে শিক্ষকতা করতে ঢুকে ককবরক শিখে বেরোন । তাঁর একটা খাতা ছিলো ককবরকের । তাতে তিনি ৮০ বছরের এক বৃদ্ধের কাছ থেকে ককবরক শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার লিখে রাখতেন । অমূল্য সম্পদ ছিলো ওই খাতা খানা । কিন্তু তাঁর এক বাঙালি বন্ধু সেই খাতা খানা নিয়ে চম্পট দেন ককবরক শেখার জন্যে । আজও সেই খাতা উদ্ধার হয় নি । কুমুদ বাবুর কাছ থেকে লঙ্কা (মরিচ) শব্দের একটা সুন্দর ককবরক অভিব্যক্তি শুনলাম । ককবরক ভাষীরা একধরনের লঙ্কাকে বলে 'মছ-তগলায়াচিঙ' । অর্থাৎ মোরগের পায়ের লম্বা নলির মতো বাঁকা লঙ্কা । দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরো অদ্ভুত ধরেনের ককবরক শব্দের ব্যঞ্জনাময় ব্যবহার বলতে লাগলেন তিনি । তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতেই বন্ধুবর ডাক্তার পার্থসারথি চক্রবর্তী ও আশিস বর্ধনের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি হলাম নন্দলাল কর্তার বাড়ির ঠিক গেটের সামনে । তাঁরা যাচ্ছিলেন কর্তার বাড়ির ভেতরে গ্যালারি ধীরেনকৃষ্ণতে । আশিস বললেন কুমুদদা, 'এবার আপনার ককবরক অভিধানের কাজটা সেরে ফেলুন, বই মেলার আগে বের করবার চেষ্টা করুন ।' পার্থবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কত টাকা লাগতে পারে আপনার অভিধান ছাপতে ?' আমি বললাম, 'পঁচিশ-তিরিশ হাজারতো লাগবেই । বললাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য একবার বলেছিলেন অগ্রিম গ্রাহক করে ২৮ বছর ধরে পড়ে থাকা অভিধানটা বের করবেন । দেখুন পারেন যদি আপনারা নর্থ-ইস্টার্ন লিটারারি কনফারেন্সের তরফ থেকে প্রকাশ করতে ।' ডাঃ চক্রবর্তী ও আশিস বেশ পুলকিত হয়ে উঠলেন আমার কথায় । তারপর পার্থ বাবুর অনুরোধে একটা ষাট জর্দা

দিয়ে পান খেয়ে গা গরম করতে করতে কর্নেল চৌমুহনীতে এলাম ভীড় ঠেলতে ঠেলতে। আজও সেখানে ভীড় আলো ও ধ্বনি সহযোগে মহিষাসুর বধ দেখার জন্যে। দেখলাম দর্পণ-সম্পাদক সমীরণ রায় বসে আছেন বট গাছের তলায় তাঁর পত্রিকার অফিসের সামনে। তাঁকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম, 'রাজ্যের খবর কী, কোন অঘটন ঘটেনি তো?' তারপর বললাম, 'আগামীকাল এসে সুধন্বা দেববর্মার অত্মজীবনীর পান্ডুলিপিটা দিয়ে যাবো।'

সমীরণের কাছ থেকে এসে কর্নেল চৌমুহনীর পাশ দিয়ে যেতেই গলির মুখে কবি নকুল দাসের সঙ্গে দেখা। নকুল বাবু গত জুনে কলকাতায় গিয়েছিলেন। কলকাতা এয়ারপোর্টে আগরতলার লেখক শ্যামল ভট্টাচার্য ও আমি তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। নকুলবাবুকে নিয়ে শ্যামলবাবুর শান্তিনিকেতনে যাবার কথা ছিলো। সেই প্রসঙ্গ তুলতেই নকুল বাবু বললেন, 'শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমরা গেলাম শিল্পী ধীরেন কৃষ্ণের অবন পল্লীর বাড়ি। শিল্পী খুব অসুস্থ তখন। শিল্পী-পত্নী (লালুকর্তার মেয়ে) খুব জোরে জোরে তাঁকে বলে শোনালেন আমাদের কথা। আগরতলার লোক শুনে ভালো করে তাকিয়ে কথা বলতে লাগলেন ধীরেন কৃষ্ণ খুব মৃদু ভাবে।' আমি বললাম, 'শান্তিনিকেতনে থাকার সময় আমি প্রায়-ই শিল্পীর বাড়ি যেতাম। ককবরক ভাষার গবেষণার কাজের জন্যে আমাকে খুব পছন্দ করতেন তিনি। একবার তিনি আমাকে ত্রিপুরার রূপকথা সংগ্রহ করতে বলেছিলেন।' কবি নকুল দাস বললেন, 'আমরা আপনার ত্রিপুরী রূপকথা (কেরেঙ কথমা) বইখানা তো শান্তিনিকেতনে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। বইখানা ধীরেন কৃষ্ণকে দিতেই তিনি যে কী খুশী হলেন তা আর কী বলবো। রূপকথার বইখানা শিল্পীর হাতে দিতেই তিনি বললেন আস্তে আস্তে, 'কুমুদ বাবুকে তো আমি চিনি, একসময় শান্তিনিকেতনে থাকতেন, প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়িতে।' নকুল বাবু এবার বললেন, 'জানেন কুমুদ দা, অনেক ছবি তুলেছি আমরা ধীরেন কৃষ্ণের, এই হয়তো ত্রিপুরার লোকদের তোলা শিল্পীর শেষ ছবি। শ্যামলের কাছে ছবিগুলো রয়েছে, শ্যামল আগরতলায় ফিরলে ছবিগুলো পেয়ে যাবো।' নকুল বাবু বলে চললেন, 'জানেন কুমুদদা, শ্যামলের মেয়ের নাম তাসা।' তাই না শুনে শিল্পী-পত্নী ত্রিপুরার রাজকুমারী তাসার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলো তো দেখি, ককবরক ভাষায় 'তাসাদি' মানে কী?' সকলেই তাকিয়ে রইলাম আমরা তাঁর দিকে। আমরা তো আর ককবরক জানিনে। তিনি বললেন, 'তাসাদি' মানে-বলো না।' আমি বললাম, ''শিল্পী ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ ও তাঁর স্ত্রী ককবরক জানেন।'' বাসায় ফিরে পুত্রকে আপেলটা দিতেই সে মহা খুশি। আর বাদাম, তেলেভাঁজা ও বড়া পেয়ে স্ত্রী ও কন্যাদের জিভে জল এলো যেন।

৫ ই অক্টোবর, ১৯৯৫, বৃহস্পতিবার। ভোর চারটেয় উঠে দেখি আকাশ ডাকছে। ছাদ ঝাঁট দেওয়ার পরেই অঝোরে বৃষ্টি নামলো বর্ষাকালের মতো। ভোর ছটায় বৃষ্টির ভেতর নীচের থেকে একটা শব্দ কানে এলো—'মুইআ নারুকনাই দা মুইআ?' করুল রাখবো নি করুল?' আমি দোতালার বারান্দা থেকে ককবরকে ডেকে বললাম, তুবুদি মুইআ, চুঙ নারুকনাই' (করুল আন আমরা রাখবো) বলতেই কাঁধের ভাড় নামিয়ে গামছা দিয়ে গা মুছতে লাগল ছেলেটা। আমার স্ত্রী ফুল কুমারী নিচে গিয়ে দু মোঠা বাঁশ কড়ুল কিনলেন তিন টাকা দিয়ে। ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম -- আছুক আই ছিরি ছিরি বিয়াঙনি ফাই? (এত ভোরে কোথা থেকে এলে?) উত্তরে সে বলল, গাবরদিনি ফাইঅ (গাবরদি থেকে এসেছি)। আমি তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। গাবরদি আগরতলা শহর থেকে কমপক্ষে ১০-১২ কিলোমিটার রাস্তা। কী ভাবে এতো ভোরে এলো সে? আসলে আগরতলা থেকে ফাড়ি পথে এলে বেশ তাড়াতাড়ি আসা যায়। সেই পথ দিয়ে রাত থাকতে বেরিয়ে আগরতলায় ট্রাইবাল মধ্যবিত্তের কাছে বাঁশের কড়ুল বিক্রী করতে এসেছে দুটো পয়সার জন্যে।

বাঁশের কড়ুল বিক্রেতা উপজাতি যুবকটি চলে যেতেই স্ত্রী তাঁর মাতৃ ভাষায় বললেন, 'তাকলাই আগুন মাছ জরা মুইআ চাইমানানূ, উআতূই তঙখ বা' --'এবার অগ্রাহায়ণ মাস পর্যন্ত বাঁশের কড়ুল খাওয়া যাবে, বৃষ্টি আছে তো।'

বাঁশের কড়ুল কিনে দিয়ে আমি গেলাম নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায়। গিয়ে দেখি তিনি খোলা বারান্দায় বসে কাইপেঙ-মলছুম-রাঙখল-রূপিনী উপজাতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর একটা প্রবন্ধ লিখছেন দৈনিক সংবাদের জন্যে। আমি যাওয়ায় লেখা থেমে গেলো বন্ধুবরের। বললেন, "দুধ নেই, লাল চা খান।" বলেই বন্ধুবর চা বানাতে গেলেন। আমি ঘরের মধ্যে বসে এদিক-ওদিক তাকাতেই বিছানার ওপর পান্নালাল দাশগুপ্ত সম্পাদিত " The Common Perspective for North-East' বইখানা চোখে পড়লো। বইখানা আমার স্মৃতিবিজড়িত। ১৯৬৬ সাল। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র- ছাত্র সংসদের কোষাধ্যক্ষ। ওই সময় পান্নালাল দাশগুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে ভারতের উপজাতি নেতাদের নিয়ে একটা সেমিনার করলেন। সেই সেমিনারে পড়া 'পেপার' গুলো নিয়ে এই মহামূল্যবান সঙ্কলন। পান্নালাল দাশগুপ্তের সহকারী অমলেন্দু গাঙ্গুলি আমাকে সেমিনারে উপস্থিত উপজাতি অতিথি বৃন্দের পরিচর্যার ভার দিয়েছিলেন। চৌরঙ্গির কাছে জাদুঘরের পাশে কিড স্ট্রিটের এম.এল.এ হোস্টেলে অন্যান্য উপজাতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ছিলেন নাগাল্যান্ডের রানী গুঁইদালো এবং মেঘালয়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন ইউলিয়ামসন ছাঙমা। রোজ রাত্রে ক্যাপ্টেন ছাঙমাকে বিয়ার খাওয়াতে হতো। সেমিনারের কর্মকর্তাদের নির্দেশমতো রানী গুঁই দালোর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হতো আমাকে। ইংরেজি-বাঙলা দোভাষীর কাজও করতে হতো আমাকেই। ক'দিনের মধ্যেই নাগাল্যান্ডের রানী খুব পছন্দ করে ফেলেছিলেন আমাকে। সবসময় সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম আমি তাঁর। সেমিনার চলাকালীন রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতিদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁকে হাত ধরে একেবারে মঞ্চের সামনে নিয়ে যেতেই লেডি রানু মুখার্জী উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং আমাকে বললেন তাঁর পাশে বসতে। আমি লেডি রানুকেই রানীর পাশে বসিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রসদনের গেটে চলে এলাম অন্যান্য উপজাতি অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানাতে। এই অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন আগরতলার উপজাতি নেতা ক্যাপ্টেন পি সি রায়-প্রভাত রায়ের ভাই।

বইখানা অনেক কথা মনে পড়িয়ে দিলো আমাকে। আশুতোষ হলে সেমিনার চলাকালীন বর্তমানে শতবার্ষিকী ভবনের এক তলায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতীয়দের পোশাক-পরিচ্ছদ ও হস্ত শিল্পের একটা প্রদশনী হয়েছিলো। সেমিনারের লাঞ্চ সেরে আমি প্রদর্শনী হলে ঢুকে দেখি নাগা নেতা ফিজোর বোন ট্রাইবাল পোশাকে ঘুরে ঘুরে একা একা প্রদর্শনী দেখছেন। আমি কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বিনীতভাবে বললাম, "Madam do you feel lonely ? " আমার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসি হাসলেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম আমরা। প্রদর্শনী দেখতে দেখতে তিনি আমাকে চোস্ত্ ইংরিজিতে যা বললেন তার অর্থ — 'তোমরা সমতলের লোকেরা আমাদের পার্বত্য-লোকদের বুঝতে চাওনা কখনো। যার জন্যে এত ভুল বোঝাবুঝি। পারলে এসো আমাদের রাজ্যে, তোমাকে রানী খুব পছন্দ করেছেন।'

হঠাৎ নগেন্দ্র বাবু লাল চা নিয়ে হাজির হতেই ফিজোর বোন স্মৃতির পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। নগেন্দ্র বাবুকে বললাম বইখানার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা। আরো বললাম, 'জানেন, আমার স্যার ডঃ সুহাস চ্যাটার্জীর একটা লেখা আছে এই সঙ্কলনে ভারতের উত্তর-পূর্বঞ্চলের ভাষার ওপর, সেখানে ককবরক ভাষায় কথাও আছে।' এমন সময় বাইরে থেকে ডাক শোনা গেলো, 'মুইআ

নারুকনাই, দা, মাইআ (কডুল রাখবে নাকি কডুল)।' নগেন্দ্রবাবু ছুটে গিয়ে হাঁক ছাড়লেন, " নারুকনাই, নারুকনাই, তুবদি মুইআ (রাখবো রাখবো, নিয়ে এসো বাঁশের কডুল)।" আমাকে বললেন, 'বসুন কুমুদ বাবু, বাশেঁর কডুল কিনি আগে ।' আমিও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম চায়ের কাপ হাতে নিয়ে । দেখি, আমি যে ছেলেটির কাছ থেকে কডুল কিনেছিলাম, সে-ই ।

নগেন্দ্রবাবুকে বললাম, 'এখন উঠি, গিয়ে হোম-ফ্রন্ট সামলাই, বাজারে যেতে হবে, আপনার মারেকে (বান্ধবীকে) খুব ভয় পাই আমি ।' উনি বললেন চলুন, 'আমিও যাবো আপনার সঙ্গে বাজারে সিকিউরিটি ছাড়াই ।' আমরা দুজনে এলাম আমাদের বাসায় প্রথম । উনি ওপরে উঠে আমার স্ত্রীকে বললেন, 'মারে,নন' গ্যাসনি ব্যবস্থা খূলাই রুইদা মান নাইগৃরানা'-- 'তোমাকে গ্যাসের ব্যবস্থা করে দিতে পারি কিনা দেখি ।' তাঁর কথা শুনে আমার স্ত্রী খুশী হলেন খুব । আস্তাবল বাজারে গেলাম আমরা সুপুরি বাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটে । প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রীকে এইভাবে বাজারে যেতে দেখে অনেকেই হকচকিয়ে গেলো । শিক্ষা বিভাগের রমেন ভট্টাচার্য নমস্কার করে কথা বললেন তাঁর সঙ্গে । চিত্রপরিচালক দেবাশিস সাহা তাঁর সঙ্গে আজ দুপুর ১১ টার সময় একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিলেন । আমি কুড়ি টাকায় ইলিশ কিনে সর্বস্বান্ত, অগত্যা প্রাক্তন মন্ত্রীর কাছ থেকে তিন টাকা নিয়ে দুটাকার কাঁচা লঙ্কা ও এক টাকার পান নিয়ে দুজনে আবার হাঁটতে হাঁটতে আমার বাসায়, সেখান থেকে তাঁর বাসায় । বাসায় ফিরেই আমার সৌজন্যে নিজের হাতে লেবুচা করে খাওয়ালেন আমাকে। তারপর বাড়ি ফিরলাম দুপুরে।

৬ ই অক্টোবর, ১৯৯৫, শুক্রবার । ভোরে উঠে ছাঁদ ঝাঁট দিয়ে এঁটো-কাটা ফেলে গেলাম রাজ-দীঘিতে নাইতে । নেয়ে এলাম দৈনিক সংবাদে । পুজোর চারদিন ছুটি থাকার পর আজ পত্রিকা বেরিয়েছে । আমার বরাদ্দ দৈনিক সংবাদ বেছে নিলাম প্রভাত ও গৌরাঙ্গদার সামনে । তারপর চশমা ছাড়া চোখে হেড লাইন দেখতে দেখতে এলাম বিদুরকর্তা চৌমুহনীতে । সেখানে দাঁড়িয়ে একটা ষাঁড়েব গতিবিধি লক্ষ্য করে দ্রুত পা চালিয়ে গেলাম কর্নেল চৌমুহনীতে। ঢুকলাম ত্রিপুরা দর্পণে । ত্রিপুরা দর্পণের হেডিং দেখেতো চক্ষু চড়ক গাছ । পুজোর ক'দিনে উগ্রপন্থীরা পুলিশ-সি.আর. পি. সহ ১৩ জন লোককে মেরে ফেলেছে । দৈনিক সংবাদে মৃত্যুর সংখ্যা সাত আছে ।

বাসায় ফিরে স্ত্রীর পাঁচখানা শাড়ি নিয়ে ইস্তিরি করতে দিয়ে এলাম বলরামের কর্ণেল চৌমুহনীর লন্ড্রিতে । ফিরে শুয়ে শুয়ে থাই ভাষার বইখানা দেখছি, এমন সময় একুশ শতকের সম্পাদক সুভ্রত দেব একুশ শতক পুজো সংখ্যা দিয়ে গেলেন । একুশ শতক পুজো সংখ্যা পেয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেলো । এবার আমরা আর অন্য পত্রিকার পুজো সংখ্যা কিনিনি, একুশ শতক পাব বলে । সত্যিই ভাল হয়েছে পুজো সংখ্যাটা । পুজোর সংখ্যায় আমার ছেলে সুরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরীব কবিতা বেরিয়েছে দেখলাম । পত্রিকা আমার হাতে আসতেই, বন্ধুবর জগৎজ্যোতি রায় ও অধ্যাপক সুদীপ বসুর প্রবন্ধ দুটো পড়ে ফেললাম এক লহমায় । বেশ ভাল হয়েছে প্রবন্ধ দুটি। আর সব পরিচিতদের লেখা গল্প-কবিতা-উপন্যাস দেখে পুলকিত হয়ে উঠলাম । সুরঞ্জন বললে, "একুশ শতক পুজোর সংখ্যার মান দারুণ স্ট্যাণ্ডার্ড হয়েছে ।" ডান পায়ের ব্যাথার জন্যে সারা দিন রেস্ট নিলাম । সন্ধ্যে বেলায় বেরিয়ে গেলাম দর্পণ অফিসে । দর্পণ সম্পাদক সমীরণ রায়ের হাতে সুধন্বা দেববর্মার "কি করে রাজনৈতিক জীবনে জড়িয়ে পড়লাম" লেখাটা ফাইলে করে দিয়ে এলাম । বাসায় ফিরতেই এলেন জহর আচার্য । তিনি রাজেন্দ্র কীর্তিশালার ১৬ খানা চিঠি দিয়ে গেলেন আমাকে বিলি করবার জন্যে । বললাম তাঁকে, কাল সকাল থেকে চিঠি বিলি করা শুরু করে দেব ।

৭ ই আক্টোবর, ১৯৯৫, শনিবার । সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ রাজেন্দ্র কীর্তিশালার চিঠি নিয়ে

বেরলাম। প্রথমে গেলাম ডঃ আভা রায় বর্মণের বাড়ি। সেখান থেকে এলাম নীল-করবী। কলিং বেল টিপে দোতলায় উঠে করবীদিদের বসার ঘরে বসলাম। দেখলাম, ডাইনিং রুমে বসে ডাক্তার বাবু ব্রেকফাস্ট করছেন। আমার জন্যেও জলখাবার এসে গেলো। কিছুক্ষণ বাদে করবী দেববর্মণ এলেন। তাঁকে দেখেই কেমন যেন মনে হলো, মুখটা খুব ভার। কিডনির অপারেশনের পরে ম্যাডাম বেশ চলেফিরে বেড়াচ্ছেন, মিটিং-সেমিনারে যাচ্ছেন, বক্তৃতা করছেন, লেখা চাইলে লেখা দিচ্ছেন, কাউকে বিমুখ করছেন না, রাধামোহন ঠাকুর একাডেমী গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। গত বইমেলায় ডাক্তার বাবু ও তিনি দারুণ পরিশ্রম করে ককবরক ভাষার প্রথম ছাপা বই রাধামোহন-সমগ্র বের করেছেন—মনেই হয় না তিনি অন্যের কিডনি নিয়ে চলছেন। এসেই বললেন, 'জানেন কুমুদবাবু, শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছে না, ডাইবিটিস ধরা পরেছে, ক্লান্তি আর ক্লান্তি।' তাঁর হাতে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার মিটিংয়ের চিঠি দিতেই বললেন, 'জহর আচার্যীর সংগ্রহ শালায় ত্রিপুরার অনেক কিছু আছে শুনেছি। জানেন কুমুদ বাবু, রাজ-বাড়িতে আমাদের রাজা-রানীও একটা মিউজিয়াম করতে পারতেন। টিকিট কেটেও সেই মিউজিয়াম দেখতে পারত মানুষেরা। কত জিনিস ছিলো রাজবাড়িতে, অমূল্য সম্পদ সব। মহারাজ বীরবিক্রম মারা যাবার পর সব কিনা ট্যাগ লাগিয়ে লাগিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হলো। আগরতলার বহু বাড়িতে রাজবাড়ির আসবাপত্র দেখতে পাই--মেহগিনি কাঠেব সব, দেখলেই চিনতে পারি। কিন্তু মজার কথা কি জানেন, কেউ স্বীকার করে না রাজবাড়ির বলে। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের সংগ্রহ শালায় রাজবাড়ির কতো সব ছিলো। কোথায় যে সব গেলো! কোন দরদ নেই এখন। রাজপ্রাসাদও বিক্রি হয়ে গেলো। জানেন, এই রাজপ্রাসাদ বিক্রি করার ব্যাপার নিয়েই তো আগের রানীর সঙ্গে মহারাজ কিরীট বিক্রমের ঝগড়াঝাটি হয়, তারপর তো অভিমানে রানী হীরের আঙটি চুষে আত্মহত্যা করেন।'

শ্রীমতী করবী দেববর্মণের বাড়ি থেকে ফিরে দুপুরের দিকে স্ত্রী ও দু'মেয়েকে নিয়ে স্ত্রীর বাপের বাড়ি হেরমার দিকে রওনা দিলাম। পুত্র সুরঞ্জন বাসায় থাকল শুধু। বটতলায় গিয়ে ৮৮১ নং সোনামোড়ার বাসে টিকিট কাটার চেষ্টা করতেই কণ্ডাক্টর বাসে বসার টিকিট দিতে অস্বীকার করায় খুব ঝগড়া করলাম তার সঙ্গে। লোক জমে গেলো। তারপর বাছাধন ঠিকই টিকিট দিলো। চড়িলাম থেকে হেরমা যেতে সন্ধ্যে হয়ে গেলো। তখন সবে মাত্র গৌরচাঁন শিল্ডের ফাইনাল খেলা শেষ হয়েছে, কমরেড ভানুলাল সাহার গলা শোনা গেলো আমার স্ত্রীর বাড়ির মাঠ থেকে। আমার স্ত্রীর ভিটে বাড়ির মাঠটায় খেলা হচ্ছে। এই মাঠের পজিশান এমই যে মাঠটা সকলের চোখে পড়েছে। এখন সেখানে একটা প্লে সেন্টার করার জন্যে সকলে মাঠটি চান। কিন্তু ওই তো একমাত্র সম্বল আমার স্ত্রীর। ১৯৭৮ সালে জমিটা কিনে মাটির দেওয়াল দেওয়া একটা বাড়ি করেছিলাম। ৮০'র দাঙ্গায় বাড়িটা পোড়েনি। বাড়িটায় তাঁতের কারখানা করেছিলাম ১৯৮৪ সনে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে। কিন্তু বাড়িটা পুড়ে যায় আমাদের সর্বস্বান্ত করে দিয়ে। এখন আমরা বাসা ভাড়া নিয়ে আগরতলায় থাকি। স্ত্রীর নয়ন মনোহর মাঠে ছেলে-মেয়েরা খেলাধুলো করে। এখন সেখানে প্লে সেন্টার হলে আমার স্ত্রী একেবারে পথে বসে যাবেন। তবে সরকার যদি জায়গাটা উচিত মূল্যে কিনে নেন, তাহলে ওই টাকায় আমরা আগরতলায় একটুকরো জমি কিনতে পারি। কিন্তু আমার ছেলে-মেয়েরা নারাজ, আমার ছোট মেয়ে বলে, 'খবরদার বাবা, বাড়িটা বিক্রি করো না। আমি একটা ভাল বাড়ি করবো ওখানে।' খেলা শেষে হেরমা বাজারে ঢুকে দেখি আজ লক্ষ্মী পুজোর দারুণ বাজার জমেছে সেখানে। খেলা শেষে বিজয়ী বাঁশতলী গাঁও সভার খেলোয়াড়রা শিল্ড নিয়ে ব্যান্ড পার্টি বাজাতে বাজাতে বাজার প্রদক্ষিণ করলো। লোকে লোকারণ্য হেরমা বাজার। মনে মনে বললাম, ধন্য আমার দাদাশ্বশুর গৌরচাঁন ঠাকুরের বাজার।

৮ ই অক্টোবর, ১৯৯৫, রবিবার । শ্বশুর বাড়ির ট্রাইবাল ভিলেজে ঘুম ভেঙ্গে গেলো ভোর সাড়ে চারটেয় । ছোট দাদা শ্বশুর তারিণী দেববর্মার পাকা পায়খানায় প্রাকৃতিক ক্রিয়া সেরে চলে গেলাম পাহাড়ী আন্দি নদীর স্রোতে সাঁতার কাটতে । স্নান সেরে ফিরে আসতেই শাশুড়িমা তিলের নাড়ু ও নারকেলের সন্দেশ খেতে দিলেন, সঙ্গে দিলেন দুধ-চিনি ছাড়া লাল টুকটুকে লবন চা । ট্রাইবাল বাড়িতে লবণ চা দারুণ হয় । চা খেতে খেতে স্ত্রী ফুলকুমারী বললেন, "গতরাতে কাকা বীরকুমার এসেছিলেন, তোমাকে যেতে বলেছেন । আর আজ দুপুর বা রাতে আমাদের নিমন্ত্রণ, কাকী জ্যোৎস্নার বড় শূকরটা কাটবে আজ । বাঁশতলীর লোটন দেববর্মা ৪৫ টাকা দরে সব মাংস কিনে নেবে ।" আমি বললাম, "কাকা বীরকুমারের বাড়ি গেলে আমাদের বাড়ির মাঠের কথা উঠবে, সোমরস পানের আসর বসবে , কোন কথা উঠতে কোন কথা উঠবে, কাজেই গিয়ে দরকার নেই ।" এই কথা বলে আমি চলে গেলাম পাশের গৌরকপরা পাড়ায় সি.পি.আই এর এ.ডি.সি'র সাবজোনালের রঙমালা গাঁও সভার চেয়ারম্যান হরমণি দেববর্মার বাড়ি মিটিং করতে ।

চেয়ারম্যান হরমণি দেববর্মাকে নিয়ে গেলাম পাশের পাড়া মণিরাম ঠাকুর । সেখানে যাবার পথে আমার শালী ও ভায়রাভাই (ছায়ারানী ও কৃষ্ণকান্ত) কে খুঁজে গেলাম । কিন্তু দেখলাম, তাঁরা ঘরের দরজা বন্ধ করে গেছেন পাশের বাড়ি টি.ভিতে চন্দ্রকান্ত দেখতে । মণিরাম ঠাকুর পাড়ায় সি.পি.আই. এর কর্মী শৈলেশ দেববর্মার বাড়িতে মিটিঙে বসলাম আমরা । শৈলেশ বাবুর স্ত্রী মাতলী সম্পর্কে আমার পিসী শাশুড়ী । শৈলেশ বাবুদের বাড়ি বসে কমিউনিস্ট পার্টির মিটিং করতে করতে পুরনো সি.পি.আই কর্মীদের মুখে শোনা অনেক কথাই মনে পড়লো । শৈলেশ বাবুর ঠাকুরদাদা প্রয়াত দেবেন্দ্র জমাদার ছিলেন রাজভক্ত । কমিউনিস্ট পার্টির জুলুমের শিকার হতে হয় তাঁকে। সি.পি.আই-এর বলঙ বরক (বন্য বাহিনী)-রা জোর করে জমাদার সাহেবের পুকুরের বড়ো বড়ো রুই-কাতলা মাছ ধরে নিয়েছে একাধিক বার । জমাদার সাহেবের বিরাট বিরাট শূকর মেরে কমিউনিস্ট বিরোধী হবার ঝালও মিটিয়েছে পঙক্তি ভোজনের মধ্য দিয়ে । পরে অবশ্যি কমিউনিস্ট পার্টি পঞ্চাশের দশকের এই ভুল স্বীকার করেছে। বিয়ের পর আমি দেবেন্দ্র জমাদারের কাছে যেতাম ভাষার কাজের ফাঁকে ফাঁকে। উনি অনেক তুক্-তাক ও জানতেন । আমার বিয়ের ফুলশয্যার রাতে গৃহপ্রবেশের সময় তিনি আমাদের ঘরের দোরগোড়ায় মন্ত্রপূত লোহার শিক পুঁতে দিয়েছিলেন । কারণ, আমার বিয়েতে গন্ডগোল হয়েছিলো । ট্রাইবাল সমাজের যুবকদের এক অংশ চাননি আমি তাঁদের সমাজে বিয়ে করি। ফুল কুমারী দেববর্মাকে বিয়ে না করার জন্যে দু'তিন খানা উড়ো চিঠি পেয়েছিলাম আমি । অথচ ফুলকুমারীর সঙ্গে আমার বিয়ে কোনো প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নয় । এটা ছিলো পুরোপুরি প্রস্তাবিত বিয়ে । আমার ককবরক ভাষার কাজের তথ্যসরবরাকারী (informant) যোগেন্দ্র দেববর্মার স্ত্রী চাঁদলক্ষ্মী দেবী, যাঁকে আমি মাসিমা বলে ডাকতাম, তিনিই এই আর্য-মোঙ্গল অসবর্ণ বিয়ের ঘটকালি কবেছিলেন এবং আমি রাজীও হয়েছিলাম এক কথায় । যুবকেরা একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, 'গ্রামঞ্চলে ট্রাইবাল বাঙালির বিয়ে আমরা বর্তমানে পছন্দ করছিনা । এক সময় মোহন চৌধুরী বিয়ে করেছিলেন আমাদের সমাজের মধ্যে, কিন্তু সে সময় আর এসময়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান । আপনি ট্রাইবাল সমাজে বিয়ে না করলে খুশী হবো ।' পরে আমার শ্বশুর বাড়ির হেরমা গ্রামের আশপাশের ট্রাইবাল সর্দারেরা বসে এই বিয়ের পক্ষে রায় দেন আমার শ্বশুরমশায়ের ঠাকুরদা রামহরি ঠাকুরের বাড়িতে বসে । রামহরি ঠাকুরের তখন ১২৯ বছর বয়েস। তিনি ছিলেন রাজার আমলের ২নং মন্ডলের মনোনীত সর্দার । তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন এই বিয়েতে । তাঁর কথা ছিলো, 'আমাদের ভাষা নিয়ে গবেষণা করছে যে ছেলে তার আবার জাত কি ? এ বিয়ে হবে ।' কিন্তু যুবকেরা শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়েনি । বিয়ের আগের রাতে সদ্যনির্মিত বিবাহ-বেদীতে

টেনসিল কাটা কাগজে লটকে দিয়ে গিয়েছিলো আমার বিরুদ্ধে চরম পত্র। শেষ পর্যন্ত খুব সতর্কতার সঙ্গে এই বিয়ে হলো। বিয়ের সাতপাকের সময় ফুল ছিটানো বন্ধ রেখেছিলেন আমার শাশুড়ীমা। ওই ফুল নিয়ে অনেকে তুকতাক করতে পারে এই ভয়ে। ফুলশয্যার রাতে এলাকার বিখ্যাত গুনিন দেবেন্দ্র জমাদারকে খবর পাঠিয়ে ডেকে এনেছিলেন আমার শ্বশুরমশায় গণেশ দেববর্মা। তখন থেকেই জমাদার সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি জীবিত থাকতে প্রায়ই যেতাম তাঁর বাড়িতে ককবরকে তুক-তাক জনিত শব্দ সংগ্রহ করতে। দেখতাম, গীতা-মহাভারত-রামায়ণ পাঠ করে শোনাতেন আসর করে। পঞ্জিকা পাশে নিয়ে সবসময় বসে থাকতেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন, আমি কমিউনিস্ট পার্টির লোক। তবু তাঁর কাছ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির জোর জুলুমের কথা কোনদিন শুনিনি আমি। আমাকে কেমন যেন সমীহ করতেন। বলতেন, "আপনি তো আমার নাতিনজামাই। বাঙালি পোলার সঙ্গে আমার নাতনীর বিয়ে অইছে, বালোই অইছে। মন্ত্র পইড়া ছরনি ছিক (লোহার শিক) পুইত্যা দিয়া আইছি, কেউ ক্ষতি করতো পারতো না।"

সেই কমিউনিস্ট বিরোধী রাজভক্ত জমাদার সাহেবের বাড়ির লোকেরা এখন সেই সি. পি আই. পার্টি করছে। দিনকাল কতো পরিবর্তন হয়েছে। পার্টি মিটিং চলাকালীন পিসি শাশুড়ী চা খাওয়ালেন দু'দুবার। সি. পি. আই.-এর রাজ্য কমিটির সদস্য সেনকুমার দেববর্মা, সম্পর্কে যিনি জমাদার সাহেবের আপন ছোট ভগ্নীপতি, তিনিও উপস্থিত ছিলেন এই মিটিংয়ে। মিটিং সেরে হরমণি বাবুর সঙ্গে ফেরার পথে আবার ঢুকলাম ভায়রা ভাইয়ের ঘরে। শালীর ছেলে উৎপুলকুমারকে দু'টাকা দিলাম লক্ষ্মীপুজোর বাজি কিনতে। তারপর পা বাড়ালাম শ্বশুরবাড়ি হেরমা পাড়ার দিকে। গিয়ে শুনি কাকা বীরকুমারের বড়ো শূকরটা কাটা হয়েছে, মেয়ে-জামাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন কাকা শ্বশুর। আমাদের যাবার কথা শুনে আমার বড়ো শালা বিশ্বকুমার বললো—'যেয়োনা তোমরা, কাকা-কাকীতে খুব ঝগড়া হয়েছে শূকরের মাথা রাখা নিয়ে। কাকী চেয়েছিলেন শূকরের মাথাটা ছোট করে রাখতে, আর কাকা রেখে দিয়েছেন বড় করে, প্রায় দু'ফাড়ি (দশ কেজি) হবে।' এবার আমার বড় শালা তার মাতৃভাষা ককবরকে বললো, 'কাকা বাই কাকী উআলাইমানি হামচুগলয়া, খাবুই মা ফাইকা আঙ' - (কাকার সঙ্গে কাকীর দারুণ ঝগড়া হয়েছে, পালিয়ে এসেছি আমি)। আমি বললাম, 'কাকী কাকা বীরকুমারের ওপর রাগ করে ঠিকই করেছেন; কত কষ্ট করে শূকরটা পুষে এতো বড়ো করেছেন তিনি, এক ফাড়ির মতো মাথাটা রাখতে পারতেন কাকা, তাহলে কাকী আরো কম করে দু'শ-আড়াইশ টাকা বেশী পেতেন; আসলে শূকরটাতো কাকীরই।'

আমার কথা শুনে আমার স্ত্রী ফুলকুমারী একটু রাগের সঙ্গে বললেন, "খুব হয়েছে, শাশুড়ীর হয়ে তোমার এতো 'হাওগাড়ি' করতে হবে না; কাকা ঠিকই করেছে, আমরা দলে-পালে মিলে 'উআক বখরক মছদেঙ চানাই' (শূকরের মাথার ভর্তা খাবো)।" শূকরের মাথার ভর্তার কথা শুনে সত্যিই জিভে জল এলো আমার। ত্রিপুরার ট্রাইবাল বাড়ির শূকরের মাথার ভর্তা আমার মনে হয় জগতের এক অনন্য মুখরোচক খাদ্য। ট্রাইবাল বাড়ির জামাই হয়ে বহুবার এই অতি সুস্বাদু ভর্তা দিয়ে রসনা তৃপ্ত করেছি আমি। ফুলকুমারীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চল যাই আমরা, শ্বশুর-শাশুড়ীতে ঝগড়া, মেয়ে-জামাই গেলে সব থেমে যাবে।' আমার কথা শুনে শাশুড়ীমা বললেন, 'দিপর' তা থাঙদি, চুঙ আরনি উআহান তুবুখা, আব-ন চাদি তাবুক, হরফান' থাঙদি আয়াঙ' (দুপুরে যেয়ো না, আমরা ওখান থেকে শূকরের মাংস এনেছি, তাই খাও এখন, পারলে রাতের দিকে যাও ওদিকে)।

রাতের দিকে কাকা শ্বশুরের বাড়ি আর যাওয়া হল না আমাদের। স্ত্রী বললেন, তাঁর মাতৃভাষায়, 'চুঙ তাই থাঙলিয়া কাকাছঙনি আর'। চুঙ তিকিমানগূলাক আর' থাঙগূই। বরগ কুবাঙমা চুআক নূঙলাইয়ানু

উআক বথরক মছদেঙবাই, পদেরপদকক ফাইআনু, চিনি মাথনি কক-ব কাছাআনু, চৃঙ তাই থাঙলয়া, মুকতিনি বুফা' (কাকাদের দিকে আমরা আর নাইবা গেলাম, আমরা টিকতে পারবো না সেখানে গিয়ে। তাঁরা শূয়োরের মাথার ভর্তা খেতে খেতে মদ খাবেন বতল বতল, নানারকম কথা উঠবে, আমাদের বাড়ির মাঠের কথাও উঠতে পারে। আমরা আর যাই না, মুক্তির বাবা)। আমার বড়োছেলে সুরঞ্জনের ডাকনাম মুক্তি। তাই আমার স্ত্রী আমাকে সবসময় 'মুক্তিনি বুফা' (মুক্তির বাবা) বলে ডাকেন।

৯ই অক্টোবর, ১৯৯৫, সোমবার। সারা রাত বৃষ্টি পড়েছে টিপ টিপ করে। গত রাতে হজাগিরি (কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা) গিয়েছে, যুবক-যুবতীদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে অন্যের বাড়ি থেকে চুরি করার আনন্দটাই মাটি করে দিয়েছে। ভোর চারটেয় উঠে দেখি তখনো বৃষ্টি পড়ছে। তখন আমার লেগেছে পাইখানা, গতকাল বেশী করে শূকরের মাংস খাবার জের। এইদিকে ছাতিও নেই শ্বশুরের ঘরে, কাছে পাইখানাও নেই যেতে হবে সেই আন্দি নদীর পাড়ে। তখনও ঘোর ঘোর ভাব, পিঠে শ্বশুর মাশাইয়ের গামছাখানা ফেলে চলে গেলাম আন্দি নদীর ধারে উন্মুক্ত ধান খেতের ভেতর। বাড়ি ফিরতে দেখি ঐ ঘোর ঘোর অবস্থায় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমার ছোট মেয়ে দেবযানী একটা বড় মিষ্টি কুমড়ো হাতে নিয়ে ফিরছে। তাকে ওই অবস্থায় ফিরতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় পেলি মিষ্টি কুমড়োটা?" উত্তরে সে বলল, 'কাল রাতে চুরি করতে গিয়ে তাড়া খেয়ে এক জায়গায় কুমড়োটা লুকিয়ে রেখে এসেছিলাম, এখন গিয়ে নিয়ে এলাম সেটা।' আমিতো অবাক। বাজারে এমন একটা পাকা মিষ্টি কুমড়োর দাম কম পক্ষে পঞ্চাশ-ষাট টাকা, ট্রাইবাল বাড়ির কুমড়ো হলেই তো আর কথা নেই। ঘরে ফিরে ফুলকুমারীকে ডেকে তুললাম, 'বাচাদি, আইখা,দাতি আগুলি থাঙনা নাঙগানূ' (ওঠো, সকাল হয়েছে, তাড়াতাড়ি আগরতলা যেতে হবে)। বড় মেয়ে নন্দিনী (তানিয়া) বলল, 'বাবা, দেবু (দেবযানী) আর আমি আজ যাবো না, বুধবারে মারে (বান্ধবী) চাফুর সঙ্গে একসঙ্গে যাবো।'

আমিতো জানি, দেবযানীর আজ যাবার কোন প্রশ্ন উঠে না, সারা রাত তারা চুরি করেছে আজ দুপুর বেলায় তারা দলে-পালে রান্না করে খাবে, তারপর ঘুমুবে রাত অবধি। সকাল ঠিক ছটায় আমরা স্বামী-স্ত্রীতে বেরিয়ে পড়লাম, বাড়ির থেকে চড়িলামের দিকে। ভাবলাম কাকা-কাকীর সঙ্গে দেখা করে যাওয়াই ভাল, কাল নিমন্ত্রণে আসিনি, শেষে কাকা বীরকুমার ও কাকী জ্যোৎস্না কী মনে করবেন, শেষে-জামাই কোন বিপদে না পড়ে। কাকার উঠনে পা রাখতেই কাকীর সঙ্গে দেখা। আর যাই কোথায়? বিশুদ্ধ ককবরক ভাষায় কাকী জ্যোৎস্না বললেন, 'নরগ মিয়া তাঙগৃই ফাইয়া উঙ, চৃঙ নাইছিঙমাঙ তঙবেলে, নরগনি বানতা ছাব' চানাই, তাবুক চাই থাঙনা নাঙগানূ, থ নগ', চাউই-নূঙগৃই থাঙনা নাঙগানূ' (তোমরা কাল আসোনি কেন, আমরা তো অপেক্ষা করেছিলাম, তোমাদের ভাগ কারা খাবে, এখন খেয়ে যেতে হবে তা) চল ঘরে, খেয়ে-দেয়েই যেতে হবে)।

কাকী শাশুড়ীর হৈচৈতে ইতিমধ্যে কাকা বীরকুমারেরও ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "ব্যাপার কী তোমাদের, রাগ করলে নাকি আমাদের উপর? কালকের দিনটা কেমন গেছে জানো। এক তোমাদের কাকীর সঙ্গে রাগারাগি শূকরের মাথা নিয়ে, তারপর সব খেলোয়াড় খাবে, তার ওপর আছে লক্ষ্মীপুজোর পাহারা, পাহারা না দিলে তো পুকুরের মাছ পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে যেতো, কোনদিকে সামলাবো বল ?"

কাকা আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় কাকী থালার ওপর সাজিয়ে দু'বাটি মাংস, দু'প্লেটে শূকরের মাথার ভর্তা, আর বাম হাতে এক বোতল সোমরস (মদ) এনে উপস্থিত। 'তাবুক বেবাক চাউই থাঙনা নাঙগানূ, নরগনি বানতা ছাব চানাই?' (এখন সবই খেয়ে যেতে হবে তোমাদের ভাগ কে খাবে?)

১৬ই অক্টোবর, ১৯৯৫, সোমবার। খুব সকালে উঠে 'রেডিওটক'টা লিখতে বসলাম। আকাশবাণী আগরতলার কেন্দ্র আমাকে একটা রেডিওটক দিয়ে বিপদে ফেলে দিয়েছে। টকটার নাম 'ককবরক ভাষার উন্নয়নে বাংলার ভাষার অবদান'। এমন একটা বিতর্কিত বিষয় নিয়ে লেখা আমার পক্ষে খুবই কঠিন। কারণ, ককবরকের দুটো যুযুধান শিবির। এক শিবির বলছে বাংলা ককবরকের ক্ষতি করছে, আর এক শিবির বলছে, না, বাংলা ভাষার প্রভাবে ককবরক ধনী হয়ে উঠছে। কাজেই খুব সতর্কতার সঙ্গে আমাকে লেখাটা তৈরী করতে হচ্ছিল। এমন সময় আমার ঘরণী মোঙ্গলিনী ফুলকুমারী এসে বললেন, 'বাজার' থাঙদি, কেরচি থপছা ফান' কুরুই, কেরচি তুবুখে মাইমুই ছুঙনা কুলাইআনু (বাজারে যাও, একফোঁটাও কেরোসিন নেই, কেরোসিন আনলে পর ভাতটাত রান্না হবে)। এমন একটা কঠিন লেখার রসভঙ্গ হয়ে গেলো। কেরোসিনের ডিব্বা নিয়ে ছুটলাম আস্তাবল বাজারে, সঙ্গে একটা ব্যাগও নিলাম যদি কিছু কুচো মাছ-টাছ পাই। আস্তাবল বাজারের প্রথম গলিটার আগেই দেখি আমার পরিচিত সেই বিহারী ছেলেটা প্রকাশ্যেই কেরোসিন বিক্রি করছে ব্ল্যাকে। তাকে দেখে বললাম, 'কিরে, সরকার দেখলাম খুব কড়াকড়ি করেছে, আর তুই এভাবে কেরোসিনের টিন নিয়ে বসে আছিস?' উত্তরে সেই বলল—'কিতা করুম, বাবু, লোকে তো কিনতো চায়।' পাঁচ লিটার কেরোসিন ৩৫ টাকায় কিনে ছুটলাম মাছের বাজারে। ২৫০ গ্রাম পুঁটি মাছ কিনলাম দশ টাকায়, আর ৩৫০ গ্রাম কুচিচিংড়ি নিলাম দশ টাকায়— এই মোট কুড়ি টাকার মাছ, আর ব্ল্যাকে কেনা পঁয়ত্রিশ টাকার কেরোসিন নিয়ে সুপুরি বাগানের ভেতর দিয়ে বাসার দিকে পা দিলাম। যেতে যেতে মনে মনে আওড়ালাম 'কেরচি'। বাঃ কি সুন্দর, ইংরিজি কেরোসিন বাঙালির মুখে হয়েছে কেবাচিন, আর ককবরক ভাষীরা বলছেন কেরচি। রেডিও টকে বহিরাগত এই কেরচি শব্দটা রাখতে হবে। বাসায় ঢুকেই কেরোসিনের ডিব্বা আর মাছের ব্যাগটা বড়োমেয়ে তানিয়ার হাতে দিয়েই চলে গেলাম কর্নেল চৌমুহনী ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা আনতে।

আমার ছাত্র সুবীর শেখর অধিকারীর হাত থেকে পত্রিকা নিতেই দর্পণ-সম্পাদক আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন—' মহেন্দ্রদার শরীর খুব খারাপ, কি হয় বল যায়না, এখন যাচ্ছি আমি।' আমি বললাম, 'রেডিও টক আছে আমার, দশটায় রেকর্ডিং, রেকর্ডিং সেরে মহেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি চলে যাবো।' মহেন্দ্র বাবুর শরীরের অবস্থা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। পেটে জল জমেছিলো মহেন্দ্রবাবুর, কলকাতা থেকে ফিরেছেন মাসখানেক আগে, এর মধ্যে আর যাওয়া হয়নি তাঁর ওখানে। মাঝেমধ্যে মেয়ে পথিকার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর শ্বশুর বাড়ির কাছে এ্যাডভাইজার চৌমুহনীতে। জিজ্ঞেস করলে বলেছেন—'কলকাতা থেকে ফিরে বাবা একটু ভালো আছেন।' বাসায় ফিরেই ছেলে সুরঞ্জনকে বললাম— 'ক্যামেরাটা তৈরি রাখ তুই, সমীরণ বললো, মহেন্দ্র বাবুর শরীর খুব খারাপ, বলা যায়না, চলে যেতে পারেন মহেন্দ্র বাবু, তুই ত্রিপুরা দর্পণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখ, ইচ্ছেমতো ছবি তুলবি তুই, বুঝলি ? আর আমি রেডিও স্টেশন থেকে সোজা চলে যাবো ওঁর বাড়ি।'

রেডিও টকটা তৈরি করে আকাশবাণীতে পৌঁছতে পৌঁছতে এগারোটা বেজে গেলো। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাবো এমন সময় স্টেশন ডিরেক্টর এন.সি. দেববর্মার সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই বললেন— 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?' বললাম— 'রেকর্ডিং আছে আমার একটা, আসতে দেরি হয়ে গেছে।' —'আজ আর আপনার রেকর্ডিং-টেকর্ডিং হবেনা; চলুন, আপনার বন্ধু মহেন্দ্র দেববর্মা চলে গেছেন, চলুন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

আমাকে প্রায় জোর করে ঢুকিয়ে দিলেন তাঁর গাড়ির ভেতর নরেন বাবু। আগের থেকেই প্রোগ্রাম এক্জিকিউটিভ মনোজ দেববর্মা বসে ছিলেন গাড়ির ভেতর। গাড়ি ছুটলো আমাদের তিনজনকে নিয়ে

মহেন্দ্র বাবুর বাড়ি। অফিসার্স কোয়ার্টার লেনে গাড়ি ঢুকতেই মনে পড়লো মনিময় দেববর্মার কথা। বছর কয়েক আগে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন এই রাস্তা থেকে, মহেন্দ্র বাবুও আজ চলে গেলেন, শুধু রইলেন দশরথ— মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেববর্মা; তাঁর শরীরও ভালো নয়, মহেন্দ্র বাবুর বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম— 'একে একে নিভিছে দেউটি।'

মহেন্দ্র দেববর্মার উঠোনে পা দিতেই দেখি নতুন একটা চৌকির ওপর উত্তর দিকে মাথা করে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন মহেন্দ্র বাবু চশমা চোখে দিয়ে ডালিম গাছের তলায়। ফুলের পাহাড় জমেছে তার দেহের ওপর। ছোট্ট উঠোনের চারদিকে ট্রাইবাল আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী, সংস্কৃতি জগতের লোকেরা, আর রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ। মহেন্দ্র বাবুর নিথর দেহটার দিকে একটু তাকিয়ে তাঁর শিয়রের কাছে ঘরের ভেতর ঢুকেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলাম আমি। তাকিয়ে দেখি সেখানে বসে আছেন প্রাক্তন মন্ত্রী রতন চক্রবর্তী, রাজকুমার কমলজিৎ সিং, স্যন্দন সম্পাদক সুবল দে, আর বন্ধুবর মানস দেববর্মণ। আমাকে এভাবে কাঁদতে দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন তাঁরা। মহেন্দ্র বাবুর মেয়ে পথিকাও এসে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন রাজকুমারের পাশে বসে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। দেখি, মহেন্দ্র বাবুর মাথার পাশে এসে বসেছেন ভূপেন দত্ত ভৌমিক, মৃণালকান্তি কর আর এন.সি. দেববর্মা। শিল্পী হীরালাল সেনগুপ্তকে দেখলাম বিমূঢ় অবস্থায় মহেন্দ্র বাবুর সাধের ছাপাখানার দিক থেকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে দেখলাম চোখ মুছতে। শিল্পী রবি সেনকে দেখলাম বিহ্বল অবস্থায় একবার বসতে একবার উঠতে। শিল্পী স্বপন নন্দী অস্থির চিত্তে একবার এদিক, একবার ওদিক করছিলেন। নেপাল দেকেও দেখা গেলো উদাম দৃষ্টিতে মহেন্দ্র বাবুর পাশে। আমার দু'জন মামা শ্বশুরকে দেখলাম মহেন্দ্র বাবুর শব দেহের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে। আমার মামা শ্বশুর গৌরাঙ্গ, নিতাই দেববর্মার আপন মামাতো ভগ্নী-পতি হইলেন মহেন্দ্র বাবু। আমার ধলেশ্বরের এই মামা শ্বশুরদের মামার বাড়ি হলো অভয়নগব। মহেন্দ্র বাবু বিয়ে করেছিলেন অভয় নগরে। এবার আমি দাঁড়ালাম মহেন্দ্র বাবুর মুখের কাছে। তাকিয়ে দেখি, তাঁর শিয়রে রয়েছে গীতা আর পঞ্জিকা, গীতাকে স্পর্শ করছে তার মাথার চুল। গীতার পাশ থেকে ধূপের কুণ্ডলী বেরিয়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে তার দেহ বেয়ে। ঠিক এমন সময় শোকবিহ্বল সকলের মধ্যে বিলি করা হলো মহেন্দ্র বাবুর ছবি সমন্বিত একটা জেরক্স করা একপাতার কাগজে তাঁর আত্মপরিচিতি। তার একটা জায়গায় লেখা আছে—"মার্কসবাদ ও কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লোক সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অন্বেষণে ও পুনরুদ্ধারে ব্রতী হলেন।"

দুপুর বারোটা নাগাদ খাটের থেকে মহেন্দ্র বাবুর দেহটা তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা সরিয়ে নিয়ে গেলেন একটা পর্দার আড়ালে স্নান করাতে। সেখানে চেয়ারে বসিয়ে সাবান দিয়ে মহেন্দ্র বাবুর শরীর ধুয়ে-মুছে সাফ করা হলো মোঙ্গলীয়-ট্রাইবাল পদ্ধতিতে। পরিয়ে দেয়া হলো তার প্রিয় পরিধান পায়জামা আর পাঞ্জাবি। মাখানো হলো আতর, পাউডার। তারপর শুইয়ে দেয়া হলো আবার খাটের ওপরে চশমা চোখে দিয়ে। তাঁর মাথার দু'পাশে কলার পাতায় রাখা হলো শ্বেতচন্দন ও তুলসীপাতা। এবার মহেন্দ্র বাবুর শরীর ঢেকে দেয়া হলো গৈরিক রঙের নামাবলী দিয়ে। তাতে লেখা আছে— হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। এবার মহেন্দ্র বাবুকে চলে যেতে হবে শ্মশানে। আত্মীয়-স্বজন, শুভানুধ্যায়ীরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, বেলা বাড়ছে, অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাঁকে। কিন্তু যাঁর জন্যে দেরি হচ্ছে, তাঁকে কিছুতেই আনা যাচ্ছে না মহেন্দ্র বাবুর পায়ের কাছে। তিনি হলেন সহধর্মিনী। জোর করে এনে স্বামীর পায়ের কাছে বসানো হলো তাঁকে।

বাড়ির গেটের বাইরে অপেক্ষা করে আছে একটি ট্রাক অনেক্ষণ ধরে মহেন্দ্র বাবুকে নিয়ে যাবার

জন্যে। না, আর দেরি নয়। এবার খাট সমেত মহেন্দ্র বাবুকে ট্রাকের ওপর তুলতে হবে। আত্মীয়-স্বজনেরা জোরে জোরে উচ্চারণ করলেন— বল হরি হরি বোল, সনাতন প্রথায়। সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টরা আন্তর্জাতিক গাইতে শুরু করলেন হীরালাল সেনগুপ্তর গলায় গলা মিলিয়ে জাগো জাগো সর্বহারা।

শেষপর্যন্ত বাড়ির বাইরে ট্রাকের ওপর তোলা হলো মহেন্দ্র বাবুকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ক্রন্দন ধ্বনির মধ্য দিয়ে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব কাঁদছেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। শবযানের সামনে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে একখানা লাল শালুর ফেস্টুন, তাতে লেখা আছে— শিল্পী মহেন্দ্র দেববর্মা অমর রহে। শবযান চলতে শুরু করতেই আবার উঠলো হরিধ্বনি— বলো হরি হরি বোল। সঙ্গে সঙ্গে হীরালাল বাবুর সঙ্গে উদার কণ্ঠে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গাইতে গাইতে শবানুগমন করলেন মহেন্দ্র বাবুর হাতে গড়া অনুজ শিল্পীরা। সামনে পঞ্চাশ পেছনে পঞ্চাশ শ্মশান বন্ধুর মাঝখানে মহেন্দ্র বাবু খররৌদ্রে চলতে শুরু করলেন দেহের ওপর চাঁদোয়ার মতো টাঙানো একটা মশারির তলায়। একদম পেছনে রাজকুমার কমলজিৎ সিংহের সঙ্গে পা মেলাচ্ছিলাম আমি। তাকিয়ে দেখলাম সমীরণ রায়ের পাশ ঘেঁসে মহেন্দ্র বাবুর বহু পরিচিত মুখ হাঁটছেন। আমবা এসে গেলাম টি.আর.টি.সি'র পাশে কদমতলার মোড়ে। এবার শবযান চলতে শুরু করলো এ্যাডভাইজার চৌমুহনীর দিকে। মহেন্দ্র বাবু এবার প্রথম বারের মতো থামলেন কৃষ্ণায়নের পাশে কসমোপলিটন ক্লাবের বিদায়াভিবাদন নিতে। দ্বিতীয়বারের মতো বিরতি নিতে হলো ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার সামনে বটতলায়। দর্পণ পত্রিকার তরফ থেকে সম্পাদক সমীরণ রায়, রীনা রায় প্রমুখ মালা দিলেন মহেন্দ্র বাবুর দেহে। হঠাৎ আমার চোখ পড়লো শিল্পী রবি সেনের ওপর। তিনি 'শিল্পী মহেন্দ্র দেববর্মা অমর রহে' ফেস্টুনটা একটা তার দিয়ে ভালো করে বেঁধে দিচ্ছিলেন। আমি কাছে গিয়ে বললাম— "শিল্পীর প্রতি শিল্পীর দরদ।" রবিদা তাঁর শুভ্র লেনিনীয় দাঁড়ি মুখে হাসলেন একগাল ম্লান মুখে। এরপর মহেন্দ্র বাবুর শবযান চলতে লাগলো প্রেস ক্লাবের দিকে। আমি কমলজিৎ বাবুকে বললাম, 'প্রিনস্, লিখুন না কিছু মহেন্দ্র বাবুর ওপর, স্মৃতিচারণ করুন কিছু।' প্রিনস্ তাঁর কালো চশমা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মহেন্দ্র দেববর্মাকে নিয়ে স্মতিচারণ করা বেশ কঠিন। মহেন্দ্র বাবুর তো অনেক সত্তা, রাজনৈতিক সত্তা, সাংস্কৃতিক সত্তা। রাজনীতিতে আবার তিনভাগ— সি.পি.আই-কংগ্রেস-সি.পি.এম.।' এমনসময় আমরা এসে গেলাম নন্দলাল কর্তার বাড়ির সামনে। প্রিনস্ বললেন, 'চলুন শর্টকাট করি।' নন্দলাল কর্তার বাড়ির পুবদিক দিয়ে একটা গলি প্রেস ক্লাবে মিশেছে, রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও কমলজিৎ বাবুকে নিয়ে আমি পৌঁছলাম প্রেস ক্লাবের চত্ত্বরে, মহেন্দ্র বাবুর শবযান বিদুরকর্তা চৌমুহনী ঘুরে আসবে এই চত্ত্বরে। প্রেস ক্লাব চত্বরের মুখে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারী, সুজিৎ চক্রবর্তী, ফুলন ভট্টাচার্য, একটু দূরে বসে আছেন স্যন্দন পত্রিকার সম্পাদক সুবল দে, কল্যাণজিৎ সিং প্রমুখ তরুণ সাংবাদিকেরা দেখলাম প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে শেষ অভিবাদন জানানোর জন্যে কেমন যেন ছটফট করছেন। মরূপ পত্রিকার বয়ঃবৃদ্ধ সম্পাদক রাজকুমাব কমলজিৎ সিংকে দেখে তরুণ সাংবাদিকেরা চেয়ার এনে দিলেন তাঁকে বসতে। ফুলন ভট্টাচার্য ও সুজিৎ চক্রবর্তী কথা বলতে লাগলেন তাঁর সঙ্গে। এমন সময় মহেন্দ্র বাবুর শবযান এসে পৌঁছে গেলো প্রেস ক্লাবের দোড় গোড়ায়। সাংবাদিক মহেন্দ্র বাবুর শবদেহে প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে প্রথম মালা দিলেন ফুলন ভট্টাচার্য। তারপর একে একে সুবল দে. সুজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখেরা মালা দিতে শুরু করলেন। রাজকুমার কমলজিৎ সিং তাঁর আশৈশব বন্ধু মহেন্দ্র দেববর্মার নিরুত্তাপ শরীরে ফুল দিয়ে এসে চোখ মুছতে লাগলেন খদ্দরের ধুতির খুঁটে। এবার মহেন্দ্র বাবুর শবদেহ নিয়ে যাওয়া হলো শচীন কর্তার বাড়ির রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সিঁড়ির সামনে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের তরফ থেকে মালা দিলেন শিল্পী চিন্ময় রায় ও অন্যান্যরা। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী চত্বরে

গত বই মেলাতেও দেখা গেছে মহেন্দ্র বাবুকে পরিচিত স্থানীয় প্রকাশকদের দোকানে দোকানে বসে উৎসাহ যোগাতে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মহেন্দ্র বাবু, চলমান বইমেলায় মহেন্দ্রবাবু, আপনজনেরা ডাকেন মহেন্দ্র দা-সামনের বইমেলায় সেই মহেন্দ্র দেববর্মাকে খুঁজে পাবেন না কেউ। গত বইমেলায় মহেন্দ্র বাবু আমার 'কগবরক লিপি বিতর্ক বানান বিতর্ক' বইখানা আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেছিলেন 'অক্ষর' বুকস্টলে। অক্ষরই হচ্ছে এই বইয়ের প্রকাশক সংস্থা।

আমার এইসব ভাবনার মধ্যেই আন্তর্জাতিক গাওয়া হলো। মহেন্দ্র বাবুর শবযান এবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী চত্বর ছেড়ে চললো বিদুরকর্তা চৌমুহনীর দিকে। বিদুরকর্তা থেকে রাধামোহন সরণিতে ঢুকে পড়ে মহেন্দ্র বাবুকে আনা হলো রবীন্দ্র পরিষদের সামনে। সেখানে পরিষদের সদস্যরা অপেক্ষা করছিলেন মহেন্দ্র বাবুর নিথর দেহের ওপর ফুল বিছিয়ে দেবেন বলে। রবীন্দ্র পরিষদের পক্ষ থেকে প্রথম মালা দিলেন অপরাজিতা রায়, তারপর মালা হাতে এগিয়ে এলেন রাজলক্ষ্মী চৌধুরী, এরপর মালা দিলেন অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র ধর, রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ। মহেন্দ্র বাবুর শব দেহকে এবার থামতে হলো 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার ভবনের সামনে। মালা দিলেন ভূপেন দত্ত ভৌমিক, মৃণাল কান্তি কর প্রমুখ সাংবাদিকগণ। ভূপেন বাবু মহেন্দ্রবাবুর শবদেহে মালা দিতেই আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়লো। মহেন্দ্র বাবুকে সঙ্গে নিয়ে একবার গিয়েছি ভূপেন বাবুর সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। আলোচনা শেষে আমরা যখন চারতলা থেকে নামছি, তখন মহেন্দ্র বাবু বললেন, 'ভূপেন একদিন বলেছিলো, দেখবেন মহেন্দ্রদা, আনন্দবাজারের মতো বড়ো পত্রিকা করবো আমি। ভূপেনের সেই স্বপ্ন সফল হয়েছে। আনন্দ বাজারের মতো বড়ো পত্রিকা তো সে করেছেই, সেই সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার ভবনের মতো দৈনিক সংবাদ ভবনও করে ফেলেছে সে। বুঝলেন, কুমুদ বাবু, নিষ্ঠা, ভূপেনের নিষ্ঠাই তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।'

দৈনিক সংবাদ ছেড়ে রাধামোহন ঠাকুরের বাড়ির সামনে আসতেই হঠাৎ করে থেমে গেলো মহেন্দ্র বাবুর শবযান। দেখি, স্টুডিও ক্লিকের মালিক আলোক চিত্র শিল্পী দিলীপ দেবরায় ছবি তুলছেন। এবার আমরা মহেন্দ্র বাবুকে নিয়ে চললাম পুরোনো আর-এম-এস চৌমুহনী হয়ে কংগ্রেস ভবনের পাশ দিয়ে গেঁদুমিয়ার বাড়ির দিকে। তাকিয়ে দেখি, ইতিমধ্যেই মহেন্দ্র বাবুর শবযানের সামনে আর পেছন থেকে তার শুভানুধ্যায়ীরা অনেকেই চলে গেছেন। আমার পাশেই হাঁটছিলেন সাংবাদিক শ্যামাপদ চক্রবর্তী। তাঁকে বললাম, 'দেখুন, শ্যামা বাবু, মহেন্দ্র বাবুর শবযাত্রায় এতো কম লোক। অথচ মহেন্দ্র বাবু হলেন আগরতলার সংস্কৃতি জগতের পুরোধা, কতো অজস্র সাংস্কৃতিক সংগঠন আগরতলায় এখন, তাঁর শবানুগমনে এতো কম লোক, ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছেনা।' শ্যামা বাবু বললেন, 'সত্যিই কুমুদ দা, ঠিক কথা বলছেন আপনি; আমিও তাই ভাবছিলাম, মহেন্দ্রদা সংস্কৃতি জগতের গুরু আগরতলার, অথচ তাঁর শবনুগমনে এতো কমলোক হবে ভাবতেই পারিনি।' 'ঠিক একই ঘটনা দেখেছি আমি বীরচন্দ্র দেববর্মার শবানুগমনে মাত্র মাস দুয়েক আগে। জনা কয়েক কমিউনিস্ট আর কিছু একান্ত শুভানুধ্যায়ী ছাড়া কেউ ছিলেন না তাঁর শবযাত্রায়।' —বললাম আমি।

ইতিমধ্যে মহেন্দ্র বাবুর শবযান এসে গেলো গেঁদুমিঞার বাড়ি পেরিয়ে নেতাজী স্কুল চৌমুহনীতে, তারপর মোড় নিলো গান্ধীঘাটের দিকে। একটু এগিয়ে শবযান ঢুকে পড়লো অরুণ কর্তার বাড়ির তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর ভবনের চত্বরে। মহেন্দ্র বাবুর শবদেহ দেখতে ভেঙে পড়লো তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর ভবন। শবযানের পাশে এসে দাঁড়ালেন নতমস্তকে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীযুত অনিল সরকার মশায়। চারদিক নেমে এলো শান্ত সমাহিত ভাব। কারোর মুখে কথা নেই, তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মীরা যেন মহেন্দ্র বাবুর মতই নীরব-নিথর। পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করছিলো মহেন্দ্র বাবুর মরদেহকে ঘিরে। এই নীরবতা

ভাঙলেন মন্ত্রী মহোদয় তাঁর প্রিয় মহেন্দ্রদার শবদেহে মালা দিয়ে । মহেন্দ্রদার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে জামার পকেটে হাত দুখানা ঢুকিয়ে দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তাঁরই সংস্কৃতি জগতের বিগত প্রাণ পুরোধার দিকে । একে একে মালা দিলো সবাই । শবযান আবার চলতে শরু করলো । দেখলাম, অনিল বাবুর নিস্পলক দৃষ্টি তখনো ধাওয়া করছে তাঁর প্রিয় মহেন্দ্রদার দিকে ।

অরুণ কর্তার বাড়ি পেরিয়ে শবযান এবার যাত্রা শুরু করলো সি.পি.আই (এম) এর পার্টি অফিসের দিকে । প্যারাডাইস চৌমুহনী পেরিয়ে কালীবাড়ির পাশে দিয়ে শবদেহ চলে এলো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের কাছে । সেখান থেকে ডি.এম.অফিসের কাছ ঘেঁসে একটু এগিয়ে মহেন্দ্র বাবুর শবযান থেমে গেলো । এলেন সি.আই. টি.ইউ- অফিসের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ । তাঁরা ফুল ছিটিয়ে দিলেন মহেন্দ্র বাবুর বুকে । এবার শবযান ঢুকে পড়লো আগরতলার আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে । মহেন্দ্র বাবুর মৃতদেহ এসে দাঁড়ালো সি.পি.আই.(এম.) এর হেডকোয়ার্টারের সামনে । ভেবেছিলাম, উপচেপড়া ভীড় হবে এখানে । কিন্তু না, জনা সাত-আট পার্টি কমরেড দাঁড়িয়ে আছেন মহেন্দ্র বাবুকে লালসেলাম জানাতে শেষবারের মতো । এগিয়ে এলেন ডেইলী দেশের কথার সম্পাদক গৌতম দাশ । তাঁর হাতে ফুলের মালা আর রক্তপতাকা । পার্টির কাস্তে হাতুড়ি শোভিত লালঝাণ্ডা দিয়ে কমরেড মহেন্দ্র দেববর্মার মরদেহের ফুলে ঢাকা নামাবলী ঢেকে দিলেন তিনি । তারপর রেড সেলুট দিয়ে শেষ বিদায় জানালেন।

শবযান এবার বটতলার শ্মশানমুখী হলো। মহেন্দ্র বাবুর শবযান বটতলায় আসতে দেখি মহেন্দ্র বাবুর সামনে পেছনে আছেন গুটিকতক তাঁর আপনজন । দৃশ্যটা নজরে আনলাম আমি হীরালাল বাবু ও শিবদাস বাবুর । দু'জনই আগরতলার বামপন্থী সংস্কৃতি জগতের লোক । তাঁদেরও দৃষ্টিকটু লাগছিলো দৃশ্যটা । খররৌদ্রের মধ্যে মহেন্দ্র বাবুর শবযান এসে ঠেকলো রাজ-শ্মশানে । আমরা যাঁরা গুটিকতক গুণমুগ্ধ ছিলাম মহেন্দ্র বাবুর শেষপর্যন্ত সবাই ক্লান্ত তখন । হীরালাল বাবুর বিশাল বপু বেয়ে ঘাম ঝরছে দরদর করে । প্রৌঢ় শিবদাস ব্যানার্জীর অবস্থা তথৈবচ । আমাদের সঙ্গী সুকান্ত দেববর্মাকেও ঘাম মুছতে দেখলাম রুমাল দিয়ে । আমরা বাঁধের ওপর একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াতেই ধলেশ্বরের আমার ছোট মামা শ্বশুর বললেন, "চা খাও জামাই তোমরা ।" পাঁচটা চা অর্ডার দিলেন তিনি বিস্কুট সহযোগে । রাজশ্মশানের মুখ গোড়ায় দোকান । একটা বেঞ্চির ওপর বসে চা খাচ্ছিলাম আমরা রাজশ্মশানের উৎকট দুর্গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে । আগরতলার সংস্কৃতি জগতের দৈন্যের কথা তুলে আলোচনা করতে লাগলেন সবাই শিবদাস বাবুদের সঙ্গে । আমি চলে গেলাম বাঁধের ওপর থেকে নেমে মহেন্দ্র বাবুর শবযানের কাছে । শবযানটির যাত্রা শেষে রাজ-শ্মশানের গেটের মুখে রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিলো ।

শবযানের কাছে গিয়ে মহেন্দ্র দেববর্মার ভাবশিষ্য রবিসেন প্যান্ট গুটিয়ে উবু হয়ে বসে আছেন গালে হাত দিয়ে । আমিও বসে পড়লাম তাঁর পাশে গিয়ে । শ্মশানের ভেতরে একটু আগে ডোম এসে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েগেছে । সেখানে মহেন্দ্র বাবুর আত্মীয়রা কাঠ এনে রাখছেন । একজন গেছেন বামুন ডাকতে । শবযানের ওপর চোখ পড়তেই দেখি মহেন্দ্র বাবুর নাতি-নাতনীরা বসে আছে খর রৌদ্রের মধ্যে । রবি বাবুকে দেখলাম মহেন্দ্র বাবুর দু'ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে । শবযানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন মহেন্দ্র বাবুর জামাই— পথিকার স্বামী । তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'আচ্ছা, মহেন্দ্রবাবু ঠিক ক'টার সময় মারা গেছেন ?' উত্তরে বললেন তিনি, 'ঠিক সকাল আট্টা কুড়িতে ।' এমন সময় বামুন এসে গেলো । রবি বাবু মহেন্দ্র বাবুর বড়ো ছেলে কে বললেন, 'যাও, এখন নদীতে গিয়ে চান করে এক কলসি জল নিয়ে এসো; সঙ্গে নিয়ে যাও কাউকে ।' ইতিমধ্যে মহেন্দ্র বাবুর চিতা সাজানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে । তাঁর রক্তের সম্পর্কের ট্রাইবাল আত্মীয়

পরিজনরা চিতা সাজানোর কাজে ব্যস্ত। সোমরস পান করে নিয়েছেন কেউ কেউ। রাজ-শ্মশানের উৎকট দুর্গন্ধ উপেক্ষা করে শবদেহ দাহ করা সত্যিই কঠিন ব্যাপার। মোঙ্গলীয় ট্রাইব ও ভারতীয় আর্যদের চিতা সাজানোর মধ্যে পার্থক্য আছে কিছুটা। মহেন্দ্র বাবুর চিতার ওপর মশারি টাঙিয়ে দিয়ে মশারির কাপড় গুটিয়ে ওপরে দেয়া হলো চাঁদোয়ার মতো করে। চিতার চার পাশে চারটি খুঁটি পুঁতে খুঁটির মাথা ফাটিয়ে ফুলের ঝারি মতো করে তার ভেতর নানারকমের ফুল দিয়ে দর্শনীয়ভাবে রাখা হলো। বাস্তবিক সুন্দর দেখাচ্ছিলো দৃশ্যটা। আমাদের আর্যদের চিতা শয্যার পাশে এমনভাবে ফুল দিয়ে সাজানোর ব্যাপারটা চোখে পড়েনা।

শ্মশান-ব্রাহ্মণ আসতে একটু দেরি করছেন। আমরা মহেন্দ্রবাবুর শবদেহ ঘিরে বসে আছি। একটু সুযোগ পেয়ে রবিবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, 'রবিদা, এই যে শ্মশানের মাঝখানটায় মন্দিরের মতো সব দেখা যাচ্ছে, ওগুলো কাদের স্মৃতিসৌধ ?' উত্তরে বললেন তিনি, 'ওই তো পরপর মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর, বীর বিক্রম আর মহারানীদের স্মৃতিসৌধ দাঁড়িয়ে রয়েছে সব।' আবার জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'রবিদা, আপনার অনেক লেখা পড়েছি প্রাচীন আগরতলার ওপর, দৈনিক সংবাদে বেরোতো সুন্দর সুন্দর ছবি সমেত; লেখাগুলো নিয়ে একটা বই বের করুন না আগামী বইমেলায়।'

—'শুনুন, কুমুদ বাবু, সামনের বইমেলায় তো বই বের করবো বলে পরিকল্পনা করেছিলাম। ভেবেছিলাম, মহেন্দ্রদা কলকাতা থেকে সুস্থ হয়ে ফিরলে, তাঁর সঙ্গে বসে আরো কিছু পুরনো তথ্য ও ঘটনা নিয়ে আলোচনা করবো। কিন্তু মহেন্দ্রদা তো গেলেন চলে। এখন তো পড়লাম বেশ বিপদে।'

—'আচ্ছা, আপনি তো মহেন্দ্র বাবুর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাই না ?'

—'ঘনিষ্ঠ ছিলাম মানে, ৪৬-৪৭ সাল থেকে মহেন্দ্রদার পেছন পেছন আমি। আমার সংস্কৃতি চর্চার গুরুই বলতে পারেন মহেন্দ্রদাকে। একবার মহেন্দ্রদা আর আমি মিলে ছবি করলাম ট্রাইবাল লাইফ নিয়ে।'

—'ট্রাইবাল লাইফ মানে ?'

—'মানে, একটা ট্রাইবাল পরিবারের সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত জীবনযাত্রা ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম একটা ডকুমেন্টারির মধ্যে।'

আমাদের কথার মধ্যে মহেন্দ্র বাবুর বড়ো ছেলে হাওড়া নদী থেকে স্নান করে এক কলসি জল নিয়ে এলো, সঙ্গে শ্মশান-ব্রাহ্মণ ও এলেন তাঁর সঙ্গে। মহেন্দ্র বাবুর বড়ো ছেলেকে নিয়ে বামুন পিন্ডদানের কাজ-কর্ম করতে লাগলেন শ্মশানের এক পাশে। জোরে জোরে বৈদিক মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলো এক মোঙ্গলীয়ের পিন্ডদানের কাজ। চিতা শয্যার বেশ কাছাকাছি মহেন্দ্র বাবুকে রাখা হলো খাটের ওপর। দেখলাম, একটা বিরাট শূকরী এসে পিন্ডদান প্রক্রিয়াব কাছে এসে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। পিন্ডদানরত শ্মশান-পুরোহিত হাত দিয়ে শূকরীকে হেই করতেই সে কিছু দূরে গিয়ে পিন্ডদান প্রক্রিয়া দেখতে লাগলো ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়লো যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহনের দৃশ্য। সেখানে ছিলো কুকুর, আর মহেন্দ্র বাবুর বেলায় শূকর। মনে মনে আমি বললাম, মহেন্দ্র বাবুর উদ্দেশে— "আর্যমতে যতোই আপনাকে পিন্ড দিক না কেন, মোঙ্গলীয় সংস্কৃতি আপনাকে ছাড়ছে না।"

এখন মহেন্দ্র বাবুকে তোলা হবে চিতা শয্যায়। আর কখনো তাঁকে দেখা যাবেনা ফটো ছাড়া। এই শেষ দেখা ধরে রাখার জন্যে ক্যামেরাম্যান এসে গেছেন। আত্মীয়-স্বজনরা দাঁড়ালেন মহেন্দ্রবাবুর শবদেহকে ঘিরে। রবি সেনও ছুটে গেলেন তাঁর সংস্কৃতি গুরুর সঙ্গে শেষ ছবি তুলতে। আমারও ইচ্ছে হলো, ছুটে গিয়ে রবিদার পাশে দাঁড়াতে, কিন্তু সেটা একেবারেই বেমানান হবে ভেবে গেলাম না। ছবি

তোলা পর্ব শেষ। এবার মহেন্দ্র বাবুর দেহ হালকা করে দিতে হবে। রবি সেন প্রথমে মহেন্দ্র বাবুর নিথর দেহের ওপর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকা তুলে নিলেন নতমস্তকে। লাল পতাকার তাল মহেন্দ্র বাবুর বুকের পরে ভালোবাসার ফুলের পাহাড় জমাট বেঁধে ছিলো। তাঁর নিথর দেহ হয়তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শবদেহের মতো বলছিলো — "ফুলগুলো সরিয়ে নাও, লাগছে।" ফুলগুলো সরিয়ে নিতেই বেরিয়ে পড়লো হরে কৃষ্ণ হরে রাম লেখা গৈরিক রঙের নামাবলী খানা। রবিদা নামাবলীখানা ভাঁজ করে দিয়ে দিলেন মহেন্দ্র বাবুর ছেলের হাতে, আর নিজে রাখলেন কমিউনিস্ট পার্টির রক্তপতাকা। নামাবলীর নিচে পাজামা-পাঞ্জাবী পরা মহেন্দ্র বাবুর দেহ। এবার মহেন্দ্র বাবুর চিতায় ওঠার অপেক্ষায়। না, মহেন্দ্র বাবুকে নিরাবরণ করা হলো না আর্য প্রথায়— ফুল বাবুর বেশে মোঙ্গলীয় ট্রাইবাল প্রথায় তাঁকে শুইয়ে দেয়া হলো চিতাশয্যায় বলো হরি হরি বোল দিয়ে। তাকিয়ে দেখি, হীরালাল সেনগুপ্তরা কেউ নেই কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক গেয়ে তাঁদের শিল্পগুরুকে শেষ বিদায় জানাতে। আবার ধ্বনিত হলো বলো হরি হরিবোল। হরিধ্বনি শেষ হতেই মহেন্দ্র বাবুর বুকের ওপর এবার কাঠ বিছানোর কাজ শুরু হলো। মহেন্দ্র বাবুকে ডানদিকে কিছুটা কাত করে শুইয়ে দেয়া হলো অতি সযত্নে। কেন এটা করা হলো বুঝতে পারলামনা ঠিক। সারা দেহে কাঠ বিছানোর কাজ শেষ হতেই শ্মশান-পুরোহিত মহেন্দ্র বাবুর বড়ো ছেলেকে নিয়ে গেলেন মুখাগ্নি করতে।

২৮শে অক্টোবর, ১৯৯৫, শনিবার। ভোরে উঠে সুপুরি বাগানের গলির ভেতর ঢুকে মানিক চক্রবর্তীর দোকানের পাশ থেকে তেলাকুচোর পাতা সংগ্রহ করলাম বেশ কয়েকটি। তারপর কমল চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে দিয়ে চুপচাপ সরে পড়ার চেষ্টা করতেই হাঁক শুনলাম, 'এই যে স্যার।' হাঁক শুনে বুকের ভেতর ধুকপুকুনি শুরু হলো আমার। ওঁর দাদা সূর্য চক্রবর্তীও গেটে বসে থাকতেন একেবারে ওঁৎ পেতে। আমাকে পালাতে দেখলেই একেবারে সামনে এসেই ধরে ফেলে বলতেন, " এই যে ঢাকাই কুত্তু, খুব চালাক, না ? ঢুকুন বাড়ির ভেতর, চুপচাপ সরে পড়ার চেষ্টা করছেন, না ? আপনার মতো ঢের পন্ডিত লোক দেখেছি মশায়, আমার জ্যাঠামশায় ছিলেন সংস্কৃত-আরবী-ফারসীর পন্ডিত। তিনি আমাকে জোর করে ফারসী ভাষা শেখাতে চেষ্টা করায় কলকাতা থেকে পালিয়ে আসি আমি। আপনি হলেন পন্ডিত, ককবরক ভাষার পন্ডিত, রাজা গেলো, রাজ্য গেলো, তখন হলোনা কিছু ককবরকের, এখন আবার ককবরক-ককবরক, বীরচন্দ্র দেববর্মার ভাতগুলো নষ্ট করছেন আর কি।'

কমল বাবু ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে দশাসই চেহারা নিয়ে লোহার গেটের কাছে এসে দাঁড়ালেন, 'দেশ-রাজ্যের খবর কি বলুন ?'

—'আর খবর কি, কাল গেলাম রাজবাড়ি মহারাজ কিরীট বিক্রমের সঙ্গে দেখা করতে।'

—'ব্যাপার কি ? মহারাজার সঙ্গে দেখা করার কী প্রয়োজন পড়লো ?'

—'কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম আমরা রাজেন্দ্র কীর্তিশালার স্যুভিনিরে ছাপানোর জন্যে।'

—'তথ্য তো পাবেন-ই, রাজা যখন, কিরীট বিক্রমের কাছে সবই তো থাকার কথা।'

—'জানেন কমল বাবু, খুব দুঃখ হয়, রজ প্রাসাদটা বিক্রি করে দিলেন কিরীট বিক্রম।'

—'দুঃখের কী আছে, কিরীট তো বুদ্ধিমান, বিক্রি করে ভালোই করেছে; অত বড়ো রাজপ্রাসাদ, রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাখ লাখ টাকার দরকার বছরে বছরে। এখনো যা আছে, তাই দেখভাল করতে পারছেনা ভালো করে।'

—'আচ্ছা কমল বাবু, শোনা যায়, আগের মহারানীর সঙ্গে রাজপ্রাসাদ বিক্রি করা নিয়ে মনোমালিন্য হয় মহারাজ কিরীট বিক্রমের।'

—'কে বলেছে আপনাদের ? সব বাজে কথা ।'

—'না, মহারানী আত্মহত্যা করার পর কাগজে বেরিয়েছিলো, ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদ বিক্রি করা নিয়ে রাজার সঙ্গে রাণীর দারুণ মনোমালিন্য হয়,' রাণী নাকি বলেন, 'রাজা হয়ে রাজপ্রাসাদ বিক্রি করা শোভা পায়না, এটা আমার শ্বশুরের স্মৃতি, কিছুতেই বিক্রি করতে দেবনা তোমাকে, কতো টাকা লাগবে তোমার, বলো ? আমি গোয়ালিয়র থেকে এনে দেবো যতো টাকা তোমার দরকার ।'

—'তারপর ?'

—'তারপর আর কি ? মহারাণী হীরের আঙটি চুষে আত্মহত্যা করলেন বালিগঞ্জের রাজপ্রাসাদে।'

—'খুব মুখরোচক খবর রাখেন দেখছি সব ।'

—'না, না, মহারাণীর আত্মহত্যার পর কোলকাতার সব বড়ো কাগজে বেরিয়েছিলো হীরের আংটি চুষে ত্রিপুরার মহারাণী আত্মহত্যা করেছেন বলে ।'

—'সব বাজে কথা বুঝলেন, সব বাজে কথা, কাগজঅলাদের সব বানানো কথা । আসল কথা হলো, মহারাণী রোজই ঘুমের পিল খেয়ে শুতেন, সেদিন কয়েকটা পিল বেশি খেয়ে ফেলেছিলেন....'

—'ঘুমের বড়ি খেয়ে মহারাণী ঘুমোতেন ?'

—'আরে, মহারাণী কেন, সব রাজ-রাজড়ার ছেলে-মেয়েরাই তো ঘুমের পিল খেয়ে শুতো। পিল খাওয়াটা নাকি এ্যারিস্টোক্রাসির লক্ষণ । নেশার পিল গুঁজে দিতো অন্যসব রাজার ছেলেরা । বুঝলেন, এখন টাটা-বিড়লার ঘরের ছেলে-মেয়েরাও পিল খেয়ে ঘুমোয় ।'

—'কিন্তু, আপনি বলছেন, রাজার সঙ্গে আগের রাণীর রাজপ্রাসাদ বিক্রি করা নিয়ে কোনো মন কষাকষি হয়নি, আর, রাণী ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েই মারা গেছেন ?'

—'আরে শুনুন, শুনুন, আমরা এ রাজ্যের রাজার আমলের লোক, সত্যি কথাটা আমাদের কাছ থেকে নিন, আমরা সব জানি ।'

একথা বলতে বলতে কমল বাবুর গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার ভুড়ির মতো বড়ো ভুড়িটা কেঁপে উঠলো। মাথার শঙ্খশুভ্র সাদা চুলগুলো টাকের ওপর দিয়ে দিতে বললেন, 'শুনুন আসল ঘটনাটা । মহারাণীর ভাই পড়তো বিলেতে । সে এসেছে কলকাতায় বোনের বাড়িতে । সেখান থেকে সে যাবে নেপালে শিকার করতে নেপাল রাজের আমন্ত্রণে। খবর পেয়ে মহারাণী গেছেন কোলকাতায়; দু' ভাইবোনে অনেকদিন পরে দেখা । ঠিক সেই সময় কেনিয়ার হকি টিম কোলকাতার মাঠে আসছে খেলতে। আমাদের কিরীট তো হকি-ক্রিকেট পাগল । সে ট্রাঙ্কলে রাণীকে বলেছে টিকিট কেটে রাখতে। যে-রাতে রাণী মারা যান, সে-রাতে এগারোটার সময় রাজা-রাণীতে কথা হয়েছে । রাণী বলেছেন, 'টিকিট কাটা হয়েছে, তুমি সকালের ফ্লাইটে আগরতলা থেকে কোলকাতায় চলে এসো ।'

—'তারপর ?' বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করলাম আমি ।

—'তারপর আর কি ? হয়তো টেনশান একটু বেশি ছিলো রাণীর, ঘুম আসছেনা দেখে ঘুমের পিল বেশ ক'টা মুখে পুরে দিলেন, তারপর আর জাগলেন না রাণী ।

—'কি হলো এরপর ?'

—'কি আর হবে ? মহারাজ তো তার পরের দিন কোলকাতায় যাবেন বলে সকালের এয়ারপোর্টে চলে গেছেন গাড়ি হাঁকিয়ে, ঠিক এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে রাজবাড়িতে এলো বালিগঞ্জ রাজবাড়িতে মহারাণীর মৃত্যুর কথা ।'

—'মহারাজ তখন কি প্লেনে উঠে বসেছেন ?'

—'শুনুন না, টেলিফোনে রাণীর মৃত্যুর খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজলাল কর্তা আর কোন কর্তা

জানি, গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটলেন সিঙেরবিল এয়ার পোর্টে। প্লেন তখন ছাড়ো-ছাড়ো অবস্থা। তখন ব্রজলাল কর্তা ছুটতে ছুটতে রানওয়ের কাছে চলে যান পারমিশন নিয়ে। এয়ারপোর্ট অফিস থেকেও প্লেনের ভেতর ফোনে পাইলটকে জানানো হয় মহারাজ কিরীট বিক্রমের সঙ্গে জরুরী কথা বলতে চান ব্রজলাল কর্তা। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজা চলে আসেন প্লেনের সিঁড়ির ওপর। মহারাজ কিরীট বিক্রমকে দেখে ব্রজলাল কর্তা বলে ওঠেন মহারাজ, —সর্বনাশ হয়েছে।'

—'কী সর্বনাশ ?'

—'মহারাণী আর নেই।'

—'মহারাণী নেই ?'

—'মহারাণী গতরাত্রে ঘুমের মধ্যে মারা গেছেন। আপনি একা কীভাবে যাবেন, আমরা দু'জনেও আপনার সঙ্গে যেতে চাই।'

— 'কমলবাবুকে উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম-তারপর কি হলো ?'

—'কি আর হবে, মহারাজের অনুরোধে দু'জন প্যাসেঞ্জার নেমে এলেন প্লেন থেকে, আর তাঁদের জায়গায় ব্রজলাল কর্তারা কিরীট বিক্রমের সঙ্গে চলে গেলেন কোলকাতায়। এই হলো আসল ঘটনা, বুঝলেন ?'

—'চলি কমল বাবু, বাড়ি গিয়ে তেলাকুচো পাতার রস খেতে হবে। অনেক নতুন তথ্য পেলাম আজ আপনার কাছ থেকে।'

সকাল দশটায় হেঁটে চলে গেলাম গোর্খাবস্তিতে। মাসের শেষ, পকেটে পয়সা নেই, তার ওপর বাঁ পায়ের হাঁটুর মালায় বেশ ক'দিন ধরে ব্যথা। শিল্প বিভাগে গেলাম ডেপুটি ডাইরেক্টর হরেন্দ্র ভৌমিকের সঙ্গে দেখা করতে আমার স্ত্রী ফুলকুমারী দেববর্মার চাকরি রেগুলার করার ব্যাপারে। হরেন্দ্র বাবুর পিয়ন বললো, 'হরেন্দ্র বাবু অসুস্থ, বেশ ক'দিন অফিসে আসছেন না।' চলে এলাম শিল্প বিভাগের পাব্লিক রিলেশন অফিসার লেখক শঙ্খশুভ্র দেববর্মার ঘরে। এ ঘরে আগেও আসতাম সুবিমল রায় যখন পি.আর.ও. ছিলেন। শঙ্খশুভ্র লাফিয়ে উঠলো আমাকে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে চায়ের অর্ডার পড়লো। বললো, 'ভালো অনুবাদক হিসেবে আপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।'

—'কেমন ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—'একুশ শতক-এর গত সেপ্টেম্বর সংখ্যায় চিঠিপত্র কলামে প্রশংসা বেরিয়েছে।'

—'লিখেছেন কে ?'

—'উত্তর বঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে সঞ্জীব রায় বলে এক ভদ্রলোক।'

—'প্রশংসাটা কেমন শুনি ?'

—'ভদ্রলোক লিখেছেন, ককবরক উপন্যাস 'হাচুক খুরিঅ'র অনুবাদের গতি বেশ তীব্র।'

—'ঠিক আছে, একুশ শতকের সেপ্টেম্বর সংখ্যা আমি পেয়েছি, বাসায় গিয়ে চিঠিপত্রের কলামটা পড়তে হবে।'

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে ক্রাফ্ট্স্ কাউন্সিলের জনাতিনেক সদস্য এলেন পি.আর.ও. শঙ্খশুভ্র দেববর্মার সঙ্গে দেখা করতে। এঁরা আলোচনার মধ্যে ত্রিপুরার বাঁশজাত সৌখীন জিনিসপত্রের খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। শঙ্খশুভ্র তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন—

—'আচ্ছা, বলুন তো, ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের বাঁশজাত জিনিসপত্রের নাম সব থেকে বেশী ?'

—'আমাদের ত্রিপুরার নাম সব থেকে বেশী' বললেন সকলে একবাক্যে।

—'না, না, আপনারা ঠিক বলছেন না, কেরালা-ই সব থেকেনাম কোরেছে।'

—'না, স্যার, আমাদের রাজ্যের বাঁশের তৈরি জিনিস পত্রের খুব চাহিদা বাইরের রাজ্যে, হাজার হাজার শিল্পী বাঁশ-বেতের কাজ করে বেঁচে যাচ্ছে।'

—'তাই যদি হয়, তাহলে ত্রিপুরায় বাঁশতো আর থাকবে না।'

—'ঠিক-ই বলেছেন, যেভাবে বাঁশ ত্রিপুরা থেকে কাছাড়ের পেপার মিলে চলে যাচ্ছে ভাবাই যায় না। তাছাড়া বাংলা দেশে বাঁশ পাচার হচ্ছে হরদম। বাঁশের অভাবে আমাদের রাজ্যের বাঁশ- শিল্পীরা সব মরে যাবে।'

—'না, না, বাঁশ-শিল্পীরা আগে মরবেনা, আগে মরবে ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা।'

—'কেন স্যার ?'

—'কেন আর, ত্রিপুরার ট্রাইবালরা যারা পাহাড়ে থাকে, ছ'মাস বেঁচে থাকে তরা এই বাঁশের কড়ুল খেয়ে। বাঁশ তাদের জীবনে অপরিহার্য। আগরতলা শহরের ট্রাইবেলরা আমরাও তো বাঁশের কড়ুল না খেয়ে থাকতে পারিনে। ভোর হতে না হতে 'বাঁশ করুল নিবনি বাঁশ করুল' বলে কোত্থেকে সব একের পর এক আসতে থাকে ট্রাইবাল যুবকরা। গারো মেয়েরাও নিয়ে আসে লাঙ্গার ভেতর করে বাঁশ কড়ুল। কাজেই, আমরা ট্রাইবালরাই বাঁশ কড়ুল খেয়ে ত্রিপুরার সব বাঁশ ধ্বংস করে দেবো।'

—'না স্যার, আপনার কথা ঠিক নয়। যে ভাবে ত্রিপুরার পাহাড়-জঙ্গলে বাঁশ হয়, তা খেয়ে শেষ করা যায় না। পাহাড়ের ট্রাইবালরা কী বলে জানেন স্যার ? '

—'কী বলে ?'

—'বলে, বাঁশ নাকি দৌড়ায়।'

—'বাঁশ দৌড়ায় ? এ আবার কেমন কথা !'

—'না, তারা বলে, বাঁশ একজায়গায় থাকতে পারে না, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকে। এক বছরের ভেতর তারা অনেক দূর চলে যায়।'

—'বাঃ, ট্রাইবালদের পর্যবেক্ষণ তো সাংঘাতিক, একেই বলে লোকায়ত দর্শন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় একবার যদি ত্রিপুরায় এসে ট্রাইবাল লাইফ দেখতেন, তাহলে বুঝতেন লোকায়ত দর্শন কাকে বলে।'

ত্রিপুরার বাঁশ নিয়ে এমনসব সরস কথা শুনতে ভালোই লাগছিলো আমার। কিন্তু তাড়া ছিলো। বাসায় ফিরে আবার যেতে হবে মহেন্দ্রবাবুর শ্রাদ্ধে। তাই শঙ্খশুভ্রকে বলে উঠে পড়লাম। গোর্খাবস্তির শিল্প বিভাগের দোতলা থেকে নামতে হাঁটুর মালায় বেশ ব্যথা করছিলো। আবার, মাইল দুয়েক রাস্তা হেঁটে যেতে হবে এই রৌদ্র ঠেঙিয়ে। পায়ে আবার প্লাস্টিকের ছেঁড়া জুতো, প্লাস্টিকের জুতো আবার খুব গরম হয় এই কড়া রৌদ্রে। লাঞ্চ আওয়ার হয়েছে, সরকারী আমলারা সব গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছেন বাড়ি বা কোয়ার্টারে। স্কুটারেও ছুঁটছেন অনেকে। ভাবলাম, পরিচিত কাওকে পেলে বলবো কর্ণেল চৌমুহনী পর্যন্ত লিফ্‌ট দিতে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম। না, কেউ পরিচিত চোখে পড়ছেনা। গোর্খাবস্তির নতুন সরকারী অফিসের টিলা থেকে আস্তে আস্তে নেমে এলাম রাজ-পথে রাজকুমারী কমলপ্রভার বাড়ির সামনে। রাজকুমারীর বাড়ির দিকে চোখ পড়তেই একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল আমার। ঘটনাটা হলো, মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের কিশোরী কন্যা রাজকুমারী কমলপ্রভা বাল্যকালে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে এক মেমের কাছে পড়তেন। এই মেম ছিলেন ভীষণভাবে হিন্দুধর্ম বিরোধী। সন্ধ্যে হলেই তিনি কানে আঙুল দিয়ে দাঁতকপাটি এঁটে বসে থাকতেন যাতে লক্ষ্মীনারায়ণমন্দির বা জগন্নাথবাড়ি থেকে শাঁখের আওয়াজ ও ঝাঁঝ-ঘন্টার ধ্বনি তাঁর কানে না ঢোকে। এবং দারুণ বর্ণবিদ্বেষীও ছিলেন তিনি। রাজপ্রাসাদের কালো চামড়ার ঝিয়েরা তাঁকে স্পর্শ করতে পারতো না। একদিন হলো কী, সন্ধ্যের পরে

সিঁড়ি বেয়ে রাজপ্রাসাদের দোতলায় উঠে রাজকুমারীকে পড়াতে যেতে তিনি পড়ে গেলেন পা পিছলে। এমন সময় কালো চামড়ার একজন ঝি এসে মেমকে তুলতে যেতেই তিনি তাঁকে স্পর্শ করতে বারণ করলেন। এর মধ্যে কিশোরী রাজকুমারীর কানে সে কথা যেতেই তিনি সিঁড়ি বেয়ে নামতেই দেখেন তাঁর শিক্ষিকা মেম যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। রাজকুমারীকে দেখে তিনি হাত বাড়িয়ে দিতেই রাজকুমারী ঘৃণাভরে মেমের হাত স্পর্শ করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে দাদা মহারাজ বীরবিক্রমের কাছে গিয়ে নালিশ করে বললেন তিনি আর ওই মেমের কাছে পড়বেন না। যে মেম কালো চামড়ার মানুষকে ঘৃণা করে এমন মেমের কাছে তিনি পড়তে পারেন না। মহারাজ আর কী করবেন, জেদী বোনের কথায় সাদা ধবধবে দুধে আলতা রঙের মেমকে রাজপ্রাসাদ থেকে বিদায় করে দিলেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো ত্রিপুরার রাজপণ্ডিতের বিদ্বান ছেলে গঙ্গাপ্রসাদ শর্মাকে নিয়ে। তখনো রাজকুমারীর স্বামী ননী কর্তা (রমেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ) জীবিত। অভাবী গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা তাঁর চিরাচরিত আদুল গায়ে প্রায়ই পুরানো মন্ত্রী অফিসে উচ্চপদস্থ কর্তার অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়তেন, তাঁকে আটকানোর সাহস করত না কেউ। গঙ্গাপ্রসাদকে দেখে একেবারে ভূত দেখার মত চমকে উঠতেন কর্তা। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দিতেন পকেটে যা থাকত তা দিয়ে। রাজপণ্ডিতের ছেলে বলে কথা! একদিন এহেন গঙ্গাপ্রসাদ ননী কর্তার এই নতুন বাড়ির ফুল বাগান সংলগ্ন উঠোনে চুপিসারে এসে অর্ধনগ্ন অবস্থায় পড়লেন শুয়ে। কাপড় একেবারে এলোমেলো। হঠাৎ করে রাজকুমারীর এক পরিচারিকা বাইরে বেরোতে গিয়ে রাজপণ্ডিতের বুড়ো ছেলেকে এই অবস্থায় দেখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি চাপতে চাপতে ছুটলো অন্দর মহলে রাজকুমারীর কাছে। রাজকুমারী কমলপ্রভা সব শুনে পরিচারিকার সঙ্গে এসে দেখেন স্বয়ং রাজপণ্ডিতের ছেলে গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা একেবারে বেসামাল অবস্থায় শুয়ে। রাজকুমারী আর কি করেন! প্রথমে গঙ্গাবাবু, গঙ্গাবাবু বলে বারকয়েক ডাকলেন জোরে জোরে। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই। তারপর রাজকুমারী মুখে হাসি চেপে বললেন, 'কেমন তর রাজপণ্ডিতের পুলা আপনি, লাজ-শরমের মাথা খাইছেননি, উইঠ্যা বসুন, কাপড়-চোপড় সামলাইয়া লন আগে, বাড়ির মাইয়ারা ফিট হইয়া যাইবো তো, আপনার এমনতর অবস্থা দেইখ্যা।'

গঙ্গাপ্রসাদ না উঠে আর থাকতে পারলেন না। রাজকুমারী বলে কথা, তার ওপর ননী কর্তার রাণী। কাপড় সামলে হঠাৎ করে উঠে বসে রাজকুমারীর দিকে মোহিনী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'শোনো রাজকুমারী, মাত্র দু'জন সুন্দর পুরুষ আছে এ-রাজ্যে । একজন হলো তোমার কর্তা, আরেকজন তোমাদের রাজপণ্ডিতের এই বুড়ো খোকা গঙ্গাপ্রসাদ। এখন বলো, কাকে তোমার বেশী পছন্দ?' গঙ্গাপ্রসাদের কথা শুনে খিলখিল করে হাসতে হাসতে রাজকুমারী বললেন, 'খুব সুন্দর আপনি, একেবারে শিবের মতন, এখন ঘরো হামান, সিদ্ধা দিয়া বিদায় করি লই।' গঙ্গাপ্রসাদ রাজকুমারীর পেছন পেছন একেবারে ভালো ছেলের মত গিয়ে বসে পড়লেন ননী কর্তার চেয়ারের পাশে গদি আঁটা চেয়ারে ভালোরকম সিধা পাবার অপেক্ষায়।

সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদকে নিয়ে আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়লো আমার। গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ছিলেন স্বশিক্ষিত মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। সংস্কৃতর জাহাজ ছিলেন তিনি। সমান পাণ্ডিত্য ছিল বাংলা ও ইংরিজিতে। কিন্তু সব কিছুই হার মেনে ছিল তাঁর উচ্চ মানের রসিকতা বোধের কাছে। তাঁর হিউমার ও স্যাটায়ার এখন আগরতলার পুরোনো লোকজনদের মুখে মুখে ঘোরে। তা হলো কি, একদিন সকাল বেলায় গঙ্গাপ্রসাদ গিয়ে উপস্থিত কমিউনিস্ট নেতা সরোজ চন্দর জয়নগরের বাড়ি। কমঃ চন্দকে খুব স্নেহ করতেন তিনি। গঙ্গাপ্রসাদ সরোজবাবুর চেয়ারে পা তুলে বসে আগে অর্ডার করলেন একটা জর্দাঅলা পানের। যথাসময়ে পান এসে গেলো। তিনি মনের সুখে পান চিবুতে আরম্ভ করতেই কমঃ

চন্দ রসিকতা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা গঙ্গাদা, নৃপেন চক্রবর্তী (ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) আর আপনার বয়সতো প্রায় সমান সমান। কিন্তু নৃপেনদাকে এখনো যুবকের মতো দেখায়, আর আপনাকে লাগে একেবারে বুড়োর মতো , ব্যাপার কি?' সরোজবাবুর কথা শুনেই গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা একেবারে অগ্নি শর্মা হয়ে মুখের আধচিবানো পান টেবিলের ধবধবে সাদা চাদরের ওপর সশব্দে রেখে তীর্যক দৃষ্টিতে সরোজবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দ্যাখো সরোজ, আমার যদি নৃপেন চক্রবর্তীর ডাক্তার দাদা নন্দলাল চক্রবর্তীর মতো একজন রোজগেরে ডাক্তার দাদা থাকতেন, আর যদি তিনি রোজ সকালে বটতলা বাজারের সেরা রুই মাছটা কিনে আনতেন থলে ভরে বাড়িতে, আর সাধনা চক্রবর্তী (ডাক্তার নন্দলাল চক্রবর্তীর স্ত্রী)'র মতো একজন বৌদি থাকতেন আমার ও রোজ রোজ ঐ রুই মাছের মুড়োটা পড়তো আমার পাতে, তাহলে বুঝলে সরোজ, আমারও তোমাদের ঐ নৃপেন চক্কোত্তির মতো নধরকান্তি যুবকেরই চেহারাই থাকতো। না, তোমার কথায় আমার জর্দা দেয়া পান খাওয়াটাই মাটি হয়ে গেল; নাও, আরেকটা পান আনাও।' ঘটনা তিনটের কথা মনে পড়তেই আপন মনে হেসে ফেললাম আমি। তারপর সুকুমার কর্তার বাড়ি পেরিয়ে খুব সন্তর্পণে এলাম ক্ষীরগোপাল কর্তার বাড়ির গেটের সামনে। মনে পড়লো ক্ষীরগোপাল কর্তার বাবা লালু কর্তার কথা। লালু কর্তার ভাল নাম ছিলো ব্রজেন্দ্র কিশোর। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তার ইউরোপ ভ্রমণের সাথী করেছিলেন একবার। একটা ছবিতে দেখেছি প্যারিসে রবীন্দ্রনাথ, রোমারোলা ও ব্রজেন্দ্র কিশোরকে। সেখানে দাঁড়িয়ে রাজভবনের সামনের ট্রাফিক পুলিশের ইঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোন করমে রাস্তা পেরিয়ে রবীন্দ্রকাননের পাশে এসে দাঁড়ালাম। তারপর সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে ডাইনে রাজর্ষি যাত্রী নিবাস ও বাঁয়ে সার্কিট হাউস রেখে চৌরাস্তার গান্ধী স্ট্যাচুর পাদদেশ দিয়ে হেঁটে চললাম বুদ্ধ মন্দিরেব দিকে। বুদ্ধ মন্দিরের সামনে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিলাম একটু। এবার আরেকটু এগিয়ে আদিত্য কর্তার পুরোনো বাড়িটার পাশের গলি দিয়ে সোজা রাধানগরের দিকে মোড় নিলাম। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম রাজপুত্র আদিত্য কর্তার শ্রীহীন নতুন বাড়ির সামনে। কর্তার বাড়ির সামনে এসে একটু জিরিয়ে নিতে নিতে স্মৃতিচারণ করলাম ঃ আদিত্য কর্তা ছিলেন ত্রিপুরার রাজপুত্র, মহারাজ রাধাকিশোর অথবা বীরেন্দ্র কিশোরের ছেলে। কর্তার পুরনো বাড়িটাকে আগে যারা দেখেছেন, তারা এখনো বাড়িটার মনোরম প্রকৃতিক দৃশ্যের কথা বলেন। গাছ-গাছালিতে ঘেরা ছায়াঘন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সুদৃশ্য নয়নমনোহর অট্টালিকা। রাজতন্ত্র পতনের পরে গরীব হয়ে যান রাজ কুমাররা সব রাতারাতি। স্ট্যাটাস বাঁচানোর জন্যে প্রথম দিকে জমি ছাড়তে শুরু করেন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু ধন্যাঢ্যদের কাঁচা টাকার কাছে। তাতেও রক্ষা হয় না, শেষে বাড়িতে হাত পড়ে রাজপুত্রদের। আদিত্য কর্তা, নক্ষত্র কর্তাদের বাড়ি বিক্রি হতে শুরু করে। এমন কি রবীন্দ্র সান্নিধ্য ধন্য লালু কর্তাও প্রাসাদোপম বাড়িটি সরকারের কাছে বিক্রি করে দিয়ে চলে যান কুঞ্জবনের টিলার ওপর। লালু কর্তার সেই বাড়িতে এখন সরকারি মহিলা কলেজ। লালু কর্তার ছোট ভাই টীকাজী কর্তার জমি ছিলো মহিলা কলেজ থেকে শুরু করে গণরাজ চৌমুহনী পর্যন্ত। এখন এক কাঠাও জমিও নেই সেখানে টীকীজী কর্তার। আদিত্য কর্তার বাড়িও বিক্রি করে দিতে হলো সরকারের কাছে। বর্তমানের বি.এড. কলেজটাই হলো আদিত্য কর্তার পুরনো বাড়ি। পরে কর্তা রাধানগরের এক প্রান্তে এই বাড়িটা করে কোনোরকমে আত্মরক্ষা করেন। শোনাযায় এই নতুন বাড়িতেও নাকি কর্তার এগারোটা বড়ো বড়ো কুকুর ছিলো। আদিত্য কর্তার এক ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন রাজকুমারী কমলপ্রভার ছেলে জিষ্ণু কর্তা তাঁর 'ইনট্যাচ' অফিসে। আদিত্য কর্তার এই ছেলে যখন শিলংয়ে লেখাপড়া করতেন, তখন এক ধনাঢ্যা খাসী মেয়ে তরুণ কর্তার প্রেমে পড়ে যান। তাঁদের একটা ছেলেও হয়। কিন্তু কর্তা যখন আগরতলায় এসে থিতু হতে

চাইলেন, তখন বাদ সাধলেন খাসী বণিক কন্যা। কিছুদিন কর্তা খাসী পত্নীকে ছেড়ে নাকি আগরতলায় ছিলেন, ছেলেকেও সঙ্গে আনতে পারেননি। এখন শুনি, কর্তা নাকি আবার শিলংয়ে গিয়ে খাসী বণিক কন্যাকে নিয়ে ঘর-সংসার করছেন রাজপুত্রের আভিজত্য বোধে ইতি টেনে দিয়ে।

আগরতলার কর্তা পরিবারের এইসব ট্রাজেডি রোমন্থন শেষে জোরে জোরে পা বাড়ালাম কাটা খালের ওপর রাধানগরের ব্রিজের দিকে। নাক টিপে ধরে কোন রকমে পেরোলাম রাধানগরের ব্রিজ। ব্রিজের দু'পাশ থেকে খাটা-পায়খানার দুর্গন্ধে বমি আসার জো। ব্রিজ পেরিয়ে পা রাখলাম লেবু কর্তার বাড়ির পাশে। এখানে এসেও লেবু কর্তার বাড়ির স্মৃতি ঘাড়ে চাপলো আমার। লেবু কর্তা ছিলেন মহারাজ রাধাকিশোরের বৈমাত্রেয় বড়ো ভাই। রাধাকিশোর তার এই দাদাকে খুব সম্মান করতেন তাঁর শিল্প বোধের জন্যে। সমস্ত জ্ঞানী-গুণী শিল্পী রাজ দরবারে এলে তাঁদেরকে মহারাজ প্রথমে পাঠিয়ে দিতেন তাঁর এই দাদার কাছে। লেবু কর্তার বাড়ির চন্ডীমন্ডপে বসতো কালোয়াতদের আসর। খুব ভোর থেকে বসতো এই কালোয়াতী আসর, দুপুর গড়িয়ে যেতো, শ্রোতারা থাকতো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। এমনকি গাছের পাখিরা পর্যন্ত নাকি শ্রোতা হয়ে তাদের কিচির-মিচির ডাক ভুলে গিয়ে কালোয়াতী গান শুনতো। সমস্ত প্রকৃতি পড়তো স্তব্ধ হয়ে।

লেবু কর্তা খুব ভালো বাঁশি বাজাতে জানতেন। এ সম্পর্কে একটা গল্প আছে। মহারাজ রাধাকিশোর একবার গেছেন সিমলা ভ্রমণে। সঙ্গে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লেবু কর্তা। লেবু কর্তা একদিন কাকভোরে বেরিয়ে চলে গেছেন বেশ দূরে ঘন জঙ্গলের কাছে। সেখানে খুব ভোরে মনের সুখে বাঁশি বাজাতে শুরু করেছেন। বাঁশিতে ভোরবেলাকার রাগিনীর মায়াবী সুর তুলেছেন। এমন সময় একটা বিষধর সাপ বাঁশির রাগিনী শুনে কাছে এসে ফণা তুলে বসে আছে। কর্তার কিন্তু কোন খেয়াল নেই, চোখ বুজে বাঁশি বাজিয়েই চলেছেন। এবার সাপটা করলো কি কর্তার সারা গা পেঁচিয়ে ধরে তার ফণাধরা মুখ কর্তার মুখের কাছে এনে দিব্যি মনের আনন্দে রাগিনী শুনতে লাগলো। তবু কর্তার খেয়াল নেই। এই খবর গিয়ে পৌঁছালো স্বয়ং রাজার কাছে। মহারাজ রাধাকিশোর লোক-লস্কর নিয়ে গিয়ে দেখেন এক অপরূপ দৃশ্য। তখন দাদাকে কোনোরকমে উদ্ধার করেন বিষধর সাপের কবল থেকে।

বাসায় পৌঁছিয়ে একটু বিশ্রাম করে তিনটে নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম মহেন্দ্র দেববর্মার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খেতে। বাসা থেকে বেরিয়ে ধীরেন্দ্র ক্যাপ্টেনের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে এলাম নাজির পুকুরের কোণার চৌমুহনীতে। এবার সোজা চললাম অ্যাডভাইজার চৌমুহনীর দিকে। অ্যাডভাইজার চৌমুহনীর পর পড়লো যোগেন্দ্র ক্যাপ্টেনের বাড়ি পদ্মপুকুরে। যোগেন্দ্র ক্যাপ্টেনের বাড়ির সামনে এসে মনে পড়লো স্বয়ং মহারাজ বীরবিক্রম যোগেন্দ্র ক্যাপ্টেনের শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত থেকে শ্রাদ্ধের কাজকর্ম তদারকি করেছিলেন। মহারাজ যোগেন্দ্র ক্যাপ্টেনকে খুব ভালোবাসতেন। এই তথ্য দিয়েছিলেন যোগেন্দ্র ক্যাপ্টেনের পুত্র অনিল দেববর্মা ও কন্যা মলিনা চৌধুরী (দেববর্মা)। এবার ঢুকে পড়লাম যোগেন্দ্র ক্যাপ্টেনের বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা গলির ভেতর। এই গলি দিয়ে শর্টকাট করবো মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি। নারকেল-সুপুরি গাছের ছায়ায় ঘেরা এই গলি দিয়ে যেতে যেতে মনে মনে বললাম, রাজা গেলো, রাজতন্ত্র গেলো, কিন্তু এখনো স্মৃতিভারে রয়ে গেছে রাজ আমলের সেই নাজির পুকুর, পদ্মপুকুর এখনো লোকে বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মাফ্রন্টে যাওয়া ট্রাইবেল যোদ্ধা যোগেন্দ্র ক্যাপ্টেন--ধীরেন্দ্র ক্যাপ্টেনের নাম। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এবার এসে পড়লাম রাজ আমলের তবলা চৌমুহনীতে। তবলা চৌমুহনীর দক্ষিণ দিকে গলির প্রথম বাড়িটাই মহেন্দ্রবাবুদের। ভাবলাম, খুব দেরি হয়ে গেছে, লোকজনের ভিড় তেমন থাকবেনা, তাছাড়া মহেন্দ্রবাবুর শবানুগমনেও তেমন লোকজন হয়নি, শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণেও হয়তো তাই হবে। কিন্তু আমার হিসেবে সব গোলমাল হয়ে গেলো। মহেন্দ্র

বাবুর উঠোনে পা দিয়ে দেখি, উপচে পড়ছে আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের ভিড় । সকলেই অপেক্ষা করছেন পরের বারে খাবার জন্যে । ঢুকেই দেখা হয়ে গেলো আমার ধনেশ্বরের মামাশ্বশুর গৌরাঙ্গ দেববর্মার সঙ্গে । আমাকে দেখে বসতে বললেন তিনি । বসতে যাবো, এমন সময় চোখে পড়লো মহেন্দ্রবাবুর ছবির দিকে । এগিয়ে গিয়ে দেখি, পশ্চিম পোতার টিনের ঘরের বারান্দার দক্ষিণ পাশে তিনখানা চেয়ারের ওপর সযত্নে রাখা হয়েছে তিনখানা ছবি । তার মধ্যে একখানা বড়ো মাপের অয়েল পেন্টিং, আর দু'খানা বয়সের বিভিন্ন সময়ের ছবি । বিশাল আকৃতির এই ছবিটা এঁকেছেন শিল্পী চন্দন মজুমদার—প্রখ্যাত শিল্পী নলিনী মজুমদারের ছেলে । মহেন্দ্রবাবুর মৃত্যুর আগের চেহারা ধরে রেখেছেন শিল্পী। ছবিগুলোর পেছনে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে শবযানের সেই লাল ফেস্টুনটি যাতে লেখা রয়েছে — শিল্পী মহেন্দ্র দেববর্মা অমর রহে । ছবিগুলোর সামনে ধূপ-ধুনোর আরতি ফুলের সমাহারে । কিছুক্ষণ প্রয়াত শিল্পীর ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ ফেরালাম এবার অপেক্ষমান মহেন্দ্রবাবুর শুভানুধ্যায়ীদের দিকে। হঠাৎ চোখে পড়লো মহেন্দ্রবাবুর সংস্কৃতি-জীবনের সহকর্মী শিবদাস ব্যানার্জীর দিকে । পি সি যোশীর সময়ে ত্রিপুরায় যখন আই পি টি এ গড়ে ওঠে তখন মহেন্দ্রবাবু হন তার সম্পাদক, আর শিবদাস বাবুকে করা হয় সহ-সম্পাদক । শিবদাস বাবু মহেন্দ্র বাবুর শবযানের পাশাপাশি ছিলেন সর্বক্ষণ, আর এখন তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে শুভানুধ্যায়ীদের আদর-আপ্যায়ন করছেন শশব্যস্ত হয়ে । তাঁর পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আস্তে আস্তে, 'আচ্ছা, শিবদাস বাবু ভিড় দেখছি খুব এখনো, কতলোক খেয়েছেন এ পর্যন্ত ।' উত্তরে বললেন তিনি, 'এই নিয়ে চার ব্যাচ হতে যাচ্ছে । দু'দিকে লোক বসিয়েছি, এই চার ব্যাচে সাড়ে তিনশোর মতো লোক খেয়েছেন, এখনো দেখছেনতো উঠোন ভর্তি লোক, মহেন্দ্রদার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে সব্বাই আসছেন বুঝলেন, আমার মনে হয়, কুমুদবাবু, রাত পর্যন্ত ছশোর মতো লোক হয়ে যাবে । আপনি বসুন, পরের ব্যাচে আপনাকে বসিয়ে দেবো । খেয়ে যাবেন কিন্তু, মহেন্দ্রদার শ্মশানবন্ধু আপনি ।'

—'না, না, আমি খেয়ে যাবো । আমার জন্যে ভাববেন না । আচ্ছা, শিবদাসবাবু, মন্ত্রী-টন্ত্রী কেউ আসেননি মহেন্দ্রবাবুর শ্রাদ্ধে ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি ।

—'হ্যাঁ, মন্ত্রী, দু'জন এসে খেয়ে গেছেন ।'

—'নিশ্চয়ই সংস্কৃতি মন্ত্রী অনিল সরকার এসেছিলেন ।'

—'না, সংস্কৃতি মন্ত্রী আসেননি এখনো ।'

—'তবে কোন কোন মন্ত্রী এসেছিলেন ?'

—'বাজুবন রিয়াঙ আর জিতেন চৌধুরী এসে খেয়ে গেছেন ।'

— 'আমাদের হীরালাল সেনগুপ্তকে দেখছিনা তো খাটাখাটুনি করতে, ব্যাপার কি ?'

—'হীরালাল বাবু বোধ হয় রাতের বেলায় আসবেন, কোথায় একটা মিটিঙে গেছেন শুনলাম । ঠিক আছে, আপনি বসুন, আমি আরেকটা ব্যাচের ব্যবস্থা করি ।'

তাকিয়ে দেখি একটা চেয়ার খালি আছে মহেন্দ্র বাবুর প্রেসের দিকে । সেখানে গিয়ে আস্তে আস্তে বসে পড়লাম । চেয়ে দেখি মহেন্দ্র বাবুর বাঙালি বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরাই সংখ্যায় বেশী ।

আজ সন্ধ্যে পাঁচটায় মহারাজ কিরীট বিক্রমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ছিলো । কিন্তু এক ঘন্টা দেরিতে পৌঁছনোয় মহারাজা বিরক্ত হন এবং বলেন আগামীকাল সকাল দশটায় যেতে । আমার সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য, সাংবাদিক সত্যব্রত (কল্যাণব্রত) চক্রবর্তী ও রাজেন্দ্র কীর্তিশালার জহর আচার্য ।

২৯ শে অক্টোবর, ১৯৯৫, রবিবার । সকাল ১০ টায় কবি কল্যাণব্রত চক্রবর্তী ও জহর

আচার্যকে নিয়ে মহারাজ কিরীট বিক্রমের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। সন্ধ্যে ৬ টায় প্রেসক্লাবে গেলাম মহেন্দ্র বাবুর স্মরণসভায়। সভায় শ্রোতা ছিলেন সর্বসাকুল্যে ২৬ জন। সভানেত্রী ছিলেন ফুলন ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন ভূপেনদত্ত ভৌমিক, সত্যব্রত চক্রবর্তী, জয়ন্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ সাংবাদিকবৃন্দ।

২ রা নভেম্বর, ১৯৯৫, বৃহস্পতিবার। খুব ভোরে উঠে ছাদ ঝাঁট দিয়ে কিছুক্ষণ চোখের ব্যায়াম করলাম। তারপর পড়ার টেবিলে বসে আজকের কর্মসূচীগুলো ভাবতে শুরু করতেই গা শিউরে উঠলো — প্রথমে যেতে হবে আস্তাবল বাজারে চাল কিনতে, সকাল সাতটা তিরিশ মিনিটে এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ক্যাক্স্টন প্রিন্টার্স-এ একুশ শতকের সম্পাদক শুভ্রব্রত দেবের সঙ্গে, ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ বের করার ব্যাপারে, সকাল ন'টার মধ্যে ধরতে হবে আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্রের অধিকর্তা এন.সি.দেববর্মাকে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে জহর আচার্যীর রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্য জয়ন্তী উপলক্ষে একটা সেমিনার পেপারের বিষয়ে। সকাল পৌনে দশটায় হাজিরা দিতে হবে কর্নেল চৌমুহনীর ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার অফিসে, সেখানে দর্পণ-সম্পাদক সমীরণ রায়ের কক্ষে হা পিত্যেশ করে অপেক্ষা করবেন জহর আচার্যী, সেখান থেকে আমরা দু'জনে যাবো রাজভবনে মাননীয় রাজ্যপালকে দিয়ে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার একজিবিশন উদ্বোধন করার বিষয়ে আলোচনা করতে। রাজভবন থেকে আমাকে এগারোটার মধ্যে যেতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যাপক আমেদের সঙ্গে বসে ককবরক পরীক্ষার মার্কসিট তৈরি করতে হবে বাঙলা বিভাগে তাঁর ঘরে বসে। বেলা দুটোর সময় অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য যাবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাঁকে নিয়ে যেতে হবে অধ্যাপক মহাদেব চক্রবর্তীর কাছে। অধ্যাপক চক্রবর্তী রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তী উৎসব কমিটিভুক্ত সেমিনার সাব-কমিটির চেয়ারম্যান। সেখানে সেমিনার-পেপার ও বক্তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা সেরে আমাকে ককবরক ক্লাস নিতে যেতে হবে বেলা সাড়ে তিনটের সময়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরক ক্লাস সেরে ছুটতে হবে উজির বাড়িতে, সেখানে সন্ধ্যে ছ'টায় রয়েছে সদ্য প্রয়াত শিল্পী মহেন্দ্র দেববর্মার স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান, বেণুধর গোস্বামী বার বার অনুরোধ করে গেছেন যেতে, অনিলকৃষ্ণ স্মারক সমিতি ও মুক্তধারা যৌথভাবে মহেন্দ্র দেববর্মার স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে সেখানে। স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান সেরে আটটার মধ্যে পৌঁছে যেতে হবে আবার ত্রিপুরা দর্পণে, সেখানে জহর আচার্য অপেক্ষা করে থাকবেন রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তীর আজকের কাজকর্মের পর্যালোচনা করার জন্যে। ভাবনায় ছেদ ঘটলো ছোটো মেয়ে দেবযানীর বিশুদ্ধ ককবরক ভাষার ডাকে— চা নৃঙ-ফাইদি, বাবু— চা খেতে এসো বাবা।

—'তঙগৃরাখুদি, ফাইঅ'— রসো, আসছি। আমিও ককবরক ভাষায় উত্তর দিলাম। আসলে, আমাদের পরিবার সত্যিকারের আর্য-মোঙ্গলয়েড পরিবার। আমার স্ত্রী ফুলকুমারী তো খাঁটি মোঙ্গলিনী। আমার ছেলে-মেয়েদের মাতৃভাষা হলো ককবরক। বাড়িতে তারা আমার সঙ্গেও ককবরকে কথা বলে। আমি বাঙলা বললে তারা ককবরকে উত্তর দেয়। আমার স্ত্রী তো বিয়ের পঁচিশ বছরের মধ্যে একবারও আমার মাতৃভাষায় কথা বলেননি আমার সঙ্গে। সবসময় চীনা ভাষার দৌহিত্রী ককবককে তাঁর কাছ থেকে কথা শুনতে শুনতে মনে হয়, আমি পিকিঙ শহরে এক চীনা মহিলার সঙ্গে ঘর করছি। আমি যখন বিয়ে করে ত্রিপুরা থেকে কলকাতায় যাই, তখন আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরা আমার স্ত্রীকে দেখে চাইনিজ বা ভিয়েৎনামিজ বলে সন্দেহ করেছিলেন। আমি রহস্য করে বলেছিলাম, 'তোমরা তো উলুপা-চিত্রাঙ্গদার কথা মহাভারতেই শুনেছো, চোখে তো আর দ্যাখো নি, এবার চাক্ষুষ দ্যাখো উলুপা-চিত্রঙ্গদাদের বংশধর।' একটা মজার ঘটনা ঘটেছিলো কলকাতায় কমলেন্দু গাঙ্গুলী-উষা গাঙ্গুলীদের বাসায়। উষা আমাদের ফুলশয্যা গোছের একটা ব্যবস্থা ক'রেছিলো

তাদের ১১৮ নং বিবেকানন্দ রোডের বাসায়। আমার স্ত্রী জানেন না উষাদের বাসায় রাত কাটাতে হবে সেদিন। আলাদা একটা ঘরে আমাদের আর্য-মোঙ্গল বর-কন্যাকে গোলাপ-রজনীগন্ধার তোড়া দিয়ে আপ্যায়ন করলেন বন্ধু-বান্ধবরা। সেরাতে বন্ধু-বান্ধবরাও খেলেন আমাদের সঙ্গে। কমলদা-উষার অনেক টাকা খরচ হয়েছিলো সেদিন। খেতে খেতে রাত তখন ন'টা। আমার স্ত্রী বললেন— হর বর' থুনাই? —রাত্রে কোথায় শোব? —'তাঙগৃই, অর'থৃআনু'— কেন, এখানে শোবো।

—'আছুক হর' বাহাইকে থাঙনাই নিউবারাকপুর!' — এত রাত্রে কীভাবে যাবো নিউবারাক পুরে!

—'জেছাফান' খৃলাই থাঙনা নাঙগানৃ'—যে করেই হোক যেতে হবে।

—'নাঁও তাঙগৃই বুচিয়াউঁও বা, ছিয়ালদা ছগৃইতে ছগৃইতে দশটা অমুই থাঙগানৃ, নিউবারকপুর' চাঁও ছগৃইআনৃ হর এগারটাঅ—' তুমি বুঝছোনা কেন, শেয়ালদা পৌঁছতে পৌঁছতে দশটা বেজে যাবে, নিউবারাকপুর পৌঁছবো আমরা রাত এগারোটায়—

—'ছুকাঙবেরে নৃঙ তাঙগৃই ছায়াউঁঙ বা আন' অর' তঙনানাঙগানৃ হূনৃই, আমা উআনু জাগানৃ বৃলে, বন' ছাইকাইফায়াখু তিনি কিফিলয়া হূনৃই—' আগের ভাগে তুমি আমাকে বলোনি কেন এখানে থাকতে হবে বলে, মা (শাশুড়ী মা) চিন্তা কোরবেন তো, তাঁকে বলে আসিনি আজ ফিরবো না বলে-
-

ঠিক এমন সময় কমলদা ও উষা এসে উপস্থিত —'কুমুদ, তোমাদের চাইনীজ ভাষা আমরা তো বুঝতে পারছিনে, তোমাদের কি কোনো অসুবিধে হচ্ছে?' বেশ উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন কমলদা।

—'না, না, কোনো অসুবিধেনা, ফুলকুমারী বলছিলো আজ রাতেই নিউবারাকপুর ফিরে যাবে, রাতে ফিরবো না বলে মাকে বলে আসা হয়নি, মা চিন্তা করবেন।'

—'ও, তাই, বাঁচালে আমাদের, আমরা ভাবলাম কী না কী হয়েছে, তোমরা দু'জনে ঝগড়া করছো' —বলে হাসতে লাগলো উষা। তারপর ফুলকুমারীর পাশে বসে গায়ে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে বললো —'কি আজ রাতেই যেতে হবে শাশুড়ীর কাছে, শাশুড়ীর প্রতি এতো টান, কাল সকালে গেলে চলবে না? আমাদের তো শাশুড়ীর জন্যে এতো টান নেই—' বলে উষা এবার আমার দিকে চোখ ফেরালো, 'তোমার বৌ খুব ভালো কুমুদ, বেশ দায়িত্ববোধ আছে, তোমারইতো অন্যায় হয়েছে, তোমার মাকে বলে আশা উচিত ছিলো আজ ফিরবে না বলে।'

—'আরে, আমি কি জানতাম, তোমার আমাদের এরকম ফুলশয্যার ব্যবস্থা করবে।'—বলে আমিও হাসতে লাগলাম।

এরপর উষা আমার বৌয়ের হাতদুটো মুঠো করে ধরে বললেন—'ফুলকুমারী, রাত তো সাড়ে ন'টার মতো বাজে, এখন তো আর যেতে পারবে না, কাল সকালে চা-টা খেয়ে চলে যেয়ো শাশুড়ীর কাছে, কেমন?'

ফুলকুমারী এবার মাথা নেড়ে সম্মতিসূচক হুঁ বলতেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলো উষা। এই ঘটনা এখনো মনে আছে উষার। ক'বছর আগে আগরতলায় এসেছিলো সে সরকারী প্রোগ্রামে নাটকের বিচারক হয়ে। আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে তার সঙ্গে দেখা করতেই প্রসঙ্গটা তুললো উষা— 'মনে আছে কুমুদ, তোমরা যে ঝগড়া করেছিলে আমাদের বাসায়, ফুলকুমারী তো কিছুতেই থাকতে চায় না, কেমন মজা হয়েছিলো সে-রাত্রে, তাই না?'

—'তোমার মনে আছে সে-কথা এখনো!' হাসতে লাগলাম আমি।

—'মনে থাকবে না ? তোমাদের কমলদা যে কতো জায়গায় বলেছে ঘটনাটা ।'

এরপর আমার বৌয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—ফুলকুমারী, এতো কালো হয়ে গেছো তুমি, কী দুধে-আলতা রঙ ছিলো তোমার ? জানো কুমুদ, তোমার বৌয়ের রঙের কথা কতো বন্ধুদের বলেছি আমরা, কুমুদ একটা বৌ এনেছে বটে ত্রিপুরায় থেকে. রঙ কী তার, আর মলয়দা (কালান্তর পত্রিকার মলয় দাশগুপ্ত) তো ফুলকুমারীর রঙের কথার ঢাক পিটিয়েছে সারা কলকাতায় ।

—'বাবু, চা কূচাঙনা নাইখা'—বাবা, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে । এবার বড়ো মেয়ে নন্দিনী ডাক দিতেই মধুর স্মৃতিতে বাধা পড়লো । আমি মিচ মিচ করে হবাসতে হাসতে ফুলকুমারীর পাশে বসতেই আমার দু'মেয়ে বললো—'তাঙগৃই মুনুউইতঙ ?' হাসছো কেন ? উত্তরে আমি বললাম, 'অনেক দিন পর একটা ঘটনার কথা মনে পড়তেই হাসি পেলো আমার ।'

—'ব গতনা আব ।' —কোন ঘটনাটা ? দেবযানী শুধোয় ।

—'ও তোরা জানবি না, তোদের মা আর আমি জানি ।'

—'ছালা, বাবু খীনানা মূচুঙগ'—বলো না, বাবা, শুনতে ইচ্ছে করছে ।

—তোরা দু'বোন তখন হোসনি, বুঝলি; তোদের দাদা (আমার বড়ো ছেলে সুরঞ্জন) কেবল পেটে, তখন বিয়ের ছ'মাস পর তোদের মাকে নিয়ে আমি বাড়ি গেলাম । তোদের কমল জ্যাঠা আর ঊষা জেঠী কলকাতায় তাদের বাসায় আমাদের ফুলশয্যার ব্যবস্থা করলো । এদিকে রাত হয়েগেছে, মা নিউবারাকপুরের বাড়ি ফিরতে চায় । আমি বলি এতো রাতে বাড়ি ফিরবো কী করে ? মা তো যাবেই । এই নিয়ে আমরা দু'জনে ককবরকে কথা কাটাকাটি শুরু কোরে দিলাম । আমাদের এই চাইনীজ কথা তো আর কমলদা -ঊষা বোঝে না, তারা এলো ছুটে, নিশ্চয়ই আমাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে । তারপর তোদের মায়ের নিউবারাকপুর যাবার কতা শুনে তো তারা হেসে মরে আর কি ।

—'তাঙগৃই তাবুক আচমছা আ কক মুইতু মানছুলা' —হঠাৎ করে এখন সে কথা মনে এলো কেনো ? জিজ্ঞেস করে ফুলকুমারী ।

—'না, মানে ডাইরি লিখতে লিখতে কথাটা মনে পড়ে গেলো ।'

—'আইচ চা, কুবুই-ন, অছানি ছুকাঙ উছা ফাইহূন বূলা আগূলি নাতক খূলাইনানি, তাঙগৃই চূঙবাই মালাইয়া ছূলা—?' আচ্ছা, ভালো কথা, দুর্গাপুজোর আগে ঊষা নাকি আগরতলায় এসেছিলো নাটক করতে, আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেলো না কেন ?

—'এসেছিলো তো ঊষা তাদের রঙ্গকর্মী ট্রুপ নিয়ে, এয়ারপোর্টে নেমেই নাকি আমার কথা বলেছিলো, আগরতলায় নাটক করার ফাঁকেও নাকি আমাকে খুঁজেও ছিলো ।'

—'ছাব ছা নন' অ কক ? কে তোমাকে বললো এ-কথা ?'

—'ডঃ জলধর মল্লিকের সঙ্গে দেখা সেদিন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে, তখন কথাটা বললেন উনি। ডঃ মল্লিক ঊষাকে একখানা চিঠি দিতে বলেছেন, বুঝলে, সত্যিসত্যি একখানা চিঠি দেয়া দরকার, কি ভাববে বলো তো ঊষা, কলকাতা থেকে আগরতলায় এলো সে, আর আমরা দেখা করলাম না, ব্যাপারটা খুব বিশ্রী হয়েছে ।'

এমন সময় সুরঞ্জন পাশের ঘর থেকে এসে বললো —'আঙ নুকখা বলে ঊষা জ্যাঠীন হাচাল তঙতূতূই, আঙ বিনি নাতক নাইনা থাঙবূলে আদিন' —সে দিন দূর থেকে ঊষা জেঠীকে তো দেখে ছিলাম আমি, তার নাটক দেখতে গিয়েছিলাম তো আমি ।

—'তা তুই কথা বলিসনি কেন, কি ছেলেরে বাবা ! '

—'বুই তাম' হূননাই, আবনি বাগূই জেথি বাই আঙ মালাইয়া'-লোকে কি ভাববে, তাই আমি

দেখা করিনি।

—'উঙখা উঙখা, তাবুক বাজার' থাঙদি, মাইরুঙ কুবুইখা, খবর বুনাইরগ-ব নন' খবর বুয়া তাম' খুলাইনানি' —হয়েছে হয়েছে, এখন বাজারে যাও; চাল শেষ হয়েছে, যারা খবর দেবে তারাও তোমাকে খবর দেয়নি, আর কি করা যাবে!'

এবার আমি বিশুদ্ধ ককবরকে বললাম— 'রাঙ বুদি'— টাকা দাও।

আমার স্ত্রী একশ' টাকার চার খানা নোট আর খুচরো দশ টাকা দিয়ে বললেন—' মাঙখে মছ' কুথাঙ বাই মুলাই কুলুই জাত কিছা ছাইউই তুবদি, দ?'—পেলে কাচা লঙ্কা আর কিছু নরম দেখে মুলো নিয়ে এসো, কেমন?

বড়ো মেয়ে তানিয়া (নন্দিনী) প্লাস্টিকের বস্তা একটা আর বাজারের থলে হাতে দিয়ে বললো— 'দাতি ফাইদি দ, বাবু, মাইরুঙ তুবখে মাই বকছানাই, মছ' কুথাঙ ব কঙছা ফান' কুবুই'—তাড়াতাড়ি এসো, বাবা; চাল আনলে পর ভাত চড়াবো, কাঁচা লঙ্কাও একটাও নেই।

চালের বস্তা আর বাজারের থলে হাতে নিয়ে সুপুরি বাগানের ভেতর দিয়ে রাজার দেওয়ান বঙ্গঠাকুরের বাড়ি বাঁয়ে রেখে আমার শালা সুনীল দেববর্মার বাসার পাশ ঘেঁসে এসে পড়লাম একেবারে অধ্যাপক বি. কে. রায়বর্মণের ভাগ্নেজামাই ডাঃ পি. আর.লস্করের বাড়ির সামনে। তারপর সোজা পুবমুখো হয়ে আস্তাবল বাজারে। পুড়ে যাবার পর প্রায় একইরকম গলি করে বাজারটা পাকা করা হয়েছে। একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাল-পট্টিতে ঢুকে পড়ে দীনেশ মজুমদারের চালের দোকানে বস্তা রেখে দীনেশ বাবুর ছেলেকে বললাম— 'মজুমদার, এই নাও চারশো টাকা, চাল দাও একমণ, মাসের শেষে কম পড়লে তখন আবার নেয়া যাবে।'

খাতায় চারশো টাকা জমা করে মজুমদার বললো— 'আরো তো আড়াই শ' টাকার মতো থাইকত্যাছে, বাড়াইয়া দ্যান না কিছু, পূজার মাসে শোধ করেন নাই তো।'

—'আরে আরে, আমি তো তোমার বাঁধা খরিদ্দার, স্ত্রীর জমিতে তো ছ'মাসের বেশী ধান হয়না, আর তো ছ'মাস খাই তোমার কাছ থেকে, ঠিক পেয়ে যাবে টাকা, চিন্তা কি?'

—'যান আপনি বাজারে, চাইল মাইপ্যা রাইখমু আমি। যাইবার সময় লইয়া যাইবেন।'

মজুমদারের দোকান থেকে মাছের বাজারের মাসের প্রথমের ভীড় সামলিয়ে কোনো রকমে গিয়ে পড়লাম সবজি পট্টিতে। সবজি পট্টিতে আর ট্রাইবাল দোকানদার বেশ কম এসেছে দেখলাম। একটা আট-ন' বছরের পরিষ্কার ফুটফুটে ট্রাইবাল ছেলে কিছু মুলো আর থানকুনি পাতা নিয়ে বসে আছে। দাম করতেই চক্ষু চড়ক গাছ, এক হালি (এক গন্ডা) মুলোর দাম তিন টাকা। ট্রাইবাল ভাষায় ছেলেটাকে বললাম—' থিকখে ছাদি, আলি কুনুই নানাই, বুছুক বুনাই? —ঠিক করে বলো, দু'হালি নেবো, কত দেবো?'

—'রাঙ খকদক বুনানাঙগানু —ছ'টাকা দিতে হবে।'

—'খাইনাদি কিছা, আলি কুনুই খক বা বুআনু —কিছু কম করে নাও, দু' হালি পাঁচ টাকা দোবো।'

—'ইঁহি, উঙগ্য়া —উঁহু, হবেনা।'

—'আলি কুনুই না বুলে, খকছা কম নারুকদি তা হুন'! —দু' হালি নিচ্ছি তো, এক টাকা কম রাখো আর কি!'

—'ইঁহি উঙাগ্য়া উঙগ্য়া' বুইমাইয়া —উঁহু, হবেনা হবেনা, দিতে পারবো না।'

বুঝলাম, ট্রাইবাল সবজিঅলারা আজ তেমন আসেনি, তাই ছেলেটা এতো দর হাঁকিয়েছে। ট্রাইবাল ছেলেটার কাছে দরাদরি করে হেরে যাওয়ায় খুব আনন্দ পেলাম আমি। মনে মনে

বললাম— যাক, ট্রাইবালরা আস্তে আস্তে ব্যবসা কোরতে শিখছে। এতটুকুন ট্রাইবাল ছেলে, সেও বাজারের ভাব বুঝে দিব্যি দরকষাকষি করছে বাঙালী ব্যবসাদারের মতো। একটা ঘটনার কথা মনে পড়লো আমার। তখনো আস্তাবল বাজারটা এরকম পাকা হয়নি। বাজার পুড়ে যাবার পরে যে-যেখানে পারে বসে। ট্রাইবাল সবজি ব্যবসাদারেরা বাজারের একদিকে একসঙ্গে বসে আট-দশ জনের মতো। দল করে সব বাঙালীরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেখানে সার ছাড়া তরি-তরকারির লোভে। আর আগরতলার ট্রাইবাল খরিদ্দারের তো কথাই নেই, বাঁশের কড়ুল, জুমের বেগুন, চাল কুমড়ো, মিষ্টি কুমড়ো, সুগন্ধি মশলা পাতা (বান্‌তা), জুমের নানা রকম শাক-সব্জি, বড়মোড়া পাহাড়ের কলার থোড় ও মোচার লোভে সব সেখানে ভীড় জমায়। ট্রাইবালরা আধুনিক সার ছাড়া তরি-তরকারি করে বলে খেতে স্বাদও হয়, শরীরেরও ক্ষতি করেনা তেমন। ব্যাঙের ছাতা (ককবরক ভাষায় 'মুইখুমু হাপ্লক') কেনার জন্যে তো বাঙালি বাড়তি পয়সার খরিদ্দাররা ছুটতে ছুটতে আসে ট্রাইবাল সবজিঅলাদের কাছে। ব্যাঙের ছাতা খেলে নাকি হার্টের ব্যামো কমে, হার্ট এ্যাটাক হবার সম্ভাবনা থাকে কম। একশো টাকা কেজি হলে একশো টাকাই সই, তবু ট্রাইবালের ব্যাঙের ছাতা চাই-ই চাই।

কিন্তু ব্যাপারটা মোড় নিলো অন্যদিকে। বাঙালি সবজিঅলাদের বেশীরভাগ খরিদ্দার নবাগত পাহাড়ের ট্রাইবাল সবজিঅলাদের কাছে চলে যাচ্ছে, তাদের বেচা-কেনাও হচ্ছে কম, বাকীতে কেনা মাস কাবারী খরিদ্দররা ছাড়া আগরতলার কাঁচা পয়সার নগদ-লক্ষ্মীরা সব চলে যাচ্ছে ট্রাইবাল ব্যবসাদারের দিকে। একদিন আমি নিজের কানে এক বাঙালি সবজিঅলাকে বলতে শুনলাম— 'আমাগো বেচা-কেনা হইবো কি আর, ট্রাইবালদের ওহান থেইক্যা আইলেই না আমাগো বেচা-কেনা।' কথাটা শুনে আমার মনে কেমন যেন খটকা লাগলো। সারা আগরতলা শহরে শুধুমাত্র রাজ প্রাসাদের কাছের এই বাজারে হাল আমলে আগরতলার আট-দশ মাইল দূর থেকে পাহাড়ের কিছু গরিব-গুরবো ট্রাইবাল বড়মোড়া পাহাড় ও জুম থেকে কিছু শাক-সব্জি, তরি-তরকারি নিয়ে আসে, যাকে অর্থনৈতির পরিভাষায় 'ফ্রি কালেকশান' বলা যেতে পারে, আর তাও বা কতটুকু সময় বাজারে থাকে তারা, সকালে ক'ঘন্টা মাত্র। আগরতলার আস্তাবল বাজারকে অনেকটা ট্রাইবাল বাজার বলা চলে। এই বাজাবে অর্দ্ধেক ক্রেতাই আগরতলার মধ্যবিত্ত ট্রাইবাল। আশির ভায়াবহ জাতি দাঙ্গার সময় ট্রাইবালরা কেবলমাত্র রাজবাড়ির দোরগোড়ার বাজারে আসতে সাহস করতো; এখনো পাহাড়ের ট্রাইবাল ব্যবসাদারও সাহস করে শুধুমাত্র ক'ঘন্টার জন্যে সকাল বেলায় এই বাজারে আসে পাহাড়ের কিছু শাক-সব্জি নিয়ে। বাঙালি ব্যবসাদারদের কাছ থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য শিখে এখন পাহাড়ে কিছু কিছু ট্রাইবাল ব্যবসাদার বাজার অর্থনীতিতে আসার চেষ্টা করছে, জমি-চাকরির ওপর নির্ভরতা কমানোর এই যে প্রচেষ্টা, তাকে বাঙালি ব্যবসাদারদের স্বাগত জানানোই উচিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ট্রাইবালরা ব্যবসা-বাণিজ্য শিখুক, তা তাঁরা মেনে নিতে পারছেন না; তারা ত্রিপুরায় ট্রাইবালদের শুধুমাত্র ক্রেতা হিসেবে দেখতে চান, ট্রাইবাল মধ্যবিত্ত-সরকারী কর্মচারী, পাহাড়ের কিছুটা সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক এইসব ব্যবসাদারদের তিনপুরুষের ঐতিহ্যবাহী খরিদ্দার হিসেবে পেতে চান তাঁরা। এই সব ক্রেতাদের কোনো বাজেট নেই, নেই কোনো অর্থ সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা, চোখ বুজে এরা মালপত্র কেনে, প্রায় সময়ই কোনো দরদাম করেনা, রাজার জাতির লোকদের বাজারে দরদাম করা নাকি পোষায় না, সম্মানে লাগে, যা আয় করে সব খরচ করে ফেলে, আছে তো মহাজন। এমন মানসিকতার ক্রেতারা যদি ভাগ হয়ে যায়, বাঙালি ব্যবসাদারদের তাহলে আর একচেটে ব্যবসা থাকবে না? এই ভয় থেকে ট্রাইবালদের ব্যবসা বাণিজ্য করতে দেখলে আঁতকে ওঠেন তাঁরা। কাজেই আস্তাবল বাজারের কাঁচা মালের দোকানদাররা পাহাড় থেকে আসা সদ্যগজানো এই সব ট্রাইবাল পসারীকে তো

ভালো ভাবে নেবে না এটাই স্বাভাবিক। বাস্তবে হলোও তাই। কাঁচামালের দোকানদাররা ট্রাইবাল সবজিঅলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করলেন, অনেকে তাদের কাছ থেকে পাইকারি মাল কিনে ঠিকমতো দাম দিচ্ছে না দেখা গেলো। মাঝেমধ্যে কাঁচা মালের দোকানদারদের সঙ্গে বাঙালি ব্যবসাদারদের কথা কাটাকাটি শ্রুতিমধুর লাগালো না বাজারে আসা মানুষজনের। বাজার কমিটির কিছু হোমরা-চোমরাকে ট্রাইবাল দোকানদারদের সঙ্গে চোখ রাঙাতেও দেখতে লাগলেন সকলে। একদিন তো এক ট্রাইবাল দোকানদার ও বাঙালি দোকানদারের মধ্যে বচসা এমন জায়গায় পৌঁছালো যে একে অন্যকে দা দেখিয়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বাজারের লোক জমে গেলো সেখানে। কে যে আগে দা দেখিয়েছিলো, ট্রাইবেল দোকানদার না বাঙালি দোকানদার, তা কেউ লক্ষ্য করেনি। বাজারের লোকজনই ব্যাপারটা মীমাংসাও করে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। আমিও ছিলাম তখন বাজারে। ঘটনাটা মীমাংসা হয়ে যাবার পর চালপট্টির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে একটা কথা কানে যেতেই থমকে দাঁড়ালাম আমি। দেখি, এক ভদ্রলোক ইনিয়ে-বিনিয়ে ঘটনাটা বলছেন, "কী সাহস, দ্যাখো, আস্তাবল বাজারের মতো জায়গায় এসে ট্রাইবালরা দা দেখায়, তাহলে পাহাড়ে কি হবে বলো!"

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোককে এক ধমক দিলাম আমি বেশ উত্তেজিত ভাবে—'পোশাক-আসাকে তো বেশ ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে, তা কথায় এতো সাম্প্রদায়িকতা কেন। বাজারটা কি শুধু বাঙালিদের? এক জাতির কোন হাটবাজার হয়? বাঙালি ত্রিপুরী, মণিপুরী সকলেরই বাজার এটা। যে যেখান থেকে পারুন কিনুন, এর মধ্যে ট্রাইবেল-বাঙালি শব্দ আসে কি করে?' ভদ্রলোক চারদিকে তাকিয়ে দেখেন তার কোনো সমর্থক নেই, তখন ভেজা বেড়ালের মতো চুপসে কেটে পড়লেন তাড়াতাড়ি।

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৯৫, শুক্রবার। খুব ভোরে উঠে ডিমসাগরের পাশ দিয়ে রাজবাড়ির উত্তর গেট হয়ে কর্ণকর্তার বাড়ির সামনে দিয়ে উজির বাড়ি বাঁয়ে রেখে ইসকাস ভবন, জনসেবা পরিষদের গা ঘেঁষে বীরচন্দ্র দেববর্মার মামার বাড়ি বর্তমান পাওয়ার হাউসের তলা দিয়ে ডাইনে লালবাহাদুর ক্লাব হয়ে সোজা একটু হেঁটে পৌঁছলাম সি পি আই নেতা অঘোর দেববর্মার বাড়ি। গতকাল দু'বার এসেছিলেন আমার বাসায়, আমাকে খুঁজতে। পার্টির আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আলোচনা সেরে সকাল ৭.৩০-এ একটা রিক্সা চেপে রামনগর ৭ নম্বর রাস্তার দিকে রওনা হলাম। রিকসা চেপে দুর্গা চৌমুহনী বাজারে নেমে, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে গেলাম অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যের বাড়ি রাজেন্দ্র কীর্তিশালার কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করতে। গিয়ে দেখি জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য আগেই এসে বসে রয়েছেন। একটু পরে এলেন জহর আচার্য। রাজেন্দ্র কীর্তিশালার সেমিনার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উদ্বোধন করবেন বলে ঠিক হলো, রামেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে উপাচার্য ওয়াই ডি পাণ্ডেকে টেলিফোনে সব জানালেন, রাজি হয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু রাজেন্দ্র কীর্তিশালার প্রদর্শনী কে উদ্বোধন করবেন, তা ঠিক করা গেল না। রাজ্যপালকে পাওয়া যাচ্ছে না। আলোচনা শেষে জয়নারায়ণবাবু ও জহর আচার্য চলে গেলেন। আমি একটু থেকে রামেশ্বরবাবুর পিতৃদেব শ্রীযুত রামতারণ ভট্টাচার্যের সংস্কৃত সব বই দেখতে লাগলাম। রমেশ চন্দ্র দত্ত সম্পাদিত ঋগ্‌বেদ সংহিতা পড়তে শুরু করলাম। বইখানার ভূমিকা লিখে দিয়েছেন ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

দুপুর বারোটায় চলে এলাম দৈনিক সংবাদে ভূপেন দত্ত ভৌমিকের কাছে রাজেন্দ্র কীর্তিশালা নিয়ে আলোচনা করতে। রামেশ্বর, জহর আচার্য ও বেণুধর গোস্বামীকে নিয়ে ভূপেনবাবুর সঙ্গে আমি আলোচনা শুরু করলাম। ভূপেনবাবু সব শুনে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তী উৎসবে কলকাতা থেকে আগত অতিথিদের আগরতলায় থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব নিলেন। আলোচনার সময় কবি মিহির

দেবও উপস্থিত ছিলেন, তিনিও সাহায্য করলেন আমাদের। আলোচনা করে আমি চলে এলাম বাড়িতে।

বিকেল সাড়ে তিনটায় গেলাম মেলার মাঠে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তের বাড়িতে জনশিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে তার কাছ থেকে একটা লেখা আনতে। সেখান থেকে এলাম মধ্যপাড়ায় কানু সেন-বেণু সেনদের বাড়ি। সেখানে শিল্পী রবি সেনের সঙ্গে আলোচনা হল জনশিক্ষা আন্দোলনের সময় তার তোলা ছবি নিয়ে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরলাম স্ত্রী শালবাগান বি এস এফ ক্যাম্প থেকে ফিরেছেন কিনা তা দেখতে। বাসায় ঢুকতেই স্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। বাড়িতে একটু থেকে ফুলকুমারীর সঙ্গে চা খেয়ে চলে এলাম নন্দলাল কর্তার বাড়ির ত্রিপুরা দর্পণের অফিসের দিকে। রাস্তায় দেখা হয়ে গেলো বন্ধুবর জগৎজ্যোতি রায়ের সঙ্গে। তাঁকে বললাম ত্রিপুরার সতীদাহের ওপর একটা পেপার পড়তে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার সেমিনারে। তাঁকে অটোয় তুলে দিতে বিদুর কর্তা চৌমুহনীর দিকে যেতেই জহর আচার্য সাইকেল করে এসে গেলেন আমাদের সামনে। জহরবাবু রাজেন্দ্র কীর্তিশালার সুভ্যেনির নিয়ে আলোচনা করলেন জগৎজ্যোতিবাবুর সঙ্গে। জগৎজ্যোতিবাবুকে অটোয় তুলে দিয়ে আমরা চলে এলাম নন্দলাল কর্তার বাড়ির ত্রিপুরা দর্পণ অফিসে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে স্টেটসম্যানের সাংবাদিক সত্যব্রত চক্রবর্তী ও টেলিগ্রাফ পত্রিকার শেখর দত্ত ও ঢুকলেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও দর্পণ সম্পাদক সমীরণ রায়ও ঢুকলেন। রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রজতজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনের সময় সভাপতিত্ব মহারাজ কিরীট বিক্রম করবেন শুনে সমীরণ আপত্তি জানালেন। কবি রাতুল দেববর্মাও সমীরণ রায়কে সমর্থন জানালেন। খুচখাচ বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হলো এ নিয়ে। সত্যবাবু ও শেখর রাজেন্দ্র কীর্তিশালার আমন্ত্রণপত্র লিখতে লাগলেন খুব মন দিয়ে। রামেশ্বর সমীরণ রায় ও রাতুল দেববর্মাকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করতে বললেন রাজাকে। কিন্তু তাঁরা ত্রিপুরার ইতিহাসে বর্তমান যুবরাজ কিরীট বিক্রমের কোনো ভূমিকা নেই বলে মন্তব্য করলেন।

১০ই নভেম্বর, ১৯৯৫, শনিবার। আজ সন্ধ্যেবেলায় মহারাজ কুমার সহদেব কর্তার বাড়ি ঢুকলাম খুব সন্তর্পণে তাঁর ইংরাজি ভাষায় লেখা ককবরক ভাষার উপর গবেষণামূলক নিবন্ধটি নিয়ে। নিবন্ধটি মহারাজ কুমার আমাদের দেখতে দিয়েছিলেন। নিবন্ধটি তিনি পড়বেন রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তী উৎসবের সেমিনারে। বেগুনি রঙের নয়নমনোহর নেটের পর্দার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল এক অদ্ভূত ধরনের রাত্রিবাস পরে কর্তা কার্পেট বিছানো মেঝের ওপর বসে কার সঙ্গে যেন পুঁথিপত্র নিয়ে আলোচনা করছেন। মহারাজ কুমার আছেন নাকি বলতেই উত্তর দিলেন তিনি, 'কে? আসুন, আসুন।' আমি সাহস পেয়ে ভেতরে ঢুকে আগরতলার ঠাকুরলোকের রেওয়াজ মাফিক আনতমস্তকে নমস্কার জানিয়ে বললাম, 'এই নিন, আপনার লেখাটা। লেখাটা বেশ ভালো, ককবরক ভাষার সঙ্গে অস্ট্রিক গোষ্ঠির ভাষার সঙ্গে তুলনা করেছেন আপনি, এতে নতুনত্ব আছে, আর ককবরক ভাষার উৎপত্তি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা বেশ মৌলিক, এই পেপার (প্রবন্ধটিই) পড়বেন আপনি।' কর্তা আমার কথা শুনে বেশ খুশিই হলেন। কর্তার পাশে বসে ট্রাইবেল রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের অরুণ দেববর্মা ত্রিপুরার রাজাদের বিভিন্ন ছবি সামনে রেখে কি যেন লিখছিলেন।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি—"কি লিখছেন অরুণবাবু?"

উত্তরে বললেন তিনি, 'ত্রিপুরার রাজাদের ছবি নিয়ে ট্রাইবাল রিসার্চ থেকে একটা অ্যালবাম করতে যাচ্ছি, তাই কর্তার সঙ্গে বসে ছবিগুলো সম্বন্ধে কিছু তথ্য লিখে রাখছি।' আমাদের কথার মধ্যে হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হলেন রাজেন্দ্র কীর্তিশালার জহর আচার্য, সঙ্গে ফটোগ্রাফার দিলীপ দেবরায় ও সরকারী মিউজিয়ামের কিউরেটর। জহরবাবুর এ বাড়িতে অবারিত দ্বার। সহদেব কর্তা তাঁকে স্নেহও

করেন খুব, তাঁর সংগ্রহশালা থেকে অনেক কিছু দুষ্প্রাপ্য জিনিসও দিয়েছেন তিনি তাঁকে। জহর বাবু নতমস্তক হয়ে বললেন, 'মহারাজ কুমার, এগজিবিশনটা বেশ ভালোই হবে, চিন্তা করবেন না।'

১২ নভেম্বর, ১৯৯৫, রবিবার। এই দিনের দিনলিপির মূল ঘটনা : ১) ভোরে উঠে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদার ও স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তকে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার চিঠি দেয়া। (২) সেখান থেকে রয়াল গেস্ট হাউস হোটেলে গিয়ে ৭টা ১৫ মিনিটে ১০৮ ও ১০৯ নম্বর রুমে গিয়ে যথাক্রমে অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ডঃ কল্যাণ কুমার দাশগুপ্তর ঘরের দরজায় টোকা মারা—কোনো সাড়া না পাওয়া (৩) ৭.৩০-এ ত্রিপুরা দর্পণ নিয়ে বাড়ি ফেরা। (৪) ৭.৪০-এ শিল্পী রবি সেন এলেন মহেন্দ্রবাবুর ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে। (৫) স্নান সেরে সকাল ৮.১৫ মিনিটে কৃষ্ণায়নে গিয়ে শ্রী দুলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করা ও চা খাওয়া। (৬) দুলাল বাবুকে নিয়ে ৮.৩০ মিনিটে পথিকা দেববর্মার সঙ্গে দেখা করে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তী উৎসবে গিয়ে সংগীত পরিবেশন করার জন্যে অনুরোধ করা, রিক্সা ভাড়া দিতে চাইলে পথিকার প্রত্যাহার। (৭) ৮.৪০-এ ব্রাইডওয়ে হোটেলে গিয়ে অধ্যাপক এ এন লাহিড়ী, শ্রীমতী লাহিড়ী ও অধ্যাপক ব্যানার্জিকে রাজধানী হোটেলে নিয়ে শিফট করার বিষয়ে আলোচনা করা। (৮) ৮.৫০-এ রয়াল গেস্ট হাউসে গিয়ে অধ্যাপক দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা করা—তখনো বসন্ত চৌধুরী সহদেব কর্তার বাড়ি থেকে না ফেরা (৯) বসন্ত চৌধুরীর ৮.৫৫য় হোটেলে ফেরা এবং সহদেব কর্তার বাড়ি হোটেলের রুমের চাবি ফেলে আসার কথা বলা। (১০) আমার সহদেব কর্তার বাড়ি চাবি আনতে যাওয়া এবং চাবি নিয়ে বসন্ত চৌধুরীকে দেওয়া। (১১) বসন্ত চৌধুরী ও অধ্যাপক দাশগুপ্তর সঙ্গে তাঁদেরকে দৈনিক সংবাদের গেস্ট হিসেবে রাজধানী হোটেলে নিয়ে যাবার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। এবং তারা বলেন রৌপ্যজয়ন্তী উৎসব সেরে হোটেল চেঞ্জ করা (১২) পুনরায় ব্রাইডওয়ে হোটেলে ৯.২০ মিনিটে ফিরে আসা এবং অধ্যাপক লাহিড়ীদের অটো করে বন্ধুবর দুলাল চক্রবর্তীকে দিয়ে রাজধানী হোটেলে পাঠিয়ে দেয়া (১৩) ৯.৩০ মিনিটে আমার রাজ অন্দরে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার অনুষ্ঠানের জায়গায় যাওয়া এবং সেখান থেকে বন্ধুবর জগৎজ্যোতি রায়কে নিয়ে ত্রিপুরা দর্পণে ফিরে আসা এবং সমীরণ রায়ের বাড়ি থেকে হারমোনিয়াম নিয়ে একটা রিক্সা করে রাজঅন্দরে যাওয়া। (১৪) রাজঅন্দরে ঢুকে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করা এবং মঞ্চের ওপর রাজকীয় চেয়ারের ব্যবস্থা করা এবং সে বিষয়ে সমস্যা। (১৫)অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যের মহারাণীকে সভাপতিত্ব করার জন্যে বলা—রাজা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন না বলে সমস্যার সৃষ্টি হওয়া (১৬) রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তী উৎসব ১০টার পরিবর্তে ১০.৪০ মিনিটে শুরু হওয়া (১৭) মঞ্চে মহারাণী, উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার, খাদ্যমন্ত্রী ড. ব্রজগোপাল রায়, অধ্যাপক লাহিড়ী, অধ্যাপক দাশগুপ্ত ও অভিনেতা বসন্ত চৌধুরীর আসন গ্রহণ করা (১৮) অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যের অনুষ্ঠানের ঘোষক হিসেবে সফল পরিচালনা করা (১৯) শ্রীমতী পথিকা দেববর্মার উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন রবীন্দ্র সংগীত ও তার অনুবাদ ককবরকের মাধ্যমে (২০) উপমুখ্যমন্ত্রী, আমার, খাদ্যমন্ত্রী, অধ্যাপক দাশগুপ্ত, বসন্ত চৌধুরী, অধ্যাপক লাহিড়ী, জহর আচার্য, মহারাণী ও সাংবাদিক সত্যব্রত চক্রবর্তীর ভাষণ, অরুন্ধতী রায়ের গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি (২১) অনুষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণ-জনসমাবেশ-মন্তব্য (২২) অনুষ্ঠান শেষে উপমুখ্যমন্ত্রী ও মহারাণীর মহারাণীর দরবার হলে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার প্রদর্শনীর উদ্বোধন—ফিতে কাটানো উপমুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করানো মহারাণী বিভুকুমারীকে দিয়ে। (২৩) সমবেত জনতার প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশ (২৪) মহারাণীর আতিথ্যে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও তা নিয়ে সমস্যা — মহারাজা কিরীট বিক্রমের দরবার কক্ষে

অতিথিবৃন্দের গমন ও প্রাতরাশ ভক্ষণ। (২৫) প্রদর্শনী কক্ষের বর্ণনা—রাজা ও রাণীর সঙ্গে বিশিষ্ট অতিথিদের মুদ্র্য বিষয়ক আলোচনা (২৬) বসন্ত চৌধুরী ও অধ্যাপক দাশগুপ্তকে নিয়ে রয়াল গেস্ট হাউস থেকে রাজধানী হোটেলে শিফট করানো—সঙ্গে দুলাল চক্রবর্তী ও আমি (২৭) সেখান থেকে ৩টের সময় বাড়ি ফেরা। (২৮) ৪-৩০ শে রাজঅন্দরে প্রদর্শনীতে যাওয়া। প্রদর্শনীতে দারুণ ভিড় মহারাজার ভিড় সামলানোর দৃশ্য ও খুশিখুশি ভাব (২৯) রাজঅন্দর থেকে ফেরার পথে বন্ধুবর জগৎজ্যোতি রায়কে নিয়ে সহদেব কর্তার বাড়ি যাওয়া এবং রজতজয়ন্তী উৎসব সম্পর্কে তার মতামত নেয়া। (৩০) রাত ৭টায় ত্রিপুরা দর্পণে ফেরা এবং সেখান থেকে জয়নারায়ণ ভট্টাচার্যের স্কুটারে করে রামেশ্বর ও আমার রাজধানী হোটেলে গিয়ে বসন্ত চৌধুরী ও অধ্যাপক দাশগুপ্তকে অ্যাটেণ্ড করা এবং বসন্ত চৌধুরীর খোসগল্প শোনা ঃ বসন্ত চৌধুরী একবার উদয়পুরে গিয়ে কবি অমিতাভ করের গাড়িতে করে ডম্বুর প্রকল্প দেখতে যান। একজন রিয়াঙ কৃষক তাঁকে একটা নেকড়ের বাচ্চা উপহার দেন। কিন্তু তিনি তা নিয়ে কলকাতায় যেতে পারেননি। তারপর সেই নেকড়ের বাচ্চাকে এয়ারলাইন্সের মি. গুহ নিয়ে তাঁর আগরতলার বাড়িতে রাখেন। কুকুর বেড়ালের সঙ্গে সেটা প্রতিপালিত হতে থাকে। বসন্তবাবু মিস্টার গুহর বাড়িতে গিয়ে সেটা দেখতে যান। পরে জানতে পারেন নেকড়ের বাচ্চাটা বড়ো হয়ে বাড়ির একটা কুকুর মেরে ফেলে। তারপর সেটাকে 'জু'তে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই খোসগল্প শোনার সময় হঠাৎ করে সমীরণ রায় এস পি অমিতাভ করের সঙ্গে বসন্ত চৌধুরীর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। (৩১) বসন্তবাবুর কাল সকালে রাজকুমারী কমলপ্রভার বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন সমীরণ। কথাবার্তা সেরে কমলপ্রভার বাড়ি থেকে সকাল ৯'টায় সমীরণের বাড়ি যাবেন এবং সেখান থেকে যাবেন আমার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে বক্তৃতা দিতে। (৩২) জয়নারায়ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কর্ণেল চৌমুহনীর শনিতলার চায়ের দোকানে রামেশ্বর, জগৎজ্যোতি বাবুর সঙ্গে চা খাওয়া। (৩৩) পরে দর্পণে ফিরে আমি ভূপেন দত্ত ভৌমিককে ফোন করে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার অনুষ্ঠানের বিষয়ে কথা বলি। রাজধানী হোটেলে দৈনিক সংবাদের অতিথি হয়ে বসন্ত চৌধুরী, অধ্যাপক দাশগুপ্ত, অধ্যাপক লাহিড়ী, অধ্যাপক ব্যানার্জি রয়েছেন — তাঁদের সম্পর্কে তাকে অভিহিত করি। ভূপেন বাবুকে প্রস্তাব দিই বসন্ত চৌধুরী প্রমুখকে তাঁর পত্রিকা অফিসে চায়ের নিমন্ত্রণ করার জন্যে। তিনি আমার প্রস্তাব মেনে নেন। (৩৪) তারপর রাত ১০টায় বাড়ি ফিরি। (৩৫) বসন্ত চৌধুরী বলেন যে, তাঁর ঠাকুমা ১৮৭২ সালে নাগপুর গিয়ে সেটেলড্ করেন, তিনি বাল্যকাল ও যৌবনের একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত নাগপুরেই কাটান প্রবাসী বাঙালি হিসেবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বসন্ত শাঠের সঙ্গে তিনি একই কলেজে পড়েছেন।

১৪ই নভেম্বর, ১৯৯৫, সোমবার। সকাল সাতটায় রওনা দিলাম রবি সেনের বাড়ি। তাঁকে মহেন্দ্র দেববর্মার ভাষা ও সংগীত চর্চার ওপর কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দেব বলে। তিনি সরকারী গোমতী পত্রিকায় মহেন্দ্রবাবুর ওপর একটা গবেষণামূলক নিবন্ধ তৈরী করছেন। বেরিয়ে পড়ে প্রথমে কর্ণেল চৌমুহনী গিয়ে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা অফিস থেকে হাঁটতে লাগলাম। দর্পণ পত্রিকায় চোখ বোলাতে বোলাতে বিদুরকর্তা চৌমুহনীর দিকে চলাম। ত্রিপুরা দর্পণে দেখলাম গতকালের রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তী উদ্বোধন অনুষ্ঠানের চমৎকার ধারাবিবরণী দিয়েছে। চতুর্থ পাতায় দেখলাম একটা ছবি—-কীর্তিশালার প্রদর্শনীর মুদ্রা দেখছেন মহারাজা কিরীটবিক্রম অভিনেতা ও মুদ্রা বিশেষজ্ঞ বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে, তাঁদের দু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মহারাজ বীরবিক্রমের শিক্ষক-পুত্র সুদর্শন মুখোপাধ্যায় ও প্রভুবাড়ির বেণুধর গোস্বামী। বিদুরকর্তা চৌমুহনীতে পৌঁছে দৈনিক সংবাদ অফিসে ঢুকে আমার কমপ্লিমেন্টারি কপিখানা নিয়ে পড়তে পড়তে মধ্যপাড়ায় কানু সেন বেণু সেন (রবি সেনের অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয়)-এর বাড়ির দিকে চলতে লাগলাম। দৈনিক সংবাদ খুলে তো অবাক, একেবারে প্রথম পাতায়

রাজেন্দ্র কীর্তিশালার প্রদর্শনীর ছবি । ছবিতে মহারাজ কিরীটবিক্রম অভিনেতা বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা দেখছেন । দু'জনের ছবি এমন নয়ন মনোহর হয়েছে যে ভাবাই যায় না । দু'জনের চেহারা ছবিটাতে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । ছবি দেখে আমি মনে মনে বললাম, কার চেহারা ভালো, কে বেশি সুদর্শন—ত্রিপুরার মহারাজ না অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী ? মহারাজার বয়স ৬৩ আর বসন্ত চৌধুরীর ৬৮ । মনে মনে আবৃত্তি করলাম, 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলংকার !' দৈনিক সংবাদে আরেকটি ছবি না দেখতে পেয়ে আমি অনেকটা স্বস্তি পেলাম । মহারাজ কিরীটবিক্রমের সঙ্গে অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী যখন দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা দেখছেন, তখন হঠাৎ করে মহারাণী বিভুকুমারী দেবী সেখানে উপস্থিত হন । বসন্ত চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে সকলকে অবাক করে দিয়ে মহারাণীর সুন্দর গালে চুমু খান । মহারাজও বোধহয় কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন । ক্যামেরাম্যানেরা এই অসম্ভব দুষ্প্রাপ্য ছবিটি মিস করেছে ।

ইতিমধ্যে পুরোনো আর. এম এস চৌমুহনীতে অটো স্ট্যাণ্ড পেরিয়ে মধ্যপাড়ায় ঢুকে পড়েছি। একটু সামনে গিয়েই রাজ আমলের জাদু প্রদর্শক প্রফুল্ল সেনের বাড়ি। প্রফুল্ল সেনের ছেলেই হচ্ছেন বিখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী রবি সেন। মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে যৌথভাবে ত্রিপুরার উপজাতিদের নিয়ে ডকুমেন্টারি করেছেন তিনি। সেই ছবিতে ত্রিপুরার উপজাতিদের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবনযাত্রা ফুটে উঠেছে অত্যন্ত বিমূর্তভাবে। রবিবাবু তাঁর ফটোগ্রাফির সুখ্যাতির জন্যে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নেও আমন্ত্রিত হয়ে গেছেন সেখানে। প্রফুল্ল সেনের বাড়ির লোহার গেট দিয়ে ঢুকে দোতলায় উঠলাম এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে। দুটো বিলিতি কুকুরের মধ্যে ছাইরঙের অদ্ভুত দর্শন কুকুরটি দেখলে আমার বুকের ভেতর কেমন যেন দুরু দুরু করতে থাকে। কলিং বেল টিপতেই আসবি না আসবি সেই কান ঝোলা চোখ বসা দশাশই নেকড়েটা। রবিদার স্ত্রী এক মুখ হেসে বললেন—'ঢুকে পড়ুন, কিচ্ছু করবে না।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বৌদির পিছু পিছু গিয়ে পা ফেললাম রবিদার চোখ জুড়িয়ে যাওয়া ড্রয়িং রুমে। ড্রয়িংরুমটা দেখে মনে মনে বললাম — একেই বলে শিল্পীর রুচি। রুমটায় চোখে পড়ার মতো তাঁর পিতৃদেব প্রফুল্ল সেনের একটা মূর্তি রেখেছেন শিল্পী রবি সেন। কাজি নজরুল ইসলামের একটা অতীব জীবন্ত ছবি দেয়ালে আঁটা। রবীন্দ্র রচনাবলী থরে থরে সাজানো রয়েছে সুদর্শন এক বইয়ের আলমারিতে। ড্রয়িংরুমের একবারে দক্ষিণ প্রান্তে খোলা জানালার ধারে রবি সেনের গবেষণামূলক লেখা পড়ার টেবিল। টেবিলের প্রথম সারিতে রয়েছে তাঁর নিজের তৈরী সিনেমার রিলগুলো। এর মধ্যে রয়েছে উপজাতি পরিবারের সকাল-সন্ধ্যা নিয়ে ডকুমেন্টারি। যে ডকুমেন্টারিতে সদ্য প্রয়াত শিল্পী মহেন্দ্র দেববর্মার গান ও সুর রয়েছে বিদ্ধৃত হয়ে। আর রয়েছে সি. পি আই (এম)-এর দশম পার্টি কংগ্রেসের আড়াই ঘন্টার ছবি (ডকুমেন্টারি), যে ছবি দেখে নাকি ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত খুবই খুশি হয়েছিলেন। আর পার্টি কংগ্রেসের এই ছবিটা নৃপেন চক্রবর্তীর পরামর্শেই তৈরী হয়েছিলো বলে জেনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

এই দিনের মূল ঘটনবলীর main point.

১) রবি সেনকে মহেন্দ্রবাবুর গানের অনুবাদে সাহায্য করা

২) বাড়ি ফেরা

৩) রাজ অন্দরে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার প্রদর্শনীতে রাজা-রাণীর উপস্থিতিতে ও তাদের তত্ত্বাবধানে সাহায্য করা (৪) First fligth-এ আনন্দ গোপাল শঙ্খনিধি এলেন। তাঁকে Bride way হোটেলে রাখা। তিনি বললেন 2nd flight-এ আরো ১০জন ডেলিগেট আসছেন। (৫) এই খবর শুনে প্রথমে

সমীরণ রায় ও পরে রাজ অন্দরে প্রদর্শনীতে গিয়ে জহর আচার্য ও গৌহাটি থেকে আগত প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বসুর সঙ্গে পরামর্শ করা। (৬) শ্রীযুক্ত বসুকে নিয়ে ডেলিগেটদের রাখার ব্যাপারে প্রথমে রয়াল গেস্ট হাউসে যাওয়া ও হোটেল-মালিক চুনীবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে হোটেলের ডরমিটরিতে ৭টি সিটের ব্যবস্থা করা এবং পরে বোস সাহেবকে নিয়ে হোটেলের গাড়িতে ত্রিপুরা দর্পণে আসা এবং রয়াল গেস্ট হাউসের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা। (৭) বোস সাহেব চলে গেলে আমার বিজয়কুমার চৌমুহনীর স্টেট ব্যাংকে যাওয়া এবং সেখান থেকে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার উৎসবের ব্যাজ সংগ্রহ করা। (৮) ব্যাজ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় রাজঅন্দরে যাওয়া এবং জহরবাবু ও তাঁর ছেলে সৈকতকে ব্যাজ দেওয়া (৯) রাজঅন্দর থেকে ফিরে ত্রিপুরা দর্পণে বসে অপেক্ষা করা। (১০) ইতিমধ্যে জহর আচার্য এলেন ত্রিপুরা দর্পণে এবং তাঁর সঙ্গে 2nd filght-এর অতিথিদের রাখার ব্যাপারে আলোচনা করে খয়েরপুরে এ্যাডভোকেট শঙ্কর দাশের বাবার শ্রাদ্ধে যোগদান করতে চলে যাওয়া। (১১) জহরবাবু বলেন যে রয়াল গেস্ট হাউসে যে টাকা লাগবে তার থেকে Bride wayতে 2nd flight-এর গেস্টদের রাখা এবং সেই মর্মে Bride way'র ৩টি রুম বুক করা। ইতিমধ্যে 2nd flight-এর গেস্টরা চলে এলেন। জহরবাবু Bride wayতে নিয়ে তাঁদেরকে Bride wayতে রাখলেন (১২) মহারাজ কিরীট বিক্রম আজ দিয়েছেন ডিনার। জহরবাবুর সঙ্গে বসে কলকাতা ও গৌহাটি থেকে আগত ২০জন গেস্টদের লিস্ট করা এবং তার পরে রাজঅন্দরে গিয়ে ডঃ দাসশাস্ত্রীকে নিয়ে মহারাজ কিরীট বিক্রমকে সেই লিস্ট দেয়। এবং মহারাজের কথামতো গেস্টদের ডেজিগনেশান লিখে দেওয়া। (১৩) আবার ত্রিপুরা দর্পণে ফিরে আসা এবং সমীরণ রায় ও জহর আচার্যীর সঙ্গে গেস্টদের sight seeing নিয়ে আলোচনা করা। (১৪) ইতিমধ্যে জহরবাবুর মহারাণীকে ত্রিপুরা দর্পণ থেকে ফোন করে গেস্টদের রাত্রের রয়াল ডিনার দেয়া সম্পর্কে কথা বলা। ফোনে রাণীর কথা অনুযায়ী - জহরবাবুর, প্রাক্তন মন্ত্রী বীরজিৎ সিনহার সঙ্গে কথা বলা, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ও নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাড়িতে তাঁর গিয়ে নিমন্ত্রণ করা (১৫) এরপর জহরবাবুর দেয়া ৬০০ টাকা নিয়ে শ্বেতমহলে ছোটা এবং সেখানে গিয়ে পরের দিন sight seeing-এর জন্যে ১২টা সিট বুক করা। সেখানে আমার দিদি শাশুড়ি - মঞ্জু দেববর্মার কাছ থেকে চা খাওয়া। (১৬) তারপর রিক্সা করে ৫.৪৫-এ রাজঅন্দরে এসে প্রদর্শনী থেকে জয়নারায়ণ ভট্টাচার্যকে নিয়ে তাঁর স্কুটার চড়ে ত্রিপুরা দর্পণে আসা এবং সমীরণ রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজধানী হোটেলে যাওয়া গেস্টদের রয়াল ডিনার-এ নিয়ে যাওয়া ।

বেরিয়ে আমরা প্রথমে গেলাম Bride way'র গেস্ট হাউসে। সেখানে গেস্টদের বললাম, ৭.৩০-এ এসে তাঁদেরকে রাজবাড়ি নিয়ে যাবো ডিনার খাওয়াতে। এই কথা বলে আমরা রওনা দিলাম রাজধানী হোটেলের দিকে। পথে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এলাম আমাদের বন্ধুদের খুঁজতে। সেখানে চলছিলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় নাটক প্রতিযোগিতা। সিনেমা পরিচালক দীপক ভট্টাচার্য আমাকে ডেকে চা খাওয়ালেন। তাঁকে বললাম, 'বসন্ত চৌধুরী আপনার ছবির প্রশংসা করেছেন।' দীপকবাবুকে অনুরোধ করলাম ১৫ তারিখে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে পিলাক সংস্কৃতির ওপর পেপার পড়তে। পাশেই বসে আড্ডা জমাচ্ছিলেন শিল্পী হীরালাল সেনগুপ্ত। তাঁকে রাজঅন্দরে গিয়ে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার পূরাতাত্ত্বিক প্রদর্শনী দেখতে বলায় তিনি বললেন - 'আপনারা রাজ-রাজড়া নিয়ে আছেন, থাকুন, আমরা রাজা-রাজড়ার ইতিহাস বুঝি না।' হীরালালবাবুর সঙ্গে কথা সেরে জয়নারায়ণবাবুর স্কুটার চেপে গেলাম রাজধানী হোটেলে। সেখানে গিয়ে গেস্টদের রেডি হতে বললাম Royal dinner-এ যাওয়া ঠিক হলো, গাড়ি না থাকায় আমরা রিক্সা করে গেস্টদের রাজবাড়ি নিয়ে যাবো। কিন্তু অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী বললেন -'রাজবাড়ি আমি রিক্সা চড়ে যাবো না - যাবো গাড়ি করে।' পাশে বসা অধ্যাপক কল্যাণ দাশগুপ্ত তাঁর কথা শুনে

বললেন, 'ঠিকই তো রাজবাড়ি বলে কথা।' নিচে এসে ফোনে মহারাজার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম বসন্তবাবুকে রাজ গাড়িতে করে নিয়ে যেতে কিন্তু ফোন করা গেলো না। আমি বসন্তবাবুকে বলে গেলাম, 'অধ্যাপক দাশগুপ্ত আর আপনি অপেক্ষা করুন। আমি রাজবাড়ি গিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।' পাঁচখানা রিক্সা করে ৯জন গেস্টকে নিয়ে আমি রওনা দিলাম রাজবাড়িতে। রওনা দেয়ার আগে অধ্যাপক লাহিড়ীকে বলেছিলাম আপনি বসুন গাড়িতে বসন্তবাবুর সঙ্গে যাবেন। উনি রাজি হলেন না, "বললেন আমি পিছিয়ে থাকতে পারবো না - আমি আপনাদের সঙ্গে রিক্সাতেই রাজবাড়িতে যাবো।" উনিও রিক্সায় চড়লেন। রাজবাড়ির রাজ অন্দরের গেটে অভ্যাগতরা অতিথিদের স্বাগত জানালেন। ওদিকে জয়নারায়ণবাবু Bride way হোটেল থেকে অন্যান্য গেস্টদের নিয়ে এসেছেন। রিক্সা থেকেই নেমে বসন্তবাবুর কথা বলতেই দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ তাঁদের গাড়ি নিয়ে যেতে বললেন। দূরদর্শনের গাড়ি নিয়ে গেলাম বসন্তবাবুকে আনতে। দূরদর্শন থেকে এসেছিলো বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে T. V. Programme ঠিক করতে। দূরদর্শনের গাড়ি নিয়ে গেলাম রাজধানী হোটেলে। সেখানে গিয়ে দেখি রাজ পোশাাকে অপেক্ষা করছেন বসন্তবাবু। আমি তাঁকে হেসে বললাম - 'রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার, চলুন রাজবাড়ির গাড়ি এসেছে।' বসন্ত চৌধুরী ও অধ্যাপক কল্যাণ কুমার দাশগুপ্তকে নিয়ে চলে এলাম রাজবাড়ির অন্দর মহলে। সেখানে রাজ অন্দরের মাঝখানের open space-এ dinner খাওয়ানোর টেবিল সাজানো আছে। অতিথিরা রাজবাড়ির বিশেষ চেয়ারে রাজঅন্দরের বারান্দায় অপেক্ষা করছেন। আমাদের অতিথিরা ছাড়া এই রাজভোজ খেতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন ক্ষীরগোপাল কর্তা, নগেন্দ্র জমাতিয়া, ভূপেন দত্ত ভৌমিক, বীরজিৎ সিনহা প্রমুখ। জহর আচার্য সকলকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। দূরে দাঁড়িয়ে জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য ও দুলাল চক্রবর্তী মহারাণীর P.A. তাপস দের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বসন্তবাবুর সঙ্গে T.V'র বিশ্বজিৎ দাশ কথা বলতে লাগলেন। তারপর বসন্ত চৌধুরীকে আমি ভূপেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ভূপেনবাবু আমাকে বললেন, - 'কুমুদবাবু, আমি আপনাদের অতিথিদের আগামীকাল চায়ের বদলে ডিনার খাওয়াবো, আপনি সেইভাবে সকলকে নিমন্ত্রণ করবেন।' নগেন্দ্র জমাতিয়ার সঙ্গেও বসন্তবাবুকে আলাপ করিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে রাজা ও রাণী নামলেন দোতলা থেকে রাজকীয় পোষাকে। তারা আসতেই সকলে উঠে রাজা-রাণীকে অভিবাদন জানালেন। রাজা তাঁর কাকা ক্ষীরগোপাল কর্তার সঙ্গে হিন্দী ও ইংরাজীতে কথা বললেন। মহারাণীর সঙ্গেই দেখলাম অভ্যাগতরা বেশী ঘনিষ্ঠ হতে চান। রাণী চোস্ত্ ইংরোজীতে অভ্যাগতদের তাঁর শ্বশুরকুলের প্রশংসা করতে লাগলেন। বিশেষ করে মহারাণী কাঞ্চনপ্রভার কথা এলো। জমে উঠতে লাগলো রাজভোজ। ক্ষীরগোপাল কর্তাকে তুমি বলে সম্বোধন করলেন বসন্ত চৌধুরী। মহারাজ প্রাক্তন মন্ত্রীদের সঙ্গে গাম্ভীর্য বজায় রেখে কথা বলতে লাগলেন। বসন্ত চৌধুরী রাজার কাছে এলেন এবং দু'জনে রাজকীয় মর্যাদায় কথা বলতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য ও দুলাল চক্রবর্তী চলে গেছেন। জহর আচার্য এবং আমি। রয়ে গেছে রাজভোজ শুরু হবার মুখে রাজভৃত্যরা সুন্দর কাঁচের গেলাসে লিমকা পরিবেশন করতে লাগলেন। মহারাজকে বলেছিলাম - 'আমরা রাজেন্দ্র কীর্তিশালার কেউই থাকবো না রাজভোজে - শুধু আমরা দু'জনে গেস্টদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে আসবো।' তাই-ই করলাম আমরা। জহরবাবু আর আমি সহদেব কর্তার বাড়ির পাশ দিয়ে ত্রিপুরা দর্পণে চলে এলাম। পথে আমার মাথাটা কেমন যেন করছিল, একটু নেশা নেশা ভাব। আমার মনে হয়, লিমকার মধ্যে বোধ হয় শরাবও মেশানো ছিলো। দর্পণে ঢুকে সমীরণ রায়কে রাজ ভোজের রিপোর্ট করে বাড়ি ফিরলাম রাত সাড়ে ন'টায়। ঘরে ঢুকতেই স্ত্রী বললেন - 'নাইদি নূছালা লুমখা' (দ্যাখো, তোমার ছেলের জ্বর হয়েছে)। স্ত্রীর কথা শুনে ছেলে সুরঞ্জনের

কপালে হাত দিয়ে দেখি বেশ জ্বর। দুপুরের দিকে সে রাজ অন্দরের প্রদর্শনীতে ডিউটি দিয়েছিলো। ভেবেছিলাম প্রদর্শনীতে যে ভিড় হচ্ছে, সুরঞ্জন সেখানে একদিন একটু ডিউটি দিতে পারবে। তার অসুখ দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। আমার মোঙ্গলিনী গৃহিণী ফুলকুমারী অফিস থেকে ফেরার পথে তুলসীবতী বাজার থেকে পুঁঠি মাছ কিনে এনে রান্না করেছেন। তাই দিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়লাম অসাড় শরীর নিয়ে।

১৫ই নভেম্বর, ১৯৯৫, মঙ্গলবার । খুব ভোরে উঠে ছেলের কপালে হাত দিয়ে তার জ্বর কতটা হয়েছে একটু দেখে লিখতে বসলাম। লেখা একটু এগিয়েছে, এমন সময় সম্পর্কে আমার এক বড়ো শালী পারুল দেববর্মা এলেন চাকরির দরবার করতে। মাস কয়েক হলো তাঁর স্বামী সূর্য দেববর্মা মারা গেছেন। আমার এই বড়ো ভায়রা কেন্দ্রীয় সরকারের Statistics বিভাগে চাকরি করতেন। এমন নিখুঁতভাবে জটিল সব সিডুল (কোশ্চেনায়ার) পূরণ করতে পারতেন সে ভাবাই যায় না। এমন সুপার ইনটেলিজেন্ট লোক আমার শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় স্বজনের মধ্যে খুবই কম দেখেছি। চেহারাও ছিলো খুব সুন্দর। ছাত্রাবস্থায় নামকরা ফুটবলার ছিলেন। ইনটারস্টেট ফুটবল খেলেতে ভারতের বহু রাজ্যে ত্রিপুরাকে প্রতিনিধিত্ব দিয়েছেন তিনি। মাঝেমধ্যে ত্রিপুরা থেকে চলে যেতেন কলকাতারর মাঠে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখতে। বিয়ের পরে এই ভায়রার সঙ্গে খুব ভাব জমে ওঠে আমার। শ্বশুর বাড়ির পরিবেশে মাঝেমধ্যেই দেখা হতো তাঁর সঙ্গে। আমার হেরমার বাসভবনে এলেই সোমরস দিয়ে আপ্যায়ন করতে হতো তাঁকে। কিন্তু এতটুকু অসংলগ্ন হতেন না তিনি। বলতেন, ট্রাইবাল বাড়ির জামাইদের সোমরস পান করতেই হয়, না হলে মানায় না। জামাইরা বেড়াতে যাবে শুনলে শাশুড়িরা বিন্নিচালের সোমরস তৈরী করে রাখেন আগের থেকে। অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরাও তাই। জামাই গেলে আর কথা নেই। প্রতিদিন সুরাপানের আসর। যতদিন থাকো, পান করো ফূর্তি করো এমন একটা ভাব। আমার এই ভায়রাভাই কুমুই সূর্য (সূর্য জামাইবাবু) বিয়ের পর মাত্রারিক্ত সুরাসক্ত হয়ে পড়েন। পরে লিভার সিরোসিস হয়। কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে যান। কিন্তু বাড়ি ফিরেই মারা যান তাঁর শ্বশুরবাড়ি ধারিয়াথল গ্রামে। •

বড়োশালীর সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় নিচের থেকে প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার গলা পেলাম—'কুমুদবাবু আছেন নাকি?' তাকিয়ে দেখি একজন বডিগার্ড নিয়ে বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আমি ওপরে উঠতে বললাম তাঁকে। ওপরে উঠতেই বললাম, 'বাইরে বসাই আপনাকে, ছেলেটার জ্বর, কাল আপনাদের রাজভোজ থেকে কেটে পড়ে বাড়ি ফিরেই দেখি মুক্তি (আমার ছেলে সুরঞ্জনের ডাক নাম) জ্বরে কাতরাচ্ছে। - 'আরে বলবেন না, দারুণ ভোজ দিয়েছেন মহারাজ।' নগেন্দ্রবাবু বললেন।

"জানেন, কাল একটা নতুন জিনিষ খেলাম রাজবাড়িতে, গাজর দিয়ে পায়েস। কেমন করে যে রান্না করিয়েছেন মহারাণী তা বুঝতে পারলাম না। আর শুনুন, রাজভোজ খেতে খেতে ক্ষীরগোপাল কর্তা জহর আচার্য আর আপনাকে খুঁজছিলেন।" তখন মহারাণী বললেন, আপনারা চলে গেছেন। -- "ঠিকই, আপনারা যখন রাজ অন্দরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পানাহার শুরু করেছেন, তখনই জহরবাবু ও আমি চুপিসাড়ে কেটে পড়ি" — বলেই হেসে ফেললাম আমি। একটু বাদেই নগেন্দ্রবাবু উঠলেন। আমিও চলে গেলাম অনুরূপা মুখার্জীর বাড়ির পাশে ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার চেম্বারে পুত্রের জন্যে ওষুধ আনতে।

ঠিক সন্ধ্যে সাতটার সময় গেলাম দৈনিক সংবাদে। আজ রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তী উৎসবে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের নৈশভোজে আপ্যায়ন করেছেন দৈনিক সংবাদের সম্পাদক ভূপেন দত্ত

ভৌমিক। আমাকে দেখেই বললেন, "আর যাবেন না কুমুদবাবু, মিহির গুপ্ত আর আপনি মিলে অতিথিদের অভ্যর্থনার ব্যাপারটা দেখবেন।"

— "রাজা-রাণী ও আসবেন বলে কথা দিয়েছেন, ভূপেনবাবু।" —হ্যাঁ, আমি তো নিজে গিয়ে বলে এসেছিলাম। আমার পরম সৌভাগ্য ত্রিপুরার রাজা-রাণী আসবেন আমার বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করতে।"

ভূপেনবাবুর সঙ্গে কথা বলে আমি গেলাম মিহির গুপ্তর দৈনিক সংবাদের অফিস ঘরে। ঠিক হলো, আটটার সময় ব্রাইডওয়ে, রয়াল গেস্ট হাউস ও রাজধানী আগরতলা হোটেলে দৈনিক সংবাদের গাড়ি গিয়ে অতিথিদের নিয়ে আসবে এক এক করে। সেই মতো সাড়ে আটটা থেকে অতিথিরা আসতে শুরু করলেন। রাজধানী হোটেল থেকে জহর আচার্য অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য কল্যাণকুমার দাশগুপ্তকে নিয়ে এলেন। ভূপেনবাবু অভ্যাগতদের নিয়ে তিন তলার একটা বিশেষ ঘরে বসালেন। দৈনিক সংবাদের অন্দর মহল আজ সাজানো হয়েছিলো বেশ নয়ন মনোহর করে। রজনীগন্ধা-বেল-জুঁয়ের গন্ধে আমোদিত করছিলো চারদিক। শিবকে তুষ্ট করার মতো সব কিছুরই ব্যবস্থা করেছিলেন দৈনিক সংবাদের দরাজ সম্পাদক।

তিন তলার হল ঘরে লম্বা লম্বা টেবিলের ওপর ধবধবে সাদা চাদর বিছিয়ে তার ওপর বুফে সিস্টেমে খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এর দায়িত্বে ছিলেন ডাঃ এম এল সাহা, ভূপেনবাবুর একান্ত আপনজন। তিনি ফিনফিনে ধুতির ওপর গিলেকরা সাদা পাঞ্জাবি পরে হাতে কাপড়ের কোচা নিয়ে তত্ত্বাবধান করছিলেন। তাঁকে দেখে কলকাতার বনেদি বাড়ির বাবুলোকদের কথা মনে পড়ে গেলো আমার।

আমি নিচে এসে দৈনিক সংবাদের গেটের সামনে দাঁড়ালাম। ন'টা বাজতে যায়, এখনো রাজা-রাণী এলেন না। আমার উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে রাজা-রাণীর গাড়ি এসে দাঁড়ালো দৈনিক সংবাদের গেটের সামনে। খবর পেয়ে ভূপেনবাবু, ভাইপো প্রদীপ তরতর করে নিচে নেমে এলেন। আমি গাড়ির দরজার সামনে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে রাজা-রাণীকে গাড়ি থেকে নামালাম। সঙ্গে সঙ্গে এসে অভ্যার্থনা জানালেন দৈনিক সংবাদের সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিক। তাঁদের নিয়ে তিন তলার বসবার ঘরে নিয়ে যেতেই সমবেত অতিথিবৃন্দ উঠে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরার রাজা-রাণীর প্রতি সম্মান জানালেন। রাজা-রাণীর উপস্থিতিতে দৈনিক সংবাদের তিন তলার হল ঘর জমে উঠলো এবার। অভিনেতা বসন্ত চৌধুরীও আজ সেজে ছিলেন দারুণভাবে। ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর একটা ফোক ডিজাইনের নাগা জ্যাকেট পরেছিলেন লালরঙের। ভূপেনবাবুও বাদামী রঙের একটা স্যুট পরেছিলেন সকলের নজর কাড়ার মতো। ভূপেনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী মীরা দত্ত ভৌমিকও ছিলেন বেশ সেজেগুজে। রাজা-রাণী ও অন্যান্য অভ্যাগতদের ভিড়ের মধ্যে আমার চোখ খুঁজছিলো দু'জন গুণী ব্যক্তিকে। তাঁরা হলেন ঃ ডঃ অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। শুনলাম কল্যাণবাবু দোতলার একটা ঘরে বসে পুরাতত্ত্বের ওপর একটা নিবন্ধ লিখছেন যা কিনা কাল দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হবে। কিন্তু রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তী উৎসবের মধ্যমণি ডঃ লাহিড়ী আসছেন না কেন? খবর নিয়ে যা জানলাম তাতে আমার মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেলো। হার্টের গন্ডগোল দেখা দেয়ায় তাঁকে জি. বি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রাত ঠিক সাড়ে ন'টায় ভূপেনবাবু রাজা-রাণী ও অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে খাবার হল ঘরে ঢুকলেন। খাবার আইটেম দেখে আমার চক্ষু একেবারে চড়ক গাছ। দই-মিষ্টি-ছানার পায়েস ছাড়াই রয়েছে বারো রকমের আইটেম। তার মধ্যে রয়েছে তিন রকমের মাছ ও দু'রকমের মাংস। ইলিশ-চিতল-পাবদা ত্রয়ী সঙ্গম দেখে তারিফ করলাম ভূপেনবাবুর রুচিবোধ ও দরাজ হৃদয়ের। পাঁঠা ও মুরগীর মাংসও অঢেল। তার সঙ্গে রয়েছে নানা ধরনের স্যালাড। গাবরদি থেকে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে আনা

হয়েছে ত্রিপুরার বিখ্যাত ছানার পায়েস। মনে মনে বললাম, দৈনিক সংবাদের সম্পাদক গতকালের রয়াল ডিনারের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন নাকি? দৈনিক সংবাদের সম্পাদকের দরাজ মনের এই নৈশ ভোজ রাজা ও রাণীর নজর কাড়লো। একসময় নজর পড়লো ক্ষীরোগোপাল কর্তার দিকে। বসন্ত চৌধুরী ও তিনি খেতে খেতে গল্প করছেন। ভয়ে ভয়ে আমি খুব একটা খেলাম না। মাছের মধ্যে খেলাম শুধুমাত্র পাবদা মাছ। আগামীকাল সকাল দশটায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার সেমিনার শুরু হবে। কিছুতেই শরীর খারাপ করা যাবে না। কালকের দিনটা পার করে দিতে পারলে ছুটি। গত তিন-চার মাস ধরে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তী কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে খাটতে খাটতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কালকের দিনটে পার করে দিতে পারলে বড়ো একটা দায়িত্ব থেকে খালাস। এরপর আগরতলা থেকে আমার ট্রাইবেল ভিলেজে গিয়ে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে। শরীরটার ওপর বড্ড ধকল গেছে এ ক'মাসে।

১৮ই নভেম্বর, ১৯৯৫, শনিবার। আজ খুব ভোরে উঠে সুরঞ্জনের গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম। জ্বর রেমিশন হয়ে যাবার পরেও জ্বর রয়েছে অল্প অল্প। ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মা ন'টাকা দামের CIFRON ট্যাবলেট দিয়েছেন আগের ওষুধ পালটিয়ে। সেই কবে ১৩ই নভেম্বর থেকে ভুগছে ছেলেটা। আগরতলায় আবার জোর ম্যালেরিয়া হতে শুরু করেছে। মনে হলো নতুন হাবেলীর পুরনো যুগ আবার ফিরে আসছে। এডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার কাছ থেকে শুনেছি নতুন আগরতলায় এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে খুব ম্যালেরিয়া হোত এবং শিশু মৃত্যুর হারও ছিলো খুব বেশী। বাঙালি বাবুরা তাই বড়ো বড়ো চাকরি পেয়েও মহারাজার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতেন।

সকাল সাড়ে সাতটা নগাদ চা খেয়ে আস্তাবল বাজারে বেরোলাম। মানিক চক্রবর্তীর দোকান ছাড়িয়ে সুপুরি বাগানের ডানদিকে মোড় নোব, এমন সময় দেখি দেওয়ান বাড়ির জ্যোতিষ দেববর্মা সুপুরী বাগানে গাঙ্গুলী বাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাজারের থলে হাতে এগিয়ে আসছেন। আমাকে দেখে শহুরে ককবরক ভাষায় বললেন - 'বাথাকগৃয়াদি, দা কতর; আঙ-ব নুঙ বাই বাজার' থাঙনাই- 'দাঁড়ান একটু, বড়দা আমিও আপনার সঙ্গে বাজারে যাবো।' আমি দাঁড়াতেই আমার পাশে এসে চলতে শুরু করে বললেন - 'খৃনাকা, চম্পকনগরনি গতনা, ওমা ওমা আঙ কিরিজাগ' দা কতর, চবান' আঙ জবই কিরিজাগ'। আছিনি চবা মুইতু মাঙখে মকল' মুকতৃবৃই ফাইজাগয়া আঙ- ' শুনেছেন, চম্পকনগরের ঘটনা; মাগো মা, আমার খুব ভয় করে বড়দা, দাঙ্গাকে খুব ডরাই আমি। আশির দাঙ্গা মনে পড়লে চোখে ঘুম আসে না আমার।'

আগরতলা থেকে কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে বড়মোড়া পাহাড়ের পাদদেশে চম্পকনগর বাজারের কাছে চন্দ্রসাধু রূপিনী ট্রাইবাল পাড়ার সঙ্গে বাঙালি পাড়ার ছোটখাটো সংঘর্ষ চলছে আজ ক'দিন ধরে। দিন কয়েক আগে পাশের শচীন্দ্রনগর কলোনিতে দিনের বেলায় শরৎ দেববর্মা নামে এক উপজাতি যুবককে দশ-বারোজন বাঙালি যুবক বাস থেকে টেনে নেমে নৃশংসভাবে খুন করে। ছেলেটি ত্রিপুরা সরকারের স্পেশাল ড্রাইভে চাকরির অফার পেয়েছিল। মান্দাই তহশিল কাছারিতে যাচ্ছিল সে তার অফারের কাগজ নিয়ে। চাকরির অফার জমা দেয়া তার আর হল না। উগ্রবাদী বাঙালি হাঙরের মুখে তাকে মরতে হলো। বাঙালি উগ্রবদী হাঙরদের কথা অনুযায়ী শরৎ দেববর্মা নাকি একজন উপজাতি উগ্রপন্থী। ক'দিন আগে সে নাকি জিরানীয়ার ভবতোষ দাসকে কিডন্যাপিঙ (অপহরণ)-এর সঙ্গে জড়িত ছিল। গতকালের ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় এ সম্পর্কে হেডিং ছিল- 'জিরানীয়ার শচীন্দ্রনগর কলোনিতে গাড়ি থেকে নামিয়ে যুবক খুন, আহত ১ ঃ উত্তেজনা, আজ বন্ধ।' আজ সকালে উঠে 'দৈনিক সংবাদ' খুলে দেখি চম্পকনগর অগ্নিগর্ভ, টাইবাল-বাঙালির মধ্যে দাঙ্গা লাগোলাগো ভাব।

দৈনিক সংবাদ বড়ো বড়ো হরফে হেডিং দিয়েছে — 'উত্তেজনা সৃষ্টির উৎকট চেষ্টায় চম্পকনগরের কাছে এক বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ঃ এলাকা সংঘর্ষমুখী। .... জিরানীয়া থানা এলাকার মান্দাই, শচীন্দ্রনগর কলোনী, নোয়াবদী, চম্পকনগর, কলাবাগান সহ বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দরা গতকাল সারা রাত ঘুমাতে পারেনি। সারা রাত চারদিক থেকে একটু বাদে বাদে ভেসে এসেছে হৈ হৈ রই রই রব। কখনও ধর ধর, মার মার কলরব। প্রতিটি বাড়ির বৃদ্ধ থেকে পাঁচ/সাত বছরের বালক সারা রাত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটিয়েছেন। পাড়ার যুবকরা দল বেঁধে পাহারা দিয়েছেন।'

আসলে বাঙালি যুবক ভবতোষ দাসের অপহরণ ও উপজাতি যুবক শরৎ দেববর্মার খুনকে কেন্দ্র করে জিরানীয়া থানার প্রায় সমগ্র বাঙালি ও উপজাতি এলাকা সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাসে ভুগছে। বাঙালি এলাকা পাহারা দিচ্ছে বাঙালি যুবকরা রামদা হাতে, আর উপজাতি জনপদ পাহারা দিচ্ছে উতপজাতি যুবকরা নিজেদের হাতে তৈরি বন্দুক নিয়ে । মাঝখানে পুলিশ । পুলিশের অবস্থা অনেকটা কাটা সৈনিকের মতো। আধুনিক মারণাস্ত্র তার হাতে নেই। এ'দিকে মাস খানেক আগে মান্দাইয়ের কাছাকাছি এক গ্রামে ট্রাইবাল উগ্রপন্থী ধরতে গিয়ে পুলিশ এ.কে. ৪৭ রাইফেলের সন্ধান পেয়েছে। তারপর থেকে কি পুলিশ কি আসাম রাইফেলস সকলের আক্কেল গুড়ুম অবস্থা।

গতকাল জিরানীয়া এলাকায় দুটো উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা সমগ্র এলাকাকে টান টান টেনশানের মধ্যে নিয়ে গেছে । এক, গতকাল 'দুপুর দুটো নাগাদ কঠোর পুলিশী প্রহরার মধ্য দিয়ে শরৎ দেববর্মার মৃতদেহটি কলা বাগানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সন্ধ্যে নাগাদ মৃতদেহটি দাহ করা হয়। প্রচুর সংখ্যক লোক ওই সময় ওখানে উপস্থিত ছিলেন।' খবরে জানা গেছে, নিহত শরৎ দেববর্মা ছিলো ত্রিপুরা উপজাতি যুবসমিতির পয়লা সারির নেতা তথা ত্রিপুরা স্বশাসিত জেনা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য চন্দ্রোদয় রূপিনীর আত্মীয়। কজেই, উপজাতি যুবসমিতির নাম করা নেতার আত্মীয় বলে এবং একজন বেকার যুবক চাকরির অফার জমা দেয়ার পথে খুন হয়েছে জেনে শরৎ দেববর্মার হত্যার ঘটনা বিশেষ এক মাত্রা পায়। এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে চম্পকনগর ও মান্দাই এলাকায় বারো ঘন্টার হরতাল পালন করে উপজাতি যুবসমিতি, কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা। নিহত তরতাজা যুবক শরৎ দেববর্মার কলাবাগান আশির মহা দাঙায় প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। বহু শরৎ দেববর্মা শহীদ হন ওই কলা বাগানে। আশির মহাদাঙ্গার ক্ষত এখনো ভুলতে পারেন নি কলাবাগানের উপজাতীয় বর্গের মানুষ। দীর্ঘ পনেরো বছর পর আবার ঘনায়মান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বলি হলো এই গ্রামের আঠারো বছরের ফুল্ল কুসুমিত এক উপজাতীয় যুবক, যার হাতে ছিলো চাকরির অফারের কাগজপত্র। তার হয়তো প্রিয় বান্ধবী ছিলো, চাকরি পাবার পর সিঁথের সিঁদুর দেবে তাকে, একথা দিয়েছিলো সে । আর হতভাগ্য চোদ্দ বছরের তরুণ ভবতোষ দাস। সে হয়তো মাথায় মুড়ির টিন নিয়ে ট্রাইবাল এলাকায় গিয়েছিলো দুপয়সা আয় করতে। ট্রাইবাল উগ্রপন্থীরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সে হয়তো আর কখোনো ফিরবে না তার মায়ের কাছে। শচীন্দ্রনগর কলোনিতে মা ভাত বেড়ে রেখেছেন তার, হয়তো মায়ের ভাড়া ভাত খেতে আর আসবে না কখনো সে।

দ্বিতীয় যে ঘটনা ঘটেছে তা হলো, চম্পকনগকর বাজারের বেশ কাছের উপজাতীয় গ্রাম চন্দ্রসাধ পাড়ায় শ্রীমতী নন্দকুমারী রূপিনীর ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে উগ্রপন্থীরা। দু'জন যুবক পিস্তল হাতে এসে প্রথমে গুলি করে নন্দকুমারী ও তার মেয়ে অঞ্জলি রূপিনীকে তাক করে। নন্দকুমারী ও অঞ্জলি কোনোমতে অত্মরক্ষা করে পাশের বড়মোড়া পাহাড়ের জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে রাত কাটায়। রাত দশটা নাগাদ ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে চম্পক নগরের পুলিশ ফাঁড়ি থেকে আগরতলার পুলিশ হেডকোয়ার্টার ও দমকলে খবর আসে চন্দ্রসাধু পাড়ায় ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। সঙ্গে

সঙ্গে পুলিশ ও দমকলের গাড়ি ছুটে যায় সেখানে। পুলিশ গিয়ে নন্দকুমারী বা তার মেয়ে অঞ্জলির কোনো খবরই পায়নি। সারা রাত উত্তেজনার মধ্যে কাটিয়েছে বড় মোড়া পাহাড়ের পাদদেশের ট্রাইবাল ও বাঙালিরা।

তৃতীয় আরেকটি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে গতকাল। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মার হাতে গড়া চম্পকনগর লোকশিক্ষালয় থেকে ভয়ে পালিয়েছে উপজাতি ছাত্ররা তাদের আবাসিক ঘর থেকে। বেশীর ভাগ ছাত্র চলে গেছে ভৃগুদাস রূপিনী পাড়ার দিকে। ত্রিপুরার ট্রাইবালদের মধ্যে রূপিনীরা হলো বৈষ্ণব। উপজাতিদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মানুষ আছে জেনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি আমি। তারপর যখন রিসার্চের কাছে ভৃগুদাস বৈষ্ণব পাড়ায় যাই তখন দেখি সত্যি সত্যি বৈষ্ণব পাড়া। পুরুষ ও মেয়েদের গলায় কন্ঠি দেখতে পাই আমি। ফোঁটা তিলক কাটা পুরুষ ও মহিলা চোখে পড়ে আমার। গ্রামটায় চোখে পড়ে অনেক বৈষ্ণব মন্দির। শূকর পালন ও মদ খাওয়া বন্ধ শুনে অবিশ্বাসে কানে আঙ্গুল দিয়েছিলাম। উপজাতীয় গ্রামে শূকর পালন মদ্যপান বন্ধ! কিন্তু পরে বিশ্বাস করতে হয় আমাকে। এখন অবিশ্যি রূপিনী পাড়ার বৈষ্ণবীয় অনুশাসন কিছুটা শিথিল হয়েছে নব্য শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কাছে। আমি আরো তাজ্জব বনে যাই রূপিনী পাড়াগুলোতে আমার মতো একগাদা বাঙালি জামাই দেখে। আমি নিজেকে ট্রাইবাল বাড়ির বাঙালি জামাই বলে যে গর্ববোধ করতাম এতোদিন, ত্রিপুরার বড়মোড়ার আরণ্যক পরিবেশে রূপিনী উপজাতিদের পাড়ায় এসে সেই গর্ববোধে বেশ ধাক্কা খেলো আমার। বাঙালি জামাইরা বেশীরভাগ চাকবিজীবী, কিছু কিছু ব্যবসাদারও আছে। একদিন বাড়ি ফিরে আমার স্ত্রীকে রূপিনী পাড়ায় বাঙালি জামাইদের কথা বলতে বিশ্বাসই করেননি তিনি। তারপর একদিন নিয়ে গেলাম তাঁকে ভৃগুদাস পাড়ায় চম্পকনগর ইস্কুলের কাছে নেমে রকতিয়া ট্রাইবাল গ্রামের ভেতর দিয়ে। আমরা গিয়ে উঠলাম ডাঃ গোবিন্দ রূপিনীর বাড়ি। গোবিন্দ বাবুর আপন ভাগ্নী বিয়ে করেছে বাঙালি এক আর্মি অফিসারকে। গোবিন্দ বাবুর সেই ভাগ্নী চড়িলাম হাসপাতালের নার্স এখন।

দেওয়ান সাহেবের সঙ্গে চলতে চলতে ভাবছিলাম, যে রূপিনী এলাকায় এতগুলো বাঙালি জামাই, সেখানে ট্রাইবাল-বাঙালি দাঙ্গা হয় কী করে? অনেক কথা মনে পড়ছিলো আমাব ট্রাইবাল-বাঙালি মৈত্রীর পরিবেশ দেখে সেখানে মাত্র ক'বছর আগে। এমন সময় দেওয়ান সাহেব বললেন— 'তাওগৃই আছূক ছিরিঙ ছিরিঙ তঙ, চৌধুরী বাবু? নূঙ খূ দা খূনাকা, কুবুই দা এরেঙ ছাইমায়া—এত চুপচাপ কেন চৌধুরী বাবু, আপনি কি শুনেছেন, সত্যি কি মিথ্যে জানিনে।'

— 'কী শুনেছেন আপনি?'

—'উআনছা উগর'পনথি অঙখরকা হূনূই খূনামানি—বাঙালি উগ্রপন্থী নেমেছে শুনলাম।'

—'কাগজে তো লিখছে, ট্রাইবাল-বাঙালি উগ্রপন্থী বাণিজ্য ত্রিপুরায় এখন রমরমা।'

— 'চিনি হা উলখাই আরব-ইজরাইল হাই উঙনাই দা? আমাদের দেশ কি শেষপর্যন্ত আরব - ইস্রাইলের মতো হবে?'

—'না না, তা হবে না; শুনছেন না, কিডন্যাপ (অপহরণ) করে নিয়ে গেলে সব লেনদেন হয় আগরতলার মহাজনের দোকানে।'

—'আও জবই কিরিজাগ' উগর'পনথিরগন', চৌধুরী বাবু—আমি খুব ডরাই উগ্রপন্থীদের, চৌধুরী বাবু।'

—'আপনার আমার ভয় পাবার কী আছে? আপনার ঘরে বাঙালি বৌ বিশুদ্ধ ব্রহ্মাণী, আর আমার ঘরে ট্রাইবাল বৌ বিশুদ্ধ মোঙ্গলিনী।'

— 'নিনি কক খূনাউই আঙ মূনূইনা মূচুঙগ' —আপনার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে ।'

—'এ আবার হাসির কি হলো, আপনি হলেন বাঙালি বাড়ির ট্রাইবাল জামাই, আর আমি হলাম গিয়ে ট্রাইবাল বাড়ির বাঙালি জামাই । চলুন, আমরা ট্রাইবাল বাড়ির বাঙালি জামাই আর বাঙালি বাড়ির ট্রাইবাল জামাইরা সব গিয়ে মিনি দাঙ্গাগুলো থামাই ।'

কথা বলতে বলতে আমরা বিপিন কর্তার বাড়ি ছাড়িয়ে আস্তাবল বাজারের কাছে এসে গেছি । জ্যোতিষ বাবু বললেন—' কাগলাইখাদ, চৌধুরী বাবু—ছাড়াছাড়ি হলাম, চৌধুরী বাবু ।'

—'কাগলাইখা, দেওয়ান সাহেব, খুলুমকা— ছাড়াছাড়ি হলাম দেওয়ান, সাহেব নমস্কার ।'

আস্তাবল মাছের বাজারে ঢুকে কৃষিমন্ত্রী বাজুবন রিয়াঙের বড়ো ভাই দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা । মিস্টার রিয়াঙ কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের ডি.এস.পি. দূর থেকে দেখে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন—'চৌধুরী বাবু, আপনার কাছে একটু যেতে চাই, কাল যদি হয় কাল-ই ।'

—'দেখুন,কাল তো আমার সময় হবে না ।'

—'কাল না হয় পরশু ।'

—'দেখুন মিঃ রিয়াঙ, আমাকে ধরা খুব মুশকিল, সেই সকাল দশটায় ইউনিভার্সিটি বেরিয়ে যাই, ককবককের ক্লাস সেরে ফিরতে ফিরতে হয় প্রায় রাত সাতটা; তারপর বেশির ভাগ দিন একাজ-সেকাজ সেরে সাড়ে নটা দশটার আগে ফিরতে পারিনে । তা, আপনি কিসের জন্যে যেতে চান আমার কাছে, সেইভাবে আমি সময় করে নেবো ।'

—'আপনার সঙ্গে ককবরক ভাষা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই, কিছু প্রশ্ন আছে আমার।'

—'ঠিক আছে, আজ সন্ধ্যে বেলায় চলে যাবো আপনার বাসায়, কেমন ?'

—'তাহলে তো খুব ভালো হয়, আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকবো ।'

—'ঠিক আছে তাই হবে ।'

দশ টাকায় তিনশো গ্রাম পুঁটি মাছ আর ছেলের জন্যে 'সিফরন' ক্যাপসুল কিনে বাসার দিকে পা বাড়ালাম । সেন্ট্রাল আই.বি. মিস্টার রিয়াঙের কথা মনে পড়েগেলো প্রশ্ন জাগলো ভদ্রলোক কেন যাবেন আমার কাছে ? ককবরক নিয়ে কী প্রশ্ন থাকতে পারে তাঁর ? নিশ্চয়ই ককবরকের লিপি সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে । গতবার আগরতলার বইমেলায় আমার 'ককবরক বানান বিতর্ক লিপি বিকর্ত' বইখানা বেরোতেই গোয়েন্দা বিভাগ এর অনেক কপি কিনে নিয়েছিলো । আমি ওই বইয়ে ককবরকের জন্যে বাঙলা হরফের পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছি । এদিকে উগ্রপন্থী সংস্থা এন এল এফ টি এবং এ টি টি এফ হুমকি দিয়েছে যারা রোমান হরফের বিপক্ষে যাবে, তাদেরকে চরম শাস্তি দেয়া হবে । এমন কি মৃত্যুর জন্যে তৈরি থাকতে পারে তারা এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে এ টি টি এফ প্রকাশিত চবা (সংঘর্ষ) পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় । মনে মনে বললাম, নিশ্চয়ই এই সব সেন্‌সিটিভ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন মিস্টার রিয়াঙ ।

কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা আমার খোঁজ-খবর করলে অথবা আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে আমার বুকের ভেতরটায় কেমন যেন দুরু দুরু ভাব হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অতীতের রোমান্টিক একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যায় । বাঙলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন মাত্র শুরু হয়েছে । চড়িলাম ও তার আশপাশে জয় বাঙলার লোক ভর্তি । এক ব্রজপুরেই কয়েক লক্ষ লোকের শিবির । এই ব্রজপুরের রিফিউজি ক্যাম্প পরিদর্শন করতে এসেছিলেন সূদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন. এফ. কেনেডির ছোট ভাই মার্কিন সিনেটর রবার্ট কেনেডি । জয় বাঙলার রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের নিয়ে তখন আমরা চড়িলাম, বিশালগড়, লালসিং মোড়া, সুতারমোড়া প্রভৃতি জয়গায়

মিটিং করতে ব্যস্ত। রাতদিন খাটছি। চড়িলাম ইস্কুল মাঠে মিটিং করলাম একদিন অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরীকে নিয়ে। মিটিঙে কমরেড মোহনচৌধুরী সভাপতি করলেন আমাকে। চড়িলামের বিশিষ্ট নাগরিক বনমালী দেবনাথ এবং ব্যবসায়ী কমিনী সরকার মতিয়া চৌধুরী ও আলতাফ হোসেন প্রমুখদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এখনো মনে আছে বনমালী বাবু চমৎকার নাদিশাল চাল দিয়ে ছিলেন। একদিন খুব বৃষ্টির মধ্যে মতিয়া চৌধুরী ও কবি বেগম সুফিয়া কামালকে নিয়ে গেলাম সুতার মোড়া গ্রামে। সারা রাস্তা পিছল। বয়স্কা কবিকে সারা রাস্তা হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম। বিকেলে সুতার মোড়া ট্রাইবাল গ্রামের ইস্কুলমাঠে মোহন চৌধুরীর নেতৃত্বে বেশ বড়ো এক জনসভা হলো। অগ্নিকন্যাকে দেখার জন্যে আশপাশের ট্রাইবাল গ্রামগুলো থেকে ভিড় হলো খুব। সুতারমোড়া মাঠে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন তিনি। বেগম সুফিয়া কামালও ভাষণ রাখলেন। কবিকে দেখার জন্যে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকেরাও ভীড় জমালেন বেশ। মিটিঙ শেষে রাতের বেলায় মোহন চৌধুরীর বাড়িতেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। সম্পূর্ণ এক ট্রাইবাল পরিবেশে এসে মতিয়া চৌধুরী ও বেগম সুফিয়া কামালের কৌতূহলের আর অন্ত ছিলোনা। রাতের বেলায় অনেক খুঁটিনাটি সব তথ্য জানতে লাগলেন ত্রিপুরার ট্রাইবাল জনজীবনের। ত্রিপুরী মেয়েদের নিজেদের হাতে তৈরি কারুকার্য খচিত অদ্ভুতদর্শন বক্ষবন্ধনী 'রিছা' দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন কবি। মোহন বাবুর স্ত্রী তাঁর নিজের হাতের তৈরি নক্সা করা সব পাছড়া দেখাতে লাগলেন অগ্নিকন্যা ও কবিকে। আমি লক্ষ্য করছিলাম কী আগ্রহসহকারে না তাঁরা দেখছিলেন ট্রাইবাল মেয়েদের নিজেদের তাঁতে তৈরি এইসব পরিধেয় বস্ত্র। জয় বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মানে সেরাতে এক বড়ো ভোজ দিলেন কমরেড মোহন চৌধুরী। মুরগীর মাংস-মাছ সবই রান্না করেছিলেন মোহন বাবুর স্ত্রী মঞ্জরী দেববর্মা। তারসঙ্গে ছিলো ট্রাইবাল খানা—গোদক ও চাখুই। কমরেড মোহনের স্ত্রী ট্রাইবাল। কাজেই বাঙালি খানার সঙ্গে নিজের হাতে তৈরি ট্রাইবাল খানা খাওয়াবেনই তিনি। ঝাল ঝাল এক অদ্ভুত স্বাদের গোদক খেতে খেতে ঘামে সারা চোখ-মুখ ভিজে গিয়েছিলো তাঁদের। তবু চেয়ে চেয়ে খাচ্ছিলেন গোদকটা। খাবার পরে অনেক রাত অবধি জয় বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা চলতে থাকলো। বাইরেও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। একসময় এসে মোহন বাবুর স্ত্রী ডেকে নিয়ে গেলেন জয় বাঙলার দুই মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীকে শোবার জন্যে।

পরদিন ঘুম ভাঙতে ভাঙতে একটু দেরিই হলো অগ্নিকন্যা ও কবির। এদিকে খুব ভোরে উঠে মোহন বাবুর স্ত্রী 'আওয়াঙ ছকরাঙ' —এক ধরনের ট্রাইবাল-পিঠে তৈরি করার কাজে লেগে গেলেন। সম্পর্কে মোহন বাবুর স্ত্রী মঞ্জরী দেবী আমার পিস্ শাশুড়ী। তাঁকে আমি আমা বলেই ডাকি। সেই কাকভোরে আমিও রান্না ঘরে গিয়ে তাঁর কাছে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে ককবরক ভাষায়— 'আমা, তাম' খূলাইতঙ ?—মা, কী করছেন ?'

—'অতিছরগনি বাগ্‌ইূ আওয়াঙ ছকরাঙ খূলাইনানাইঅ আঙ —অতিথিদের জন্যে আওয়ান ছকরাঙ কোরছি আর কি।'

—'আছূক কছত' খূলাইউই আওয়াঙ ছকরাঙ খূলাইনাঙ দা তাবুক ? এত কষ্ট করে আওয়ান ছকরাঙ করবেন নাকি এখন ?'

—'চিনি আওয়াঙ-বরক কিছা চারুনা মূচুঙ তঙখা আঙ অতিছরগন' — আমাদের বরক জাতির পিঠে কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করছে অতিথিদের।'

এরপর তিনি ভেজানো বিন্নি চালের সঙ্গে আদা-পেঁয়াজ-গরমমশলা মাখলেন ভালো করে নারকেল কোরার সঙ্গে। দুটো হাঁড়ি পাশেই ছিলো তাঁর। আওয়াঙ ছকরাঙ রান্না করতে হলে দুটো হাঁড়ি লাগে। নিচের হাঁড়িতে থাকে জল আর ওপরেরটায় থাকে পিঠের চাল। প্রথম হাঁড়িটাতে নিচে থাকে গোল

গোল কিছু ছেঁদা। ছেঁদাগুলোর ওপর বিছিয়ে দেয়া হয় নরম কঞ্চির শলা দিয়ে বোনা আয়তক্ষেত্রের মতো দেখতে কয়েক ইঞ্চির ছাঁদ। আমি বসে বসে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম ট্রাইবাল বাড়ির জামাই হয়ে আওয়াঙ ছকরাঙ রান্না করার জটিল প্রক্রিয়াটা। দেখলাম, পিসিমা ওপরের হাঁড়িতে মশলাপাতি মাখা চাল ঢেলে দিয়ে দুটো হাঁড়ির জোড়া জায়গাটা মাটি দিয়ে লেপেদিলেন ভালো কোরে। তারপর ওপরের হাঁড়ির মুখ দিলেন সরা দিয়ে ঢেকে। এখন নিচের হাঁড়ির গরমজলের ভাপে আওয়াঙ ছকরাঙ এই চাইনীজ পিঠে তৈরি হবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

পিসশাশুড়ীর পিঠে হতে হতে অন্তত ঘন্টা দেড়েক লেগে যাবে। এই ফাঁকে আমি গেলাম পাশের নৈদ্যাবাসী দেববর্মার বাড়ি। নৈদ্যা বাবু গতকাল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মিটিঙে ককবরক ও বাঙলা ভাষায় গণসংগীত গেয়েছিলেন খুব দরদ দিয়ে। গতরাতেও ছিলেন অনেক্ষণ মতিয়া চৌধুরী ও বেগম সুফিয়া কামালের সঙ্গে। তাঁর গণসংগীত শুনে অগ্নিকন্যা ও মহিলা কবি তো মুগ্ধ। গিয়ে দেখি বাউল গায়ক নৈদ্যাবাসী দেববর্মা তখন ঘুমোচ্ছেন। দা নৈদ্যা, দা নৈদ্যা বলে তুললাম তাঁকে ডেকে। বললাম, 'হাত-মুখ ধুন, মোহনদার স্ত্রী আওয়াঙ ছকরাঙ তৈরি করছেন বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চমক দিতে। চলুন তাড়াতাড়ি, ট্রাইবাল পিঠে খাইয়ে তাঁদেরকে পৌঁছে দিয়ে আসি ব্রজপুর রিফিউজি ক্যাম্পে। ব্রজপুর ক্যাম্পে কাজ সেরে তারা যাবেন আগরতলায়।'

নৈদ্যাবাসী দেববর্মার সঙ্গে একথা-সেকথা বলতে বলতে ঘন্টাখানিক কেটে গেলো। ঘন্টাখানিক পরে আমরা মোহন বাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখি অগ্নিকন্যা ও কবি উঠে গেছেন। মোহন চৌধুরীর সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে কথা বলছেন তাঁরা। নৈদ্যাবাবু ও আমি গিয়ে পাশে বসলাম তাঁদের। কিছুক্ষণ বাদে পিসশাশুড়ী ইশারা কোরে ডাকলেন আমাকে। তাঁর পিছু পিছু রান্না ঘরে গিয়ে তো আমার চক্ষু চড়ক গাছ। চারপাঁচ খানা ঝকঝকে স্টীলের থালার আওয়াঙ ছকরাঙ, তার পাশে ডবল ডিমের ওমলেট। আমাকে ডেকে বললেন—'মন্দিরা (মোহন চৌধুরীর বড়ো মেয়ে, এখন বিয়ে হয়েছে আগরতলায় নাজির বাড়ি) বাই নরগ কৃনূই আওয়াঙরগ তিলাঙদি, আঙ চা মুথুঙগৃই তিলাঙগানূ উল'—মন্দিরা আর তুমি দু'জনে পিঠে নিয়ে যাও, আমি চা করে নিয়ে আসছি একটু পরে।'

মন্দিরা আর আমি পিঠের থালা নিয়ে যেতেই জয় বাঙলার অতিথিরা তো রিতিমতো অবাক। তখনো পিঠের থালা থেকে ধোঁয়া উড়ছে। মোহন বাবু বললেন—'এ হলো ট্রাইবাল পিঠে, ককবরক ভাষায় বলে আওয়াঙ ছকরাঙ, অনেকটা চাইনীজ ফ্রাইড রাইসের মতো। আমার স্ত্রী নিজের হাতে কোরেছেন, খান।'

হাত দিয়ে খেতে শুরু করলেন ট্রাইবাল পিঠে অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী ও বেগম সুফিয়া কামাল। দেখলাম, বিন্নি চালের পিঠে তাঁদের আঙুলে আঠার মতো এঁটে ধরছে। মোহন বাবু বললেন— 'জুমের বিন্নি ধানের চাল থেকে এই পিঠে করা। রান্না করলে খুব আঠা আঠা হয়ে যায়।'

খেতে খেতে সুফিয়া কামাল বললেন—'এতো দেখছি আনইউজুয়াল স্বাদ, কি সুগন্ধ। আমরা বাঙালিরা এ ধরনের পিঠে করতে পারিনে।'

মোহন বাবু উত্তর দিলেন—'এতো ট্রাইবাল পিঠে, মোঙ্গলয়েড ট্রাইবরা এই পিঠে করে থাকে, পিঠে করার পদ্ধতিও খুব জটিল, আপনাদের ময়মনসিংহের হাজঙ বা গারো ট্রাইবরা এ পিঠে করতে জানে।'

মোহন চৌধুরীর কথা শুনে মতিয়া চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন—'এবার তা হলে সংগ্রামটা জিতে, খানসেনা আর রাজাকারদের তাড়িয়ে ময়মনসিঙে গিয়ে হাজঙ এলাকায় থেকে আসবো কিছুদিন। এমন সফিস্টিকেটেড পিঠের লোভ সামলানো যায়না।'

এমন সময় আমার পিসশাশুড়ী মঞ্জরী দেবী একটা বড়ো থালায় চায়ের কাপ সাজিয়ে অতিথিদের মধ্যে হাজির। কবি সোফিয়া কামাল তাঁকে দেখে বললেন—'কী পিঠে খাওয়ালেন দিদি, চিরকাল মনে থাকবে।'

উত্তরে বললেন তিনি—'আপনারা ছাদিনতা ছংগ্রামীরা আইছেন, কিছু খাওয়াইয়া দিলাম আর কি তিপরা পিথা।'

তিপ্রা পিঠের সঙ্গে চায়ের পর্ব সারতে সারতে আরো কিছু আলোচনা হলো বাঙলাদেশের স্বধীনতা সংগ্রাম নিয়ে। চা-পিঠের পর্ব শেষ করে অগ্নি কন্যা মতিয়া চৌধুরী ও কবি বেগম সুফিয়া কামাল মোহন বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে আমরা বিদায় নিই কমরেড।' এবার মোহন চৌধুরীর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাই দিদি, চিরকাল আপনার এই পিঠে খাওয়ানোর কথা মনে থাকবে আমাদের।'

এবার, নৈদ্যাবাসী ও আমি অগ্নিকন্যা ও কবি সুফিয়া কামালকে নিয়ে মোহন বাবুর বাড়ি ছাড়লাম। সুতারমোড়ার ইসকুলের মাঠ বাঁয়ে রেখে লালসিং মোড়া বাজারের দিকে পা বাড়াতেই দেখলাম কবি সুফিয়া আর হাঁটতে পারছেন না, রাস্তা এতো পিছল যে মাঝে মাঝে তিনি পড়ে যাবার উপক্রম করছেন। আমি বললাম, আমার ঘাড় ধরুন ম্যাডাম, এভাবে তো আপনি যেতে পারবেন না। হাঁটতে তো হবে ছ'মাইলের মতো রাস্তা।

আমার কথায় কবি খুশি হয়ে তাঁর ডান হাত আমার কাঁধে রেখে হাঁপ ছাড়লেন। এভাবে আমার কাঁধে হাত রেখে চললেন কবি পাহাড়ী-বাঙালি মানুষ দেখতে দেখতে। হাঁটতে হাঁটতে তিনি কথা বলছিলেন কম। কেবল যেন আনমনা হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। অন্যদিকে, বাঙলাদেশের স্বধীনতা নিয়ে অগ্নিকন্যা মতিয়ার সঙ্গে নৈদ্যবাসী কথা বলে চলেছেন অবিরাম ভাবে। দীর্ঘ তিন ঘন্টা সময় লেগে গেলো আমাদের ব্রজপুর ক্যাম্পে পৌঁছুতে। ব্রজপুর ক্যাম্পে আমরা আর বেশি দেরি করলাম না। বিকেলে চড়িলামে মিটিং ছিলো। আমরা অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী ও কবি সুফিয়া কামালের কাছ থেকে বিদায় নিলাম ব্যথিত হৃদয়ে। রাতের বেলায় শ্বশুরবাড়ি হেরমায় ফিরতেই স্ত্রী মুখ কালো করে বললেন, 'আগুলিনি গোয়েন্দারগ তিনি দিপর' 'নন' রুতুগূই থাঙ্কা, নকনি বরকরগ কিরিজাকখা — আগরতলার গোয়েন্দারা আজ দুপুরে তোমাকে খুঁজে গেছে। বাড়ির লোকেরা সব ভয় পেয়েছে।' আমি বললাম, ক'দিন ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে মিটিং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই বোধ হয় গোয়েন্দা দপ্তর থেকে খোঁজখবর নিতে এসেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেলো। তখন ইন্দিরা গান্ধীর ইমারজেন্সির সময়। আমি গিয়েছিলাম কলকাতায়। সেখান থেকে ছোটমামার সঙ্গে চলে যাই মধ্যপ্রদেশের ভিলাই। ছোট মামা ডাঃ নির্মল চন্দ্র পাল সেখানে রেলওয়ের বড় ডাক্তার — আর. এম. ও. সেখান থেকে হেরমার শ্বশুরবাড়ি ফিরতেই আগরতলা থেকে ডি এস পি নিরাপদ গণ চৌধুরী এসে খোঁজখবর নিয়েছিলেন আমার। জিজ্ঞেস করেছিলেন, এতদিন আমি কোথায় ছিলাম? ভিলাই থেকে আমি বাস্তার ট্রাইবেল এলাকায় গিয়েছিলাম কিনা, এইসব নানা প্রসঙ্গে। তারপর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'জানেন মিস্টার কুন্ডু, আপনি ট্রাইবেল ভাষায় গবেষণা করেন, আবার করেছেন ট্রাইবেল মেয়ে বিয়ে, কাজেই সরকারের চোখ থাকবেই আপনার গতিবিধির ওপর।' আর, তখন থেকেই গোয়েন্দা-পুলিশকে খুব ডরাই আমি।

২২ শে নভেম্বর, বুধবার, ১৯৯৫। সকালে ছোট শালা বিমলের জন্যে চাকরির দরবার করতে গেলাম কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টর বংশী ঠাকুরের ছেলে বি. এল. দেববর্মার বনমালীপুরের বাড়িতে। বংশঠাকুর (অমরেন্দ্র দেববর্মা, লোকসভার প্রাক্তন এম. পি.)-এর কৃতী ছেলে কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টর বদ্রীলাল দেববর্মার ড্রয়িং রুমের মনোরম শোফায় বসে বংশী ঠাকুরের এই বাড়ির পরিবর্তনের কথা

ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠল তাঁর একটা অভিনব সুদূর প্রসারী কথা। আশির জাতি-উপজাতির মহাদাঙ্গার দু'এক বছর আগে একদিন সকালে বংশী ঠাকুরের বাড়ি এলাম আমি। তিনি ছিলেন সম্পর্কে আমার দাদাশ্বশুর। ককবরক ভাষার গবেষণার কাজ করি বলে আমাকে খুব ভালবাসতেন তিনি। আমি এসেছিলাম ত্রিপুরার কিছু জায়গার ককবরক নাম সম্পর্কে আলোচনা করতে। এসে দেখি ঠাকুর সাহেব আস্তাবল বাজারে গেছেন। দিদিশাশুড়ী বসতে বললেন আমাকে। আমি দা বংশী (বংশী দা-ককবরক ভাষায় সম্বোধন বাচক শব্দ নামের আগে বসে)'র খড়ের ছাউনি দেয়া ছোট্ট বসবার ঘরে বসতেই তাঁর টেবিলের ওপর চোখ পড়ল আমার। দেখি বিশ্বভারতীর দু'খানা বড় বড় খাম। খাম দু'খানা খোলা। কৌতূহল হলো আমার। বিশ্বভারতীয় কর্তৃপক্ষ বংশী ঠাকুরের কাছে কী পাঠালেন আবার? খুব সন্তর্পণে একখানা খাম থেকে একটা বাণ্ডিলের মতো কাগজ বের করে দেখি তাতে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্পের ককবরক ভাষায় অনুবাদ ও বংশী ঠাকুরের মন্তব্য। অনুবাদকের নাম মনোরঞ্জন মজুমদার। মন্তব্য পড়ে দেখি, ঠাকুর সাহেব মনোরঞ্জন মজুমদারের রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের ককবরক ভাষায় অনুবাদ অনুমোদন করেননি। নানা যুক্তি দেখিয়ে তা নাকচ করে দিয়েছেন। কৌতূহলবশতঃ অপর খামটার ভেতর থেকেও কাগজের বাণ্ডিলটা বের করলাম আমি। দেখি রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত কবিতার ককবরক ভাষায় অনুবাদ। অনুবাদকের নাম কুমুদরঞ্জন দেববর্মা। মন্তব্য পড়ে দেখলাম, ঠাকুর সাহেব কুমুদরঞ্জন দেববর্মার অনুবাদকে যথাযথ বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। আমি বসে বসে ভাবছিলাম, ঠাকুর সাহেব কুমুদবাবুর অনুবাদ যথাযথ হয়েছে বলে সার্টিফিকেট দিলেন, আর মনোরঞ্জনবাবুর অনুবাদটা নাকচ করে দিয়েছেন, ব্যাপার কী ? অথচ আমি জানি, মনোরঞ্জন মজুমদার ককবরক ভাষা ভালোই জানেন। পাহাড়ের ভেতর টাকারজলা, সুতারমোড়া এলাকায় দীর্ঘদিন মাস্টারী করতে করতে ককবরক ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করেছেন তিনি। ঠিক এমন সময় দা বংশী এসে আমাকে দেখেই হাঁকডাক শুরু করলেন, 'আরে, আমাদের নাতিন জামাই এসেছেন, চা-টা খাওয়াও।'

আমি তখন ঠাকুর সাহেবকে বললাম, 'ঠাকুর সাহেব, বেয়াদবি মাপ করবেন আমার। কৌতূহল সামলাতে না পেরে বিশ্বভারতীর খাম দুটোর ভেতরের অনুবাদের ওপর আপনার মন্তব্য দুটো পড়ে ফেলেছি আমি। আপনি একজনের অনুবাদ যথাযথ বলে সার্টিফিকেট দিলেন, আর আরেকজনের অনুবাদ নাকচ করে দিলেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

আমার কথা শুনে ঠাকুর সাহেব হাসলেন একটু। তারপর বাঁশের হুঁকো হাতে করে রান্না ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'নাতিন জামাই, তামাক সেজে নিয়ে আসি, তামাক টানতে টানতে আপনার কথার জবাব দেব আমি।'

কিছুক্ষণ বাদে দা বংশীর ছোট মেয়ে আমার জন্যে চা নিয়ে এলেন। দা বংশীও এলেন পিছু পিছু। তারপর চেয়ারের ওপর দু'পা তুলে আরাম করে বসে পুড়ুত পুড়ুত করে তামাক টানতে টানতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এইবার আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়া যাক। শুনুন, ককবরক ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের অনুবাদ মনোরঞ্জন মজুমদার যা করেছেন তা ভালোই হয়েছে। একজন বাঙালী হয়ে তিনি যে আমাদের মাতৃভাষায় এমন অনুবাদ করতে পারেন, তা ভাবাই যায় না।

— 'তাহলে আপনি তাঁর অনুবাদ নাকচ করলেন কেন, ঠাকুর সাহেব?'

— 'নাকচ আমি ইচ্ছে করেই করেছি কুমুদবাবু। যে অনুবাদ মনোরঞ্জনবাবু করেছেন, তা কি আমরা ককবরক ভাষীরা করতে পারিনে? খুব পারি। বলি, ল্যাণ্ড চলে গেছে, ল্যাঙ্গুয়েজটাও চলে যাবে?'

ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন বংশী ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। বললাম, 'ঠাকুর সাহেব,

আপনার কথাটার তাৎপর্যটা ঠিক বুঝতে পারলাম না আমি।'

— 'এর বেশী আমি আর কিছু বলবো না। আমি বুদ্ধিজীবী মানুষ, একটু গভীরভাবে ভাবলে আমার কথার তাৎপর্য ঠিকই অনুধাবন করতে পারবেন আপনি। চলুন, এইবার আপনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। আপনি তো যাবেন বীরচন্দ্র উকিল (বীরচন্দ্র দেববর্মা ছিলেন বংশী ঠাকুরের মাসতুতো ভাই)-এর বাড়ি। আমি যাবো ডি. এম. অফিসে, সিমেন্টের দরবার করতে।'

রিক্সায় চেপে যেতে যেতে আমি তাঁকে বললাম, 'আচ্ছা, ঠাকুর সাহেব, 'আখাউড়া' শব্দের ব্যুৎপত্তিটা একটু বলুন।' উত্তরে তিনি বললেন, 'আজ না নাতিন জামাই। আপনার ছেলের অন্নপ্রশনে হেরমা বাড়ি গিয়ে আমার ছাত্র যোগেন্দ্র মাস্টারের ঘরে বসে আখাউড়া শব্দের ব্যুৎপত্তি বলব।' বলেই তিনি বীরচন্দ্র দেববর্মার পান্থশালায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন আমাকে।

গতকাল আমার পিসতুতো শালী গীতা এসেছিলো তার শ্বশুরবাড়ি জলাজলা (ভেলুয়ারচর) থেকে weaver-এর ইন্টারভিউ দিতে গোর্খাবস্তীর শিল্প দপ্তরে । আর সকাল দশটায় আমার ছোটো শালাকে দিয়ে ইন্টারভিউ দিতে পাঠালাম । গীতাকে আমি তাঁতের ট্রেনিং দিইয়েছিলাম । অনুরূপা মুখার্জীর আদিবাসী মহিলা সমিতির তাঁতে ভালই কাজ শিখেছিলো সে । ট্রাইবাল মেয়ে ফ্রেমলুমে যে এমন দক্ষ তাঁতী হবে একথা ভাবাই যায়নি । গীতা জুমের সোনালী তুলো এনেছিল কিছু আমার জন্যে। গীতার বিয়ে হয়েছে সোনামুড়ার ভেলুয়ার চর বাজারের কাছে এক উপজাতি জনপদে। গীতাদের শ্বশুরবাড়ি অক্ষেমোড়া পাহাড়ের পাদদেশে। অক্ষেমোড়ার পাহাড়ী জঙ্গলে গীতার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা জুম করে প্রতি বছর। জুমে ধান-তুলো-তিল একই সঙ্গে বপন করা হয়। জুমের তুলো কর্পাস জাতীয়, ছোট ছোট আঁশের তুলো। এই তুলো খুব গরম। রাজ আমলে এই ছোট আঁশের তুলো ত্রিপুরা থেকে রপ্তানী হত জাপানে। লম্বা আঁশের জাপানী তুলোর সঙ্গে ত্রিপুরার ছোট আঁশের তুলো মিশিয়ে জাপানী বস্ত্র ব্যবসায়ীরা এক ধরনের গরম বস্ত্র তৈরী করতেন। আমার ভাষাতত্ত্বের শিক্ষা গুরু ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায় আমার সঙ্গে বিশ্রামগঞ্জের কাছে খেওরা উপজাতি পাড়ায় চন্দ্রকুমার-অশ্বিনী দেববর্মার বাড়িতে যখন ককবরক ভাষার গবেষণার কাজে কয়েকদিন ছিলেন, তখন আমাদের গায়ে দিতে যে লেপ দেয়া হয়েছিল তা খুব গরম। ডঃ চ্যাটার্জি পরের দিন সকালে ত্রিপুরার জুমের তুলো দেখে তো অবাক। বললেন, 'এই তুলো তো আমেরিকার তুলোর সমান। আমেরিকার আমাজন নদীর ধারের উপজাতিরা তো এই তুলোর চাষ করে।'

গীতা যে সোনালী তুলো এনেছিল, তা আলাদাভাবে জুমে হয় না। জুমের সাধারণ তুলোর সঙ্গে এই তুলো হয়। একমন জুমের তুলোর ভেতর হয়ত এক থেকে দুই কেজি এই ভুবন বিখ্যাত তুলো পাওয়া যায়। পৃথিবীর আর কোথাও এই 'স্বর্ণ-তুলা' জন্মায় কিনা আমার জানা নেই। ত্রিপুরার তিব্বত-বর্মীয় ককবরক ভাষী উপজাতি মেয়েরা তাঁদের ট্রাইবাল তাঁত (loin loom)-এ যখন গায়ের চাদর বোনেন, ঐ সোনালী তুলো সাদা জমিনের টানার ভাঁজে ভাঁজে জরির মতো ঢুকিয়ে দেয়া হয়। একখানা সাদা চাদরের ওপর সোনালী তুলোর জরি দেয়া এই হাতের কাজ অতুলনীয় । ত্রিপুরী মেয়েরা যখন মারা যান, তখন এই সোনালী তুলোর জরি দেয়া চাদর তাঁদের মৃতদেহের ওপর দেয়া হয়। মৃত্যুর আগে ত্রিপুরী মেয়েরা প্রত্যেকে তাঁদের এই চাদর বুনে রাখেন। তাঁরা এই চাদরকে বলেন, 'থূই-বানতা'। ককবরক ভাষায় 'থূই' অর্থ মরা এবং 'বানতা' অর্থ অংশ। অর্থাৎ মরার অংশ বা মৃত্যুকালীন অংশ বা সহচর।

একবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে পান্নালাল দাশগুপ্ত এসে আমার শ্বশুরবাড়ির উপজাতি গ্রামে জান আমার সঙ্গে। তখন আমি তাঁকে ত্রিপুরার জুমের সোনালী তুলো দেখাই । এই তুলো দেখে তিনি বিস্মিত হন। এবং আমার দিদিশাশুড়ী শশীকুমারীর কাছ থেকে এই সোনালী তুলোর কিছু বিচি নিয়ে

যান তাঁর বীরভূমের বলরামপুর আশ্রমে লাগানোর জন্যে। কিন্তু বীরভূমের মাটিতে ত্রিপুরার জুমের সোনালী তুলোর গাছ ওঠেনি। পরবর্তীকালে বাইরে থেকে আসা বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে এই তুলোর নমুনা নিয়ে গেছেন। এখনো নিতে আসেন। তাই গীতা মাঝে মধ্যে আমাকে জুমের এই অত্যাশ্চর্য সোনালী তুলো এনে দেয়।

সকাল সোয়া এগারোটায় গেলাম টি.ভি.সেন্টারে চেক নিতে। গতবছর মহেন্দ্র দেববর্মা, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, চন্দ্রবালা দেববর্মা ও আমি সমবেত ভাবে টি.ভি.তে ত্রিপুরার উপজাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ওপর একটা টক দিয়েছিলাম, তারই চেক নিতে যাওয়া। সেখানে শ্রীমান বিশ্বজিৎ দাশ ও আবৃত্তিকার প্রণব সাহা আমাকে চেকটা পাইয়ে দিতে সাহায্য করলেন; কিন্তু চেকটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেলোনা। প্রণব তাঁর আবৃত্তির একটা ক্যাসেট দিলেন দৈনিক সংবাদে সমালোচনা করে দেয়ার জন্যে। প্রণব বললেন, তিনি কলকাতার বিখ্যাত আবৃত্তিকার প্রবীর ঘোষের কাছ থেকে আবৃত্তির তালিম নিয়েছেন।

টি.ভি. সেন্টার থেকে ফিরে মেলারমাঠে স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা করে ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের ওপর একটা লেখা নিলাম তাঁর কাছ থেকে অক্ষর প্রকাশনীর তরফ থেকে। তাঁর সঙ্গে সি.পি.আই পার্টির আভ্যন্তরীণ দলাদলী মীমাংসার ব্যাপারে আলোচনা হলো। দেখা গেলো, অঘোর দেববর্মাকে তিনি খুব কনফিডেন্সে নিচ্ছেন না।

দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে অবস্থিত সি.পি.আই-এর সদর বিভাগীয় দপ্তরে একটু উঁকি মেরে এলাম অক্ষর প্রকাশনীর অফিসে। সেখানে কমলাদি (কমলা সূত্রধর)'র হাতে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর লেখাটা দিয়ে বাসায় ফিরে এলাম সন্ধ্যে ৫ টায়।

তারপর গেলাম কর্নেল চৌমুহনীতে ডাঃ তাপস আচার্যের চেম্বারে আমার নিজের ওষুধ নিতে। কর্নেল চৌমুহনীতে দেখা হয়ে গেলো অফিস-ফেরতা স্ত্রী ফুলকুমারীর সঙ্গে। তাঁকে টি.ভির চেক না পাওয়ার দুঃসংবাদ জানাতে জানাতে বাসায় নিয়ে গেলাম।

রাত সাতটা নাগাদ এলেন রাজেন্দ্র কীর্তিশালার জহর আচার্জী। তিনি আসতেই বললাম, 'একটা সুসংবাদ আছে জহর বাবু, আজ সকালে তাপস দে (প্রাক্তন কংগ্রেসী M.L.A ও বর্তমানে মহারাণী বিভুকুমারী দেবীর প্রাইভেট সেক্রেটারী) কে দিয়ে মহারানী তাঁর M.P কোটা থেকে একটা গ্যাসের পারমিট পাঠিয়ে দিয়েছেন।' জহর বাবু বললেন, 'এখন আপনাকে তো মহারাণীর কাছে নিয়ে যেতে এসেছি। রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তী কমিটির তরফ থেকে মহারাণীকে একটা ধন্যবাদ জানাতে হবে। প্রেস ক্লাবে রামেশ্বর ভট্টাচার্য, সত্যব্রত চক্রবর্তী অপেক্ষা করে আছেন, চলুন এক্ষুণি বেরোতে হবে। আর যাবার সময় ত্রিপুরা দর্পণ থেকে সমীরণ রায়কে নিয়ে যেতে হবে।' জহর বাবুর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম ত্রিপুরা দর্পণে। কিন্তু সমীরণ রায় যেতে চাইলেন না। এলাম প্রেস ক্লাবে। দেখি অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য নেই সেখানে। আর সত্যবাবুকে দেখলাম ফুলন ভট্টাচার্য, শেখর দত্ত, সুজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে জরুরি এক মিটিং করতে। সত্যবাবু বললেন, 'আপনারা দু'জনেই যান, আপনারাই ধন্যবাদ জানিয়ে আসুন মহারাণীকে, আর মহারাণী তো কাল কলকাতায় চলে যাচ্ছেন, কলকাতা থেকে ফিরলে আমরা সকলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তীর অনুষ্ঠান নিয়ে একটা মিটিং করবো।'

অগত্যা জহর বাবু আর আমি রাজবাড়ি গেলাম মহারাণীর সঙ্গে দেখা করতে। রাজ অন্দরের গেট দিয়ে দেতলায় মহারাণীর বৈঠক খানা ঘরে ঢুকতেই দেখি কবি নন্দ কুমার দেববর্মা বেরিয়ে আসছেন মহারাণীর ঘর থেকে। আমাকে দেখে বললেন, "কী ব্যাপার এখানে?" বললাম, "রাজেন্দ্র কীর্তিশালার তরফ থেকে মহারাণীকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।" আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—

"প্রতিদিন তো কীর্তি করছেন আপনি, আর কত কীর্তি করবেন ?" উত্তরে আমিও হেসে বলাম—ভাবছি, এখন থেকে অপকীর্তিই করবো। নন্দবাবু নিচে নেমে গেলে জহর বাবু ও আমি বৈঠকখানার দক্ষিণমুখো বারান্দায় শ্বেত পাথরের লম্বা চেয়ারে বসলাম দু'জনে। জহরবাবু বললেন—"জানেন কুমুদবাবু, এই শ্বেত পাথরের চেয়ার স্বর্গীয় মহারাজা বীরবিক্রম এনেছিলেন জার্মানী থেকে আর আপনার সামনের ওই মুসোলিনীর ব্রোঞ্জের মূর্তিটা ইটালী থেকে।" ঠিক এই সময় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের তরুণ অধ্যাপক সুখেন্দু দেববর্মা বেরোলেন মহারাণীর ঘর থেকে। আমার সঙ্গে ককবরক ভাষায় শুভেচ্ছা জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এবার আমাদের পাশে শ্বেতপাথরের চেয়ারে এসে বসলেন মহারাণীর সেক্রেটারী তাপস দে। তাপস বাবুকে জিজ্ঞেস করলাম আমি, "আচ্ছা তাপস বাবু, আপনি কখনো এই বারান্দা থেকে সামনের ভোরের দৃশ্য দেখেছেন ?" উত্তরে বললেন, "ভোরের দৃশ্য খুব সুন্দর বিশেষ করে, সূর্য ওঠার সময় এমন একটা রক্তিম আভার ছায়া পড়ে রাজ দীঘির ওপরে, তার সৌন্দর্য অপূর্ব।" বারান্দার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখি দীঘির ওপারে ঠিক সোজাসুজি দুর্গাবাড়ির গেট দেখা যাচ্ছে রমণীয়ভাবে। তাপস বাবু এবার বললেন, "চলুন কুমুদবাবু, নিশ্চয়ই এতক্ষণে টি.এস.এফ (ট্রাইবাল স্টুডেন্ট ফেডারেশান) এর ছেলেদের সঙ্গে মহারাণীর কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে।" জহর বাবু আর আমি মহারাণীর দরবাব কক্ষে ঢুকতেই তাপস বাবু বললেন, 'মহারাণী কুমুদ কন্ডু চৌধুরী দেখা করতে এসেছেন।' এক পলক আমার দিকে তাকালেন তিনি। তখনো টি.এস.অফ-এর ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হয়নি তাঁর। রাজ-সোফায় বসা টি.এস.এফ-এর ছেলেরা আমাকে দেখে খানিকটা অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো মনে হলো। এমন রাতের বেলায় আমাকে মহারাণীর দরবার কক্ষে দেখা পাবে ভাবতেই পারেনি তারা। তাদের মধ্যে কলেজে পড়া আমার এক জ্যাঠতুতো শালাও বসেছিলো। দেখলাম, মহারাণী এক জমাতিয়া ছেলের সঙ্গে অনর্গল ইংরিজিতে কি বোঝাচ্ছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ছেলেটাকে আমি চিনি রাজভবনে চাকরি করে, শিলঙে লেখাপড়া করা ছেলে, বেশভালো ইংরিজি বলতে পারে। স্ক্রিপ্ট সিলেকশন কমিটির সেমিনারে ককবরকের জন্যে রোমান হরফের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলো। সে আমার বাঙলা হরফের যুক্তিকে খন্ডন করে। পরে জেনেছিলাম, ছেলেটা লেখাপড়া বেশিদূর করেনি, তবে বেশ ক'বছর শিলঙে থাকার সুবাদে চলনসই ইংরিজি বলতে শিখেছে ভালোই। মহারাণী এবার চোখ ফেরালেন সোফায় হেলান দিয়ে বসে থাকা টি.এস.এফ-এর ছেলেদের দিকে এবং বাঁহাতের তালুতে ডানহাতের তর্জনী দিয়ে আঘাত করতে করতে বললেন—'তাহলে মোদ্দা কথা হইছে তোমাদের ইন্দিরা কংগ্রেসের ছাত্রসংগঠন হিসাবে কাজ করতে হইবো। ওইসব কূপমন্ডুক রাজনীতি ছোড় দাও বাবা, আমার সঙ্গে হাত মিলাও, মেইন স্ট্রীম রাজনীতির সঙ্গে আইসোসব, ত্রিপুরার উন্নতি হইবো, আমার লগে কাজ করো। টি.এস.এফ-এর দামাল ছেলেরা উঠে দাঁড়িয়ে গো গ্রাসে গিলতে লাগলো মহারাণীর কথা। কি যেন আলাপ করলো ককবরক ভাষায়। তারপর জমাতিয়া ছেলেটি কি একটা কথা জিজ্ঞেস করতেই মহারাণী বাঁহাতের তালুর ওপর তর্জনী দিয়ে আঘাত করে বললেন—Tomorrow I am leaving for Calcutta, সেখান থেকে day after tomorrow আমি দিল্লী যাইবো। Tomorrow morning either you pass a message or you come with a list of office bearers- যারা মন দিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেস করবো, এখন যাও তোমরা, কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী সাহেব আইছেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হইবো।" ঠিক এই মুহূর্তে এক অধ্যাপক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কাগজে কি একটা সই করতে মহারাণীর কাছে আসতেই কিছুটা যেন বিরক্ত হলেন তিনি, তারপর তাপস বাবুকে ডেকে তাঁদের সম্পর্কে কি যেন বলে দিতে লাগলেন। অধ্যাপক ও অধ্যাপকের স্ত্রী খানিকক্ষণ আগে মুসোলিনীর মূর্তির পাশে আমাদের সঙ্গে বসে

ছিলেন মহারাণীর অপেক্ষায় । জহরবাবু আস্তে আস্তে বললেন, “অধ্যাপকের স্ত্রী রাজ অন্দরের একটা ঘরে নার্সারি ইস্কুল খুলতে চান একটা, পরে বলবো ব্যাপারটা ।' মহারাণী অধ্যাপক ও অধ্যাপক স্ত্রীকে বিদায় করে দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতেই সোফা থেকে উঠে মাথাটা সামনের দিকে একটু নুইয়ে নমস্কার করে বললাম—'সকালে তাপস বাবু গিয়ে গ্যাসের পারমিটটা দিয়ে এসেছেন আমাকে, ধন্যবাদ আপনাকে ।”

—“ধন্যবাদ দেবার আর কিতা আছে, নগেন্দ্র জমাতিয়া আপনার জন্যে গ্যাসের কথা বললো সেদিন, তাপসও বললো, পেয়ে গেলেন গ্যাস । কতলোক ধান্দায় আসে আমার কাছে, জহরও আসে, কি বলো কালোমানিক, মহারাণী ঠিক কইতাছে না মিথ্যা কইতাছে ?” বলেই মহারাণী স্নিগ্ধ মোহিনী দৃষ্টিতে জহরবাবুর দিকে তাকিয়ে তাঁর কাঁচা সোনার মতো আঙুল দিয়ে থুতনিটা নাড়িয়ে দিলেন জহর বাবুর—তা তুমি কইতেই, জহর, রাজ অন্দরের নিচের আমার দরবার ঘরটা ছাইড়া দিলাম তুমি এগজিবিশন করলে কয়েনের । রাজা-রাণী সাহায্য করলো কিনা কও ? আর, কুন্ডু চৌধুরী সাহেব পন্ডিত লোক আছে, গবেষক মানুষ উনি, উনাকে একটা গ্যাস দিয়ে দিছি আমার এম.পি.কোটা থেকে, এতে মহারাণীকে ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন আছে কি ?'

সবিনয়ে বললাম আমি, 'মহারাণী, এবার আপনাকে ককবরক শেখাবো আমি । রোমানাইজড ফরমে একটা বই লিখছি সেটা কাজে লাগবে আপনার ।'

—'মহারাণীর বয়েস হয়ে গেছে, সময় পাবে কখন ককবরক শেখার, পলিটিক্স করি আমি, এই এখন ইন্দিরা কংগ্রেসটা করতে হইব ভালো করে, তাই তো যুবসমিতির, না না, টি.টি.এন. সি'র পোলাগুলোকে কইলাম সর্বভারতীয় রাজনীতি করো তোমরা, আঞ্চলিক পার্টি কইরা কিতা হইব, আমাদের কাছ থেইক্যা রাজনীতি শেখো, আমরা আর কত দিন বা বাঁচবো, লিডারশিপ লও তোমরা, সারা ভারতের সঙ্গে থাকো । বুঝলেন, হোল নর্থ-ইস্টার্ন রিজিয়নে কোনো ইকোনোমিক প্লানিং নেই, আমাদের ত্রিপুরাতেও নেই, ত্রিপুরার তিপরা-বাঙ্গালি হগ্গলে মিল্যা গাঁজার চাষ করবো কিছুদিন পরে, আর তাই যাবে বাঙালা দেশে, বাঙলা দেশ থেইক্যা আইবো ব্রাউন সুগার, তাই আমাদের পুলাপানেরা খাইবো আর চোখ ঢুলুঢুলু কইরা ঝিমাইবো । এইতো ত্রিপুরার নেক্সট্ জেনারেশানের ভবিষ্যৎ ।”

আঁচলটা আবার সামলালেন মহারাণী, ববছাট চুলটায় একটু আলতো ক'রে হতে বোলালেন, ঠোঁটের ওপর ঠোঁট দিয়ে একটু ভিজিয়ে নিলেন লাল রঙের লিপিস্টিক । তারপর বলতে শুরু করলেন আমাদের দিকে তাকিয়ে, 'গঙ্গানগরে গিয়েছিলাম গতকাল । কইতে লজ্জা হয়, ডাগর ডাগর মাইয়াদের পিঁধনের কাপড় নাই, লজ্জা ঢাকতো পারতাছেনা তারা, শীতের রাতো ঝোঁপের মইধ্যে গাছের পাতা জড়ো কইরা তার ওপর শুইয়া থাকছে গরিব লোকেরা । এই রাজ্যের কংগ্রেস-নেতারা ভাবছেন কিছু তাদের লাইগ্যা ? সমীররঞ্জন বর্মণ কি ভাবেন এইসব ভুখা-নাঙ্গা লোকদের কথা ?'

তাপস বাবু বলে ফেললেন মহারাণীর আবেগময় কথাগুলোর মাঝখানে, 'কুমুদবাবুকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের এইসব করুণ দৃশ্য দেখানোর দরকার, উনি লেখক লোক ।'

—'কুমুদ বাবুদের মতো বিদ্বান লোকদের কইতাছি আমি, আপনারা আমাকে কিছু লোক দিন, যারা ছল নয়, খারাপ ধান্দায় আসেনা নিজের স্বার্থের লাইগ্যা, তারা আমার লগে থাইক্যা কাম-কাজ করুক, দেখতো পাইবো মহারাণী একজন খাঁটি লোক, ঠক নয় ।'

এবার জহরবাবুর দিকে একটু কঠিনভাবে তাকিয়ে বললেন- “মহারাজ তোমার এগজিবিশন থাইক্যা [illegible] নিছেন দেখতো, তা আবার পোলাপানের মতো চাইতো হয় না রাজার কাছে, এক্কেবারে পোলাপান আমার এই কালোমাণিক । হ্যাঁ শোনো, আমাকে কিছু ভালো লোক দাও, জহর, তারা

ইন্দিরা কংগ্রেস করবো আমার লগে। আমি ফিইরা আমু ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে - তখন আমার লোক চাই কিন্তু। ঠিক আছে চৌধুরীবাবু, আবার দেখা হবে। আপনাদের মহারাজ একটা এগজিবিশন কোরবেন বলে বলতাছেন, আপনাকে সাহায্য কোরতো হইবো কিন্তু।"

মহারাণীকে আগরতলার ঠাকুর-কর্তা পরিবারের আদব-কায়দা অনুযায়ী আনত মস্তক করে শুভরাত্রি জানিয়ে মুসোলিনীর সেই ভয়ঙ্কর মূর্তিটার পাশ দিয়ে একতলায় গেটের কাছে চলে এলাম। তাপসবাবু গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন আমাকে। একান্তে পেয়ে তাপসবাবু জিজ্ঞেস করলাম - 'আচ্ছা তাপসবাবু, মহারাণী তো অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে আছেন তাই না? তা, অর্জুন সিং-তেওয়ারীদের অবস্থা খুব ভালো কি? মহারাণী বেশ রিস্ক নিচ্ছেন বোধ হয়, তাই না কি?'

— 'দেখুন মহারাণী যখন একবার একটা পজিশন নিয়ে ফেলেছেন, তখন আর তিনি সেখান থেকে হঠাৎ করে সরে আসবেন বলে মনে হয় না। দারুণ এক কথার মানুষ মহারাণী। আর, নরসিংহ রাওয়ের অবস্থাও যে খুব ভালো, তাও মনে করার কোনো কারণ নেই, ইলেকশনের আগে পোলারাইজেশানটা কেমন হয়, দেখা যাক।'

তাপস বাবুকেও শুভরাত্রি জানিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে জহরবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম- 'আচ্ছা জহরবাবু, প্রোফেসর লাহিড়ীর ঠিক কোন জায়গাটায় হার্ট এ্যাটাক হয়েছিলো দেখান দেখি।' - চলুন, দেখাচ্ছি বলে, রাজ অন্দরের গেটের পাশে বারান্দার একধারে নিয়ে গিয়ে বললেন জহরবাবু- 'ঠিক এই জায়গাটায় ঘটনাটা ঘটেছিলো। বসন্ত চৌধুরী একেবারে বাঁদিকে, তারপরে অধ্যাপক কল্যাণ দাশগুপ্ত, আর তাঁর পাশেই অধ্যাপক লাহিড়ী, টি ভি ক্যামেরার মুখ লাহিড়ী সাহেবের দিক ঘোরাতেই দেখা গেলো তিনি ঘাড় কাত ক'রে চেয়ারের একদিকে হেলে আছেন। মহারাণীও ছিলেন কাছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন দোতলায় ওষুধ আনতে। ফিরে এসে এক ডোজ হোমিওপ্যাথি ওষুধ কোনো মতে অধ্যাপক লাহিড়ীর মুখে পুরে দিতেই একটু চোখ মেলে তাকালেন তিনি, কিন্তু আবার চোখ বুজে গেলো তাঁর।'

রাজ অন্দর থেকে বেরিয়ে রাজবাড়ির উন্মুক্ত চত্বরে পা দিতেই জহরবাবু বললেন,' 'মহারাজ যে তিনটে কয়েন দেখতে নিয়েছেন, তা আর কারোর কাছে নেই, রাজমালায় নাম নেই এমন এক রাজার মুদ্রা এগুলো। কয়েন তিনটিকে প্রাণের থেকে ভালোবাসি আমি, যতক্ষণ না ফেরত পাচ্ছি, টেনশন যাবে না।'

রহস্য করে বললাম আমি — 'রাজার ধন রাজা নিয়েছেন, আপনি তো সংগ্রাহক মাত্র।' — রাজবাড়ির গেট দিয়ে বেরিয়ে রাজকুমারী কমলপ্রভার কিশোরীলাল মন্দিরের পাশ দিয়ে এসে প্রেস ক্লাবের কাছে আসতেই বললাম, 'আমি কাটি জহরবাবু, আপনি ফিরে যান তাড়াতাড়ি। প্রেস ক্লাবে মহারাজ বীরবিক্রম হবেন না কিন্তু, বীর বিক্রম হবার মতো শরীর নেই আপনার; রাজেন্দ্র কীর্তিশালার কীর্তি করতে গিয়ে একজনকে শহীদ করেছেন, নিজে যেন শহীদ হবেন না; আবার রয়েছে কয়েনের টেনশন, বাড়িতে একটু বেশী সময় দিন, না হলে হোম-ফ্রন্টে গণ্ডগোল হয়ে যাবে সব। আচ্ছা ঠিক আছে চলি, শুভরাত্রি।'

প্রেস ক্লাবে পুরাতত্ত্বের মেহের আলী ঢুকে যেতেই আমি ডান দিকে কর্তার বাড়ির মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েদের হোস্টেলের পাশের গলি দিয়ে আলো-আঁধারির ভুতুড়ে নির্জনতা পেরিয়ে নন্দলাল কর্তার বাড়ির সামনের বড়ো রাস্তায় এসে পড়তেই চোখ চলে গেলো আমার কর্তার বাড়ির গ্যালারি ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ-আর্ট গ্যালারির ঘরে। দেখলাম, তখনো আলো জ্বলছে সে- ঘরে; লেখক শিল্পীদের হৃদয় উজাড় করা আড্ডার সরব ধ্বনি আছড়ে পড়ছে রাজপথে। কর্তার গেটের

সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে বললাম, বেড়ে হয়েছে ব্যাপারটা, আর কোন জায়গা না পেয়ে কর্তার কুত্তার ঘরে শিল্পীরা করেছেন আর্ট-গ্যালারি। হাসি পেতেই ফিক ক'রেই হেসে ফেললাম আমি। আসলে বর্তমান রবীন্দ্র স্নেহধন্য বিশ্রুত শিল্পীর নামে আর্ট-গ্যালারির এই ঘরটায় নন্দলাল কর্তা বিলিতি কুকুর পুষতেন। সাত-সাতটা কুকুর, সোজা কথা নয়, প্রতিটি কুকুরের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গা। এখনো কুকুর বাঁধার হুকগুলো দেখলে কর্তার কুত্তা পোষার কথা মনে করিয়ে দেয়। কর্তা তো একে ত্রিপুরার রাজপুত্র, তারপর চাকুরি জীবনে ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের সেক্রেটারি। রাজ্য চলে গেলেও কর্তার দাপট ছিলো সাংঘাতিক, যাকে বলে মেজাজী কর্তা। এমনিতেই 'কর্তার মেজাজ' বলে একটা কথাই চাউর আছে আগরতলায়। তা কুকুরগুলো পেয়েছিলো প্রভুর স্বভাব, ভারী মেজাজী; লোকে বলতো কর্তার কুত্তা। কুত্তা সামাল দিয়ে তবেই কর্তার কাছে যেতে হতো। এহেন বাঘা বাঘা কুকুরগুলোকে একদিন বেশ সকালে কেঁউ কেঁউ করতে করতে পড়ি কি মরি ক'রে কর্তার অন্দর মহলে ছুটে গিয়ে বাথরুমে, ঘাটের তলায়, লাকড়ির ঘরে পালাতে দেখে কর্তা সমেত বাড়ি সুদ্ধ লোক তো অবাক। ব্যাপার কি? কর্তার রয়েল বেঙ্গল টাইগারগুলো পালাচ্ছেন কেন? কেঁদো বাঘ-টাঘ এসে ঢুকলো নাকি ঝোপ ঝাড়ে ঘেরা কর্তার ফুলের বাগানে? তখনো বেশ ভোর ভোর। কুকুরগুলো তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে ভোরবেলায় কর্তার ফুল বাগানে তাদের প্রাতঃক্রিয়া সারছিলো দলেপালে। এমন সময় কর্তার বাড়ির ফটক দিয়ে ঢুকে পড়লো অদ্ভুত পোষাক পরা তাগড়াই তাগড়াই পাঁচ-ছ'জন জোয়ান। কর্তার সাত কুত্তা তাদের দেখামাত্র ভয়ে কেঁউ কেঁউ করতে করতে দিলো ছুট একেবারে অন্দরমহলে। কুকুরদের এমন কাহিল অবস্থার কারণ জানতে কর্তা এলেন তাঁর দরবার কক্ষের বাইরে। বাইরে আসতেই জাঁদরেল কর্তার চোখ উঠলো কপালে। কয়েকজন নাগা তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে দরবার কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে। তাদের দেখে কর্তা চিৎকার করে বলে উঠলেন—"বুজছি বুজছি, কুত্তাগুলা পালাইলা ক্যান, এখন বুজছি। নাগাদের গায়ের গন্ধ পাইয়াই কুত্তাগুলো পালাইছে।" আজ সেই কর্তাও নেই, কুত্তাও নেই, রয়েছে কর্তা ও কর্তাব কুত্তার স্মৃতি। নন্দলাল কর্তার বাড়ি ছাড়িয়ে ডাক্তার এম এল সাহার নার্সিং হোমের পাশ দিয়ে মোহন কর্তার বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বর্তমান মহারাণী শ্রীমতী বিভুকুমারী দেবীর বাঙলা বলার কথা ভাবছিলাম। তাঁর বাঙলা কথায় কলকাতার চলিত বাঙলা, শিলঙের সিলেটী বাঙলা ও আগরতলার রাজ অন্দরের বিশেষ ধরনের বাঙলার মিশ্রণ ঘটেছে। আর বাঙলা উচ্চারণে রয়েছে হিন্দি উচ্চারণের প্রভাব। কিন্তু শুনতে বেশ ভালোই লাগে মহারাণীর পাঁচমিশালী বাঙলা। আগরতলার রাজ অন্দর ও ঠাকুর কর্তা পরিবারের লোকেরা যেভাবে বাঙলা বলেন তা সত্যিই অদ্ভুত। এনিয়ে গবেষণা করা যায়, এইসব ভাবতে ভাবতে রমণী ক্যাপ্টেনের বাড়ির সামনে দিয়ে এসে পৌছলাম কর্ণেল চৌমুহনীতে। তখনো দেখি মোঙ্গলীয় সভ্যতার কুপি জ্বেলে মাটিতে বসে শূকরের মাংস বিক্রি করছেন একজন ট্রাইবেল দোকানী। এবার রাস্তাটা পেরিয়ে কর্ণেল বাড়ির হাসি রায়ের আলেখ বাবার মন্দির ডাইনে রেখে সোজা চললাম দিলীপ দেবরায়ের বাড়ি- আমার ডেরায়। রাত সাড়ে ন'টায় বাসায় ফিরেই স্ত্রীকে বললাম, 'মহারাণী তোমার হাতের গোদক খেতে চেয়েছেন, গ্যাসটা পেয়েই আগে মহারাণীকে গোদক রান্না করে খাইয়ে এসো।'

২৫শে নভেম্বর, ১৯৯৫, শনিবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০২ । অগ্রহায়ণ মাসের আট তারিখে টিমটিমে বৃষ্টির সঙ্গে এমন ঝড়ো হাওয়া অনেকদিন দেখিনি ত্রিপুরায়। বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়া কনকনে ঠাণ্ডাকেও সঙ্গে আনতে ভোলেনি। এমন এক অত্রাযোগের দিনে আমার মতো প্রৌঢ় ব্যক্তির উচিত ছিলো লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা। কিন্তু দায়িত্ব বড়ো বালাই, যেতে হবে বনমালীপুর সি. পি. আই. নেতা অঘোর দেববর্মার বাড়ি; ত্রিপুরার জনশিক্ষা সমিতির ইতিহাস লিখেছেন তিনি, সেই পাণ্ডুলিপি

খানা এনে দিতে হবে 'অক্ষর প্রকাশনী'র শুভব্রত দেব ওরফে রতুর কাছে। অক্ষর প্রকাশনী এবার ত্রিপুরার জনশিক্ষা সমিতির পঞ্চাশতম বর্ষে একটা স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছে জনশিক্ষা আন্দোলনের নেতাদের কাছ থেকে লেখাগুলো সংগ্রহ করার। ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের অন্তিম লগ্নে ট্রাইবেলদের মধ্যে গড়ে ওঠা এই জনশিক্ষা আন্দোলনই ছিলো ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূতিকাগৃহ। আর এই ঐতিহাসিক জনশিক্ষা আন্দোলনের স্থপতিদের পুরোভাগে ছিলেন হেমন্ত দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা, সুধন্বা দেববর্মা ও ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব (দেববর্মা)। এই স্থপতি চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম স্থপতি হেমন্ত দেববর্মা প্রয়াত হয়েছেন আশি সালের জাতিদাঙ্গার দু'এক বছর পরেই প্রায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়েই। বেঁচে আছেন ট্রাইবালরা শুধু নাম ধরে যাঁদের ডাকেন, সেই অঘোর, সুধন্বা ও দশরথ। ইতিমধ্যে সুধন্বা দেববর্মা 'আমি রাজনীতিতে কিভাবে জড়িয়ে পড়লাম' শীর্ষক লেখাটা আমার কাছে দিয়ে গেছেন ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপার জন্যে। দর্পণ-সম্পাদক সমীরণ রায়ের কাছে তা দিয়ে এসেছি আমি মাসখানেক আগে। সেই লেখার জনশিক্ষা আন্দোলনের অংশটুকু ছাপা হবে বর্তমান স্মারক গ্রন্থে। আর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের কাছে শুভব্রত দেব নিজেই গেছেন জনশিক্ষা আন্দোলনের ওপর লেখা নিতে। অসুস্থ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মুক্তি পরিষদের ইতিকথা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু নাকি নিতেও বলেছেন শুভব্রত বাবুকে। জনশিক্ষা আন্দোলনের আরেক পুরোধা ডাঃ নীলমণি দেববর্মার কাছে শুভব্রত দেবকে নিয়ে আমি গেছি স্মারক গ্রন্থের লেখা সংগ্রহ করতে। ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগের সেক্রেটারি প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তকে একটা লেখা লিখতে অনুরোধ করা হয়েছিলো। 'ত্রিপুরায় জনশিক্ষা আন্দোলনের তাৎপর্য' শীর্ষক একটা নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ ইতিমধ্যেই তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনেছি আমি। ত্রিপুরার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি কমরেড সরোজ চন্দের সঙ্গেও কথা হয়েছে এ ব্যাপারে। তিনিও জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্যের ওপর একটা লেখা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। ক'দিন আগে শুভব্রত দেব তাঁর স্কুটারে চাপিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সরোজদার জয়নগরের বাড়িতে। গিয়ে দেখি সরোজদা তাঁর ডান হাত নাড়তে পারছেন না। ঘাড়েও স্পণ্ডিলাইটিসের ব্যথা। ঠিক হলো, তাঁর কাছ থেকে শ্রুতি লিখন নিতে হবে। আর এই শ্রুতি লিখন নিতে শুভাশিস তলাপাত্র বা পুরুষোত্তম রায় বর্মণকে পেলে সব থেকে ভালো হয়— এমন আলোচনাও হলো সরোজদার সঙ্গে। ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের ওপর আরো কিছু লেখা সংগ্রহ করা হচ্ছে একটু অন্যভাবে। জনশিক্ষা আন্দোলনের নেপথ্য-নায়ক প্রয়াত বীরেন দত্তের পুরনো লেখা থেকে জনশিক্ষা আন্দোলনের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা। জনশিক্ষা আন্দোলনের কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে শিল্পী রবি সেনের কাছে। শুভব্রত দেব আর আমি সেদিন গিয়েছিলাম আগরতলার মধ্যপাড়ায় তাঁর বাড়িতে। তাঁর কাছে রয়েছে ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের অমূল্য সম্পদ - দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় অনুষ্ঠিত জনশিক্ষা সমিতির প্রথম সম্মেলনের ছবি। এই ছবি তুলেছিলেন সেই কবে ১৯৪৫ সালে রবি সেনের পিতৃদেব প্রফুল্ল সেন। জনশিক্ষা আন্দোলনের স্মারক গ্রন্থে এই দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক ছবি দিতে রাজী হয়েছেন তিনি। জনশিক্ষা আন্দোলনের ওপর একটা লেখাও চেয়ে এসেছি তাঁর কাছে। তিনি কথা দিয়েছেন, সদ্য প্রয়াত শিল্পী মহেন্দ্র দেববর্মার ওপর লেখাটা শেষ করেই জনশিক্ষা আন্দোলনের ওপর আরো কিছু লেখা সংগ্রহ করে দেবেন মহেন্দ্র দেববর্মার ইয়াপ্রি পত্রিকা থেকে। ককবরক ও বাঙলা ভাষায় লেখা এই দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক পত্রিকায় মহেন্দ্রবাবু হেমন্ত দেববর্মা মারা গেলে 'হেমন্ত স্মৃতি সংখ্যা' বের করেছিলেন। ইয়াপ্রি পত্রিকার বাঁধানো ভল্যুম সেই স্মৃতি সংখ্যা থেকে ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের ওপর কিছু আকর্ষণীয় লেখা পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে। কিছু তথ্য পাওয়া যাবে পল্টুবাবুর রমাপ্রসাদ

গ্রন্থাগারে। সেখানেও যেতে হবে।

এই কনকনে ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির মধ্যে আমার গৃহিণী শ্রীমতী ফুলকুমারী দেববর্মা তাঁর 'পূর্বাশা' অফিসে যাবার পথে অঘোর দেববর্মার দোতলা বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেলেন আমাকে। ভেবেছিলাম, আশি ছুঁই ছুঁই অঘোর বাবু ত্রিপুরার প্রথম ট্রাইবাল কমিউনিস্ট, যাঁকে সি. পি. আই.-এর তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারী পি সি যোশী লালকার্ড দিয়েছিলেন, সেই কমরেড অঘোরবাবুকে এই অত্রাযোগের দিনে বাড়িতে লেপের মধ্যে পাবো। কিন্তু কী তাজ্জব ব্যাপার, এই বাদলা হাওয়ায় গায়ে কাঁটা বেঁধানো শীতের মধ্যে তিনি বেরিয়ে গেছেন। আমার সাড়া পেয়ে অঘোরবাবুর স্ত্রী দুলালী দেবী রান্নাঘর থেকে জোরগলায় বললেন — 'বসুন কুমুদ বাবু, আপনাদের কমরেডতো এই ঠাণ্ডায় বেরিয়ে গেছেন কমরেড দুর্বাজয় রিয়াঙ-এর কোয়ার্টারে। কাগজ পড়তে থাকুন আপনি, চা নিয়ে আসি আমি।'

দোতলার দক্ষিণ খোলা বারান্দায় একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে 'স্যন্দন' পত্রিকা খানা হাতে ক'রে বসে পড়লাম। ভাবলাম, অঘোর বাবু আগামীকালের পার্টির রাজ্য পরিষদ মিটিঙের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করতে গেছেন কমরেড দুর্বাজয়ের (কমরেড দুর্বাজয় রিয়াঙ ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের সি. পি. আই. সদস্য) কোয়ার্টারে। স্যন্দন পত্রিকার মূল খবরগুলোয় চোখ বোলাতেই চা হাতে এসে গেলেন মাদাম চিয়াঙ চিঙ মানে কমরেড অঘোরবাবুর স্ত্রী। কমরেড মাও সে তুঙের স্ত্রী মাদাম চিয়াঙ চিঙের চেহারার সঙ্গে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য চোখে ধরা পড়ে আমার অঘোর বাবুর স্ত্রী দুলালী দেববর্মার। দু'জনেই মোঙ্গলিনী। তাই আমি দুলালী দেবীকে মাঝেমধ্যে রহস্য ক'রে মাদাম চিয়াঙ চিঙ বলে ডাকি। মাদাম চিয়াঙ চিঙকে চাক্ষুষ দেখিনি আমি কোনোদিন। কিন্তু কেন জানি আমার মনে হয়, মাদাম চিয়াঙ চিঙের চেয়ে আমাদের আগরতলার মাদাম চিয়াঙ চিঙের গায়ের রঙ আরো বেশী পরিষ্কার, কলকাতার যে কোনো চীনা মেয়ের গায়ের রঙ হার মানবে আমার এই মাদাম চিয়াঙ চিঙের রঙের কাছে। আমার দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে নিজের চা নিয়ে বসে পড়লেন ত্রিপুরী পাছড়াপরা মাদাম আমার সামনে আরেকটা বেতের চেয়ারে। এই দারুণ শীতেও বাঙালি মেয়ের মতো এগারো হাতের শাড়ি পরেননি তিনি। বার্মিজ মেয়ের মতো ট্রাইবাল পাছড়া পরনে তাঁর, গায়েও জড়িয়েছেন ত্রিপুরার ট্রাইবাল মেয়েদের নিজেদের তাঁতে বোনা একখানা শাল। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম — 'এবার বলুন মাদাম, আমাদের কমরেডের ফিরতে কত দেরী, এই দুর্যোগের ভেতরই বা বেরিয়েছেন কেন তিনি?'

— 'আপনাদের কমরেডের কথা আর বলবেন না। কত বলি, বেরিয়ো না আর ওই খোঁড়া পা নিয়ে, আমার কথা কী শোনেন আপনাদের কমরেড? কমিউনিস্ট পার্টি! জেনে রাখুন আপনি, সি. পি. আই. আর হবে না এ রাজ্যে' সি. পি. এম.-ই এ রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি। সারা জীবন কমিউনিস্ট পার্টি ক'রে কী পেয়েছে অঘোর দেববর্মা। অঘোর দেববর্মা কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙেনি, যারা ভেঙেছে, তারা আজ রাজা, তারা মন্ত্রী হয়, গাড়ি হাঁকায়। আর, যে লোকটা কমিউনিস্ট পার্টি ধরে রাখলো, তার কোনো দাম নেই আজ। রেখে দিন আপনাদের কমিউনিস্ট পার্টি। এই দেখুন না, বৃষ্টি পড়ছে, এই কনকনে ঠাণ্ডার দিনে লোকটা বেরিয়ে গেছে খোঁড়া পা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে আলোচনা করতে । রিক্সা থেকে পড়ে মরবে তো লোকটা। আপনাদের কাছে না হয় লোকটার দাম নেই, আমার কাছে তো আছে।'

—'কমিউনিস্ট পার্টির ওপর বিরক্ত হয়েছেন মনে হচ্ছে, মাদাম ?'

—' বিরক্ত হবো না কী হবো, কমিউনিস্ট পার্টি ক'রে কী হয়েছে আমাদের, কী পেলাম আমরা?'

—' কমিউনিস্ট পার্টি ক'রে এই তো দিব্যি দোতলা দালান করেছেন, ছেলে-পিলে উচ্চ শিক্ষিত

করেছেন, আপনার বড়ো ছেলে ডাক্তার, মেজো ছেলে সাব জেলার, ছোট ছেলে ব্যাঙ্কের মস্ত বড়ো অফিসার, মেয়ে দু'জনেই গ্রাজুয়েট, কমিউনিস্ট পার্টি ক'রে কিঁ ক্ষতিটাই হলো আপনাদের, বলুন না মাদাম ?'

— 'অঘোর দেববর্মা দোতলা বাড়ি করেছে, এই তো আপনাদের প্রচার। কেন, বলি, দশরথ (দশরথ দেববর্মা সি. পি. আই. (এম) পার্টির নেতা এবং ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী) কি দোতলা বাড়ি করেনি? সুধন্বার (সুধন্বা দেববর্মা সি. পি. আই. (এম) পার্টির নেতা ও বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও মন্ত্রী) জম্পুইজলায় কি দালান বাড়ি নেই? হেমন্তর (হেমন্ত দেববর্মা সি. পি. আই. এম. পার্টির প্রাক্তন এম. এল. এ) কি দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় বিরাট লেক নেই? যতো দোষ নন্দ ঘোষ, অঘোর দেববর্মা দোতলা দালান তুলেছে।'

'তবে মাদাম, এটা ঠিক, কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে অঘোর দেববর্মার এই দোতলা দালানটাই প্রথম।

— 'মানলাম আপনার কথা, কুমুদবাবু, কিন্তু আপনি যখন ভাষার কাজে প্রথম আসেন, তখন নিশ্চয়ই আমাদের খড়ের ছাউনি দেয়া মাটির ঘরখানা দেখেছেন। আমার বেশ মনে আছে, শ্যামসুন্দরবাবু (শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য আমার বন্ধু। আমরা দু'জনে ত্রিপুরায় ককবরক ভাষা গবেষণার কাজে এক সঙ্গে এসেছিলাম ১৯৬৭ সালে) আর আপনাকে নিজের হাতে আমি খাইয়েছি ওই মাটির ঘরে। আপনাদের কমরেডের সঙ্গে বিয়ের পরে ওই মাটির ঘরে বছরের পর বছর থেকেছি আমি পাঁচ-পাঁচটা বাচ্চা নিয়ে। অথচ আমার মা রাজপরিবারের মেয়ে - কুমারী। বাবার অমতে বিয়ে করি আণ্ডার গ্রাউণ্ডে যাওয়া এক কমিউনিস্টকে। দুঃখ জীবনে কম পাইনি আমি, কুমুদবাবু, আপনাদের কমরেডকে বিয়ে ক'রে। বৌ-বাচ্চা কাচ্চা ফেলে রেখে বার বার জেলে গেছে লোকটা। বাপের বাড়ি না থাকলে না খেয়েই মরে যেতাম আমরা। আপনাদের কমরেডের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছিলো সরকার। তার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিলো। আপনারা তো এখন বাবু কমিউনিস্ট, রাজা-উজির মারছেন সবসময়, করতেন আমাদের মতো সেক্রিফাইস, তাহলে বুঝতেন কমিউনিস্ট অঘোর দেববর্মাকে, দশরথও স্বীকার করেছে সে কথা, কী কষ্টই না করেছে লোকটা, আমাদেরও কষ্টের সীমা ছিলো না একদিন।'

— 'আচ্ছা মাদাম, কমরেড যখন জেলে জেলে থাকতেন, তখন কি আপনার শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছু ধান-চাল আসতো না?'

— 'আপনি তো জানেন, আমার শ্বশুরবাড়ি, মানে অঘোর দেববর্মার গ্রাম লাটিয়াছড়া কোথায় ?' সেখানে যাওয়া কত কঠিন, চড়িলাম রিজার্ভ ফরেস্টের পাশ দিয়ে কত বাঘ-ভাল্লুকের ভয়, তবু গেছি আমি সেখানে দু'মুঠো ধানের জন্যে, বাল-বাচ্চা বাঁচাতে হবে তো।

— 'জানেন মাদাম, ভাষার কাজে এসে একদিন অঘোরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তাঁর লাটিয়াছড়া গ্রামে। গিয়ে আমি তো অবাক। দেখি ধান ক্ষেতে হাঁটু পর্যন্ত কাদায় নেমে উথলা (প্যাক কাদাযুক্ত মাটি) কাটছেন কোদাল দিয়ে। দেখে তো একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম আমি। পার্টির এতো বড়ো নেতা, তার ওপর এম. এল এ, সেই ব্যক্তি কিনা এক হাঁটু কাদা মেখে ক্ষেতে মাটি কোপাচ্ছেন!'

—'আপনাদের অঘোর দেববর্মা সব পারে। বাল্যকালে গোরু-মহিষ চরাতো চড়িলামের বাঘ-ভাল্লুকের জঙ্গলে। লাঙল চষতেও পারে লোকটা। ধান বোনা আর ধান কাটা তো তার কাছে কিছুই নয়। এখন কুড়ুল দিয়ে লাকড়িও (জ্বালানী কাঠ) ফেড়ে দেয় মাঝেমধ্যে।'

— 'তা মাদাম, এমন ধরনের অজ ট্রাইবাল গ্রামের লোক লেখাপড়াই বা শিখলেন কেমন করে,

আর কমিউনিস্ট নেতা হয়েই বা আপনার মতো এক রাজকুমারীর মেয়েকেই বা বিয়ে করলেন কী করে?'

—'সে অনেক কথা কুমুদবাবু। আপনাদের নেতা ছেলেবেলায় জঙ্গলে গোরু-মহিষ চরাক আর যাই করুক, লেখাপড়ার প্রতি ছিলো লোকটার অদ্ভুত টান। পাহাড়ে তখন আর ইসকুল কোথায় বলুন? শেষে তার মায়ের ছাগল তিন টাকায় বিক্রি করে দিয়ে লোকটা প্রায় পালিয়ে আসে বাবাকে না বলে আগরতলা শহরে তার জ্ঞাতি-ভাই (দাদা) ভিক্ষু ঠাকেরর বাবা হৃদয়রঞ্জন ঠাকুরের বাড়ি। হৃদয়রঞ্জন ঠাকুরের বাবা রাধামোহন ঠাকুর, যিনি ককবরক ভাষায় প্রথম বই লিখে গেছেন, তিনি হচ্ছেন আপনাদের অঘোরবাবুর ঠাকুরদাদার আপন বড়ো ভাই।'

— 'তাহলে মাদাম, আপনি বলছেন, অঘোরবাবু লেখাপড়া শিখেঁছেন তাঁর দাদা ভিক্ষু ঠাকুরের বাড়ি থেকে?'

— 'ভিক্ষু ঠাকুর, যার ভালোনাম হৃষিকেশ ঠাকুর, তাঁর বাবা হৃদয়রঞ্জন ঠাকুর ছিলেন অঘোর দেববর্মার সম্পর্কে জ্যাঠামশায়। ওই জ্যাঠাই তাঁকে লেখাপড়া শেখান।'

— 'শুনেছি, অঘোরবাবু নাকি উমাকান্ত ইসকুলের ট্রাইবেল বোর্ডিঙে পড়াশুনা করতেন?'

— 'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন আপনি। ক্লাস নাইন-টেনে যখন ওঠেন আপনাদের অঘোরবাবু, তখন তাঁর জ্যাঠাই পাঠিয়েছেন তিপ্রা বোর্ডিঙে। ওখানে পাহাড়ের ছেলেদের সঙ্গে দলে-পালে থাকবে, ককবরক ভাষায় কথা বলবে, আমোদ-ফূর্তি করবে, মনটাও ভালো থাকবে।'

—'তাহলে বীরেন দত্ত গিয়ে ওই তিপ্রা বোর্ডিঙে গিয়ে অঘোরবাবুকে পাকড়াও করে তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টির কানমন্ত্র দিতে থাকেন?'

— 'আর বলবেন না আপনি বীরেন দত্তর কথা। আপনি তো আমাদের ককবরক ভাষার গবেষক, 'মুইছিলি' শব্দের অর্থটা জানেন তো?'

— 'হ্যাঁ, ককবরকের অভিধান যখন সঙ্কলন করি তখন এই অদ্ভুত শব্দটা পেয়েছিলাম আমি, শব্দটার অর্থ যোগেন্দ্র দেববর্মা বলেছিলেন 'মানুষ চোর'।'

— 'যোগেন্দ্র দেববর্মা ঠিকই বলেছেন 'মুইছিলি' শব্দের অর্থ। আর এই মানুষ চোরেরা ছেলে-পিলে চুরি করে এনে রাজ বাড়িতে বিক্রি করতো, আর রাজারা দিতেন তাদেরকে বলি, যাকে বলে নর বলি।'

—' বলেন কী মাদাম, আগে ত্রিপুরার রাজ বাড়িতে নর বলি হতো?'

— 'সে যে কোনকালে হতো তা জানিনে। তবে আমাদের রাজবংশ তো খুব পুরনো, সেইসব পুরনো রাজাদের সময় রাজবাড়ির কালিবাড়িতে নর বলি হতো।'

— 'আচ্ছা মাদাম, তা আপনি কমিউনিস্ট নেতা বীরেন দত্তর প্রসঙ্গে তুলতেই 'মুইছিলি' কথা আনলেন কেন, ঠিক বুঝতে পারছিনে।'

— 'আরে বুঝলেন না আপনি? বীরেন দত্ত ছিলো আগরতলার মুইছিলি, মানে ছেলেচোর, যাকে ছেলেধরা বলে। ভদ্রলোকের কাজ ছিলো তিপ্রা বোর্ডিঙের ভালো ভালো ছাত্র ধরে নিয়ে কানে কমিউনিস্ট মন্ত্র দেয়া। আর অঘোর দেববর্মাকে তো এইভাবে চুরি করে এনে কানে কমিউনিস্ট ফুসমন্ত্র দিয়ে ঘর থেকে বের করেন তিনি।'

মাদামের কথা শুনে হেসে ফেললাম আমি। বললাম, 'তাহলে বলছেন বীরেন দত্ত ছেলেধরা ছিলেন?'

— 'ছেলেধরাই তো। অঘোর দেববর্মার কানে ফুসমন্ত্র দিয়ে ঘর থেকে বের করে না নিয়ে গেলে

লোকটা তো বি. এ.- এম. এ. পাশ করতে পারতো। ছাত্র হিসেবে তো সে খুব ভালো ছিলো। ডাঃ নীলমণি দেববর্মা, দেবু সেনের ছোটভাই শিবু বা কালা মিঞা মাস্টারকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন সে কথা। শিবু আর কালা মিঞা তো তার ক্লাসমেট।'

— 'সে যাই বলুন মাদাম চিয়াঙ চিঙ, নাই বা করলেন অঘোরবাবু বি. এ.-এম. এ. পাশ, বীরেন দত্তর হাতে কমিউনিজমের হাতে খড়ি দিয়ে ত্রিপুরার ট্রাইবালদের মধ্যে প্রথম তো তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছেন, উপজাতিদের মধ্যে জনশিক্ষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন সুধন্বা, দশরথ আর কমরেড হেমন্ত দেববর্মার সঙ্গে। কাজেই বীরেন দত্ত তাঁকে ঘর থেকে বের করে কোনো অন্যায় করেননি।'

—'বীরেন দত্ত তাকে ঘর থেকে বের করে কোনো অন্যায় করেছেন তা বোলছি না, বরঞ্চ একটা ট্রাইবাল ছেলেকে তিনি সারা দুনিয়াটা দেখার চোখ খুলে দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী জানেন, সি. পি. আই. পার্টি ভাঙার পর্বে সেই অঘোর দেববর্মা হয়ে গেলো তাঁর চোখের বিষ। বীরেন দত্ত দশরথরা তো করলো নতুন পার্টি। আর অঘোর দেববর্মা তো রয়ে গেলো সেই সি. পি. আই. পার্টিতে, যে পার্টিতে দত্তই তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। অঘোর দেববর্মা পার্টি পাল্টাতে পারেনি বলে কী এমন চোখের কাঁটা হয়ে গেলো তাঁর?'

—'কিন্তু মাদাম, আপনি বীরেন বাবুকে এতো দুষছেন কেন? পার্টি তো নীতিগতভাবে দু'ভাগ হয়ে গেলো। তাতে তাঁর কোনো হাত ছিলো না।'

— 'আমি আপনাদের পার্টি ভাগাভাগির তত্ত্ব কথা অতো বুঝিনে, আমরা বুঝি দত্তকে। সেই দত্ত কিনা পার্টি ভাগ হবার পর দশরথকে খুশি করতে গিয়ে অঘোর দেববর্মাকে যা-তাই বললেন তাঁর বইয়ে! আমি আপনাদের কমরেডকে বললাম, বীরেন দত্ত তাঁর 'কমিউনিস্ট পার্টির গোড়ার কথা' বইয়ে তোমার কথা তো লেখেননি তেমন করে, সব নাকি করেছে দশরথ, তোমাকে তো সি আই -এর এজেন্ট বানিয়ে ছেড়েছেন বীরেন দত্ত, তুমি এর প্রতিবাদ লেখো। তার পরেই না আপনাদের কমরেড কলম ধরে।'

আমার মাদাম চিয়াঙ চিঙের কিসে যেন পেয়েছে আজ। মনের দরজা একেবারে হাট আগলা করে দিয়েছেন। আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আজ আপনার কী হলো মাদাম, মন উজাড় কোরে বলছেন সব কথা। কমিউনিষ্ট নেতার বৌ, অনেক কথা জানলেও তা আপনি বলতে পারেন না, মুখে একটা আব্রু থাকার দরকার।'

— 'মুখে কীভাবে আব্রু রাখবো বলুন ? আপনাদের কমরেড 'ত্রিপুরার দাঙ্গা' বই লিখে ট্রাইবালদের দুঃখকষ্টের কথা বলেছে, তাতে লোকটা কী ভুল করেছে আমাকে বলুন? আপনারা সি. পি. এম.-এর কথায় বইটা সমালোচনা করলেন আর তার বিরুদ্ধে এই বই লেখার জন্যে নিলেন নিন্দাসূচক প্রস্তাব। জানেন, এখনো কলেজ-ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক গবেষকরা বইখানা খুঁজে খুঁজে নিয়ে যান। আরো দুঃখের কথা কী জানেন, যে বইয়ের ভূমিকা লেখেন দেবু সেন, সেই দেবু সেন কিনা এখন অঘোর দেববর্মার বিরুদ্ধে ! আপনাদের অঘোর দেববর্মা তো দেবু সেনের শিষ্য । আমাদের বড়ো কাঠের ঘরে দেব বাবু তো পার্টির ক্লাস নিতেন সেই কবে ভারতের স্বাধীনতার আগে । এখন সেই শিষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর শত্রু । এ কেমন কথা বলুন তো ?'

আমি মাদাম চিয়াঙ চিঙের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর পটে আঁকা চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঝরছে । আমারো যেন কী হয়েছিলো আজ । মাত্রাবোধের অভাব দেখা দিয়েছিলো আমারও। আমি মুখ ফসকে বলে ফেললাম, 'আচ্ছা মাদাম, অঘোর বাবুকে তো অনেকে সাম্প্রদায়িক বলে, এর

কারণ কী ?'

আমার কথা শুনে মাদাম একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন । দুর্দমনীয় আবেগে তাঁর বেতের চেয়ারটা আমার সামনে একটু এগিয়ে এনে উত্তেজনায় একেবারে ফেটে পড়লেন—'শুনুন কুমুদ বাবু, অঘোর দেববর্মাকে সাম্প্রদায়িক কারা বলে, সি.পি.এম. এর লোকেরাই তো ? দশরথেরা বলে অঘোর দেববর্মা বাঙালি বিদ্বেষী তাই তো ? কিন্তু দেখুন আপনি, সেই অঘোর দেববর্মার ঘরে দুই বাঙালি জামাই । আমাদের বড়ো মেয়ে অপু বিয়ে করেছিলো নিবিড় চক্রবর্তীকে । সে তো সি.পি.এম পার্টির নামকরা ক্যাডার । অপুর যখন বিয়ে হয়, নিবিড় তখন আগরতলা পুরসভার সি.পি.এম-এর কাউন্সিলার । আর ছোট মেয়ে বুটলি বিয়ে করেছে আগরতলার ছেলে দিলীপ সাহাকে। আমাদের পরিবারে সাম্প্রদায়িকতার সা পর্যন্ত নেই । আমার ছোট বোন যমুনা বাঙালি-স্বামী সমীরবরণ চক্রবর্তীকে নিয়ে দিব্যি ঘরকন্না করছে আমাদের বাড়িতে । আর, আমার মেঝে বোন গীতা তো বিয়ে করে এক বিপ্লব করে ফেলেছে । সে বিয়ে করেছে এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ছেলেকে ।'

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, 'কাশ্মীরী ব্রাহ্মণকে ! আচ্ছা মাদাম, এটা কেমন কোরে ঘটলো ? এতো দেখছি দারুণ ব্যাপার !'

—'শুনুন, তাহলে বলি । আমার মেঝে বোন গীতা বি.এ. পাশ কোরে আগরতলায় হেলথ্ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতে করতে দিল্লী গেলো ট্রেনিংয়ে । সেখানেই পরিচয় হয় সুকুমার মহাজনের সঙ্গে । সুকুমার তখন কাজ করতো দিল্লীর স্টেটস্‌ম্যান কাগজে । তাদের দু'জনের মধ্যে ভাব-ভালোবাসার কথা আপনাদের অঘোর দেববর্মা জেনে ফেললেন । তিনি তখন আপনাদের সি.পি.আই পার্টির ন্যাশন্যাল কাউন্সিলের মেম্বার । শেষে রাজেশ্বর রাও'(রাজেশ্বর রাও ছিলেন তখন সি.পি.আই এর জেনারেল সেক্রেটারী)-এর কাছ থেকে টাকা হাওলাৎ করে আপনাদের অঘোর বাবু তাঁর আদরের শালীর বিয়ে দিলেন । আর এই লোকটাকে কিনা সি.পি.এম-এর লোকেরা বলে বাঙালি বিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক ! আর তার সঙ্গে সুর মেলায় কিনা জুনুদাশ-সুনীল দাশগুপ্ত-প্রশান্ত কপালীরা ! দেবু সেন-কানু সেনও সেই দলে । তাজ্জব ব্যাপার কুমুদ বাবু, তাজ্জব ব্যাপার ।' —বলেই হাসতে লাগলেন তিনি ।

আমি বললাম, 'না মাদাম, সি.পি.এম -এর লোকেরাই শুধু যে বলে তাই নয় । আমি চড়িলাম-বিশ্রামগঞ্জের অনেক রিফিউজি নেতার মুখে এ-কথা শুনেছি ।' এবার একটু উৎফুল্ল হয়ে মাদাম চিয়াঙ চিঙ বললেন, 'বুঝেছি আপনার কথা কুমুদ বাবু । এরও একটা ইতিহাস আছে, আমি সব বলবো । বসুন আপনি, আপনার জন্যে আরেক কাপ চা কোরে নিয়ে আসি, ঠান্ডায় তো জমে যাচ্ছেন, গরম চা খেতে খেতে শুনবেন সে-সব কথা ।'

মাদাম চিয়াঙ চিঙ চলে যেতেই ভাবছিলাম আগরতলার মোঙ্গলপ্রজাতির কর্তা-ঠাকুর লোকের সুসংস্কৃতির ঐতিহ্যের কথা । এঁদের রাজাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্কের কথা । ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তো উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন আগরতলা এই ঠাকুর-কর্তার লোকদের। তিনি তাঁর 'কিরাত-জন-কৃতি' বইয়ে আগরতলার এই মঙ্গল প্রজাতীয় ঠাকুর-কর্তা লোকের সংস্কৃতিকে ভারতবর্ষের অন্যান্য অগ্রগামী জাতিগোষ্ঠীর উচ্চকোটি সমাজের সংস্কৃতির সমকক্ষ বলে অভিহিত করেছেন । আমার মনে হয়, সুনীতিবাবু যদি ত্রিপুরার পাহাড়ে বসবাসকারী ককবরক ভাষাভাষী সমাজকে নিজের চোখে দেখার সুযোগ পেতেন, তাহলে ওই একই কথা বলতেন । পাহাড়ের সাধারণ ককবরক ভাষী উপজাতীয় পরিবার থেকে এসে আঘোর দেববর্মার ঠাকুর দাদার বড়ো ভাই রাধামোহন ঠাকুর ত্রিপুরার প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন । তাঁর পাঁচ ছেলেই ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত । এক ছেলে পিয়ারী

মোহন দেববর্মা গত শতকের প্রথম ভাগে হাওড়ার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের কিউরেটর হয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই এই পদ অলঙ্কৃত করছিলেন । রাধামোহন ঠাকুরের আরেক ছেলে রেবতী ঠাকুর । তাঁর পৌত্রী অধ্যাপিকা করবী দেববর্মণ আগরতলা সরকারি মহিলা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, সুকবিও তিনি । আঘোর বাবুর জ্যাঠ্যামশায় হৃদয়রঞ্জন ঠাকুরের ছেলে ভিক্ষু ঠাকুর তো ছিলেন ত্রিপুরার পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত । আমার মন চলে গিয়ে ছিলো আরেকটু দূরে—ত্রিপুরার রাজ পরিবারে । মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্যের কন্যা অনঙ্গমোহিনী দেবী ছিলেন সুকবি । বাঙলা ভাষায় কবিতা লিখতেন তিনি । তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী । ত্রিপুরার আর এক রাজ কুমার তো বিশ্ববন্দিত গায়ক কুমার শচীন দেববর্মণ এস.ডি.দেববর্মণ নামে যিনি বাইরের দুনিয়ায় সমধিক পরিচিত । মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের ছোট ভাই ব্রজেন্দ্র কিশোর (লালু কর্ত্তা) তো ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য । রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের সাথী করেছিলেন । প্যারিসে তোলা একটা ছবিতে রবীন্দ্রনাথ-রোমারোলা-ব্রজেন্দ্র কিশোরের ছবি আছে । রবীন্দ্র নাথের আর এক ভাব শিষ্য হলেন শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা রাজপ্রসাদ সংলগ্ন উজির বাড়ির মানুষ । ত্রিপুরার ককবরক ভাষী সমাজেব এই সব মণিমাণিক্য আজ বৃহত্তর ভারতসংস্কৃতির অঙ্গ । কিন্তু আজ আর ত্রিপুরার রাজাও নেই, রাজ্যও নেই । ত্রিপুরার উপজাতিরা আজ সংখ্যালঘু, তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে তাঁদের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে, তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'দিকই আছে । সেই নেতিবাচক দিকের পাল্লা আজ ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে । ত্রিপুরার পাহাড়ে-সমতলে উদ্বাস্তু আর উদ্বাস্তু । প্রচিন উপজাতিদের পাশাপাশি অবস্থান করছেন নবাগত উদ্বাস্তু বাঙালীরা । কিন্তু হৃদয়ের বন্ধন এই দু'জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে তেমনভাবে দানা বাঁধছেনা । এর কারণ কি ? উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বাসের বাতাবরণে ফাটল ধবে চলেছে প্রতিদিন । হৃদয়ের এই ফাটল বন্ধ করা যাবে কী করে?

এমন সময় মাদাম চিয়াঙ চিঙ আমাব সামনে ট্রেতে করে ধোঁয়া ওড়া দু'কাপ চা আনতেই আমার চিন্তার জগতে ফাটল্ ধরলো । আমাকে খানিকটা আনমনা দেখে স্মিত হাসি হেসে বললেন, 'কী ভাবছিলেন অতো আনমনা হয়ে ? এই নিন গরম গরম চা খান, তারপর বলছি রিফুজি নেতারা কেন অঘোর দেববর্মাকে সাম্প্রদায়িক বলে ।'

—'না মাদাম, ভাবছিলাম, ত্রিপুরার উপজাতি আর উদ্বাস্তুদের ভেতর যে বিশ্বাসের বাতাববণ এতো দিন ছিলো, তাতে এখন ফাটল ধরছে কেন ?'

—'এখন শুনুন আমার কথা । আমার কথার ভেতরেই রয়েছে আপনার প্রশ্নের উত্তর । আমাদের এই স্বাধীন ত্রিপুরা যেদিন বৃহত্তর ভারতবর্ষে যোগ দিলো, তখন থেকেই এই ছোট্ট পাহাড়ী রাজ্যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আসতে শুরু করলো । এতো রিফুজির এই ছোট্ট রাজ্যে পুনর্বাসন কোথায় হবে ? তারা প্রথমে থাকলো রিফুজিক্যাম্পে । তারপর সরকার তাদেরকে ক্যাম্প থেকে পুনর্বাসন দিতে থকলো সড়কের ধারে ধারে । কিন্তু যেদিন থেকে সরকার পাহাড়ের ভেতর উপজাতিদের গ্রামের কাছে তাদের জুমের জায়গায়, ছন-বাঁশ-লাকড়ি সংগ্রহ করবার বাড়ির কাছের জঙ্গলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিতে শুরু করলো, তখনই গন্ডগোল হলো শুরু । পাহাড়ের উপজাতিরা তাদের গ্রামের কাছে, ঘরের আশেপাশে অজানা, অচেনা ভিনদেশী লোকদের পুনর্বাসন মেনে নিতে পারেনি । বিশেষ করে আপত্তি আসতে থাকলো উপজাতি মেয়েদের কাছ থেকে । তাদের নিত্য দিনকার বন্য আলু, শাক-সব্জি সংগ্রহ করবার জায়গায় যদি ভিন্‌দেশের লোকেরা এসে বসতি স্থাপন করে, তাহলে তাদের হবে সব থেকে অসুবিধে । বাড়ির পাশের জঙ্গলে প্রতি দিনকার যাওয়ায় বাধা পড়বে তো । বুঝলেন তো কুমুদবাবু, জঙ্গল ছাড়া আমাদের পাহাড়ের মেয়েরা তো থাকতে পারেনা । আর, তারা তো একটু বে-আব্রু থাকে,

সে তো আপনি জানেন, আপনিও তো আমাদের পাহাড়ের ট্রাইবাল পরিবারের জামাই, আপনাকে আর তো কিছু বলতে হবেনা । তা চড়িলাম-বিশ্রামগঞ্জের পাহাড়ের ভেতর ট্রাইবাল গ্রামের পাশে সরকার খাস জমির ওপর যখন পুনর্বাসন দিতে চেষ্টা করলো উদ্বাস্তুদের, তখন আপনাদের অঘোর দেববর্মা ওই এলাকার উপজাতিদের হয়ে সরকারের এই পুনর্বাসনের কাজে বাধা দিলেন । পার্টির ভেতরেও উপজাতি এলাকায় উপজাতি পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনা হয় । অঘোর দেববর্মা এই পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সাফ কথা জানিয়ে দেন । তাঁর কথা ছিলো, একেবারে পাহাড়ের ভেতরে উপজাতিদের হাঁড়ি-হেঁসেলের কাছে উপজাতি পুনর্বাসন দিলে ভবিষ্যতে উপজাতি উদ্বাস্তুর মধ্যে বিরোধ দেখা দেবে । অগ্রসর বাঙালীরা অনগ্রসর উপজাতিদের জায়গা জমি আস্তে আস্তে দখল করে নেবে । শেষে অশান্তি দেখা দেবে এই দু' জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে । কাজেই এই পুনর্বাসন আগামীদিনে আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে । এখন বুঝতে পারছেন তো অঘোর দেববর্মা কেন সাম্প্রদায়িক ? এখন কী হোচ্ছে ? পাহাড়ের ভেতর উদ্বাস্তুরা শান্তিতে থাকতে পারছে ? অঘোর দেববর্মার আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত ফলে গেলো, বুঝলেন ?'

এই পর্যন্ত বলে মাদাম চিয়াঙ চিঙ একটু থামলেন। চোখে-মুখে কেমন যেন আত্মতৃপ্তির ভাব। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, বলুন, 'আর কিছু বলার আছে আপনার'?'

আমি সবিনয়ে বললাম, 'মাদাম, আমি তো এতো কথা জানিনে, তবে রিফিউজি পুনর্বাসন একেবারে পাহাড়ের ভেতরে নিয়ে যে কবা সরকারের উচিত হয়নি, তা এখন বুঝতে পারছি।'

— 'শুনুন কুমুদবাবু, অঘোর দেববর্মার ওপর কম অবিচার হয়নি সেদিন। বিশ্রামগঞ্জ-চড়িলামের ট্রাইবেল গ্রামের কাছে পুনর্বাসনের কাজে বাধা দেয়ায় তাকে আপনাদের পার্টি কী শাস্তি দিয়েছিলো জানেন'?'

— 'মাদাম, এসব কথা তো আমার জানার কথা নয়, আমি তখনতো ত্রিপুরায় আসিনি। কাজেই, আমি কী কোরে বলবো ?'

— 'অঘোর দেববর্মাকে পার্টি সাব্রুমে নির্বাসনে পাঠালো। সদরে সে আর পার্টি করতে পারবে না। এইভাবে লোকটাকে শাস্তি দিলো পার্টি। কিন্তু সব থেকে মজার কথা কি জানেন, অঘোর দেববর্মার দৃষ্টিভঙ্গিকে আপনাদের পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী অজয় ঘোষ পর্যন্ত সমর্থন করেছিলেন।'

—'কমরেড অজয় ঘোষ সমর্থন করেছিলেন আপনি বলছেন ! আমার গলায় রীতিমতো বিস্ময়ের সুর।'

—' কেন, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তা হলে ঘটনাটা আমি বলি, শুনুন। সালটা ১৯৫৭ই হবে। ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ তখন সি. পি. আই -এর মুখ্যমন্ত্রী কেরালার। তখন কমরেড অজয় ঘোষ দিল্লী থেকে একদিন আগরতলায় এলেন ত্রিপুরায় রিফুইজি পুনর্বাসন নিয়ে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করতে। মিটিঙে আপনাদের কমরেড অঘোর দেববর্মাও ছিলেন। কিন্তু দুপুরের দিকে আপনাদের কমরেড একেবারে গোমড়া মুখ নিয়ে ফিরলেন বাড়ি। তাঁর সমস্ত চোখেমুখে বিষাদের ছায়া। — 'কী হয়েছে তোমার, খুব উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে।'

— 'কী আর হবে, দশরথ-নৃপেন চক্রবর্তীর জন্যে সব গণ্ডগোল হয়ে গেলো। হেরে গেলাম আমি।'

— 'খুলে বলোনা ব্যাপারটা। আমার গলায় উৎকণ্ঠার সুর।'

—' কমরেড অজয় ঘোষ পার্টি মিটিঙে বললেন, 'ত্রিপুরায় লক্ষ লক্ষ রিফুজি ঢুকছে। ইতিমধ্যে এখানকার উপজাতিরা সংখ্যালঘু হয়ে গেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ

পঞ্চের ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে পার্লামেন্টে প্রদত্ত রিপোর্ট আপনারা শুনেছেন। রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হয়েছে ত্রিপুরা অল রেডি স্যাচুরেটেড পয়েন্টে চলে গেছে। এই রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো খুব দুর্বল, আর এখানে রিফুইজি ঢুকতে দেয়া উচিত হবে না। এই যে উপজাতিরা মাইনরিটি হয়ে গেলো এই রাজ্যে, তার জন্যে এখানকার কমিউনিস্ট পার্টিকে একদিন কৈফিয়ত দিতে হবে। তার কারণ তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টিকেই আঁকড়ে ধরে আছেন। এই ব্যাপারটা আপনাদের গভীরভাবে ভেবে দেখার দরকার।' তার উত্তরে নৃপেন চক্রবর্তী কি বললেন জানো?

— 'কি বললেন?'

— 'বললেন, কমরেড ঘোষ, আপনি জানেন কি বোম্বেতে একটা কারখানায় দু'লক্ষ শ্রমিক কাজ করে ? আর ত্রিপুরা একটা রাজ্য। এখানে কয়েক লক্ষ রিফুজির পুনর্বাসন দিলে ক্ষতি কি?'

— 'অজয় ঘোষ তখন কী বললেন?'

— 'কমরেড ঘোষ বিরক্ত হয়ে বোললেন, কমরেড চক্রবর্তী, আপনি বোম্বের কারখানার দু'লক্ষ শ্রমিকের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যে রিফুজি অনুপ্রবেশের কেন তুলনা করছেন তা বুঝতে পারছি না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোটি কোটি রিফুজি আসতে পারে, আপনাদের রাজ্য কি সে ভার বইতে পারবে?'

— 'তখন নৃপেন চক্রবর্তী আর কী বলবেন ? একেবারে চুপ হয়ে গেলেন তিনি। আর আমি অজয় ঘোষকে সমর্থন করতেই দশরথ আমাকে কষে এক ধমক দিলো।'

—'দশরথ তোমাকে ধমক দিলো?'

দশবথ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "আরে অঘোর, তুমি এ্যাতো প্যাড়প্যাড় করছো কেন? দেখছো না রিফুজিরা ক্যাম্পে, রাস্তাঘাটে এ্যাতো দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে, ত্রিপুরায় বন-জঙ্গল পড়ে রয়েছে এ্যাতো, ঘর বাঁধুক না রিফুজিরা সেখানে।'

দশরথেব কথা শুনে কমরেড ঘোষ হাসতে হাসতে বললেন , 'কমরেড দশরথ, অলরেডি আপনার জাতি গোষ্ঠী মাইনরিটি হয়ে গেছে, আরো যদি আপনারা রিফুজি পুনর্বাসনের ঝুঁকি নেন, তাহোলে আপনার উপজাতি জনগোষ্ঠী একেবারে মাইক্রসর্কফিক মাইনরিটি হয়ে যাবে, আপনি তাঁদের সব থেকে বড়ো নেতা। কাজেই আপনাকেই গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে বিষয়টা।'

— 'আচ্ছা, মাদাম, শোনা যায় কমিউনিস্ট পার্টিই নাকি বাঙাল খেদা আন্দোলন করে ছিলো?'

— 'আরে মশায়, কমিউনিষ্ট পার্টি যদি বাঙাল খেদা আন্দোলন সত্যি সত্যি করতো, তাহোলে রিফুজিরা আর কী এই রাজ্য দখল করে নিতে পারে? এহলো কংগ্রেসী অপপ্রচার।'

—'কংগ্রেসরাই বা এধরনের অপপ্রচার করতে যাবে কেন?'

— 'বুঝলেন না, পাহাড়টা দখলে ছিলো কমিউনিস্ট পার্টির, সেখানে শচীন সিং-সুখময় সেনগুপ্তর কংগ্রেস পার্টির কোনো বেস ছিলো না। তাই তারা রিফুজিদের কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে বলেছিলেন, কমিউনিস্টরা রিফুজি পুনর্বাসনের বিপক্ষে, কাজেই কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে জেতাতে হবে, আর দিল্লীতেও রয়েছে কংগ্রেস, রিফুজিদের রক্ষাকর্তা হলো কংগ্রেস পার্টি। রিফুজিদের কংগ্রেস পার্টি করতে হবে।'

— 'আমি, মাদাম, বীরচন্দ্র দেববর্মার কাছ থেকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা শুনেছি শচীনবাবু সম্পর্কে।'

— 'বীরচন্দ্র ঠাকুর আবার কী কথা বললেন আপনাকে।'

— একদিন বীরচন্দ্রবাবুর সঙ্গে এই রাজ্যের রিফুজি পুনর্বাসনে ত্রিপুরা সরকারের ভূমিকা নিয়ে কথা হচ্ছিলো। তখন তিনি বললেন, 'পাহাড়ের মধ্যে ট্রাইবাল এলাকায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে বাধা দিচ্ছিলো

স্থানীয় লোকেরা। আর, তখন এ কে লোধ ছিলেন ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর। শচীন সিং তাঁকে অর্ডার দিয়ে বললেন, মিস্টার লোধ, তুমি পাহাড়ের ভেতর সরকারী খাস জায়গা দ্যাখো। আমি পুলিশ দিয়ে সেখানে রিফুজি পুনর্বাসন দেবো, তুমি কোনো চিন্তা কোরোনা, দেখবো কারা সরকারের কাজে বাধা দেয়, সকলের হাতে দড়ি পরাবো আমি।'

মাদাম চিয়াঙ চিঙ হাসতে হাসতে বললেন, 'দারুণ একটা কথা শুনেছেন তো বীরচন্দ্র ঠাকুরের কাছ থেকে। আচ্ছা অনেক কথাই তো হলো আপনার সঙ্গে, কিন্তু আমার মানুষটা যে এখনো ফিরলো না, বেলা একটা বাজতে চললো, ব্যাপার কি ?'

— 'হয়তো দুর্বাজয় রিয়াঙের ওখানে ম্যারাথন মিটিং করছেন, এসে যাবেন কিছুক্ষণের ভেতর, আপনাকে এতো চিন্তা কোরতে হবে না। এবার বলুন তো মাদাম, আপনাদের বিয়ের কথা একটু শুনি। কেমন করে একজন বিপ্লবীকে বিয়ে করে অনিশ্চিত এক জীবনে ঝাঁপ দিলেন আপনি?'

— 'আমাদের সেই বিয়ে খুব রোমাঞ্চকর কমরেড। শুনতে চান সেই কাহিনী। শুনুন তাহোলে- আমার দাদা গৌরাঙ্গ দেববর্মা ছিলেন তখন তরুণ কমিউনিস্ট। তাঁর তরুণ কমিউনিস্ট বন্ধুদের নিয়ে ভিড় জমাতেন বাড়ি, খেতেনও তাঁরা। কমিউনিস্ট বন্ধুরা সারাদিন বীরেন দত্ত ও দেবু সেনের কাছে পার্টি ক্লাস করে রাতেও থাকতেন আমাদের সেই পুরোনো বিরাট কাঠের বাড়িতে। মাঝে মাঝে সুধন্বা, হেমন্ত ও অঘোর দেববর্মাও এসে পার্টি ক্লাসে যোগ দিতেন। এতে আমার বাবা নলিনী ঠাকুর খুব অসন্তুষ্ট হতেন। স্বল্প আয়ের রাজভক্ত লোক ছিলেন আমার বাবা। বাবাও ছিলেন রাজকুমারীর ঘরের। মা ছিলেন আবার বাবার বিপরীত। দাদার কমিউনিস্ট বন্ধুও সুধন্বা, হেমন্ত ও অঘোরকে খুব পছন্দ করতেন তিনি। সোনা-দানা বন্ধক রেখে কমিউনিস্টদের খাওয়াতেন আমার মা। এই সব ঘটনায় বাবার সঙ্গে মায়ের মনোমালিন্য দেখা দিতো সবসময়। রাজভক্ত বাবা একটুও পছন্দ কবতেন না কমিউনিস্টদের। তাঁর জগৎ ছিলো আলাদা। কবিরাজি ছিলো তাঁর পেশা। রাজ বাড়িতেও ডাক পড়তো তাঁর। সারাদিন বড়ো বড়ো কড়াইয়ে কবিরাজি ওষুধ তৈরী কোরতেন তিনি। বাল্যকালে আমার বাবার কাছ থেকে চ্যাবনপ্রাশ খেতাম খুব করে।

আমার দাদাব সঙ্গে আপনাদের কমরেড অঘোর দেববর্মা আমাদের বাড়িতে আসতেন ঘন ঘন। জনশিক্ষা আন্দোলনের কর্মী হিসেবে তখন খুব তাঁর নাম। ফুটফুটে সুন্দর যুবক, কথাও বলতে পারতেন খুব ভালো। মনে মনে তাঁকে ভালোবেসে ফেলি আমি। আমাদের যখন বিয়ে হয়, তখন অঘোর দেববর্মা আণ্ডার গ্রাউণ্ডে, পাঁচ হাজার টাকা মাথার দাম তাঁর। আমার বযেস তখন ১৮, আর তাঁর বয়েস ৩০। আমার থেকে বারো বছরের বড়ো আপনাদের কমরেড। আমাব বয়েস এখন ৬৫ আর তাঁর বয়েস ৭৭।

আমার মা আমার মনের কথা জানতেন। তাই আণ্ডার গ্রাউণ্ডে যাওয়া এক বিপ্লবী কমিউনিস্টের সঙ্গে বিয়েতে তাঁর সম্মতি ছিলো। কাঞ্চনমালায় থাকতেন আমার ধর্মের দাদা কুমার দেববর্মা। তিনিই অঘোর দেববর্মাকে আমার মনের কথা বলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান আপনাদের কমরেড। তারপর ১৯৫০ সালের ২২শে মে এক ঝড় জলের সন্ধ্যেবেলায় আমার ধর্মের দাদা কুমার দেববর্মার সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি পায়ে হেঁটে মায়ের সম্মতি নিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে একেবারে শেষ রাতে এসে আমরা পৌঁছে যাই সেকেরকোটের কাছে কাঞ্চনমালায়। আর হাঁটতে পারছিলাম না আমি, এতো যে পথ হাঁটতে পারবো ভাবতে পারিনি কোনো দিন। কাঞ্চনমালায় এসে ধর্মের দাদার বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। খুব ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন কুমারদা। তারপর চোখে-মুখে জল দিয়ে আবার হাঁটা। তারপর দুপুরের একটু আগে পৌঁছে যাই অঘোর দেববর্মার পিসতুতো দিদির বাড়ি শ্যামনগরে। সেখানে সেই

দিনই গোধূলিলগ্নে আমার বিয়ে হয়ে যায় কমিউনিস্ট নেতা অঘোর দেববর্মার সঙ্গে। আমাদের বিয়েতে আপনাদের ম্যাডাম করবী দেববর্মণের স্বামী ডাঃ নীলমণি দেববর্মাও ছিলেন উপস্থিত। অঘোর দেববর্মার বাল্যবন্ধু টাকারজলা আমতলীর অখিল দেববর্মা সারাক্ষণ ছিলেন আমাদের এই রোমাঞ্চকর বিয়েতে। আমার বেশ মনে আছে, বিয়ের ভোজ হয়েছিলো বিরাট এক শূকর কেটে আর বনের হরিণ মেরে।

বিয়ের পরে সব জানাজানি হয়ে যায়। বাবা শুনে খুব হৈচৈ শুরু করেন। মনে খুব আঘাত পান তিনি। গৌরাঙ্গদাও বিয়ে করোছিলেন বাবার অমতে দুর্গা চৌধুরী পাড়ার কমিউনিস্ট পার্টির গানের স্কোয়াডের মেয়ে ফেলুবালা দেববর্মাকে। আমরা দু'ভাই-বোন সেদিন সত্যিই খুব আঘাত দিয়েছিলাম বাবার মনে। সব থেকে রাগ করেন তিনি মায়ের ওপর, তাঁর সঙ্গে ব্যাক্যালাপ বন্ধ করে দেন তিনি। বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেয়ায় মা-ও খুব আঘাত পান মনে। কিন্তু তিনি অবিচল থেকে কমিউনিস্ট নেতাদের বাড়িতে রাখতেন । কমরেড সুধন্বা, কমরেড দশরথ সবাই থেকে গেছেন আমার মায়ের কাছে। জানেন, আমাদের বাড়িতে থাকার সময় দশরথের একবার খুব অসুখ হলো। মা তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করে সারিয়ে তোলেন। রোজ মুরগীর জুস নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতেন দশরথকে। জানেন কমরেড, আপনাদের নৃপেন চক্রবর্তীকে আমার দাদা গৌরাঙ্গ দেববর্মা আমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে যান দুর্গা চৌধুরীপাড়ায়। আর সেখান থেকে পাহাড়ের ভেতর আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যান তিনি। দুর্গা চৌধুরীপাড়ার বুড়ো-বুড়ীরা এখনো সে-কথা বলেন। কমরেড হেমন্ত দেববর্মার বৌদি সম্বুলক্ষ্মী দেববর্মা, ছোট ভাইয়ের বৌ সন্ধ্যারাণী, কমরেড পুলিন দেববর্মার শাশুড়ি কুসুমশ্বরী দেববর্মা ও কমরেড সুশীল চন্দের শাশুড়ি তখিতি দেববর্মা এখনো বলেন নৃপেন চক্রবর্তীর কথা। জঙ্গলের ভেতর ভাত নিয়ে গিয়ে তাঁকে খাওয়াতেন তাঁরা। আমাদের বাড়ির কথা, বিশেষ করে আমার মায়ের কথা, কোনোদিন ভোলেননি নৃপেন চক্রবর্তী। তাই প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে জেল দেখতে এসে আমার বুড়ো মায়ের সঙ্গে দেখা করে যান তিনি।'

একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম আমি আমার মাদাম চিয়াঙ চিঙ- শ্রীমতী দুলালী দেববর্মার কথা। তার কথার মাঝখানে কথা বললাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা মাদাম, বিয়ের পরে কোথায় থাকলেন আপনি?' একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'দেখুন কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে গেছি আমি।' একেবারে মহাভারত শুনিয়ে ফেললাম আপনাকে। 'এবার শুনুন,' বলে আবার বলতে শুরু করলেন মাদাম ।

—'বিয়ের পরে বেশ ক'বছর আমি ছিলাম আমার ননদের বাড়ি শ্যামনগরে। সেখান থেকে মাঝে মাঝে আসতাম শ্বশুর বাড়ি লাটিয়াছড়ায়। ট্রাইবেল কৃষক পরিবারে থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে কৃষিকাজ শিখে ফেললাম আমি। কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে ধান রোয়া, ধান নিড়ানি দেয়া এবং ধান কাটাও রপ্ত করলাম আমি। উদুখলে ট্রাইবাল মেয়ের মতো ধান ভানতেও শিখলাম একদিন। বিশ্বাস করবেন না কমরেড, একদিনে একা উদুখলে তিন-চার মন ধান ভানতে পারতাম আমি। খুব মজবুত শরীর ছিলো আমার। প্রথম রোয়া দেয়ার পরে বৃষ্টির জলে ধানের চারা উপড়ে নষ্ট হয়ে গেলে আবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন চারা নিয়ে ধান রোয়া দিয়ে আসতাম আমি। এভাবেই আগরতলার রাজরক্তের মেয়ে একজন পাহাড়ের কমিউনিস্ট বিপ্লবীর জীবন সঙ্গিনী হোয়ে গেলাম আমি।'

মাদাম চিয়াঙ চিঙকে কেমন যেন বিষণ্ন মনে হচ্ছিলো এই কথার বলার পর। বাবা-মা দু'জনেই ছিলেন রাজরক্তের লোক। তাঁকেও রাজ কুমারীই বলা যায়। সেই রাজ কুমারী এক পাহাড়ী উপজাতি-বিপ্লবীকে বিয়ে করে শেষ পর্যন্ত কৃষক বধূ হয়ে গেলেন, দুই বিপরীতমুখী জীবনের দ্বন্দ্ব বোধ হয় তাঁর মনে মাঝে মাঝে উঁকি মারতো। আর তার জন্যেই কী এই বিষণ্নতা? আমি এবার মাদামকে ভিন্ন এক

প্রসঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাঁর আনমনা ভাবটা কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। বললাম, 'আচ্ছা মাদাম, আমার কী মনে হয় জানেন, একদিন হয়তো আগরতলার এই উপজাতীয় ঠাকুরলোক ইতিহাসের ফসিল হয়ে যাবে, রাজ পরিবার, কর্তা পরিবার হারিয়ে যাবে ইতিহাসের পাতায়। তাই আপনার মাতৃ ও পিতৃকুল সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চাই, যদি কোনো দিন পারি লিখে রেখে যাবো আপনাদের সম্পর্কে।'

মাদামের মুখে এবার হাসি দেখা দিলো একটু। বললেন, 'আপনি গবেষক মানুষ, পারলে আপনিই পারবেন আমাদের এই বিলীন প্রায় ঠাকুরলোক সম্পর্কে কিছু লিখে যেতে। তাহলে আমার মাতৃকুল দিয়ে শুরু করি আমার নিজের নাম থেকেই। কুষ্টিতে আমার পিতৃনাম দেয়া ছিলো ভুবনমোহিনী। পরে শিক্ষকের দেয়া নাম হল ধলী- গায়ের রঙ ধলা বলে। তারপর তার থেকে হলো দুলালী, দুলালী থেকে এখন ডাকনাম দুলু।

আমার মায়ের নাম হেমপ্রতিভা, হেমপ্রতিভার মায়ের নাম গিরিজাসুন্দরী, গিরিজাসুন্দরীর মায়ের নাম স্বর্ণময়ী আর স্বর্ণময়ীর মায়ের নাম ভুবনেশ্বরী। এই ভুবনেশ্বরীর স্বামী ছিলেন মহেশ ঠাকুর। তিনি ছিলেন ত্রিপুরার রাজার নিজ তহবিলের চাবিদার , সম্ভবতঃ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময়ে। মহেশ ঠাকুরের চেহারা ছিলো যাকে বলে দশাসই। বাহারী গোঁফ ছিলো তাঁর। গলার আওয়াজ ছিলো মেঠের মতো। তাঁর হাসি শুনতে পেতো লোকে বহুদূর থেকে। নিজের হাতে রান্না করে খেতেন তিনি। ঘি দিয়ে মাংস রান্না না করে খেলে তৃপ্তি পেতেন না। যাকে বলে ভোজন রসিক আর কী। এই ভোজন রসিকতার জন্যে তাড়াতাড়ি মারাও যান তিনি।

এই মহেশ ঠাকুরের একখানানা ছবি আছে আমার ছোট ভাই ভানু দেববর্মার কাছে। আমাদের এই যে বর্তমান বাড়ি অর্থাৎ অঘোর দেববর্মার শ্বশুর বাড়ি, এটিই হলো মহেশ ঠাকুরের বাড়ি। পরে আমাদের বাড়ির সম্পর্কে বলাবো।'

— 'এবার মাদাম আপনার পিতৃকুল সম্পর্কে কিছু বলুন।'

— 'আমার বাবার নাম নলিনী ঠাকুর। তিনি ছিলেন রাজকুমারীর ছেলে। নলিনী ঠাকুরের বাবার নাম প্রকাশ ঠাকুর। তিনিও ছিলেন কুমারীর ছেলে। প্রকাশ ঠাকুরের বাবার নাম আনন্দ ঠাকুর। আনন্দ ঠাকুরের নামেই এখন আনন্দনগর। আনন্দ ঠাকুরের এক ভাই হলেন মলয় ঠাকুর। আর এই মলয় ঠাকুরের নামে এখনকার মলয়নগর। আনন্দনগর ও মলয়নগর হচ্ছে আগরতলার হাওড়া নদীর ওপারে যোগেন্দ্রনগরের কাছে। নলিনী ঠাকুর ও প্রকাশ ঠাকুরের মধ্যে রাজ রক্ত আছে। আমাদের পিতৃকুল এসেছে মেঘ কর্তা থেকে। আর এই মেঘ কর্তার সঙ্গে জগু কর্তার জ্ঞাতি সম্পর্ক। আগেই বলেছি, আমার বাবা-মা দু'জনেই রাজরক্তের লোক। আমার মা রাজভাতা পেতেন ৫ টাকা। সেই ৫ টাকা বেড়ে ৩৫০ টাকা হয়েছিলো। আমার ঠাকুর্দা প্রকাশ ঠাকুরের ছিলো দুই বিয়ে। প্রথম পক্ষের সন্তান আমার বাবা নলিনী ঠাকুর। নলিনী ঠাকুরের এক সৎ ছোটো বোন লহরী দেবী এখনো বেঁচে আছেন কর্ণেল বাড়িতে। লহরী দেবীর তিন-চার ভাইও ছিলো। এবার একটা খুব মজার কথা বলি শুনুন। আমার ঠাকুরদা প্রকাশ ঠাকুরের আগে বাড়ি ছিলো কৃষ্ণনগরের পদ্মপুকুরের কাছে। ওই বাড়িতে একবার ভূতের উপদ্রব হলো খুব। অনেক ছেলে-মেয়ে আমার ঠাকুর্দার ভূতে পেয়ে মারা গেলো সেখানে। তখন ভূত তাড়ানোর জন্যে দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা খোল-করতাল নিয়ে হরিনাম হতো সেখানে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলোনা, ভূতের উৎপাত বাড়তেই থাকলো। শেষে আমার ঠাকুর্দা প্রকাশ ঠাকুর অতিষ্ঠ হয়ে ওই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এই বর্তমান মহেশ ঠাকুরের বাড়ি চলে আসেন। পদ্মপুকুরের ওই ভূতুড়ে বাড়ি অনেক দিন খালি পড়ে ছিলো সেখানে। লোকে ওই বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে ভয় পেতো রীতিমতো। শেষে ওই ভূতুড়ে খালি বাড়ি কে কেনেন জানেন?'

মাদাম এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে। আমি বললাম, 'মাদাম, আমি বাইরের লোক, কীভাবে জানবো সে কথা?'

— 'ওই ভূতুড়ে বাড়িটা প্রকাশ ঠাকুর শেষে বিক্রি করে দেন সাবেক মন্ত্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্যের বাবা হরিদাস ভট্টাচার্যের কাছে।'

মাদামের কথা শুনে আমার মনে একটা খটকা লাগলো। আমি বললাম, 'আচ্ছা মাদাম, কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্যের বাড়ি রোজ সন্ধ্যে বেলায় এখনো খোল -করতাল বাজিয়ে হরিনাম-সংকীর্তন করতে দেখি। তাহলে কি প্রকাশ ঠাকুরের ভূত তাড়ানোর সেই ট্র্যাডিশন এখনো চেলছে সেখানে ?'

আমার কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেললেন আমার মাদাম চিয়াঙ চিঙ । বললেন, 'একেই বলে গবেষকের চোখ । তবে আপনি কী ভাবেন তখনকার আগরতলার প্রকাশ ঠাকুরের ভূতের বাড়ি এখনও আছে ? কৃষ্ণদাস বাবুরা তো গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবার, তাই হয়তো রোজ সন্ধ্যেবেলায় খোল করতাল বাজিয়ে হরিনাম করেন ।' মাদাম চিয়াঙ চিঙ আমার প্রশ্নের উত্তর এ-ভাবে দিলেও আমার কানে এখনো যেন প্রকাশ ঠাকুরের বাড়ির ভূত তাড়ানো সেই হরিধ্বনির শব্দ বাজছে।

মাদাম সরে এলেন সেই কথা থেকে । বললেন, 'দেখুনতো দুটো বাজতে গেলো লোকটা তো এখনো ফিরলো না । খোঁড়া মানুষ, সবসময় চিন্তায় থাকতে হয় । দুর্বাজয়ের কোয়ার্টারে মিটিং করতে গেছেন । মিটিং করে কি হবে ? আপনি কি মনে করেন এ রাজ্যে আর সি. পি আই পার্টি হবে। কমিউনিস্ট পার্টি তো সি. পি. এম এই রাজ্যে, সি. পি. আই -এর তো পাত্তা নেই। লোকটাকে বলেছি, তোমাদের দলাদলির এই পার্টি আর এখানে হবে না, তোমরা সারেণ্ডার করেছো সি. পি. এম-এর কাছে। তোমরা মারা গেলেও তো শ্মশানে মিছিল করে যাবার লোক থাকবে না।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, আপনাদের মহেন্দ্র দেববর্মা খুব হিসেবী লোক ছিলেন জানেন। তিনি ছিলেন সি. পি. আই -এর এম. এল. এ। তারপর হাজারীবাগ জেল থেকে বেরিয়ে সংসার বাঁচানোর জন্যে শচীন সিংয়েব অনুরোধে করলেন কংগ্রেস। শেষ জীবনে কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে সি. পি. এম -এর কাছাকাছি এলেন। কিন্তু পার্টি মেম্বারশিপ নেননি অনেক দিন। পরে অসুস্থ শরীরে থাকতে থাকতে তার মনে হলো মারা গেলে তাঁকে নিয়ে লালঝাণ্ডার লোকেরা শবানুগমন করবে না মিছিল করে। তাই মৃত্যুর মাত্র ক'দিন আগে তিনি সি. পি. এম -এর মেম্বারশিপ নেন। লালকার্ড দিয়ে যান বাড়িতে এসে কমরেড ভানু ঘোষ নাকি তাঁর হাতে। আপনাদের অঘোর দেববর্মা মারা গেলেও দেখবেন তাঁকে নিয়ে আপনাদের পার্টির মিছিল করে যাবার লোক থাকবে না শ্মশানে।'

— 'আপনি যে কী বলেন মাদাম?'

—'সত্যিই বলছি, আমি হয়তো সেদিন বেঁচে থাকবো না। আমার শরীর খুব খারাপ। ওজন বেড়ে হয়েছে একশো কে.জি , হাইপ্রেসার। ডাক্তার বলেছে সারা দিনে একশো গ্রাম চালের ভাত খেতে। এত বড়ো শরীরে একশো গ্রাম চালের ভাত খেলে কি হয় ? ডাক্তারের কথা কে শোনে, আমি সব খাই। আজ সকালেও জোড়া সবরি কলা দিয়ে দুধ-চিড়ে খেয়েছি এক জাম বাটি। কবে শুনবেন টপ করে পটল তুলেছি। আপনি গবেষক মানুষ, আজ মন উজাড় করে আপনাকে সব বললাম, পারলে আমাদের লুপ্তপ্রায় ঠাকুরলোক সম্পর্কে কিছু লিখবেন। দেখছেন, লোকটা এখানো এলোনা। আমি যাই স্নান করি গিয়ে। আপনারও দেরী হয়ে গেলো খুব। না, খেয়ে যাবেন আমাদের এখান থেকে?' আমিও হাসতে হাসতে বললাম, 'না মাদাম, আমি এখন যাই, আমারো জন্যে একজন বসে আছে পথ চেয়ে। আপনারই মতো একজন মোঙ্গলিনী।'

পথে বেরিয়ে মাদাম চিয়াঙ চিঙ সম্পর্কে একটা কথা মনে পড়ে গেল। একবার তাঁর স্বামী অঘোর

দেববর্মার সঙ্গে তিনি গিয়েছিলেন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর থেকে ফিরতেই দেখা করতে গেলাম তাঁর সঙ্গে। আমাকে বসতে দিয়ে বললেন, 'জানেন কুমুদবাবু, আমাদের ট্রাইবালদের মতো চেহারার অনেক লোক দেখলাম মস্কোতে।' উত্তরে আমি বললাম, 'মাদাম, মোঙ্গল-রক্তের অনেক জাতিগোষ্ঠী আছে তো সোভিয়েত ইউনিয়নে।'

—''তা থাকতে পারে, তবে আমি তো আর অতো জানিনে। এখন আসল কথাটা বলি। মস্কোতে যে হোটেলে ছিলাম আমরা, ঠিক আমাদের পাশের ঘরে ছিল আমাদের চেহারার এক পরিবার। ওই ঘরের মেয়েরা আমাদের ঘরে এসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতেন, আমি জড়িয়ে ধরতাম তাঁদেরকে। কিন্তু ওঁদের ভাষাও আমি বুঝতাম না, আমার ভাষাও ওঁরা বুঝতেন না। সে এক মজার ব্যাপার। মনে হতো, কত চেনা আমরা একে অপরের কাছে। একেই বলে রক্তের টান। বুঝলেন কুমুদবাবু !' কথাটা এখনও আমার কানে ভাসছে।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কথাও স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো আমার। ১৯৮১-৮২ সালের কথা। তখন আমি শান্তিনিকেতনে। হঠাৎ একদিন একটা টেলিগ্রাম এলো অঘোরবাবুর কলকাতার ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার রিসার্স সেন্টার থেকে। টেলিগ্রাম পেয়ে মাথায় হাত দিলাম আমি। অঘোরবাবুর ক্যান্সার হয়েছে! পরের দিনই ভোরের বিশ্বভারতী ধরে চলে গেলাম বেহালার ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার রিসার্স সেন্টারে। গিয়ে দেখি, অঘোরবাবুর খুব জ্বর হয়েছে, খুব কাতরাচ্ছেন তিনি। আমি অঘোরবাবু-অঘোরবাবু বলে ডাকতেই চোখ মেললেন তিনি। আমাকে দেখে বললেন, 'কুমুদবাবু, আপনি এসেছেন, আপনার কথাই ভাবছি সবসময়। আমাকে একটু ধরুন , উঠে বসি আমি।'

আমি ধরে বসালাম তাঁকে। দেখি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে তাঁর। আমার দিকে একটু তাকিয়ে বললেন, 'আমার বালিশের নীচের খাতাটা বের করুন একটু।' খাতাটা বের করে তাঁর হাতে দিতেই বললেন, 'ত্রিপুরার জনশিক্ষা সমিতির ইতিহাস লেখা আছে এই খাতায়। আপনি এই খাতাখানা নিয়ে ইলাদি (সি. পি. আই. নেত্রী ইলা মিত্র)'র বাসায় যান। রমেনদা (ইলা মিত্রের স্বামী)কে বলে ছাপানোর চেষ্টা করুন। ডাঃ সরোজ গুপ্ত বলেছেন, ক্যান্সার হয়েছে আমার, বেশীদিন বাঁচবো না আমি। ত্রিপুরার জনশিক্ষা সমিতির ইতিহাস ছাপা অক্ষরে দেখে মরলেও শান্তি পাবো আমি।'

কমঃ অঘোর দেববর্মার কথা শুনে চোখে জল এলো আমার। কোনোরকমে নিজেকে সামলিয়ে বললাম, 'ক্যান্সারের ভালো চিকিৎসা হয় এখানে, সেরেও যানতো অনেকে, ভাববেন না আপনি, আমি একটু যাই, ডাক্তার গুপ্তর সঙ্গে কথা বলে আসি।'

ডাঃ সরোজ গুপ্তকে পেয়ে গেলাম তাঁর চেম্বারে। অঘোর দেববর্মার কথা বলতেই তিনি আমাকে বসতে বলে বললেন, 'জানেন, অঘোরবাবুর হয়েছে ক্যান্সার, লাঙ্‌সে জল জমেছে, খুব বাজে অবস্থা। কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইছেন না তাঁর ক্যান্সার হয়েছে, পুরোনো কমিউনিস্ট, বুঝলেন তো, সাহস আছে খুব অঘোরবাবুর। তবে বেশীদিন হয়তো বাঁচবেন না , তবু চেষ্টা তো করতে হবে আমাদের।'

ডাঃ সরোজ গুপ্তর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলাম অঘোরবাবুর কাছে। বললাম, 'ডাঃ গুপ্ত আপনাকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করবেন, আপনি ভাববেন না। এখন তাহলে আমি ইলাদির বাসায় যাই, রমেনদাকে বলে আপনার জনশিক্ষা সমিতির ইতিহাস ছাপার চেষ্টা করি। আমাকে বিকেলে বিশ্বভারতী এক্সপ্রেস ধরে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতে হবে।' আমি উঠতেই বললেন, 'সপ্তাহে অন্ততঃ একবার এসে দেখি যাবেন আমাকে।'

অঘোরবাবু ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার রিসার্স সেন্টারে মাসখানেক থেকে আগরতলায় ফিরে আসেন। পরে সি. পি. আই. -এর জেনারেল সেক্রেটারি কমঃ রাজেশ্বর রাও তাঁকে পাঠিয়েদেন মস্কোতে

চিকিৎসার জন্যে। মস্কোর ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেন অঘোরবাবুর ক্যান্সার হয়নি, হয়েছে কঠিন ব্রনকাইটিস। আর যার জন্যে লাঙ্‌সে জল জমেছে। মস্কোর ডাক্তাররা তখন ইলেকট্রনিক নল দিয়ে তাঁর ফুসফুসের জল বের করে দিতেই সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। তবে ফুসফুসের ভেতর ইলেকট্রনিক নল ঢোকানো খুব রিস্কের ব্যাপার ছিলো। ফুসফুসে নল ঢুকিয়ে পাম্প করে জমা জল বের করার সময় তাঁর জ্বর হয়েছিলো আট ডিগ্রির মতন।

মস্কো থেকে কলকাতায় ফিরেই অঘোরবাবু সোজা চলে যান ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার রিসার্স সেন্টারে ডাক্তার সরোজ গুপ্তর সঙ্গে দেখা করতে। ডাক্তার গুপ্ত অঘোরবাবুর তরতাজা শরীর দেখে অবাক হয়ে যান। তখন অঘোরবাবু ডাক্তার গুপ্তকে বলেন, 'মস্কো থেকে ফিরছি সরোজবাবু, আমার তো ক্যান্সার হয়নি, ব্রনকাইটিসের জন্যে বুকে জল জমে ছিলো। মস্কোর ডাক্তাররা পাম্প করে জল বের করে দিতেই তো সুস্থ হয়ে গেলাম আমি। আপনারা তো আমাকে মেরেই ফেলেছিলেন ভুল চিকিৎসা করে।

অঘোরবাবুর কথায় ডাক্তার গুপ্ত একটু লজ্জাই পেয়ে যান। সবিনয়ে বলেন, 'অঘোরবাবু, একেই বলে মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। আপনার ফুসফুসে জল জমা ও অন্যান্য সিম্পটমে আপনার ক্যান্সার বলে সন্দেহ করেছিলাম আমরা। যাক, আপনি সুস্থ থাকুন। এটাই আমরা চাই।'

অঘোর দেববর্মা সুস্থ হলেন বটে, কিন্তু ভুল চিকিৎসার জন্যে তাঁর কোমরের হাড় একদিকে গেলো শুকিয়ে, এক পা খোঁড়া হয়ে গেলো তাঁর। আর এখন এই খোঁড়া পায়ের ডেসপারেট স্বামীকে নিয়ে চিন্তিত আমার মাদাম চিয়াঙ চিঙ।

২৮শে নভেম্বর, ১৯৯৫ মঙ্গলবার। সকালের দিকে 'হাচুক খুরিঅ' এর বাঙলা অনুবাদ অনেকটা এগিয়ে রেখে গেলাম ম্যাগনেট ক্লাবের সংলগ্ন অধ্যাপক ডঃ কমল কুমার সিংহর বাড়ি। দরজার কাছে যেতেই চারটে কুকুরের মধ্যে তিনটি কুকুর যথারীতি সশব্দে আপ্যায়ন করলো। একটা কুকুর কম দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো। দেখি কমল বাবু পুব দিকে পিঠ দিয়ে লোহার রেলিঙের হেলান দেয়া অবস্থায় কিসব লিখছেন। বাঁ পাশে একটা কুকুর ও বেড়াল নিয়ে ছোট মেয়ে বুবু পড়ছে। কমল বাবুর স্ত্রী সামনে বসে আছেন একটা চেয়ারে। সবসময় হাসিখুশি কমল বাবুর পরিবার কেমন যেন বিমর্ষ আজ। আমাকে দেখে কমল বাবু বললেন, 'জানেন কুমুদ বাবু, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের গান্ধী সেমিনারের ধকল সামলাতে না সামলাতে বড়ো একটা বিপদ গেছে আমাদের।' জিঞ্জেস করলাম, 'কিসের বিপদ?'

—'আমাদের একটা কুকুর মারা গেছে।'

—'বলেন কি! আমি এসে তিনটে কুকুর দেখেই কেমন একটা সন্দেহ করেছিলাম। তা হলো কী কুকুরটার, মরলোই বা কি ক'রে?'

—'সপ্তাখানেক ধরে নাকি খুব একটা খেতো না কুকুরটা। আমিও গান্ধীজয়ন্তী নিয়ে ব্যস্ত, গৃহিনীরও ইস্কুল, মেয়েরও পরীক্ষা চলছে, কাজেই কুকুরটার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেনি কেউ। যখন ধরা পড়লো, খুব দেরি হয়েগেছে তখন। দিন সাতেক আগে স্ট্রোক ক'রেছিলো। ডাক্তার এসে ইনজেকশন দিলো বটে, কিন্তু পেছনের পা দুটো লেঙচিয়ে লেঙচিয়ে হাঁটতো যে ক'দিন বেঁচেছিলো। গত পরশু দিনের আগের দিন সন্ধ্যে থেকে শ্বাস কষ্টের মতো হলো কিছুটা। মনে হলো অসহ্য কষ্ট হচ্ছে শরীরে। খাটের ওপর আমার পাশে শুয়ে কি যেন বলার চেষ্টা করছিলো সারা দিন। তা রাত ঠিক আটটা নাগাদ ডাক্তার নিয়ে এলাম ডেকে। ইনজেকশন দিলেন একটা ডাক্তার। এরপর আমার পাশেই ঘুমিয়ে পড়লো যেন। আমি তার সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলাম। কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে .....।'

লক্ষ্য করলাম, কমলবাবু আবেগরুদ্ধ হয়ে গেছেন, চোখ দুটো ছলছল করছে তাঁর। আমারও

কৌতূহল বেড়েগেলো জানতে। জানি এই কুকুরগুলোই কমলবাবুর পরিবারের জীবন। তাদের নিয়ে খাটে শুয়ে থাকেন তাঁরা। শীতকালে তাঁদের সঙ্গে কুকুর গুলোও একই লেপের মধ্যে শুয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর কি হলো, কমল বাবু ?'

—'রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গলায় কফ জমতে শুরু করলো তার। ঘরঘড়ানি শুরু হলো তারপর থেকে। যা বোঝার বুঝলাম। আমরা সব বসে রইলাম তাকে ঘিরে। রাত ঠিক আড়াইটার সময় মারা গেলো সে।'

—'তারপর!' আমার গলায় সমবেদনার ভাব।

—'তারপর সকালে সকলকে ডেকে কবর দিলাম ঘরের পাশে। আজ আমারা নিরামিষ ভাঙলাম কুমুদ বাবু। গতকাল জগন্নাথ বাড়িতে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছি। আর ভেবেছি, কুকুরটার স্মৃতিতে একটা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা করবো পশু-পক্ষীর ওপর। দেড় হাজার টাকার প্রথম পুরস্কার দোবো ঠিক ক'রেছি। কিছু একটা করতে না পারলে মনে শান্তি পাচ্ছিনা, কুমুদ বাবু।'

—'অনিলবাবু (অনিল সরকার- ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী) টেলিফোনে এ-ক'দিন প্রবোধ দিচ্ছেন বারবার।' বললাম—'আপনার অনিলবাবুও কুকুরভক্ত। কুকুরও বোধ হয় অনিল বাবুকে ছেড়ে থাকতে পারেনা। গত বছরের আগের বছর রবীন্দ্র কাননে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কুকুরটা গিয়েছিলো অনিলবাবুর সঙ্গে। প্রভুর সঙ্গে বসে দিব্যি দেখলো রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য।'

—'না, মানে, আমাদের কুকুরের জীবনের সঙ্গে এভাবে একাত্ম হয়ে যাবার পেছনে একটা ঘটনা আছে।'

—'কি ঘটনা, কমল বাবু ?' কৌতূহল বেড়ে গেলো আমার।

—'না, আজ বলবো না সে ঘটনার কথা, সে কথা বলার মতো মানসিক অবস্থা এখন আমার নেই, আরেকদিন বলবো।'

— 'ঠিক আছে, একদিন নিশ্চয়ই শুনতে হবে ঘটনাটা। তা, এবার বলুন দেখি, ডাক্তার মেয়েকে আগ্রায় জানিয়েছেন কি কুকুরটার মরে যাবার কথা ?'

—'না জয়ার এখন ফাইনাল পরীক্ষা। কুকুরটা খুব প্রিয় ছিলো তারই। খবরটা এখন জানানো ঠিক হবেনা তাকে, যে পাগল, খবরটা শুনে সব ছেড়ে ছুড়ে হয়তো চলে আসবে আগরতলায়।'

—'বলেন কি!' আমার গলায় বিস্ময়ের সুর।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৫, শুক্রবার। সারাদিন আগরতলা শহরে ২৯.১১.৯৫ তারিখে কমলপুর শহরের ইউ.বি.আই. ব্যাঙ্কে দুর্ধর্ষ ডাকাতি নিয়ে সবাই সমালোচনা মুখর। অনেকে বলছে, এই তিন-চার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে ট্রাইবাল উগ্রপন্থীদের সঙ্গে বাঙালিরাও রয়েছে। যে জীপে করে উগ্রপন্থীরা কমলপুরে যায়, তা নাকি আগরতলা থেকে ভাড়া করা হয়েছিলো। জীপের মালিক ও ড্রাইভার বাঙালি। শহরের লোকদের কথা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমর চৌধুরী কমলপুর ডাকবাঙলায় পুলিশ অফিসারদের নিয়ে যখন মিটিঙ করছিলেন, তখনই এই রোমহর্ষক ডাকাতি। আসলে এই কাজের মধ্য দিয়ে উগ্রপন্থীরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

গতকাল রাতে নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসার পাশে কালো পোষাকে একদল সন্দেহভাজন যুবক বসে ছিলো। স্থানীয় যুবকদের তাড়া খেয়ে তারা গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। নগেন্দ্র জমাতিয়া এ ব্যাপারে ডি.জি.কে জানিয়েছেন। এখবর বেরিয়েছে ৩০.১১.৯৫ তারিখের ত্রিপুরা দর্পণের প্রথম পাতায়।

২ রা ডিসেম্বর, ১৯৯৫, শনিবার। শনিবার, হেরমার বাজার বার। স্ত্রী ফুলকুমারীকে নিয়ে সোনামোড়ার বাসে চড়ে চড়িলাম নামলাম বিকেল তিনটের সময়। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে হেরমা

এলাম ৫৫ মিনিটে। বাড়িতে ঢুকে আমা (শাশুড়ী)'র সঙ্গে দেখা করে স্বামী-স্ত্রীতে আমরা গেলাম হেরমা বাজারে। হেরমা বাজারে পাদ্রী রমেশ দেববর্মার সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, ১৯৯০ সালে লিপি বিতর্কের সেমিনার উপলক্ষে রোমান হরফের পক্ষে তার লেখাটা প্রয়োজন। আর বললেন, "নাফ্রাই জমাতিয়াকে ৩০ টা ককবরক রূপকথা দেয়ার জন্যে তৈরি করেছি—এক একটা রূপকথা ১০০ টাকা ক'রে দেবে বলেছে সে।" তাঁর সঙ্গে বসে চা খেলাম। সম্পর্কে আমার দাদা শ্বশুর তিনি। দীর্ঘদিন অরুন্ধতীনগর খ্রীষ্টান মিশনে থেকে ককবরক ভাষায় নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ করেন।

সন্ধ্যে হতেই স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর নতুন বাড়ির মাঠের পাশ দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। দু'জনে হাত-পা ধুয়ে শাশুড়ীর জ্বলন্ত উননের পাশে বসে আগুন পোহাতে লাগলাম। আমা হলদির পাতায় মুড়ে কুচো মাছ উনুনে ঢুকিয়ে দিয়ে 'ইকজাক' করে খেতে দিলেন, আর সঙ্গে দিলেন ২ কাপ সোমরস। কিছুক্ষণ বাদে শ্বশুর মশায়ও বসলেন আমাদের পাশে। আগরতলার গোলকচন্দ্র ঠাকুরের দিদির ছেলে মনা ঠাকুর হলেন শ্বশুর মশায়ের প্রপিতামহ-একথা বললেন তিনি। তাঁর কথা থেকে বোঝা গেলো মনা ঠাকুরের মায়ের আগরতলা থেকে পাহাড়ে বিয়ে হয়েছিলো।

আমার হেরমা আসার আরো একটা উদ্দেশ্য, শ্বশুর মশায় আমার জন্যে একখানা বই রাখার র‍্যাক তৈরি করেছেন নিজের হাতে, সেখানা নিয়ে আসা। আগরতলার বর্তমান বাসায় বইপত্র রাখার খুব অসুবিধে হচ্ছে, তাই শ্বশুর মশায়কে প্রায় ছ'মাস আগে কিছু টাকা দিয়েছিলাম। স্পেশাল ড্রাইভে চাকরির ইনটারভিউ দিতে এসে ছোটো শালা বিমল এসে বলেগোলা— কুমুই কতর, নিনি বই তনজাগনাই র‍্যাক ছূনামবাইখা, নাফাইছিদি ফুন—বড়ো জামাই বাবু, তোমার বই রাখার র‍্যাক তৈরি হয়ে গেছে, নিয়ে আসতে বলেছে। বুঝলাম, শ্বশুর মশায় খবর পাঠিয়েছেন, র‍্যাকখানা নিয়ে আসার জন্যে। আসলে, তাঁর নিজের হাতের তৈরী একখানা বইয়ের র‍্যাকের প্রতি আমার খুব লোভ। শ্বশুর মশায় শ্রীযুত গনেশচন্দ্র দেববর্মা নিজের হাতে তাঁর গবেষক জামাইকে বই রাখার একখানা র‍্যাক তৈরি করে দিয়েছেন, এটা একটা স্মৃতি। তিনি আজ থেকে পনেরো বছর আগে আমাকে একখানা টেবিল ও চেয়ার তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন, এখনো তাই-ই আমাদের সম্বল। সেই চেয়ার-টেবিলে বসে আমার ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করে আর বলে আমাদের দাদমশায় এই-চেয়ার-টেবিল তৈরি করে দিয়েছেন নিজেব হাতে—সেটা কম গর্বের কথা নয়। আমার পরিষ্কার মনে আছে, আমি তখন শ্বশুর বাড়ি থাকি। আমার দাদা শ্বশুর বিশিষ্ট সমাজ সেবক গৌরচাঁন দেববর্মা বর্তমান হেরমা বাজারের জায়গাটা সরকারকে দান করে দেন পঞ্চয়েতের একটা ট্রাইবাল মার্কেট করার জন্যে। ওই চার কানি (বিঘে) জমির ওপর ছিলো আম-কাঁঠাল আর নানারকম ফল-ফলারির বাগান। হেরমা বাড়ির ছেলে মেয়েরা কামিচাঙ (পুরোনো পাড়া)-এর ওই বাগানে ঢুকে বিভিন্ন ঋতুতে নানারকম ফল খেতো। আমার বিয়ের পরে ওই বাগানটার দক্ষিণে জোড়া গাব গাছের কাছে আর তেঁতুল বাগানের পাশে আমার দিদি শাশুড়ী (শ্বশুর মশায়ের মা) শশীরানী নিজের হাতে জুম করেছিলেন আমাকে নিয়ে। তখন ফাল্গুন প্রায় শেষ। একদিন সকালে নানা (ককবরক ভাষাভাষী অনেক জায়গায় ঠাকুরমা, দিদিমা, দিদি শাশুড়ীকে নানা বলে সম্বোধন করা হয়) ভাত খাবার পর আমাকে বললেন—থ তিনি আঙবাই কমিচাঙগ' (চলো আজ আমার সঙ্গে পুরোনো পাড়ায়)।

— 'তাঙগূই নানা (কিসের জন্যে নানা) ?' প্রশ্ন করলাম আমি।

—'নূঙ বাই আঙ হুক খূলাইনাই তাকূলাই' (তোমার সঙ্গে আমি জুম করবো এবার)।

নানার কথা শুনে আমি তো আর আনন্দে বাঁচিনে। কি মজা, নানা বাঙালি নাতিন জামাই আমাকে নিয়ে জুম করবেন! দেখলাম, নানা নিজের হাতে তৈরি জুমের ব্লাউজ গায়ে দিলেন একটা; তারপর

আমার হাতে জুমের জঙ্গল পরিষ্কার করার একখানা বিশেষ দা দিয়ে বললেন—অ দা বরক তৃইউই্ আঙ বাই্ ফাইদি' (এই্ বরক-দা নিয়ে আমার সঙ্গে এসো)।

নানার কথা শুনে প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর সঙ্গে চললাম আঁদি নদীর কিনার দিয়ে দিয়ে। ব্রজকুমার মাস্টার (সম্পর্কে আমার দাদা শ্বশুর) এর ঘাট পেরিয়ে আমরা ঢুকলাম কামিচাঙে (পুরোনো পাড়ায়)'র জুম করার জায়গায়। নানা আমাকে ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা জায়গাটা দেখিয়ে বললেন- 'ছোনা, (নানা আমাকে সোনা বলে ডাকতেন) অরছে হূক খৃলাইছিনাই চৃঙ' (সোনা, এখানেই আমরা জুম করবো)। ঝোপ-ঝাড়ের পাশে আমার চোখে পড়লো বাঁশের টুকরো চারখানা আড়াআড়ি করে বাঁধা। নানাকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন—মৃতাই রূখা ব্লে (পুজো দিয়েছি তো)।

৩ রা ডিসেম্বর, ১৯৯৫, রবিবার। দুপুরে ভাত খেলাম শাশুড়ীর রান্না সিমের গোদক, মুলোর আওয়ানদুরু, হলুদ আর ল্যাঠা মাছের গোদক দিয়ে। দুধও খেলাম ভাতের সঙ্গে। ভাত খেয়ে বেলা আড়াইটার সময় আমরা স্বামী-স্ত্রীতে বেরিয়ে পড়লাম পায়ে হেঁটে। একটা কেটলিতে দুধ নিলাম সুরঞ্জন-তানিয়া-দেবযানীর জন্যে। স্ত্রীর শরীর খারাপ লাগছিলো, হাঁটতে পারছিলেন না তিনি। ভাবছিলাম এতটা রাস্তা কীভাবে তাঁকে নিয়ে চড়িলামে যাবো। এমন সময় দেখি পেছন থেকে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। গাড়ির মধ্যে দেখি অরুন্ধতী নগর মিশনের হেডপাদ্রী বাহাদুব দেববর্মা। তিনি আমার স্ত্রীর মামাতো ভাই। তিনি তাঁর গাড়িতে নিয়ে নিলেন আমাদেরকে এবং বটতলা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। সেখান থেকে বাসায় ফিরতেই দেখি আমাদেব বাসার সামনে পুকুব পাড়ে ট্রাইবাল যুবক-যুকতীদের ভীড়। দেখলাম একটা ১৬/১৮ বছরের মেয়ে খ্রীষ্টান হচ্ছে। পাদ্রী রানা কুসুম দেববর্মা বাইবেল থেকে মন্ত্রপড়তে লাগলেন। তাবপর একসময় পাদ্রী মেয়েটাকে নিয়ে কিসব পড়লেন। তারপর ট্রাইবাল পোষাক পরা মেয়েটা একসময় ঝুপ করে ডুব দিলো ডিসেম্বরের এই ঠান্ডা জলে। অনুষ্ঠান শেষ হতেই মেয়েটি পাদ্রীর সঙ্গে হেটে এলো সকলের সামনে দিয়ে। আমার মেয়ে দেবযানী বললো—ধাবা দ্যাখো দ্যাখো, মেয়েটির চোখে জল।' আমি বললাম, 'একজন কমেগেলো আমাদের ধর্মের লোক।' একটু পরে এলেন প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া তার বডিগার্ড প্রমোদ বাবুকে নিয়ে। তাঁকে একটু আগে সদ্য খ্রীষ্টান হওয়া মেয়েটার সম্পর্কে বললাম। তিনি বললেন, 'ক্রীস্টমাস আসছে বোঝা যাচ্ছে।' নগেন্দ্রবাবু এবার অন্য কথা পাড়লেন—'জানেন কুমুদবাবু, যারা সেদিন গাড়ি করে কালো পোষাকে আমার বাসার পাশে অপেক্ষা করছিলো তারা নাকি স্মাগলার, উগ্রপন্থী নয়। পুলিশের এস.পি. বলেছেন আমার জন্যে সিকিউরিটির চিন্তা করতে হবে না।'

৫ ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫, মঙ্গলবার। সকাল সাড়ে সাতটা-আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম 'নীল-করবী'তে ডাঃ নীলমণি দেববর্মার কাছে যাবো বলে। জনশিক্ষা আন্দোলনের ওপর একটা লেখা দেয়ার কথা তাঁর। ত্রিপুরায় জনশিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎদের মধ্যে ডাঃ নীলমণি দেববর্মা একজন। হেমন্ত-সুধন্বা-দশরথ-অঘোর-নীলমণি—এই পাঁচজন মিলে ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারমুক্তি আন্দোলন শুরু করেন ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের শেষপাদে এসে। ১৯৪৫ সালের ১১ ই পৌষ আগরতলার কাছে উপজাতি জনপদ দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় এই জনশিক্ষা আন্দোলনের সংগঠকরা এক সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মেলনের মাধ্যমে জনশিক্ষা সমিতি গঠন করেন। তারপর থেকে ত্রিপুরার উপজাতি সমাজে ১১ ই পৌষ পালন করা হয়ে থাকে জনশিক্ষা সমিতির পুণ্যদিন হিসেবে। সে-দিন জনশিক্ষা আন্দোলন এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে ত্রিপুরার শেষ রাজা মহারাজ বীরবিক্রম এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধি করে উপজাতি জনপদে প্রায় পাঁচশ মতো প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলে দেন এবং ত্রিপুরার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাউন সাহেব এই ব্যাপারে সাহায্য করেন। এই সব কথা

এখন ইতিহাস। এই ইতিহাস শুরু হয় আগরতলার উমাকান্ত ইস্কুলের ট্রাইবাল বোর্ডিঙয়ে। তরুণ নীলমণি ও অঘোর তখন ওই বোর্ডিঙ এর ছাত্র। আগরতলার উমাকান্ত ইস্কুলের ট্রাইবাল বোর্ডিঙ হচ্ছে ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের সূতিকাগার। এই সূতিকাগারে অঘোর-নীলমণির সঙ্গে গোপনে দেখা করতেন রাজনৈতিক ছেলে ধরা জননায়ক বীরেন দত্ত। কাজেই বীরেন দত্তকে ত্রিপুরা জনশিক্ষা আন্দোলনের নেপথ্য নায়কও বলা যায়। পরে জনশিক্ষা আন্দোলনের শেষে কমিউনিস্ট নেতা বীরেন দত্তর প্রভাবে অঘোর ও নীলমণি কমিউনিস্ট মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অঘোর দেববর্মাই হলেন ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে প্রথম কমিউনিস্ট, কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারী পি.সি.যোশী তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টির লাল কার্ড দেন। সেই অঘোর দেববর্মা এখন ত্রিপুরায় একজন প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট নেতা—দশরথ-অঘোর এই দুটো নাম পাশাপাশি চলে ত্রিপুরায়। অন্যদিকে কৃতীছাত্র হবার সুবাদে নীলমণি চলে যান ডাক্তারী পড়তে। তিনিই হলেন ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে সম্ভবতঃ প্রথম ডাক্তার। যক্ষ্মারোগ বিশেষজ্ঞ নীলমণি বাবু ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তা হিসেবে অবসর নিয়েছেন এই ক'বছর হলো। বিজয়কুমার চৌমুহনীতে ভগবান ঠাকুরের মেয়ে অনিতা দেববর্মার জমি কিনে 'নীল-করবী' নামে এক সুরম্য বাড়ি করে অবসর জীবনযাপন করছেন স্ত্রী করবী দেববর্মণের সঙ্গে। স্বামীর-স্ত্রীর নামেই এমন সুন্দর নামকরণ করা হয়েছে বাড়িটার। নীলমণির 'নীল' এবং করবীর 'করবী' নিয়েই এমন শ্রুতিমধুর এই নামকরণ—নীল-করবী। নীল-করবী তৈরি হয়েছে ত্রিপুরার রিয়াং উপজাতিদের টোঙ ঘরের আদলে। তাই দেখতে এতো সুন্দর। পাহাড়ের ওপর রিয়াং উপজাতিদের টোঙ ঘরের সঙ্গে প্রচীন জার্মান উপজাতিদের গথিক ভাস্কর্যের কেমন যেন একটা মিল আমার চোখে পড়ে। অনেকে বলেন, করবী ম্যাডাম রিয়াংদের আস্ত একটা টোঙঘর এনে শহরে বসিয়ে দিয়েছেন অত্যন্ত আধুনিক ভাবে। যেমন তিনি অত্যন্ত আধুনিক ট্রাইবাল লেডী, তেমনি তেমনি তাঁর অত্যাধুনিক ট্রাইবাল ঘর। কথাটা ঠিক-ই। রাজপরিবারের বাইরে তাঁর মতো আধুনিক ট্রাইবাল লেডী আর নেই বললে চলে। যেমন বিদ্যা তেমন-ই রুচিবোধ। ছিলেন কলেজের অধ্যাপিকা, পরে হলেন সবকারী মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল। তিনি বোধ হয় ত্রিপুরার উপজাতি মহিলাদের মধ্যে প্রথম প্রিন্সিপাল। উইমেনস্ কলেজের প্রিন্সিপাল থাকাকালীন তাকে নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে যেতে দেখেছি কলেজে আর তাঁর ডাকসাইটে মন্ত্রী-জামাই রতন চক্রবর্তীর ধলেশ্বরের বাড়ি। কি নন এই করবী ম্যাডাম, একাধারে কবি, সমালোচক ও চোখ ধাঁধানো বাগ্মী। সেমিনারগুলোতে তাঁর কথার ফুলঝুরি মন্ত্র মুগ্ধের মতো শোনে অনেকে। এখনও তাঁর যে দেহসৌষ্ঠব, যৌবনে তাঁকে দেখে যদি কারের চোখে ভিরমি লাগতো, তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। আমার মনে হয় করবী ম্যাডামের সৌন্দর্য বোধ হয় শুধুমাত্র দেহলালিত্যে নয়, আসল সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তাঁর স্মার্টনেসেব মধ্যে। এই বয়সেও কী স্মার্ট! পোষাক-আসাকেও খুবই পরিপাটি তিনি। বাঙালি মেয়ের মতো শাড়ি যখন পরেন তখন চেয়ে দেখার মতো। আবার ফোক ডিজাইনের ট্রাইবাল পাছড়া (ত্রিপুরার উপজাতি মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র) যখন পরেন ম্যাডাম, তখনও অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। বছর তিনেক আগে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে করবী দেববর্মণকে ট্রাইবাল পাছড়া পরে আসতে দেখে সকলের চোখ গেল ধাঁধিয়ে। ফিস ফিস করতে শুরু করলো সবাই।

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫, শুক্রবার। আজ সকাল সাতটায় বেরিয়ে লেক চৌমুহনীতে সি. পি. আই (এম)-এর পুর নির্বাচনী অফিসে গেলাম। আগরতলা পুরসভার ৬নং এস. টি কেন্দ্রে লেখক শঙ্খশুভ্র দেববর্মণের বাবা সলিল দেববর্মা সি. পি. আই (এম)-এর প্রার্থী হয়েছেন। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন এ্যাডভাইজার জিতেন ঠাকুরের ছেলে কর্নেল হিরণকান্তি দেববর্মা। সকাল সাড়ে সাতটায় প্রার্থী সলিলবাবু

এলেন। রিক্সা থেকে নেমে আমাকে দেখে বেশ খুশীই হলেন এবং হাতে হাত মেলালেন। ঠিক এরপরে কমরেড যুগল বৈদ্য ও প্রদীপ দের নেতৃত্বে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেন শুরু হলো। আস্তাবল বাজারের একেবারে পশ্চিমের প্রান্ত থেকে শুরু করে আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত ঘরে ঘরে গিয়ে মেহের কালীবাড়ী পর্যন্ত এলাম। এই পরিক্রমার মধ্যে প্রচীন উল্লেখযোগ্য পরিবার পড়েছিলো লেবু কর্তার দুই ছেলে বিপিন কর্তা ও বঙ্কিম কর্তার বাড়ি। তাছাড়া, লেবু কর্তার আর এক রাণীর পুত্র গিরীশ কর্তা'র বাড়ি। পরিক্রমার পরিধির মধ্যে বেশ কিছু ট্রাইবাল পরিবার ছিলো। কাটাখালের বাঁধের নিচে এবং প্রগতি বিদ্যালয় ও আস্তাবল চৌমুহনীর মেইন সড়কের উত্তর পাশের এই অংশ অনেকটা বস্তি টাইপের। পরিক্রমার সময় নাকে মদ জ্বাল দেয়ার গন্ধ আসছিলো। দেখলাম মরাগরিবের কুঁড়ে ঘরের পাশাপাশি ধনীর অট্টালিকাও আছে। গলিগুলো খুবই অপরিস্কার অপরিচ্ছন্ন, ড্রেনগুলো অনাব্য এবং সংস্কারের অপেক্ষায় দিনগুনছে। এর আগে মহারাজ রাধাকিশোরের বড়ো ভাই লেবু কর্তার বাড়িতে কোনদিন যাইনি। লেবুকর্তার পুত্রবধূ বিপিন কর্তার স্ত্রীকে দেখলাম উঠোনে রৌদ্রে পিঠ করে পৃথুল দেহ নিয়ে বসে আছেন। বঙ্কিম কর্তার বাড়িতে দেখলাম একটি যুবক রাজ আমলের আলখাল্লা পরে রাজকীয় পোষাকে কাজ করছে। লেবু কর্তার আরেক রাণীর ঘরের অবস্থা খুব খারাপ দেখলাম। বংশকৌলিন্য থাকলেও আর্থিক সচ্ছলতা আছে বলে মনে হলো না।

ভোট পরিক্রমায় কংগ্রেস প্রার্থী হিরণকান্তি দেববর্মার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। কংগ্রেসের পনেরো-কুড়িটা ছেলে হিরণকান্তিকে নিয়ে ডোর টু ডোর প্রচারে বেরিয়েছে। কর্নেলের বুকে দেখলাম ঝোলানো রয়েছে একগাদা সোনার মেডেল। সামনাসামনি দেখা হয়ে গেলো দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সলিল দেববর্মা ও হিরণকান্তি দেববর্মার সঙ্গে। কর্নেল সাহেব বয়েসে সলিলবাবুর থেকে বড়ো। তিনিই প্রথমে সলিলবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। কর্নেল সাহেবের ওপর আমার একটু দুর্বলতা ছিলো। তিনি একসময় আমার কাছে ককবরক শিখেছিলেন - জনান্তিকে এ কথাটা বলে রাখলাম।

ভোট পরিক্রমার আরেকটা বাড়ি এই এলাকায় নজর কেড়ে নিলো, সেটা হলো এ্যাডভোকেট ধীবাজ গুহর সুরম্য অট্টালিকা - অনেকটা শ্বেতপাথরের বাড়ি বলে মনে হলো।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫, শনিবার । আজ ছিলো সেকেণ্ড সেটারডে, স্ত্রীর অফিস বন্ধ। তিনি সকালে একমুঠ খেয়ে তাঁর বাপের বাড়ি চলে গেলেন হেরমায়। তাঁকে একাকা ছাড়তে ভয় হচ্ছিল হাইপোথাইরিয়ডইজমের রোগী বলে। গ্রামে গেলে পর আমার শ্বশুর মশায় শ্রীযুক্ত গণেশ দেববর্মা তাঁর মেয়েকে একটা ভালো খবর দিলেন। খবরটা হলো - বন শূকরের মাংস পাওয়া গেছে অনেকদিন পরে। ঘটনাটা হয়েছে কি, চড়িলামের আড়ালিয়ায় আমার শ্বশুর মশায়ের বন্ধু আশাবুদ্দিন সায়েবের ছেলেরা ধান ক্ষেত থেকে একটা বন্য শূকর মেরে হেরমায় আমার শ্বশুর বাড়িতে খবর দিয়েছে। এই খবর পেয়ে আমার জ্যাঠতুতো শালা বলরাম এবং খুড়তুতো শালা দীনেশ (মাস্টার) ১২০০ টাকায় শূকরাটা কিনে এনে ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেছে। মাংস হয়েছে মাত্র ২৫ কেজি। অনেকদিন পরে বন শূকরের মাংস পেয়ে একেবারে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। আমার শ্বশুর মশায় কোনোরকমে ১ কেজি কিনেছেন। তার থেকে পরের দিন রবিবারে আধসের মাংস এনেছেন স্ত্রী ফুলকুমারী। রাতের বেলায় খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম আমরা এই বন্যবরাহের মাংস। কিন্তু আমার বড়ো মেয়ে তানিয়া খেলো না— শূকরের মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে। স্ত্রীর কাছ থেকে আজ অজানা এই তথ্য পেলাম - জোড়া শিকার পেলে নাকি একটা শিকারের মাংস গ্রামের বাইরে রান্না করে খেতে হয় —সে মাংস গ্রামে ঢোকানো যায় না। আমার স্ত্রী তাঁর বিয়ের আগে গ্রামের বাইরে এরকম অনেকবার মাংস খেয়েছেন। আমার স্ত্রী আগরতলায় ফেরার পথে পুরাইবাসা হয়ে লালসিংমোড়া বাজার করে বাড়ি ফিরেছেন।

হেরমার কাছে পুরাইবাসায় আমার বড়ো পিসশাশুড়ি নলিনী দেববর্মার বাড়ি। ফুলকুমারী গিয়েছিলেন পিসিরবাড়ি তাঁর পিসতুতো ভাই সুভাষের কাছ থেকে কিছু টাকা হাওলাত আনতে গ্যাস নেবেন বলে। মহারাণী তাঁর এম. পি. কোটায় গ্যাসের পারমিট দিয়েছেন। কিন্তু টাকার অভাবে নিতে পারছি না। আমার স্ত্রী গিয়ে দেখেন তাঁর ভাই সুভাষ ২য়বার বিয়ে করার জন্যে সূতারমোড়ায় যাবে বলে দলেপালে মদ খাচ্ছে। আগের স্ত্রীর সঙ্গে আমার এই শালার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়ে ভাগ করে নিয়েছে তারা। শালার ভাগে ছেলে, শালার বৌয়ের ভাগে মেয়ে। শালা সুভাষ সি.আর.পি.এফ'এ চাকরি করে। মাস কয়েক আগে তারা স্বামী-স্ত্রীতে আমাদের বাসায় এসে দুপুরে খেয়েছিলো। বৌটা চাকরি করতো বিশালগড়ের কৃষি অফিসে। ব্লক অফিসে গেলে দেখা হতো আমার সঙ্গে। কুমুই (জামাইবাবু) বলে ডেকে চা খাওয়াতো আদর করে। দেখতেও সুন্দরী ছিলো সে। আসলে সে ছিলো বিধ্বস্ত, আশির দাঙ্গায় আগের স্বামী মারা যায় তার। তারপর শালা সুভাষের প্রেমে পড়ে সে। সেই মেয়ে আজ আবার আরেকটি স্বামী নিয়ে ঘর করতে গেলো আমার শালাকে ছেড়ে।

১১ই ডিসেম্বর, সোমবার, ১৯৯৫। সকাল ৭টায় আমার বাসার পাশে পাল্লা-বাটখারা অফিস থেকে পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের সি. পি. আই. এম প্রার্থী সলিল দেববর্মাকে নিয়ে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনে বেরোলাম। বেরোতেই দক্ষিণ চড়িলামের সি. পি. আই ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী গণেশ ভৌমিক এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এ. ডি. সি থেকে ব্যবসা-পাতির লোন পাবার জন্যে। তিনিও আমাদের সঙ্গে কয়েকটা বাড়ি ঘুরলেন। তারপর মেয়ের বাড়ি চলে গেলেন। প্রার্থী সলিলবাবুকে নিয়ে আমরা গৌরাঙ্গ সাহার বাড়ি থেকে শুরু করে কমলা চক্রবর্তীর বাড়ির পাশ দিয়ে সুপরিবাগানে ঢুকলাম। সুপুরি বাগানে মানিক চক্রবর্তীর দোকান হয়ে গেলাম রবীন্দ্র সান্নিধ্য ধন্য যামিনী আচার্যর বাড়ি। সেখান থেকে বঙ্গ ঠাকুর দেওয়ান বাড়ি। সুপুরি বাগান শেষ করতে লেগে গেলো বেলা সাড়ে ন'টা। ডোর টু ডোর ক্যাম্পেন শেষ করে প্রার্থী সলিল দেববর্মা ও কমরেড যুগল বৈদ্য আমার সঙ্গে এলেন আমার বাসায়। আমার স্ত্রী তখন অফিসে যাবেন বলে ব্যস্ত। ছোট মেয়ে দেবযানী চা করে খাওয়ালো। আমার পড়ার ঘরে বসেছিলেন তাঁরা। সলিলবাবুকে শরৎচন্দ্র দাশ প্রণীত তিব্বতী অভিধান দেখাতেই তিনি খুব আগ্রহ সহকারে দেখতে লাগলেন সেখানা। যুগলবাবু বললেন - "মনে হচ্ছে তিব্বতী হরফের সঙ্গে আমাদের দেবনাগরী হরফের বেশ মিল আছে।" আমি বললাম, "তিব্বতী হরফ ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপি থেকেই উদ্ভূত।" যুগলবাবুকে শেষে আমি চাইনিজ গ্রামার দেখালাম। চাইনিজ লিপি দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে ৬২ বছর বয়সী সলিল দেববর্মা ও ৪৮ বছর বয়সী যুগল বৈদ্য চলে গেলেন আমার বাসা থেকে ।

সলিলবাবুরা চলে যেতেই এলেন দক্ষিণ চড়িলামের কামরাজ কলোনীর ডাক্তার চিত্তরঞ্জন মোহন্ত দাশ। তিনি এলেন চড়িলামের পার্টির ব্যাপারে আলোচনা করতে। কিছুক্ষণ পরে তিনি চলে গেলেন সি. পি. আই. নেতা অঘোর দেববর্মার বাড়ি।

ডাঃ মোহন্ত দাশ চলে যেতেই এলেন কমরেড গণেশ ভৌমিক। গণেশবাবুকে বসতে বলে আমি ঢুকলাম বাথরুমে স্নান করতে। এমন সময় শুনতে পেলাম ককবরক ভাষায় কে যেন ডাকলো- 'কুমুদবাবু দা তঙ?' - কুমুদবাবু আছেন কি? আমিও ককবরকে বাথরুম থেকে উত্তর দিলাম- ছাব?' আচুকদি- কে ? বসুন। বাথরুম থেকে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে দেখি বিশ্রামগঞ্জ থেকে আমার মামাতো সম্বন্ধী ননী দেববর্মা ও তাঁর স্ত্রী মুখ কালো করে ঘরের বাইরে বসে আছেন। আমার এই দাদা-বৌদি দু'জনেই স্কুলে পড়ান। কাগজে দেখেছিলাম, তাঁদের পুত্রবধূকে বিশ্রামগঞ্জ বাজারবারের দিন কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে ঘটনাটা বললেন তাঁরা। তখন সন্ধ্যে ঘোরঘোর, এমন সময় একটা মারুতি গাড়ি

এসে তাঁদের বিশ্রামগঞ্জ কলোনির বাড়িতে ঢুকে পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে পুত্রবধূকে ওই গাড়িতে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে একেবারে খোয়াই শহরের কাছে পূর্ব দুর্গানগরে নিয়ে যায়। গাড়িটা পরে ধরা পড়েছে, খোয়াই থানায় আছে এখন। পরামর্শের জন্যে বিকেলে তাঁদেরকে নিয়ে গেলাম কমরেড অঘোর দেববর্মার বাড়ি। তিনি ডি এস পি রাজেন্দ্র দেববর্মাকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন। কিন্তু ফোনে তাঁকে পাওয়া গেলো না। পরে তিনি আমাদের বললেন এম এল এ দেবব্রত কলইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী টি এইচ পি পি নেতা দেবব্রত কলইয়ের কোয়ার্টারে গিয়ে আলোচনা করলাম সব। মনোযোগ দিয়ে তিনি শুনলেন সব কথা। রাত দশটা নাগাদ আমরা ফিরে এলাম তাঁর বাসা থেকে। তিনি একটা কিছু করবেন বলে আশ্বাস দিলেন আমাদের।

১৪ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯৯৫ । ভোর ৪ টেয় উঠলাম। কিছুক্ষণ লিখে ছাদে গিয়ে ঝাঁট দিলাম। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আমার কাকী শাশুড়ি জ্যোৎস্না দেববর্মাকে জাগিয়ে দিলাম। তিন সাড়ে ছ'টায় বাস ধরে মটরস্ট্যাণ্ড থেকে তাঁর বাপের বাড়ি কমলপুরের মরাছড়ায় যাবেন। তাঁর মা নাকি খুব অসুস্থ। গতকাল সন্ধ্যে বেলায় হেরমা থেকে তিনি এসেছেন। মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ি থেকে খুব ভোরে উঠে কমলপুর রওনা হবেন। কাকী বাড়ি থেকে ডিম এনেছিলেন, তাই-ই রান্না হলো রাতে। কাকীর সাজ-গোজ করে বেরোতে বেরোতে বেশ দেরী হলো। আমি একটা রিক্সা ডেকে তাঁকে রওনা করে দিলাম।

সাতটার সময় বেরিয়ে পড়লাম পুর-প্রার্থী সলিল দেববর্মার সঙ্গে প্রভাতী প্রচারে। যাবার পথে আমার শ্যালক সুজিৎ দেববর্মার সুপুরিবাগানের বাসায় গেলাম আমার গ্যাস কেনার ব্যাপারে আলোচনা করতে। তার বিলিতি কালো কুকুরের ভয়ে ঘরে আর ঢুকলাম না -বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলে কর্নেল বাড়ির সামনে এসে দেখি সলিলবাবু প্রভাতী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। আমরা সদলবলে বাড়িবাড়ি যেতে যেতে একসময় চলে এলাম প্রয়াত ধীরেন্দ্র ক্যাপ্টেনের বাড়ি। ধীরেন্দ্র ক্যাপ্টেনের বড়ো ছেলে শিশির দেববর্মা নির্দল প্রার্থী হয়ে পুর পরিষদ নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। তাকে সমর্থন করে টি. টি. এন. সি-এই উপজাতীয় দল। শিবিরবাবুর বাড়ি ঢুকতেই দেখি আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের অধিকর্তা নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা সেখানে। তিনিই টি. টি. এন. সির ব্রেণ বলে সকলে বলেন। শিবিরবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম পাশের বাড়ি কিরীট কর্তার বাড়ি। কিরীটবাবুর ছোট মেয়ে বললো তার মা গলব্লাডার অপারেশনের জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। কিরীট কর্তার বাড়ি পেরিয়ে এডভাইজর চৌমুহনী দিয়ে কৃষ্ণায়নের পাশ দিয়ে পরপর কতকগুলো ট্রাইবাল-বাঙালি বাড়ি ভোট চাইতে গেলাম। এক ট্রাইবাল বাড়িতে (কনক কুটির) একটা ময়না পাখি এখনো দেখতে পেলাম। দেখি এক বৃদ্ধ ট্রাইবেল ভদ্রলোক ময়না পাখিটাকে খাওয়াচ্ছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম পাখিটা ত্রিপুরার জঙ্গলেরই। তিনি বললেন, ত্রিপুরার খুব গভীর জঙ্গলে ময়না পাখি এখনো পাওয়া যায়। পালক ওঠেনি এমন ছোট থাকতে ময়নাটা এনেছিলেন তিনি এক হাজার টাকা দিয়ে। মানুষের মতো এখন কথা বলতে পারে। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম গলির ভিতর দিয়ে একেবারে অমরেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি। তিনি একজন প্রাক্তন পুলিশ আফিসার। তাঁর বাড়ির সামনে একটা জলা দেখতে পেলাম। জলাটা নাকি মহারাজাদের ঘোড়ার কোচম্যানদের পরিবারের। জলাটার পাশেই একটা মুসলিম পরিবার এখনো আছে রাজ আমলের স্মৃতি বহন করে। এই বাড়িটি রাজার কোচম্যানের বংশধরের। সর্বশেষে গেলাম আমরা ত্রিপুরা দর্পণের সম্পাদক সমীরণ রায়ের বাড়ি। সমীরণ রায়ের বাবা শ্রীযুক্ত সতীশ রায় আমাদের স্বাগত জানালেন। সমীরণবাবু তাঁর বাবার সঙ্গে প্রার্থী সলিল দেববর্মার আলাপ করিয়ে দিলেন। সমীরণের মা তখন পুজোর ফুল-দুর্বা তুলছিলেন তাঁদের বিশাল বাড়ির নয়নমনোহর ফুলবাগান থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ককবরক ক্লাস সেরে রাত সাড়ে ছ'টায় পুনরায় এলাম অমরেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি। প্রার্থী সলিল দেববর্মার সমর্থনে ঘরোয়া মিটিং করতে । মিটিংয়ের সভাপতি হলেন অমরেন্দ্র দেববর্মা স্বয়ং। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শম্ভু চক্রবর্তী, কমরেড প্রাণগোপাল চক্রবর্তী। প্রার্থী সলিলবাবু মিটিং চলাকালে এসে সুন্দর সাজানো-গোছানো একটা বক্তৃতা করে চলে গেলেন সুপুরিবাগানের মধুসূদন দেববর্মার বাড়িতে আরেকটা ঘরোয়া মিটিংয়ে যোগ দিতে। সলিলবাবুর বাঙলা উচ্চারণ প্রায় কলকাতার মতন। সলিলবাবুদের পরিবারের বাঙালি পরিবারের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক অনেকদিনের। তাঁর মা বাঙালি, সম্ভবত সিংভূমের এক সামন্ত পরিবারের মেয়ে। এখন বোঝা যায় সলিলবাবুর ছেলে শঙ্খশুভ্র দেববর্মা এত ভালো বাঙলা লেখে কী করে। সলিল দেববর্মার আপন খুড়তুতো দিদি হলেন অধ্যাপিকা করবী দেববর্মা - তার মাও বাঙালি মেদিনীপুরের। মিটিঙে শেষ বক্তা ছিলাম আমি। আমার বক্তৃতা অনেকে তারিফ করলেন দেখলাম।

১৫ই ডিসেম্বর, শুক্রবার, ১৯৯৫ । ভোর ছ'টার সময় যখন আমার বাসার দক্ষিণমুখো বারান্দায় বসে ধীরেন্দ্র ক্যাপ্টেনের বাড়ির দিকে মুখ করে ডায়েরী লিখছি, তখন দেখি প্রখ্যাত গণশিল্পী কমরেড হীরালাল সেনগুপ্ত সদলবলে ভোটের গান গাইতে গাইতে আমাদের বাসার সামনে দিয়ে নাজির পুকুর পাড়ের দিকে চলে গেলেন। গায়ক নেপাল করের হাতে হাতমাইক, তার পাশেই একজন মহিলা গায়িকা, হীরালালবাবু পাশ থেকে হাত নেড়েনেড়ে তাল দিচ্ছিলেন জীবন মেটার কায়দায়। হীরালালবাবুর বিশাল দেহে আলখাল্লার মত পোষাক, তার ওপর মাথায় বেতের টুপী, এই পোষাকে তাঁকে মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ লালন ফকিরের মত। বাড়ির গেইট ও বারান্দা থেকে সকলেই শুনছিল আগরতলা পুরপরিষদের ভোটের গান 'গাও সকলে পুর ভোটের গান-পুরবাসীরে।'

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫, শনিবার । সকাল সাড়ে আটটায় আমরা স্বামী-স্ত্রীতে গেলাম ডঃ কমল কুমার সিংহর বাড়ি। সেখান থেকে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পিকনিকের বাসে চেপে সকাল সাড়ে - দশটা নাগাদ গেলাম নীরমহলে। বাসে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ছিলেন বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদ, ডঃ কমল কুমার সিংহ, ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাশশাস্ত্রী, অধ্যাপক সুদীপ বসু, অধ্যাপিকা চম্পা দাশগুপ্তা, অধ্যাপিকা শিপ্রা রায়। কমলবাবুর স্ত্রী ও ছোট মেয়েও ছিলেন। অধ্যাপক সুদীপ বসুর স্ত্রীও গিয়েছিলেন। কমলবাবু খুব ভোরে উঠে বাড়িতে পাঁঠা কাটান - তিনটে তরতাজা পাঁঠা। আমাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলের ঠাকুরও ছিলেন। প্রায় ১২টা নাগাদ আমরা রুদ্রসাগরে গিয়ে পৌঁছোলাম। ছাত্র-ছাত্রীরা রুদ্রসাগরের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে গেলো। আরও মুগ্ধ হয়ে গেলো দূর থেকে নীরমহলের সৌন্দর্য দেখে। একবার আমাব স্ত্রীর সঙ্গে প্রখ্যাত ভাষাবিদ কোলকাতার ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের সঙ্গে নীরমহল দেখতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন ডঃ মল্লিকের ভাইঝি-জামাই ব্যাঙ্কের অফিসার আগরতলার ভবানন্দ মজুমদার। পিকনিকের বাস থেকে নেমে আমরা সরকারী রান্না ঘরের সামনে রান্নার সব জিনিসপত্র নামালাম। অনেকগুলি আইটেম হবে খাবার- ডাল, বেগুন ভাজা, আলু-কপির তরকারি, চচ্চড়ি, ছানার ডালনা, মাছের ঝোল, পাঁঠার মাংস, জলপাইয়ের চাটনি সঙ্গে স্যালাড । আমার স্ত্রী ট্রাইবাল পোষাকে কমলবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে ছাত্রীদের নিয়ে বসে গেলেন তরকারি কুটতে । দুজন ঠাকুর উনুন জ্বাললো। এর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতর থেকে প্রশান্ত কুণ্ড, পঙ্কজ কর, রনেশ রায়, বকুল, খালেদ মিঞা পালোয়ান, ঋতুপর্ণা চক্রবর্তী, মৌসুমী পাল প্রমুখ ব্রেকফাস্ট খাওয়ালো ডিমসেদ্ধ পাঁউরুটি ও রসগোল্লা দিয়ে। ছাত্র-ছাত্রীরা হৈই হুল্লোড় করতে লাগলো রুদ্রসাগরের পারে। বেলা দুটো নাগাদ শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত অনিল সরকার আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমরা সবাই তাঁর সঙ্গে গেলাম সাগরমহলে। সেখানে প্রখ্যাত লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণের ৮১তম

স্মৃতি সভা ছিল। সাগরমহলের দোতলায় সুদৃশ্য ঘরে স্মৃতি সভা শুরু হল। ডায়াসের সামনে মল্লবর্মণের একখানা হাতে আঁকা ছবিও ছিল। সভার সভাপতিত্ব করলেন ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদ। ভাষণ দিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতিরক্ষা সমিতির সভাপতি ডঃ কমল কুমার সিংহ ও সমিতির সম্পাদক, রুদ্রসাগর মৎস্যজীবী সমিতির সম্পাদক প্রমুখ। ডায়াসে বসে ছিলেন শ্রীযুক্ত অনিল সরকার, ডঃ আহমেদ, ডঃ কমল কুমার সিংহ, ডঃ দাশশাস্ত্রী। সভা চলাকালীন বাংলা বিভাগের প্রথম বার্ষের ছাত্রী অনিন্দিতা দাশগুপ্ত গুরুতরভাবে অসুস্থ পড়ে। তাতে শিক্ষামন্ত্রীর মূল্যবান বক্তব্য কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখতে হয়। সভা শেষে শিক্ষামন্ত্রী চলে আসেন পিকনিক স্পটে। তারপর পংক্তি ভোজনে বসে খেয়ে আগরতলা চলে যান ছাত্র-ছাত্রীদের নীরমহল দেখার ব্যবস্থা করিয়ে দিয়ে। তখন সাড়ে তিনটে বাজে। ছাত্র-ছাত্রীরা খাবার আগে স্পিডবোটে চেপে শিক্ষকদের সঙ্গে নীরমহল দেখে এল। আমরা স্বামী-স্ত্রী আর গেলাম না, রুদ্রসাগরের পাড়ে পাকা ঘাটে বসে পাখিদের আনাগোনা দেখতে লাগলাম। আমরা বিয়ের পর অনেকবার পৌষ সংক্রান্তিতে এই রুদ্রসাগরে এসে সারা রাত জেগে ট্রাইবেল মেয়েদের বাউল গান শুনেছি, তারপর খুব ভোরে স্নান সেরে বড় মাছ কিনে বাড়ি ফিরেছি। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা সন্ধ্যে ৬.১০-এ বাসে চাপলাম। আগরতলা পৌঁছলাম রাত ৭.৩০-এ।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫, রবিবার। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত আগরতলার পুরসভার সি. পি. আই. এম প্রার্থী সলিল দেববর্মাকে নিয়ে ভোটের প্রচারে বেরুলাম। দুপুর আড়াইটা থেকেও ভোটের প্রচারে গেলাম এডভাইজার চৌমুহনী থেকে বিজয়কুমার চৌমুহনী পর্যন্ত রাস্তার উত্তর দিকে জনবসতি এলাকায়। সন্ধ্যে পাঁচটায় ডোর টু ডোর প্রচার শেষ করে আমি গেলাম ৬নং ওয়ার্ডের নতুন পল্লীতে ডাঃ প্রবীর চক্রবর্তীর বাড়ির ঘরোয়া মিটিং-এ বামফ্রন্টের পক্ষে বক্তব্য রাখতে। পাশে একটু পরে বিদ্যাধর দের বাড়ি তখন চলছিলো ৭নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী আঞ্জলি চ্যাটার্জীর উঠোন সভা। মাইকে শুনতে পেলাম - প্রথমে বক্তৃতা করলেন আই. এন. টি. ইউ সি নেতা নীরদবরণ দাশ, তারপর শিক্ষক মণিলাল চ্যাটার্জী, তারপর প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া। সবশেষে বক্তৃতা করলেন প্রার্থী অঞ্জলি চ্যাটার্জী। তিনি আবার করবী দেববর্মণের ছোট্ট ভাই কুশল দেববর্মণের স্ত্রী এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এল এম মুখার্জীর শ্যালিকা। বক্তা নীরদবরণ দাশ তার বক্তব্যে অঞ্জলির চ্যাটার্জীর উপজাতি পরিবারে বিয়ের কথা উল্লেখ করে বললেন- এটা একটি বাঙালি উপজাতির মৈত্রীর প্রতীক। আমি আমার সভা শেষ করে পাশে বংশীঠাকুরের মেয়ে গীতার বাড়ি নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায় এলাম। দেখলাম তিনিও সভা শেষ করে এসে গেছেন। আমার বান্ধবী পবিত্ররাণী জমাতিয়া গিয়েছিলেন ১৩নং পৌর ওয়ার্ডে কংগ্রেস আই প্রার্থী সাবিত্রী পালের পক্ষে ভোট প্রচারে। তিনিও এসে গেছেন প্রচার শেষ করে। বান্ধবীর কাছে চা খেতে চাইলাম। বান্ধবী হেসে ককবরকে বললেন- 'কিচিঙ নন' চা খাঁরুয়া, নৃঙ বামফ্রন্টনি পক্ষে আঙ কংগ্রেসনি পক্ষে, তাবুক চৃঙ জুদা।' (বন্ধু তোমাকে চা খাওয়াবো না, তুমি বামফ্রন্টের পক্ষে, আমি কংগ্রেসের পক্ষে, এখন আমরা আলাদা)। বান্ধবীর কথা শুনে বন্ধুবর নগেন্দ্র জমাতিয়া হেসে উঠলেন হোঃ হোঃ করে। পরে বান্ধবী দুধ ছাড়া ধোঁয়াওড়া লাল চা খাওয়ালেন। ঠাণ্ডার সময় দারুণ লাগল বান্ধবীর দেয়া চা।

চা খেয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম বিজয়কুমার চৌমুহনী দিয়ে বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়ি সি. পি. আই সদর বিভাগীয় অফিসের দিকে। বিজয়কুমার চৌমুহনীতে এসে দেখি সি. পি. আই প্রার্থী সাহানা সেনগুপ্তের নির্বাচনী অফিসে নাগা শাল গায়ে টুপি মাথায় বসে আছেন গণশিল্পী কমরেড হীরালাল সেনগুপ্ত নন্দদুলাল দেববর্মা, রামচরণ দেববর্মা, হিমাদ্রী দেববর্মা প্রমুখের সাথে। আমাকে দেখে নির্বাচনী অফিস থেকে হীরালাল বাবু বেরিয়ে এলেন। তাঁকে বললাম, 'সেদিন সকালে আপনার

ভোটের গান শুনলাম, ওই প্রভাতী নির্বাচনী গানটা আমার দরকার, আমি রেকর্ড রাখবো। একদিন আমাদের উত্তর পুরুষেরা জানতে পারবে এভাবে আগরতলায় এক সময় প্রভাতী ভোটের গান গেয়ে বেড়াতেন গণশিল্পী হীরালাল সেনগুপ্ত।'

হীরালাল বাবুর সঙ্গে কথা শেষ করে বীরচন্দ্রবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি কমরেড সাহানা সেনগুপ্ত তাঁর পঁচাশি বছরের স্বামী দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তের সঙ্গে বসে দিব্যি ভোটের আলোচনা করছেন, তখন রাত ৮.৩০। একটু পরে এলেন কমরেড প্রশান্ত কপালী। কিরীট দত্তকে দেখলাম নাগা শাল গায়ে দিয়ে বসে থাকতে। চড়িলামের পার্টি কর্মী মনোরঞ্জন দেবনাথ বলল, অমূল্য শর্মার জ্বর হয়েছে। পাশের ঘরে শুয়ে আছে। আমি কমরেড অমূল্য শর্মাকে গিয়ে দেখে এলাম, কথাও বললাম তার সঙ্গে। পরে বাড়ি ফিরলাম রাত ন'টায়।

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫, সোমবার। সকাল সাড়ে সাতটায় আগরতলা পুরপরিষদের ৬ নং ওয়ার্ডের সি পি. আই. (এম) প্রার্থী সলিল দেববর্মার ডোর টু ডোর ভোট প্রচারে নতুন পল্লীতে গিয়ে শুনি সলিল বাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সকালে বাড়ি বাড়ি প্রচার হবে না। হবে বিকেল চারটেয়। সি. পি. আই. (এম) কর্মীদের মুখে এই কথা শুনে আমি পাশেই বংশীঠাকুরের মেয়ে গীতার বাড়িতে প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায় গেলাম। নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী আমার বান্ধবী, লাল চা খাওয়ালেন। নগেন্দ্রবাবু বললেন, আজ দুপুরের দিকে তাঁরা তাঁদের গ্রামের বাড়ি তোতাকামিতে চলে যাচ্ছেন। মা-বাবা দু'জনেই অসুস্থ, ফিরবেন দু'তিন দিন পরে। নগেন্দ্র বাবু আরো বললেন, 'রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা ককবরক লেখক ও গবেষকদের নিয়ে একটা প্রকাশনা সংস্থা করতে চান।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, রবীন্দ্রবাবু সেদিন আমার বাসায় এসেছিলেন, প্রস্তাবটা আমিই দিয়েছি।' নগেন্দ্রবাবু বললেন, 'রবীন্দ্র কিশোরের সঙ্গে ককবরকের হরফ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁকে আমি বলেছি, বর্তমানে ককবরক লেখাকে বৃহত্তম পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে হলে বাঙলা হরফই ভালো হবে, রোমান হরফে পাঠক কম।' আমি বললাম, 'হরফের বিষয়টা লেখকদের ওপর ছেড়ে দেয়াই ভালো, যাঁর যে হরফ পছন্দ করেন, তাতেই লিখুন, সে বাঙলা হরফই হোক, আর রোমান হরফই হোক।' নগেন্দ্রবাবু অন্য প্রসঙ্গে গেলেন এবার। বললেন, 'পরশুদিন মহারাণীর কাছে গিয়েছিলাম, মহারাণী আমাকে দেখে বললেন, কুমুদবাবুকে গ্যাসের পারমিট দিয়ে দিয়েছি।' আমি বললাম, 'গ্যাসের পারমিট মহারাণী দিয়ে আমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছেন, এখনো টাকা সংগ্রহ করতে পারিনি, কম টাকা নয়, একেবারে বাইশশো টাকা।' নগেন্দ্রবাবু হেসে বললেন, 'ধার নিন, আমি ধার করেই তো সংসার চালাচ্ছি, এর মধ্যে আমার পনেরো হাজার টাকার ধার নেয়া হয়েছে, সরকার এম. এল. এ ভাতাটা দিলেই শোধ করে দেবো সব।'

বান্ধবীর হাত থেকে একটু সুপুরি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি। বিজয়কুমার চৌমুহনীতে এসে ভাবলাম, করবী দেববর্মণের বাড়িতে ঢুকে সলিলবাবুর অসুস্থতার একটু খবর নেয়া যাক। নীল-করবীর দোতলায় উঠেই দেখি করবীদি একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'জানেন তো কুমুদবাবু, আমার ভাই সলিল তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আপনাদের ডাক্তারবাবু সলিলকে দেখতে গেছেন।' আমি বললাম, 'আমিও আর বসবো না, সলিলবাবুকেই দেখতে যাই।'

ডাঃ নীলমণি দেববর্মার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বীরচন্দ্র দেববর্মার পাশ দিয়ে বাঁদিকে সৎসঙ্গের সামনে দিয়ে সোজা চলে গেলাম বিদুর কর্তা চৌমুহনীতে। বিদুর কর্তা চৌমুহনী থেকে ডাইনে মোড় নিয়ে দৈনিক সংবাদের সামনে গিয়ে ঢুকে পড়লাম পত্রিকা অফিসে। সেখান থেকে প্রভাতের কাছ থেকে আমার বিনে পয়সায় পাওয়া ভূপেনবাবুর দৈনিক সংবাদ খানা সংগ্রহ করে পাশেই রাধামোহন

ঠাকুর (সলিল দেববর্মার প্রপিতামহ) এর বাড়িতে ঢোকার মুখে দেখি সি. পি. এম.-এর কর্মী বাদল মুখার্জী, শম্ভু চক্রবর্তী, প্রাণগোপাল চক্রবর্তী প্রমুখেরা সলিল বাবুকে দেখে বেরিয়ে আসছেন। আমাকে দেখে তাঁরা বললেন, 'যান, সলিলবাবু কিছুটা ভালো আছেন।'

সলিল বাবুদের সাবেকী ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সলিলবাবুর ছেলে শঙ্খশুভ্রের নাম ধরে ডাকতেই বেরিয়ে এলো কৃতী লেখক শঙ্খশুভ্র দেববর্মা। আমাকে দেখেই শ্রীমান শঙ্খশুভ্র বললো, 'চলুন বাবার কাছে।' এই বলে ভেতরের অন্দরের ঘরে নিয়ে গেলো সে। গিয়ে দেখি, সলিলবাবু একটা রাজ আমলের সাবেকী খাটে লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। তার খাটের ঠিক সামনেই আরেকটা নিচু চৌকি খাটের সঙ্গে পাতা। আমি অনুরূপা মুখার্জীর খাট সংলগ্ন আরেকটি এমন চৌকি দেখেছি। আমার মনে হয়, আগরতলার ঠাকুর-কর্তা পরিবারে বোধ হয় একটা মূল খাটের সঙ্গে আরেকটা সহকারী চৌকি পাতা থাকে এবং কেন এমন থাকে তা গবেষণার বিষয়। থাক সে-কথা; সলিলবাবু আমাকে দেখে বসতে বললেন তাঁর খাটের সামনের চেয়ারে। বললেন, 'গতকাল নির্বাচনী ঘরোয়া মিটিং সেরে রাতে বার তিনেক পায়খানা ও চার বার বমি করেছি, জ্বর ও হয়েছিলো একটু বোধ হয়, এখন অনেকটা ভালো।' এর মধ্যে সলিলবাবুর বৃদ্ধা মা এলেন আমার সামনে। সলিলবাবু আলাপ করে দিতেই প্রণাম করলাম আমি তাঁকে। বললাম, 'আপনাদের পরিবার সম্পর্কে আমি অনেক কথাই জানি। আপনি রাধামোহন ঠাকুরের পৌত্রের স্ত্রী। আমি ৬৭ সনে ভাষার কাজ করতে এসে অঘোরবাবুর সঙ্গে এসেছিলাম রাধামোহন ঠাকুরের 'কক্-বরক্-মা' বই নিতে। তখন যোগেশ ঠাকুর জীবিত। আর অঘোর দেববর্মার কাছ থেকে আপনাদের সম্পর্কে অনেক শুনেছি।

২০ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫, বুধবার । সকাল সাতটায় পাল্লা-বাটকারা অফিসের সামনে থেকে পুর নির্বাচন প্রার্থী সলিল দেববর্মাকে নিয়ে ডোর টু ডোর প্রচারে বেরুলাম । প্রফেসার কুন্ডুর বাড়ি হুয়ে উত্তরদিকে এগোতে থাকলাম । একটা ট্রাইবাল বাড়িতে ঢুকে দেখি বাঙালি জামাই শ্রীযুত ব্রজদুলালভট্টাচার্য কৃষিবিভাগে চাকরি করেন তিনি। দোতলায় উঠতেই বাঙালি স্বামী ও ট্রাইবাল স্ত্রী আমাদের সঙ্গে কথা বললেন । ট্রাইবাল লেডিটি শ্রীমতী অনুরূপা মুখার্জী(দেববর্মা)'র আত্মীয়া । এই বাড়িতে প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার ভাইপো শিলঘাটীর বিনন্দ জমাতিয়ার ছেলে ভাড়া থাকে ও আগরতলার কলেজে লেখাপড়া করে । এরপরেই আরেকটি ট্রাইবাল বাড়িতে ঢুকে ফুলের সমাহার দেখে তো অবাক । কমরেড বিশু দেববর্মা (মাধব বাড়ির ছেলে, এখন বাড়ি করেছে এ্যাডভাইজার চৌমুহনীর পাশে- ডাক্তার সত্যবঞ্জন দেববর্মার বাড়ির পুবদিকে) বললেন, "জানেন কুমুদবাবু, এই বাড়িটি ফুলের মালা গেঁথে দেয়ার জন্যে আগরতলায় ঠাকুর-কর্তা পরিবারের মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত । এই বাড়ির মেয়েরা আগরতলার ট্রাইবাল বাড়ির বিয়ে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে ফুলের মালা তৈরি করে দিতেন । বিনি সুতোর মালা গাঁথতে পারেন এই বাড়ির মেয়েরা।" সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেলো আমার ত্রিপুরার রূপকথা। ত্রিপুরী রূপকথায় বিনিসুতোর মালা গাঁথার কথা আছে।

আমি বললাম, "আরেক দিন আসবো ফুলের মালা গাঁথার ইতিহাস জানতে ।" এরপর আমরা এলাম শাহী বাড়ি । এই বাড়ির শাহী যুবকটি নেপালী, তাঁর মা ট্রাইবাল । সুন্দর দোতলা ঝকঝকে বাড়ি। এই শাহী যুবকটিকে গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় মান্দাই থেকে ভোট বাক্স আনার পথে কিডনাপ করে নিয়ে গিয়েছিল উগ্রপন্থীরা অথবা উগ্রপন্থীরা ভোট বাক্স ছিনিয়ে নেবার সময় সে আহত হয়ে বনের মধ্যে পালিয়ে ছিলো এবং তিনদিন পর আহত অবস্থায় বাড়ি ফিরে এসেছিলো সে । বাড়ি ফেরার পর তার বাড়িতে দেখতে গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু কৌতূহলী জনতার ভীড়ে ঘরে ঢুকতে পারিনি । পরে জেনেছি যুবকটির নাম মেঘনাদ শাহী।

শাহী বাড়ি ছেড়ে ঢুকে পড়লাম জজকোর্ট-কোয়ার্টার এলাকায় । এই কোয়ার্টার গুলো এখন যেখানে গড়ে উঠেছে, জানলাম, সেখানে আগে ছিলো ত্রিপুরার রাজা নক্ষত্র রায়ের বংশধরদের বিরাট পুকুর । এখন বলা হয় প্রতাপ রায়ের জায়গা । প্রতাপ রায়ের ছেলেদের মধ্যে এখনো কেউ কেউ বেঁচে আছেন— পুকুরের পাশেই আছেন ব্রজবিহারী রায় । তার অন্যান্য ভাই — গোবিন্দ রায়, প্রভাত রায়, ক্যাপটেন পি.সি.রায় প্রমুখ সুপুরি বাগানে এসে বাড়ি করেছেন । ব্রজবিহারী রায়ের বাড়ি যেতেই প্রার্থী সলিল বাবু তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন । ব্রজবিহারী রায় সম্পর্কে সলিল দেববর্মার প্রপিতামহ রাধামোহন ঠাকুরের দৌহিত্র । দেখতে পেলাম জজকোর্টের উত্তর-পশ্চিমদিকে অনেকটা বস্তির মতো বসতি । রাস্তাঘাটের খুব অভাব, জলনিকাশের ব্যবস্থাও মোটেই ভাল নয় । বসতিটি ট্রাইবাল-বাঙালি মিশ্রিত ।

বেলা সাড়ে নটা পর্যন্ত প্রচার করে আমরা ফিরে এলাম । সলিল বাবু জজকোয়র্টারের সামনে থেকে তার স্ত্রীর সঙ্গে চলে গেলেন একটা রিক্সায় । কমরেড যুগল বৈদ্য আগামীকালের প্রোগ্রাম করে দিয়ে চলে গেলেন বাড়ি । আমি বাসার দিকে আসতেই প্রাক্তন আই.এ.এস অফিসার মানিক মজুমদার ও গৌরাঙ্গ সাহা মহোদয়ের সঙ্গে দেখা হলো । পুর নির্বাচন নিয়ে আলেচনা করলেন কিছুক্ষণ । বললেন, সলিল বাবুর সঙ্গে কর্নেল হিরণকান্তির টাফ ফাইট হবে, কে জেতে কে হারে বলা যায় না, তবে হিরণকান্তির জেতার সম্ভাবনা বেশী । এরপর মানিকবাবু তাঁর তামাকের কোটো থেকে বিশেষ ভাবে তৈরি তামাকপাতা আমাকে দিলেন একটু মুখে দেওয়ার জন্যে । আমি তামাকপাতা চুষতে চুষতে বাড়ি ফিরে দেখি স্ত্রী ফুলকুমারী দেববর্মা তখনও অফিসে বেরোননি, বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করছেন । তিনি বেরিয়ে গেলে আমি বীরচন্দ্র দেববর্মণের বাড়ি সি.পি.আই -এর অফিসে যেতেই কমরেড অমূল্য শর্মা বললো—'জানেন কুমুদদা, অঘোর দেববর্মার স্ত্রী আজ সকালে হার্ট এ্যাটাকে মারা গেছেন ।' খবরটা শুনে বজ্রাহাতের মতো রইলাম আমি । তাহলে আমার মাদাম চিয়াং চিঙ আর নেই ? পাশেই বসে ছিলেন কমরেড দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত । এরমধ্যে সাহানা সেনগুপ্ত আসতেই সাহানাদিকে নিয়ে চলে গেলেন তিনি বনমালীপুরে কমরেড অঘোর দেববর্মার বাড়ি । আমিও বেরিয়ে এলাম ওল্ড কালীবাড়ি লেনে লেখক নিধু হাজরার বাড়ি । নিধুদাকে দুঃসংবাদটা দিতেই তিনি ফোন করলেন অঘোর বাবুর বাড়িতে । ফোন ধরলেন ডাঃ নীলমণি দেববর্মা— অঘোব বাবুর ভাইঝি জামাই । এরপর নীলমণি বাবু কমরেড দীনেশ সাহাকে ফোনটা দিলেন । দীনেশ বাবু সব ঘটনা জানালেন নিধুবাবুকে ।

নিধুবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি সোজা বাসায় ফিরে ছোট মেয়ে দেবযানীকে দুঃসংবাদটা দিয়ে রওনা দিলাম অঘোর দেববর্মার বাড়ির দিকে । বিধানসভার পাশ দিয়ে যেতেই মনে হলো নরেশ বাবু (নরেশচন্দ্র দেববর্মা, ডেপুটি সেক্রেটারী)কে ডেকে নিয়ে গেলে ভাল হয় । নরেশ বাবুকে দুঃসংবাদটি দিতেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন আমার সঙ্গে । যেতেই ইস্কাস ভবনের সামনে হরিহর বাবু (হরিহর সাহা)'র সঙ্গে দেখা হলো । তাঁর কাছ থেকেও অঘোর বাবুর স্ত্রীর মৃত্যুর খবরটা জানালাম ।

আমরা দুজনে অঘোর বাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি তাঁর বাড়ির সামনে খুব ভিড় । ভেতরে ঢুকে দেখি, দোতলা বাড়ির নিচের তলার বারান্দায় আমার মাদাম চিয়াঙ চিঙ চির নিদ্রায় শায়িত । তাঁর চারপাশে ছেলেমেয়ে, পুত্রবধূরা ঘিরে হাউমাউ করে কাঁদছে । এই করুণ দৃশ্য আমার পক্ষে দেখা সম্ভব ছিলো না । আমার মাদাম চিয়াঙ চিঙয়ের যে এই অবস্থা হবে কে জানতো ? ককবরক ভাষার কাজে আসার পর সেই ১৯৬৭ সাল থেকে তাঁর কাছে আসি, কত পরিবর্তন দেখেছি তাঁর । সেই কমরেড স্ট্যালিনের ফটো ঝোলানো মাটির ঘর থেকেএই পাকা বাড়িতে আসার মধ্যে তাঁর বড় ছেলে পুঁটু হয়েছে ডাক্তার,

মেজ ছেলে টান্টু হয়েছে ডেপুটি জেলার, ছোট ছেলে ভল্টু হয়েছে ব্যাঙ্কের বড় অফিসার, বড় মেয়ে অপু বি.এ. পাশ করেছিলো। সেতার বাজনায় বেশ ভাল হাত ছিলো তাঁর। বিয়েও করেছিলো সি.পি.আই.এম. এর যুবকর্মী নিবিড়বরণ চক্রবর্তীকে। কিন্তু ডেলিভারি হতে গিয়ে মারা গেলো বেচারী। ছোট মেয়ে বুটলীও বি.এ. পাশ করে বিয়ে করেছে এক বাঙালি ছেলেকে নাম তার দিলীপ সাহা। সূর্য চৌমুহনীর কাছে দিলীপ বাবুদের নাম করা দোকান। বুটলীর ছেলেমেয়েও বড় হয়ে গেছে। সে এখন সরকারী স্কুলের হেড মিস্ট্রেস, বি.এ. পাশ করার বহুদিন পর ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস এম.এ. পরীক্ষা দিচ্ছে। আমার মাদাম চিয়াঙ চিঙ— দুলালী দেববর্মার স্বামী কমরেড অঘোর দেববর্মা তো রাজনৈতিক নেতা। কখনো ঘরের ভাত কখনো জেলের ভাত, সংসারটা আগাগোড়া ধরে রেখেছিলেন আমার মাদাম চিয়াঙ চিঙ-ই। আমার চোখের সামনে মাদামের ছেলে মেয়েগুলো মানুষ হয়েছে একবারে সাধারণ অবস্থার মধ্যে। খুব কষ্ট করেই লেখাপড়া শিখিয়ে ছিলেন তিন ছেলে দু'মেয়েকে দুলালী দেববর্মা। কখনো আমি তাঁকে দেখেছি কুড়ুল দিয়ে কাঠ চলা করতে, কখনো দেখতাম উদখলে উঠোনে ধান ভানতে ভানতে ঘর্মাক্ত হচ্ছেন। তার ওপর গরু আছে, হাঁস-মোরগ আছে। অথচ আগরতলার রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মেয়ে ছিলেন তিনি। সেই মেয়ে বাবার অমতে এক আন্ডার গ্রাউন্ডে যাওয়া কমিউনিস্ট বিপ্লবীকে বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ির ট্রাইবাল গ্রাম লাটিয়াছড়ায় গিয়ে ধান রোপন পর্যন্ত করেছেন, ধান কেটেছেন নিজের হাতে, তারপর ধানের বোঝা মাথায় করে অন্যান্য ট্রাইবাল মেয়েদের সঙ্গে এসেছেন হাসিমুখে। সুযোগমতো জুম চাষও করেছেন শ্বশুর বাড়ির গভীর জঙ্গলে। আবার বাবার সঙ্গে মিটমাট করে পিতৃভিটিতে ফিরে মাটির ঘর তুলে ছেলে-মেয়েগুলোকে বুকে জড়িয়ে ধরে আধুনিক ভাবে লেখাপড়াও শিখিয়ে ছিলেন তিনি। মায়ের দেয়া আগরতলা শহরের ওপর এক কানি (এক বিঘে) জমির একটুকরোও বিক্রি করেননি হাজার অভাবেও। তারপর সেই জমি ব্যাঙ্কে মর্টগেজ রেখে পাকা দালান তুলেছেন। প্রথমে একতলা, এরপর ব্যাঙ্কের অফিসার ছোট ছেলে ভল্টু দোতলা তুলেছে পরে। মাদাম চিয়াঙ চিঙ এর নিথর দেহের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, এইতো মাত্র কদিন আগে এক ঝড়ো হাওয়ার দিনে তিনি আমাকে বলে গিয়েছিলেন তাঁর বিয়ের রোমাঞ্চকর কাহিনী আর তাঁদের কমিউনিস্ট পরিবারের কত কথা। হঠাৎ করে তিনি যে এইভাবে আমার মনে আঘাত দিয়ে চলে যাবেন ভাবতে পারিনি। কমরেড প্রশান্ত কপালীর হাত থেকে রক্ত গোলাপের মালা নিয়ে মাদাম চিয়াঙ চিঙ-এর বুকের ওপর রেখে সজল চোখে বিদায় নিলাম আমি। খানিকটা উদভ্রান্তচিত্তে যেতে যেতে মনে মনে বললাম, মাদাম বলেছিলেন, বেশি দিন বাঁচবেন না আর, কথাটা ভবিষ্যৎবাণীর মতো ফলে গেলো!

২৩ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫, শনিবার। আগরতলা পুরপরিষদের নির্বাচন। সকাল ছ'টায় পাল্লা বাটকারা অফিসের পাশে গেলাম। ওই অফিসেই আজ আগরতলা পুরসভার চল্লিশ এবং একচল্লিশ নং বুথের ভোট। অফিসের কাছে নাজির পুকুরের রাস্তায় ঢোকার মুখে সি.পি.আই. এম. ও কংগ্রেস উভয়দলই বুথ সাজিয়েছে সারা রাত্রি জেগে। ভোট কেন্দ্রের চারপাশ ছিলো সুসজ্জিত, লাল এবং গেরুয়া রং-এর পোস্টারের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দারুণ লাগছিলো আমার কাছে। আমি গিয়ে দেখি বামফ্রন্টের কর্মীরা ভোটের লিস্ট নিয়ে বসে গেছে, কংগ্রেসের ছেলেরা একটু পরে এলো, ভোট শুরু হবে সকাল সাতটা থেকে। আমি প্রথমে নাজির পুকুর পাড়ে নাইন বুলেট ক্লাবের পাশে কমরেড শম্ভু চক্রবর্তী মশায়ের বাড়ি ঢুকে গেলাম। ওখানেই ভোটের গণ-চা ও খিচুড়ি হয় প্রতি বছরই বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে। কমরেড অঘোর দেববর্মার গত পুরনির্বাচনের সময় আমি এই বাড়িতেই খিচুড়ি খেয়েছিলাম। গিয়ে দেখি শম্ভুবাবু বড় ডেগে গ্যাসে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছেন। পঞ্চাশ-উর্ধ্ব গৌর

বর্ণ শম্ভুবাবু মাথায় একটা পশুলোমের টুপি পরে গায়ে একটা খদ্দরের চাদর জড়িয়ে পার্টির কর্মীদের প্রাতরাশের আয়োজন করছেন ।

সাতটা বাজার আগেই প্রার্থী সলিল দেববর্মার পোলিং এজেন্ট ঢুকিয়ে দিলাম আমরা । বুথ অফিসের চারপাশে তখন সাজ সাজ রব । সি.পি.এম কর্মীরা চারপাশে বসে গেছে ততক্ষণে । ভোট শুরু হতেই আমরা শম্ভুবাবুর বাড়িতে চা এবং চায়ের সঙ্গে সিদ্ধ ডিম, পাঁউরুটির পিস ও বঁদে খেলাম পেট ভরে । দশটা বাজতেই প্রার্থী সলিল দেববর্মা এলেন । তিনিও শম্ভুবাবুর বাড়িতে চা খেয়ে নিলেন আমাদের সঙ্গে । তারপর তিনি আমাকে নিয়ে তাঁর নির্বাচনী জীপে করে বেরিয়ে পড়লেন । প্রথমে গেলাম ব্যানার্জী পাড়ার একটা বুথে, তারপর গেলাম প্রগতি বিদ্যালয়ের কাছে তিনটে বুথে, তারপর এলাম মোহন কর্তার বাড়ির বুথে । সব বুথ পরিক্রমা করে আবার পাল্লাবাটকারা অফিসের বুথে ফিরে এলাম দেড়টার সময় । বিকেল চারটের সময় নির্বাচন শেষ হলো । আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে শম্ভুবাবুর বাড়ি গিয়ে গণ-খিচুড়ি খেলাম পেট ভরে । আমার মোঙ্গলিনী গৃহিনীকে ট্রাইবাল পোষাকে দারুণ দেখাচ্ছিল।

২৪ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫, রবিবার । সকালে উঠে ছাত্র সংঘের কাছে বিদ্যাধরদের বাড়িতে কমরেড সুরেন্দ্র দেবনাথের বাড়ি গেলাম সাত নং পুরওয়ার্ডের সি.পি.আই প্রার্থী কমরেড সাহানা সেনগুপ্তর অবস্থা সম্পর্কে জানতে । তারপর সেখান থেকে গেলাম কবি কৃত্তিবাস চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাসায় । দেখলাম, নগেন্দ্রবাবুর শরীর খারাপ, বাম হাত খুব ব্যথা করছে । ডাক্তার নাকি বলেছেন হার্টের গন্ডগোল হয়েছে । তবে জি.বি. হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখা গেছে স্পণ্ডেলাইটিস । আমি তাঁকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতে বললাম, আর বললাম আকন্দ পাতার সেক দিতে ।

নগেন্দ্রবাবুর বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম ওল্ড কালীবাড়ি লেনে কমরেড নিধু হাজরার বাড়ি । তাঁর কাছে পুর নির্বাচনী ফলাফলের আগাম আভাস জানতে চাইলাম। তিনি বললেন— বামফ্রন্ট সতেরটি আসনের মধ্যে সবকটি পাবে এবং সাহানা সেনগুপ্তর সিট সম্পর্কে তাঁকে দেখলাম খুবই আশাবাদী ।

নিধুবাবুর বাড়ি থেকে বাসায় ফিরে দেখি আমার স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ লাগছে, শরীর খুব দুর্বল তাঁর। আমি একগাদা জামা-কাপড় কেঁচে ভাত খেয়ে একটার সময় রেডি হয়েছি উমাকান্ত ইস্কুল মাঠে পুর নির্বাচনের ফলাফল জানতে যাব বলে । এমনসময় আমার এক শালা এলো সুজিত দেববর্মা সে থাকে সুপুরি বাগানে । তাঁর সঙ্গে রিক্সা চেপে গেলাম উমাকান্ত মাঠে । গিয়ে দেখি এক নং ওয়ার্ডের রেজাল্ট বেরিয়েছে, সেটি পেয়েছে কংগ্রেস— হেরেছে সি.পি.এম । দেখলাম উমাকান্ত একাডেমীর প্রধান গেটের দুদিকের মাঠে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস তাবু খাটিয়ে শিবির গড়ে তুলেছে । উভয় শিবিরে হাজার হাজার লোক । সামনের বড় রাস্তায় লোকে লোকারণ্য । মাঝখানে পুলিশ-সি.আর.পি-র বেরিকেড এর মধ্যে ৯ নং ওয়ার্ডের রেজাল্ট ঘোষণা করা হলো, সেটিও গেলো কংগ্রেসের অনুকূলে-- সি.পি.আই. প্রার্থী কমরেড ফটিক ভৌমিক হেরে গেলেন ৪৩৫ ভোটের ব্যবধানে । এরপর ২ নং ও ১০ নং ওয়ার্ডের রেজাল্ট বেরোতে দেখা গেলো ১০ নংটি পেয়েছে কংগ্রেস আর ২ নং সিটটি পেয়েছে সি.পি.এম এর মণিপুরী মহিলা প্রার্থী শ্রীমতী নিরুপমা দত্ত । রেজাল্টে দেখা গেল কংগ্রেস ৩ এবং সি.পি.এম একটি সিট পেয়েছে । এই রেজাল্টে বামফ্রন্ট শিবিরে খুব হতাশা দেখা দিলো । অন্যদিকে কংগ্রেস শিবিরে উল্লাস চলতে লাগলো বাজি ফুটিয়ে । কিছুক্ষণ পরে গণনা কেন্দ্র থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর এলো ৩ নং এবং ১১ নং সিট দুটিও কংগ্রেস পেয়েছে । এই খবর পাওয়া মাত্র কংগ্রেস শিবির পড়লো উল্লাসে ফেটে, আর বামফ্রন্ট শিবিরে দেখা দিলো চরম হতাশা । ঠিক এমনি সময় কারা কে জানে সি.আর.পি 'র ওপর বোমা মারলো, খুব শক্তিশালী বোমা, তিনজন সি.আর.পি জওয়ান

আহত হলো মারাত্মকভাবে। সি.আর.পি.ও রাইফেল থেকে ফাঁকা আওয়াজ করতেই মাঠের দর্শকমন্ডলী ছোটাছুটি করতে লাগল এবং যে যেমন পারে উমাকান্ত ইস্কুলের দেয়াল টপকিয়ে পালাতে লাগল প্রাণের ভয়ে। আমি তখন কমরেড অমূল্য শর্মা, সুরেন্দ্র দেবনাথ, মনোরঞ্জন দেবনাথ ও নির্মল ভৌমিক—সি.পি.আই.এর এই চারজন কমরেডের সঙ্গে বাম শিবিরে বসে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তখন সময় সন্ধ্যে সাতটার মতো। তখনই এমন ঘটনা ঘটলো। সি. আর. পি ফাঁকা আওয়াজ করে। পরেও বোমা পড়তে থাকলো। বাম শিবিরে তখন চাঁদোয়ার তলায় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সব প্রার্থী বসে আছেন। মহিলা কমরেডের সংখ্যাও কয়েকশ। নেতৃবৃন্দ সকলকে সাহসের সঙ্গে থাকতে বললেন। কিন্তু তখন আতঙ্ক এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে বাম শিবিরের বহু লোক পাঁচিল টপকে আখাউড়া রোডে পালাতে লাগলো। আমিও তখন দলহারা হয়ে গেছি। আমি অমূল্য শর্মাকে বললাম—চল, এখানে নিরাপদ মনে হচ্ছে না, ভেতর থেকে বাইরে যাই। এমন সময় গুলির শব্দ শোনা গেলো। আমিও ছুটে বীরচন্দ্র স্টেট লাইব্রেরীর কোণা দিয়ে পাঁচিল টপকে আখাউড়া রোডে পড়লাম। পাঁচিল টপকাতে গিয়ে পড়ে গেলাম একবার। রাস্তায় পড়ে দেখি লোকজন যে যেমনভাবে পারে পালাচ্ছে। আমিও অন্যদের সঙ্গে দৌড়াতে দৌড়াতে এলাম ভি এম হাসপাতালের দিকে। কিন্তু সেখানেও বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না, পুলিশ ধাওয়া করছে। আমি আর মাঠে ঢোকার চেষ্টা না করে হেঁটে ব্যানার্জী পাড়া দিয়ে সোজা চলে এলাম কর্নেল চৌমুহনীতে ত্রিপুরা দর্পণ অফিসে। দর্পণ সম্পাদক সমীরণ রায়কে জানালাম সব। সমীরণবাবু টেলিফোনে সব জানছেন দেখলাম। আমি বেরিয়ে এসে কর্নেল বাড়ির সামনে ডাঃ তাপস আচার্যীর কাছ থেকে এক ডোজ হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়ে বাসায় ফিরলাম। ফিরে দেখি পুত্র সুরঞ্জন তখনো ফিরেনি। সে ফিরলো রাত ন'টার পর। সে বললো, 'বাবা তোমাকে পালাতে দেখেছি আমি।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, ! তুই কোথায় ছিলি তখন?' পুত্র সুরঞ্জন বললো, ' আমি তখন বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর ঠিক কোণায় দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম।' বললাম, 'ঠিক পালানো নয়, পদদলিত হবার ভয়ে নিরাপদ জায়গা বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবো ভাবলাম। কিন্তু দেখি পুলিশের তাড়া খেয়ে যে যেদিকে পারে ছুটছে, তখন আমি আর কী করবো ? কথায় বলে 'য পলায়তি স জীবতি।' আমার কথা শুনে আমার বড়ো মেয়ে নন্দিনী, ছোট মেয়ে দেবযানী ও আমার স্ত্রী ফুলকুমারী হাসতে শুরু করলো। পুত্র সুরঞ্জন বললো—'পুর নির্বাচনের যে ট্রেণ্ড দেখছি, তাতে তোমাদের বামফ্রন্ট তোমার মতো পালাতেই পারে।' আমি বললাম, 'ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে দেখে নিস, এখন থেকে যেগুলো বেরোবে, সবগুলো বামফ্রন্টের ফেভারে যাবে।'

২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন, ১৯৯৫, সোমবার। খুব ভোরে উঠে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে উমাকান্ত স্কুলের মাঠে যাবো বলে বেরিয়ে পড়লাম। গতকাল পুর পরিষদের ফল বেরোনোর সময় যে কাণ্ড ঘটলো তারপর ভগ্নহৃদয়ে বাড়ি চলে এলাম, সারা রাত উদ্বেগে ঘুম হয়নি ভালো। পুত্র সুরঞ্জনের কথা যদি ঠিক হয়, বামফ্রন্ট যদি সত্যিই হারে, তখন কী হবে? ৬নং ওয়ার্ডে সি. পি. আই. এম প্রার্থী সলিল দেববর্মা জিতলেন কিনা, ৭নং ওয়ার্ডে সি. পি. আই প্রার্থী সাহানা সেনগুপ্তের বা কী অবস্থা - এই সবকথা ভাবতে ভাবতে বাসা থেকে এ্যাডভাইজার চৌমুহনী যেতেই দেখি গুটিকয়েক ছেলে এক জায়গায় জড়ো হয়ে কি যেন বলাবলি কোরছে। আমি তাদের কাছে এগোতেই একটি ছেলেকে বেশ উত্তেজিতভাবে বলতে শুনলাম—'শিশির দেববর্মার জন্যে আমাদের প্রার্থী হেরে গেছে, শালার পুত যদি দুশ' ভোট না পেতো, তাহলে হিরণকান্তি দেববর্মা জিতে যেতো। চল , শালার পুতকে গিয়ে ধরে ফেলি।' আমি ছেলেগুলোর পাশ কাটিয়ে এ্যাডভাইজার চৌমুহনী পেরিয়ে ভাবলাম, ছেলেগুলোর কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে ৬নং ওয়ার্ডে সি. পি. এম প্রার্থী সলিল দেববর্মা নিশ্চয়ই জিতে গেছেন। যাক, যে সিটটার

জন্যে খেটেছি এক'দিন সলিলবাবুর সঙ্গে থেকে, তাহলে তা সার্থক হয়েছে। এখন সি. পি. আই. প্রার্থী সাহানা সেনগুপ্তর কী হলো? বেশ জোরে পা চালিয়ে বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর আবার সেই কোণায় আসতেই দেখি সি. পি. এম. -এর ছেলেরা সলিল দেববর্মার জয় নিয়ে আলোচনা কোরছে। জিজ্ঞেস করলাম আমি—'সলিলবাবু কত ভোটে জিতলেন?' 'দুশো ভোটের কিছু বেশী ভোটে জিতেছেন সলিলদা।' উত্তর দিলো একটি ছেলে। তাদের কাছ থেকে এসে এবার উমাকান্ত স্কুলের মেইন গেট দিয়ে ঢুকে একবার তাকালাম সব দিকে। ডান দিকে তাকিয়ে দেখি কংগ্রেস শিবিরে এই ভোরেও লোক উপচে পড়ছে। মনে হলো সারা রাত কংগ্রেসের উল্লসিত জনতা আর বাড়ি যায়নি, শেষ ফলটা বেরোনো পর্যন্ত থাকবে বোধ হয়। আর বাঁদিকে বামফ্রন্টের শিবিরের দিকে তাকিয়ে দেখি একেবারে ছত্রভঙ্গ অবস্থা, লোকজন নেই বললেই চলে, তাবুর নিচে ক'জন লোক বসে আছে মাত্র, আর এদিকে ওদিকে পঁচিশ-ত্রিশজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সামনে মুখ করে দেখি সি. আর. পি ও পুলিশের বেরিকেডও ফাঁকা। এইখানে গত রাত্রে সি. আর. পি. এফ জওয়ানদের ওপর বোমা পড়েছিলো। তারপর তারা ফাঁকা আওয়াজ করে আত্মরক্ষার্থে। এরপর কৌতূহলী জনতা ছোটাছুটি শুরু হয়। দেখলাম উমাকান্ত স্কুলের মেন গেট ও স্কুলের প্রধান প্রবেশ পথের মধ্যেকার বিশাল চত্বরের এমন চেহারা হয়েছে যে দেখলে বেশ বোজা যায়, বেশ বড়ো ধরনের খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে গত রাত্রে। সমস্ত চত্বরের বালি মেশানো মাটির ওপর শতশত মানুষের এলোমেলো পায়ের দাগ। মানুষ যে প্রাণের ভয়ে ছোটাছুটি করেছে, তা পরিষ্কার বোঝা গেলো। ফিতে ছেঁড়া পায়ের চপ্পল চোখে পড়লো যত্রতত্র।

এবার আমি কয়েকজন প্রহরারত সি. আর পি জওয়ানের পাশ কাটিয়ে বাম শিবিরের দিকে যেতেই সি. পি. এম-এর বিজয়ী প্রার্থী সলিল দেববর্মা ও এই জয়ের প্রধান স্থপতি কমরেড যুগল বৈদ্য আমাকে দেখে হাত দেখালেন। আমি তাঁদের কাছে এগিয়ে গিয়েই সলিলবাবু ও যুগলবাবুর সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করলাম। তারপর সাহানা সেনগুপ্তের খবর জিজ্ঞেস করতেই বললেন তাঁরা, একটু পরেই সাহানা দিদিমণির ফল জানা যাবে, খুব হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে বলে খবর এসেছে। এরপর খুব সন্তর্পণে বাম শিবিরের অন্দরে ঢুকে দেখি সি. পি. আই. এম নেতা কমরেড সমীর চক্রবর্তী তাঁর স্তালিনীয় গোঁফ নিয়ে বসে আছেন *স্থিরচিত্তে আগরতলা পুরসভার ভোটে ভরাডুবি সত্ত্বেও। কমরেড সমীরবাবুকে আমি খুব পছন্দ করি তাঁর বাগ্মিতার জন্যে। একটু পরে পুরসভার ৭নং ওয়ার্ডের ফল বেরুলো। সি. পি. আই প্রার্থী সাহানা সেনগুপ্ত অল্প ব্যবধানে হেরেছেন কংগ্রেস প্রার্থী ও সি. পি. আই. এম নেতা সলিল দেববর্মার ভ্রাতৃবধূ অঞ্জলি চ্যাটার্জীর কাছে। ভাসুর ও ভ্রাতৃবধূ পাশাপাশি ওয়ার্ডে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫, বৃহস্পতিবার। আজকের প্রধান ঘটনাবলী ঃ (১) সকাল ৭টায় ডাঃ এস আর দেবের বাড়ি যাওয়া আমার স্ত্রীর হেমোগ্লোবিন কমে যাওয়া (৭.৩৪) সম্পর্কে রিপোর্ট করতে, (২) ফেরার পথে ৭.৪৫-এর সময় ডাঃ এস আর দেববর্মার বাসায় যাওয়া ডঃ সিরাজুদ্দীন সাহেবের স্ত্রীর হেমোগ্লোবিন পরীক্ষা করার ব্যাপারে জানাতে। (৩) ৮টায় বাসায় ফিরে বাজার (৪) ৮.৩৯-এর সময় সিরাজ সাহেব ও তাঁর স্ত্রী রাবেয়া খাতুন এলেন ডাঃ দেববর্মার চেম্বারে। ডাঃ দেববর্মা তার হেমোগ্লোবিন পরীক্ষা করে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট দিলেন। দেখা গেলো সিরাজ সাহেবের স্ত্রীর হেমোগ্লোবিন বেশ বেশী, ১১ পয়েন্টের কিছুটা বেশী। ডঃ আমেদ ডাঃ দেববর্মাকে ফিস দিতে গেলেন, ডাঃ দেববর্মা তা নিলেন না। বললেন, it is a pleasure for us। এরপর ডঃ আমেদ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আমার বাসায় এলেন। আমার ছেলেমেয়েরা তাঁদেরকে প্রণাম করলো। আমার বড়ো মেয়ে তানিয়া (নন্দিনী), আবার মিসেস আমেদের ছাত্রী। তানিয়া তখন কুচো মাছ কুটছিলো। ছেলে সুরঞ্জন মাছ

ভাজছিলো রান্না ঘরে প্যান্ট পরে। আমার স্ত্রী অবসন্ন অবস্থায় ডঃ আমেদ ও মিসেস আমেদের সঙ্গে দেখা করলেন। পরে চা করে নিয়ে এলো তানিয়া ও সুরঞ্জন। তাঁদের দু'জনকে আমার স্ত্রীর হাতে তৈরী ট্রাইবাল তাঁতের কিছু বিছানার চাদর, পাছড়া ও দরজার পর্দার কাপড় দেখালাম। খুবই পছন্দ করলেন তাঁরা সেগুলোর। ডঃ আমেদকে শরৎচন্দ্র দাশ প্রণীত তিব্বতী ইংরাজী বিশালকায় অভিধান দেখালাম আমি। ঠিক দশটা বাজতে ১০ মিনিট আগে তাঁদেরকে নিয়ে আমি গেলাম কর্ণেল চৌমুহনীর দিকে রিক্সায় তুলে দিতে।

৭ই জানুয়ারী, ১৯৯৬, সোমবার ঃ হেরমায় শ্বশুর বাড়িতে ঘুম ভাঙলো রাত ৪টেয়। গতকাল স্ত্রী ফুলকুমারীকে নিয়ে হেরমায় এসেছিলাম তাঁর জমি-জায়গাগুলোর নামজারি করতে স্থানীয় রঙমালা তহশীল কাছারীতে। নায়েব মশায় না থাকায় নামজারির রিপোর্ট জমা দেয়া সম্ভব হয়নি। চুপিসাড়ে স্ত্রীর পাশ থেকে উঠে গিয়ে হারিকেন নিয়ে গেলাম রান্নাঘরে। তারপর জল খেলাম বড়ো দু'গেলাস। গতকাল রাতে শূকরের মাংস খাওয়া একটু বেশি হয়ে গিয়েছিলো। প্রথম খেয়েছিলাম কাকাশ্বশুর কাকা বীরকুমার (বীরকুমার কাকা)এর ঘরে। পরে খেয়েছিলাম শাশুড়ী মায়ের হাতে। জামাই-মেয়ে এসেছে দেখে শ্বশুর মশায় হেরমা বাজার থেকে শূকরের মাংস এনেছিলেন। ট্রাইবেল বাড়ির শূকরের মাংস খেতে এতো ভালো লাগে যে লোভ সামলাতে পারিনে আমি। কিন্তু এই প্রৌঢ় বয়েসে এতটা শূকরের মাংস খেয়ে হজম করা চাট্টিখানি কথা নয়। তার ওপর ট্রাইবেল বাড়ির জামাই হয়ে মাঝে-মধ্যে সোমরস পান না করে উপায় থাকে না। শ্বশুর বাড়ির ট্রাইবেল ল্যান্ডে গেলে মনে হয় ইউরোপে এসেছি। আমার এক সতীর্থ অসিত চক্রবর্তী আমার শ্বশুর বাড়িতে এসে শাশুড়ীর দেয়া সোমরস পান করে এ-কথাই বলেছিলেন। অসিতবাবু যুগশ্লাভিয়ার গ্রাম দেশে ঠিক এমনই সোমরস পান করার পরিবেশে ঢুকে পড়তেন মাঝে-মধ্যে। গত রাতে কাকা বীরকুমারও জামাইকে আমার কাকীশাশুড়ীর নিজের হাতে তৈরী সোমরস খেতে দিলেন দু' থেকে আড়াই কাপ শূকরের মাংস খাবার আসরে। আমার পাশেই ছিলেন আমার এক ক্ষেতমজুর শাশুড়ী। তিনিই খেলেন সব থেকে বেশী। জামাই হয়ে আমাকেই কাকা বীরকুমার ও আমার এই শাশুড়ী, কাকা কুথূঙ-এর স্ত্রীকে সোমরস পরিবেশন করতে হলো। কাকা বীরকুমার ছিলেন উনুনের ধারে। নিজেই ভাঁলো করে কষছিলেন শূকরের মাংস। আমি পরিবেশন করছিলাম সোমরস। আমাদের তিনজনের হাতে তিনটে কাপ। সোমরস পরিবেশনের মাঝে মাঝে কাকা কড়াই থেকে এই শীতের রাতে গরম গরম শূকরের মাংস দিচ্ছিলেন আমাদের পাতে। আমার বাঁপাশে ক্ষেতমজুর শাশুড়ী, ডান পাশে গ্রাজুয়েট কাকা শ্বশুর আর মাঝখানে আমি বাঙালী জামাই। সোমরসের বেশীরভাগই খাওয়ালাম আমার এই প্রলেতারিয়েত শাশুড়ীকেই। লক্ষ্য করলাম, জামাইয়ের দেয়া এই সোমরস খেতে খেতে বেশ পুলকিত হচ্ছিলেন তিনি। ককবরক ভাষায় আশীর্বাদ করে বললেন —আয়ুক লকথূন নিনি, বূছা-বূতূই কাহাম-কূরূঙ তঙথন (পরমায়ু বাড়ুক তোমার, ছেলে-মেয়েরা মঙ্গলমতো থাকুক)। শ্রমজীবী শাশুড়ীর আশীর্বাদ শেষ হতেই আমিও সোমরসের বোতল নিঃশেষ করে ঢেলে দিলাম তাঁর পানপাত্রে। দেখলাম আমার এই ফর্সা রঙের মোঙ্গলিনী শাশুড়ীর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো এবার। বরাহ মাংসের সঙ্গে সোমরসের আসর শেষ হতেই দেখি রাত বেজে গেছে আটটা। এবার ছুটলাম খোদ শ্বশুর বাড়ির দিকে। ভয় ছিলো ফুলকুমারীর। রান্না ঘরে ঢুকে দেখি শাশুড়ীমা শূকরের মাংস পরিবেশন করছেন শ্বশুর মশায় ও আমার ছোটশালা বিমলকে। জিজ্ঞেস করলাম ককবরক ভাষায় — ফুলটি বিয়াঙ থাঙ? (ফুলটি কোথায় গেলো? — আমার স্ত্রী ফুলকুমারীর ডাকনাম ফুলটি) শাশুড়ীমা উত্তর দিলেন — দরনী জমাতিয়া' বাই মালাইনা থাঙগ আয়াব'ছঙনি আর' (ধরনী জমাতিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেছে আয়াবদের ওখানে)। শাশুড়ীর কথা

শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, ফুলকুমারী নেই, বাঁচা গেলো। আমি গুড়িসুড়ি মেরে উনুনের ধারে শাশুড়ীমায়ের কাছে বসতেই এককাপ সোমরস আমার হাতে দিয়ে বললেন — ইঁ, নৃঙগৃই নাইদি, চুআরাক হামমানি (এই নাও, খেয়ে দেখো, সোমরসটা খুবই ভালো)। শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করে পানপাত্রে চুমুক দিতেই টের পেলাম ভালো কাকে বলা। আগে কিছুটা খেয়েছি, আমার এই কড়া সোমরস পেটে গেলে বাঙালী জামাইয়ের অবস্থাটা যে কি হবে অনুধাবন করে সকলের অলক্ষে বেশীরভাগ ফেলে দিলাম আমি। ফুলটি এসে আমার হাতে পানপাত্রে দেখে অবাক হয়ে ধমকের সুরে বললো — - নৃঙগৃই তঙগ নৃঙ, ফেককে উল ছাইমানানৃ (পান কোরছো তুমি, মাতাল হলে পরে বুঝতে পারবে)। ভয়ে ভয়ে বললাম আমি — ছিমি খুরিছা নৃঙনাই, তাই নৃঙলিয়া (শুধুমাত্র একপাত্র খাবো, আর খাবো না)। ইতিমধ্যে জামাই-মেয়েকে ভাত বেড়ে দিয়েছেন আমা(মাকে ককবরকে আমা বলে। আমা অর্থ নিজের মা। আমিও শাশুড়ীকে আমা হলেই ডাকি)। গোদকের সঙ্গে বড়ো একবাটি শূকরের মাংস মূলো দিয়ে রান্না করা। সাহস করে খেয়ে ফেলাম সবটা। স্ত্রী রাগের সঙ্গে বললেন — চুআক নৃঙখা, ছাইমানানৃ রুজাই বিছিঙগ থাঙগৃই (সরাব পান করেছো, বুঝতে পারবে লেপের মধ্যে গিয়ে)। শ্বশুর মশায়ও বললেন, চু'আক খাইলে লেপের মইদদ গিয়া খুব নেছা দরে।' ভয় পেয়ে হাতু-মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি শাশুড়ীর জুমের তুলোর গরম লেপের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভোর চারটের সময় যখন ঘুম ভাঙলো, তখন দেখি পেটের মধ্যে ভুট-ভাট শব্দ শুরু হয়েছে। রান্না ঘরে গিয়ে ঠান্ডা জল খেতেই লাগলো পায়খানা। অমনি ওই কাকভোরে ছুটলাম আমি আন্দি নদীর ধারে। নদীর ধারে কালভার্টের ওপরে বসে ঘন কুয়াশার মধ্যে পায়খানা করলাম। আমি বাড়ি এলেই কাকভোরে এই কালভার্টের ওপর গিয়ে বসি, তারপর আন্দিনদীতে গিয়ে করি জলসৌচ।

শিলঙ ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৭ । শিলঙের পুলিশ বাজারের ব্রডওয়ে হোটেল । দোতলায় একশো উনিশ নম্বর রুমে সকাল ন'টায় জি টিভির আমেজ। পি.আই. বি ট্যুরের কর্ণধার জহর আচার্য টেলিফোনের রিসিভার তুললেন, 'হ্যালো, ইজ ইট নেপা ? পি. আই.বি ইনফরমেশন অফিসার জহর আচার্য - জে.এল.আচার্য স্পিকিং ফ্রম শিলঙ । আই লাইক টু স্পিক টু মিস্টার সেকাবাম, ডাইরেক্টর, নেপা । গুডমর্ণিং সেকারাম । উই রিচড ইয়েসটারডে ইভনিং ফ্রম আগরতলা । হ্যাভ ইউ গট আওয়ার পি.আই.বি ট্যুর প্রোগ্রাম ? গট ? থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ এ লট । উই উইল রিচ নেপা টুডে বাই ইলেভেন । হাউমেনি ? এইট রিপোর্টার্স ফ্রম ডিফারেন্ট নিউজ পেপারস, ওয়ান রিপ্রেজেনটেটিভ ফ্রম পি.টি.আই এ্যান্ড ওয়ান লিঙ্গুয়িস্ট । হোয়াট, লানচ অফার্ড ? ওঃ সো ফাইন । ইয়েস ইয়েস এ্যাট ইলেভেন-ও ক্লক সার্প । থ্যাঙ্কস, ওকে ওকে ।' —'কি বললেন জহরবাবু' নেফা যেতে হবে আমাদের, এখানে নেফা আবার এলো কোথেকে ? নেফা মানে তো নর্থ-ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি ।'

—'আরে বাবা নেফা নয়, নেপা-নর্থ ইস্টার্ন পুলিশ এ্যাকাডেমি ।'

—'আমার কানে এলো নেফা।'

—'উঃ এই কান নিয়ে আপনি আবার ভাষার কাজ করেন, বললাম নেপা, আর শুনলেন নেফা । এন.ই.পি.এ-নেপা, বুঝলেন এবার ।'

—'বিলক্ষণ । বিলক্ষণ, খুব ভালো করে বুঝেছি । তুলেছেন পুলিশ বাজরে,এখন আবার নিয়ে যাবেন পুলিশ একাডেমিতে, দেখছি পি.আই.বি.ট্যুরে এসে পুলিশ রাজের মধ্যে থাকতে হবে। এলাম শিলঙে, থাকবো বড়বাজারে খাসি মেয়েদের মাতৃতান্ত্রিক জামাই আদরে, মজা সুপুরি খেয়ে এই শীত-বৃষ্টিতে একটু গা গরম করবো, আর তা না করে কোথায় পুলিশ বাজারে ।'

—'আরে দেখবেন, দেখবেন, সাত বোনের রাজ্যে পুলিশ একাডেমি। চোখ একেবারে জুড়িয়ে

যাবে আপনার, ডাইরেক্টর মিস্টার সেকারামকে দেখলে মনে হবে আপনি জেনারেল জে.এন.চৌধুরীকে দেখছেন ।'

—'বলেন কি ?'

—'অবিকল জে.এন.চৌধুরী । সেইরকম উঁচু লম্বা, মাথায় টাক.... ।'

—'ভয় ধরিয়ে দিচ্ছেন তো আপনি, জহরবাবু ।'

—'না,না ভয়ের কিস্যু নেই, দারুণ অমায়িক লোক নেপার ডাইরেক্টর সেকারাম সাহেব ।'

টক্, টক্, টক্...

'কে ? প্লিজ কাম ইন ।'

—'ওঃ শেখর বাবু ।'

—'দেখুন তো এই ছেলেটার দিকে তাকিয়ে কুমুদ দা । ধরে এনেছি আপনার কাছে । এর নাম নৃপেন দেববর্মা, আমাদের কাতলামারায় বাড়ি । আমাদের ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের মতো ইনোসেন্ট মুখ, ঠিক ধরেছি আমি; আপনার ককবরকে কথা বলে ।'

—'কুবুই দা নিনি নক কাতলামারা ?' (সত্যি কি তোমার বাড়ি কাতলামারা ?)—'হুঁ, কুবুই - ন' (হ্যাঁ, সত্যিই তো) ।

—'তাম, খূলাই নূঙ অর ? (কি করো তুমি এখানে ?)'

—'অ হোতেল' বয়নি ছামুঙ তাঙগ' (এই হোটেলে বয়ের কাজ করি)—'এই আবার শুরু হলো ককবরক, শিলঙের হোটেলেও ককবরক । নেপা থেকে ফিরে এসে নৃপেনের সঙ্গে খুব কথা বলুন আপনি । এখন যান তো স্নান করতে, আমার ব্যাগে সরষের তেলের শিশি আছে । শেখর যাও তুমি, চান-টান সেরে রেডি হয়ে নাও, ঠিক একঘন্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে' — জহর আচার্যীর কড়া হুকুম।

—'শেখর দত্তকে বলতে হবেনা । সুবল দে আর সমীরণ রায় তো এখনো নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে, তাঁদের তুলুন গিয়ে আপনি । এখন ন'টার বেশী বেজে গেছে এখনো ঘুমোচ্ছে । দেখছি নেপার প্রোগ্রাম ফেল মেরে যাবে ।'

—'আপনি জানেননা জহর বাবু, সাংবাদিকদের ছ'টার ঘুম ন'টায় ভাঙে । যান,যান আপনি, তাড়া দিন তাদের, জহর, সুজিত ইয়ং সাংবাদিকরা কি করছে দেখুন । পানিগ্রাহি বাবু তো খুব পার্টিকুলার, সেজেগুজে বসে আছেন দেখুন ।'

দশটা পনেরো । ব্রডওয়ে হোটেলের রিসিপশান কাউন্টারে মিস্টার দেবনাথের কাছে রুমের চাবি দিচ্ছি, এমন সময় জহরবাবু এসে বললেন—'প্রোগ্রাম এদিক-ওদিক করতে হলো ।' —'কি হলো, তাহলে নেপায় যাওয়া হচ্ছেনা এখন ?' ' না না-নেপায় যাবো । তার আগে আই. সি. এ .আর. (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্স) হয়ে যেতে হবে ।'

—'হঠাৎ করে কি হলো আবার ।'

—'না, মানে আই-সি এ আর থেকে মিস্টার শর্মা জানিয়েছেন তাঁদের রিসার্স কমপ্লেক্স প্রথম ভিজিট করে নেপায় যেতে । তাঁদের অন্য একটা কী প্রোগ্রাম আছে আজ ।'

—'তাহলে নেপার ডাইরেক্টর সাহেবকে জানিয়ে দিন । পুলিশ বলে কথা ।'

— 'সে জানিয়ে দিয়েছি । আমরা আই সি এ আর সেরে ঠিক দেড়টায় পৌছে যাবো নেপায়।'

—'আই. সি.এ.আর থেকে নেপা কতদূর ?'

—'নেপা আর আই-সি-এ-আর প্রায় কাছাকাছি। দুটোই বড়পানির কাছে । ঠিক আছে, ভালোই

হলো, লান্‌চের সময় পৌঁছে যাওয়া যাবে।'

হোটেল থেকে নেমে উঠতেই হঠাৎ পাইনবন থেকে একখানা মেঘ এসে ভিজিয়ে দিয়ে গেলো আমাদের। শেখর বলে উঠলো, 'কোথায় থাকে এই মেঘগুলো, হঠাৎ হঠাৎ এসে গেরিলা কায়দায় হামলা করে।' —তাই তো এখন চেরাপুঞ্জিকে বলে ওয়েটেস্ট ডেজার্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড।'

পুলিশ বাজারের পাশ দিয়ে একটা বুনো রাস্তায় ঢুকে পড়লো আমাদের জিপ। দু'ধারে পাইনবন। ঝির ঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। প্রথম জিপে জহরবাবু শেখর আর আমি। আমাদের জিপের ড্রাইভার অসমীয়া, বাবা নেপালী। নেপালী বস্তির পাশ দিয়ে যেতেই বললেন—'আমরা শিলঙের নেপালীরা এখানে বস্তি করে থাকি। আগে বেশ শান্তিতে ছিলাম। এখন খাসিরা আর আগের মতো আপন মনে করে না আমাদেরকে।'

—'হ্যাঁ, আজকাল প্রায়ই কাগজে দেখা যায় খাসি-নেপালী গন্ডগোলের কথা। খাসি খাসি খাসি।'

—'কি হলো আপনার কুমুদ দা, এতবার খাসি খাসি করছেন। নস্টালজিয়ায় পেলো নাকি আপনাকে'-জিজ্ঞেস করেন জহরবাবু। 'নস্টালজিয়া বলুন আর যাই বলুন, কোথাও গেলে ইতিহাসের অন্ধকার তাঁড়া করে আমায়। মনে হচ্ছে, খাসি হিলস এর খাসি মেয়েদের সঙ্গে পাহাড়ের গায়ে সেই প্রাক— আর্য যুগে ধান লাগাচ্ছি, পান-সুপুরির চাষ করছি। জুমের টোঙঘরে বসে শূকর আর হরিণ তাড়াচ্ছি।'

—'ওহ্, ব্রেভো ব্রেভো' —চিৎকার করে ওঠে শেখর—'আপনি কি তাহলে বলতে চান আমরা ভারতে এসে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষদের কাছ থেকে এইসব কৃষিকাজ শিখেছিলাম ?'

—'আমার মত না, সুনীতি বাবুর 'ভারত সংস্কৃতি' বইয়ে এইসব তথ্য পেয়েছি, তাই আমি বলছি। তবে খাসি মেয়েদের হাতে পান-সুপুরির উদ্যান চাষ যে প্রথম হয়, ভারতে আর্যরা আসার ঢের ঢের আগে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খাসি গুয়াই হলো সুপুরি, তার থেকে সংস্কৃতে হয়েছে গুবাক, তার পর এই গুবাক পূর্ববঙ্গে হয়েছে গো। আর এই গুয়াই ককবরক ভাষায় হয়েছে কুয়াই, বুঝলেন জহরবাবু।' 'কুমুদ দা প্রাক-আর্য যুগে চলে গেছেন। তাঁকে টেনে নামান জহরদা, এখন নেপার কথা বলুন। খাসি হিলস ও পানচাষ আর পুলিশচাষ দুটোই চলুক! আমাদের ত্রিপুরায় 'খাইস্যা' পানের যেমন কদর তেমনি কদর হোক খাসিয়া পাহাড়ের নেপা থেকে ট্রেনিং নেয়া আমাদের ত্রিপুরার পুলিশ অফিসারদের।'

—'শেখর ঠিক কথাই বলেছে জহরবাবু, এখন নেপা সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করুন ঃ অভিমন্যুর ব্যূহে যাচ্ছি, আগের থেকে কিছু জেনে নেয়া দরকার।' — আমার গলায় আবেগের আমেজ।

—'আচ্ছা, নেপার অবস্থানটা কিরকম ?' প্রশ্ন করে শেখর - 'শিলঙ থেকে কুড়ি কিলোমিটার উত্তরে আর গুয়াহাটী শহরের তিরাশি কিলোমিটার দক্ষিণে আর উমরই এয়ারপোর্টের বারো কিলোমিটার পশ্চিমে এই নেপা-নর্থ ইস্টার্ণ পুলিশ একাডেমি।'

—'বাঃ তোফা, তোফা, প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড শৈলশহর শিলঙ থেকে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার দুরে এই পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' —সিগরেট ধরায় শেখর।

— 'গ্রামের দু'শো দশ একর জমির ওপর নেপা সাত বোনের রাজ্যের মানুষদের হাতছানি দিচ্ছে।'

—'বাঃ, বিউটিফুল, বিউটিফুল।'

বড়পানি শুরু হবার ঠিক আগটায় একটা খাসিয়া বাজারে আমাদের জিপটা পৌঁছতেই ড্রাইভার বললেন —'এটা হলো খাসিয়াদের খুব পুরনো গ্রাম। খাসিয়াদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সব কাজকর্ম এখান থেকেই হয়। মিছিল মিটিং-এ এই গ্রামের লোকেরাই বেশী যায়।'

কিছুক্ষণ বাদে বাঁদিকে পাইনবনের ভেতর দিয়ে বড়পানির নীল জলরাশি উকি দিচ্ছে। জিপ বড়পানির গা ছুঁয়ে পাইনবনের পাশ দিয়ে নীচের দিকে নামতেই আমি বললাম—'দেখুন দেখুন উমিয়াম লেক।'

—'এতো বড়পানি, আর আপনি বলছেন উমিয়াম লেক!'

—'খাসি উমিয়াম লেক এখন হয়েছে বড়পানি। খাসিদের গর্ব এই লেক দেখে একজন লেখিকা কি বলেছেন জানেন?'

—'কি বলেছেন, কি বলেছেন,' জহর বাবুর গলায় আবেগাপ্লুত ভাব। বলেছেন, 'উমিয়াম নদীর তীব্র জলোচ্ছ্বাসকে এখন মেঘালয়ের মানুষ বেঁধে ফেলেছে-উমিয়াম হাইড্রেল প্রোজেক্ট এ। লেকের নীল জলে বাহারী ফুলের ছবি সতত নৃত্যশীল।'

—'ফাইন, ফাইন, এই লেখিকার নাম কি কুমুদদা?' শেখরের প্রশ্ন—'লেখিকার নাম মালবী গুপ্ত।'

—'লেখিকার নাম মালবী গুপ্ত না হয়ে মায়াবী গুপ্ত হওয়া ঠিক ছিলো। তাঁর একসপ্রেশানের মধ্যে খাসি মেয়েদের মায়াবিদ্যার ভাব রয়েছে। খাসি মেয়েরা জাদু জানে তাই না কুমুদ দা?' জহরবাবুর প্রশ্ন।

'জাদু জানে কি না জানিনে, তবে শিলঙে পড়তে এসে আমাদের আগরতলার ঠাকুরকর্তা পরিবারের ছেলেরা যে খাসি মেয়েদের প্রেমে ভিরমি খায়, সে তথ্য আমার কাছে আছে। আর তারপরে যা হয়.....' 'কি হয় কি হয় কুমুদ দা?' -শেখরের ঔৎস্যুক্য বেড়ে যায়।

'আদিত্যকর্তাকে তো আপনারা জানেন? বুদ্ধ মন্দিরের কাছে বি-এড কলেজটাই তো আদিত্য কর্তার বাড়ি ছিলো। তারপর কর্তা স্ট্যাটাস বাঁচাতে গিয়ে অতো বড় বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন সরকারের কাছে একেবারে জলের দামে'—জহরবাবু বলেন।

—'ঠিক তাই। তা যা বলছিলাম। কর্তার এক ছেলে তো গেলেন শিলঙে পড়তে। ডাক্তারি না ফার্মাকোলজি এই রকম কি একটা হবে। কর্তার ছেলে তো কর্তাই। শরীরে রাজরক্ত। চেহারাও রাজপুত্রের মত। তারপর যা হয়, অচিরে কর্তার.....।'

—'কর্তা বড়োবাজারের এক ধনী খাসি ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ের পাণি গ্রহণ করলেন।'

—'তারপর যা হলো...।'

—'কি হলো কি হলো?'

—'খাসি কন্যার ঘরে কর্তার এক ছেলে হলো। কিন্তু খাসি দুহিতা আগরতলায় এসে ঘর কন্না করতে চাইলেন না কিছুতেই। কর্তাকেই থেকে যেতে হলো শিলঙে খাসি রানীর কাছে।'

—'আপনি বলছেন ত্রিপুরার রাজ পরিবারের ছেলে শেষ পর্যন্ত শিলঙে ঘর জামাই হয়ে উঠলেন। খুব ইন্টারেস্টিং তাহলে তো, নেপা থেকে ফিরে এসে কর্তার বাড়ি যেতে হয়।'

—'আরে কুমুদদা, গল্প থামান আপনার। বড়পানি তো শেষ। এবার আমাদের জিপ বাঁক নেবে ডানদিক আই. সি. এ. আর এর পথে। আর ওই দেখুন বাঁ দিকে উঠে গেছে নেপা যাবার রাস্তা। আই. সি. এ. আর থেকে ফিরে সেখানে আমরা যাবো। সেখানে ডাইরেক্টর সেকারাম সাহেব অপেক্ষা করে থাকবেন আমাদের জন্যে।'

আই.সি. এ. আর. থেকে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দেড়টার সময় আমাদের জিপ নেপার ফটকে এসে দাঁড়ালো বেশ খানিকটা গর্বিতভাবে। আগের থেকেই অরণ্য শোভিত সদর দরজায় নেপার এস্কর্ট গাড়ি অপেক্ষা করছিলো সাংবাদিকদের জন্যে। সাংবাদিকদের দেখামাত্র মন্ত্রমুগ্ধের মত খুলে গেলো পুলিশ প্রহরী বেষ্টিত ফটক। আগে পিছে এসকর্ট ভ্যান মাঝখানে আমাদের জিপ। মনে হচ্ছিল আমাদের ত্রিপুরার আঠারো মোড়া পাহাড়ের আরণ্যানীর মধ্য দিয়ে এগয়ে চলেছি আমারা। মিনিট দশেকের ভেতর আমাদের জিপ নেপার নয়নমনোহর কেল্লার সামনে এসেই থেমে গেলো। দেখলাম, সাংবাদিকদের অভিনন্দন জানানোর জন্য ডাইরেক্টর টি.সি. সেকারাম তাঁর অন্যান্য সহকর্মী পুলিশ অফিসারদের নিয়ে একেবারে গার্ড অফ অনার দেয়ার কায়দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। জিপ থেকে নামতেই উষ্ণ করমর্দনের পালা। করমর্দনের পর্ব শেষ হতেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো একতালার অতিথি অভ্যর্থনার হল ঘরে। মুখোমুখি বসেছি আমরা। যেন কোনো চুক্তি হবে। পি.আই. বি.'র প্রতিনিধি জহর আচার্যকে বসানো হলো নেপার পুলিশ প্রতিনিধিবর্গের মাঝখানে-একেবারে ডাইরেক্টর সেকারাম সাহেবের পাশে। জহর বাবুর ডান দিকে পরপর বসেছেন মিস্টার কাপুর, মিস্টার ভার্মা, মিস্টার রক্ষিত প্রমুখ পুলিশ প্রশিক্ষকবৃন্দ। আর পুলিশ প্রশিক্ষকবৃন্দের সামনে ত্রিপুরার সাংবাদিক বৃন্দ—বাম দিক থেকে পরপর শ্রীযুক্ত পানিগ্রাহী (ইউ.এন.আই), শ্রীযুক্ত সুবল দে (সম্পাদক স্যন্দন পত্রিকা), শ্রীযুত সমীরণ রায় (সম্পাদক, ত্রিপুবা দর্পণ), শ্রীযুত শেখর দত্ত (রিপোর্টার, দি টেলিগ্রাফ), শ্রীযুত জহর চক্রবর্তী (রিপোর্টার, ডেইলী দেশের কথা), শ্রী সুজিত দে (রিপোর্টার, দৈনিক সংবাদ) ও লেখক-গবেষক আমি। হঠাৎ আমার চোখ গেলো আমার বাঁদিকে দেযালে টাঙানো কারুকার্যখচিত একটা বোর্ডের দিকে। সেখানে লেখা আছে-নেপা গ্রিটস দ্য এস্টিমড জার্নালিস্ট অফ ত্রিপুরা। থার্টি ফার্স্ট মার্চ, ১৯৯৭ এ্যাট ওয়ান থার্টি পি. এম।

উভয় তরফ থেকে পরিচয়েব পালা শেষ হতেই ডাইরেক্টর টি.সি.সেকারাম বললেন—ত্রিপুরার সম্মানীত সাংবাদিক বন্ধুরা অভিনন্দন গ্রহণ করুন। পাল্টা অভিবাদন জানালেন সাংবাদিক প্রবরেরা- নেপা আমাদের সাত বোনের রাজ্যের গর্ব। হে পুলিশ প্রশিক্ষকবৃন্দ, আপনারা ত্রিপুরার সাংবাদিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

এবার প্রশ্ন-উত্তরের পালা। সাংবাদিকদের প্রশ্ন— 'নেপার অবস্থানটা একটু আমাদের বলবেন মিস্টার সেকারাম? কোথায় এসে যেনো হারিয়ে গেলাম আমরা!' উত্তর-'মেঘালয়ের খাসিপাহাড়ে ৯৭৬ মিটার উচ্চতায় উমসা নামে গ্রামের ২১০ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পুলিশ একাডেমি-নেপা। ঠিক গা ঘেঁষে চলে গেছে গোয়াইহাটি শিলং মেন রোড। এর ঠিক দক্ষিণেই বিখ্যাত উমিয়াম লেক এবং অনতিদূরে উমরোই এয়ারপোর্ট। পাইনবীথি ও পাহাড়ী লতাগুল্মে ঘেরা এর চার দিক। পরপর নয়নাভিরাম পাহাড়ের সারি। প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্যের কোলে আপনদের গর্বের নেপা।'

প্রশ্ন— 'এবার বলুন, কখন কীভাবে আমাদের সাতবোনের রাজ্যের এই পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠলো?'

উত্তর—'আজ থেকে ঠিক উনিশ বছর আগে ১৯৭৮ সালে পাহাড়ী ফুলের মতো চোখ মেলে তাকিয়েছে দেশের একমাত্র এই আঞ্চলিক পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ১৯৭৮ সালে গোরে কমিটির সুপারিশে নর্থ ইস্টার্ন-পুলিশ একাডেমির জন্ম। উদ্দেশ্য ছিলো শুধুমাত্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পুলিশ অফিসারদের ট্রেনিং দেয়া। পাহাড়ী এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আর্থিকভাবে অনগ্রসর। আলাদা আলাদা ভাবে পুলিশ কেন্দ্র গড়ে তোলা এই সব গরিব রাজ্যের পক্ষে সম্ভব ছিলোনা কখনো, তাই প্রয়োজন

অনুভূত হলো এই ধরনের আঞ্চলিক পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার ।'

প্রশ্ন— 'কী ভাবে এবং কী কী কোর্স দিয়ে নেপার জয়যাত্রা শুরু হয়েছিলো তা বলবেন একটু দয়া করে ?'

উত্তর— 'নেপার জয়যাত্রা শুরু হয়েছিলো সীমিতভাবে মাত্র পাঁচটা ট্রেনিং কোর্স চালু করে-দুটো বেসিক কোর্স আর তিনটে রিফ্রেসার্স কোর্স । ১৬৬ জন পুলিশ অফিসার ট্রেনিং নিয়েছিলেন প্রাথমিক পর্বে ।'

প্রশ্ন— 'প্রাথমিকভাবে কোন কোর্সে কতো জন ট্রেনিং নিয়েছিলো যদি একটু বলেন ।'

উত্তর— ১) বেসিক কোর্স ডাইরেক্টলি রিক্রুইটেড ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ-১৬ জন ।

২) বেসিক কোর্স ফর ডাইরেক্টলি রিকক্রুইটেড এস অই- ৬০ জন ।

৩) ওয়ান প্রোমোশন কোর্স- ৩০ জন ।

৪) ওয়ান রিফ্রেশার কোর্স- ৩০ জন ।

৫) ওয়ান সোসালাইজড্ কোর্স - ৩০ জন ।

সর্বমোট ১৬৬ জন । 'ধন্যবাদ মিস্টার সেকারাম । এবার একটু বলবেন কি এই পাঁচটা কোর্সের কি ভিন্ন ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য ছিল ?'

উত্তর — 'নিশ্চয়ই ছিলো । প্রথম কোর্সের উদ্দেশ্য ছিলো উত্তর পূর্বঞ্চলের রাজ্যগুলোর এস.আই এবং ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ অফিসারদের যাঁরা সরাসরি এইসব পোস্টের জন্য মনোনীত হয়েছেন । তাঁদেরকে এক বছরের কোর্সের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলা । দ্বিতীয় কোর্সের উদ্দেশ্য ছিলো —আপনাদের সাত বোনের রাজ্যগুলোর যে সব এস.আই এবং তার ওপরে কর্মরত পুলিশ অফিসার আছেন, তাঁদেরকে বিভিন্ন ধরনের পুলিশ ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ করে তোলা । তৃতীয় কোর্সের উদ্দেশ্য ছিলো-রাজস্ব, আইন, জেলা প্রশাসন এবং শুল্ক প্রভৃতি বিভাগের অফিসারদের সঙ্গে পুলিশ অফিসারদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা । চতুর্থ কোর্সের উদ্দেশ্য ছিলো—গবেষণামূলক সার্ভে ও তথ্যসংগ্রহের কাজ, যা কিনা পুলিশ অফিসাররা প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় হাতে কলমে শিখতে পারেন । আর, সর্বশেষ পঞ্চম কোর্সের উদ্দেশ্য ছিলো—বিভিন্ন লেখকের লেখা বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ সমূহে পুলিশের কাজ-কর্ম সংক্রান্ত যে সব তথ্য আছে সেগুলোকে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার দক্ষতা অর্জন করা।'

ইতিমধ্যে চা জলখাবার এসে গেলো সুদৃশ্য রেকাবিতে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে । আমার উৎসুক চোখছিলো সেকারাম সাহেবের দিকে । ঠিক-ই তো জেনারেল জে.এন চৌধুরীর সঙ্গে ভদ্রলোকের মিল আছে । কী নম্র, আর কী সাবলীল ইংরেজীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন একের পর এক । ওঃ সত্যিই কী অপূর্ব এই পুলিশ প্রশিক্ষক, যাঁর পুরো দায়িত্বে রয়েছে সাতবোনের রাজ্যের এই পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে । চা-জলখাবার খেতে খেতে আত্মপ্রসন্নতায় আবার মুখ খুললেন তিনি । বললেন, 'দেখুন, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে আমাদের এই পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র । এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সব থেকে বড় দায়িত্ব হলো প্রশিক্ষণরত পুলিশ অফিসারদের দৃঢ় অত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তিতে মানবিক গুণসম্পন্ন করে তোলা, তাদেরকে দৃঢ়চেতা, বিনয়ী ও সব বিষয়ে পারঙ্গম করে তোলা-যাঁরা সমাজে শান্তি স্থাপনে জীবন উৎসর্গ করবেন । আমাদের পুলিশ অফিসারদের থাকবে সমতার চোখ । তাঁরা সদা সর্বদা কাজ করে যাবেন সামাজিক অসন্তোষ দমনে । তাঁদের কাজ হবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা । নেপার প্রশিক্ষণরত পুলিশ ছাত্রদের কাজ হবে দেশের স্বাধীনতার

মূল্য উপলব্ধি করা। যে সব মানুষ স্বাধীনতাকে দুর্বৃত্তায়নের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তাদের গলার টুপি চেপে ধরা। সাংবাদিক বন্ধুরা, এই হলো নেপার প্রাণের কথা, মনের কথা।'

প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা শুনছিলাম নেপার ডাইরেক্টর টি.সি.সেকারামের কথা। আবার শুরু হলো সাংবাদিকদের প্রশ্ন— 'আচ্ছা, সেকারামজী, যে পাঁচটা পুলিশ কোর্সের কথা বললেন একটু আগে, তার বাইরে আরো কি কোর্স আছে পুলিশ অফিসারদের ট্রেনিং দেয়ার জন্যে ?'

— 'হ্যাঁ ঠিক প্রশ্ন করেছেন আপনারা। আমরা সময়ে সময়ে আমাদের প্রশিক্ষণ ধারা বিচার বিশ্লেষণ করেছি এবং চলমান সময়ের চাহিদা অনুসারে নেপার প্রশিক্ষণ কর্মধারারও পরিবর্তন ঘটছে। আমরা ইতিমধ্যে ১৫০ টি ট্রেনিং প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে ৪২৭২ জন পুলিশ অফিসারকে বিশেষ ট্রেনিং দিয়েছি। গত দু'বছরে আরো বারোটা নতুন কোর্সের মাধ্যমে ৫৪৯ জন পুলিশ অফিসারকে তালিম দেয়া হয়েছে।'

প্রশ্ন— 'কোর্সগুলোর নাম বলবেন দয়া করে ?'

উত্তর — 'কোর্সগুলো হলো-বেসিক কোর্স ফর ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ এন্ড এস.আই। কাউন্টার ইন্সারজেন্সি এন্ড কম্ব্যাটিং-টেরোরিজম। ওয়েপন ট্রেনিং এন্ড ফিল্ড অপারেশন পুলিশ কমান্ডো। এক্সপ্লোসিভ এন্ড বোম ডিসপোজাল। রিফ্রেসারস কোর্স। স্পেশাল কমান্ডো কোর্স ফর আসাম স্টেইট পুলিশ। পি.টি.আই এন্ড ড্রিল ইনসট্রাকটরস কোর্স। এ্যাডভান্স ইনটেলিজেন্স, ইনভেসেটিগেশান এন্ড ইনটারোগেশান কোর্স। ভি.আই.পি সিকিউরিটি কোর্স। নারকোটিকস-ল-এনফোর্সমেন্ট কোর্স এবং কমপিউটার এপ্রিসিয়েশন কোর্স। একটু থামলেন সেকারাম সাহেব এবং বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বললেন, কর্মরত পুলিশ অফিসারদের জন্যে ১৯৯৬ সালে আরো বিশেষ তিনটি কোর্স সংযুক্ত করা হয়েছে, আর তাহলো হিউম্যান রাইটস, ট্রেনিং অফ ট্রেনার্স এবং কোর্স স্টাডি প্রেজেন্টেশন।'

এরপর শিরস্ত্রাণ খুলে পাশে রেখে সেকারাম সাহেব আমাদের দিকে এক ঝলক কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'আপনারা ভাবছেন এখানেই নেপার কর্মযজ্ঞ শেষ। না বন্ধুরা না। আরো কুড়িটার মতন স্পেশালাইজড ট্রেনিং প্রোগ্রাম কন্ডাকট করছি আমরা, পুলিশ অফিসারদের জন্যে।'

ডাইরেক্টর সেকারামের কথা শুনে আমরা-তো অবাক। এর পরেও আরো স্পেশালাইজড প্রোগ্রাম। ঔৎসুক্য বেড়ে গেলো আমাদের। জিজ্ঞেস করলাম, বলুন বলুন সেগুলো কেমন ?

উত্তর —' দেখুন, এর একটা ইতিহাস আছে। ১৯৯৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্রেটারী(পুলিশ)'র চেয়ারম্যানশিপে গড়ে উঠলো একটা কমিটি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবদী কার্যকলাপ মোকাবিলার জন্যে অতি আধুনিক সব ট্রেনিংপদ্ধতির সুপারিশ করলো কমিটি। কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করল কেন্দ্রীয় সরকার। আর সেগুলো হলো কাউন্টার ইনসারজেন্সি সিম্পোজিয়াম, কাউন্টার ইনসারজেন্সি এন্ড কম্ব্যাটিং টেরোরিজম, ওয়েপন ট্রেনিং এন্ড ফিল্ড অপারেশন, পুলিশ কমান্ডো, একসপ্লোসিভ এন্ড বোম ডিসপোজাল, বেসিক কোর্স ফর ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ এ্যান্ড এস.আই. রিফ্রেসারস কোর্স ফর য়ুথ অফিসার্স, রিফ্রেসারস কোর্স ফর নিউলি প্রোমোটেড ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টস অফ পুলিশ, পি. পি.আই এন্ড ড্রিল। ইন্সট্রাক্টারস কোর্স অফ ম্যানেজমেন্ট কোর্স। এ্যাডভানস ইনটেলিজেন্স, ইনভেসটিগেশান এন্ড ট্রেইনার্স কোর্স, ভি আই পি সিকিউরিটি কোর্স, নারকোটিস ল এনফোর্সমেন্ট কোর্স, সিভিল এভিয়েশন সিকিউরিটি কোর্স, কমপিউটার এ্যান্ড পি.সি.অপারেশন কোর্স, ফিঙ্গারপ্রিন্ট অপারেশন কোর্স, প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ডব্লিউস।'

এবার প্রসন্নতার হাসি হেসে কৌতূহলী সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে নেপার পুলিশ প্রধান বললেন, 'আপনাদের নেপা এখন ১১০০ পুলিশ অফিসারদের এই কুড়িটি স্পেশালাইজড ট্রেনিং কোর্স প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। অথচ এই জয়যাত্রা শুরু হয়েছিলো মাত্র পাঁচটি কোর্সের মাধ্যমে ১৬৬ জন পুলিশ অফিসারকে ট্রেনিং দেয়ার মধ্য দিয়ে।'

মুগ্ধ সাংবাদিকরা আবার প্রশ্ন করে বসলেন আত্মপ্রত্যয়ী সেকারাম সাহেবকে, 'আচ্ছা, সেকারামজী, পুলিশ অফিসারদের ট্রেনিং দেয়ার ক্ষেত্রে নেপার সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার বা ওই ধরনের অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আছে কি ?'

উত্তর—'সাংবাদিক বন্ধুদের জানার আগ্রহ দেখে খুবই খুশী হয়েছি আমি। নেপা তার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মান বাড়ানোর জন্যে ভারতবর্ষের নামজাদা সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ রক্ষা করে চলে। আর সেগুলো হল—হায়দ্রাবাদের ন্যাশানাল পুলিশ একাডেমী এ্যান্ড এডমিনিসট্রেটিভ স্টাফ কলেজ, নয়াদিল্লীর ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক এডমিনিসট্রেশন, সি.পি.ও. একাডেমিস। এছাড়া অন্যান্য প্রফেশন্যাল এজেন্সি—যেমন, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডস ব্যুরো, আর্মি ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ক্রিমিনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ক্রিমিনোলজি এ্যান্ড ফরেনসিক সায়েন্স প্রভৃতির সাহায্যও নেপা গ্রহণ করে থাকে তার পুলিশ অফিসাদের ট্রেনিং দেয়ার ক্ষেত্রে। নর্থ-ইস্টার্ন কাউনসিলের পূর্ণ সহযোগিতায় নেপা এখন ভারত সরকারের চোখের মণি। ভারত সরকার গৌরবজনক স্বীকৃতি দিয়েছে সাতবোনের রাজ্যের এই পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে। আমাদের এই একাডেমি থেকে ইতিমধ্যে ন'জন পুলিশ অফিসার পুলিশ পদক পেয়েছেন তাঁদের যোগ্যতার মর্যাদা হিসেবে। আপনারা ত্রিপুরার সাংবাদিক, শুনে খুশী হবেন যে নেপার প্রতিবন্ধী পুলিশ কর্মী শ্রীযুক্ত অনুপকুমার ঘোষ, যিনি কিনা আপনাদের পার্বত্য ত্রিপুরার পুলিশ বন্ধু, গত বছর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবন্ধী পুলিশ কর্মী হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন।'

প্রতিবন্ধী পুলিশ বন্ধু অনুপ কুমার ঘোষের কথা শুনে গর্বে বুকটা ফুলে উঠলো ত্রিপুরার সাংবাদিকদের। অনুপ কুমার ঘোষ আমাদের ত্রিপুরার গর্ব। তাঁর সম্মানে মাথা নত করে সাংবাদিকরা এবার চলে এলেন অন্য প্রসঙ্গে। জিজ্ঞেস করলেন, 'সেকারামজী, নেপার পুলিশ প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণরত পুলিশকর্মী ও অন্যান্যদের জন্যে আবাসিক বিনোদন বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধে কি আছে যদি একটু বলেন দয়া করে।'

সাংবাদিকদের কথতা শুনে মৃদু হাসলেন সেকারামজী। তারপব বললেন, 'সব দিকেই আপনাদের নজর আছে দেখছি। খুব সুস্বাস্থ্যের পরিবেশের মধ্যে নেপার কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা আছেন এখানে। পুলিশ কর্মীদের ছেলে-মেয়েরা যাতে লেখাপড়ার ভালো সুযোগ পায় তার জন্যে রয়েছে টুয়েলভ ক্লাস সেন্ট্রাল স্কুল এবং সেখানে অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, কোঅপারেটিভ ক্যানটিন, রিক্রিয়েশান ক্লাব, ডেয়ারি ও পোলট্রি ফার্মস, কেবেল টি.ভি. নেটওয়ার্ক-কোনো কিছুরই অভাব নেই এখানে। ভেবে দেখুন, মাত্র উনিশ বছরের মধ্যে নেপা সব দিক থেকে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে শিখেছে একান্ত স্বাবলম্বীভাবে। আপনাদের ভালো লাগবে শুনে যে নেপায় পঁচিশ হাজার বইয়ের এক সুন্দর লাইব্রেরী আছে। আর চারটি লেকচার হল।'

এবার একটু অন্য ধরনের প্রশ্নের অবতরণা করলেন সাংবাদিকরা। জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সেকারামজী, নেপায় যাঁরা প্রশিক্ষণ নেন,তাঁদের মধ্যে ট্রাইবাল পুলিশের ভাগ কেমন।'

উত্তর—'দেখুন, সাতবোনের রাজ্যগুলোতে পুলিশ বিভাগে ট্রাইবাল পুলিশের ভাগ খুব সন্তোষজনক, ননট্রাইবেল পুলিশ থেকে তাঁদের সংখ্যা একটু বেশী। এইতো আমাদের এখানে বেসিক

ট্রেনিং কোর্সে এগার জন ট্রাইবাল পুলিশ অফিসার ট্রেনিং নিচ্ছেন ।'

এবার আবার সাংবাদিকদের প্রশ্ন—'বাজেটের কথা একটু বলুন এবার । নেপার বাৎসরিক বাজেট কত ?'

উত্তর— 'দেখুন, প্রতি পাঁচ বছরের জন্যে একটা বাড়তি টাকা আমার পাই । গত বছর পেয়েছি এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা । প্রতি বছর আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম বাড়ছে । আর তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের বাজেট বরাদ্দে বেশী টাকা আসা দরকার ।'

সাংবাদিকদের ফের প্রশ্ন— 'আচ্ছা, সেকারামজী, আমার জেনেছি একটা বোর্ডের মারফত এই উত্তর পূর্বাঞ্চল পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হয়ে থাকে । সে সম্পর্কে বলবেন কিছু ?'

উত্তর— 'ঠিক বলেছেন আপনারা । নেপার পরিচালনার জন্যে একটা বোর্ড আছে এবং সেই বোর্ডের সদস্যসংখ্যা তের ।'

প্রশ্ন — 'এই তের সদস্যক বোর্ডের সদস্য কারা জানতে পারি কি ?'

উত্তর -- 'বিলক্ষণ জানতে পারেন আপনারা । বোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন এন.ই.সি (নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল)'র সেক্রেটারী স্বয়ং এবং অন্যান্য সদস্যরা হলেন—ডি জি পি আসাম(সদস্য), ডি জি পি মেঘালয়(সদস্য), ডি জি পি মণিপুর (সদস্য), ডি জি পি নাগাল্যান্ড (সদস্য), ডি জি পি ত্রিপুরা (সদস্য), আই জি পি অরুণাচল প্রদেশ (সদস্য), ডাইরেক্টার (টি আর জি) বি বি আর এন্ড ডি এম এইচ এ (সদস্য), ফিনান্সিয়াল এ্যাডভাইজার এন ই সি (সদস্য),জয়েন্ট সেক্রেটারী (পুলিশ) এম এইচ এ (সদস্য), জয়েন্ট সেক্রেটারী (এন ই) এম এইচ এ (সদস্য), এবং ডাইরেক্টার নেপা (মেম্বার সেক্রেটারী) ।'

—'আচ্ছা, সেকারামজী, নেপার এই সুন্দর পুলিশী দুর্গে এসে আমরা খুবই খুশী । আর এই দুর্গ পরিচালনায় যাঁরা আছেন তাঁদের সংখ্যা কত এবং কি ধরণের পদমর্যাদা তাঁদের, একটু বলবেন কি ?'

উত্তর — মৃদু হেসে । 'ঠিকই বলেছেন । নেপা একটা দুর্গ বটে । এই দুর্গে স্যাঙ্কশন্ড পোস্ট আজে ২৪৭ । কিন্তু কাজ করেন ২১২ জন । পদমর্যদা সহকারে পোস্টগুলোর হাল হকিকৎ এই রকম— গেজেটেড 'এ' ক্যাটাগরি—স্যাঙ্কশন্ড পোস্ট ১০ পোস্ট ফিল্ড ৫, গেজেটেড 'বি' ক্যাটাগরি স্যাঙ্কশন্ড পোস্ট ৪, পোস্ট ফিল্ড ২, নন গেজেটেড 'সি' ক্যাটাগরি স্যাঙ্কশন্ড পোস্ট ৪ ফিল্ড ৪, গ্রুপ 'ডি' ক্যাটাগরি স্যাঙ্কশান্ড পোস্ট ৫৭ ফিল্ড ৫৬, ক্যান্টিন স্টাফ 'সি' স্যাঙ্কশন্ড পোস্ট ৩ ফিল্ড ৩, ক্যান্টিন স্টাফ গ্রুপ 'ডি' স্যাঙ্কশন্ড পোস্ট ৭ ফিল্ড ৫ ।'

সাংবাদিকদের থেকে আবার প্রশ্ন— 'আচ্ছা, সেকারামজী, নেপায় পুলিশ ট্রেনিং এর দৈনন্দিন চিত্রটা একটু তুলে ধরবেন আমাদের সামনে ?'

উত্তর— 'ঠিক ভোর চারটের বিউগল বাজার সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠেন আমাদের পুলিশ বন্ধুরা । পি. টি এবং প্যারেড শুরু হয় ভোর সোয়া পাঁচটায় । এবং ৭ টা পর্যন্ত তা চলে । প্রাতরাশের পরে ঠিক সাড়ে আটটায় সতেরটা বিষয়ের ওপর ইনডোর ক্লাশ শুরু হয়ে যায় এবং চলে ১টা পর্যন্ত । এর পর মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ঠিক আড়াইটার সময় আউটডোর ক্লাশ শুরু হয় এবং চলে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত । সব শেষে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের গেম ক্লাশ শুরু হয় । বিকেলের সেশানে প্রশিক্ষণরত পুলিশ অফিসাররা শেখেন ঘোড়ায় চড়া ও মোটর সাইকেল চালানো । এর পর এক ঘন্টা বিশ্রামের পর শুরু হয় লাইব্রেরী ক্লাশ এবং তা চলে সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত । অবশ্য তা সপ্তায় চার দিন মাত্র । আর সপ্তায় দু'দিন সিনেমা শোতে অংশ নেন পুলিশ অফিসাররা । ঠিক এভাবেই সারা সপ্তাটা কাটান অতি ব্যস্ততার মধ্যে, প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মশগুল হয়ে থাকে আমাদের পুলিশ কর্মীরা ।'

—'এবার আমাদের শেষ প্রশ্ন সেকারাম সাহেব। নেপার বিভিন্ন কোর্সে যাঁরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তাঁদের বছরওয়ারি হিসেবটা কেমন ?'

উত্তর— 'দেখুন আমার কাছে ১৯৯০ থেকে '৯৬ এই ক'বছরের হিসেব আছে এবং তা হল— ১৯৯০ (২০৯ জন), ১৯৯১ (৩৭৭ জন), ১৯৯২ (২২৫ জন), ১৯৯৩ (৩২৮ জন), ১৯৯৪ (৩৩৯জন), ১৯৯৫ (৫২৩ জন) এবং ১৯৯৬ (৫৭০ জন) —এই হলো গত সাত বছরের চিত্র।'

—'ঠিক আছে সেকারামজী। আমরা সাতবোনের রাজ্যের নেপার কাজকর্ম দেখে খুবই মুগ্ধ। আপনারা ত্রিপুরার সাংবাদিকদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।' 'নেপার তরফ থেকেও আপনাদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। চলুন এবার লাঞ্চের দিকে যাওয়া যাক।'

শিলঙ, ১লা এপ্রিল, ১৯৯৭। সেদিন খাসি পাহাড়ের নর্থ-ইস্টার্ন পুলিশ একাডেমি (নেপা) থেকে ফিরতে ফিরতে শুধু বার বার মনে পড়ছিলো ত্রিপুরার পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্কের কথা। আমাদের জিপ উমিয়াম লেকের পাশ দিয়ে শিলঙ পাহাড়ে উঠছিলো। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেছে। লেকে ভাসমান নৌকো থেকে আলোর নয়নমনোহর দৃশ্য। মন স্বাভাবিক ভাবেই রোমান্সের ভেতর ডুবে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমার মনে তখন বেসুরো বাজছিল। বিষণ্নতায় আশ্রয় করেছিলো আমার শরীর ও মন। নেপার ডাইরেক্টর মিস্টার টি সি সেকারামের পুলিশী কর্তব্যবোধের কথাগুলো ত্রিপুরার সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করছিলাম একটু গভীর ভাবে। এই যে হিউম্যান রাইটস এর কথা বললেন তিনি, কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা তা মানছে কি ? তাহলে ত্রিপুরায় কুটনাবাড়ি হয় কেন ? সন্ত্রাসবাদী দল এ টি টি এফ (অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স) আক্রমণ করলো টহলরত টি এস আর (ত্রিপুরা রাইফেলস) বাহিনীকে, উভয়পক্ষে হতাহত হলো, কিন্তু পাল্টা নিতে গিয়ে কেন টি এস আর এর জওয়ানরা সাধারণ উপজাতিদের ওপর পাগলা হাতির মতো আক্রমণ করলো ? কেন মুহূর্তের মধ্যে দু'শোর মতো ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলো তারা, কেন গর্ভবতী মা বোন প্রাণ হারালেন তাদের হাতে, কেন ধর্মস্থান পুড়িয়ে দিয়ে একজনকে হত্যা করলো সেখানে তারা ? তাহলে নেপা কী শেখাচ্ছে পুলিশদের, নীতিবোধ মানসিকতা বোধ কি শেখানো হচ্ছে না সেখানেও ? শুধু যান্ত্রিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া ? সেদিন লাঞ্চ খেতে খেতে সেকারাম সাহেব যখন আমার পাশে এসে বসলেন, তখন একটু উত্তেজিতভাবে কুটনাবাড়ির প্রসঙ্গ তুলেছিলাম আমি। বলেছিলাম, 'এ কী করলো টি এস আর বাহিনী সেদিন ? দু'শো পরিবার মুহূর্তের মধ্যে সর্বস্বান্ত হলো ? যে পুলিশ সাধারণ মানুষের ধনসম্পদ রক্ষা করবে, সে কি না করলো এমন নীতি বিগর্হিত জঘন্য কাজ ! ত্রিপুরার গোটা ট্রাইবেল সমাজের ওপর সুদূরপ্রসারী কী খারাপ প্রভাব পড়লো জানেন ? মানবিক বোধ বিসর্জন দিয়ে এখন মানবধিকার লঙঘন ত্রিপুরার পুলিশ কী করে করলো বলুন সেকারাম সাহেব ? পুলিশকে কী নীতিবোধ শেখাচ্ছেন আপনারা নেপায় , আমাদের সাতবোনের রাজ্যের গর্বের জায়গা এই পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ?' অতিথি আপ্যায়নের মধ্যে আমার এ ধরনের প্রশ্নে বিস্মিত হলেন নেপার পুলিশ প্রধান। তারপরে খুব শান্তভাবে বললেন, 'জানেন, কুটনাবাড়ির ঘটনা আমরা জানি, টি.এস.আর যে মানবিক অধিকার লঙঘন করেছে একথাও ঠিক, তবে টি এস আর এর পক্ষে ওটা হয়েছে সিমপ্যাথেটিক রিভেঞ্জ। বন্ধুরা মারা গেছে, এ টি টি এফ এর আক্রমণকারীরা গিয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে, এখন সাধারণ নিরীহ উপজাতিরা হয়ে পড়েছে আক্রমণের শিকার , ভাবাবেগে এ কাজ করে ফেলেছে কর্তব্যরত টি এস আর বাহিনীর জওয়ানরা।'

আমাদের জিপ এগিয়ে চলেছে কিছুটা সর্পিল গতিতে। ডান দিকে বিস্তীর্ণ জলরাশি উমিয়াম লেক। খাসি ভাষায় 'উম' অর্থ জল ? তাহলে 'উমিয়াম ' অর্থ কি ? নিশ্চয়ই জলরাশি বা ওই রকম কিছু

একটা হবে। কিন্তু আমার গবেষকমন আর এগোতে চাইছিলনা সেদিকে। বার বার মনে পড়ছিল সেকারাম সাহেবের শেষ কথাটা সিম্প্যাথেটিক রিভেনজ- ভাবাবেগতাড়িত প্রতিশোধ। ভাবাবেগতাড়িত হয়ে আরক্ষা কর্মীরা মুহূর্তের মধ্যে একটা সদ্য বিকশিত উপজাতীয় জনপদকে ধবংস করে দিলো! ধর্মস্থান পুড়িয়ে দিয়ে রক্ত ঝরালো সেখানে? কিন্তু পুলিশ যে বলে ত্রিপুরার যেখানেই গীর্জা সেখানেই সন্ত্রাসবাদীদের বাসা। কথাটা কি সত্যিই ঠিক? আর তার জন্যেই কি গীর্জায় আগুন ধরিয়ে দিলো টি এস আর বাহিনী? আচ্ছা, টি.এস.আর. এর কম্বিনেশানটা কেমন? সেখানে বাঙালির সংখ্যাই কি বেশী? এমন একটা কথা শোনা যাচ্ছে, ত্রিপুরা স্টেইট রাইফেলস মানেই তো বাঙালি। কথাটা আসছে উপজাতীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে। আর এই বাঙালি রাইফেলস বাহিনী সুযোগ পেলেই উপজাতি এলাকার নীতিবিগর্হিত সব কাজ করে বসে। কুটনাবাড়ীর ঘটনার পর আগরতলার এক শ্রেণীর বাঙালিদের মধ্যে সে কী উল্লাস, যেন বঙ্গসেনারা সিংহল জয় করে এসেছে। আর তার ঠিক একমাস বা দেড়মাস পরে খোয়াইয়ের কল্যাণপুরে সন্ত্রাসবাদীরা যখন বাঙালি জনপদ জ্বালিয়ে দিলো পুড়িয়ে দিলো, গণহত্যা চালালো নির্বিচারে, তখন ওই একই উল্লাস দেখা গেছে এক শ্রেণীর উপজাতিদের মধ্যে। কুটনাবাড়ির পাল্টা হল কল্যাণপুর, বাঃ চমৎকার, এটাকেও কি বলবো সিম্প্যাথেটিক রিভেন্জ? হায় সেকারাম সাহেব, ত্রিপুরায় তো ট্রাইবাল বাঙালিদের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি, এখন ঘটছে কেন? আপনার অনুশাসনপ্রাপ্ত পুলিশও পক্ষপাতিত্বের শিকার হচ্ছে, দায়িত্ব পালনেও পরান্মুখ। তা না হলে কল্যাণপুর পুলিশ থানার নাকের ডগায় এতোবড়ো গণহত্যা হলো ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে, বাড়ি পুড়লো, ঘর পুড়লো, তবু পুলিশ সেখানে গেলো না সময়মতো। পুলিশ একাডেমির অনুশাসনগুলো কেন পুলিশ, সি আর পি এফ এবং টি এস আর বাহিনী কাজে লাগাতে পারছে না? কারণ কী এর? সেদিন পুলিশের এক ডাকসাইটে অফিসার ফেটে পড়েছিলেন আগরতলার এক সংবাদপত্র অফিসে এই পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে। প্রায় চিৎকার করে সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "আপনাদের মুখ থেকে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার কথা শুনতে শুনতে কান আমাদের ঝালাপালা হয়ে গেছে বুঝলেন? কি নিয়ে লড়বে পুলিশ, কী আছে তার হাতে? এটি টি এফ-এন এল এফ টি, বেজারেকশন আর্মির হাতে রয়েছে একে ৪৭, একে ৫৬, পাহাড়ের ওপর থেকে এ্যাম্বুশ করছে তারা, আমরা কী করবো? অসহায়ভাবে মরতে হচ্ছে আমাদের। সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পুলিশ যখন মরে, পুলিশের বৌরা যখন বিধবা হয়, কৈ তখন তো আপনারা কিছু বলেন না, তখন আপনারা মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন কেন? তখন পাব্লিক সেন্টিমেন্ট যায় কোথায়? এই ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদীদের হাতে কয়েকশ' পুলিশ মরলো, কই একটা রাজনেতিক পার্টিও তো এগিয়ে এসে মিছিল -মিটিং করেনা আমাদের পক্ষ নিয়ে। পুলিশ কি মানুষ না? আপনাদের মতো সামাজিক জীব নয়? আপনারা শুধু পুলিশের খাকি পোশাকটাই দেখেন, তার হৃদয়টা দেখেননা, তার কি কোনো দুঃখবোধ নেই। সন্ত্রাসবাদীদের হাতে এই যে পুলিশরা সব মরছে, তাদের বৌদের কি হচ্ছে, বাল-বাচ্চারা কি অবস্থায় থাকছে, একবার ভেবে দেখেন কি আপনরা? আপনাদের মুখ থেকে, পাব্লিকের মুখ থেকে শুধু একটাই কথা— পুলিশ নিষ্ক্রিয়, পুলিশ কিছু করে না। আমরা পোলারাইজ্‌ড নই, পুলিশকে পোলারাইজ্‌ড করে দিচ্ছেন আপনারা রাজনৈতিক দলেরা।"

জিপ কখন যে শিলঙ পাহাড়ে উঠে পুলিশ বাজারে ঢুকে পড়েছে, খেয়াল নেই আমার। খাসি পাহাড় থেকে আমার মন উধাও হয়ে চলে গিয়েছিলো সুদূর ত্রিপুরার পাহাড়ের উপজাতি- বাঙালি জনপদে, যেখানে কুটনাবাড়িও আছে, কল্যাণপুরও আছে। আমাদের জিপ ব্রডওয়ে হোটেলের সামনে এসে থামতেই পি আই বি চীফ্ জহর আচার্য বললেন, "নামুন কুমুদদা, কি হলো আপনার সারা

রাস্তাটা এমন চুপচাপ থাকলেন, ব্যাপার কী ?' টেলিগ্রাফের শেখর দত্ত গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন, 'কুমুদদা ইজ সিজড উইথ কমপ্লিট অবসেসন' — বিষন্নতায় গ্রাস করে ফেলেছে কুমুদদাকে। নৃপেননের সঙ্গে ককবরকে কথা বললে সব ঠিক হয়ে যাবে। কাতলামারার নৃপেন দেববর্মা শিলঙে বৃড্রওয়ে হোটেলের বয়, কুমুদদার শ্বশুর কুলের লোক। আর কি চাই ? তার মুখ দেখলেই কুমুদদা চাঙ্গা হয়ে যাবেন। চলুন এবার, ওপরে ওঠা যাক, গরম গরম কফি খেতে হবে নৃপেনের হাত থেকে। কাতলামারার নৃপেন্দ্র দেববর্মা, ওঃ কি ইনোসেন্ট মুখ।" হোটেলের দো'তলায় উঠে রিসিপশান কাউন্টার এর মিস্টার দেবনাথের কাছ থেকে চাবি নিয়ে তিনতলায় একশ' উনিশ নম্বর ঘরে ঢুকে পড়লাম। তাকালাম একটু এদিক ওদিক, কিন্তু নৃপেনের দেখা মিললো না। জহর আচার্য এসে ঘরে ঢুকতেই বললাম, "আমি একটু বেড়িয়ে আসি জহরবাবু, দেখি খাসি ভাষার ওপর কোনো বই পাওয়া যায় কিনা।" আমার কথা শুনে জহরবাবু কি যেন একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, 'সাড়ে ছ'টার ওপর বাজে, তাহলে বেরিয়ে পড়ুন এক্ষুণি, সাতটার মধ্যে ফিরে আসবেন কিন্তু, জানেন তো, শিলঙ শহরে সাতটার পরে ....।'

—'সাতটার পরে কি হয় জহর বাবু ? আমার গলায় বিস্ময়ের সুর' - 'সাতটার পরে ছেলে ধরারা সব দাঁড়িয়ে থাকে। কাজেই আপনাকে ......।' জহর বাবুর কথা শুনে একটু মৃদু হেসে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নামতে শুরু করলাম আমি। রিসিপশান কাউন্টারে মিস্টার দেবনাথের দিকে তাকালাম। একবার মনে মনে বললাম, আগরতলার ধলেশ্বরের দেবনাথ বাবু বেশ করে কম্মে খাচ্ছেন এখানে, কোট চাপিয়ে বেশ জবরদস্ত চেহারা নিয়ে খাসি, হিন্দী, ইংরেজী, বাঙলা হড় হড় করে বলে যাচ্ছেন একের পর এক। অথচ শোনা যায়, বাঙালিরা শিলঙ শহরে বেশ বেকায়দায় আছে, লোটা কম্বল গোটানোর মতো অবস্থা। সব ঝুট হ্যায় ......।

রাস্তায় নেমে দেখি ইলশেগুঁড়ির মতো বৃষ্টি হচ্ছে, একটু কুয়াশা কুয়াশা ভাব। বাঁচা গেলো, চেরাপুঞ্জীর মেঘগুলো সারাদিনের পর শিলঙ শহরের পাইন গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। এগিয়ে চললাম আমি হোটেলের ফুটপাত বেয়ে সরকারী বাসস্ট্যান্ডের দিকে। ব্রডওয়ে হোটেলের তিন চারটে বাড়ির পরেই পেয়ে গেলাম মডার্ন বুক স্টোর্স। বিরাট বইয়ের দোকান। কিন্তু তাজ্জব বনে গেলাম আমি। মাত্র দুটো খাসি মেয়ে এতবড়ো দোকানটা সামলাচ্ছে। দোকান বোধ হয় বন্ধ হবার মুখে। বেশ ভিড়। ঠেলে ঠুলে খাসি সুন্দরীর মুখোমুখি হলাম কোনো রকমে।

... 'ম্যাডাম ড্যু য়্যু হ্যাভ বুকস অন খাসি ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিঙ ?' আমার ইংরেজী উচ্চারণ শুনে খাসি সুন্দরীর মুখে বাঁকা হাসি দেখা দিলো একটু। বললেন— 'নো।' 'এনি বুকস অন খাসি ল্যাঙ্গুয়েজ ?'

—'নো।'

—'এনি বুকস অন খাসি রেইস এন্ড কালচার ?'

আমার তোতাপাখির মতো বুলি আওড়ানো দেখে এবার সত্যিই ফিক করে হেসে ফেলেন খাসি সুন্দরী। তারপর হাসতে হাসতে বললেন—'ইউ আর আস্কিং লাইক ভেরিয়ার এলুইন।' আমি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—'পার্ডন ?'

— 'মিস্টার এলুইন য়ুসড টু ভিজিট আওয়ার শপ এন্ড আস্ক লাইক ইউ। হি ওয়াজ এ গ্রেট এ্যানথ্রোপলজিস্ট এন্ড ম্যারিড আওয়ার খাসি গার্ল। আর ইউ এ্যান এ্যানথ্রোপলজিস্ট ?'

—'নো, আই এ্যাম এ লিঙ্গুয়িস্ট।'

—'ডু ইউ নো অ্যাওয়ার খাসি ল্যাঙ্গুয়েজ ?'

— 'আই কান্ট স্পিক ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ বাট নো (Know) অ্যাবাউট ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ।'

—'অ্যাবাউট আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ?'

—'হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট ?'

—'খাসি হ্যাজ থ্রি ডায়ালেকটস - লিংনগম, সিনটেং এ্যান্ড ওয়ার .....।' আমার মুখে খাসি উপভাষাগুলোর নাম শুনে মধ্যবয়সী খাসি ললনার মুখে এক বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো যেন। তারপর হঠাৎ করে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে উষ্ণ করমর্দন করে বললেন, 'রিয়ালি ইউ লাভ আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, বেটার ইউ কাম টুমরো, আই য়ুয়িল গিভ ইউ এ খাসি ইংলিস ডিকশনারি। এন্ড এনজয় ওভার টি।'

—'বাই।'

—'থ্যাঙ্কস, থ্যাঙ্কস, আই য়ুয়িল সি ইউ টুমরো, বাই বাই।'

খাসি সুন্দরীর উষ্ণ করমর্দনেব স্পর্শ অনুভব করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে এসে মনে মনে বললাম, এলুয়িন সাহেবের সঙ্গে বিদ্যায় আমার মিল নেই -বিবাহে আছে। দু'জুনেই ট্রাইবাল মেয়ের পাণিগ্রহণ করেছি আমরা,তবে তিনি খাসি, আর আমি ত্রিপুরীর। শ্রদ্ধেয় মানিক মজুমদারের কাছে শুনেছি এলুয়িন সাহেব ত্রিপুরায় এসেছিলেন। ভেরিয়াব এলুয়িন ১৯৫৮ সালে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন কমলপুর বিভাগের গন্ডাছড়া মডেল ট্রাইবাল কলোনি ভিজিট করতে। এলুয়িন সাহেবের চোখে পড়লো মলছুম, কলই আর দেববর্মা মেয়েরা বাজারের শাড়ি দু' ভাজ করে পাছড়ার মতো ব্যবহার করছে। হঠাৎ সার্কেল অফিসার মজুমদারের এর দিকে তাকিয়ে একটু উষ্মার সুরে জিজ্ঞেস করলেন- - মিস্টার মজুমদার, হোয়াই দিজ ট্রাইবাল উইমেন উয়্যার বাজার লুম সারিজ— ট্রাইবাল মেয়েরা এই সব বাজারী শাড়ি পরছে কেন ? উত্তরে মিস্টার মজুমদার বললেন— 'স্যার, ইট ইজ চীপ। দেয়ার হ্যান্ড ওভেন ক্লথস টেক মাচ টাইম এন্ড লেবার ইন দেয়ার লোয়েন লুম'—খুব সস্তা এগুলো। এদের ট্রাইবাল তাঁতে এগুলো বুনতে সময় ও শ্রম খুব বেশি লাগে স্যার।

হঠাৎ ভক্ত সাইমালের ঘরের দাওয়ায় চোখ গেলো এলুয়িন সাহেবের। সেখানে একজন কুকী মেয়ে পা ছড়িয়ে খোঁপায় সজারুর কাঁটা গুঁজে ট্রাইবাল তাঁতে সাদা জমিনের ওপর কালো সুতো দিয়ে ত্রিভুজ আকারের ফুল তুলছিলো পাকা শিল্পীব মতো। মাঝে মাঝে খোঁপা থেকে সজারুর কাঁটা বের করে সাদা জমিনে বুলিয়ে নিচ্ছিলো তা বেশ মুন্সিয়ানাভাবে। সেদিকে তাকিয়ে মোহমুগ্ধ হলেন এলুয়িন সাহেব। একপাট্টা কাপড়ের সাদা জমিনের ওপর কালো ত্রিবুজ চার পাশে লাল টকটকে বর্ডার। মিস্টার মজুমদারের দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন সাহেব। তার পর ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন — 'ক্যান ইয়োর বাজার উয়েভারস প্রডিউস সাচ এ পিস, মিস্টার মজুমদার ?' — তোমার বাজারী তাঁতীবা এমন পিস তৈরী করতে পারে, মিস্টার মজুমদার ? 'প্লিস ডিসকারেজ দেম ফ্রম পারচেজিং বাজার ক্লথস' — বাজার থেকে কাপড় কিনতে এদের উৎসাহ দিয়োনা মিস্টার মজুমদার। 'ইউ পিপল সুড এনকারেজ দেম য়ুজ দেয়ার লোয়েন লুম ওভেন পাছরাস এ্যান্ড গামছাস।' —তোমাদের উচিত তাদের নিজেদের তাঁতে বোনা পাছড়া আর গামছা পরতে উৎসাহ দেয়া। হঠাৎ আমার মনে প্রশ্ন এলো, আচ্ছা, খাসিদের কি নিজেদের তাঁত আছে ? তারা কি সাতবোনের রাজ্যের অন্যান্য ট্রাইবাল মেয়েদের মতো নিজেদের তাঁতে কাপড় বোনে ? আবার পথ চলতে লাগলাম আমি। পথ চলতে চলতে প্রশ্নটা আবার আমার মাথার মধ্যে বাসা বাঁধলো— খাসিদের কি নিজেদের তাঁত নেই? খাসি মেয়েরা কি সাত বোনের রাজ্যের অন্যান্য ট্রাইবেল মেয়েদের মতো কোমর তাঁতে কাপড় বোনেনা ? তারা কি ত্রিপুরী মেয়েদের মতো নয়নমনোহর রিছা, রিগ্নাই, রিত্রাক বোনেনা

তাদের ট্রাইবেল তাঁতে? খৃস্টান হয়ে যাবার আগে তাদের নিজস্ব তাঁত ছিলো? ধর্মান্তর কি তাদের নিজস্ব তাঁতও কেড়ে নিলো? একটা অজানা শঙ্কা ভাবিয়া তুললো আমায়। আচ্ছা, ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা তো খৃস্টান হয়ে যাচ্ছে। তারাও কি একদিন তাদের হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত উপজাতীয় প্রচিন বয়ন শিল্প হারিয়ে ফেলবে ? একটা কথা ভেবে কিছুটা শান্ত হলো আমার মন। নাগারা, মিজোরা তো খৃস্টান হয়েছে, কই, তারা তো তাদের কোমর তাঁত ঠিকই রেখেছে। তবে কেন খাসিরা তাদের তাঁত হারিয়ে ফেললো? তবে কি খাসিরা কোনো দিন তাঁতের ব্যবহার জানতো না'? এলুয়িন সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতাম আমি। ত্রিপুরায় এলুয়িন সাহেব এসেছিলেন অন্তত বার তিনেক। তখন তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতীয় বিষয়ক উপদেষ্টা। জহরলালের পরম বন্ধু। জহরলাল নেহেরু শিলঙে এলেই চলে যেতেন ভেরিয়ার এলুয়িনের বাসভবনে, সময় কাটাতেন তার মহামূল্যবান লাইব্রেরীতে। দশ থেকে পনেরোটা আলমারিতে শুধু বই আর বই, নৃতত্ব, সমাজতত্ত্ব, আর সারা পৃথিবীর ট্রাইবালদের উপর বই ওই লাইব্রেরীতে। শ্রীযুক্ত মানিক মজুমদারের স্মৃতি মনে পড়লো আমার। ১৯৬২ সালের কথা, মণিপুব, নাগাল্যাণ্ড ট্রাইবাল ওরিয়েন্টশন সেন্টারের প্রিন্সিপাল মিস্টার হলদিপুরের সঙ্গে মানিকবাবু গেলেন শিলঙে এলুয়িন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। একটা টিলার ওপর নয়নমনোহর একতলা বাড়ি। ট্রাইবাল আর্ট ক্রাফটে সাজানো চোখ জুড়ানো বৈঠকখানা। সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের পর প্রিন্সিপাল হলদিপুর বেরিয়ে গেলেন তাঁর কাজে। কিন্তু মানিক মজুমদার রয়ে গেলেন। এলুয়িন সাহেবের সঙ্গে মানিকবাবুর পরিচয় হলেছিলো তারও আগে। ১৯৫৮ সালে মানিকবাবু তখন কমলপুরের সার্কেল অফিসার। একদিন সেখান এলেন এলুয়িন সাহেব। মিস্টার মজুমদারকে নিয়ে সাহেব গেলেন গণ্ডাছড়ার ট্রাইবাল জুমিয়া কলোনী দেখতে। সেই থেকেই পরিচয়। যখন তিনি শুনলেন মজুমদার তামিঙলঙ থেকে ফিরছেন, তখন তিনি আনন্দে আপ্লুত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তামিঙলঙ থেকে ফিরছো মজুমদার'? বলো সেখানকার কথা। জানো মজুমদার, এখন থেকে পঁচিশ বছর আগে সেখানে ছিলাম আমি। চার হাজার ফুট উঁচুতে তামিঙলঙ। আব কী জায়গা ! মেঘ ঘরের ভেতর ঢুকে বেরিয়ে যায়। কী অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা মজুমদার। নেফা, আমার স্বপ্নেব নেফা, মজুমদার।' এবার মিস্টার মজুমদারের দিকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন পক্ককেশ সাহেব- 'আচ্ছা তুমি কি আমার ফিলোজফি অফ নেফা পড়েছো, মিস্টার মজুমদার'? আচ্ছা যাক সে কথা। এখন বলো তোমার ত্রিপুরার ট্রাইবালদের কথা। মনে আছে মজুমদার, তোমাকে নিয়ে একষট্টি সালে জিরানীয়ার মাধব বাড়ি ট্রাইবাল ভিলেজে গিয়েছিলাম। তুমি তখন ওখানকার বি ডি ও। জানো মজুমদার। তোমাদের ত্রিপুরার ট্রাইবালদের বৈচিত্র্য অনেক বেশী। কিন্তু কোন জিনিষটা আমাকে সব থেকে দুঃখ দেয় জানো ? ত্রিপুরায় যখন আমি দেখি ত্রিপুরার ট্রাইবাল মেয়েরা তাদের তাঁতে বোনা পাছড়া ছেড়ে বাজারে শাড়ি পরছে। ট্রাইবাল মেয়েদের বাজারে শাড়ি পরার উৎসাহ দিয়োনা মজুমদার। রিছা-রিগ্নাই পরা ট্রাইবাল মেয়েদের কী সুন্দরই না দেখায়। তাদের ঐতিহ্য তারা রাখুক। ট্রাইবাল ফোক- ড্রেস ওয়াণ্ডার ফুল, মিস্টার মজুমদার, ওয়াণ্ডার ফুল। চোখ একেবারে জুড়িয়ে যায়।'

মজুমদারের স্মৃতিতে ভেরিয়ার এলুয়িন আবারো ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন আমার মন। সম্ভবতঃ ১৯৬৫ সালের কথা। ত্রিপুরায় এসেছেন এলুয়িন সাহেব উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতীয় বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে সরকারী প্রশাসকদের পরামর্শ দিতে। উঠেছেন রাজভবনে। ডাক পড়লো মানিক মজুদমদারের। তখন তিনি বিলোনীয়ার বগাফা ব্লকে। ব্যাপার কি'? না, বগাফা থেকে তসলমফা (রাজপ্রসাদ রিয়াং) কে নিয়ে আসতে হবে রাজভবনে। তাঁর সঙ্গে এলুয়িন সাহেবের অনেক কথা আছে। মেসেজ পাবার সঙ্গে সঙ্গে মজুমদার বাবুতো তসলমফাকে নিয়ে রাজভবনে হাজির। অনেকদিন পর আবার দেখা

হলো দু'জনের। এলুয়িন সাহেবের তখন সাদা চুল পাকা ভ্রু। টল ফিগার জার্মান (?) এলুয়িনের সে দিন ট্রাউজারের সঙ্গে বুশ শার্ট গায়ে। একটু রাত হতেই তসলামফার সঙ্গে খুঁটিনাটি নানা প্রশ্ন। দো ভাষীর কাজ করতে হলো মানিক মজুমদারকেই। রাত হলো গভীর, নীরব রাজভবনে তখনো সরব রইলেন তসলমফা-এলুয়িন।

মজুমদারের ভাষায়— 'এলুয়িন ওয়াজ দ্য ডেমিগড ইন রেসপেক্ট অফ ট্রাইবাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ নর্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া।' ত্রিপুরার বিচিত্রসব ট্রাইবের সম্পর্কে অসীম কৌতূহল ছিলো তাঁর। বারবার এসেছেন ত্রিপুরায়, বিভিন্ন মহকুমায় উপজাতি জনপদে গিয়ে তথ্য নিয়েছেন তিনি। কিন্তু লিখিত ভাবে ত্রিপুরার ট্রাইবদের সম্পর্কে কোনো তথ্য রেখে গেলেন না কেন এলুয়িন সাহেব ? না শিলঙের মহাফেজখানায় তাঁর লেখা 'ত্রিপুরার ট্রাইব' পাণ্ডুলিপি আকারে অপেক্ষা করছে গবেষকদের জন্যে ? আমার মন বলে উঠলো- প্রেসটুর শেষ করে যেভাবেই হোক শিলঙের সরকারী মহাফেজখানায় হানা দিতে হবে আমায়। পি আই বি কর্ণধার জহর আচার্যকে বলতে হবে সব ব্যবস্থা করে দিতে। আর এলুয়িন সাহেবের লাইব্রেরিতে যেতেই হবে একবার। তাঁর মৃত্যুর পর মহামূল্যবান ওই লাইব্রেরির কি অবস্থা হয়েছে কে জানে ? এই লাইব্রেরিতে বসে একদিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন একজন গবেষক — 'আচ্ছা, এলুয়িন সাহেব, সারাজীবন তো আপনি কাটালেন ট্রাইবালাদের নিয়ে, বলুনতো এককথায় ট্রাইবালের সংজ্ঞা কি হবে ?' ভেরিয়ার এলুয়িন গবেষকের দিকে তাকালেন একবার কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে। তারপর হাসতে হাসতে বললেন He who does not know his future, he is a tribe-যে মানুষ তার ভবিষৎ জানে না সে-ই ট্রাইব। হায় এলুয়িন সাহেব, তোমার সঙ্গে দেখা হলো না আমার। অথচ আমরা দু'জনেই ট্রাইবাল বাড়ির জামাই। পার্থক্য এইটুকু, আমি ট্রাইবাল বাড়ির একান্ত অনুগত ঘরজামাই-চামারি অমপা। ভাষার কাজে ঢুকেছি ট্রাইবাল সংসারে। মোঙ্গলিনী গৃহিণী আমাকে নিয়ে জুম করেছেন রূপকথার জঙ্গলে। তাদের অর্ধ পিতৃতান্ত্রিক ট্রাইবাল সমাজের টানাপোড়েনের মধ্যে থেকে পর্যবেক্ষণ করছি তাদের রূপান্তব। কিন্তু ট্রাইবাল কাকে বলে সে কথা বলার দিব্যজ্ঞান এখনো হয়নি আমার। আমার মনে হয়েছে, ট্রাইবালরা জলভরা মেঘ, প্রকৃতিকে শস্য-শ্যামলা করে দিয়ে বিলীন হয়ে যাওয়া তাদের কাজ।

শিলঙের রাস্তায় কেমন যেন ভাবালু হয়ে গিয়েছিলাম আমি। এসে পড়লাম এসেম্বলি চৌমুহনীতে। বাঁদিক দিয়ে রাস্তা চলে গেছে গা ছম ছম করা পুলিশ বাজারের ভেতর। পাশে টি বি হাসপাতাল। ডান দিকে বেসরকারী যানবাহনের হৈ হুল্লোড়। যেদিকে চোখ যায় মোঙ্গলপ্রজাতির নর-নারীর ভীড়। মনে হলো সন্ধ্যে বেলার কৃষ্ণনগরের এ্যাডভাইজার চৌমুহনীতে এসে দাঁড়িয়েছি। সব থেকে ভীড় জমেছে খাসি মেয়েদের মজা সুপুরির পানের দোকানে। যুবক, যুবতীরা গা গরম করা মজা সুপুরি দিয়ে পান হাতে। মনে মনে বললাম ট্রাইবাল চৌমুহনী। খাসি ললনার হাত থেকে মজা সুপুরি দিয়ে পান খাবার লোভ হলো আমার। এক খাসি ললনার পানের দোকানের সামনে দাঁড়াতেই দেখি তিন জন ট্রাইবেল মজা সুপুরি দিয়ে পান খেতে খেতে ককবরক ভাষায় কথা বলছে। চমকে উঠলাম আনন্দে আপ্লুত হয়ে, এখানেও ককবরক! ফিস ফিস করে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ধন্য ককবরক, খাসি শহরেও জায়গা করে নিয়েছো তুমি। ককবরক ভাষী যুবকরা পুলিশ বাজারের আলো-আঁধারী গলির ভেতর ঢুকে পড়তেই পিছু নিলাম আমি তাদের। বড্ড ইচ্ছে করছিলো ককবরকে কথা বলতে তাদের সঙ্গে কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারলাম না। আমার নাগালের বাইরে চলে গিয়ে একটা কাফের ভেতর ঢুকে পড়লো তারা। কাফেটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়লো আমার। তাতে লেখা Maphlang Brandy is available here-মফলঙ ব্রাণ্ডি পাওয়া যায় এখানে। সঙ্গে সঙ্গে পড়লো

মানিক মজুমদারকে। তাঁর কাছ থেকে শুনেছিলাম খাসি পাহাড়ের মফলঙব্রাণ্ডির কথা। মফলঙ গ্রামের খাসি মেয়েরা এই মদ তৈরী করে বিক্রি করে বোতলে ভরে। আচ্ছা, কি দিয়ে এই মদ তৈরী করে খাসি মেয়েরা, ভাত দিয়ে কি? আমাদের ত্রিপুরার ট্রাইবেল মেয়েরা যেভাবে পাতন ক্রিয়া করে সেভাবেই কি খাসি মেয়েরাও তৈরী করে এই হাউস ওয়াইন? খেতে সস্তাই হবে। বুঝলাম, ককবরকভাষী যুবকদের মফলঙ মদে টেনেছে, এখন আর তাদের পাওয়া যাবে না। আবার ফিরে এলাম চৌমুহনীতে।

তখন বোধ হয় পুলিশ বাজারের সিনেমা শো ভেঙেছে। খাসি যুবক-যুবতীরা হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে আসছে দলে দলে। খাসি মেয়েদের চোখ কেড়ে নেয়া পোষাকের দিকে দৃষ্টি গেলো আমার। একী পোষাক তাদের সারা দেহে, একসঙ্গে এত রঙের পোষাক। মানিকবাবু বলেছিলেন, খাসি মেয়েরা সাতপলা পোষাক পরে। কথাটা সত্যি মনে হচ্ছে আমার। মন চলে গেলো আমার গর্ডন সাহেবের 'দি খাসিজ' বইয়ের পাতায়। গর্ডন সাহেব এই শতাব্দীর প্রথম দশকে খাসি মেয়েদের দেহ বল্লরি একই সঙ্গে চারটি পোষাকে ঢাকতে দেখেছেন। প্রথম পোষাক হলো কা জিমপিয়েন। এই পোষাক দিয়ে হাঁটুর মালা পর্যন্ত খাসি মেয়েদের ধবধবে সারা শরীর ঢেকে দেয়া হয়। বাঁধা হয় কোমরে কাপড়ের তৈরী কটিবন্ধ। এরপর নয়নমনোহর গ্রীবা দেশ থেকে রক্তাভ গোড়ালি পর্যন্ত ঝোলানো হয় মুগা সিল্কের ডেরিকাজমাইনসিয়েন পোষাক। তার ওপর খাসি সুন্দরী পরেন কা জাইন বুক দেহ আচ্ছাদন। অনেকটা শেমিজের মত দেখতে এটি, কিন্তু মাঝখান দিয়ে চেরা, গিট দিতে হয় সুতো দিয়ে। ফরাসী মেরুন রংয়ের চোখ ঝলসানো এই দেহ আচ্ছাদন অতি সহজে চোখ কেড়ে নেয় পুরুষদের। চেরাপুঞ্জির খানদানি খাসি মেয়েদের মেরুন রং-এর এক পোষাক খুব পছন্দ। চতুর্থ ও শেষ যে পোষাক খুব পরেন খাসি লীলাবতীরা, তাহল কা তাপ মো খলিয়ে। এটা অনেকটা র‍্যাপারের মত। গলদেশ থেকে স্কন্ধদেশ আচ্ছাদিত করা হয় শ্বেতবর্ণের এই আচ্ছাদন দিয়ে। দ্বিতীয় পোষাক কা-জামাই সিয়েমে আছে গোপন পকেট। সেখানে লুকিয়ে রাখা হয় অনেক কিছু। শীতের সময় খাসিললনারা পরেন হাঁটু পর্যন্ত মোজা। একবার গর্ডন সাহেব নঙসটোয়িন জানে গিয়ে দেখেন খাসি সুন্দরীরা হাটু পর্যন্ত পাতার মোজা পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সাহেব তো অবাক। কারণ জিজ্ঞাসা করতেই নঙসটোয়িনের পরীরা খিল খিল করে হেসে উত্তর দেন—ছিনে জোঁক দেখেছো সাহেব, ছিনেজোঁক। ওই ছিনেজোঁকের ভয়ে আমরা পরেছি পাতার মোজা। সাহেবের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল মনে—ও গো সুদরীরা চার চারটে পোষাকে তোমরা কেন লুকিয়ে রেখেছো ওই মোহিনী দেহবল্লরি? কিন্তু প্রশ্নটা মনেই রয়ে গিয়েছিল সাহেবের। জিজ্ঞাসা করার সাহস হয়নি তাঁর। আমার মনে হল পাইন গাছের আড়ালে চেরাপুঞ্জির জলভরা মেঘ যেমন লুকিয়ে থাকে খাসি পাহাড়ে, তেমনি লুকিয়ে থাকে খাসি মেয়েদের দেহ সৌষ্ঠব পরতের পর পরত দেহ আচ্ছাদনে।

গুয়াহাটি, ২রা এপ্রিল , ১৯৯৭ । শৈলশহর শিলং থেকে প্রেসট্যুর শেষ করে নন্দন হোটেল ফিরেছি একটু আগে । আবার সেই দোতলার ২০৬ নং রুম । শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বিশ্রাম করতে করতে শিলং ট্যুরের স্মৃতিচারণ মনের ভেতর কেমন যেন একটা নস্টালজিয়ার অনুভূতি এনে দিয়েছে । আমার গবেষক মন শিলং শব্দটার ব্যুৎপত্তি সন্ধানে ব্যস্ত । আচ্ছা , শিলং শব্দটা অসট্রিক না টিবেটো -বার্মিজ ? ত্রিপুরার ককবরক ভাষীরা তো শিলং কে ছিলুঙ উচ্চারণ করে থাকেন । ককবরক 'ছি' ক্রিয়াপদের অর্থ 'জানা' আর 'লুঙ' অথ' ময় বা ব্যাপ্তি । তাহলে ছিলুঙ শব্দটার অর্থ দাঁড়ায় জ্ঞানময় বা জ্ঞানের ব্যাপ্তি । একটু শোভনভাবে অর্থ করলে হয় জ্ঞানাগার । তিব্বত-বর্মীয় মানুষেরা কি জ্ঞান চর্চা করতেন কোনদিন এখানে ? অথচ শিলং তো এখন অসট্রিক বর্গের মানুষ খাসিদের দখলে । খাসি বা খাসিয়া শব্দটাই বা এলো কী করে ? ককবরকে ' খাসি' শব্দের উচ্চারণ

খাছি যার খা অর্থ হৃদয় ও ছি অর্থ জানা। তাহলে খাছি'র অর্থ হৃদয় জানা, অর্থাৎ যে জাতি তার হৃদয় জানে। কিন্তু খাছিয়ার অর্থ তো হৃদয় না জানা; যে জাতি তাদের হৃদয় জানে না তারাই খাছিয়া । খাসিয়া জনগোষ্ঠীর হৃদয়বোধ ছিল না? ককবরক ভাষীরাই বা অসট্রিক গোষ্ঠীর লোকেদের এই নাম দিলেন কেন? ঠিক এমন সময় আবার নষ্টালজিয়া বৃত্তির স্বপ্ন ভঙ্গ করলেন পি আই বি 'র আগরতলা ইউনিটের কর্ণধার জহর আচার্য। ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, কুমুদবাবু, 'রেডি হয়ে নিন, এক্ষুণি আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।'

—'বেরিয়ে পড়তে হবে?'

—'হ্যাঁ, ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে শোয়ালকুছি যেতে হবে।' 'শোয়ালকুছি অদ্ভুত নাম তো!'

—'শোয়ালকুছি অসমীয়া তাঁতীদের খুব পুরোনো গ্রাম। বেশমের অদ্ভুত সব কাজ হয় সেখানে, আর আমাদের প্রেস ট্যুর শেষ হবে সেখানে।' 'ঠিক আছে, এবার তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক শোয়ালকুছি।'

সামনে পেছনে দুটো জিপ। গৌহাটি-শিলং রোড ধরে একটু এগিয়ে একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়লো জিপ দুটো। এখানে গৌহাটি ইউনিটের পি আই বি অফিস। দোতলায় অফিস ঘরে ঢুকতেই অফিস ইনচার্জ সমীর দাশ অভ্যর্থনা জানালেন আমাদের। জহর বাবু আগরতলার দিকপাল সব সংবাদিকদের একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিস্টার দাশের সঙ্গে। ঠিক হলো পি আই বি অফিসার মিঃ কটকী যাবেন আমাদের সঙ্গে শোয়ালকুছি গ্রামে । চায়েব পর্ব শেষ করে আবার জিপে উঠে পড়লাম আমরা সকলে। একটু বাদে জীপ এসে থামলো আসাম টেক্সস্টাইল ডিপার্টমেন্ট অফিসের সামনে। জহরবাবু মিঃ কটকীকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন অফিসের ভেতর শোয়ালকুছি গ্রামের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে। আমরা ততক্ষণে টেক্সস্টাইল ডিপার্টমেন্টের শো রুমের অন্দরে ঢুকে পড়ে আসামের নয়নাভিরাম তাঁতবস্ত্র দেখতে লাগলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে । একটু বাদেই জহরবাবু ও মিস্টার দাশ আসাম টেক্সস্টাইল ডিপার্টমেন্টের হ্যান্ডলুম অফিসার মিস্টার হককে নিয়ে বেরিয়ে এসেই বললেন, চলুন এবার শোয়ালকুছি। জিপ চলেছে ব্রহ্মপুত্রের গা ঘেঁষে দ্রুতগতিতে। দূর থেকে দেখা গেলো পাহাড়চূড়ায় কামরূপ কামাক্ষ্যা মন্দির । আবার মন চলে গোলা ইতিহাসের পাতায়। সপ্তম শতাব্দীতে ভাস্কর বর্মণের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এসেছিলেন এখানে। তখন অসমীয় ভাষা জন্ম নিচ্ছে হাঁটি হাঁটি পা পা করে। পাশে পাহাড়গুলোত তিব্বত-বর্মীয় উপজাতিদের বাস। হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে এইসব উপজাতিদের ভাষার কথাও উল্লেখ করেছেন সযত্নে। জিপ এসে পান্ডু ব্রীজের ওপর উঠতেই আমি মিস্টার কটকীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা মিস্টার কটকী' 'ব্রহ্মপুত্রের এই বিরাট ব্রীজ কবে তৈরী হয়েছে?' । 'জহরলাল নেহরুর সময়,' উত্তরে বললেন তিনি । 'আচ্ছা, মিস্টার কটকী, এই ব্রীজ আমাদের হাওড়া ব্রীজ থেকে অনেক বড়, তাই না ?'
—'বড়ো কি বলছেন, দ্বিগুণ হবে বলুন! জানেন মিস্টাব কুন্ডু, পান্ডু ব্রীজকে সরাইঘাট ব্রীজও বলে। এই সরাইঘাট একটা ঐতিহাসিক জায়গা। এখানে মীরজুমলার সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল।'

এবার ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে আমাদের জিপ এগিয়ে চললো আমাদের গন্তব্যস্থলে শোয়ালকুছি গ্রামের দিকে। একেবারে ব্রহ্মপুত্রের গা ঘেঁষে জিপ চলেছে সাঁ সাঁ করে। আমার গবেষক মন শোয়ালকুছি গ্রাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইছে। মিস্টার কটকীকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, কটকী সাহেব, এই শোয়ালকুছি গ্রামের নামকরণ কিভাবে হলো?

—'শোয়ালকুছি গ্রামের নাম...'

—*'আমি জানতে চাইছি, শোয়ালকুছির অর্থ কি?'*

—'শোয়াল অর্থ সুন্দর , আর কুছি অর্থ যাব'

—'তার মানে শোয়ালকুছির অর্থ সুন্দর যাব ?'

—'আমাদের অসমীয় ভাষায় তাই ই বলে ।'

—'আচ্ছা , মিস্টার কটকী , শোয়ালকুছি গ্রামের বিশেষত্ব কি ?'

—'জানেন মিস্টার কুন্ডু , শোয়ালকুছি পুরোপুরি অসমীয়া তাঁতীদের গ্রাম । সেই অহম রাজাদের সময় থেকে এই গ্রামে তাঁতীরা বসবাস করে আসছে । আর , মুগা সিল্কের জন্যেই এই গ্রাম খুব প্রসিদ্ধ ।'

—'কি বললেন, অহম রাজাদের সময় থেকে এই গ্রাম ? তাহলে কি অহম রাজারাই এখানে রেশম চাষের শুরু করেন ।'

—'কেন ? আপনার কি তাই মনে হয় ?'- 'না মানে, ইতিহাস থেকে জানা যায় , অতি প্রচীনকালে অসমীয়া তাঁতারি' খোদ চীন দেশ থেকে আসামে রেশমের সুতো কিনে এনে এখানে কাপড় বুনতো , অসমীয় মেখলা তৈরী করতো তাই বলছিলাম ......'

—'আপনি দেখছি গবেষক মানুষ মশায় ?'

— 'চীনা ংশুক শব্দটার তো অর্থ জানেন, মিস্টার কটকী ?'

—'না, আপনি বলুন ।'

—'চীনাংশুক অর্থ চীনদেশীয় রেশমবস্ত্র ।'

—' তাহলে আপনি কী বলতে চান আসামের রেশমচাষ চীন দেশ থেকেই এসেছে ?' —'সে তো আসতেই পারে । আসামের অহম উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষতো চীন দেশ থেকেই এসেছে ।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ আমরা । হঠাৎ সামনে পড়লো একটা বাজার । মিস্টার কটকী বললেন, 'আরেকটু পরেই আমরা শোয়ালকুছি গ্রামে পৌঁছে যাবো ।' ভাবলাম, শোয়ালকুছির তাঁতীদের সম্পর্কে আরো কিছু কথা মিস্টার কটকীর কাছ থেকে জেনে নেয়া যাক । বললাম, 'মিস্টার কটকী, শোয়ালকুছি গ্রামের তাঁতীদের পদবী কি ?'

—'শোয়ালকুছি গ্রামের তাঁতীরা সব বৈশ্য লেখে ।'

—'তাহলে বৈশ্য মানেই তাঁতী ?'

— 'সব বৈশ্যরাই তাঁতী । তবে দাস সম্প্রদায়ের লোক আছে এই গ্রামে, তাঁরাও তাঁত বোনেন।'

—'আচ্ছা, মিস্টার কটকী, কত ঘর তাঁতী বাস করে এই গ্রামে ?'

—'শোয়ালকুছিতে পাঁচ হাজার তাঁতী আছে, আর প্রত্যেক তাঁতীর ঘরে আছে দু'খানা করে তাঁত।'

—'তাহলে আপনি বলছেন, এই তাঁতী গ্রামে দশ হাজার তাঁত আছে ?'

—'ঠিক তাই, আর এই দশহাজার তাঁতে বিশহাজার শ্রমিক কাজ করে ।'

পাশে বসে ছিলেন হ্যান্ডলুম -অফিসার মিস্টার হক । আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জানেন মিস্টার কুন্ডু, শোয়ালকুছিতে সমবায় সমিতি আছে প্রচুর ।'

—'আপনি বলছেন তাঁতীদরে সমবায় সমিতি ? '

—'হ্যাঁ । শোয়ালকুছিতে পনেরোটার মতো তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি রয়েছে । কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁতশিল্প নিগম আসাম টেক্সস্টাইল ডিপার্টমেন্টের মারফত এই সব সমবায় সমিতিতে অর্থ সাহায্য করে থাকে ।'

—'এই সব সমবায় সমিতিগুলোর কাজ কি মিস্টার হক ?'

—'এরা গরীব তাঁতীদের সংঘবদ্ধ করে মুগা সিল্ক, এন্ডি সিল্ক দেয় । তারা শাড়ি, মেখলা

বোনে। তারপর সমবায় সমিতিতে জমা দেয়। মিস্টার কটকী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিস্টার কুন্ডু, একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দিই।'

—'বলুন।'

— 'এই গ্রামের তাঁতী পরিবারের মেয়েদের অন্য গ্রামে বিয়ে হয় না।'

—' বলেন কি ! আমি বিস্ময়ে কটকীর মুখের দিকে তাকাই।'

—' কেন জানেন, এই গ্রামের তাঁতী মেয়েরা অন্য গ্রামের চলে গেলে শোয়ালকুছির তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যাবে যে।'

—'শুধু এই জন্যেই ?'

—' মিস্টার কুন্ডু , শোয়ালকুছির তাঁতী মেয়েরা তো ট্রেড -সিক্রেট। তাদেরকে অন্য গ্রামে কিছুতেই বিয়ে দেয়া যায়না।'

আমাদের কথা শেষ হতে না হতেই জিপ থেকে নেমে দেখি রাস্তার দু' ধারে মুগা সিল্ক ও এন্ডি সিল্কের শাড়ি ও মেখলার দোকান। চোখে পড়লো বড়ো বড়ো সাইনবোর্ডে লেখা --- বিষ্ণু সিল্ক এম্পোরিয়াম, দীপশিখা হ্যান্ডলুম সিল্ক হাউস, জ্যোতি সিল্ক হাউস। যে দিকে দু' চোখ যায় শুধু সিল্কের শাড়ি ও মেখলার দোকান। শাড়ি ও মেখলার পাশে রয়েছে মুগা আর এন্ডি সিল্কের থান কাপড়।

এবার মিস্টার কটকী ও হক সাহেব আমাদের নিয়ে চললেন তাঁত সমবায় সমিতিগুলো দেখানোর জন্যে। শোয়ালকুছি বাজারের পেট চিরে চলে গেছে শোয়ালকুছি কলেজ রোড। সেই রাস্তা দিয়ে ভূপেন হাজারিকার মিষ্টি মধুর অসমীয়া গান শুনতে শুনতে এগিয়ে চললেন সাংবাদিক বন্ধুরা। সামনে পড়লো আসাম সমবায় রেশম প্রতিষ্ঠান। দোতলায় তাঁতশালা। তাঁতশালায় উঠে দেখি বারো খানা তাঁতে শোয়ালকুছি গ্রামের গর্ব তাঁতী মেয়েরা ফ্রেমলুমে শাড়ি বুনছেন। অচেনা লোকেদের দেখে তাঁদের হাতের মাকুগুলো পাগলের মতো ছুটতে লাগলো যেন। সাংবাদিক বন্ধুরা এক একজন তাঁদের সামনে গিয়ে মেখলা পরা তাঁতী মেয়েদের জিজ্ঞেস করতে লাগলেন তাঁদের নানান প্রশ্ন। ক্যামেরায় ধরাও দিলেন তাঁরা। এতো বড়ো তাঁতশালায় দেখলাম একজন মাত্র তাঁতকর্মী চরখায় সুতো কাটছেন। বারোটা তাঁতে চব্বিশ জন তাঁতী মেয়ের কর্মচঞ্চলতার পাশে বড়োই বেমানান দেখালো তাঁকে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে চোখে পড়লো আরেকটা তাঁতশালা রাস্তার ওপারে। সেখানে থেকে কানে ভেসে এলো চলমান মাকুর তালে তালে তাঁতী মেয়েদের সঙ্ঘবদ্ধ তাঁত চালানো গান। এরপর আমরা চলে এলাম 'শোয়ালকুছি রেশম উৎপাদন সমিতি কেন্দ্রে। এখানে দেখতে পেলাম মালবারি সিল্ক ও মুগা সিল্কের সুতো, শাড়ি ও অসমীয়া মেখলার সমাহার। সমিতির পক্ষে অনন্ত দাস ও মনোরঞ্জন দাস অভ্যর্থনা জানালেন আমাদের। প্রশ্ন করে জানতে পারলাম সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭৫ সলে, সদস্য সংখ্যা ১০৬। গরীব তাঁতীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে এই সিল্ক উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন তাঁরা। কেন্দ্রীয় সরকারও আসাম সরকারের উৎপাদন সহায়তায় এই উৎপাদন কেন্দ্র চালানো হয়।

চায়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে চলে এলাম এবার আসাম সমবায় রেশম প্রতিষ্ঠানের শো রুমে। চা খেতে খেতে মুগা সিল্কের তৈরি অসমীয়া মেখলার নানা ধরনের ডিজাইন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম আমি। হঠাৎ একজন সেলসম্যান বললেন, 'জানেন, আমাদের বিহু উৎসবের সময় সব অসমীয়া মেয়েকে এই মেখলা পরতে হয়। বিহু নাচগানের সঙ্গে মেখলার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।' আমি বললাম, 'অনেকটা সাংস্কৃতিকও বটে।' এবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা এই মেখলার দাম কেমন ?'

—'দেখুন, সাধারণ দামের মেখলাও আছে বেশি দামের মেখলাও আছে।'

— 'সাধারণ মেখলার দাম কত ?'

—'আটশো টাকার মতন ?'

—' আর বেশি দামের মেখলা ?'

— 'সাড়ে তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা।'

এই অসাধারণ মেখলার দাম শুনে আমার চোখ কপালে উঠলো।

শোরুম থেকে বেরিয়ে শোয়ালকুছির বাজারের বাপুজী পথের একটা ক্যাসেটের দোকানে এসে দাঁড়ালাম। দোকানী এক তরুণ অসমীয়া যুবক। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, আপনি সিল্কের কাপড়ের দোকান না দিয়ে ক্যাসেটের দোকান দিয়েছেন কেন ?'

বললেন, 'দেখুন আমাদের বাড়িতে দু' খানা তাঁত আছে, মা-বাবা চালান। আমার তাঁদের কাজ ভালো লাগে না, তাই এই দোকান দিয়েছি ।'

এমন সময় দেখি বাপুজী পথ দিয়ে দশ বারো জনের ট্রাইবাল মেয়ে পাছড়া পরে বুকে কাঁচুলি দিয়ে খোঁপায় ফুল গুঁজে দল বেঁধে যাচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরার ট্রাইবাল মেয়েদেব মতো এইসব মেয়ে দেখে কেমন যেন মনে হলো। ক্যাসেটের দোকানের তরুণ মালিক শ্যামশরণ দাশকে জিজ্ঞেস করলাম, এই মেয়েরা কি অসমীয়া ?

— 'না, না, ওরা বোড়ো মেয়ে।'

— 'বোড়ো মেয়ে, কী করে তারা এখানে ? '

—' কেন, ওরা অসমীয়া পাড়ায় তাঁতের কাজ করে।'

— 'বোড়ো মেয়োরা অসমীয়া পাড়ায় তাঁতে কাজ করে ?'

— 'করবেনা কেন, ওরা মেচ করে একসঙ্গে থাকে, তাঁতের কাজ করে।'

— 'বোড়ো মেয়েরা সূক্ষ্ম সুতোর কাজ করতে পারে ? '

—' করবেনা কেন, মুগা সিল্কের সূক্ষ্ম কাজ ওরাই তো করে।'

দীর্ঘশ্বাস পড়লো আমার। হায়, ত্রিপুরার ট্রাইবাল মেয়েরা যদি এই সূক্ষ্ম সুতোর কাজ করতে পারতো।

দোকানী শ্যামশরণ দাস আমার দিকে একটু কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। প্রসঙ্গ পাল্টালাম আমি। বললাম, 'মিস্টার দাস, শোয়ালকুছি মুগা সিল্কের জন্যে খুব বিখ্যাত, তাই না!' 'মুগা সিল্ক, এন্ডি সিল্ক আর মালবারি সিল্কের শাড়ি মেখলার জন্যে আমাদের এই গ্রাম তো ভারত বিখ্যাত । এখানকার রেশম সুতো, শাড়ি মেখলা তো কলকাতা, দিল্লি মুম্বাই সব জায়গায় যায়। সারা ভারত থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে আসে, সুতো কেনে, শাড়ি কেনে, মেখলা কেনে । ভারতেব বাইরের আমাদের শোয়ালকুছির শাড়ি মেখলা চালান যায়। আর এই জন্যে শোয়ালকুছি আমাদের গর্ব।' এমন সময় টেলিগ্রাফের সাংবাদিক বন্ধু শেখর দত্ত রাস্তায় ওপাশ থেকে হাঁক দিলেন, 'কুমুদ দা, টাইম ইজ আপ, চলুন, অনেক গবেষণা হয়েছে আপনার, এবার ফেরা যাক।' সন্ধ্যার আলো আঁধারীর মধ্যে তাঁতী গ্রাম শোয়ালকুছি ছাড়লাম আমরা।

৬ জুন ১৯৯৮, শনিবার। আজ অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সঙ্গে আগরতলা থেকে I.C ৭৪২ বিমানে কলকাতায় এলাম চিকিৎসার জন্যে। রামেশ্বরবাবু ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের Post Graduate-এর পরীক্ষার খাতা নিয়ে ভুবনেশ্বর যাবেন ৮.৬. ৯৮ তারিখে। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে তিনি একখানা Taxi নিলেন। উল্টো ডাঙ্গার কাছে তিনি বিধান নিবাসে S.N. Roy Choudhry'র Flat-এ নেমে

গেলেন। ওটা ওঁর মাসির বাড়ি। আমি একটু নেমে রামেশ্বরবাবুর অতি বৃদ্ধা দিদিমাকে প্রণাম করে Taxi নিয়ে বালিগঞ্জ গার্ডেনস-এ অধ্যাপক স্বপন বসুর বাড়ি (১১৫-এ বালিগঞ্জ গার্ডেনস) উঠলাম। স্বপনের স্ত্রী, আমার বৌমা ভাত বেড়েই রেখে ছিলেন। বিকেলে গেলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসেবা পরিষদের অফিসে অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে। গোপালবাবু আমাকে ৮ তারিখে ডাঃ পাহাড়ীর বাড়িতে পাঠাবেন। এইদিন রাতে আমার ছেলে সুরঞ্জন আগরতলা থেকে Telephone করেছিলো।

৭ই জুন, ১৯৯৮, রবিবার। আজ সকালে উঠে ভোর ৫.৩০-এ ঢাকুরিয়া লেকে বেড়াতে গেলাম। দেখলাম সারা লেক শেওলাতে ভরে গেছে। লেক থেকে ফিরে ৭টার সময় OICD ট্যাবলেট খেলাম। ৮টার সময় স্নান সেরে Lasix ও প্রেসারের ওষুধ Amlodac 10 mg. খেলাম। ছবি (স্বপনের বাড়ির maid servant) আমাকে জল খাবার দিলো। সকাল ৯টায় বারাসতে ছোটদির বাড়ি টেলিফোন করলাম। ছোটদি ধরলেন। তারপর করলাম নববারাকপুরে সেজদার Style House দোকানে। সেজদা টেলিফোন ধরলেন। দুপুর ১২টায় বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের soliology'র অধ্যাপক সরিৎ ভৌমিক দেখা করতে এলেন আমার সঙ্গে। সরিৎবাবু আগরতলার অনুরূপা মুখার্জীর বাড়ির জামাই। সরিতের স্ত্রীর নাম মীনাক্ষী দেববর্মা। সরিতবাবুর বিয়ের ঘটকালি করেছিলাম আমি এক নাটকীয় ভাবে। আমি তখন চড়িলামে হেরমা গ্রামে আমার শ্বশুর বাড়িতে থাকি। তিনি আগরতলায় এসেছিলেন ত্রিপুরার চা বাগানের ওপর গবেষণা করতে। আমি তাঁকে একদিন আগরতলা থেকে আমার শ্বশুরবাড়ি হেরমা বাড়ি নিয়ে এলাম। তখন শুরু হয়েছে দুর্গাপুজো। হেরমা বাজারেও দুর্গাপুজো হচ্ছে। আমরা অষ্টমীর রাত্রে দুজনে দুর্গাপুজো দেখে বাড়ি ফিরতেই আমার শ্বশুড়ীমা তাঁর হাতে তৈবী করা বিন্নি চাউলের সোমরস এক বতল এনে দিলেন আমাদের সামনে। জামাইয়ের বন্ধু বলে কথা। তারপর দু প্লেট শূকরের কষা মাংসও এনে দিলেন চাট হিসেবে। দেখলাম সরিৎবাবু ভালই পান করতে পারেন। পরের দিন তিনি আমার সঙ্গে হেরমা বাজারের দক্ষিণ দিকে আন্দি নদীর ওপারে ঘন জঙ্গলের দিকে বেড়াতে গেলেন এবং ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজের আর্থিক উন্নয়ন কীভাবে হতে পারে তা নিয়েও আলোচনা করলেন। আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে তিনদিন তিনি ছিলেন এবং দুর্গাপুজোয় ট্রাইবাল মেয়েদের ভোগ নিয়ে আসার ছবিও তুলেছিলেন তিনি। তিনদিন পর তাঁকে নিয়ে এলাম আগরতলায়। তিনি উঠেছিলেন মীনাক্ষী হোটেলে। চায়ের অর্ডার দিয়ে তিনি আমাকে বললেন, 'জানেন কুমুদবাবু আমারও ইচ্ছে আপনার মতো ট্রাইবাল মেয়ে বিয়ে করতে।' আমি তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে বললাম, 'একি বলছেন আপনি সরিৎ বাবু। আপনি হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক মানুষ, আপনার সঙ্গে ট্রাইবাল মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে আগরতলা শহরেই পাত্রী খুঁজতে হবে, নিদেন পক্ষে আপনার জন্যেতো গ্রাজুয়েট পাত্রী চাই।' আপনিতো আর আমার মতো ট্রাইবেল পরিবারের কৃষক কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পারবেন না। 'বম্বেতে আপনি এব্যাপারে আমাকে চিঠি লিখবেন।' আমিতো পড়লাম মহা ফেসাদে। আগরতলায় কোন পরিবারে গ্র্যাজুয়েট ট্রাইবাল মেয়ে পাই ? হঠাৎ মনে পড়ে গেল অনুরূপা মুখার্জী (দেববর্মা)র কথা। একদিন তাঁকে গিয়ে বিষটি বলতেই তিনি উৎফুল্ল হয়ে আমাকে বললেন, 'কুমুদবাবু, আমার দাদার মেয়ে মীনাক্ষী বিকম পাশ, গার্লস বোধজং ইস্কুলে মাস্টারী করে, তার সঙ্গেই আপনি আপনার বন্ধু সরিৎ বাবুর যে ভাবেই হোক বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। আমরা আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব।' আমি ঠিক পরের দিনই অধ্যাপক সরিৎ বাবুকে বম্বের বাড়িতে চিঠি লিখলাম এবং পাত্রীর কথাও জানালাম আমি। ইংরেজিতে একটা লাইন লিখেছিলাম She is socially conscious। চিঠির উত্তরে তিনি আমাকে মেয়েটি সোসালি কনসাস বলে আমি কী বুঝাতে চেয়েছি তা জানতে

চাইলেন। পরের চিঠিতে আমি লিখেছিলাম, আনুরুপা মুখার্জীদের পরিবার আগরতলার ঠাকুর লোকদের সম্মানিত পরিবার এবং মেয়ের মার সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সম্পর্ক আছে। কাজেই মেয়েটি কালচারড, বেশ Sophisticated। সরিৎ বাবু পরের চিঠিতে তাঁর মা, তাঁর মায়ের বান্ধবী ও তাঁর দাদা আগরতলায় যাচ্ছেন বলে লিখলেন। সরিৎ বাবুর মা, দাদা ও মায়ের বান্ধবী সত্যিই একদিন চলে এলেন আগরতলায় মেয়ে দেখতে। তাঁরা উঠেছিলেন সার্কিট হাউসে। আমি সেখান থেকে তাঁদেরকে অনুরূপা মুখার্জীর বাড়ি নিয়ে যাই। দেখা গেল অনুরূপা মুখার্জী ও সরিৎ ভৌমিকের মা একে অন্যের সঙ্গে পূর্ব পরিচিত। অনুরূপা মুখার্জী দিল্লীতে থাকাকালীন সরিতের মায়ের সঙ্গে সোসাল ওয়ার্ক করতেন। তাঁরা মেয়ে দেখে পছন্দ করে বিয়ের তারিখ ঠিক করলেন। কথা হলো, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জুলিয়াস সেন এই বিবাহে উপস্থিত থেকে কোর্ট ম্যারেজ করিয়ে দেবেন। বিয়ের দু'দিন আগে বম্বে থেকে সরিতের মা-বাবা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন চলে এলেন আগরতলায় এবং তাঁরা সার্কিট হাউসে কয়েকটি ঘর নিয়ে থাকলেন। যথারীতি ত্রিপুরা ট্রাইবাল পদ্ধতিতে অধ্যাপক সরিৎ ভৌমিকের বিয়ে হলো আগরতলার ট্রাইবেল ঠাকুর পরিবারের মেয়ে কুমারী মীনাক্ষী দেববর্মার সঙ্গে। বিবাহ অনুষ্ঠানটি হয়েছিলো অনুরূপা মুখার্জীর বাড়িতেই। পরদিন সরিৎবাবুরা সর্কিট হাউসে পার্টি দিলেন এবং ওই পার্টিতে মিঃ জুলিয়াস সেন উপস্থিত ছিলেন। পানাহারের সময় মেজিস্ট্রেট সাহেব বললেন পরের রবিবারে তিনি আমার হেরমা গ্রাম পরিদর্শনে যাবেন। আমি এই প্রস্তাব শুনে তো অবাক, ভাবলাম পানাহারের সময় মেজিস্ট্রেট সাহেব যে কথা বললেন তাকি তাঁর মনে থাকবে? আমি মেজিস্ট্রেট সাহেবের কথামতো আমার শ্বশুরবাড়ি হেরমায় গিয়ে বিষয়টি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। ঠিক হলো, হেরমা গ্রামের হরিচরণ দেববর্মার যে ধানের জমি বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে তা ফেরত পাওয়ার জন্যে জেলা মেজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করা হবে। মিঃ জুলিয়াস সেন তাঁর কথা সত্যি সত্যি রেখেছিলেন। পরের রবিবারে সকাল দশটায় তিনি গাড়ি হাকিয়ে বডিগার্ড নিয়ে হেরমা বাজারে এসে উপস্থিত। আমরা তাঁকে আমার স্ত্রীর হেরমা বাজারের পাশের বাড়িতে বসার ব্যবস্থা করেছিলাম। সেখানে ছিলো উপজাতি মেয়েদের তাঁতের কারখানা। তিনি এই তাঁতের কারখানায় উপজাতি মেয়েদের হাতের কাজ দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তখন এই কারখানায় ফ্রেমলুমে উপজাতি তাঁতি মেয়েরা সূক্ষ্ম সুতোয় শাড়ি বুনছিলো। এই ঘটনাটা মেজিস্ট্রেট সাহেবকে খুব খুশি করলো। কারণ ট্রাইবাল মেয়েরা তাঁদের ট্রাইবাল তাঁতে শুধুমাত্র মোটা সুতোর কাজ করতে পারে। আশি কাউন্টেব সূক্ষ্ম সুতোর কাজ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরপরে মেজিস্ট্রেট সাহেব হেরমা ও আশপাশের গ্রামের লোকজনদের নিয়ে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। এরমধ্যে আমার কাকা শ্বশুর হরিচরণ দেববর্মা তাঁর বেআইনী হস্তান্তরিত সাত কানি জমির পুনরায় পাবার জন্যে মেজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে একখানা দরখাস্ত দিলেন। দরখাস্ত খানা পড়ে মেজিস্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই বেআইনি হস্তান্তরিত জমি এখান থেকে কত দুর?' আমি বললাম, 'বেশী দূর নয়, বাজারের পাশের আন্দি নদীর ওপারেই এই জমি।' তিনি ওই জমি নিজে দেখতে চাইলেন। আমরা তাঁকে সঙ্গে করে সেই জমির কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, একসপ্তাহের মধ্যে এই বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। যে কথা সেই কাজ। দেখা গেল সপ্তাখানেক বাদে হেরমা বাড়ি তহশিল কাছারিতে রেভিনিউ অফিসার এসে জমির মালিক হরিচরণ দেববর্মা ও অন্যান্যদের ডেকে জমি ফেরত দেবার ব্যাপারে আলোচনা করলেন এবং যাদের কাছে এই জমি বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত করা হয়েছিলো তাঁরাও উপস্থিত ছিলেন ওই সময়ে। রেভিনিউ অফিসার আইনমাফিক হরিচরণ দেববর্মাকে তাঁর জমি ফেরত দিয়ে দিলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পর আমি শ্রীমতী অনুরূপা মুখার্জীর বাড়ি যেতেই

তিনি আমাকে বললেন, 'কুন্ডু বাবু জেলা মেজিস্ট্রেট জুলিয়াস সেনকে তো আপনার জন্যেই সরকার বদলি করে দিলো।' মিসেস মুখার্জীর কথা শুনে আমি তো অবাক। জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপার কি ? তিনি বললেন, 'ওই যে আপনি মেজিস্ট্রেটকে নিয়ে রাতারাতি বেআইনী হস্তান্তরিত জমি উদ্ধার করে দিলেন, তাতেই তাঁর কপাল পুড়লো।' আমি বললাম, 'মিসেস মুখার্জী মেজিস্ট্রেট সাহেব বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেবার জন্যেতো সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসল লোক, এ কাজ তো তাঁকেই করতে হয়। তা এই ভাল কাজ করার জন্যে তাঁকে সাজা পেতে হলো কেন ?' উনি হাসতে হাসতে বললেন, বুঝলেন না রুলিং পার্টি মেজিস্ট্রেট সাহেবের এক রতফা এই কাজ মেনে নিতে পারেনি। তার জন্যে তাঁর এই সাজা। সরিৎ বাবুকে দেখেই অতীতের এই সব অম্লমধুর ঘটনা আমার স্মৃতিপটে ভেসে এলো। ত্রিপুরার বর্তমান অবস্থা নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক আলাপ হলো। আলাপ হলো OXFAM এবং আমার ছেলে সুরঞ্জন সম্পর্কে। সুরঞ্জন Tata Centre for Social Studies-তে ভর্তি হতে চায়। সরিৎবাবু চেষ্টা করবেন বললেন। সরিৎবাবু চলে যাবার পর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বান্ধবী সরস্বতী মিশ্র এলেন। তিনি ত্রিপুরার আনারস একাই একটা খেলেন। সন্ধ্যে ৭টার সময় তাকে বালিগঞ্জ স্টেশনে বাসে তুলে দিলাম।

৮ই জুন, ১৯৯৮, সোমবার। ৫.৪০ মিনিটে ঢাকুরিয়া লেকে বেড়াতে গেলাম। ফিরে এসে ওষুধ ও কুলেখাড়া শাকের রস খেলাম। তাবপর ডাঃ পাহাড়ীর কাছে যেতে হবে বলে Prescription ও অন্যান্য কাগজপত্র রেডি করলাম। বিকেল ৪.১০-এ এলো ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক সুদীপ বসু। বন্ধু স্বপন ও তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ৫টার সময় গেলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসেবা পরিষদ অফিসে। সেখানে গিয়ে বাপীর সঙ্গে দেখা করলাম। তারপর শ্রীমান ভোলাকে নিয়ে ৫, হিন্দুস্তান পার্কে ডাঃ পাহাড়ীর চেম্বারে গেলাম। ডাঃ পাহাড়ী আমাকে ভালো করে পরীক্ষা করলেন। Florinef সাপ্তায় ৩ দিন খেতে বললেন, Ocid বন্ধ করে দিলেন। তারপর Blood urea, Sodium, creatinene এবং Blood sugar (F) পরীক্ষার জন্যে Duncun Glencagles-এ পাঠালেন।

৯ই জুন, ১৯৯৮, মঙ্গলবার। সকাল ৬.৩০-এ Duncun clinic-এ গেলাম। ৮.২০ তে আমার রক্ত নিলো বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য। তারপর ওখানে বসে কিছু খেয়ে ৮-৩০তে Amlodac 10mg প্রেসারের ওষুধ খেলাম। তাপর গড়িয়াহাট থেকে ১টা ডাব ও ১টা আম নিয়ে স্বপনের বাড়িতে ফিরলাম ৯.২০তে। দুপুরে সরস্বতী দি এলো। আমাকে একটা দামী শার্টের কাপড় উপহার দিলো। সন্ধ্যে ৬টায় Duncun Clinic -এ গেলাম (গড়িয়াহাট মোড়ে) Report আনতে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে ভয়ে ভয়ে দেখলাম Report মোটামুটি normal। তবে কিডনির Cratinene 1.6. normal range থেকে ১ পয়েন্ট বেশী। Duncun Clinic থেকে ২৪ ঘন্টার Sodium estimation-এর জন্যে একটা জার নিয়ে স্বপনের বাড়িতে ফিরলাম। ফেরার পথে গড়িয়াহাট বাজারে ঢুকে কুলেখাড়া শাক, আম, জাম, ডাব ও শশা কিনলাম। ফিরে দেখি সরস্বতী দি তখনো আছে। রাত তখন ৮টা।

১০ই জুন, ১৯৯৮, বুধবার। আজ সকালে উঠে গেলাম ঢাকুরিয়া লেকে বেড়াতে। সেখানে একটা ছোট লেকের পাড়ে পদ্মফুলের সামনে বসলাম। তারপর লেকের জলে পা দুটো একটু চুবিয়ে নিলাম। ফেরার পথে লেক চত্বরে পড়লো নজরুল মঞ্চ। অনেকটা টালার ট্যাঙ্কের মতো দেখতে নজরুল মঞ্চ। লেক থেকে স্বপন বসুর বাড়ি ফিরে নুন-জল খেলাম এক গ্লাস। তারপর খেলাম কুলেখাড়া শাকের রস। তারপর বৌমা (স্বপনের স্ত্রী) জল খাবার দিলো সকাল ৮টায়। জল খাবার খেয়ে প্রেসারের ওষুধ Amlosafe খেলাম। জল খাবার খেয়ে ২৪ ঘন্টার পেচ্ছাব রাখতে শুরু করলাম Duncun Clinic-

এর দেয়া একটা বিশেষ জারে। আজ আর বিকেলে বেরোয়নি। নিষ্ঠার সঙ্গে পেচ্ছাব রাখতে লাগলাম আগামীকাল Duncun-এ জমা দিতে হবে বলে। রাত ১০টায় ভাত খেলাম।

১১ জুন, ১৯৯৮, বৃহস্পতিবার। আজ সকালে উঠে লেক থেকে বেড়িয়ে এসে শেষ পেচ্ছাব করলাম ৮টার সময়। কাল সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত। পেচ্ছাবের জারটাকে নিয়ে ৮.৩০-এ গড়িয়াহাট মোরে Duncun Gleneagles Clinic এ জমা দিলাম। বিকেলে যেতে হবে Report নিতে। ফেরার পথে গড়িয়াহাট বাজার থেকে ফলমূল কিনে স্বপনের বাড়ি ফিরলাম সকাল ৯.৩০-এ। দুপুরে পঞ্চ-ব্যঞ্জন দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন করালেন বৌমা। দুপুর ২ টোর সময় ডাবের জল খেলাম ছবির হাতে। ৪ টের সময় আম, জাম, ও মোছাম্বি লেবু খেলাম। বিকেল ৫.৩০-এ রওনা হলাম ডানকান ক্লিনিকে। রিপোর্ট পেতে ৬.৩৫ হয়ে গেলো। ২৪ ঘন্টার Sodium estimation-এ টোটাল পেচ্ছাবের পরিমাণ normal range-এ আছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। রাত ১০টায় খেয়ে প্রেসারের ওষুধ ও ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

১২ জুন, ১৯৯৮, শুক্রবার। সাড়ে পাঁচটায় গেলাম ঢাকুরিয়া লেকে বেড়াতে। মাঝে মাঝে খালি পা হয়ে হাঁটলাম। পদ্মফুল ঘেরা ছোট ডিম্বাকৃতি লেকটাকে প্রদক্ষিণ করলাম। দেখলাম লেকটিতে সাদা এবং লাল এই উভয় ধরনের পদ্মফুল আছে। ফেরার পথে লেকের ধার থেকে একটা ডাব কিনলাম ৫ টাকায়। লেক থেকে এসে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবেশদ্বারের সিঁড়িতে বিশ্রাম নিতে নিতে দেখলাম লেক থেকে ফেরা অনেক বয়স্ক লোক মিশনের গেটের থাম্বে খোদাই করা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক চিহ্নটির গায়ে হাত ছুঁইয়ে প্রণাম করতে। প্রতীকটি পিতলের। তার মধ্যে কুণ্ডলি পাকানো ফনা তোলা একটি সাপের ছবি। তার নিচে একটা হাঁস খোদাই কবা। লেক থেকে ফিরে কুলথ কলাই ভেজানো জল এবং কুলেখাড়া শাকের রস খেলাম। সকাল ৮টায় স্নান সেরে জল খাবার খেয়ে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে কাগজ পড়তে লাগলাম। বিকেলে ডাঃ পাহাড়ীর কাছে গেলাম বিপোর্ট নিয়ে। রিপোর্ট দেখে তিনি খুশী হলেন। বললেন আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাবেন। Florinef সপ্তায় (সোম, বুধ, শুক্র) ৩ দিন এবং Lasix সপ্তায় (মঙ্গল, শনি) ২ দিন খেতে বললেন। সেকা লবণ খেতেও অনুমোদন দিলেন। প্রতি ৩ মাস অন্তর রক্তের পরীক্ষাগুলি করতে বললেন। তাঁকে আমি ত্রিপুরার ককবরক ভাষার লেখক সুধন্বা দেববর্বার 'হাচুক খুরিঅ' (পাহাড়ের কোলে)র উপন্যাসের আমার করা অনুবাদ বইটি দিলাম। আজ রাত ৯টায় ত্রিপুরা থেকে পুত্র সুরঞ্জন ফোন করেছিল।

১৩ই জুন, ১৯৯৮, শনিবার। সকালে উঠে ঢাকুরিয়া লেকে বেডাতে গিয়ে অন্যের দেখাদেখি কিছু কোমরের ব্যায়াম করলাম। দেখলাম মর্নিং ওয়াকে যাঁরা আসেন তার প্রায় অর্দ্ধেকই অবাঙালী। একটা নির্জন জায়গায় লেকের মুখোমুখি বসে ফুটবল-বিশ্বকাপের খেলার কথা বয়স্ক লোকদের কাছ থেকে শুনতে লাগলাম। যুবতী মেয়েরা দেখলাম বেশীর ভাগ প্যান্ট পরে প্রাতর্ভ্রমণ করতে এসেছে। বুড়ো বুড়ো লোকদের দৌড়ানো এবং ব্যায়াম করতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। লেক থেকে ফেরার পথে ১১.০০ টাকা দিয়ে ২ টো ডাব কিনলাম আর ১ টাকায় ১ টা তাল শাঁস খেলাম। লেক থেকে ফিরে দেখি স্বপনের দিদি টিয়াদি এসেছেন। আমি তাকে প্রণাম করলাম। সকাল ৯ টায় গড়িয়া হাট বাজারে গিয়ে ফলমূল কিনে ১০ টায় ফিরলাম। বিকেলে গোলপার্কের মোড়ে গিয়ে ৯১ টাকার ওষুধ কিলনাম। রাত ১০ টায় ভাত খেয়ে প্রেসারের ওষুধ খেলাম। তারপর বন্ধুবর স্বপনের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে ১০.৩০ এ শুয়ে পড়লাম।

১৪ই জুন, ১৯৯৮, রবিবার। আজ বৌমা (স্বপনের স্ত্রী)'র কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বালিগঞ্জ থেকে শেয়ালদায় এসে ৯.৪২ এর বারাসত লোকাল ধরে নিজেদের বাড়ি নববারাকপুরে এলাম। ১০.৩০ এ

নববারাকপুর মেজদার বাড়ি এসে দেখি মেজদা তখনও দোকান (Style House) এ যাননি। আমাকে অনেকটা সুস্থ দেখে মেজদা- মেজে বৌদি ও ভাইজি (ইতু-ইনু) দের খুব ভাল লাগলো। মেজদার বাড়ি থেকে গেলাম বড়দার বাড়ি। বড়দা ও বড়বৌদিকে প্রণাম করলাম। ভাইপো জয় আমার অসুখের জন্যে কয়েকটা হমিওপ্যাথি ওষুধ দিলো। বড়দার বাড়ি থেকে গেলাম গুপ্তবাড়ি। রূপার বাবা দিলীপদা ও বৌদি খুব আদরযত্ন করলেন। দুপুর ১২ টার সময় ফিরে এসে মেজদা ও আমার বাল্যকালের বন্ধু পাঁচু (শ্রীপতি হরি)'র সঙ্গে একসঙ্গে বসে ভাত খেলাম অনেক দিন পর। চারটের সময় ফল খেয়ে গেলাম সেজদার বাড়ি। সেজদার ছেলে নাড়ু (ইন্দ্রনাথ) বাজার থেকে আমার জন্যে ডাব ও আম নিয়ে এলো। সন্ধ্যে ৬ টায় বেরিয়ে পড়লাম বারসতে ছোটদির বাড়ি। রাত ৮ টায় ছোটদিব বাড়ি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ফিরলাম। রাত ১০ টায় ভাত খেয়ে প্রেসারের ওষুধ খেলাম। তারপর ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

১৫ ই জুন, ১৯৯৮, সোমবার। বারাসত ছোটদি(নিলীমা পাল)'র বাড়ি। ভোরে প্রাতর্ভ্রমণ করলাম লালী সিনেমার আশপাশে। ৭ টায় ফিরে কুলেখাড়ার রস খেলাম ছোটদির হাতের। ৭.৩০ এ রুটি আলু পটলের তরকারী ও দুধ কলা রুটি খেয়ে আটটায় প্রেসারের ওষুধ amlosafe ও lasix খেলাম। নটায় খেলাম florinef tablet. ইতিমধ্যে ছোটদাদাবাবু (শচীন পাল) ফিরলেন ফুল তুলে। ছোটদি অসুস্থ শরীরে আমার শরীর রক্ষার্থে অনেক উপদেশ দিলেন এবং একখানা গীতা উপহার দিলেন। ছোটদাদাবাবু আমাকে খাওয়াবেন বলে বারাসত বাজার থেকে চার রকমের মাছ, (চারপোনা,জ্যান্ত ট্যাঙরা মাছ, মুরুল্য ও কাসকেল মাছ) এছাড়াও কিছু পুঁটি ও বাইন মাছ ছিলো। দাদুবাবু আমার জন্যে আম, ডাব ও কলাও নিয়ে এলেন। দুপুরে ভুরিভোজন করা হলো। পুনর্লোভা শাকও খেলাম। দুপুরে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে চারটের সময় ফল খেলাম পেট পুরে। তারপর ৫.৩০ এ বালিগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হলাম। ছোটদি আমাকে ২০০ টাকা দিলেন। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ১৬ টাকায় চারটে মোছাম্বি লেবু কিনে স্বপনের বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ঢুকেই দেখি সরস্বতী মিশ্র আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। রাতে স্বপনের সম্বন্ধী লালু বাবু এলেন বর্ধমান থেকে।

১৬ ই জুন, ১৯৯৮, মঙ্গলবার। ভোর বেলায় বেরিয়ে রামকৃষ্ণমিশনের পাশ দিয়ে ঢাকুরিয়া লেক (রবীন্দ্র সরোবর)-এ বেড়াতে গেলাম। লেকের যোগকেন্দ্রে ঢুকে দেখি একটা বিরাট খড়ের ঘরের ভেতর অনেকে বিছানার ওপর নানারকমের যোগাসন করছেন। একজায়াগায় দেখলাম খাকি হাফপ্যান্ট পরে আর.এস.এস. এর যুবকেরা ড্রিল করছে এবং মুখ দিয়ে হো হো- হা হা বলে বিচিত্র শব্দ করছে। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে স্বপনের বাড়ি ফিরে তাঁর কয়লার ব্যবসার সম্পর্কে লালুবাবুর কাছ থেকে অনেক কথা শুনলাম। সকাল ৮.৩০ এ স্বপন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করলো। আজ স্বপনের মেয়ে চিনির বি.এ. পার্ট ওয়ান (Honours in History) পরীক্ষা শেষ হবে। বৌমা সঙ্গে করে তাঁকে নিয়ে যাবেন। বিকেল ৫.৩০ এ এলেন OXFAM -এর দুই প্রতিনিধি অধ্যাপক চন্দন সেনগুপ্ত (Tata Institute of Social Science, Mumbai) ও ডি. রামস্বামী। তাঁদের সঙ্গে আগরতলার Heritage নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। আমাকে আগরতলার সংস্কৃতির ওপর একটা নিবন্ধ লিখতে বললেন।

১৭ ই জুন, ১৯৯৮। সকালে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরে এসে ৮ টায় প্রেসারের ওষুধ খেয়ে গেলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসেবাপরিষদ আফিসে। উদ্দেশ্য অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তীকে আমার শারীরিক অবস্থা জানানো। কিন্তু জনসেবা পরিষদের কর্মী নীলয় বললো, অধ্যাপক চক্রবর্তী শ্রীমান বাপীকে নিয়ে মুকুন্দপুর জনসেবা পরিষদ অফিসে গেছেন। যাদবপুর থেকে গেলাম প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের

ত্রিপুরা ভবনে। সেখানে গিয়ে Tripura Tourism দপ্তরের অফিসার বন্ধুবর বরুণ সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা করে ২৪/২৫ জুন আগরতলায় যাবার টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে বললাম। তাঁকে ১৪৩০.০০ টাকা দিলাম টিকিট কাটতে। কাল আবার যেতে হবে টিকিট আনতে। Tourism -এর অজিত বাবুর কাছে শুনলাম মন্ত্রী অনিল সরকার, মন্ত্রী নারায়ণ রূপিনী ও প্রাক্তন মন্ত্রী ব্রজগোপাল রায় ত্রিপুরা ভবনে অবস্থান করছেন। ত্রিপুরা ভবন থেকে বেরিয়ে ১২.৪৫-এ বালিগঞ্জ ফিরলাম। বিকেলে ঢাকুরিয়ায় ডাঃ প্রণব চক্রবর্তীর চেম্বারে গেলাম। আমার বাম চোখের ছানি খুব পেকে গেছে। বৌমা (স্বপনের স্ত্রী) বললেন, 'কুমুদদা, এবারই চোখের ছানি কেটে যান। পুজোর ছুটিতে এলে খুব দেরি হয়ে যাবে।' সিদ্ধান্ত করলাম, বৌমার কথাই ঠিক, ছানি কেটেই যাব।

১৮ই জুন, ১৯৯৮, বৃহস্পতিবার। আজ সকালে উঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসেবাপরিষদ অফিসে গেলাম অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তীর সঙ্গে চোখের ছানি কাটার ব্যাপারে আলাপ করতে। অধ্যাপক চক্রবর্তীর ওখানেই প্রাতরাশ সারলাম। ৯.৩০ এর সময় তিনি যাদবপুব থানার কাছে অবস্থিত অরবিন্দ সেবা কেন্দ্রের ডাক্তার প্রনব চক্রবর্তীর সঙ্গে ফোনে আমার ব্যাপারে কথা বললেন। ডাক্তার চক্রবর্তী আমাকে তাঁর কাছে যেতে বললেন। জনসেবা পরিষদের কর্মী শ্রীমান সঞ্জয় চক্রবর্তী আমাকে অরবিন্দ সেবা কেন্দ্রে নিয়ে গেলেন। ২৩.৬.৯৮ তারিখে আমার চোখ অপারেশান করবেন বলে ডাক্তার জানালেন।

সন্ধ্যে বেলায় আবার গেলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত জনসেবা পরিষদের কর্মকর্তা অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর জনসেবা পরিষদের ভীড়ের মধ্যে একটু সময় করে আমার চোখ অপারেশানের আর্থিক দিক নিয়ে আলোচনা করলাম। মোট লাগবে ৬ হাজার টাকা। আমার কাছে আছে মাত্র এক হাজার টাকা। তিনি বললেন, 'সোমবার আসুন তখন সব আলোচনা করা যাবে।' দুপুরে সরস্বতী মিশ্রের সঙ্গেও স্বপনের বাড়িতে চোখ কাটানোর আর্থিক দিক নিয়ে আলোচনা করলাম। সরস্বতীদি বললেন সোমবার সকালে তাঁকে ফোন করতে।

১৯ শে জুন, ১৯৯৮, শুক্রবার। আজ চোখ কাটানোর ব্যাপারে নববারাকপুরে সেজদা (শক্তিরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরী)'র সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি দু হাজার টাকা তাঁর কলকাতার খাদিমের জুতোর দোকান থেকে নিয়ে যেতে বললেন। এরপর বন্ধুবর স্বপন আমার চোখ কাটানোর ব্যাপারে আমাদের বান্ধবী সরস্বতী মিশ্রের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। সরস্বতীদি একহাজার টাকা দেবেন বললেন।

বিকেলে ত্রিপুরা ভবনে গিয়ে পর্যটন বিভাগের বরুণ সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আগরতলায় যাওয়ার টিকিটের পুরো টাকাটাই আমাকে ফেরত দিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে ত্রিপুরার পর্যটন বিভাগের উন্নতির জন্যে অনেক কথা হলো। বরুণ বাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম শিক্ষা মন্ত্রী মাননীয় অনিল সরকারের ভি.আই.পি.রুমে। তিনি আমাকে দেখে খুশি হলেন। তারপর 'গোমতী'র আম্বেদকর সংখ্যাটা তুলে দিলেন আমার হাতে। তাঁর স্ত্রীর হারনিয়ার চিকিৎসার জন্যে তিনি ত্রিপুরা ভবনে অবস্থান করছেন। নিজেও অসুস্থ, গতমাসে বুকে পেসমেকার বসিয়েছেন। অনিল বাবুর রুম থেকে বেরিয়ে এলাম ত্রিপুরার বনমন্ত্রী নারায়ণ রূপিনীর রুমে। কিছুদিন আগে তিনিও আমি পি.জি. হাসপাতালে উডবার্ন ওয়ার্ডে ছিলাম। তিনি চা খাওয়ালেন। তিনিও চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় এসেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার এক পিসতুতো শালার স্ত্রী ধারিয়াথল গাঁওসভার চেয়ারম্যান তুলসী দেববর্মাও এসেছেন চিকিৎসার জন্যে। মন্ত্রীমহোদয়ের ওখানে চা খেতে খেতে আমার একটা কথা মনে পড়লো। আমি উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়ার পর তিনি এলেন সেখানে অসুস্থ হয়ে। চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জিতে মন্ত্রীমহোদয় তাঁর কেন্দ্রে সারাদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবির মাখামাখি করেছিলেন। রাতের দিকে

তিনি বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করতে থাকেন এবং সঙ্গে ছিলো হিক্কা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় পি.জি. হাসপাতালে। একদিন হলো কি, সকালে তাঁর রুমে বেলা দশটা পর্যন্ত কোন সংবাদ পত্র দেওয়া হলো না। আমি সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেই তিনি বললেন, "কুমুদ বাবু, আজতো আমাকে খবরের কাগজ পড়তে দিলো না।" তাঁকে খবরের কাগজ কেন পড়তে দেওয়া হয়নি সে ব্যাপারটা আমি জানতাম। আসলে ওই দিনের কাগজে ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহর হত্যাকান্ডের খবর ছিলো তাঁর ছবি সমেত। বিমল সিংহর হত্যাকান্ডের খবরে যাতে তিনি আরো অসুস্থ হয়ে না পড়েন, তারজন্যে তাঁকে ওই দিন খবরের কাগজ পড়তে দেওয়া হয় নি। অবশ্য পরে তিনি তাঁর ছেলের কাছ থেকে এই দুঃখ জনক খবরটি পেয়ে গিয়েছিলেন।

২০ শে জুন, ১৯৯৮, রবিবার। সকালে মর্ণিং ওয়াক সেরে স্বপনের বাড়ি ফিরে সাক্ষরতা আন্দোলনের নেতা পার্থ সেনগুপ্তের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। পার্থদা আগামীকাল আসবেন বললেন। এরপর বারাসতে ছোটদি ও ছোট জামাইবাবুকে ফোন করে আমার চোখ কাটানোর বিষয়ে আলোচনা করলাম। সকাল ৯ টায় বেরিয়ে কলেজ স্ট্রীটে গেলাম। কফি হাউসে ঢুকে কফি না খেয়ে নুন জল খেলাম আমার Salt loosing অসুখের জন্যে। তারপর গেলাম ৬০, পটুয়াতলা লেনে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অফিসে সেখানে গিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মী অনন্তর কাছ থেকে শুনি সুধীতদা (সুধীর চ্যাটার্জী) স্বপন মুখার্জীকে নিয়ে ১৬.৬.৯৮ তারিখে ত্রিপুরায় গেছেন। এরপর মহেন্দ্র দত্তর ছাতার দোকানে গিয়ে ১১৫ টাকা দিয়ে একটা লেডিজ ছাতা কিনলাম আমার ছোট মেয়ে দেবযানীর জন্যে। ছাতা কিনে গেলাম সেজদার শেয়ালদার জুতোর দোকানে। আমাকে দেখে সেজদার ছেলে নাড়ু দুহাজার টাকা দিয়ে দিলো। তারপর দুপুরে ফিরে এলাম বালিগঞ্জে। বিকেলে চোখের ডাক্তার প্রনব চক্রবর্তীর চেম্বারে গিয়ে Biometry test করা হলো চোখের। রাত ৮ টায় ওষুধ কিনে বন্ধুবর স্বপন বসুব ডেরায় ফিরলাম। আজ আমার ভাইপো শ্যামল চৌধুরী বেলঘরিয়া থেকে ফোন করেছিলো আমার চোখ কাটানোর ব্যাপারে। সে আমাকে এক হাজার টাকা দেবে বললো।

২১ শে জুন ১৯৯৮, সোমবার। আজ আর প্রাতর্ভ্রমণে বেরোয়নি। আগরতলার চিঠিগুলো লিখলাম; পুত্র সুরঞ্জনকে একখানা, তার চিঠির খামের মধ্যে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার জুন মাসের বেতন তোলার জন্যে তার নামে অথরাইজড লেটার দিয়ে দিলাম। অধ্যাপিকা মঞ্জরী চৌধুরী (বাংলা বিভাগের প্রধান) কে একখানা। চিঠিতে তাঁকে আমার চোখ অপারেশানের কথা লিখলাম এবং জানালাম চোখ অপারেশানের একমাস পরে ত্রিপুরায় ফিরে গিয়ে আগস্ট মাস থেকে বিশ্ববিদালয়ে ককবরক ক্লাস নেব। একখানা চিঠি লিখলাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অধ্যাপক অজিত চক্রবর্তী মহোদয়কে। তাঁকে আমার চোখ অপারেশানের খবর দিলাম। আরেকখানা চিঠি লিখলাম অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে। চোখ অপারেশানের জন্যে কিছু টাকা পাঠাতে অনুরোধ করলাম তাঁকে। চিঠিগুলো নিয়ে সকালে ঠিক ন'টায় গেলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসেবাপরিষদ অফিসে। সেখানে অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার চোখের অপারেশান নিয়ে আলোচনা করলাম। তিনি জনসেবা পরিষদের কর্মী বাপী ও ভোলাকে ডেকে আমার অপারেশানের দিন (২৩.৬.৯৮) KD Cure Nursing Home, 52 Jodhpur Park, Cal-এ কে কে থাকবে তা নিয়ে আলোচনা করলেন। ঠিক হলো জনসেবা পরিষদের পুরনো কর্মী ভোলা মূল দায়িত্ব নেবেন এবং অপারেশানের দিন সকাল নটায় জনসেবা পরিষদের কর্মীরা কে.ডি.কিউর নার্সিং হোমে চলে যাবেন। চোখ অপারেশনের ব্যাপারে আলোচনা সেরে জনসেবা পরিষদের কর্মী বাপীকে আগরতলার চিঠিগুলো দিলাম। আগামীকাল জনসেবা পরিষদের কর্মী নীলয় আগরতলা যাবে। সে-ই চিঠিগুলো নিয়ে আগরতলায় জনসেবা পরিষদের অফিসে শ্রীযুত

হরিহর সাহার কাছে দিয়ে দেবে।

যাদবপুর থেকে ১০.৩০-এ বেরিয়ে ঢাকুরিয়ায় নেমে ২০ BI, Dhakuria Stationh Road-এ আমার কলেজ জীবনের শিক্ষক অধ্যাপক অরুণ বসুর ফ্লাটে গেলাম। স্যারকে আমার 'ককবরক লিপি বিতর্ক বানান বিতর্ক' এবং আমার অনুবাদ করা সুধন্বা দেববর্মার লেখা ককবরক ভাষার প্রথম উপন্যাস 'হাচুক খুরিঅ' (পাহাড়ের কোলে) দিলাম। বই দু'খানি পেয়ে খুবই খুশী হলেন তিনি। বই দু'খানির Review করারও প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ককবরক গবেষণার বিষয় নিয়েও আলোচনা হলো। শেষে আমার Kidney ও চোখের ব্যাপরে আলোচনা সেরে স্যারকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। গোলপার্কে হেঁটেই এলাম স্যারের বাড়ি থেকে ঢাকুরিয়া ব্রিজের ওপর দিয়ে। গোলপার্ক থেকে কলা ও সরবতী লেবু কিনলাম এবং একটা ডাবও খেলাম পাঁচ টাকা দিয়ে।

১২ টায় স্বপনের বাড়িতে ফিরতেই বৌমা বললেন, 'কুমুদদা, চোখ অপারেশানের দিন আমি আপনাকে টেক্সি করে যোধপুর পার্কে নার্সিংহোমে নিয়ে যাব।' বৌমার এই কথা শুনে আমার আনন্দ আর ধরে না।

দুপুরে নিরক্ষরতা দূরীকরণের পার্থদা ফোন করেছিলেন, চোখ অপারেশনের সময় থাকবেন বললেন, আরো বললেন আগামীকাল আমার বন্ধু সাক্ষরতা কর্মী সব্যসাচী চক্রবর্তীও থাকবে।

রাত ৯.৩০ এ আগরতলা থেকে পুত্র সুরঞ্জন ফোন করেছিলো। তাকে চোখ অপরেশানের কথা জানালাম এবং চার হাজার টাকা পাঠাতে বললাম।

২২ শে জুন, ১৯৯৮, মঙ্গলবার। আজ সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে দাঁড়ি কামালাম রাস্তায় বসে আড়াই টাকা দিয়ে, তারপর পাঁচ টাকায় একটা ডাব নিয়ে স্বপনের বাড়ি ফিরলাম। ফিরে কুলত্থকলাই এর জল খেলাম একটু নুন দিয়ে। এরপর স্নান সেরে কিছু খেয়ে আটটার সময় প্রেসারের ওষুধ (Amlosafe 10 mg) একটি খেলাম। এরপর বিরাটির ভাইপো শ্যামকে (শ্যামলকে) ফোন করলাম। শ্যামের যে ছেলে ডাক্তারী পড়ে সে (মনীষ/ টুকাই) ফোন ধরলো পরে শ্যাম ধরলো। আগামীকাল আমার চোখ অপারেশানের সময় সে ও তাঁর ছেলে মনীষ উপস্থিত থাকবে বলল। এরপর বৌমা টাকা বের করে দিলেন ওষুধ কেনার জন্যে। গোলপার্কে গিয়ে ৫২০ টাকার ওষুধ কিনলাম, ওয়েল ক্লথও একমিটার কিনলাম।

বিকেলে আমার কিডনির ডাক্তার ডি.কে. পাহাড়ীর কাছে গেলাম। তিনি চোখ অপারেশনের অনুমতি দিলেন। রাত ৯ টায় আগরতলা থেকে পুত্র সুরঞ্জন ফোনে জানাল যে সে চার হাজার টাকা আগরতলার জনসেবা পরিষদ অফিসে শ্রীযুত হরিহর সাহার কাছে জমা দিয়েছে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসেবা পরিষদ দপ্তরে অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী মহোদয়কে সব জানিয়েছে।

২৩ শে জুন, ১৯৯৮, বুধবার। আজ আমার চোখ অপারেশন হবে যোধপুর পার্কের কে.ডি.কিওর নার্সিংহোমে। অপারেশান করবেন ডাক্তার প্রনব চক্রবর্তী। বৌমা ও চিনি আমাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাবে সকাল ৮.৪৫ এ। অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তীও জনসেবা পরিষদের কয়েকজন কর্মী পাঠালেন নার্সিংহোমে। বারাসত থেকে ছোট জামাইবাবু শচীনপাল ও আমার দুই ভাইপো শ্যাম ও প্রভাস উপস্থিত থাকবে। সরস্বতী মিশ্র ও সুধীর চ্যাটার্জী উপস্থিত থাকবেন। বৌমা ও চিনি ঠিক সময়ে নার্সিং হোমে নিয়ে গেলো ট্যাক্সি করে বন্ধুবর স্বপনের নির্দেশ মতো। নার্সিং হোমে ভর্তি হতেই নার্সরা আমাকে একগাদা ইনজেকশন দিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে আমাকে হুইলচেয়ার করে অপারেশান থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার ও নার্সরা রেডি হলেন। আমার চুল বেঁধে দেওয়া হলে একটা রুমাল দিয়ে। তারপর ডাক্তার প্রণব চক্রবর্তী

আমার ছানিপড়া বাম চোখে একটা ইনজেকশান দিলেন। এরপরেই তিনি গুনগুন করে রবীন্দ্র সংগীত গাইতে গাইতে আমার চোখের ছানি কাটলেন। পরের দিন স্বপনের স্ত্রী-আমার বৌমা চিনিকে নিয়ে ট্যাক্সি করে আমাকে তাঁদের বালিগঞ্জের বাড়িতে নিয়ে এলেন। এক মাস আমি বৌমার সেবা-শুশ্রূষায় ছিলাম। স্বপনের মেয়ে চিনি আমার চোখে সবসময় ওষুধ দিয়ে দিত। আর যশোদাদি ও গীতাদি আমার মাথা ঘুয়ে দিতেন এবং আমার ওপর খুব লক্ষ্য রাখতেন। এক মাস পরে আমার চোখের ডাক্তার প্রণব চক্রবর্তীকে চোখ দেখিয়ে চশমা নিলাম। ও সেদিন কি আনন্দ আমার! আমি আমার ছানি পড়া সেই চোখে সব দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট অক্ষরও পড়তে পারছি। এই চক্ষুদানের জন্যে বৌমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। একদিন তিনি মেয়ে চিনিকে নিয়ে আমাকে দমদম এয়ারপোর্টে নিয়ে গিয়ে প্লেনে তুলে দিয়ে এলেন বন্ধুবর স্বপনের ভাগ্নী চুমকিকে সঙ্গে নিয়ে। চুমকি এয়ারাপোর্টের অফিসার। আমি বৌমার হাতে তখন ১০০ টাকা দিয়ে বললাম, 'বৌমা এই টাকাটা রাখ, তোমরা ট্যাক্সি করেই বাড়ি ফিরে যাও।' উত্তরে বৌমা বললেন, 'না কুমুদদা, টাকা লাগবে না, আমরা বাসে করেই বালিগঞ্জে ফিরে যাব।' আমি চোখের জল মুছতে মুছতে তাদেরকে বিদায় জানালাম।

১৫ ই আগস্ট, ১৯৯৮, শুক্রবার। আগরতলা, মঞ্জু আলয়। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেলো লেখক নিধু হাজরার ডাকে। বাইরে এসে দোতলার বারান্দায় চোখ মুছতে মুছতে দাঁড়াতেই নিধুবাবু ও সি. পি. আই নেতা কমরেড শ্যামল চৌধুরী বললেন, 'সুধন্বা দেববর্মা গতকাল (১৪ই আগস্ট) রাত সাড়ে দশটায় তাঁর জামাই ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার কৃষ্ণনগর অ্যাডভাইজার চৌমুহনীর বাসভবনে মারা গেছেন। ডাঃ দেববর্মা আপনাকে যেতে বলেছেন।' সুধন্বা দেববর্মা মারা গেছেন! বুকটা ধড়ফড় করে উঠলো। গতকাল রাতেই আমরা স্বামী-স্ত্রী ঠিক করেছিলাম আজ সকালে তাঁর ছেলে প্রশান্তবাবুর ৭৯ টিলার কোয়ার্টারে গিয়ে তাঁকে দেখে আসবো আর আমার বড়ো মেয়ে তানিয়ার চাকরির ব্যাপারে একটু আলোচনা করে আসবো। স্ত্রী ফুলকুমারী দেববর্মাকে দুঃসংবাদটি দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম কাগজ ও দুধ আনতে। কাগজ ও দুধ এনে সুধন্বাবাবুর শবদেহের কাছে যাবো ভাবলাম। বাসা থেকে বেরিয়ে ত্রিপুরা দর্পণ অফিসে গিয়ে একখানা পত্রিকা নিযে খুলে দেখি প্রথম পাতায সুধন্বাবাবুর মৃত্যুর ছবি বেরিয়েছে-- তাঁর মেয়ে রাণু পিতার শবদেহ জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন। ত্রিপুরা দর্পণে প্রকাশিত সুভাশিস তলাপাত্রের সুধন্বাবাবু সম্পর্কে লেখাটা এক লহমায় পড়ে ফেললাম। ত্রিপুরা দর্পণ থেকে বেরিয়ে গেলাম 'দৈনিক সংবাদ' অফিসে। সেখান থেকে দৈনিক সংবাদ হাতে নিয়ে দেখি সুধন্বা দেববর্মার মৃত্যুর সংবাদ সেখানেও বেরিয়েছে। তবে 'সুধন্বা' বানানটা 'সুধন্য' লেখা হয়েছে দৈনিক সংবাদে। তবে লোক মুখে 'সুধন্য' উচ্চারণটাই বেশী শোনা যায়। কর্ণেল চৌমুহনী থেকে দুধ নিয়ে বাড়ি ফিরেই শুনি ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মা এসেছিলেন সুধন্বা দেববর্মার মৃত্যুর খবর দিতে। আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলে গেছেন। বছর খানেক ধরে আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। প্রেসার ও কিডনির রোগী। স্ত্রী ফুলকুমারী ককবরকে বললেন, 'নৃঙ থাঙয়াখে চলিয়া দা, নিনি ছরির ব হামথাইয়া' (তুমি না গেলে চলে না নাকি, তোমার শরীরও তো ভালো না)। বললাম, 'প্রেসারের ওষুধটা খেয়েই যাবো, তুমি ভেবো না।' সুধন্বাবাবুর প্রতি আমার হৃদয় দৌর্বল্যের কথা জানতেন আমার স্ত্রী। তাঁ শবদেহ দেখতে গিয়ে আমিই না অসুস্থ হয়ে পড়ি এই তাঁর চিন্তা।

প্রেসারের ওষুধ খেয়ে সুধন্বা দেববর্মার 'হাচুক খুরিঅ' (পাহাড়ের কোলে) উপন্যাসের একখানা কপি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার বাসভবনে। তখন সকাল সোয়া সাতটা। গিয়ে দেখি ডাঃ দেববর্মার প্যাথলজিক্যাল লেবরাটরির সামনের ঘরে বরফ দিয়ে সুধন্বাবাবুর মরদেহ সযত্নে রাখা হয়েছে। সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা বুকের ওপর একখানা গীতা ও অজস্র ফুল। আমি সুধন্বাবাবুর

ডাক্তার জামাতার হাতে ‘হাচুখ খুরিঅ’ উপন্যাস খানা তুলে দিয়ে বললাম, ‘এখানাও তাঁর বুকের ওপর রেখে দিন।’ আমার হাতে ‘হাচুক খুরিঅ’ উপন্যাস দেখে বললেন — ‘আমার কাছেও তাঁর ‘কি করে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লাম’ বইখানা আছে, সে-খানাও এনে দিই।’

সুধন্বাবাবুর মরদেহের কাছেই টেলিফোন। আমি আমার পুত্র সুরঞ্জনকে বললাম, ‘টেলিফোন করা যাক বন্ধু-বান্ধবকে।’ সে সম্মতি জানালো। প্রথমে ফোন করলাম রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে। তাঁকে সুধন্বাবাবুর মৃত্যু সংবাদ দিতেই বললেন, এক্ষুণি আসছি। তারপর বন্ধুবর জগৎ জ্যোতি রায়কে দিলাম সুধন্বাবাবুর মৃত্যু সংবাদ। চিত্র পরিচালক দীপক ভট্টাচার্যকে টেলিফোন করে বললাম, ‘আসুন যদি সুধন্বাবাবুকে নিয়ে সিনেমা-টিনেমা করতে চান তাহলে তাঁর অন্তিম যাত্রার সাক্ষী থাকুন, পরে কাজে লাগবে।’ টেলিফোন করতেই তিনি কৃষ্ণনগর আবাসন থেকে পায়ে হেঁটে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে আমাদের দু’জনের পাশে এসে দাঁড়ালেন কবি চন্দ্রকান্ত মরাসিং। আস্তে আস্তে ভীড় বাড়ছে। আগরতলার উপজাতি পল্লীগুলোতে পৌঁছে গেছে সুধন্বাবাবুর মৃত্যু সংবাদ। জনশিক্ষা সমিতির প্রথম সভাপতিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে প্রাচিন ব্যক্তিরা সবাই আসছেন এক এক করে। শ্রীমতী করবী দেববর্মণকে নতজানু হয়ে ফুল দিতে দেখলাম সুধন্বাবাবুর মরদেহে। সুধন্বা দেববর্মার প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই করবী দেববর্মণ-নীলমণি দেববর্মা পবিবারের। ৮০’র দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জি. বি. হাসপাতালের কাছে ইন্দ্রনগরের সৌখীন বাড়ি ছেড়ে দিয়ে স্পীকার সুধন্বা দেববর্মার সরকারী বাসভবনে উঠে এসেছিলেন তাঁরা। হয়তো ম্যাডাম শবদেহের পাশে দাঁড়িয়ে এ-সব কথার স্মৃতিচারণ করছিলেন। ম্যাডামের কাছ থেকে জানতে পারলাম ডাঃ দেববর্মণ খুব সকলে এসে গেছেন। আসবেন-ই তো। নীলমণিবাবু না এলে কে আসবেন? জনশিক্ষা আন্দোলনেব প্রথম সভাপতি সুধন্বা দেববর্মা। আব ডাঃ নীলমণি দেববর্মা তার এক স্তম্ভ। ১৯৪৫ সালে ডাঃ দেববর্মা অঘোর দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে কুমিল্লার শ্রীকাইল কলেজে যান জনশিক্ষা সমিতিব বিষয়ে আলোচনা করতে। সুধন্বাবাবু তাঁর ‘বাজনীতিতে কি করে জড়িয়ে পড়লাম’ পুস্তিকায় জনশিক্ষা আন্দোলনে নীলমণি ও অঘোর দেববর্মার ভূমিকার কথা সবিশেষ উল্লেখ করেছেন।

ন’টা নাগাদ বিধানসভার স্পীকার এসে সুধন্বাবাবুব মরদেহের পাশে দাঁড়ালেন। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন সুধন্বাবাবু। আর তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এলেন চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জিতেন সরকার সঙ্গে দেখলাম বিধানসভার ডেপুটি সেক্রেটারি (এডিটিং) নরেশ চন্দ্র দেববর্মাকে।

একটুবাদে এলেন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রধান কার্যকরী সদস্য রঞ্জিত দেববর্মা ও চেয়ারম্যান মঙছা জাই মগ। এর পরেই এলেন শিক্ষা মন্ত্রী অনিল সরকার — সুধন্বা দেববর্মার একান্ত আপন জন। সুধন্বাদার মৃত্যুতে অনিলবাবু যেন কিছুটা হত বিহ্বল হয়ে গেছেন। মহেন্দ্র দেববর্মার মৃত্যুতেও অনিলবাবুকে এমন-ই হতবিহ্বল দেখেছিলাম।

ইতিমধ্যে দেখি আমার এক দিদি শাশুড়ি সরোজিনী দেববর্মাকে তাঁর বড়ো ছেলে আমার কাকা শ্বশুর উপেন্দ্র দেববর্মা (ডেপুটি ডাইরেক্টর, ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট) হাত ধরে নিয়ে এলেন সুধন্বাবাবুর শেষ দর্শন করাতে। সুধন্বাবাবু হলেন আমার এই দিদি শাশুড়ির মাসির ছেলে। ছোট ভাইয়ের মরদেহে ফুল দিয়ে সুর করে ককবরক ভাষায় কাঁদতে শুরু করলেন তিনি। ফুল দেয়া শেষ হলে কাকা উপেন ও আমি হাত ধরে তাঁকে বাসায় নিয়ে গেলাম ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার বাড়ির সামনে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিৎ দেববর্মার বাড়ি। সেখানে চা খেতে খেতে নানা (দিদি শাশুড়ি)’র কাছ থেকে সুধন্বাবাবুর সম্পর্কে একটা গল্প শুনলাম। ককবরকে বলে চলেছেন নানা —‘ছালছা হর উঙদরপ,

গানতিনগ' মাই-মুই ছঙগৃইতঙমানি। আতমছা ফাতার' ছাব যেন নৃঙগৃইতঙ, বাই নগ' দা তঙ? ম ছাবনি খরাঙলে, সুধন্বানি খরাঙ হাই। ব তাবুক হররগ' বিয়াঙনি ফাই? দুগার ফিয়গৃই নাইমালে, কুবুই কুবুই-ন সুধন্বা; লগি দছরথ, হেমন্ত তাই অগুর (অঘোর)। আছুক নেতানরগন' নুগুই আঙ উআনাজাকখা তা হূন'। বরগন' নগ' ছিতগৃই থাছখে বিছুনা বই রূখা। য়াকুঙরগ ছুলাইবাই বরগ-ব আচুকবাইকা। উলখাই সুধন্বা ছাঅ, বাই, চুঙ খরক বৃরূই মাই চানাই। আঙ ছাকা, তাম' চারুনাই নরগন' নুকুমুই-ব কূরূই, বাঙলাদেছ' থাঙকা উআ তিলাঙগৃই, দাইল-ব কূরূই নগ', তাম' ছঙগৃই চারুনাই নেতারগন'? উল' হেমন্ত ছাকা, বাচুই, আছুক তা উআনাদি, চুঙ ছিমি বেরমা বৃতুই বাই মাই চাইমান'। আঙ ছাকা, আইচ্‌চা, বেরমা বৃতুই বাই-ন চারুনাই নরগ-ন। উল' বরগ রক' দরপ-ন মুকতৃরূই থাঙবাইখা। লেঙখা তা হূন' হিম্‌মাঙ হিমমাঙ। বরগ থুবাইখে আঙ তাম' খূলাইকা খূনাদি। আঙ তগলা কতমা মাছা রাথারকা। আছুক নেতা কতমা কতমা অতিশ উঙমানি তক রাথারূয়াইদা তুঙগৃই মানছি। উল মাই-মুঙ ছঙবাইখে নেতারগন' ছচাউই মাইমুই খুরুই রূখা। তহান জামছা জামছা নুগুই হেমন্ত মূনূইতৃতুই ছাঅ-বাচুই লে কুবুই কুবুই-ন বেরমা-বৃতুই ছঙকা। আঙ হূনকাতা-নরগ নেতা কতমা কতমা ফাইমানি ছিসি বেরমা বৃতুই বাইকে চা রূনাই, তগলা কতমা রাথারূই রূখা। উলখাই হেমন্ত ছাঅ, বাচুই ছঙমানি জুদা, বেতালা থগজাগ আঙ।

উল মাই চাবাইখে জন' কাঙছা কাঙছা রিতৃরাক রূউই মুথুকা। বরগ-কুঙ কর' উই মুকতৃরূই থাঙবাইখা। আইছিরি ছিরি গঙ (সুধন্বা) নৃঙহর' আন'- বাচাদি বাই, চুঙ থাঙনানাইখা, দুগার ছইরূদি। আঙ-ব বাচাখা বৃরাম-বারাম। বাচাউই নাইমা লে বরক কূরূইখা, অঙখরই থাঙবাইখা জতন।' (একদিন সবে রাত হয়েছে, আমি রান্নাঘরে ভাত-তরিতরকারি রান্না কোরছি; এমন সময় হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন ডাকলো-দিদি, ঘরে আছো নাকি? এ কার গলা, সুধন্বার গলার মতো লাগছে অনেকটা। সে এই রাতে কোত্থেকে এলো? দুয়ার খুলে দেখি, সত্যি সত্যি সুধন্বা, সঙ্গে দশরথ, হেমন্ত আর অঘোর। এক সঙ্গে এত নেতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম আর কি। তাদের ঘরে ঢুকিয়ে সুন্দর করে বিছানা করে দিলাম। পা-টা ধুয়ে তারাও বসলো ভালো কোরে। একটু পরে সুধন্বা বললো— দিদি, আমরা চারজনে ভাত খাবো। আমি বললাম— কি খাওয়াবো তোমাদের? তোমার জামাইবাবুও নেই, বাঁশ নিয়ে গেছে বাঙলাদেশে, ডালও নেই ঘরে, কী রান্না করে নেতাদের যে খাওয়াই! শেষে হেমন্ত বললো— বৌদি এতো ভেবোনা, আমরা শুধু সিঁদলের ঝোল দিয়েই ভাত খেতে পারি। আমি বললাম— আচ্ছা, সিঁদলের ঝোল দিয়েই তোমাদেরকে খাওয়াবো। এদিকে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই তারা পড়লো ঘুমিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আর কি। তারা ঘুমিয়ে পড়লে আমি কি করলাম শোনো। আমি বড়ো দেখে একটা মোরগই কেটে ফেললাম। এতো বড়ো বড়ো নেতা বাড়িতে অতিথি হয়েছে, মোরগ না কেটে কি পারা যায়? শেষে ভাত-তরিতরকারী রান্না করে নেতাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলে ভাত বেড়ে দিলাম। প্রত্যেকের পাতে এক এক বাটি মাংস দেখে হেমন্ত হাসতে হাসতে বলে— 'বৌদি, তুমি সত্যি সত্যি সিঁদলের ঝোল রান্না করেছো।' আমি বললাম— 'তোমরা সব বড়ো বড়ো নেতা এসেছো, শুধু সিঁদলের ঝোল দিয়ে কী করে খেতে দিই, তাই মোরগ একটা কেটে ফেললাম।' হেমন্তের কথা থামতে চায় না, বলে, 'বৌদের রান্নাই অন্যরকম, আমার কাছে খুব স্বাদ লাগে।'

ভাত-টাত তো তারা খেলো। পরে প্রত্যেককে একখানা করে বাড়িতে বোনা গায়ের চাদর দিয়ে ঘুম পাড়ালাম তাদেরকে। একটু পরে নাক ডাকতে শুরু করলো তারা। খুব ভোরে গঙ (সুধন্বা) ডাক দিলো আমায় —দিদি, ওঠো, আমরা চললাম, দরজা বন্ধ করে দাও। আমিও উঠলাম পড়ি কি মরি

করে। উঠে দেখি তারা নেই, নেমে পড়েছে সবাই)।

দিদিশাশুড়ি সরোজিনী দেবীর কাছ থেকে এই কাহিনী শুনে আমি আবার চলে এলাম ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার বাড়ির সামনে। আবার পাশে এসে দাঁড়ালাম চিত্র পরিচালক দীপক ভট্টাচার্য ও কবি চন্দ্রকান্ত মুড়াসিংয়ের পাশে। বেলা বাড়ছে, কৃষ্ণনগর, অভয়নগর ও বনমালীপুরের প্রচীন লোকেরা এসে সুধন্বাবাবুর মরদেহে ফুল দিচ্ছেন সব। শিল্পী হীরালাল সেনগুপ্তকে একফাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা হীরালালবাবু, সুধন্বাবাবুর মরদেহ নিয়ে যেতে কত দেরী হবে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'এগারোটার আগে যাত্রা করা যাবে বলে মনে হয় না।' এমন সময় দীপকবাবু বললেন, 'চলুন কুমুদদা, কোথাও বসা যাক, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেছে।' চন্দ্রকান্তবাবুও বললেন, 'দা কুমুদ (কুমুদ দা) চলুন একটা কোথাও গিয়ে বসি, বেশ রোদ লাগছে।' তখন আমি চিত্র পরিচালক দীপক ভট্টাচার্য ও কবি চন্দ্রকান্ত মুড়াসিংকে নিয়ে পাশে ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার বোনের বাড়ির পাকা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই ডাক্তারবাবুর ভগ্নীপতি সুবোধ দেববর্মা আমাদের আদর করে ডেকে নিয়ে ভেতরে তাঁদের ড্রয়িংরুমে বসালেন। বললেন, 'বসুন, আপনারা চা খেয়ে যাবেন।' আমরা তিনজনে সোফার ওপর বসে সোফার সামনে টেবিলে রাখা সংবাদপত্রের দিকে চোখ পড়তেই চন্দ্রকান্তবাবু ৩রা আগস্টের একখানা ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় চোখ বোলাতে বোলাতে বললেন, 'আচ্ছা দা কুমুদ, এই যে খবর বেরিয়েছে মান্দাইয়ের কাছে ডাকডুক ছড়ায় ট্রাইবাল এলাকায় একখানা প্রচীন নৌকো পাওয়া গেছে, এ সম্পর্কে আমার অভিমত কি?' দীপকবাবুও বললেন, 'কুমুদ দা, ক'দিন ধরে ভাবছি, আপনার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা একটু জানবো। ডাকডুকছড়া (ডাক ডুক নামে ছোট্ট নদী)য় মোহন দেববর্মা তার জমির ভেতর যে ৩৩ ফুটের গাছের গুঁড়ির নৌকাটা পেলেন ব্যাপারটা কি? ত্রিপুরার ট্রাইবালরা কি কোনোদিন নৌকাব ব্যবহার জানতো? তারা আগে জুমচাষ করতো টিলা-টঙ্করে, এখনো যেমন করে, সেখানে নৌকোর ব্যবহার করার তো কোনো প্রয়োজন ছিলো না। অথচ যে নৌকোটা পাওয়া গেছে একেবারে ট্রাইবাল এলাকার ভেতর, তার গঠন প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে খুব প্রচীন। পুরো একটা আস্ত গাছের গুঁড়ির নৌকো দেখতে অনেকটা ডোঙার মতো।'

আমি দীপকবাবু ও কবি চন্দ্রকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'দেখুন, ককবরক ভাষায় নৌকোর প্রতিশব্দ আছে, আর সেটা হলো 'রুঙ'। 'রুঙ চগ' মানে নৌকো বায়। কাজেই এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, ককবরক ভাষী উপজাতিরা একসময় নৌকো ব্যবহার করতেন, তা না হলে নৌকো শব্দ এলো কী কোরে ককবরক ভাষায়?'

তখন চন্দ্রকান্তবাবু বললেন, 'ঠিক বলেছেন দা কুমুদ, ককবরক ভাষায় যখন নৌকোর প্রতিশব্দ 'রুঙ' আছে, তাহলে একসময় ককবরক ভাষাভাষী পূর্বপুরুষরা নৌকোর ব্যবহার জানতেন।'

আমি বললাম, 'জানেন বোধ হয় চন্দ্রকান্তবাবু, আপনাদের পূর্বপুরুষেরা আগে চীনদেশে হোয়াংহো নদীর তীরে বসবাস করতেন এবং বারবার বন্যার প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্যে তাঁরা হোয়াংহো নদীর তীর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন নিরাপদ জায়গার সন্ধানে। কাজেই হোয়াঙ নদীর তীরে তাঁরা বসবাস করতেন, আর নৌকোর ব্যবহার জানতেন না, এমন হতে পারে না।'

আচ্ছা কুমুদ দা, আপনি আগে তো আমাদেরকে বলেছেন ত্রিপুরার ককবরক ভাষা চীনা-তিব্বতীয় ভাষা বংশ থেকে এসেছে। তাহলে চীনা ও তিব্বতী ভাষায় নৌকোকে কী বলে?'

— 'দেখুন দীপকবাবু, চাইনিজ ভাষায় নৌকোকে বলে 'চুআন', ইংরেজীতে বানান হল chuan। আর ককবরক ভাষায় নৌকোর প্রতিশব্দ হচ্ছে 'রুঙ'। আপনারা বলতে পারেন চাইনিজ 'চুআন' -এর সঙ্গে ককবরক 'রুঙ' -এর কোনো শব্দ সাদৃশ্য নেই। কিন্তু নৌকো বাওয়াকে ককবরকে

বলে 'চক'। রুঙ চগ' অর্থ নৌকো বায়। ককবরকের এই 'চক' ক্রিয়াপদের সঙ্গে নৌকো অর্থে চীনা শব্দ 'চুআন'-এর একটা মিল আছে। অন্যদিকে, তিব্বতী ভাষায় নৌকোকে বলে 'গ্রু' যার ইংরেজী বানান হলো 'gru'। নৌকো অর্থে ককবরক ভাষার 'রুঙ' এবং তিব্বতী ভাষার 'গ্রু' একই।'

আমার কথা শুনে চন্দ্রকান্তবাবু বললেন, 'চীনা 'চুআন' শব্দের সঙ্গে ককবরক 'রুঙ' শব্দের কোনো মিল না থাকলেও তিব্বতী 'গ্রু' শব্দের সঙ্গে ককবরকের 'রুঙ' শব্দের কিছুটা শব্দ সাদৃশ্য আছে। আর আমরা অনায়াসেই ককবরকের 'রুঙ চগ'-র জয়গার 'গ্রু চগ' - নৌকো বায় বলতে পারি।

- 'সব থেকে মজার জিনিষ কী জানেন চন্দ্রকান্তবাবু, আপনাদের জাতি গোষ্ঠী খুবই প্রচীন। ভাষাচার্য সুনীতি কুমারের মতে আপনাদের বৃহত্তর বোড়ো জাতি গোষ্ঠী যীশু খৃস্টের জন্মের আগেই আসাম, উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গে এসে বসতি স্থাপন করেন। আর অন্য পণ্ডিতেরা বলেন, আপনাদের এই জনগোষ্ঠী প্রথমে চীন থেকে এসে তিব্বতে বেশ কিছুকাল থাকেন এবং সেখান থেকে ব্রহ্মপুত্রের উৎস দিয়ে এসে আমাসের ব্রহ্মপুত্র নদের দু'দিকে ছড়িয়ে পড়েন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে যখন আসামের রাজা ভাস্কর বর্মণের আতিথ্যে কামরূপে ছিলেন, তখন তিনি কামরূপের পাহাড়ে বসবাসকারী আপনার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে দক্ষিণ চীনের পরম শক্তিধর 'মন' উপজাতিদের সাদৃশ্য খুঁজে পান।'

আমার কথা শুনে দীপকবাবু বললেন, 'তাহলে আপনি বলছেন ককবরক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষেরা তিব্বত থেকে এসে বৃহত্তর আসামে আস্তানা গাড়েন?

— 'সেতো তিব্বতী ও ককবরক ভাষার কিছু শব্দ শুনলে আপনারা বুঝতেই পারবেন। যেমন ধরুন, তিব্বতী ভাষায় 'ঝুক', যার ইংরেজীতে বানান Zhuk আর ককবরক ভাষায় 'হুক' ইংরেজী বানান huk-একই, অর্থ উপত্যকায় কৃষি চাষ, ইংরেজীতে যাকে বলে mountain cultivation; আর যার বাঙলা নাম জুম বা ঝুম চাষ।'

— 'দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগছে আপনার কথা শুনতে' - কবি চন্দ্রকান্ত বলে ওঠেন।

—'এখানেই শেষ নয়, কবিবর, তিব্বতী 'রোঙ' এবং ককবরক 'হা-রুঙ' এর একই অর্থ, টিলা বা পাহাড় থেকে সমতলের দিকে নেমে আসা নৌকো সদৃশ্য জমি। আর তিব্বতী 'রোঙ' এবং ককবরকের 'হা-রুঙ' থেকে ককবরকে নৌকোবাচক 'রুঙ' শব্দ এসেছে। কাজেই 'হা-রুঙ' অর্থ মাটির নৌকো। কাজেই মান্দাইয়ের ডাকডুকছড়ায় যে 'রুঙ' বা নৌকো পাওয়া গেছে তা অনেক অনেক আগে ককবরকভাষীরা তৈরী করেন একটা আস্ত গাছের গুঁড়ি দিয়ে যাতে পেরেক জাতীয় কোনো লোহার সংস্পর্শ নেই। তবে কি জানেন, ককবরক 'রুঙ' বলতে যে নৌকো বোঝায় তার সঙ্গে আধুনিক নৌকো বা বোটের গঠন শৈলী এক নয়। ককবরকের 'রুঙ'কে বাঙলায় ডোঙা বা ডোঙ্গা বলা যেতে পারে। আর এই ডোঙার সঙ্গে উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতিদের তৈরী ডোঙার হুবহু মিল আছে। যার নিদর্শন মেলে যীশুখৃস্টের জন্মের হাজার হাজার বছর আগের থেকে। উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান 'মিকমাক' উপজাতিরা যে নৌকো ব্যবহার করতো, তাকে ইংরেজীতে বলে 'কেনো' canoe। 'কেনো'র সাথে আমাদের মান্দাইয়ের ডাকডুকছড়ায় পাওয়া ৩৩ ফুটের সুবৃহৎ গাছের গুঁড়ির ডোঙার মিল আছে।

আমার কথা চিত্র পরিচালক দীপক ভট্টাচার্য ও কবিবর চন্দ্রকান্ত মোড়াসিং খুব আগ্রহ সহকারে শুনছিলেন। এবার চন্দ্রকান্তবাবু মুখলেন, 'তাহলে দা কুমুদ, আপনি বলছেন, ডাকডুকছড়ায় পাওয়া নৌকোটা খুবই প্রচীন আর উত্তর আমেরিকার 'মিকমাক' ট্রাইবদের ডোঙার সঙ্গে মিল আছে?'

—'তা কুমুদ দা, এই মিল হলো কী করে? কোথায় উত্তর আমেরিকা আর কেথোয় পার্বত্য ত্রিপুরার

এক অজ ডাকডুকছড়া' — দীপকবাবুর প্রশ্ন ।

—' দেখুন দীপকবাবু, পৃথিবীর আদিমতম অনেক কিছুই সবদেশে এক। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে দীপকবাবু, ক'বছর আগে জহর আচার্যির রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্য জয়ন্তীর সেমিনারে বিশিষ্ট কলা সমালোচক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত আমাদের ত্রিপুরার উনকোটী পাহাড়ের দেবদেবতার মূর্তির ওপর একটা পেপার পড়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছেন, উনকোটী পাহাড়ের গায়ে খোদিত অনেক দেবদেবতার মূর্তির সঙ্গে উত্তর আমেরিকার উপজাতিদের অনেক দেবদেবতার খুব মিল আছে।'

আমার কথা শুনে দু'জনে প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন 'বলেন কী' !

এর মধ্যে সুবোধবাবু সুদৃশ্য ট্রে করে চা-বিস্কুট এনে হাজির । চা খেতে খেতে আমি বললাম, 'দেখুন, আমরা এখানে বসে উপজাতিদের নৌকো থেকে দেবদেবতা নিয়ে আলোচনা করতে করতে ভুলে গেছি পাশে এক উপজাতি নেতার মৃতদেহ নিয়ে কী হচ্ছে । চলুন, চলুন, বাইরে গিয়ে দেখি সুধন্বাবাবুকে জম্পুইজলায় নিয়ে যাবার কতটা কী হলো ।' বেলাতো এগারোটা বাজে ।'

বাইরে আমরা বেরিয়ে এসে দেখি, শ্রীমতী অনুরূপা মুখার্জীর বাড়ির সামনে থেকে একেবারে ইন্দ্রজিৎ দেববর্মার বাড়ি পর্যন্ত লোকে লোকারাণ্য । গণশিল্পী হীরালাল সেনগুপ্ত সুধন্বা বাবুর মৃতদেহ লরির ওপর ওঠানোর ব্যাপারে হাঁক-ডাক করছেন । তখন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে । দেখলাম হীরালালবাবু শবযানের ওপর একটা চাঁদোয়া টাঙানোর ব্যাপারে খুবই ব্যস্ত । এমন সময় ডাক্তার বাবুর ঘরের ভেতর থেকে সুধন্বা বাবুর মেয়েদের সরব কান্নার ধ্বনি শোনা গেল । এবার সুধন্বাবাবুর পৃথুল মৃতদেহকে শবযানের ওপর অতি সন্তর্পণে তোলা হলো । দেখলাম, আত্মীয়-স্বজনেরা খুব কাঁদছেন, শুভানুধ্যায়ীদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে । এবার সুধন্বাবাবু শবযানে চড়ে তাঁর জম্পুইজলার বাড়িতে যাবেন। সেখানে তাঁর ভায়রাভাই ত্রিপুরার সমবায় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন দেববর্মা আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে চিতা সাজানোর তদারকির কাজে ব্যস্ত । হাজার হাজার উপজাতি-বাঙালি অপেক্ষা করছেন সেখানে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের স্থপতি ও 'হাচুক খুরিঅ (পাহাড়ের কোলে)' উপন্যাসের অমর লেখক সুধন্বা বাবুকে । এবার সুধন্বাবাবুর শবযান ছেড়েদিলো । শিল্পী হীরালাল সেনগুপ্ত 'জাগো জাগো সর্বহারা' বলে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গাইতে গাইতে তাঁর সাংস্কৃতিক দল নিয়ে শবানুগমন করলেন অন্যান্যদের সঙ্গে । শবযান প্রথমে যাবে ত্রিপুরা বিধানসভায় । যেখানে তিনি ত্রিপুরার প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের অধ্যক্ষ ছিলেন । এরপর সুধন্বাবাবুর নিথর দেহ গিয়ে পৌঁছবে মেলারমাঠে সি. পি. আই (এম)-এর পার্টি অফিসের সামনে । তারপর তাঁর সেইনিথর দেহ নিয়ে শবযান দ্রুত গতিতে চলবে জম্পুইজলার দিকে ।

সুধন্বাবাবুকে চিরবিদায় জানিয়ে বিষণ্ন চিত্তে দিলীপ দেবরায়ের বাড়ি আমার বাসায় ফিরতেই প্রথমেই চোখে পড়লো সেই বৃহদাকৃতির বেতের চেয়ারটার দিকে, যেখানে সুধন্বাবাবু এসে বসতেন মস্ত বড়ো দেহটা নিয়ে । আমার মন চলে গেলেন সুধন্বাবাবুকে নিয়ে অতীতের স্মৃতির পাতায় ।

মনের স্মতির পর্দায় প্রথম ভেসে উঠলো ১৯৬৮ সালে সুধন্বা দেববর্মার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের স্মৃতি । ১৯৬৭ সালে যখন আমি ককবরক উন্নয়ন পরিষদের আমন্ত্রণে আমার বন্ধু শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যের সঙ্গে ত্রিপুরায় আসি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ককবরক ভাষায় ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে লিখিতরূপ দেয়ার গবেষণার কাজে, তখন আমার কলেজ জীবনের অধ্যাপক শ্রীযুত ব্রজেন সাহা বলেছিলেন, "কুমুদ, তুই ত্রিপুরায় যাচ্ছিস ককবরক ভাষা গবেষণার কাজে, তুই গিয়েই কুমিল্লার শ্রীকাইল কলেজের

আমার প্রাক্তন ছাত্র সুধন্বা দেববর্মার সঙ্গে দেখা কোরিস। সে ত্রিপুরার মস্তবড়ো কমিউনিস্ট নেতা ও ককবরক ভাষাভাষী উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর লোক।" কিন্তু ১৯৬৭ সালে ককবরক ভাষার গবেষণার কাজে এসে সেবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। কারণ, আমাদের ভাষাগবেষণার জন্যে ককবরক ভাষার ৮ টি উপভাষা-এলাকায় যেভাবে ভাষা-শিবির নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন শ্রীযুত বীরচন্দ্র দেববর্মা, কমরেড অঘোর দেববর্মা ও কমরেড মোহন চৌধুরী, সেই সব এলাকায় সুধন্বা দেববর্মার সুতারমোড়া বা জম্পুই জলার বাসস্থান পড়ে না। পরে যখন ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে পাকাপাকি ভাবে ককবরক ভাষার একখানা ত্রৈভাষিক অভিধান (ককবরক-বাঙলা-ইংরেজী) সংকলনের কাজে চড়িলামের হেরমা গ্রামে শ্রীযুত যোগেন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করি, তখন সুধন্বাবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের সুযোগ হয়। সুধন্বা বাবুর গ্রাম সুতার মোড়া হেরমা থেকে পাহাড়ী রাস্তায় তিন কিলোমিটারের মতো পথ। হেরমার পাশের গ্রামে ধারিয়াথলে তাঁর দিদির বাড়ি। ধরিয়াথলের প্রয়াত ব্রজেন্দ্র দেববর্মা (ব্রজেন্দ্র সেক্রেটারি) ছিলেন তাঁর ভগ্নীপতি। ভাষার কাজ করতে করতে প্রায়ই আমি ধরিয়াথলে বেড়াতে যেতাম সুধন্বা দেববর্মার ভগ্নীপতি ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ি এবং তাঁর আত্মীয় গদাধর দেববর্মা ও শ্রীযুত যুগল দেববর্মার বাড়ি। যুগল বাবু প্রায়ই হেরমার যোগেন্দ্র বাবুর বাড়ি গিয়ে আমার ককবরক ভাষার অভিধান সংকলনের কাজ দেখতে যেতেন এবং আমার জন্য নানাপ্রকার তরি-তরকারি দিয়ে আসতেন যোগেন্দ্র বাবুর বাড়ি।

একদিন যুগল বাবুর কাছ থেকে শুনলাম সুধন্বা বাবু তাঁর দিদিব বাড়িতে বেড়াতে আসবেন। এই খবর পাবার পর আমি তাঁর দিদির বাড়ি গিয়ে তাঁর ছোট ভাগ্নে শ্রীযুত সুবল দেববর্মাকে বলে আসি তাঁর মামা এলে আমাকে যেন খবর দেয়া হয়। একদিন সকালে এসে সুবল বাবু যোগেন্দ্র বাবু ও আমাকে তাঁদের বাড়িতে রাতের বেলায় নিমন্ত্রণ করেন তাঁর মামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে। সেইমতো আমরা রাতের বেলায় সুধন্বা দেববর্মার দিদির বাড়িতে যাই। সেখানেই দেখা হয়ে যায় সুধন্বাবাবুর সঙ্গে। প্রথম দর্শনে ধুতিপাঞ্জাবী পরা তাঁর সৌম্য চেহারা আমাকে আকৃষ্ট করে। দেখি তাঁর মাথায় বড়োটাক এবং একটি চোখ অন্ধ। পরিচয়ের প্রথম পর্বেই তাঁকে নমস্কার করে বলি, "আপনি আমার সতীর্থ।" তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বিশুদ্ধ কলকাতার ভাষায় বলেন, " আপনার কথা ঠিকমতো বুঝতে পারছিনা আমি, আমি কী করে আপনার সতীর্থ হলাম।" তখন আমি বললাম, " আপনার শ্রীকাইল কলেজের শিক্ষক এবং বর্তমানে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের বাঙলার অধ্যাপক ব্রজেন সাহার ছাত্র আমি। কাজেই আমরা একই গুরুর শিষ্য।" তিনি আমার এইকথা শুনে একেবারে অবাক হয়ে যান। তারপর তিনি আমাকে বলেন, "তাহলে তো আপনি আমার গুরু ভাই।" আমিও হেসে বলি, "আমিও তো তাই বোলছি।" দেখলাম, তিনি আমার ককবরক ভাষা গবেষণা ও ককবরক ভাষায় অভিধান সংকলনের কাজের কথা জানেন। পরবর্তীকালে আমি যখন হরেমায় গৌরচাঁন ঠাকুরের নাতনী ফুলকুমারী দেববর্মাকে বিয়ে করি ১৯৭০ সালে, তখন জানতে পারি আমার দিদিশাশুড়ী অর্থাৎ আমার শ্বশুরমশায়ের মা শশীরানীর সম্পর্কে ভাই হলেন সুধন্বা দেববর্মা। কাজেই তখন থেকেই তিনি হয়ে যান আমার দাদা শ্বশুর। আমার সতীর্থ আমার দাদাশ্বশুর হয়ে যাওয়ায় দারুণ মজাপাই আমি। খুশী হন তিনিও তাঁর দিদির নাতনীকে বিয়ে করার জন্যে। তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে যে কতোবার দেখা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বড়ো ভালোবাসতেন আমাকে। একে তো সতীর্থ তাঁর ওপর নাতিন জামাই। জীবনের কত রোমহর্ষক কাহিনী শুনেছি তাঁর সম্পর্কে যোগেন্দ্র বাবু ও অন্যান্যদের কাছ থেকে হেরমা এলাকায় আন্দি অঞ্চলে থাকতে থাকতে।

প্রথম যে কথাটা শুনি যোগেন্দ্র বাবুর কাছ থেকে তা হলো, তিনি ছিলেন ককবরকভাষীদের

শিক্ষাগুরু। ত্রিপুরার শেষ রাজা বীরবিক্রমের অন্তিম পর্বে ত্রিপুরার ককবরক ভাষাভষী অন্যান্য উপজাতিদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে যে 'জনশিক্ষা সমিতি' গড়ে ওঠে ১৯৪৫ সালে, তিনি ছিলেন তার প্রথম সভাপতি। তখন তিনি কুমিল্লার শ্রীকাইল কলেজ থেকে ত্রিপুরার পাহাড়ের উপজাতিদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে হেমন্ত দেববর্মা, আঘোর দেববর্মা, ডাঃ নীলমণি দেববর্মা ও পরবর্তীকালের জননায়ক দশরথ দেববর্মার সহযোগিতায় ত্রিপুরায় জনশিক্ষা আন্দোলন গড়ে ওঠে। আর যার নেপথ্য নায়ক ছিলেন প্রয়াত কমিউনিষ্ট নেতা ত্রিপুরার আপামর জনসাধারনের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব বীরেন দত্ত। এই জনশিক্ষা আন্দোলনের ফলে মহারাজ বীরবিক্রমের জীবদ্দশায় ত্রিপুরার পাহাড়-কন্দরে ৫০০'র মতো প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। তখন ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন একজন ইংরেজ, যিনি পরিচিত ছিলেন ব্রাউন সাহেব নামে। ব্রাউন সাহেবের সত্যিকারের আন্তরিকতায় ত্রিপুরার পাহাড়ে শিক্ষার প্রদীপ জ্বলে ওঠে। সুধন্বা দেববর্মা একাধারে যেমন ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা, তেমনি ছিলেন ককবরক ভাষার সার্থক সাহিত্যিক। ককবরক ভাষার প্রথম সাহিত্য পত্রিকা 'ক্তালকথমা'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি। 'ক্তালকথমা' থেকেই ককবরক ভাষার আধুনিক সাহিত্যযুগ জন্মলাভ করে। এখন ককবরক ভাষার শতশত কবি, লেখক ও সাহিত্যিকের দীক্ষা গুরু তিনিই। তিনি শেষ বয়েসে তাঁর লেখা ককবরক ভাষার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'হাচুক খুরিঅ' (পাহাড়ের কোলে)'র বাঙলা ভাষায় অনুবাদের ভার দেন আমার ওপর। এই অমর উপন্যাস ৪ খন্ডে রচিত। পৃথিবীর কোনো ভাষায় প্রথম উপন্যাস ৪ খন্ডে আর কোথাও লিখিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। তিনি এই দায়িত্বভার আমার ওপর ন্যস্ত করার পর আমি ওই উপন্যাসের প্রথম খন্ডের ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করি শ্রীযুত শুভব্রতদেব সম্পাদিত একুশ শতকমাসিক পত্রিকায়। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ককবরক ভাষার প্রথম উপন্যাসের অনুবাদ পড়ে বাঙালি পাঠককুল মুগ্ধ হয়ে যান। কবি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও কবি কৃত্তিবাস চক্রবর্তী প্রমুখ লেখকের মতে ভারতের উত্তর পূর্বঞ্চলের বাঙলা-অসমীয়া-মনিপুরী প্রভৃতি ভাষার লেখা উপন্যাসগুলোর মধ্যে ককবরক ভাষায় লেখা সুধন্বা দেববর্মার 'হাচুক খুরঅ' (পাহাড়ের কোলে) অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পরবর্তীকালে একুশ শতকের সম্পাদক আমার অনুবাদকৃত 'হাচুক খুরিঅ' বাঙলা অনুবাদ তাঁর 'অক্ষর' প্রকাশনী থেকে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন। 'হাচুক খুবিঅ' উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ড বাঙলায় অনুবাদ করার জন্যে স্বয়ং লেখক আমার বাসায় এসে কিছু সংশোধন সহ দ্বিতীয় খন্ডটি দিয়ে যান। কিন্তু তারপর আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় 'হাচুক খুরিঅ'র দ্বিতীয় খন্ড অনুবাদ করতে পারিনি।

আমার পুত্র শ্রীমান সুরঞ্জনের মাতৃভাষা ককবরক। তাঁর পক্ষে শ্রীযুত শ্যামলাল দেববর্মা লিখিত ককবরক ভাষার দ্বিতীয় উপন্যাস 'খঙ' (গন্ডি) উপন্যাস অনুবাদ করা অনেক সহজ হয়েছে। আর, আমার পক্ষে 'হাচুক খুরিঅ' উপন্যাসের প্রথম খন্ড বাঙলায় অনুবাদ করা ছিলো একেবারে একটি দুঃসাধ্য কাজ। কারণ ককবরক ভাষা আমার মাতৃভাষা নয়। তবে আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, উপন্যাসের জনক সুধন্বা দেববর্মা আমার বাঙলা অনুবাদ পড়ে সত্যিই খুশী হয়েছিলেন। অনেক সময় এই উপন্যাসের অনেক বাক্যের উপজাতীয় ভাব প্রকাশ করতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছে। কিন্তু সেই ভাবের যে অনুবাদ আমি করেছি, তা তিনি সমর্থন করেছেন। এটা আমার কাছে কম আনন্দের কথা নয়।

আমার স্মৃতির পর্দায় সুধন্বা দেববর্মার কর্মবহুল জীবনের বিচিত্র সব ঘটনা, যা আমি লোকমুখে একাধিকবার শুনেছি, পরপর ভেসে উঠতে লাগলো। সুধন্বা বাবু তখন কুমিল্লার শ্রীকাইল কলেজে সদ্য ভর্তি হয়েছেন আই.এ. ক্লাসে। তখন বাঙলায় প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার জন্যে কলেজের ছাত্র-

ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রবন্ধ চাওয়া হয়। তখন সুধন্বা বাবুও ওই রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার জন্যে তাঁর ইচ্ছের কথা তাঁর বাঙালী বন্ধুদের জানান। তখন তারা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, "সুধন্বা, তুই হলি তিপরা, এসেছিস ত্রিপুরার পাহাড় থেকে, এখনো ভালো কোরে বাঙলায় কথা বলোতে পারিসনে, তুই আবার বাঙলায় প্রবন্ধ লিখবি প্রতিযোগিতার জন্যে, তুই হাসালি আমাদের সুধন্বা, হাসালি।" এই কথা শুনে সুধন্বা বাবুও বাজি ধরেন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে। বলেন, "শোন তোরা, আমি যদি এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট না হোতে পারি, তাহলে, আমি আমার এই ডানহাত খানা কেটে ফেলবো।" বন্ধুরা তাঁর এই বাজি ধরা দেখে অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছিলো। কিন্তু প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল বেরোতেই দেখা গেলো, ত্রিপুরার পাহাড়ের সেই তিপ্রা ছেলেই কলেজের ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক সবাইকে অবাক করে দিয়ে ফার্স্ট হয়েছে। সুধন্বা দেববর্মার কলেজজীবনের এই তথ্য আমাকে দিয়েছিলেন আমার ককবরক অভিধানের তথ্য সরবরাহকারী ত্রিপুরার জনশিক্ষা সমিতির প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য যোগেন্দ্র দেববর্মা।

সুধন্বা বাবু যখন আগরতলার উমাকান্ত অ্যাকাডেমি স্কুলের শিক্ষক, তখন তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয় জনশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক পেকুয়াজলার উয়াখিরাই দেববর্মার মেয়ে শৈলবালার সঙ্গে। উয়াখিরাই ঠাকুর ত্রিপুরার পাহাড়ের উপজাতি ছাত্রদের জন্যে আগরতলায় ট্রাইব্যাল বোর্ডিং (তিপ্রা বোর্ডিং) গড়ে তোলার জন্যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর অনেকগুলো হাতি ছিলো শোনা যায়। উমাকান্ত এ্যকাডেমির কোনো ট্রাইব্যাল ছাত্র বাড়ি চলে গিয়ে দীর্ঘদিন স্কুল কামাই করলে তিনি হাতি পাঠিয়ে সেই ছাত্রকে ধরে আনতেন। সুধন্বা বাবুর স্ত্রীও হাতি চড়ায় ছিলেন খুব পটু। বিয়ের পরে তিনি তাঁর পেকুয়াজলাব বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি সুতার মোড়ায় সবসময় হাতির পিঠে চড়ে আসতেন। তাঁর মতো আর কেউ নাকি তাঁর বাবার হাতিগুলোকে পোষ মানাতে পারতো না। একবার হলো কী, তিনি একবার একটা বদমেজাজী হাতির পিঠে চড়ে এলেন তাঁর সুতারমোড়ার শ্বশুরবাড়ি। হঠাৎ হাতিটা গেলো ছুটে। সুতার মোড়ার বিভিন্ন বাড়ি গিয়ে কলাবাগান একেবারে সাফ করে ফেললো খেয়ে। গ্রামের লোকেরা ভয় পেয়ে গোলো। রাত হয়ে গেলে বদমেজাজী হাতিটা যে কী করে বসে! এখন উপায়? তখন সুধন্বাবাবুর নববিবাহিতা স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে হাতিটার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তার কাছে যেতেই সে শুঁড় বুলিয়ে উয়াখিরাই ঠাকুরের এই মেয়েকে সোহাগ করতে লাগলো গলায় অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে। তখন তিনি তার পিঠে চড়ে হাতিটাকে শ্বশুরবাড়িতে এনে শিকল দিয়ে ভালো করে বেঁধে রাখলেন।

সুধন্বাবাবুর এই স্ত্রী সম্পর্কে একটা গল্প শুনেছিলাম আমি কমরেড মোহন চৌধুরীর কাছ থেকে। সুধন্বাবাবু তখন সি. পি. আই পার্টির নেতা। একদিন বিশালগড়ের সি. পি. আই এম. এল এ আপ্তাবুদ্দীন সাহেব একখানা খুব দামী শাড়ি কিনে নিয়ে গেলেন সুতারমোড়া গ্রামে পার্টির নেতা সুধন্বাবাবুর স্ত্রীকে উপহার দেয়ার জন্যে। দুপুর বেলায় যখন আপ্তাবুদ্দীন সাহেব খেতে বসেছেন সুধন্বাবাবু, মোহন চৌধুরীর সঙ্গে, তখন আপ্তাবুদ্দীন সাহেবের চক্ষু তো চড়ক গাছ। সুধন্বাবাবুর স্ত্রী তাঁর উপহার দেয়া সেই মূল্যবান শাড়ি খানা কিনা দু'ভাজ করে একেবারে তিপ্রা মেয়েদের পাছড়ার মতো করে পরে তাঁদেরকে পরিবেশন করেছেন। খাওয়া সেরে আপ্তাবুদ্দীন সাহেব খুব আফসোসের। সুরে মোহন চৌধুরীকে বললেন, "কমরেড মোহন, এটা কিতা করলা কমরেড সুধন্বার বেটী, আমার এমন দামী শাড়িডারে দুই ভাজ কইরা তিপ্রা পাছড়ার মতো পিনধ্যা ফেল্লা, ই আল্লা!"

কিন্তু সুধন্বাবাবুর স্ত্রী এই রোমান্টিক বিবাহিত জীবন মোটেই মসৃণ হয়নি পরবর্তীকালে। উমাকান্ত অ্যাকাডেমিতে শিক্ষকতা করতে করতে তিনি আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যান। ৪৮ সালে সি. পি. আই.

পার্টি বে-আইনী হলে ত্রিপুরাতেও তার জোর ধাক্কা লাগে। পুলিশ-মিলিটারি পাহাড়ের ভেতর ঢুকে কমিউনিস্ট নেতাদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পোড়াতে থাকে। সুধন্বাবাবুর সুতারমোড়া গ্রামের বাড়িটিকেও মিলিটারী এসে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়। আণ্ডার গ্রাউণ্ডে থাকার সময় বনে-জঙ্গলে পালাতে পালাতে কঞ্চির আগা তার বাম চোখে ঢুকে চোখটি চিরকালের মতো নষ্ট করে দেয়। পরবর্তীকালে তাঁর জনশিক্ষা আন্দোলনের সহযোগী ডাঃ নীলমণি দেববর্মা তাঁর চোখ ভালো করার জন্যে কলকাতার মেডিকেল কলেজে দেখান। কিন্তু ডাক্তাররা বলেন, "সুধন্বাবাবু, আমরা খুব দুঃখিত, আপনার এ-চোখ আর ভালো হবে না, বড়ো দেরীতে চোখ দেখাতে এসেছেন আপনি।" কলকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিশেষজ্ঞদের এই কথায় খুব দুঃখ পান সুধন্বাবাবু। ডাঃ নীলমণি দেববর্মা প্রবোধ জানাতে থাকেন তাঁকে।

আণ্ডার গ্রাউণ্ডে থাকার সময় তিনি একবার উদয়পুরের সি. পি. আই. নেতা সুনীল দাশের সঙ্গে কলকাতায় যান কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে কিছু বিশেষ ব্যাপারে আলোচনা করতে। এই সময় তাঁর স্ত্রী শৈলবালা আগরতলায় থাকতেন এক আত্মীয়ের বাড়ি। সেখানে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান তিনি। কলকাতা থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে তিনি বক্সনগরের কাছে কলম চোরা দিয়ে ত্রিপুরায় ঢুকে রামনগরে আমার মামাশ্বশুর নবকুমার দেববর্মা (নবকুমার মাস্টার)র বাড়িতে উপস্থিত হন। তখন নবকুমার মাস্টার তাঁকে তাঁর স্ত্রী বিয়োগের দুঃসংবাদটা দিতেই তিনি একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েন। সুধন্বাবাবুর প্রথম পক্ষের এই স্ত্রীর ঘরে যে মেয়ে হয় তাঁর নাম রেখা। সেই সুদর্শনা মেয়ের বিয়ে হয় ত্রিপুরার রাজপরিবারের শিক্ষক অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পরিবারে।

সুধন্বা দেববর্মা সম্পর্কে একটা মজার গল্প বলেছিলেন তাঁরই জ্যাঠতুতো দাদা সূর্য কুমারের জামাই কমরেড মোহন চৌধুরী। একবার নাকি সুধন্বাবাবু 'জমাতিয়া' উপজাতি এলাকায় মিটিং করতে গেছেন সি. পি. আই. পার্টির। তখন তিনি বাঙলায় বক্তৃতার শুরুতেই জমাতিয়া জনতার দিকে তাকিয়ে তাঁদেরকে সম্বোধন করলেন জমাতিয়া ভাইগণ বলে। ককবরক ভাষায় 'ভ' এই ধ্বনিটি নেই। সুধন্বাবাবু ভালো বাঙলা বলতে পারলেও 'ভ' ধ্বনিটি নাকি উচ্চারণ করতে পারতেন না। 'ভ'-এর জায়গায় 'ব' উচ্চারণ করতেন। কাজেই জমাতিয়া ভাইগণ উচ্চাবণ করতে গিয়ে তিনি উচ্চারণ করে ফেলেন 'জমাতিয়া বাইগণ'। বাইগণ হলো বেগুনের আঞ্চলিক রূপ। জমাতিয়ারা মনে করেন, কমরেড সুধন্বা তাদেরকে জমাতিয়া বেগুন বলে সম্বোধন করেছেন। এরপর তাঁরা অপমানিত বোধ করে মিটিং ছেড়ে চলে যান। আসলে ককবরক ভাষায় বাঙলা বর্ণমালার চতুর্থ ধ্বনিগুলো নেই এবং মূর্ধা-ণ বর্গের ট ঠ ড ঢ ণ ধ্বনিগুলোও অনুপস্থিত। ককবককভাষীরা 'ট' সহজে উচ্চারণ করতে পারেন না - 'ট'কে উচ্চারণ করেন 'ত'। এমনকি ককবরক ভাষী জননায়ক উচ্চশিক্ষিত দশরথ দেববর্মা (ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) ও কমিউনিস্ট পার্টি উচ্চারণ করতে গিয়ে উচ্চারণ করতেন কমিউনিছত্ পারতি। এটা সুধন্বাবাবু বা দশরথবাবুর দোষ নয়। আসলে যে ধ্বনিগুলো তাঁদের মাতৃভাষা ককবরকে নেই, সেগুলো তাঁরা উচ্চারণ করতে পারতেন না। আমি একবার দিল্লীতে মোঙ্গলীয়ার দূতাবাসে একটা সেমিনারে গিয়েছিলাম সি. পি. আই.-এর হেড কোয়ার্টার অজয় ভবন থেকে কমরেড প্রতুল লাহিড়ীর সঙ্গে। মোঙ্গলীয়া দূতাবাসের মোঙ্গলীয় কূটনীতিকরা ইংরিজিতে যে বক্তৃতা করলেন, তা শুনতে শুনতে বুঝলাম তাঁরা ইংরেজী T উচ্চারণ করতে পারছেন না, T কে উচ্চারণ করছেন 'তি'। তা থেকে আমার মনে হলো চীনা-তিব্বতী ভাষাবংশের অনেক ভাষায় T ধ্বনিটি নেই, যেমন হয়েছে ত্রিপুরার ককবরক ভাষায় ক্ষেত্রে।

কমরেড সুধন্বা দেববর্মা জনসভার বক্তৃতায় খুব ভালো জমাতে পারতেন না। কিন্তু ঘরোয়া মিটিঙে

তিনি অসাধ্য সাধন করতে পারতেন। পার্টির কোথাও সমস্যা দেখা দিলে তিনি সেখানে চুপিচুপি ঢুকে পড়তেন এবং ঘরোয়া মিটিং করে সেইসব সমস্যা সমাধান করে দিতেন। এমনিতে তিনি খুবই ধীরস্থির ব্যক্তি ছিলেন, খুব চুপচাপ থাকতে ভালোবাসতেন। তাঁর এই চুপচাপ স্বভাবের জন্যে তাঁকে ককবরক ভাষীরা নাম দিয়েছিলো 'গঙ'। ককবরক ভাষায় যার অর্থ হলো ভল্লুক। এটা ছিলো তাঁর ছদ্মনাম। এই নামেই তাঁকে জায়গা বিশেষে ডাকা হতো। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় কমরেড দশরথ দেববর্মার নাম ছিলো 'লাম্‌পূরা' - অর্থ দেবতা বিশেষ কমরেড অঘোব দেববর্মার ছদ্মনাম 'খিচ্‌লাঙ' অর্থ পাছা। অঘোর দেববর্মার পাছা খুব বড়ো, তাই ককবরক ভাষীরা তাঁর এরকম ছদ্মনাম দিয়েছেন। এবার সুধন্বা দেববর্মার কমিউনিস্ট জীবনের দুটো ঘটনার কথা উল্লেখ করবো। প্রথম ঘটনাটা এরকম ঃ একবার সি. পি. আই. নেতা কমরেড ডাঙ্গে ত্রিপুরায় এসে খয়েরপুরে বক্তৃতা করছেন। কমরেড ডাঙ্গের মিটিং বলে পাহাড়ের উপজাতিরা হাজারে হাজারে জমা হয়েছেন ওই মিটিঙে। ত্রিপুরা সরকারের পুলিশ-গোয়েন্দারাও তৎপর। মিটিং শেষ হতে হতে অন্ধকার হয়ে গেছে। এমন সময় শান্তিসেনার জঙ্গী লোকেরা একজন সাদাপোষাকের গোয়েন্দাকে চিনে ফেলে তাঁকে চোখ বেঁধে একেবাবে উপজাতি এলাকার এক নির্জন বাড়িতে নিয়ে গেছে। খুব সকালে সেই গোয়েন্দা অফিসার পাশের ঘর থেকে তাঁর উমাকান্ত স্কুলের শিক্ষক সুধন্বা দেববর্মার গলা শুনতে পেয়ে শান্তিসেনার কর্মীদের বললেন, "পাশের ঘরে আমার মাস্টার মশায় কথা বলছেন, আপনারা দয়া করে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন, তিনি আমাকে চিনবেন, যে বিচার হয় তিনি কোরবেন।" গোযেন্দা অফিসারের কথামতো তাঁকে সুধন্বাবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সুধন্বাবাবুকে দেখেই তিনি তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললেন, "স্যার আপনি আমাকে বাঁচান।" তখন সুধন্বাবাবুর পবনে জলপাই রঙের মিলিটারির ড্রেস। তিনি তাঁর পুরনো ছাত্রকে চিনতে পারলেন। তাবপর শান্তিসেনার কর্মীদের আদেশ দিলেন তাঁকে একটা নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দিতে। সুধন্বা দেববর্মার আদেশ পেয়ে শান্তিসেনার জঙ্গী কর্মীরা আবার তাঁর চোখ বেঁধে পাকা সড়কের কাছাকাছি একটা জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আসে। সেখান থেকে গোয়েন্দা অফিসার সড়কে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। তিনি পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষকের এই মহানুভাবতার কথা আমাকে বলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি সুধন্বা দেববর্মার জীবনে এক বেদনাবিধুব ঘটনা। যে বেদনা তাঁকে সারা জীবন কুরে কুরে খেয়েছে। ঘটনাটা এইরকম। তখন কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী। পাহাড়ের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির একচ্ছত্র অধিকার। সেখান থেকে সরকার কোনো খবরই আনতে পারেন না। কিন্তু সরকাবও বসে নেই। অনেক টাকা -পয়সা খরচ করে ককবরক ভাষীদের ভেতর থেকেই 'ইনফরমার' সৃষ্টি করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টি একথা জানতে পেরে সরকারের ট্রাইবেল ইনফরমারদের ডাইনী খোঁজা খুঁজতে থাকে। পাহাড়ের মধ্যে তখন ঘরে ঘরে সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। কাউকে একটু সন্দেহ হলেই গণমুক্তি পরিষদও শান্তিসেনার কর্মীরা তাকে ধরে নিয়ে কমিউনিস্ট ঘাঁটিতে নিয়ে যেতো বিচারের জন্যে। যার যেমন দোষ তেমনি বিচার হতো। একবার সুধন্বা দেববর্মার শ্বশুরমশায় উয়াখিরাই ঠাকুরের নাতি এবং সুধন্বাবাবুর সম্পর্কে ভগ্নীপতি খগেন্দ্র দেববর্মাকে সরকারী ইনফরমার বলে চিহ্নিত করা হলো। খগেন্দ্রবাবু তখনকার সময় আই. এ পা শ। থাকতেন তাঁর শ্বশুরবাড়ি সুতারমোড়া গ্রামে। আর চাকরি করতেন চড়িলাম স্কুলে। একদিন তিনি চড়িলাম স্কুল থেকে যখন তাঁর শ্বশুরবাড়ি সুতারমোড়ায় ফিরছিলেন, তখন গণমুক্তি পরিষদের জঙ্গী কর্মীরা তাঁকে চোখমুখ বেঁধে ধরে নিয়ে আমার শ্বশুরবাড়ি হেরমা গ্রামে নিয়ে যায়। আমার দাদা শ্বশুর গৌরচাঁদ ঠাকুরের বাড়িতে তখন সন্দেহভাজন লোকদের নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানে কমিউনিস্ট নেতাদের কেউনা কেউ তখন থাকতেন। খগেন্দ্র দেববর্মাকে যে রাত্রে আমার শ্বশুরবাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন সেখানে সুধন্বা দেববর্মা ছিলেন। আমার দিদিশাশুড়ী

(গৌরচাঁন ঠাকুরের স্ত্রী) শশরাণী সম্পর্কে খগেন্দ্র দেববর্মার বৌদি। তখন খগেন্দ্রবাবু তাঁর বৌদির পা জড়িয়ে ধরে বলেন, "বাচ্রূই, আন' মুথাঙদি, বরগ আন' বুথারূইখিবনাই, (বৌদি, আমাকে বাঁচাও, তারা আমাকে মেরে ফেলবে)। খগেন্দ্রবাবুর এই অবস্থা দেখে আমার দিদিশাশুড়ী সম্পর্কে তাঁর ছোটভাই সুধন্বা দেববর্মাকে আলাদা ঘরে ডেকে নিয়ে যাতে তাঁর জীবনহানি না হয়, সেই সম্পর্কে অনুরোধ করেন। সুধন্বাবাবু তখন তাঁর দিদিকে বলেন, "বাই তা উআনাদি, চৃঙ খগেন্দ্র ন' ককরগ ছূঙগূই ফিয়গূইরূনাই" (দিদি তুমি চিন্তা কোরো না, আমরা খগেন্দ্রকে কিছু কথাবার্তা জিজ্ঞেস করে ছেড়ে দেবো)। কিন্তু সুধন্বা বাবু তাঁর দিদির অনুরোধ রাখতে পারেননি। খগেন্দ্র দেববর্মা স্বল্প শিক্ষিত উপজাতি সমাজে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি বলে তৎক্ষণাৎ তাঁর বিচার করা সম্ভব হয়নি। পরে তাঁকে খোয়াইয়ের কমিউনিস্ট ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। শোনা যায়, সেখানে তৎকালীন সি. পি. আই.-এর ট্রাইবাল সুপ্রিমোর নির্দেশে হতভাগ্য খগেন্দ্র দেববর্মা পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যান।

এই ঘটনার জন্যে সুধন্বাবাবুকে তাঁর সম্পর্কিত বোনের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। খগেন্দ্রবাবু আর কোনো দিন তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে আসেননি। কিন্তু সুধন্বা বাবুর এই বোন সিঁথের সিঁদুর মোছেননি, হাতের শাঁখাও ভাঙেননি। আমি ১৯৭০ সালে যখন হেরমায় বিয়ে করে সুধন্বা দেববর্মা ও কমরেড মোহন চৌধুরীর বাড়িতে আমরা স্বামী-স্ত্রীতে বেড়াতে যাই, তখন কৌতূহলবশতঃ আমি আমার স্ত্রী ফুলকুমারীকে নিয়ে খগেন্দ্র দেববর্মার স্ত্রীর বাড়িতে বেড়াতে যাই। খগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী আমার শ্বশুর বাড়ির দিক থেকে আত্মীয়া। আমরা খগেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর কপালে সিঁদুর ও হাতে শাখা দেখি। আর দেখি খগেন্দ্রবাবুর বিবাহযোগ্যা মেয়ে সুদর্শনা কল্পনাকে। খুব সপ্রতিভ ছিলো সে।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবর্ষে আগরতলায় ককবরক ভাষায় রবীন্দ্র রচনা অনুবাদের জন্যে একটা কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটিতে ছিলেন শ্রীযুক্ত অজিত বন্ধু দেববর্মা, এ্যাডভাইজার জিতেন ঠাকুর, গায়ক মহেন্দ্র দেববর্মা ও সুধন্বা দেববর্মা। লেখক সুদন্বাবাবু ককবরক ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক অমিতাক্ষর ছন্দে অনুবাদ করেন, আর মহেন্দ্র দেববর্মা অনুবাদ করেন রবীন্দ্র সংগীত।

১লা জুন, ১৯৯৯, মঙ্গলবার। আজ সকাল ৯ টায় সি.পি.আই নেতা অঘোর দেববর্মার বাড়ি গেলাম। গিয়ে দেখি কমরেড ধর্মরায় দেববর্মা ও কমরেড লোরা মগ অপেক্ষা করছেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হলো-- সি.পি.আই নেতা এ.বি. বর্ধন, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত এবং আসামের কমরেড প্রমোদ গগৈইকে চিঠি পাঠানো হবে, যাতে তারা ত্রিপুরা পার্টির রাজ্য সম্মেলন করার জন্যে জরুরী পদক্ষেপ নেন।

১২ই জুন, ১৯৯৯, শনিবার। আজ আগরতলা থেকে মেডিকেল চেকআপএর জন্যে কলকাতায় এসেছি। উঠেছি ১১৫ এ, বালিগঞ্জ গার্ডেনস-এ বন্ধুবর স্বপন বসুর বাড়ি। এসে স্বপনের দিদি টিয়াদিকে দেখে প্রণাম করলাম। স্বপনের স্ত্রী-আমার বৌমার শরীরটা বেশ খারাপ দেখলাম। তবে বন্ধুবরের মেয়ে চিনির শরীর বেশ ভালই আছে। স্বপনের ভাগ্নী চুমকি, যে এয়ারলান্স কর্পোরেশনে কাজ করে, তাকেও পেলাম। আমার আনা ত্রিপুরার আনারস কাটা হলো। আনারসের প্রশংসা করলো সবাই। বিকেলে সরস্বতীদি (সরস্বতী মিশ্র) এলেন। অনেক কথা হলো।

১৩ই জুন, ১৯৯৯, রবিবার। সকালে উঠে ঢাকুরিয়ালেকে প্রাতর্ভ্রমণ করলাম। বৌমা ভোর পাঁচটায় গেট খুলে দিলেন। লেকে দেখলাম গতবারের মতো কচুরীপানা নেই। প্রাতর্ভ্রমণকারীরা বিশ্বকাপে ক্রিকেট খেলায় ভারতের পরাজয় নিয়ে আলোচনা করছেন।

সকাল ৯টায় বন্ধুবর স্বপনের কথামতো আমাদের কলেজ জীবনের শিক্ষক অধ্যাপক অরুণ বসুর ঢাকুরিয়ার ফ্লাটে গিয়ে একটা ত্রিপুরার আনারস ও আমার 'ককবরক ভাষা ও সাহিত্য' বই খানা দিয়ে

প্রণাম করলাম। তিনি আমার ছেলের পুণা গিয়ে লিঙ্গুয়িস্টিকস্ নিয়ে পড়ার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। স্যারের বাড়ি থেকে এলাম নববারাকপুরে দাদাদের বাড়ি এবং বিকেলে বারাসতে ছোটদির বাড়ি গেলাম।

১৪ই জুন, ১৯৯৯, সোমবার, বারাসত। সকালে উঠে বারাসতের ব্যারাকপুর রোড হয়ে পান্নাঝিলের পাশ দিয়ে প্রাতর্ভ্রমণ করে কল্যাণী রোড পেরিয়ে লালি সিনেমার পাশ দিয়ে ছোটদিদির বাড়ি এলাম। তারপর দুপুরে খেয়ে বেলা ২.৩০-এ বালিগঞ্জে বন্ধুবর স্বপন বসুর বাড়ি এলাম। তারপর বিকেলে ৫, হিন্দুস্থান পার্কে ডাঃ দিলীপ কুমার পাহাড়ীকে দেখাতে গেলাম। ডাঃ পাহাড়ী প্রেসার দেখলেন। উপরের প্রেসার ১৩৯ এবং নিচেরটা ৭৬। অনেকগুলি পরীক্ষা করতে বললেন তিনি ডানকানগ্লিনইগেলস্ থেকে।

১৫ই জুন, ১৯৯৯, মঙ্গলবার। সকালে উঠে ঢাকুরিয়া লেকে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ডানকানে গেলাম। আগামী বুধবার সকালে রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা করবো। লাগবে ৬২৫ টাকা। আজ দুপুরে বেরিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযে গিয়ে ডিপার্টমেন্ট অফ লিঙ্গুয়িস্টিকস্-এর প্রধান অধ্যাপক কিশোর রায়ের সঙ্গে দেখা করে পুত্র সুরঞ্জনের লিঙ্গুয়িস্টিকস্ পড়া নিয়ে আলোচনা করলাম। তারপর বেরিয়ে ৬০ পটুয়াটোলা লেনে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অফিসে গিয়ে সুধীত চ্যাটার্জী, স্বপন মুখার্জী এবং রাজশ্রী বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করলাম এবং ত্রিপুরায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা হলো। আমি তাঁদের উদয়পুরের সাক্ষরতা স্কুল সম্পর্কে হালফিল খবর দিলাম।

১৬ই জুন, ১৯৯৯, বুধবার। সকালে ডানকানগ্লিনইগেলস্-এ গিয়ে রক্ত দিলাম। বিকেলে গিয়ে রিপোর্ট নিলাম। রিপোর্টে দেখা গেল, অন্যসব নর্মাল আছে। তবে ক্রিয়াটিনিন বেড়ে ২ হয়েছে। আর, ইউরিক অ্যাসিড ৭.২। রিপোর্ট নিয়ে ডাঃ পাহাড়ীর চেম্বারে গেলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি ডাঃ পাহাড়ীর চেম্বার বন্ধ হয়ে গেছে। রাতে আগরতলা থেকে পুত্র সুরঞ্জন ফোন করেছিল।

১৭ই জুন, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার। ভোর ৪.৩০ উঠে মর্ণিং ওয়ার্ক করতে করতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসেবা পরিষদ অফিসে গেলাম। গিয়ে দেখি অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী তখনো ওঠেননি। তাই ফিরে এলাম। সকাল ৯টায় আবার গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে অধ্যাপক অরুণোদয় সাহার নিখোঁজ ছেলে দেবর্ষির ব্যাপারে খোঁজখবর নিলাম। আজ সমীরণ রায় আগরতলা থেকে দেবর্ষির মা অধ্যাপিকা মঞ্জরী চৌধুরীকে নিয়ে কলকাতায় আসছেন। দুপুরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেয়ে অধ্যাপক কিশোর রায় ও অধ্যাপক অভিজিৎ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করে পুত্র সুরঞ্জনের পুণায় গিয়ে লিঙ্গুয়িস্টিকস্ পড়ার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলাম। সন্ধ্যে বেলায় গেলাম ডাঃ পাহাড়ীর কাছে। তিনি আমাকে জায়লোরিক ট্যাবলেট খেতে বললেন ইউরিক অ্যাসিড কমানোর জন্য

১৮ই জুন, ১৯৯৯, শুক্রবার। সকালে রবীন্দ্র সরোবরে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে গড়িয়াহাট মোড় থেকে খবরের কাগজ এনে বন্ধুবর স্বপনের ডেরায় ফিরলাম। সকাল ৯টায় বেরিয়ে গেলাম ত্রিপুরা ভবনে প্লেনের টিকিটের জন্যে। ত্রিপুরা ভবনের জয়েন্ট রেসিডেন্ট কমিশনার টি কে চাকমা আমাকে ২৩-৬-৯৯ তারিখে টিকিটের ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানে নবনির্মিত ভবনে সমীরণ রায়ের সঙ্গে দেখা হলো ২০৫ নং রুমে। সেখানে এলেন অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা। তিনি ছেলের খোঁজে সমীরণ ও জনসেবা পরিষদের কর্মী বাপীকে নিয়ে ভবনীভবনে চলে গেলেন। আমি ফিরে এলাম বালীগঞ্জে। বিকেলে ঢাকুরিয়ায় চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ প্রণব চক্রবর্তীকে চোখ দেখাতে গেলাম। তারপর সেখান থেকে গেলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসেবা পরিষদ অফিসে।

২১শে জুন, ১৯৯৯, সোমবার। কাকভোরে উঠে রবীন্দ্রসরোবরে প্রাতর্ভ্রমণ করলাম। তারপর

ফিরে এলাম স্বপনের বাড়ি। সকাল ৯টায় বেরিয়ে পড়লাম সাক্ষরতা কর্মী পার্থ সেনগুপ্তর ২১৬ নং বিবেকানন্দ রোডের বিশ্বকোষ পরিষদ অফিসে। সেখানে বিশ্বকোষের ত্রিপুরা অধ্যায় নিয়ে আলোচনা হলো। আলোচনার সময় বন্ধুবর সব্যসাচী চক্রবর্তী ও সোমা চক্রবর্তী ছিলেন। সেখান থেকে বিরেয়ে এলাম ত্রিপুরা ভবনে প্লেনের টিকিটের জন্যে। চাকমা সাহেব বললেন, আগামীকাল টিকিট পাওয়া যাবে। বালীগঞ্জে বিকেলে ফিরে দেখি স্বপনের বাড়িতে সরস্বতী মিশ্র এসেছেন। আমাকে ৬০ টাকা দিলেন আম, কলা ও মিষ্টির জন্যে। তারপর বিদায় নিলেন ৭.৪০ মিনিটে।

২২শে জুন, ১৯৯৯, মঙ্গলবার । সকালে উঠে যথারীতি ঢাকুরিয়া লেকে প্রাতর্ভ্রমণে গেলাম। তারপর বাড়ি ফিরে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে গেলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসেবা পরিষদের অফিসে। দুপুরে গেলাম ত্রিপুরা ভবনে টিকিট নিতে। সেখান থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম অধ্যাপক কিশোর রাঢ়ীর সঙ্গে দেখা করতে। তারপর সেখান থেকে গেলাম শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের 'ক্যাম্পের' বই এর দোকানে। ক্যাম্পে অক্ষর প্রকাশনীর বই আছে। জানতে পারলাম আমার 'ককবরক ভাষা ও সাহিত্য' বই খানা কলকাতার পণ্ডিত ব্যক্তিরা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলাম কফি হাউসে। সেখানে বন্ধুবর আফিফ ফুয়াদের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁকে আগরতলার লেখক দেবব্রত দেব সম্পাদিত মুখাবয়েবের কয়েকটি কপি দিলাম। কফি হাউস থেকে বেরিয়ে এলাম ৬০ পটুয়াটোলা লেনের All India Council for Mass education and Development Office-এ।

২৩শে জুন, ১৯৯৯, বুধবার । আই. সি.-৭৪৩ বিমানে দুপুরে ১১টায় আগরতলায় যাবো। সকালে উঠে দেখি টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তাই প্রাতর্ভ্রমণে গেলাম না। স্বপনের বাড়িতেই হাল্কা ব্যায়াম করলাম। এর মধ্যে বৌমা উঠে গেছেন। আমাকে সব গুছিয়ে নিতে বললেন। আমিও তৈরী হলাম। স্নান সারার পর যশোদাদি জল খাবার দিলেন। জল খাবার খেয়ে প্রেসারের ওষুধ খেলাম। এরমধ্যে চিনিও উঠে গেছে। আমি কাঁকুলিয়া মোড় থেকে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এলাম। এবার বিদায়ের পালা। বীণা ও যশোদাদিকে পাঁচ টাকা করে বকশিস দিলাম। তারপর বৌমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্টে গুপ্তবাবুর ছেলে ভেল্টু নব ব্যারাকপুর থেকে এসে দুটো আমের প্যাকেট দিলো। এর মধ্যে অধ্যাপক সিরাজুদ্দীন আমেদের শ্যালিকা মিঠু এক প্যাকেট আম ও প্রশান্ত পালের নয় খণ্ড রবীন্দ্র জীবনীর প্যাকেট দিয়ে গেলো। আমি এই সব নিয়ে ১১টার প্লেনে আগরতলায় চলে এলাম। এয়ারপোর্টে নেমে দেখি পুত্র সুরঞ্জন আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

৩০শে জুন, ১৯৯৯, বুধবার । আমার পুত্র শ্রীমান সুরঞ্জন আই. সি.- ৭৪৪ বিমানে আগরতলা থেকে কলকাতায় রওনা হয়ে গেছে। সেখান থেকে সে পুণায় যাবে ডেকান কলেজে ডিপার্টমেন্ট অফ লিঙ্গুয়িস্টিকস্-এ ভর্তি হওয়ার জন্যে। সেখান লিঙ্গুয়িস্টিকস্ ডিপার্টমেন্টের প্রধান Dr. R V. DHONGDE তাঁকে M.A. in linguistics-এ ভর্তি করে নেয়ার ব্যাপারে চিঠি লিখেছেন ২৬-৫-৯৯ তারিখে। এই চিঠি অনুযায়ী সেই পুণায় যাচ্ছে। কলকাতায় গিয়ে রাত্রে সে আমার গৃহস্বামী ধ্রুব কর্তাকে টেলিফোনে তার কলকাতায় পৌঁছানোর খবর জানায়। সে কলকাতায় আমার বন্ধু স্বপন বসুর ১১৫-এ বালীগঞ্জ গার্ডেন্সের বাড়ি উঠেছে। সেখান থেকে ট্রেনের টিকিট কেটে দু'এক দিনের মধ্যে পুণায় চলে যাবে।

১লা জুলাই, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার । আজ সকালে আগরতলার টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে পুণার Deccan College-এর Linguistics Department -&' Head Dr. R.V. DHONGDE কে টেলিগ্রাম করে আমার পুত্রের পুণায় রওনা হয়ে যাওয়ার কথা জানালাম। Urgent Telegram-এর জন্যে খরচ হলো ৩৮ টাকা। Telegram-এর Serial No. 117232. Telegram No. A30 Booked

at 0845, Pune.

৪ঠা আগষ্ট, ১৯৯৯, বুধবার । সকালে ছোট মেয়ে দেবযানীকে নিয়ে ধলেশ্বরে ডাঃ সঞ্জয় নাথের চেম্বারে গিয়ে পরীক্ষা করার জন্যে রক্ত দিলাম আমি। সোডিয়াম, পটাসিয়াম আমার কম। তাই এই পরীক্ষা। আবার সঙ্গে কিডনীরও সমস্যা আছে। তাই ক্রিয়াটিনিনের পরীক্ষারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বাসায় ফিরে দেখি বন্ধুবর বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন তাঁর ভাগ্নে কে বি জমাতিয়া (ডেপুটি রেজিস্ট্রার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়)'র কোয়ার্টারে যাবেন বলে। আমার পুত্র সুরঞ্জন তাঁর সঙ্গে গেলো। দুপুরে খাওয়ার পর ককবরক অভিধানের কিছু কাজ করলাম। বিকেলে গেলাম ডঃ কমল কুমার সিনহার বাড়ি। সেখান থেকে এডিসি-র প্রাক্তন প্রধান কার্যকারী সদস্য হরিনাথ দেববর্মার বাড়ি ঢুকলাম। সেখানে এডিসি-র প্রাক্তন সদস্য শ্রীদাম দেববর্মা ও দেবব্রত কলই-এর সঙ্গে দেখা হলো। হরিনাথবাবু ও শ্রীদামবাবুর সঙ্গে সুতারমোড়া ও মরগাঙ বাড়ির পুরনো দিনের অনেক কথা আলোচনা হলো।

৬ই আগষ্ট, ১৯৯৯, শুক্রবার । ভোর পাঁচটায় উঠে ১নং এম. এল এল হোষ্টেলে পায়ে হেঁটে গিয়ে বন্ধুবর নগেন্দ্র জমাতিয়ার কোয়ার্টারে গেলাম। সেখানে এলেন বিধায়ক রতিমোহন জমাতিয়া ও ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা। তাঁরা দিল্লী যাওয়ার ব্যাপারে টাকা-পয়সা নিয়ে আলোচনা করলেন। সেখানে রিয়াংদেব ভাষা নিয়েও আলোচনা হলো। রিয়াংরা ককববকভাষী নন বলে দাবী করছেন। তাঁদের ভাষা নাকি কাও ব্রু। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্যে নগেন্দ্রবাবু একটা সেমিনার করবেন বললেন। দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। ফিরে ককবরক অভিধানের কিছু কাজ করলাম।

৭ই আগষ্ট, ১৯৯৯, শনিবার । সকালে উঠে আস্তাবল মাঠে খালি পায়ে ঘাসের ওপর আধঘন্টা হাঁটলাম এবং খালি হাতে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করলাম। তারপর বাসায় ফিরে দুধের কার্ড নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কর্ণেল চৌমুহনীতে। সেখান থেকে গেলাম দৈনিক সংবাদ অফিসে পত্রিকা নিতে। সেখান থেকে এলাম ত্রিপুরা দর্পণে। দুধ ও দুখানা প্রভাতী পত্রিকা বগলদাবা করে বাসায় ফিরলাম। তারপর রওনা হলাম ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার এ্যাডভাইজার চৌমুহনীর প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে রক্ত পরীক্ষার জন্যে। পথে কৃষ্ণায়নের সামনে শ্রীমতী করবী দেববর্মণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। একটা বাহারী ছাতা মাথায় দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন তাঁর ছোট ভাই অশেষ দেববর্মণের প্যালেস কম্পাউণ্ডের বাড়িতে। বাড়ি ফিরে প্রেসারের ওষুধ খেলাম। এর মধ্যে আমার ছোট শালা বিমল আস্তাবল বাজার থেকে ইলিশ মাছ নিয়ে এলো। সারাদিন ককবরক অভিধানের কাজ করলাম। বিকেলে গেলাম বনমালীপুরে সি. পি. আই. নেতা অঘোর দেববর্মার বাসভবনে। তিনি ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের অনেক তথ্য দিলেন আমাকে।

৮ই আগষ্ট, ১৯৯৯, রবিবার । সকালে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে কর্ণেল চৌমুহনীতে যেতেই ত্রিপুরা যুব সমিতির এককালের ডাকসাইটে নেতা দিবাচন্দ্র রাঙ্খলের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি ভাষা কমিশনের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমি বললাম, 'আমিতো ছেড়ে দিয়েছি। সরকার সহযোগিতা করলো না এতটুকু। কোনো বাজেটও করতে পারিনি আমি ভাষা কমিশনের। ভাষা কমিশনের মর্যাদা সরকার দিতে পারেননি। কাজেই আমার আর কী করার আছে'? তিনি বললেন, ' সরকারের কাছে আপনার দেওয়া রিপোর্ট আমাকে দেবেন। আমি দিল্লী নিয়ে যাবো।' আরো বললেন, মিজোভাষা ও কাইপেঙ, মরছুম ও রাঙ্খল ভাষা এক নয়, এটা একটু ভেবে দেখবেন। আজ শ্বশারবাড়ি হেরমা

থেকে আমার শাশুড়ীমা, ছোট শালী ছায়ারাণী ও ভায়রাভাই কৃষ্ণকান্ত এসেছে।

৯ই আগষ্ট, ১৯৯৯, সোমবার । আজ সকালে গাঙঠাকুরপাড়ার আমার পিসিশাশুড়ী ভারতী ও পিসে শ্বশুর আমার বড় মেয়ে তানিয়ার বিয়ের ব্যাপারে খবর নিয়ে এলেন। ছেলে মোহরছড়ার তরুণ দেববর্মা, টি সি এস অফিসার, টাকারজলা- জম্পুইজলা ব্লকের এডিশানাল বিডিও। আমার শাশুড়ী, শালী ও ভায়রাভাই এই সময় উপস্থিত ছিলেন। ঠিক হলো, আমার স্ত্রী ফুলকুমারী আগামী শুক্রবারে গাঙঠাকুর পাড়ায় যাবেন ছেলে দেখতে।

১০ই আগষ্ট, ১৯৯৯, মঙ্গলবার । আজ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ককবরক মার্কশিট' তৈরীর জন্যে কম্পিউটার সেকশনে গিয়ে শক্তি দেববর্মার সঙ্গে দেখা করে যথা কর্তব্য করলাম। একটার সময় ফিরে কবি নন্দকুমার দেববর্মার কর্ণেল বাড়ির বাসায় গেলাম। সেখান থেকে তাঁর সঙ্গে অরুন্ধতীনগরে কবি বন্ধু আশিস দাসের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিলাম। অরুন্ধতীনগর স্কুলের টেম্পো স্ট্যাণ্ডে দেখি শ্রীযুক্ত রামলাল দত্ত অতিথিদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। শ্রাদ্ধ বাসরে শ্রীমতী অপরাজিতা রায়, টগর ভট্টাচার্য, কবি নীলমণি দত্ত, কবি বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী, ওয়াঙ্খেল বীরমঙ্গল প্রমুখের সঙ্গে দেখা হলো। বাসায় ফিরে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম, তারপর ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসা।

১১ই আগষ্ট, ১৯৯৯, বুধবার । আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইনি। বাড়ি বসে ককবরক অভিধানের কাজ করলাম। শরীব ভালো যাচ্ছে না। কিডনির ক্রিয়াটিনিন পরীক্ষার ফল .৫ বেশী। পেচ্ছাব করতে জ্বালা-পোড়া করছে, পেচ্ছাব বেরোতেও দেরী হচ্ছে। আমার আগরতলার ডাক্তার অতনু ঘোষ (ডিম সাগর) বলেছেন, আমার পিজির ডাক্তার ডি কে পাহাড়ীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে। রাত ১০.৩০-এর সময় পুত্র সুরঞ্জন বাসায় ফিবলো। গা দিয়ে তাব 'খুশবু' বেরোচ্ছিল।

১২ই আগষ্ট, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার । বিশ্ববিদ্যালযে গিয়ে শুনলাম উপাচার্য অধ্যাপক অজিত কুমার চক্রবর্তী আমাকে দেখা করতে বলেছেন। ফ্যাকাল্টি সেক্রেটারী মনোমোহন রিয়াং ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার কে বি জমাতিয়ার সঙ্গে উপাচার্যের কাছে গেলাম। উপাচার্য মহোদয় ককবরক সার্টিফিকেট কোর্স তিন মাসের পরিবর্তে ৬ মাসের কবতে বললেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন মাসের কোর্স চালু আছে। বললেন, আগামী সিন্ডিকেট মিটিঙে বিষয়টি উঠবে, কাজেই তাব আগে সিলেবাস মডিফিকেশান করার দরকার এবং কোর্সের একটা স্ট্যাটিউট করতে হবে। বললেন, অ্যাসিস্টেন্ট কন্ট্রোলার নরেন্দু ভট্টাচার্য এ বিষয়ে সাহায্য কববেন।

১৩ই আগষ্ট, ১৯৯৯, শুক্রবার । আজ আমার স্ত্রী ফুলকুমারী দেববর্মার টাকারজলার কাছে গাঙঠাকুর পাড়ায় যাওয়ার কথা ছিল আমার বড় মেয়ে তানিয়ার বিয়েব ব্যাপারে ছেলের দেখার জন্যে। কিন্তু গতকাল টাকারজলার দিকে বৈরী সন্ত্রাস হওয়ায় এবং স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বৈরী হামলা হতে পারে ভেবে তিনি আর গাঙঠাকুর পাড়া গেলেন না। আমার পিসি শাশুড়ীর মেয়ে সোমার হাতে পিসি শাশুড়ীর পৌত্রের বার্থ-ডে'তে থালা, গ্লাস পাঠিয়ে দিলেন আর আমাব লেখা একখানা ককবরক ভাষা ও সাহিত্য বইও দিয়ে দিলেন।

১৪ই আগষ্ট, ১৯৯৯, শনিবার । সকাল ৯টায় চিত্র পরিচালক দীপক ভট্টাচার্যের 'কৃষ্ণায়ন' বাসভবনে গেলাম। তিনি ত্রিপুরার 'ঊনকোটী'র ওপর একটা ডকুমেন্টারী করবেন। তাই তাকে উপজাতি-অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত মানিক মজুমদার মহোদয়ের কাছে নিয়ে গেলাম। আমরা তাঁর বাড়িতে ৩ ঘন্টার মতো ছিলাম। ঊনকোটী সম্পর্কে অনেক তথ্য দিলেন মানিকবাবু।

বিকেলে গেলাম বনমালীপুর অঘোর দেববর্মার বাড়ি দশরথবাবুর মুক্তি পরিষদের ইতিকথা বইখানি নিয়ে।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৯৯, রবিবার । আজ ৫২তম স্বাধীনতা দিবস। আমার বাসা (ধ্রুব কর্তার বাড়ি)-র পাশ দিয়ে বড় একটা কুচকাওয়াচের মিছিল গেল। একটু পরে আমি গেলাম আমার আগের বাসার মালিক দিলীপ দেবরায়কে হাওলাতি ১০০০ টাকা পরিশোধ করতে। তিনি হার্ট অপারেশনের জন্যে ব্যাঙ্গালোরে যাচ্ছেন। আজ বেশীর ভাগ সময় ককবরক অভিধানের কাজ করলাম। সন্ধ্যে বেলা বেরিয়ে প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত পরশুরাম দেববর্মার বাড়িতে গিয়ে ৩ ঘন্টা কাটালাম। সেখানে পেলাম প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত সাধন চৌধুরী মশায়কে। তখন সেখানে আগরতলার ঠাকুর-কর্তা পরিবার নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। কথায় কথায় তিনি বললেন মহারাজ বীরবিক্রমের খুব পেয়ারের মানুষ ছিলেন যোগেন্দ্র ক্যাপ্টেন।

১৬ই আগষ্ট, ১৯৯৯, সোমবার । প্রাতর্ভ্রমণ সেরে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম। ১০টায় স্ত্রী ফুলকুমারী দেববর্মার সঙ্গে একই রিক্সায় বিশ্ববিদ্যালয়ে রওনা হলাম। তিনি 'পূর্বাশা'য় নেমে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সেক্রেটারী- বিল্ডিং-এ অ্যাডমিশান সেকশানে সুজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে ককবরক মার্কশিটের ব্যাপারে আলোচনা করে গেলাম এম. বি. বি. কলেজের ডঃ শঙ্কর বসুর কাছে। তাঁর কাছ থেকে অধ্যাপক অরুণ বসুর সম্বর্ধনার ব্যাপারে ১০০ টাকা নিলাম। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি কন্ট্রোলার মিঃ দার্লং-এ কাছে চিত্র পরিচালক দীপক ভট্টাচার্যকে নিয়ে গিয়ে ঊনকোটী সম্পর্কে আলোচনা করলাম। মিঃ এল ডার্লঙের বাড়ি ঊনকোটি পাহাড়ের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরলাম অধ্যাপক বন্ধু অমিতাভ সিনহার সঙ্গে।

রাত ৮টায় এলেন এম. এল. এ নগেন্দ্র জমাতিয়া। তাঁকে নিয়ে গেলাম ভি. এম হাসপাতালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মিঃ কে বি জমাতিয়ার মেয়েকে দেখতে। কে বি জমাতিয়া (কল্যাণবিজয় জমাতিয়া) নগেন্দ্র জমাতিয়ার ভাগ্নে। তারপর ৯টার সময় বাসায় ফিরে আবার ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম।

১৭ই আগষ্ট, ১৯৯৯, মঙ্গলবার । সারাদিনই বাসায় বসে ককবরক অভিধানের কাজ করলাম। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইনি ।

১৮ই আগষ্ট, ১৯৯৯, বুধবার । প্রাতর্ভ্রমণ সেরে বাসায় ফিরে ককবরক অভিধানের কাজে বসলাম । ১০ টার সময় স্ত্রীর সঙ্গে একই রিক্সায় বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম । বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ডঃ সিরাজুদ্দিন আমেদের বাসায় গেলাম । দুজনে মিলে Kokborok Certificate Course-এর Syllabus modification করলাম । দুপুরে বাসায় ফিবে খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম । সন্ধ্যের সময় গেলাম ডঃ কমলকুমার সিংহর বাড়ি । সেখানে শ্রীমতী সিনহার কাছে কমল বাবুর জামিনের খবর জিজ্ঞাসাবাদ কললাম । রাত ৮.৩০ এ স্ত্রীকে নিয়ে গেলাম ডাঃ অতুনু ঘোষের কাছে ।

১৯শে আগষ্ট, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার । আজ প্রাতর্ভ্রমণ সেরে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম । দশটায় পুত্রকে পাঠালাম অধ্যাপক স্বপন বসুর নামে ১৪০০ টাকার একটা ড্রাফট কেটে পাঠাতে । টাকাটা অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সম্বর্ধনার ব্যাপারে ত্রিপুরা থেকে সংগৃহীত। আজ সারাদিনই ককবরক অভিধানের কাজ করলাম । বিকেল পাঁচটায় চিত্র পরিচালক দীপক ভট্টাচার্য এলেন একটা প্রবন্ধ দেখাতে । প্রবন্ধটির নাম 'চলচ্চিত্রে উপজাতি'। প্রবন্ধটি 'পূর্বাভাস' এ ছাপানো হবে । প্রবন্ধটি সত্যিই ভালো হয়েছে । রাত ১০টা পর্যন্ত ককবরক অভিধানের কাজ করলাম ।

২০শে আগষ্ট, ১৯৯৯, শুক্রবার। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম । সকাল ৮ টায় প্রেসারের ওষুধ খেয়ে স্নান সেরে শ্রীমতী অনুরূপা মুখার্জীর আদিবাসী মহিলা সমিতিতে

গেলাম আমার এক শালার মেয়ের ভর্তি করার ব্যাপারে। তারপর রবি চক্রবর্তী (জনশিক্ষা আন্দোলনের সংগীত শিল্পী)কে রাস্তায় পেয়ে তাকে আমার লেখা ১ খানা 'ককবরক লিপি বিতর্ক বনান বিতর্ক বই দিলাম।' আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নাগিয়ে সারাদিন ককবরক অভিধানের কাজ করলাম। বিকেলে গেলাম সি. পি আই. নেতা অঘোর দেববর্মার বাড়ি। তিনি দশরথ দেববর্মা লিখিত 'মক্তিপরিষদের ইতিকথা'র ওপর লেখা একটা সমালোচনা পূর্ণ প্রবন্ধ আমায় পড়তে দিলেন। আজ রাত ৯ টায় কলকাতায় বন্ধুবর স্বপন বসুকে টেলিফোন করলাম।

২১শে আগষ্ট, ১৯৯৯, শনিবার । প্রাতর্ভ্রমণ করে ও ৮ টায় প্রেসারের ওষুধ খেয়ে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম। সকাল ১০ টায় এলেন ছোটগল্পকার দেবব্রত দেব একটা লেখা চাইতে ককবরক ভাষার ওপর। লেখাটি 'সবুজ আন্দামান' এর পুজো সংখ্যয় প্রকাশিত হবে।

২২শে আগষ্ট,১৯৯৯, রবিবার । সকালে 'সবুজ আন্দামান' পুজো সংখ্যায় লেখা দেওয়ার ব্যাপারে লেখক দেবব্রত দেবের কাছে গেছি।

বিকেলে স্ত্রীকে নিয়ে বড়ো মেয়ে তানিয়ার বিয়ের ব্যাপারে সম্পর্কে আমার দাদাশ্বশুর সুধাংশু দেববর্মার কর্নেল বাড়ির বাসায় গেছি। এরপর ককবরক অভিধানের কাজ কোরেছি রাত ১০ টা পর্যন্ত।

২৩শে আগষ্ট, ১৯৯৯ । প্রাতর্ভ্রমণে ইতি টেনে কিছুক্ষণ ককবরক অভিধানের কাজ করলাম। ১০ টায় স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। সেখানে ল্যাঙ্গুয়েজ লেবরাটরিতে কিছুক্ষণ কাজ করে গেলাম কম্পিউটার সেকশনে। সেখান থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ার মৃণাল দেববর্মার কাছ থেকে ককবরক মার্কসিট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারির পি. এ সুজিত চক্রবর্তীকে জানালাম। তারপর গেলাম V.C.'র অফিসে। সেখানে গিয়ে Dy. Registrar K B Jamatia'র ঘরে বসলাম। তার অফিস থেকে জানতে পারলাম, আমার Election duty পড়েছে। দুপুরে বাড়িফিরে খেয়ে একটু ঘুমিয়ে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম। আজ আমার বড় মেয়ে তানিয়াকে দেখতে আসার কথা ছিলো জম্পুইজলার Additional B.D.O. তরুণ দেববর্মার সঙ্গে আমার খুড়তোতো শ্যালক ডাঃ বিশ্বজিৎ দেববর্মার। কিন্তু তারা আসেনি।

২৪শে আগষ্ট,১৯৯৯, মঙ্গলবার। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কিছু কাজ করে D.M. অফিসে গেলাম। আমাকে Election duty দিয়েছে তা exempted করার জন্যে। D.M. Office থেকে বাসায় ফিরে খেয়ে একটু বিশ্রাম করে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম। বিকেল ৩ টে নাগাদ আমার ডাক্তার শালা বিশ্বজিৎ দেববর্মা পাত্র তরুণ দেববর্মাকে নিয়ে উপস্থিত B.D.O'র গাড়িতে জম্পুইজনার B.D.O. অফিস থেকে। আমার স্ত্রীকে 'পূর্বাশা'র অফিস থেকে আনতে আমার ছোট মেয়ে দেবযানী চলে গেলো। আমার পুত্র শ্রীমান সুরঞ্জন গেলো মিষ্টি আনতে। কিছুক্ষনের মধ্যে আমার স্ত্রী এসে আমার বড়ো মেয়ে তানিয়াকে পাত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সমস্ত কথাই হলো ককবরক ভাষায়। পাত্র শিলং থেকে পাশ করা। তাই মাঝেমধ্যে ইংরেজী বলছিলো। বেশ স্মার্ট ছেলে। ছেলের বাবা হাকিম দেববর্মা আমার শ্বশুরকুলের পুরনো আত্মীয়।

২৫শে আগষ্ট, ১৯৯৯, বুধবার। প্রাতর্ভ্রমণ থেকে ফিরে গেলাম কুমারীটিলায় ডঃ শিশির কুমার সিনহার কোয়ার্টারে 'ককবরক' মার্কশিট'এ সই করানোর জন্যে। সেখান থেকে ফিরে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে গেলাম আমার প্রতিবেশী A D C'র Deputy Chief Executive Officer পরশুরাম দেববর্মার বাড়ি। তাঁকে আমার Election duty'র কথা জানালাম। তিনি বললেন, সদরের S D O সুখরাম দেববর্মাকে টেলিফোন করে আমার Election duty exempted করিয়ে দেবেন। সারাদিন ককবরক ভাষার অভিধানের কাজ করে বিকেলে গেলাম সি. পি.আই. নেতা অঘোর দেববর্মার বাড়ি। দেখলাম,

তিনি দশরথ দেবের সঙ্গে আমার বিরোধ কোথায় এই নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখছেন । বাসায় ফিরে আবার কাজে বসলাম ।

২৬শে আগষ্ট, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার। ভোরের হাওয়া খেয়ে বাসায় ফিরে তেলাকুচো পাতার রস খেয়ে কুমারীটিলার ডঃ শিশির কুমার সিনহার কোর্য়ার্টারে গেলাম ককবরক সার্টিফিকেটের ফাইল আনতে । ফিরে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম । আজ শরীর ভালো ছিলো না । তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইনি । বিকেলে জি.বি. হাসপাতালে গেলাম কমরেড অমূল্য শর্মাকে দেখতে । গিয়ে শুনলাম, সে আজই ছাড়া পেয়েছে । সে পেচ্ছাবের অসুখে ভুগছে। সন্ধেবেলায় মনিপুরী বন্ধু ওয়াঙ্‌খেল বীরমঙ্গল সিং এলেন । তিনি এসেই মনিপুরী ও বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীর মধ্যে জাতিগত ও ভাষাগত দিক নিয়ে পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করলেন । রাত ১০ টা পর্যন্ত ভাষার কাজ করলাম ।

২৭শে আগষ্ট, ১৯৯৯, শুক্রবার । প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম। ১০ টায় আমার স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম । বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে FCPGS. Sey. Mr. Monomohan Reang কে ককবরক সার্টিফিকেট ready হবার কথা জানালাম । তারপর Store-এ গিয়ে Register নিয়ে এলাম Certificate dilivery দেয়ার ব্যাপারে । দুপুরে ফিরে এলাম বাসায় । সন্ধ্যে বেলায় নিধুহাজরার বাড়ি গেলাম ।

২৮শে আগষ্ট, ১৯৯৯, শনিবার । শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধ । প্রাতর্ভ্রমণ সেরে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম । হঠাৎ সি.পি.আই নেতা অঘোর দেববর্মার ফোন এলো । বিকেল ৩.৩০ এ কমরেড শ্যামল চৌধুরীব সঙ্গে অঘোর বাবুর বাড়ি গেলাম ।

২৯শে আগষ্ট, ১৯৯৯, রবিবার। Ex-IAS মানিক মজুমদারের প্রতাপ রায় রোডের বাড়ি গেছি সকাল ৯ টায় । কমরেড শ্যামল চৌধুরীকে বিকেলে করবী ম্যাডামের বাড়ি গিয়ে অনেক্ষণ আলাপ আলোচনা করেছি মহিলাকমিশনের বিষয়ে । করবী ম্যাডামের বাড়ি থেকে ফিবতে রবীন্দ্র ভবনের সামনে আমাদের ভাবী জামাই তরুণ দেববর্মার সঙ্গে দেখা হয়েছে । পরেই দেখা হলো বন্ধুবর জওহর আচার্যীর সঙ্গে প্রেস ক্লাবের সামনে । তারপর কবি নন্দকুমার দেববর্মার সঙ্গে বাসায় ফিরলাম ৭.৪৮ এ।

৩০শে আগষ্ট,১৯৯৯, সোমবার । প্রাতর্ভ্রমণ করতে গিয়ে দেখি প্রেসক্লাবে উপজাতি যুবসমিতির রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে যুবসমিতির পতাকাদিয়ে চারপাশে সাজানো হয়েছে । উপজাতি যুবসমিতির কিছু পরিচিত কর্মীর সঙ্গে প্রেসক্লাবের পাশে দেখা হয়ে গেলো । আজ সারাদিনই ককবরক অভিধানের কাজ করলাম । বিকেলে বেরিয়ে প্রেসারের ওষুধ কিনলাম । সন্ধ্যে বেলায় গেলাম জগন্নাথ মন্দিরের সামনে পার্কে । সেখানে দেখি আধো আলো আধো অন্দকারে শিক্ষিত ককবরক ভাষী ছেলে-মেয়েরা চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে ।

৩১শে আগষ্ট,১৯৯৯,মঙ্গলবার । প্রাতর্ভ্রমণের সাথী লেখক শ্রীযুক্ত নিধু হাজরা, নাট্যকার কমল রায় চৌধুরী ও সি.পি. আই নেতা শ্যামল চৌধুরীর সঙ্গে জগন্নাথ বাড়ির সামনের পার্ক থেকে শ্যামল চৌধুরীর কর্নেল চৌমুহনীর বাসায় গেলাম । এটা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সেনের বাড়ি । শ্যামল বাবুর বাসায় তখন তাঁর ভগ্নীপতি মুকুল দেবরায় উপস্থিত ছিলেন । ভদ্রলোকের ছেলের ভর্তির সমস্যার ব্যাপারে সমবেত আলোচনা শুরু হতেই আমি এক ফাঁকে জামার পকেট থেকে তেলাকুচোর পাতা বের করে শ্যামল বাবুর অসুস্থ মেয়ের কাছে একটা বাটিতে জল চাইলাম । জল পেয়েই আমি তেলাকুচোর পাতাগুলো ধুয়ে গো গ্রাসে খেয়ে ফেললাম সকলের সামনে । এতগুলো তেলাকুচোর পাতা মুখে পুরতে দেখে সকলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন । বললাম, আমার কিডনির অসুখ,

পেচ্ছাব করতে জ্বালা-পোড়া করে; তাই তেলাকুচোর পাতা খাই সকালে কিছু খাওয়ার আগে। তেলাকুচোর পাতা খেলে পেচ্ছাব সরল হয় ও জ্বালা-যন্ত্রণাও কম হয়। ঠিক এই সময় আমাদের সি.পি.আই পার্টির বিলোনীয়া বিভাগের ৩ জন শীর্ষস্থানীয় নেতা - কমরেড তরণী বণিক, তপন চক্রবর্তী ও রঞ্জিত মজুমদার শ্যামল বাবুর ঘরে ঢুকে পড়লেন। তাঁরা এসেছেন সি.পি.আই রাজ্যপার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিঙে যোগ দিতে। ওই মিটিঙে শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী ঠিক হবে। মিটিঙ হবে কামান চৌমুহনীর সি. পি.আই-এর রাজ্যদপ্তরে। সকাল ৮ টায় মিটিং। এখন বাজে প্রায় ৭ টা। এমন সময় শ্যামল বাবুর স্ত্রী ট্রেতে সাজিয়ে চা-বিস্কুট নিয়ে এলেন আমাদের জন্যে। নিধুদা তখন বৈঠকী আলাপে মশগুল। চা খেয়েই, আমি বেলোনীয়ার কমরেডদের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চলুন আপনারা আমার নতুন বাসায়, খুব দূরে নয়; কাছেই। আমার বাসা হয়ে আপনারা পার্টির মিটিঙ ধরতে পারবেন।' ওঠার সময় শ্যামল বাবুর ভগ্নীপতি কাঁকড়া বনের ডাকসাইটে কংগ্রেস নেতা মুকুল বাবুকে বললাম, 'আপনি এখানে থাকুন, আমি আপনার ছেলের ভর্তির বিষয়ে অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করে ৯টা নাগাদ আসবো। দেখাযাক রামেশ্বর বাবু কী বলেন।' এই কথা বলে বিলোনীয়ার কমরেডদের নিয়ে আমি আমার নতুন বাসা ধ্রুব কর্তার বাসভবনে চলে এলাম। দোতলায় আমার বেশ সৌখীন বাসা। আসলে কর্তারা আমাদের বর্তমান ঘরে আগে থাকতেন। তাই এতো সাজানো গোছানো।

বাসায় এসেই সামনের ঘরের নিয়ন আলো জ্বেলে দিলাম। কমরেডরা আমার বাসার চেহারা দেখে বোধ হয় একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, এখন আমি দু'হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে বেশ খানদানী ঘরে থাকি। হলঘরটার একদিকে আমার লাইব্রেরী, প্রচুর বই। আমার ছেলের আঁকা দুটো ভালো ছবি। অবাক হবার কারণ হলো, এই ক'বছর আগেও আমি ছিলাম সি.পি.আই. পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী, পার্টি-ভাতা ছিলো দু'শো টাকা; থাকতাম চড়িলামে ট্রাইবাল গ্রাম হেরমাবাড়িতে আমার শ্বশুরের করে দেওয়া একটা মাটির ঘরে। নুন আনতে পানতা ফুরনোর খবর এই কমরেডরাও জানতেন। আর আজ আমাকে বাজার হালে থাকতে দেখে তাঁদের অবাক হবারই কথা। তাছাড়া, এই ৩ জন নেতা পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। তাঁদেরকে আমার ছেলের রাখা Times of India, Indian Express কাগজ পড়তে দিয়ে আমি রান্নাঘরে এলাম। দেখলাম, আমার স্ত্রী ফুলকুমারী দেববর্মা মগ মেয়েদের মতো লুঙ্গি পরে গ্যাসের আগুনে তবকারি চাপিয়েছেন। ককবরক ভাষায় বললাম, 'চা মুথুঙদি, বিলোনিয়ানি কমেরেডরগ ফাইকা' (চা করো, বিলোনীয়ার কমরেডরা এসেছেন)। 'আছুক আইছিরিছিরি বাহাইকে বিলোনীয়ানি ছকফাই ?' (এত ভোর বেলায় কীকরে বিলোনীয়া থেকে পৌঁছুলো ?)—আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন। এবার বাংলায় বললাম, 'খুব রাত থাকতে বোধ হয় একস্প্রেস বাস ধরে এসেছন ওঁরা। তুমি তাড়াতাড়ি চা করো, ৮ টায় ওঁদের পার্টির মিটিং।' এই কথা বলে আমি আমার বিলোনীয়ার বন্ধুদের সঙ্গ দিতে গেলাম। শান্তিরবাজার কেন্দ্রে সি.পি.আই প্রার্থী নিয়ে আলোচনা হলো। কমরেড তরণী বনিক বললেন, 'কমরেড লোরা মগই আমাদের প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু হার্ট এ্যাটাকের পর তাঁর শরীর খারাপ, তাই অন্য কাউকে প্রার্থী করতে হচ্ছে।' আমি বললাম, 'শুনেছি স্বপন রিয়াং প্রার্থী হচ্ছে। ছেলেটিকে আমি চিনি, আমাদের তপতী ম্যাডামের ছাত্র, এম.বি.বি কলেজ থেকে বি.কম. পাশ করেছে। সেবার তপতী ম্যাডামকে নিয়ে যখন রিয়াং এলাকায় রিসার্চের কাজে যাই, তখন কমরেড দুর্বাজয়ের বাড়ি তার সঙ্গে দেখা। স্বপন আমাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালো। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। স্বপন নিজে ফুলপ্যান্ট পরা অবস্থায় বড়ো মোরগ কাটলো একটা। তারপর নিজেই রান্না করে খাওয়ালো আমাদেরকে।'

—'স্বপন প্রার্থী হলে তো ভালোই হতো, জেতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারতাম। বললেন তপন চক্রবর্তী।'

—'তা, গন্ডগোল হলো কোথায় ?'

—'স্বপন রিয়াংকে প্রার্থী করতে সি.পি.এম-এর আপত্তি আছে।' বললেন, কমরেড রঞ্জিত মজুমদার।

—'সি.পি.আই প্রার্থী দেবে কাকে তাও কি সি.পি.এম. ডিকটেট করবে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

—'না, স্বপন সম্পর্কে বাদল বাবু (বাদল চৌধুরী, বর্তমান অর্থমন্ত্রী) দের কাছে নানা রকম খবব আছে, তাই।' এমন সময় আমার স্ত্রী ট্রেতে করে চা নিয়ে হাজির। মগিনীদেব মতো লুঙ্গি পরে এসে তিনি বোধ হয় লজ্জায় পড়লেন একটু। আমি তাঁকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে বললাম, 'বিলোনীয়ার কমরেডরা তো ত্রিপুরার মগের মুল্লুকেই থাকেন। কাজেই তোমার লজ্জা পাবার কিছুই নেই।' আমার কথা শুনে কমরেডরা হেসে ফেললেন। আমার স্ত্রীর মুখেও হাসি দেখা দিলো।

চা খেয়ে বিলোনীয়ার কমরেডরা বেরিয়ে পড়লেন। ঘড়িতে তখন আটটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকী।

আমি একটু পরে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে আমার প্রতিবেশী —এ.ডি.সি'র Deputy Chief Executive Officer শ্রীযুক্ত পরশুরাম দেববর্মার বাড়ি গিয়ে মুকুল বাবুর ছেলের ভর্তির বিষয়ে অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে ফোন করলাম। রামেশ্বর বাবু সব শুনে বললেন, কুমুদদা, আপনারা দশটার সময় আগরতলা প্রেস ক্লাবে চলে আসুন, আমি ওখানে যাবো, পি.আই.বি আফিসার জহর আচার্যী 'জাতীয় সংহতি'র ওপর একটা সেমিনার করছে, ওখানেই এম.বি.বি. কলেজে ভর্তির বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে।' ফোন ছেড়ে দিয়ে আমি আবার গেলাম কমরেড শ্যামল চৌধুরীর বাসায়। বাসায় গিয়ে মুকুল বাবুকে আমাব বাসায় দশটার সময় আসতে বলে এলাম।

ঠিক দশটায় মুকুল বাবু এলেন। বললাম, 'শ্যামল বাবুকে কামান চৌমুহনীর সি.পি.আই অফিসে একটা ফোন করবেন প্রেস ক্লাবে আসতে, আলোচনার সময় শ্যামল বাবুর থাকার দরকার।' মুকুল বাবুকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমে শ্যামল বাবুকে প্রেস ক্লাবে আসার জন্যে ফোন করলাম। তারপর আমরা গেলাম প্রেস ক্লাবে।

প্রেস ক্লাবের দোতলায় উঠতেই জহর বাবু স্বাগত জানালেন। হলের ভেতর ঢুকে সেমিনারে বক্তব্য বাখার জন্যে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সি.পি.আই. নেতা দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, প্রবীনতম সাংবাদিক শ্রীযুক্ত জিতেন পাল, শ্রীমতী ফুলন ভট্টাচার্য, সাংবাদিক সত্যব্রত চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বসে আছেন। আমরা গিয়ে একেবারে পেছনের সাবিতে গিয়ে বসলাম। ইতিমধ্যে শ্যামল বাবুও এসে গেলেন। আমি সেমিনারের কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে ডাকলাম একটু আসার জন্যে। তখনো সেমিনার শুরু হয়নি। রামেশ্বর বললেন, 'আপনারা সেমিনারে থাকুন, সেমিনার শেষ হলে দেড়টা নাগাদ এম.বি.বি কলেজে আপনাদের নিয়ে গিয়ে কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক স্ট্যানলি রমবাই-এর সঙ্গে ভর্তির ব্যাপারে আলোচনা করবো।'

এরমধ্যে সেমিনার শুরু হয়ে গেলো। রামেশ্বর বাবু সেমিনারের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে পি.আই.বি আয়োজিত 'জাতীয় সংহতি' শীর্ষক সেমিনারের উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্যে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, জিতেন পাল, ফুলন ভট্টাচার্য ও সত্যব্রত চক্রবর্তীকে অনুরোধ করলেন। সেমিনারের সভাপতি হলেন শ্রীযুত জিতেন পাল।

এরপর সাংবাদিক পান্নালাল রায় সেমিনারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখলেন। এরপর আমি

উঠে পড়লাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার জন্যে। শ্যামলবাবুদের বললাম, 'আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে জরুরি কাজ আছে, গিয়ে ককবরক সার্টিফিকেট দিতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের। আমি আমার কাজ সেরে ঠিক দেড়টার সময় এম.বি.বি. কলেজের অধ্যাপকদের রুমে বসে থাকবো, আমাকে ডেকে নেবেন, প্রিন্সিপ্যাল রমবাইসাহেব আমারো পরিচিত। তাঁকে ভর্তির ব্যাপারে অমিও অনুরোধ করবো।' এই কথা বলে আমি দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতেই সেমিনারের মূল আয়োজক জহর আচার্য পেছন থেকে ডাকলেন, 'কুমুদদা, কোথায় যাচ্ছেন?'

—'আমি ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি, জরুরি কাজ আছে সেখানে।'

—'এখানে লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছি, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চলে আসবেন কিন্তু।' আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ইউনিভার্সিটির দিকে পা বাড়ালাম।

প্রেসক্লাবের জাতীয় সংহতির সেমিনারে এসে লাঞ্চ খাওয়া হয়নি আমার। ইউনিভার্সিটির 'ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরাটরি'তে ঢুকে ককবরক সার্টিফিকেট গুলোকে রেকড রাখার ব্যাপারে F.C.P.G.S এর Secretary'র P.A সুজিৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে কাজ করতে করতে একটা বেজে গেলো। দেড়টায় এম.বি.বি. কলেজে শ্যামল চৌধুরী, অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে V.C'র বিল্ডিঙয়ে গিয়ে ডেপুটি রেজিস্ট্রার কল্যাণবিজয় জমাতিয়ার সঙ্গে দেখা করে ছাতি মাথায় দিয়ে এম.বি.বি কলেজের Professors' lounge-এ উপস্থিত হলাম। দেখি ওঁরা কেউ আসেননি। অধ্যাপক বন্ধু শম্ভু রক্ষিত, শঙ্কর ভট্টাচার্য'র সঙ্গে কথা বলে সময় কাটতে লাগলো। শঙ্কর বাবু চা খাওয়ালেন। এর মধ্যে অধ্যাপিকা অঞ্জলি চক্রবর্তী এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'কুমুদ বাবু, কবি আশিস দাসের দু'দুটো স্মরণ সভায় আপনাকে পেলামনা কেন?' বললাম, 'জানেন ম্যাডাম, ওঁর অরুন্ধতীনগরের বাড়ির শ্রাদ্ধবাসরে কবি নন্দকুমার দেববর্মার সঙ্গে গিয়েছিলাম আমি। বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর স্মরণ সভায় দেবব্রত দেবরায়ের অনুরোধে কিছু বলবো বলে কবির 'সামনে কুরুক্ষেত্র আবার' কবিতার বইটা পড়েও ছিলাম। বইটা পড়তে পড়তে এতটা ইমোশন্যাল হয়ে পড়েছিলাম যে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। আমার কবিপুত্র সুরঞ্জন তা লক্ষ্য করে বললো, বাবা তুমি কবি আশিস দাসের স্মরণ সভায় যেয়োনা। শেষে সেখানে গিয়ে শরীর খারাপ করে ফেলবে, প্রেসার বেড়ে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই আর যাওয়া হয়নি।'

—'জানেন, কুমুদ বাবু, আশিস বাবু ভেলোরে, যাবার আগের দিন আমাকে ফোন করে বললেন, ম্যাডাম, কাল যাচ্ছি ভেলোরে আর হয়তো দেখা হবে না।'

—'আমি ধমক দিয়ে বললাম, কি যা তা বলছেন আশিস বাবু, আপনি ঠিক সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন।'

—'না ম্যাডাম, ওপরের চেহারা দেখে আমাকে বুঝবেন না। আমার শরীর সত্যিই খারাপ, আর এখানকার ডাক্তাররা যা ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে'.....অঞ্জলি ম্যাডামের কথা শেষ না হতেই সংস্কৃতের এক অধ্যাপক বন্ধু ধীরেন্দ্র দেবনাথ বললেন, 'রামেশ্বর বাবু প্রিন্সিপালের রুমে, আপনি যান।'

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যেতেই দেখি রামেশ্বর বাবু প্রিন্সিপাল রমবাই সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে ডি.ডি.ও'র ঘরে ঢুকছেন। আমি বাইরে অপেক্ষা করে রইলাম। শ্যামল বাবু, মুকুল বাবুদের না দেখতে পয়ে আমার কেমন যেন মনে খটকা লাগলো। রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, 'প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলেছি, মনে হচ্ছে ছেলেটা ভর্তি হতে পারবে।'

—রামেশ্বর বাবুকে বললাম, 'কোথাও একটু বসবেন, অধ্যাপক অরুণ বসুর সংবর্দ্ধনার ব্যাপারে কিছু কথা আছে।'

ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের রুমে গিয়ে বসলাম আমরা। ঘরটায় কেউ তখন নেই।

—'কি বলবেন বলুন, কুমুদ দা।'

—'না, মানে, আপনি তো মাঝখানে ছিলেন না, অধ্যাপক শিশির কুমার সিন্‌হা আর আমি মিলে ১৪৫০ টাকা তুলেছি। আর, কলকাতায় অধ্যাপক স্বপন বসুকে ১৪০০ টাকা ড্রাফ্‌ট কেটে পাঠিয়েছি। আপনি তো বলেছিলেন রবীন্দ্র পরিষদ থেকে কিছু টাকা তুলে দেবেন।'

—'হ্যাঁ, সেপ্টেম্বরের ছ' তারিখে রবীন্দ্র পরিষদের কার্যকরী কমিটির মিটিং আছে, সেখানেই অরুণ বাবুর সংবর্দ্ধনার ব্যাপারে আলোচনা করে একটা কিছু করবো।'

—'আরেকটা খবর জানেন, রামেশ্বর বাবু ?'

—'কোন খবরটার কথা বলছেন ?'

—'অরুণ বাবু আগরতলায় আসছেন সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট উইকে।'

—'হঠাৎ করে অধ্যাপক অরুণ বসু আগরতলায় আসছেন, ব্যাপার কী ?'

—'আসছেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে মডার্ণ পোয়েট্রির ক্লাস নিতে, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সুধীন দত্তের ওপর ক্লাস নেবেন।'

—'থাকবেন ক'দিন জানেন ?'

—'শিশির বাবু তো বলেছেন দিন দশেকের মতো থাকবেন।'

—'ঠিক আছে তাহলে। অরুণ বাবুকে দিয়ে রবীন্দ্র পরিষদে একটা গানের পরীক্ষা নেয়া যায় কিনা, আলোচনা করে দেখবো ওঁর সঙ্গে। আর, ছ' তারিখে ওঁর সংবর্দ্ধনা দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করে আমরা টাকা তোলার ব্যাপারে একটা কোটা নেবো। ঠিক আছে, এই কথা থাকলো তাহলে।'

—'ঠিক আছে। আমিও যাই ইউনিভার্সিটির দিকে।' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে বনমালীপুরে সি.পি.আই নেতা অঘোর বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসতে আসতে রাত সাড়ে সাতটা বেজে গেলো। বাসায় ঢুকে দেখি স্ত্রী ফুলকুমারী দেববর্মার ফুটফুটে মুখটায় কালো মেঘের ঘনঘটা। ভাবলাম কিছু একটা হয়েছে বাড়িতে। আমি এসে হাত-মুখ ধুতেই বড়ো মেয়ে তানিয়া তার মাতৃভাষা ককবরকে বললো, 'বাবু, নিনি বিথি চানানি জরা উঙখা' (বাবা, তোমার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে)। আমার ছেলে-মেয়েরা সবসময় তাদের মাতৃভাষায় কথা বলে আমার সঙ্গে। আমিও ককবরক ভাষায় বললাম, 'চাজাগনাই মানূই তাই প্রেসারনি বিথি রুফাইদি' (কিছু খাবার আর প্রেসারের ওষুধ এনে দাও)। সঙ্গে সঙ্গে বড়োমেয়ে তানিয়া চিড়ে-দুধ-কলা একটা বাটিতে করে এনে দিলো। আর আমার ওষুধের কোটোটা এগিয়ে দিলো। আমি টিফিন করে ওষুধ খেয়ে একটু ইংরেজী খবরের কাগজগুলো (Times of India, Indian Express) পড়বো ভাবছি, এমন সময় লোড শেডিং হলো। লোড শেডিং হতেই আমার দু'মেয়ে তানিয়া ও দেবু (নন্দিনী ও দেবযানী) মোমবাতি জ্বেলে চাইনিজ চেকার খেলতে বসলো। আর আমার স্ত্রী আমার গায়ে চিমটি কেটে বললেন, 'থ, আয়াঙ নগ', নৃঙ বাই কক তঙগ' (চলো, ওই দিককার ঘরে, তোমার সঙ্গে কথা আছে)। আমি মন্ত্র মুদ্ধের মতো তাঁর পেছন পেছন গিয়ে হলঘরে 'কেয়ার এ্যান্ড কিওর' (Care and Cure) নার্সিংহোমের দিকের জানলার পাশে গিয়ে বসলাম। অন্ধকারে দু'জন মুখোমুখি। আমার স্ত্রী কথা শুরু করলেন ঃ

—'আয়াঙনি বরক ফাইকা (ওই দিককার লোক এসেছিলো)।'

—'ছাব' ফাইবা ?' (কে এসেছিলো ?)

—'গাঙঠাকুরনি পিয়া কাইলাবারিনি কক তৃইউই ফাইঅ' (গাঙঠাকুর পাড়ার পিসা বিয়ের কথা নিয়ে এসেছিলেন।

—'তাম' ছাই কৃলাঙ ?' (কি বলে গেলেন ?)

—'ছাইথাঙগ, খিরিছতান মতে তানিয়ান' কাইনা নাঙগানৃ ফুন' (বলে গেলো, খৃস্টান মতে তানিয়াকে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে) ।

—'তাম হূন, খিরিছতান মতে তানিয়ান' কাইনা নাঙগানৃ ?' (কি বলেছেন, খৃস্টান মতে তানিয়াকে বিয়ে দিতে হবে ?)

—'হুঁ, গিরজাঅ তৃলাঙগৃই কাইনা নাঙগানৃ ফুন' (গীর্জায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিতে হবে বলে গেছে)।

—'নৃঙ পিয়ান' তাম ছাই রহর ?' (তুমি পিসাকে কি বলে পাঠালে ?)

—'আঙ ছাঅ, চৃঙ ট্রাইবেল-হিন্দু মতে কাইছিনাই' (আমি বললাম, আমরা ট্রাইবেল-হিন্দু মতে বিয়ে দোব) ।

—'নৃঙ ছামানি চাখা, চৃঙ ছিরিছিতিনি হুকুমু কারুইমানগৃলাক, চৃঙ হিন্দু মতে কাই রহরনাই। উল বরগ জেছাফান' খূলাইথুন' (তুমি ঠিকই বলেছো, আমরা আমাদের মেনে আসা আগের রীতি-নীতি ত্যাগ করতে পারবোনা, আমরা হিন্দুমতেই বিয়ে দেবো, পরে তারা যা করে করুক)।

—'বরগ গছিয়াকে লা ?' (তারা রাজি না হলে ?)

—'আহা, চৃঙ তো খিরিছতান চূলা বাই কাইনানি গছিকা বেলে, ছিমি চৃঙ চিনি হিন্দুমতে কাইরহরনাই, অছূক বরগ গছিনাইমাইয়া হাইদা ? ' (আহা, আমরা তো খৃস্টান ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হয়েছি, শুধু আমাদের হিন্দুমতে বিয়ে দিয়ে দেবো, এতটকু তারা মেনে নিতে পারেনা না কি ?)

—'চূলাছে কাহামা'(ছেলে তো খুবই ভালো ।) ।

—'ছাইমান, চূলা এ্যাডিশনাল বি.ডি.ও' (জানি ছেলে এ্যাডিশনাল বি. ডি.ও।) ।

—'তাবুক তাম' খূলাইছিনাই !'(এখন যে কি করি !) !

—'তাম' খূলাইনাই, ছিরিঙ ছিরিঙ তঙদি, নাইগৃরানা'(কি করবে, চুপচাপ, থাক দেখা যাক না)।

—'আ কক খূনামানি ছিমি বৃখাঅ ছান্তি কৃরুই !' (ওই কথা শোনার পর থেকে মনে শান্তি নেই)--এই কথা শেষ হতেই আলো জ্বলে উঠলো । আমার স্ত্রীও মেয়েদের চাইনিজ চেকার খেলায় যোগ দিলেন । আমিও ইংরিজি খবরের কাগজগুলোব ওপর চোখ বোলাতে লাগলাম । কিন্তু আমার মনেও শান্তি ছিলোনা । ভেবেছিলাম, সামনের অগ্রাহয়ণ মাসে বড়ো মেয়ে তানিয়ার বিয়ের পাট চুকিয়ে দেবো; শরীরও ভালো যাচ্ছেনা, হাইপ্রেসারের রোগী, তার ওপর কিড্‌নিরও প্রব্লেম আছে । তাই খৃস্টান ছেলে হওয়া সত্বেও আমার আপত্তি ছিলোনা । তাছাড়া, ছেলেটা সত্যিই ভালো; এবারই T.C.S. হয়ে এ্যাডিশন্যাল বি.ডি.ও হিসেবে জয়েন করেছে । আর, আমার শ্বশুরবাড়ির দিক দিয়ে পুরনো আত্মীয় তাঁরা । একসময় নাকি ছেলেটার ঠাকুরদার বাবা আমার শ্বশুর বাড়ির পুরোনো পাড়া (ককবরকে বলে কামিচাঙ) হেরমাবাড়িতে ছিলেন। এখন যেখানে হেরমাবাজার, সেখানেই তাঁর প্রপিতামহ বসবাস করতেন । তারপর সেখান থেকে চলে যান চড়িলাম ও বিশ্রামগঞ্জের মাঝখানে বিখ্যাত উপজাতি পাড়া চন্ডীঠাকুরে । তারপর সেখান থেকে পাত্রের বাবা হাকিম দেববর্মা তেলিয়ামোড়ার কাছে মোহরছড়াতে ঘরজামাই ওঠেন । মোহরছড়া বাজারে তাঁর দোতলা দোকান ছিলো । ৮০'র বাঙালি-উপজাতি দাঙ্গায় তাঁর দোকান নষ্ট হয়ে যায় । ছেলেরা তখন ইংলিশ মিডিয়ামে কেউ শিলং কেউ আগরতলায় পড়ে । আশির দাঙ্গার পরে হাকিম বাবুর চার ছেলে খৃস্টান হয়ে যায় । সব ছেলেই উচ্চ শিক্ষিত । বড়ো ছেলে টি.সি.এস. ত্রিপুরা সরকারের ট্রেজারি অফিসার । মেজো ছেলে এম.বি.বি.এস. ডাক্তার । তাঁর বৌ আবার খাসী রমণী । তিনিও ডাক্তার । ত্রিপুরার আবহাওয়ায় ভাষা

সমস্যা দেখা দেয়ায় তিনি শিলঙে গিয়ে নিজেই চেম্বার খুলে বসেছেন। হাকিম বাবুর সেজো ছেলে ত্রিপুরা সরকারের রবার প্লানটেশান করপোরেশনের অফিসার। ছোটো ছেলে শ্রীমান তরুণ এবারই টি.সি.এস. হয়ে জম্পুইজলার উপজাতি উন্নয়ন ব্লকে এ্যাডিশন্যাল বি.ডি.ও'র পদে যোগ দিয়েছে। ছেলেটা একদিন আমার খুড়তুতো শ্যালক টাকারজলা হাসপাতালের ডাক্তার বিশ্বজিৎ দেববর্মার সঙ্গে এসে আমার মেয়েকে দেখে গেছে। কিন্তু মেয়ে দেখে পছন্দ হবার পর যে শর্ত দিয়েছে তাতে আমরা অনেকটা নিরুপায় হয়ে গেছি। মনটা ভালো লাগছেনা। আশির দাঙ্গার পর ত্রিপুরার ককবরক ভাষাভষী উপজাতীয় শিক্ষিত ছেলেরা সব খৃস্টান হয়ে যাচ্ছে। তারাই আবার ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বড়ো বড়ো অফিসার। আমার বড়ো মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে যতগুলো ছেলে এসেছে তারা সবাই ডাক্তার কিন্তু খৃস্টান। এখন যে ছেলের সঙ্গে কথা পাকাপাকি হতে যাচ্ছিলো সেও খৃস্টান, টি.সি.এস. অফিসার। আমার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে ট্রাইবাল ছেলেই প্রথম পছন্দ। তারপর বাঙালি ছেলে। পছন্দ এই জন্যে যে, আমার ছেলে-মেয়েরা সবাই ককবরক ভাষী, উপজাতীয় আচার-আচরণের মধ্যে বড়ো হয়েছে। খাদ্যাভাসও তাদের উপজাতীয়। তাই ট্রাইবাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে আমার মেয়েদের এ্যাডজাস্ট করতে অসুবিধে হবে না। তাছাড়া, ককবরক ভাষাভাষী শিক্ষিত ছেলেরা সত্যিই খুব মেধাবী, অন্তঃকরণও তাদের খুব বড়ো। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরার ককবরক ভাষাভাষী উপজাতিদের এলিট অংশকে ভারতের সবথেকে উন্নত জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে বসিয়েছেন তাঁর 'কিরাত-জন-কৃতি' নামক জগৎ বিখ্যাত বইয়ে। আমি গত তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর ধরে এই জাতিগোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে গবেষণা করছি। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, এঁরা উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধে পেলে সুনীতি বাবু কথিত আগরতলার উপজাতীয় উচ্চকোটী সমাজের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারেন। এইসব ভাবতে ভাবতে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম। ছানিকাটা চোখে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করলাম। তারপর প্রেসার ও ঘুমের ওষুধ খেয়ে বাংলাদেশের লালনগীতির ক্যাসেটে ফরিদা পরভীনের গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, শনিবার। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে নিধু হাজরা, কমল রায় চৌধুরী ও কমরেড শ্যামল চৌধুরীকে নিয়ে কর্নেল চৌমুহনীর দর্পণ পত্রিকার সামনে এলাম।

আজ সারাদিন বাসায় থেকে 'সবুজ আন্দামান'এর পুজো সংখ্যার জন্যে 'সবুজ ত্রিপুরার ককবরক প্রবাদ' শীর্ষক একটা লেখা তৈরি করলাম। বিকেলে সস্ত্রীক সুনীল দেববর্মা, চাফুতি (হেরমার যোগেন্দ্র দেববর্মার বড় ছেলে রমেন্দ্র নারায়ণ দেববর্মার মেয়ে) ও তার স্বামী ও উষা, বেলারা বেড়াতে এলো। তানিয়া তার মাকে নিয়ে রূপাদের বাড়ি গিয়েছিলো।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, সোমবার। সন্ধ্যেবেলায় চিত্রপরিচালক দীপক ভট্টাচার্য তার পিলাকের ওপর লেখা উপন্যাসের পান্ডুলিপি এনে আমাকে পাঠ করে শোনালেন। এর আগে তিনি 'পিলাক কথা' নামে একখানা গবেষণাসমৃদ্ধ বইও লিখেছেন। বইখানা বিদগ্ধ পাঠকমহলে সমাদৃতও হয়েছে বেশ। বইখানা ছেপেছেন আগরতলার 'অক্ষর প্রকাশনী।'

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, মঙ্গলবার। মমতা ব্যানার্জী আস্তাবল মাঠে নির্বাচনী সভা করেন। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও ১০,০০০-এর মতো লোক হয়েছিলো। নগেন্দ্র জমাতিয়া খুব আবেগময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন এই জনসভায়। কিন্তু মমতা ব্যানার্জীর বক্তৃতা শুনে সিরিয়াস শ্রোতারা কিছুটা হতাশ হয়েছেন। তাঁর বক্তৃতায় আবেগ ছিলো বেশী, যুক্তি ছিলো কম। কিন্তু সাধারণ শ্রোতারা মুগ্ধ।

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, বুধবার। Employment Exchange-এ গিয়ে মেয়েদের কার্ড রিনিউ করলাম। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফিরে এসে বিকেলে অক্ষর পাব্লিকেশনে। তারপর দর্পণে

পুজো সংখ্যার আমার গবেষকের ডায়েরী সূচনা পর্বের Proof আনা। রাতে কাকা বীরকুমারের সঙ্গে জ্যাঠা নন্দু (নরেন্দ্র দেববর্মা) এলেন। এবং তাঁরা মেয়ে-জামাইয়ের বাসায় বসে বিলিতি সোমরস পান করতে করতে উপজাতি এলাকার নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। জামাই হিসেবে আমি তাঁদেরকে এক বোতল সোমরস অফার করতে চাইলাম। কিন্তু জ্যাঠাশ্বশুর বললেন, বিলিতি মদ খেতে ভালো লাগে না। কাকা বীরকুমার বললেন, বিলিতি খান আগরতলার কর্তা পরিবারের লোকেরা। আমরা গ্রামের লোকদের কাছে তিপ্রা মদই ভালো, ইচ্ছেমতো খাওয়া যায়। আমি শুধোলাম, শহরের কর্তাদের ঠাকুর-কর্তা পরিবারের মধ্যে কারা এখন সব থেকে ভালো জিনিষ খান? জ্যাঠাশ্বশুর বললেন, শুনেছি ক্ষীরগোপাল কর্তা ও ননীকর্তার পোলা জিষ্ণু কর্তা প্যারিসের মদ ছাড়া খান না। আমি জ্যাঠাশ্বশুরের কথা শুনে বললাম, তাই বোধ হয় তাঁদের গায়ের রঙ লাল টকটকে। ক্ষীরগোপাল কর্তার এতো বয়েস হলো, তবু এখনো তাঁকে ত্রিপুরার প্রিন্স বলে মনে হয়, রঙটা যেন জুমের বাঙ্গির মতন ফেটে পড়ছে কর্তার। আমার কথা শুনে জ্যাঠা নন্দু বললেন, রঙ ছিলো ননী কর্তার, একেবারে আপেলের মতো রঙ। এমন সুপুরুষ চেহারা সারা ভারতবর্ষেই ছিলো না। আমি বললাম, জানেন জ্যাঠা, ননী কর্তার সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী এক সঙ্গে শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করতেন। কাকাশ্বশুর বীরকুমার সোমরসের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, আশ্চর্য, ইন্দিরা গান্ধী আমাদের কর্তার প্রেমে পড়েননি? আমি বললাম, জহরলাল নন্দিনী 'প্রিয়দর্শিনী' ও ত্রিপুরার রাজপুত্র লালুকর্তার সুদর্শন পুত্র ননী কর্তার মধ্যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতার কথা সেদিনকার শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে গুঞ্জনধ্বনি তুলেছিলো। আমার এই কথা শুনে আমার কাকাশ্বশুর সোমরসের কাপ মুখে উপুড় করে আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, পড়তে হবে পড়তে হবে, আমাদের রাজপুত্রের প্রেমে প্রিয়দর্শিনীকে পড়তেই হবে। তারপর তিনি গুনগুন করে গাইতে শুরু করলেন, 'ভরাথাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি'। আমার এই কাকাশ্বশুর একসময় খুব ভালো গান গাইতেন। কিন্তু তাঁর গলায় রবীন্দ্রসংগীত কোনোদিন শুনিনি। সোমরসের আসরে তাঁর মধুর গলায় রবীন্দ্রসংগীত শুনে আমিও আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠলাম। মনে মনে বললাম, এস ডি বর্মণ- ঝর্ণা দেববর্মণের রক্ত যাবে কোথায়? কাকাশ্বশুর একসময়কার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ত্রিপুরার এক রাজপুত্রের সুদর্শন পুত্রের গভীর ভালোবাসার স্মৃতি যেভাবে রোমন্থন করলেন, তাতে বিস্মিত হয়ে গেলাম আমি। আমারও হৃদয়াবেগ বেড়ে গেলো। দেখলাম, পানপাত্র নিঃশেষিত প্রায় দুই শ্বশুরের। তখন আমি বিনীতভাবে বললাম, এমন একটা আনন্দঘন আসরে মেয়ে-জামাইয়ের তরফ থেকে একটা বিলিতি আদিছা (অর্ধেক-ককবরকভাষায় অর্ধেক বোতলকে 'আদিছা' বলে) অফার না করলে অশোভন হবে। আমার কথা শুনে কাকা বীরকুমার বললেন, এমন সময় কোথায় পাবে বিলিতি চুয়াক (মদ- ককবরক ভাষায় মদকে বলে চুয়াক)? বললাম, আমার কর্তার বাড়ির গেটের কাছেই তো বিলিতি চুয়াকের দোকান। কাজেই এক্ষুণি এসে যাবে কারণবারি। আমার ছোট শালা বিমলকে একশো টাকার একখানা নোট দিয়ে ককবরকে বললাম, আদিছা তুবদি চুয়াক বিলিতি, দদি (আধ বোতল বিলিতি মদ নিয়ে এসো, যাও তাড়াতাড়ি)। পাঁচ মিনিটের ভেতর কারণবারি সুধা এসে গেলো। এদিকে আমার স্ত্রী কাকা-জ্যাঠা কারণবারি খাচ্ছেন দেখে আমার অজান্তেই কর্ণেল চৌমুহনী থেকে শূকরের মাংস এনে কষতে শুরু করেছেন। তাঁর গন্ধও নাকে লাগছে আমাদের। একটু পরেই দুটো প্লেট ভর্তি করে কষা শূকরের মাংস আমার স্ত্রী ফুলকুমারী এনে দিতেই আমার শ্বশুরদ্বয় খুশিতে মেতে উঠলেন একেবারে। আবার জমজমাট হয়ে উঠলো আসর। শ্বশুরদের সম্মানে সোমরস উপহার দিতে পারায় আমারো মন ভরে উঠলো অনাবিল আনন্দে। আমি মুখ খুললাম এবার। আচ্ছা, জ্যাঠা, শুনেছি ননীকর্তার বড়োছেলে ভরতের চেহারাও নাকি তার বাবার মতোই সুন্দর। আমার কথা শুনে কাকা

বীরকুমার বলে উঠলেন, জানোনা তুমি, আমাদের ভরত দেববর্মা একবার ভারতশ্রী হয়েছিলো। আর তার চেহারা দেখে ভিরমি খেয়ে পড়লো সুচিত্রা সেনের মেয়ে মুনমুন সেন। আর আমাদের ত্রিপুরার গর্ব ভারতের দু'মেয়ে রাইমা ও রিয়াকে তো হামেশাই আমরা দেখি টি ভি-র পর্দায়। আমি বললাম, জানেন কাকা, একবার কী হয়েছিলো? মুনমুন সেন তো এলেন আগরতলায় একটা ক্লাবের অনুষ্ঠানে সেখান থেকে গেলেন শ্বশুরালয় ননীকর্তার বাড়ি। শাশুড়ী রাজকুমারী কমলপ্রভা আদর-আপ্যায়নের ক্রটি করলেন না এতটুকু সিনেমার নায়িকা পুত্রবধূকে। কিন্তু মোক্ষম একটা কথা বললেন তাঁকে কাছে ডেকে। শোনো বৌ, তুমি হলে সিনেমার নায়িকা, এখন কিন্তু তুমি ত্রিপুরার রাজপরিবারের পুত্রবধূ। আমার একটা কথা রাখো, তোমার নটীগিরি এখন থেকে ছাড়ো, এটা আমাদেব রাজপরিবারের সঙ্গে একেবারেই বেমান।

আমার কথা শুনে আমার কথাশ্বশুর বেশ উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর'?

— তারপর আর কী, মুনমুন সেনের সুন্দর মুখটা কালো হয়ে গেলো একেবারে।

— তাহলে রাইমা-রিয়া যে টি ভি-সিনেমায় অভিনয় করছে তাতে তার ঠাকুরমা মহারাজকুমারী মোটেই পছন্দ করছেন না? প্রশ্ন করেন জ্যাঠাশ্বশুর

— তা আমি জানিনে। তবে এটা জানি, তাঁর নাতনীরা বাপের পদবী দেববর্মণ না রেখে মায়ের পদবী সেন নেয়ায় বেজায় চটেছেন রাজকুমারী কমলপ্রভা।

— চটবেনই তো চটবেনই তো বলে কাকা বীরকুমার মাথা নাড়াতে শুরু করলেন।

এর মধ্যে আমি দেখি, আমার দেয়া সোমরসও শেষ প্রায়। তখন আমি আরো বিনীতভাবে বললাম, বিলিতি চুয়াক তো শেষ, এবার আদিছা তিপ্‌রা চুয়াক দিই। আমার কথা শেষ হতেই আমার দুই শ্বশুর প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন বলো কি, তিপ্‌রা চুয়াক, আমাদের চুয়াক, তা কে পাঠালো'?

— সে দিন পি ললিতা (আমার ছোট পিসিশাশুড়ী - ললিতা পিসি) গ্রাম থেকে কড়া পাকের এক বোতল পাঠিয়েছেন, তার অর্ধেকটা আছে। তিনি মাঝেমধ্যেই তাঁর নাতি-নাতনীদের জন্যে এরকম পাঠান।

—তাহলে তুমি আমাদের বিলিতি চুয়াক খাওয়ালে কেন, তিপ্‌রা চুয়াক না খাইয়ে? — কাকা শ্বশুব প্রশ্ন করলেন।

— ভাবলাম, বিলিতির পাশে তিপ্‌রা চুয়াক কি দাঁড়াতে পারবে'? তাই .....।

— জানো, আমাদের কড়াপাকের তিপ্‌রা চুয়াকের কাছে বিলিতি চুয়াকও হারমানে'?

এবার আমার ছোট পিসশাশুড়ীর পাঠানো তাঁর হাতে তৈরী বিন্নি চালের চুয়াক আদিছা (আধ বোতল সোমরস) আমার স্ত্রী এনে দিলেন আমার শ্বশুরদ্বয়ের পানের আসরে। আমার কাকাশ্বশুর এক চুমুক দিয়েই বলে উঠলেন, আঃ, তুলনা হয় না, তুলনা হয় না, আমাদের বিন্নি চালের কড়াপাকের চুয়াকের কাছে বিলিতি চুয়াক দাঁড়াতেই পারে না, আঃ কী মনমাতানো গন্ধ, আর কী স্বাদ!

কাকাশ্বশুরের তিপ্‌রা কড়াপাকের চুয়াকের সুখ্যাতি শুনে একটা গল্প মনে পড়ে গেলো আমার। সবিনয়ে আমি বললাম, আপনাদের কড়াপাকের এই চুয়াকের সুখ্যাতি সম্পর্কে একটা গল্প আমি বলতে পারি।

— কেমন গল্প ? জ্যাঠাশ্বশুর সোৎসাহে জিজ্ঞেস করেন।

— শুনুন, গল্পটা আমি শুনেছিলাম কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড সরোজ চন্দের কাছ থেকে।

— কমরেড সরোজ চন্দ, আমাদের এতো বড়ো নেতার কাছ থেকে শুনেছো কড়াপাক তিপ্‌রা চুয়াকের গল্প, তা বলেই ফেলো, শোনা যাক।

— তাহলে শুনুন। সারা পৃথিবীতে সেবার চলছে আন্তর্জাতিক যুব উৎসব। আমাদের ত্রিপুরাতেও তার ঢেউ এসে লাগলো। সি পি আই পার্টি তার গণসংগঠনের এই যুব উৎসব তো করলো খুব ঘটা করে। এলেন কমরেড এ কে গোপালন সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে। আর তার সঙ্গে এলেন আনন্দবাজার পত্রিকার জাঁদরেল সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তা কমরেড গোপালন উঠলেন নৃপেন চক্রবর্তীর দাদা ডাক্তার নন্দলাল চক্রবর্তীর বাড়ি। আর সত্যেনবাবুকে রাখার ব্যবস্থা করা হলো কমরেড বীরেন দত্তর দাদা ধীরেন দত্তর স্ত্রী রাণু বৌদির তত্ত্বাবধানে।

— আহা, তুমি তো ভুল বললে, কমরেড গোপালন তো সি পি এম-এরই নেতা।

— না না, আমি যখনকার কথা বলছি তখন সি পি আই ভাঙেনি, এটা খুব সম্ভব উনিশশো চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন সালের কথা। পার্টি তখন আস্তই আছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, খুব মজার কথা, বুঝলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার এই জাঁদরেল সম্পাদক আবার সোমরসের ভক্ত, ঝিলিতি চুয়াক ছাড়া ছোঁন না তিনি। তা আবার পৃথিবীর সেরা জিনিষ — ফরাসী দেশের চুয়াক। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা পড়লেন মহা ফাঁপরে।

— কি মুশকিলেই না পড়া গেলো, তুমি কেমন তরো কথা বলছো, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার হলো এক বুর্জোয়া কাগজের সম্পাদক, তিনি আবার কমিউনিষ্ট পার্টির যুব উৎসবে আসেন কেমন করে?

বুর্জোয়া কাগজের সম্পাদক হলে কি হবে, তাঁর মনটা ছিলো কিন্তু বামপন্থী। আপনারা তো নাম শুনেছেন যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখার্জীর, তিনিও ছিলেন বামঘেঁষা, বামপন্থী পার্টিগুলোর কতো মিটিঙেই না তিনি বক্তৃতা করেছেন।

— আচ্ছা, বিবেকানন্দ মুখার্জীও কি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো মদ খেতেন? প্রশ্ন করলেন আমার জ্যাঠাশ্বশুর নরেন্দ্র দেববর্মা।

— মদ খেতেন মানে? ভ্রু পর্যন্ত ডুবিয়ে খেতেন। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখার্জী, ভূপেন দত্তভৌমিকদের কথা আর বলবেন না। কারণবারি জিভে না পড়লে তাঁদের কলম দিয়ে আগুনের ফুলকি বেরোতো না।

— এবার আমার কাকা কড়াপাক তিপ্‌রা চুয়াকে ঠোঁট ভিজিয়ে অনুযোগের সঙ্গে বললেন,

—তুমি আর যাই বলো জামাই, আমাদের ভূপেন দত্ত ভৌমিক কিন্তু বামপন্থী ছিলেন না, ছিলেন একদম দক্ষিণপন্থী।

— না, আপনি ঠিকই বলেছেন, কাকা, ভূপেনবাবু প্রথমে ছিলেন বামপন্থী, আর পরে বামপন্থীরাই তাঁকে দক্ষিণপন্থী শিবিরে ঠেলে দিয়েছেন।

— আহা, আমরা না হয় চুয়াক খেয়েছি, তুমি তো আর চুয়াক খাওনি, তোমার কথাগুলো কেমন যেনো বেসুরো লাগছে।

— না, না, বেসুরো লাগবার কিছু নেই, আপনি বোধ হয় জানেন না, কাকা, ভূপেন দত্ত ভৌমিক আগে সি পি এম-এর ছাত্র সংগঠন এস এফ আই করতেন, যতদূর শুনেছি ডি ওয়াই এফ-এরও মেম্বার ছিলেন তিনি। আর, একসময় তাঁকে তো নৃপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে এক বিছানায় শুতে দেখেছে সকলে। একসময় বলা হতো, ভূপেন দত্ত ভৌমিকের গুরুদেব নৃপেন চক্রবর্তী।

আমার কথা শুনে আমার জ্যাঠাশ্বশুর সোমরসের কাপে চুমুক দিয়ে হাসতে হাসতে বলে উঠলেন — তাই বোধ হয় নৃপেন চক্রবর্তী সি পি এম থেকে বিতাড়িত হয়ে তাঁর মন্ত্রশিষ্যর দক্ষিণপন্থী কাগজে আশ্রয় নিলেন।

— ছেড়েদিন এসব কথা, মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। মাঝখানে আমার কড়াপাক তিপ্‌রা চুয়াকের গল্পটাই

ভেস্তে গেলো।

— সাঙ্গ করো তোমার গল্প, আমাদের পানপাত্রও নিঃশেষিত প্রায়।

— মাঝখানে মুনি-ঋষিদের জয়গাথা গাইতে গিয়ে কড়াপাক তিপ্‌রা চুয়াকের জয়গানের খেই হারিয়ে গেলো আমার। তা কী বলছিলাম। হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা পড়লেন ফাঁপরে। অথচ আনন্দবাজার পত্রিকার জাঁদরেল সম্পাদককে চুয়াক না খাইয়ে তো উপায় নেই। এখন কী করা? শেষে ঠিক হলো হাওয়াইবাড়ির চুয়াক খাইয়ে বাজিমাত করতে হবে।

— হাওয়াইবাড়ির চুয়াক? আমার কাকাশ্বশুরের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো।

— ভ্রূ কঁচকোবেন না। তেলিয়ামুড়ার কাছে হাওয়াইবাড়ি হলো তিপ্‌রা মদের স্বর্ণভাণ্ডার। হাওয়াইবাড়ির চার বোতল চুয়াক জ্বাল দিয়ে এক বোতল করে যারা খেয়েছে, তাদের কাছে ফরাসী চুয়াক আর রাশিয়ার ভদকা যাকে বলে জ-ল

— বলো কি তুমি? কাকাশ্বশুর আবার ভ্রূ কুঁচকোলনে।

— না খেলে আপনি বুঝবেন না। শুনেছি হাওয়াইবাড়ির চুয়াকে আগুন জ্বলে। আর সেই কড়াপাক হাওয়াই— দাওয়াই এক বোতল এনে রাখা হলো রাণু বৌদির কাছে। ঠিক হলো, সত্যেনবাবু যুব উৎসবে বক্তৃতা দিয়ে রাণু বৌদির ডেরায় ফিরলেই তাঁকে হাওয়াই দাওয়াই দিয়ে আপ্যায়িত করা হবে। তবে বিলিতিও রাখা হবে আগরতলায় যা পাওয়া যায়। সেদিন হলো কী আবার, যুব উৎসবে বক্তৃতা করে তিনি জনশিক্ষা প্রেস পরিদর্শন করতে গিয়ে বিশ্রাম করলেন সেখানে একটু গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার সঙ্গে গল্প করতে করতে। এমন সময় একজন কমিউনিষ্ট নেতা এসে বললেন, সত্যেনবাবু, আপনাকে তো এখন নেতাজী স্কুলে যেতে হবে শিল্পী-সাহিত্যিকদের আলোচনাচক্রে যোগ দিতে।

কমিউনিষ্ট নেতার প্রস্তাব শুনে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মেজাজ গেলো বিগড়ে। যুব উৎসবে বক্তৃতা করার পরে আশা করেছিলেন একঢোক হলেও জিভে কিছু পড়বে। মানসিক অবসাদ কাটবে একটু, তা নয়, আবার শিল্পী-সাহিত্যিকদের মুখোমুখি হয়ে আবার বকবক করা। কিছুটা বিরক্তি সহকারে বললেন, আবাব আমাকে কেন? আপনাদের গোপালন সাহেবকে নিয়ে যান না, আমার মুডটা তেমন ভালো নেই।

— না মানে, সেখানে আপনি যাবেন বলে সকলে অপেক্ষা করে আছে।

ইতিমধ্যে কে একজন গঙ্গাপ্রসাদ শর্মাকে ডেকে কানে কানে কি যেন বললেন। গঙ্গাপ্রসাদও সত্যেনবাবুর কানের কাছে মুখ রেখে ফিস ফিস করে বললেন, ওটা আছে, সত্যেনবাবু, শিল্পী-সাহিত্যিকদের সভা সেরে ইচ্ছে মতো পান করতে পারবেন।

গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার ফিসফিসানি মন্ত্রের মতো কাজ করলো। মুড ফিরে পেলেন সত্যেনবাবু। বললেন, চলুন তাহলে কোথায় নিয়ে যাবেন, শিল্পী-সাহিত্যিক বলে কথা।

নেতাজী স্কুলের শিল্পী-সাহিত্যিকদের সভার শেষে সত্যেন মজুমদারকে নিয়ে যাওয়া হলো জয়নগরে রাণু বৌদির তত্ত্বাবধানে। কাপড়-চোপড় ছেড়ে, হাত-পা ধুয়ে খোশ মেজাজে বসলেন তিনি খাটের ওপর। তারপর সরোজ চন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন, কই হে সরোজ, তোমরা বলেছিলে কি নাকি খাওয়াবে। আজকে বড্ড বেশী বকবক করেছি।

এমন সময় হাওয়াইবাড়ির সোমরসের বোতল ও একটা কাপ তাঁর সামনে পাঠিয়ে দিলেন রাণু বৌদি পর্দার আড়াল থেকে। দেশী কারণবারির বোতল দেখে তিরিক্ষি মেজাজে বললেন, এতো দেখছি দিশি, দিশি জিনিষ আমি ছুঁই না একেবারে।

— আমাদের হাওয়াইবাড়ি স্পেশাল এটা। এটা খেয়ে যদি ভালো না লাগে, তাহলে বিলিতিই

খাবেন, সেটারও ব্যবস্থা আছে।

— তাই নাকি। তা বেশ, চেখেই দেখি আগে তোমাদের হাওয়াইদ্বীপের স্পেশাল, যখন এত যত্ন করে খাওয়াতেই চাইছো।

এবার আনন্দবাজার পত্রিকার জবরদস্ত সম্পাদককে এক কাপ পরিবেশন করা হলো খুব ভয়ে ভয়ে। হাওয়াইবাড়ি স্পেশাল এক চুমুক খেয়েই সম্পাদক মশায় বলে উঠলেন, তোফা তোফা, এযে দেখছি প্যারিশের সোমরসের সমান। বিলিতি আর খাওয়াতে হবে না। আমার কাছে দিশি মদের কনসেপ্ট-ই পাল্টে গেলো সরোজ। এই কথা বলে পুরো কাপটাই উপুড় করে দিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার — কলকাতার সংবাদপত্রের সম্পাদক শিরোমণি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলো তো তোমরা, কেমন করে এমন জিনিষ বানায় এখানে? এর গন্ধই আলাদা, স্বাদের কথা বলেতো শেষ করা যাবে না।

— জানেন সত্যেনদা, আমাদের হাওয়াইবাড়ির ট্রাইবাল বাড়িতে এ জিনিষ পাওয়া যায়। স্পেশাল অর্ডার পেলে ওই গ্রামের ত্রিপুরী-জমাতিয়া-কলই মেয়েরা এমন কড়াপাকের জিনিষ করে দেন।

— বলো কি! নিশ্চয়ই তোমাদের হাওয়াইদ্বীপের মেয়েবা জাদু জানেন। আর্ এমন সুগন্ধই বা বেরোয় কি করে?

— গ্রামটার নাম হাওয়াইদ্বীপ নয়, সত্যেনদা, হাওয়াইবাড়ি।

না না, ওটা হাওয়াইদ্বীপই — হাওয়াইবাড়ি নয়, হাওয়াইবাড়ি বললে নামটা মনে থাকবে থাকবে না, কলকাতায় গিয়ে গল্প করতে হবে তো।

— আপনি যে সুগন্ধের কথা বলছিলেন, সত্যেনদা, তার কারণ কি জানেন, এটা বিন্নি চালের মদ। ত্রিপুরার ট্রাইবাল মেয়েরা তাঁদের জুমে বিন্নি ধান করেন। সেই সুগন্ধী চাল থেকে এই মদ করা হয়, আর সে জন্যেই এতো মনমাতানো গন্ধ।

—বিন্নি চাল, বলো কি সরোজ, সে তো জসিমুদ্দিনের কবিতায় আছে 'বিন্নি ধানের খৈ'। কবিতায় পড়েছি খাইনি কখনো। আজ সেই ভুবন বিখ্যাত ধানের মদ খেলাম ত্রিপুরায় এসে। তোমাদের ওই হাওয়াইদ্বীপের ট্রাইবাল মেয়েদের আমার কথা বলো, আমার শ্রদ্ধা জানিয়ো তাদেরকে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে ওঁদের জয়গান গাইবো আমি। আর, সরোজ, পরেরবার কোনসময় তোমাদের এখানে এলে আমাকে একটু নিয়ে যেয়ো, তোমাদের হাওয়াইদ্বীপের ললনাদের আমাব নিজের চোখে দেখে আসবো একবার।

এরপর আরো এক কাপ খেলেন সম্পাদক মশায়। এভাবে হাফ বোতোল খেয়ে ফেলে একটু জড়ানো গলায় বললেন, জানো তো সরোজ, আমার আবাব অর্শের অসুখ, আর্দ্ধেকটা থাক। সবটা খাওয়া উচিত হবে না। কাল রাতে আবার খাওয়া যাবে। এবার খেয়ে শুয়েপড়া যাক। আঃ, কি যে খাওয়ালে তোমরা হাওয়াইদ্বীপের কারণসুধা।

আমার এই গল্প একেবারে গোগ্রোসে গিলছিলেন আমার দুই শ্বশুর। কাকাশ্বশুর জিজ্ঞেস করলেন, তারপর সেই আদিছা পরের রাতে খেলেন উনি !

— না, পরের দিন রাতের বেলায় সম্পাদক মশায়কে নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করলেন হরিদাশ চক্রবর্তী মশায়।

— হরিদাশ চক্রবর্তী, তিনি আবার কে, আমরা শুনেছি কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্যের বাবা হরিদাস ভট্টাচার্যের কথা। আমার জ্যাঠাশ্বশুর বলে উঠেন।

— না জ্যাঠা, ইনি হলেন হরিদাস চক্রবর্তী, কংগ্রেস নেতা প্রিয়দাস চক্রবর্তীর দাদা। তা শুনুন, হরিদাসবাবুরা জানতেন শিবকে কী করে তুষ্ট করতে হয়। একেবারে দামী বিলিতি শরাব দিয়েই তাঁরা

আপ্যায়ন করলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে। রাতের বেলায় সেখান থেকে ফেরার সময় সদ্য নিঃশেষিত বোতলটাকে ঢুকিয়ে ফেললেন সকলের অজান্তে তাঁর কাঁধের ঝোলা ব্যাগের ভেতর। পরের দিন সকাল বেলায় ফ্লাইট। তাড়াতাড়ি প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে হাল্কা জল খাবার খেলেন রাণু বৌদির কাছ থেকে। তারপর সুটকেস গোছাতে গোছাতে ডাকলেন রাণু বৌদিকে — রাণুমা, পরশু রাত্রের হাওয়াই স্পেশালের বোতলটা আনো একবার। এই বিলিতি বোতলে ঢেলে কলকাতায় নিয়ে যাই। কলকাতার বন্ধুদের আমাকে হাওয়াইদ্বীপের ট্রাইবাল ললনাদের বিন্নি চালের তৈরী সোমরস খাওয়াতে হবে বলেই তিনি কড়াপাক তিপ্‌রা চুয়াক বিলিতি চুয়াকের বোতলে ঢেলে ছিপি এঁটে দিলেন।

— তাহলে তুমি বলছো আমাদের কড়াপাক তিপ্‌রা চুয়াক বিলিতি বোতলে ঢুকে কলকাতায় চলে গেলো আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকের সুটকেসের মধ্যে চোখ বুজে। দারুণ রসিক লোক ছিলেন তো তাহলে সম্পাদক সতেন্দ্রনাথ মজুমদার।

— রসিক মানে? রসিক চূড়ামণি যাকে বলে। এ-সম্পর্কে একটা ছোট্ট গল্প বলবো আপনাদেরকে। গল্পটা এরকম — মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলীতে মারা গেছেন। সারা দেশে শোকপ্রবাহ বইছে। কলকাতায়ও শোকসভার আয়োজন করা হয়েছে জাতির জনকের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। শোকসভায় আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও যুগান্তর পত্রিকার মালিক তুষারকান্তি ঘোষ মুখোমুখি হলেন। সত্যেনবাবুকে সামনেই পেয়ে খুব উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন তুষারকান্তি-
– সত্যেনবাবু, এখন কী হবে? মহাত্মা গান্ধী তো মারা গেলেন?

— কেন, আপনি তো আছেন। মুখের ওপর বলে ফেললেন আনন্দবাজার পত্রিকার রসিক সম্পাদক।

এই কথা শুনে আমার দুই শ্বশুর হোঃ হোঃ করে হেসে ফেললেন। বললেন, সত্যিই ভদ্রলোক রসিকই বটে।

আমি আমার শ্বশুরদ্বয়ের মনোরঞ্জন করতে সবিনয়ে বললাম, আপনাদের যদি ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে তাহলে আপনাদের তিপ্‌রা চুয়াক খেয়ে আরো দু'জন বিখ্যাত লোক কী বলেছিলেন তা বলতে পারি। আমার কথা শুনে তাঁরা চটপট উক্তি করলেন — বলো বলো, তোমার ভাণ্ডারে তিপ্‌রা চুয়াক নিয়ে যতো গল্প আছে বলো, নিজেদের জাতিগোষ্ঠীর চুয়াক হুকুমু (সোমরস সংস্কৃতি)'র জয়গাথা শুনতে কাদের না ভালো লাগে। তখন আমি বললাম — শুনুন, একবার আমার এক বন্ধু অসিত চক্রবর্তী এলেন আপনাদের গ্রামে আমার শ্বশুরবাড়িতে। অসিতবাবু আমার সঙ্গে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে এম এ পাশ করেছিলেন ষাটের দশকে। তিনি ছিলেন আমার থেকে অন্তত কমছে কম বছর দশকের বড়ো। চাকরি করতেন তখন যুগোস্লাভিয়ার দূতাবাসে দিল্লীতে। আমার এই বন্ধু অনেকগুলো ভাষা জানতেন পূর্ব ইউরোপের। রুশ ভাষার অনেক গল্প, উপন্যাস ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাষা ও জাতিগত সমস্যা নিয়ে অনেক বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন তিনি। যদিও তিনি যুগোস্লাভিয়া-দূতাবাসে চাকরি করতেন একজন ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে। তাঁর মন কিন্তু পড়ে থাকতো বড়ো গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার গবেষণার কাজে। তা হলো কি, আমার এই অগ্রজপ্রতিম বন্ধু একদিন দিল্লী থেকে সোজা চলে এলেন আপনাদের হেরমা গ্রামে। তখন তার চুলে পাক ধরেছে বেশ। একদিন শীতের সন্ধ্যে বেলায় তো এসে উপস্থিত আমাদের ঘরে। তাঁকে দেখেই চিনে ফেললাম, অসিতবাবুই তো। উনি হেসে বললেন, খুব মজা করেছি তাই না ?

— খুব মজাই তো, দিল্লী থেকে সোজা ট্রাইবালল্যাণ্ডে ছুটে এসেছেন, তা কী ব্যাপার?

— ব্যাপার আছে বলেই তো এসেছি। শুনন, আমি বোড়োগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার একখানা

তুলনামূলক বই লিখতে শুরু করেছি। নাম হবে 'বড়ো প্রবেশ'। তাই আপনার গবেষণার ভাষা ককবরকের সঙ্গে বোড়ো, দিমাছা কোচ, মেচ, চুতিয়া প্রভৃতি ভাষার কতটা মিল আছে, তা আপনার সঙ্গে বসে একটু যাচাই করে দেখতে চাই, বিশেষ করে ককবরকের টোন আর ক্লাসিফায়ার (জীব ও বস্তুর দেহের আদল অনুসারে গণনা পদ্ধতি) জানতে চাই।

এদিকে জামাইয়ের বন্ধু এসেছে দিল্লী থেকে, বুঝলেন, আমা (শাশুড়ী মা) তাঁকে কীভাবে খুশী করবেন তানিয়ে ব্যস্ত। ফুলটিও আমা-র সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছে। আমি ককবরকে আমাকে বললাম, চুঙ মাসতর মছাইনি আর' থাঙনা নাইঅ, চুঙ ফাইনা লেরনূ (আমার মাষ্টার মশায়ের কাছে যাচ্ছি, আমাদের ফিরতে দেরী হবে। আমার ছোট শ্বশুর প্রশ্ন করলেন মাঝখানে কোন মাষ্টারের কথা বলছো তুমি।

— যোগেন্দ্র মাষ্টারের কথা।

— ও, বুঝেছি, তারপর?

— তারপর তো অসিতবাবুকে নিয়ে গেলাম যোগেন্দ্রবাবুব কাছে। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, অসিতবাবু, ইনি হচ্ছেন আমার ককবরকের শিক্ষাগুরু। কাজেই আপনার টোন আর ক্লাসিফায়ার নিয়ে এঁর সঙ্গে আলোচনা করুন। আলোচনা শুরু হলো। যোগেন্দ্রবাবু এর আগে ডঃ সুহাস চ্যাটার্জীর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কাকে টোন ও কাকে ক্লাসিফায়ার বলে তা জেনেছেন। আমিও ককবরক ভাষায় বিশেষ গণনা পদ্ধতির ওপর বিশদভাবে ডেটা নিয়েছি যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে বসে। কাজেই আমরা দু'জনে অসিতবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলাম। উনি সেগুলোকে আবার ককবরকের সহোদরা ভাষা দিমাছা ও বোড়োর সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিলেন। একটা টোন পার্থক্যযুক্ত শব্দ যেমন, 'মূছা'। এই শব্দের উচ্চারণ পার্থক্য হলে একটার অর্থ হবে 'বাঘ' এবং অন্যটিরে অর্থ হবে 'নাচা'। এরপর যোগেন্দ্র মাষ্টার দু'টো বাক্য বললেন — (১) আঙ মূছাইনাইখা — আমি বাঘ দেখেছি। (২) আঙ মূছা নাইখা — আমি নাচার জন্যে তৈরী হয়েছি।

যোগেন্দ্রবাবু 'মূছা' শব্দ দিয়ে বাক্য দুটো বলায় অসিতবাবু কোন 'মূছা' উচ্চারণের ওপর গলার স্বরের ওঠানামা কেমন তা বোঝার জন্যে যোগেন্দ্রবাবুকে বারবার উচ্চারণ করতে বললেন। তারপর অসিতবাবু আরেকটা উদাহরণ জিজ্ঞেস করতেই মাষ্টারমশায় বললেন — (১) আ বূতূই তুবদি — মাছের ঝোল আনো। (২) আ বূতূই তুবদি — মাছের ডিম আনো।

বন্ধুবর অসিতবাবু তখন 'বূতূই' এর কোন উচ্চারণটা ঝোল আর কোন উচ্চারণটা ডিম তা বোঝার জন্যে মাষ্টারমশায়কে নিয়ে বারবার উচ্চারণ করালেন। এই করতে করতে বেশ রাত হয়ে গেলো। ফুলটি এসে বললো, হর থুককা মাই চায়াদা নরগ? — রাত গভীর হয়েছে, তোমরা ভাত খাবে না নাকি?

ফুলটির কথা শুনে অসিতবাবুকে বললাম, এখন কাজ ছাড়ুন। কাল আবার বসা যাবে মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে। জানেন তো, ট্রাইবালল্যাণ্ডে রাতের খাবার একটু আগেই খায়। মাষ্টার মশায়েরও খাবার সময় হয়েছে। চলুন এবার যাওয়া যাক।

— তা এবার তোমার বন্ধুর চুয়াক খাবার গল্পটা বলো? শুধোলাম কাকাশ্বশুর।

— শুনন, বাড়ি যেতেই আমা (শাশুড়ী) ডাকলেন আমাদেরকে বড়ো ঘরে যেতে। গিয়ে দেখি শাশুড়ী মা মাটিতে একটা মাদুর পেতে রেখেছেন। আমরা সেই মাদুরে বসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, নিনি য়ার চুয়াক দা নূঙ, ছূঙগূই নাইদি — তোমার বন্ধু মদ খায়, জিজ্ঞেস করে দ্যাখো।

আমা-র কথা শুনে অসিতবাবুকে বললাম, অসিতবাবু আমার শাশুড়ীমা জিজ্ঞেস করছেন আপনি মদ খান কিনা।

— মদ খাই মানে। আমাকে তো বছরের অর্ধেক সময় যুগোস্লাভিয়ায় কাটাতে হয়, কাজেই যুগোস্লাভিয়ায় কীরকম শীত তো জানেন। আর দিল্লীতে দিল্লীর দূতাবাসে তো হামেশাই খেতে হয়।

বন্ধুবরের এমন মদ খাবার অভ্যেস শুনে শাশুড়ীমাকে বললাম, নৃঙ ফুন — খান বলে বলেছেন।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই ফুলটি এক বোতল তিপ্‌রা চুয়াক ও দুটো কাপ এনে আমাদের সামনে আনতেই খুব খুশী হয়ে অসিতবাবু বললেন, বন্ধুবত্নী দেখছি দারুণ ব্যাপার করেছেন। তা বান্ধবীর কাপ কই? খেলে বান্ধবীকে নিয়ে খাবো।

ফুলটি তখন আরেকটা কাপ নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে বসে পড়লো। তারপর আপনাদের 'তূই কবর' (পাগলা পানি)-এর প্রথম কাপটা আমার বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, খাইয়া দেখুন, আমাদের তিপ্‌রা চুয়াক ভালা না খারাপ। এরপর আমার দিকে এক কাপ এগিয়ে দিয়ে ফুলটিও নিজে এক কাপ ঢেলে নিলো নিজের কাপে।

বন্ধুবর এবার চুমুক দিলেন তিপ্‌রা সোমরসে। চুমুক শেষে বললেন, কুমুদবাবু, এ যে দেখছি যুগোস্লাভিয়ার গ্রামীণ মদ। দারুণ স্বাদ তো আপনার শ্বশুরকুলের তিপ্‌রা মদের। বন্ধুবর সোমরসে ঠোঁট ভেজানোর পর আমরা স্বামী-স্ত্রীও ঠোঁট ভেজালাম। আমাদের কাছে নতুনত্বের কিছু ছিলো না। কিন্তু আমার মনে পড়লো প্রথম যেদিন মাসিমার হাত থেকে 'তূই কবর' (পাগল পানি) খাই - সেই দিনের কথা। পরের দিন অজানা অচেনা জায়গায় ঘুম ভাঙতে খুব দেরী হয়েছিলো। আমাকে একটু আনমনা হতে দেখে বন্ধুবর জিজ্ঞেস করলেন, কী ভাবছেন কুমুদবাবু? বললাম, না, মানে বাইরের লোক যাঁরাই এই তিপ্‌রা চুয়াক খান, তাঁরাই এর প্রশংসা করেন।

— করবে না কেন বলুন, এ-রকম বিশুদ্ধ চালের মদ কোথায় পাবে? আর, বিন্নি চালের যদি হয়, তবে তো কথাই নেই।

— আপনি কি এর আগে কোথায় বিন্নি চালের মদ খেয়েছেন?

— আমি তো এর আগে বোড়ো এলাকায় গিয়ে থেকেছি, সেখানে বিন্নি চালের চুয়াক খেয়েছি আমি। তবে কি জানেন, বিন্নি চালের মিষ্টি গন্ধের মদ খেয়ে বেশিক্ষণ টিকে থাকা যায় না।

আমাদের কথা এগোতে থাকলো যুগোস্লাভিয়ার মদ ও রাশিয়ার ভদকার মধ্যে দিয়ে। আর তার ফাঁকে ফাঁকে ফুলটি বন্ধুবরের কাপ ভর্তি করে দিচ্ছিলেন উপছে পড়ার মতো করে। এর মধ্যে শাশুড়ী মা প্লেটে করে কষা মুরগীর মাংস এনে দিলেন তিন প্লেট। বন্ধুবর শাশুড়ীমায়ের দিকে খুলুমকা (প্রণাম করলাম) বলে চুয়াকের সঙ্গে তহান (মোরগ-মুরগীর মাংস) চিবোতে শুরু করলেন। এক বোতল চুয়াকের আদিছা (অর্ধেক বোতল)'রও বেশী গলাধঃকরণ করলেন অসিতবাবু। এর মধ্যে ফুলটি গেলো গানতিনক (রান্নাঘর)-এ। ফিরে এসেই বললো, মাই খুরবাইখা, তা নৃঙছিদি ফুন, আমা ছাঅ। এবার অসিতবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, ভাত বাড়া হয়েছে, শাশুড়ীমা বলেছেন এখানেই থামতে, আপনি নতুন লোক, তাই তাঁর ভয়। আমার কথা শুনে বন্ধুবর হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, কোনো ভয় নেই, স্লাভীয় চুয়াক আর রাশিয়ার ভদকায় সদা অভ্যস্ত আমি।

এর মধ্যে ফুলটি দু'খানা পিতলের বড়ো থালে করে ভাত এনে উপস্থিত। দেখি, শাশুড়ী মা পুঁঠি মাছ দিয়ে কাঁচা হলুদ রানা করেছেন। শ্বশুর মশায় বিকেলে আন্দি নদীতে গিয়ে পুঁঠি মাছ ধরে এনেছেন। আর তা দিয়ে আমা কাঁচা হলুদের তরকারি রেঁধেছেন। এবার আমার ছোটশ্বশুর মুখ খুললেন, ছূতূইনি মুই নুগুই নিনি য়ার তাম ছাকা? (হলুদের তরকারি দেখে তোমার বন্ধু কী বললেন?)

— মাছ দিয়ে কাঁচা হলুদের তরকারি দেখে তো বন্ধুবর অবাক। খাবেন কি খাবেন না ইতস্তত করছেন দেখে আমি বললাম, অসিতবাবু, এ হলো কাঁচা হলুদ বেটে পুঁঠি মাছ দিয়ে রান্না করা তরকারি।

যাকে বলে বিশুদ্ধ তিপ্‌রা খানা। আপনি খান পুরো বাটিটাই, কিছ্ছু হবে না, শরীরের রক্ত শোধন হয়ে যাবে।

— না, ইয়ে, মানে, এরকম কাঁচা হলুদের তরকারি জীবনে খাইনি, তাই ভাবছিলাম.....

— না না, ভাবার কিছু নেই। এখানে ট্রাইবাল বাড়িতে শীতের মাসগুলোতে সবসময় কাঁচা হলুদের তরকারি হয়। মাছ দিয়ে কাঁচা হলুদ, কাঁচা হলুদের গদক, নানা রকমের কাঁচা হলুদের তরকারি হয় ট্রাইবাল বাড়িতে।

— দারুণ ব্যাপার তো, পুরো শীতকালটাই কাঁচা হলুদের তরকারি!

— কেন খায় জানেন, কাঁচা হলুদ খেলে বসন্ত রোগ হয় না, ঘা-পাচড়াও দূরে থাকে। সব থেকে বড়ো কথা মদ খেকো লিভারটা কাঁচা হলুদের রসে সতেজ হয়ে ওঠে। তা বুঝলেন, কাকা, আমার কথা শুনে আমার বন্ধু পুরো একবাটি খেয়ে ফেললেন কাঁচা হলুদের তরকারি।

— তা খেয়ে কী বললেন তোমার বন্ধু?

— বললেন, দেশে দেশে মদ খেয়েছি নানারকমের, তাব সঙ্গে হরেক রকমের খানাও গেছে পেটে, কিন্তু আপনার শ্বশুরবাড়ির এই কাঁচা হলুদের ব্যঞ্জন মনে হচ্ছে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ এন্টিসেপ্টিক খানা। যেখানেই যাবো, সেখানেই এর গুণগান করবো আমি, বলবো, তিপ্‌রা চুয়াক তাই তিপ্‌রা ছুতুই (ত্রিপুরী মদ ও ত্রিপুরী হলুদ) এর খানা বিশুদ্ধ খাদ্য তালিকার স্থান পেতে পারে।

আমার কথা শুনে আমার বড়ো শ্বশুর জ্যাঠা নন্দু বললেন, তা হলে আমাদের বাড়ির মদের সঙ্গে কাঁচা হলুদের তরকারিও সুখ্যাতি অর্জন করলো।

— আর বলবেন না, যদি আমার বন্ধুকে তিপ্‌রা বাড়ির শূকরের মাথার ভর্তা খাওয়ানো যেতো তখন, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন, তিপ্‌রা বাড়ির শূকরের মাথার ভর্তা হলো দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য।

ছোট শ্বশুর কাকা বীরকুমার তাড়া দিলেন এবার — প্রথম গল্পটা তো শুনলাম তোমার, এবার দ্বিতীয়টা বলে ফেলো, রাত বাড়ছে তো, ফিরতে হবে পাল্লা-বাটকারা অফিসের কাছে।

— আহা, ব্যস্ত হবেন না, দ্বিতীয় দিন আমার বন্ধু অসিতবাবু কী করলেন শুনুন আপনাদের সোমরসের স্বর্গরাজ্যে।

— কী করলেন? কাকা শ্বশুরের গলায় আবেগজড়িত স্বর।

— পরের দিন হলো কি, আমার ছোট শ্বশুর মশায় কাকা গোপাল (গোপাল কাকা) আমার বন্ধুকে নিয়ে সকালে গ্রাম বেড়াতে বেরোলেন, জামাইয়ের বন্ধু বলে কথা। আমিও গেলাম তাঁদের সঙ্গে। বুঝলেন, প্রথমে গেলাম আমরা জ্যাঠা বকুলের (বকুল জ্যাঠার) ঘরে। সেখানে গিয়ে দেখি আমার আরেক শ্বশুর কাকা বারা (বারা কাকা) আর জ্যাঠা বকুল কথাবার্তা বলছেন দু'জনে। আমাদের দেখেই জ্যাঠা তাড়াতাড়ি চৌকির ওপর একটা লামথাই (মাদুর) পেতে দিলেন আমার বন্ধুকে বসার জন্যে। বন্ধুকে আমি জ্যাঠার ঘরে রেখে চলে এলাম আমার শ্বশুরবাড়ির আমার ঘরে। একটা জরুরী লেখায় হাত দিলাম ককবরক ভাষায় অ-ককবরক ক্রিয়াপদের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে। ঘন্টাখানেক বাদে আমি দেখতে গেলাম বন্ধুকে। গিয়ে দেখি পানাহার শুরু হয়েছে জামাইয়ের বন্ধুর সৌজন্যে। বন্ধুবর চৌকির ওপর বসে সোমরসে চুমুক দিচ্ছেন, আর আমার তিন শ্বশুর মাটিতে পাটির ওপর বসে চুয়াক খাচ্ছেন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে। আমি যেতেই বন্ধুবর বললেন, রাশিয়ার ভদকা খাচ্ছি আপনার শ্বশুর মশায়দের সঙ্গে বসে।

আমাকে দেখে কাকা বারা বললেন, জামাই একখুরি খাইয়া যাও। উত্তরে আমি বললাম, ঘরে জরুরী

একটা কাজ করছি আমি। ঘন্টাখানেক বাদে আবার আসবো, তখন আপনাদের সঙ্গে বসবো।

এই কথা বলে ঘরে ফিরে আমি আমার লেখার কাজে মন দিলাম কিছুক্ষণ পরে ফুলটিকে খুঁজলাম বন্ধুবর অসিতবাবু দুপুরে কী খাবেন সে ব্যাপারে জানতে। আমাকে (শাশুড়ী মাকে) জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'নাতু উআহান পাইনা থাঙকা রাধাকুমারছঙনি'। বরগ উআক কতমা বুথারকা, তিনি বাজারবার ব্লা (নাতু রাধাকুমারদের বাড়ি গেছে শূয়োরের মাংস কিনতে, আজ তো বাজারবার)।

শাশুড়ী মায়ের কথা শুনে আমি আবার লেখার কাজে বসলাম। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে ফুলটি সুটির পাতায় মোড়া শূয়োরের মাংস এনে রান্না ঘরে দিয়ে আমার কাছে এসে বললো, থাঙদি নিনি য়ারন' নূঙহরইতুবছিদি। তাই বুছূক নূঙনাই, উল' ফেককে লা? (যাও তোমার বন্ধুকে ডেকে নিয়ে এসে, আর কতো খাবেন, শেষে মাতাল হলে?

— তা বুঝলেন কাকা, আপনাদের মেয়ের কথায় আমার টনক নড়লো। কিছুই বলা যায় না, কতটা খেয়ে ফেলেছেন কে জানে। যতই তিনি দেশে-বিদেশে চুয়াক খান না কেন, তিপ্‌রা বাড়ির চুয়াকের আসরে টিকে থাকা দায়। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুবরকে ডেকে আনতে গেলাম জ্যাঠা বকুলের বাড়ি।

— তা তখন তাঁকে কী অবস্থায় দেখলে — কাকার কৌতূহল বেড়ে গেলো।

— আর বলবেন না, আমি গিয়ে তো অবাক। বন্ধুবর চৌকি থেকে নেমে এসে বসে পড়েছেন একেবারে মাটিতে আমার শ্বশুরদের সঙ্গে। আর ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থা নিয়ে আলোচনা চলছে ঘরে মাতিয়ে দিয়ে। আমাব কী মনে হলো জানেন, বন্ধুবর সোমরসের ঘোরে বুঝতে পেরেছেন আমার শ্বশুবকুলের লোকেরা সব কমিউনিষ্ট, সর্বহারার দর্শনে বিশ্বাস করেন। কাজেই তিনি চৌকির ওপরে বসে আছেন, আর সবাই নিচে। তাঁর কাছে এটা বেসুরো লাগলো, তাঁর ভেতর দেখা দিলো সাম্যভাব। আর সেই উপলব্ধি বন্ধুবরকে চৌকি থেকে নিচে নামিয়ে আনলো ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে।

— ওঃ দারুণ লোক তো তোমার বন্ধু। তাহলে, এখন বুঝে দ্যাখো জামাই, আমাদের তিপ্‌রা চুয়াকের ভেতরও সাম্যভাব আছে। আচ্ছা, তারপর তুমি কী করলে?

— আমি আর কী করবো। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বুঝলাম বন্ধুবরের বাক রুদ্ধ প্রায়। আমাকে দেখে জ্যাঠা বুকল বললেন, "জামাই, নিনি য়ার চুয়াক ফেককা ব্লা, তাবুক বাহাইকে তিলাঙনাই'? অর' মাইরগ চাগূরাথুন, মাইরগ চাউই কিছা থুকে ছূরাঙগূইথাঙগানূ" (জামাই, তোমার বন্ধু তো মদ-পাগল হয়েছে, এখন কী করে নিয়ে যাবে? এখানে ভাত-টাত খান, ভাত-টাত খেয়ে একটু ঘুমুলে মদের নেশা ছুটে যাবে।

— বন্ধুকে তখন বাড়ি নিয়ে যেতে পারলে না? জিজ্ঞাসা করেন কাকা বীরকুমার।

— কী করে নিয়ে যাবো, চৌকিতে ওঠারই শক্তি নেই তাঁর। কাজেই আমি আর কী করবো? বাড়ি ফিরে আপনাদের মেয়েকে সব বললাম। ফুলটি আমার ওরর রাগ করলো কিছুটা। বুঝলেন, বিকেলে ছিলো আমাদের হেরমা বাজার। ভাবলাম বন্ধুবরকে ডেকে নিয়ে বাজারে যাবো। ট্রাইবাল এলাকায় ট্রাইবালরা নিজেদের হাতে কেমন বেচা-কেনা করছে দেখবো। কিন্তু গিয়ে দেখি অসিতবাবু তখন মেঝের পাটির ওপর নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন। আমাকে দেখে আমার জেঠী শাশুড়ী বললেন, 'বন' তা ছচাদি তাবুক, তাইখে থূগূরাথূন, নেছা ছূরূঙগূইথাঙগানূ' (তাকে এখননো জাগিয়ো না, আর কিছুক্ষণ ঘুমুলে নেশা ছুটে যাবে)।

জেঠী শাশুড়ীর কথা শুনে আমি বললাম, "আঙ বাজার' থাঙকা জেথি, য়ার বাচাখে চিনি নগ' তুনুইরূইদি দ" (আমি বাজারে গেলাম জেঠী, বন্ধু জাগলে আমাদের বাড়ি দিয়ে আসবেন)।

— তা বুঝলেন, কাকা, আমি তো গেলাম হেরমা বাজারে। কিন্তু মনটা আমার পড়ে থাকলো বাড়ির দিকে, বন্ধুর জন্যে চিন্তা। সন্ধ্যের সময় আপনাদের আঁদি নদীর ধার দিয়ে বাড়ি ঢুকে দেখি তাঁর বন্ধুপত্নীর সঙ্গে দিব্যি কথাবার্তা বলছেন অসিতবাবু। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগছে শরীর।

— এখন অনেকটা ভালো লাগছে।

— বড্ড বেশী খেয়ে ফেলেছেন তিপ্‌রা চুয়াক।

আমার কথা শুনে বন্ধুবর হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি কি চুয়াক খেয়েছি? আপনার শ্বশুর বাড়ির তিপ্‌রা চুয়াক আমাকেই না খেয়ে ফেলেছে।

এর মধ্যে আমা ডাকলেন গানতিনক (রান্নাঘর) থেকে, 'য়াঙ ফাইছিদি কিছা (এদিকে এসো একটু)।' রান্না ঘরে ঢুকতেই বললেন "হঁ কাগুজিবৃতৃই বাই মাই ছাপিকজাক বৃতৃই চারুদি কিছা নিনি য়ারন' নেছা, ছুরাঙগৃই থাঙগানূ, বিদেছি বরক, চুয়াক বৃছূক খাঁরুখা ছিদ' (শোনো কাগজি লেবুর রস দিয়ে ভাত চটকানো জল দিয়েছি, তোমার বন্ধুকে খাওয়াও, নেশা ছুটে যাবে। বিদেশী লোক কতটা খেতে দিয়েছো কে জানে।

শাশুড়ী মায়ের কথা শুনে আমি এক বাটি কাগজি লেবুর রস দিয়ে চটকানো ভাতের জল নিয়ে বন্ধুবরের কাছে গিয়ে বললাম, 'এই নিন নেশা ছোটার মোক্ষম জিনিষ, ভাত চটকে কাগজি লেবুর রস দিয়ে মেখে দিয়েছেন শাশুড়ীমা, খেয়ে ফেলুন; দেখবেন, নেশা ছুটে যাবে।'

আমার কথা শুনেই অসিতবাবু বাটিটা উপুড় করে দিলেন মুখের ভেতর। বললেন, 'দারুণ ব্যাপার তো, দেশে-বিদেশে এতো মদ খেয়েছি, কিন্তু নেশা ছোটার এমন মোক্ষম দাওয়াই তো কোথাও খাইনি।

— 'এ হচ্ছে তিপ্‌রা চুয়াকের তিপ্‌রা দাওয়াই'। হাসতে হাসতে বললাম আমি।

রাতের খাবর সময় শাশুড়ী মা আবার একটু চুয়াক পরিবেষণ করলেন বন্ধুকে কাপে করে। চুয়াক দেখেই অসিতবাবু যেন একটু ভয় পেলেন। 'আবার চুয়াক, এই না নেশা ছোটালাম।'

— জানেন অসিতবাবু, একে বলে বিষে বিষক্ষয়। মদ খেয়ে অতিরিক্ত নেশা হলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে যদি আবার সামান্য একটু মদ খাওয়া যায়, তাহলে মদের নেশা একেবারেই ছুটে যায়। ধরুন, আপনি রাতে খুব পান করলেন, পরের দিন ঘুম ভাঙতেই দেখলেন, শরীরটা বেচাল বেচাল ভাব, পা টলমল টলমল করছে, তখন আবার একটু পান করুন, নেশা একেবারেই ছুটে যাবে।

—বাঃ দারুণ দাওয়াই শিখিয়ে দিলেন তো বন্ধু।

— ট্রাইবাল বাড়ির জামাই হয়ে এরকম অনেক কিছুর দাওয়াই শিখেছি আমি।

এর মধ্যে আমা শূকরের মাংস ও চাখৃই (খারপানি দিয়ে তৈরী হজম কারক অম্ল জাতীয় ব্যঞ্জন) দিয়ে আমাদের ভাত বেড়ে দিলেন। খুব তৃপ্তির সঙ্গে তিপ্‌রা বাড়ির শূকরের মাংস খেলেন বন্ধুবর। তারপর চাখৃই খেতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ বস্তুটা কী, বন্ধু?'

— এর নাম চাখৃই। খার-জল বা ছাইচুয়ানো জল দিয়ে বিভিন্ন তরিতরকারির সঙ্গে এ জিনিষটা রান্না করা হয় ট্রাইবাল বাড়িতে হজমের জন্যে। বিশেষ করে মাংস-টাংস খেলে চাখৃই রান্না করা হয়। এটাকে আপনি অনেকটা অ্যালকালি মিকচারের মতো ধরতে পারেন।

— দারুণ দারুণ, ট্রাইবাল খানার মহিমা অপার দেখছি।

— জানেন অসিতবাবু, আমার বিয়ের পরে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে

— কেমন, বলুন তো শুনি।

— বিয়ের সপ্তাখানেক পর আমার দাদা শ্বশুর দা কামিনী (কামিনী দা) একটা হরিণ শিকার করে এনেছেন চড়িলামের রিজর্ভ ফরেষ্ট থেকে। আমার সামনেই ডোরাকাটা মদী হরিণটা ছোলা হলো। এরকম শিকার করা হরিণ জীবনে তো কখনো দেখিনি। শ্বশুর মশায় নিলেন সের দুয়েক মাংস। আমার আনন্দ আর তো ধরে না। একটা নতুন জিনিষ খাবো। কিন্তু যখন খেতে বসলাম, তখন চক্ষু আমার চড়ক গাছ। শাশুড়ী মা করেছেন কি, ডাঁটা শাক দিয়ে তা রান্না করেছেন। আমি ভেবেছিলাম আলুর সঙ্গে গরম মশলা-টশলা দিয়ে মাংসটা রান্না করা হবে, দারুণ করে খাবো। কিন্তু ডাঁটা শাক দিয়ে মূল্যবান হরিণের মাংস রান্না, তোবা তোবা, মনের ভেতরটয় মোচড় মেরে উঠলো আমার। কিন্তু খেয়ে দেখি অমৃত। ডাঁটা দিয়ে রান্না হরিণের মাংসর এমন স্বাদ! জানেন, অসিতবাবু, মনে রাখার মতো। এই ঘটনার অনেক বছর পর কলকাতায় বন্ধুবর স্বপন বসুর বাড়িতে তাঁর ডাক্তার দাদা রথীনবাবুর ঘরে একটা মেডিকেল জার্নালে পড়লাম মাংসের সঙ্গে শাক-সব্জি প্রচুর পরিমাণে খাবার দরকার।

— দারুণ ইন্টারেস্টিং তো।

— তাই আমি ভাবি, ট্রাইবালরা কীভাবে জানলো মাংসর সঙ্গে শাক-সব্জি খাবার দবকার যা কিনা এখন আমেরিকার ডাক্তাররা গবেষণা করে আবিষ্কার করছেন।

আমার কথা শেষ হতেই কাকা শ্বশুর বললেন, 'তোমার প্রথম গল্পের শেষ তো এখানেই, এবার দ্বিতীয় গল্পটা শুরু করো তিপ্‌রা চুয়াকের জয়গান নিয়ে।'

— নানা এখানে শেষ না কাকা দাঁড়ান, অসিতবাবুকে আগে কমরেড মোহন চৌধুরীর বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি, তারপর অসিতপর্ব শেষ হবে।

— ক্যামন?

— শুনুন তবে। পরের দিন সকালে যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে অসিতবাবু কাজ করলেন ঘণ্টাখানেক। তারপর সকালে আওয়াঙছকরাঙ (একপ্রকার ট্রাইবেল ফ্রায়েড রাইস — যাকে পিঠে বলেন ককবরকভাষীরা) দিয়ে বন্ধুবরকে প্রাতরাশ করিয়ে রওনা দিলাম মোহন চৌধুরীর শ্বশুর বাড়ির গ্রাম সোতারমোড়ায় পেতলা মোড়ার ভেতর দিয়ে। আপনাদের আঁদি নদী পেরিয়ে যেইমাত্র পেতলামোড়া টিলায় উঠেছি, তখন দেখা হয়ে গেলো জেঠি অনুপতির সঙ্গে তাঁদের বাড়ির গেটের কাছে। আমার সঙ্গে এক অপরিচিত বাঙালী ভদ্রলোককে দেখে বললেন, 'চামারিছা, হাবলাঙদি কিছা, কুয়াই চাইদি' (ও জামাই, কিছু ঢুকে যাও, পান খেয়ে যাও)।

অনুপতি দেববর্মা সম্পর্কে আমার জেঠশাশুড়ী। কাজেই শাশুড়ী অনুরোধে ঢুকতে হলো আমাদের। ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে খাটের ওপর বসতে দিলেন আমাদের। তখন তাঁদের দক্ষিণ দিকের ফুল বাগান থেকে খুমপুই ফুলের গন্ধ আসছিলো। আমার বন্ধু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছাব'ব, বিয়াঙনি ফাই?' (কে ইনি, কোথেকে এসেছেন?) আমি বললাম, 'ব আনি য়ার, চুঙ একছঙগে এম এ. পরিঅ, তাবুক দিললিঅ তঙগ ব।' (ইনি আমার বন্ধু, আমরা একসঙ্গে এম. এ. পড়েছি, এখন দিল্লীতে থাকেন)।

— 'বিনি মুঙ তাম'? (তার নাম কি?) আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

—বিনি মুঙ অসিত চক্রবর্তী (তাঁর নাম অসিত চক্রবর্তী)।

— বামুনছা উঙগানৃ বৃলা। (বামুন হবে মনে হচ্ছে)।

— হুঁ, বামুনছা-ন (হ্যাঁ, বামুনই)

— আকন, চারগ নৃঙলাইছিদি (ঠিক আছে, চা-টা খাও আরকি)।

এই কথা বলে জেঠী অনুপতি (অনুপতি জেঠি) রান্নাঘরে গেলেন। লক্ষ্য করলাম, বন্ধুবর এমন

সাজানো-গোছানো ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন। জানলা দিয়ে দক্ষিণের ফুলবাগানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব সুন্দর ফুলবাগান তো কুমুদবাবু। আচ্ছা, বলুন তো, এ্যাতো সুইট গন্ধ আসছে কি ফুল থেকে?

— খুমপুই ফুল থেকে এমন গন্ধ আসছে।

— খুমপুই ফুল? ত্রিপুরার নিজস্ব পাহাড়ী ফুল নিশ্চয়ই।

— ঠিক বলেছেন আপনি। জুঁই ফুল বা বেলফুলের মতো মনমাতানো গন্ধ আছে খুমপুই ফুলে।

— আচ্ছা, বলুন তো এই ফুল নিয়ে কি কোন রূপকথা আছে?

— আছেই তো, সে ভারি সুন্দর রূপকথা অসিতবাবু। ত্রিপুরার ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নাম শুনেছেন?

— ডম্বুর হাইড্রোইলেকট্রিক প্রোজেক্ট তো?

— হ্যাঁ, ওই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎসমুখ থেকেই এই 'খুমপুই কেরেঙ কথমা'র জন্ম।

— কি বললেন, কেরেঙ কথমা?

— হ্যাঁ, ককবরক ভাষায় রূপকথাকে বলে 'কেরেঙ কথমা'।

এর মধ্যে জেঠী অনুপতি একটা ঝকঝকে থালায় করে চা আর বড়ো বড়ো সবরিকলা এনে উপস্থিত। আমাদের সামনে থালাখানা নামিয়ে দিয়ে আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, বারির ছবরি কলা খাইতে দিলাম আর কি। ছবরি কলা খাইয়া চা খান। আমি কুয়াই-ফাতুই লইয়া আছি আপনাদের লাইগ্যা।' অসিতবাবু আমার শাশুড়ীর এই ধরনের বাঙলা কথা শুনে বললেন, 'এযে দেখছি অদ্ভুত উচ্চারণ আমাদের ঢাকা-কুমিল্লার ভাষায়।'

— জানেন অসিতবাবু, পাহাড়ে ঢাকা-কুমিল্লা-সিলেট-নোয়াখালির মিশ্রভাষার এক অদ্ভুত উচ্চারণ করেন পাহাড়ের উপজাতিরা। তা শুনতে সত্যিই খুব ভালো লাগে।

ইতিমধ্যে এক খানদানী কাঠের বাটায় পান-সুপুরি সাজিয়ে দিয়ে জেঠী অনুপতি আমাদের সামনের চেয়ারে বসলেন। অসিতবাবু দেখলাম কেমন উসখুস করছেন। বললাম, 'তাড়াতাড়ি পান খান অসিতবাবু, অলরেডি দশটা বেজে গেছে, সুতারমোড়ায় মোহনবাবুর বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে এগারোটার বেশী বেজে যাবে।

পান খেয়ে জেঠী অনুপতির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'খুলুমকা জেথি, থাঙচিনু চুঙ' (প্রণাম জেঠী, আমরা এখন চলি)।

— নিনি য়ারন' তাই উয়াইছা তুবদি। হর বূছুক তঙগৃই থাঙনাই ব? (তোমার বন্ধুকে আর একদিন নিয়ে এসো। ক'রাত্রি থেকে যাবেন তিনি)?

— তিনি মোহন চৌধুরীনি আর' হরছা থুউই থূনা আগুলি থাঙনাই। (আজ মোহন চৌধুরীর বাড়ি এক রাত্রি শুয়ে কাল আগরতলায় চলে যাবেন।

— 'থপছা ফান' চুয়াকরগ খাঁরূমালিয়া নিনি য়ারন', বূছুক হাচালনি বরক! (এক ফোঁটা চুয়াক খাওয়াতে পারলাম না তোমার বন্ধুকে, কতো দূরের মানুষ!) তারপর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন,

— আইবেন আবার, তিপ্‌রা বাড়ির বিন্নি চাউলের মদ খাওয়াইবো, পাগল হইবেন আর কি।

অসিতবাবু দু'হাত জোড় করে হাসতে হাসতে নমস্কার করলেন জেঠিকে। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম সুতারমোড়ার দিকে।

আমার কথা শেষ হতেই কাকাশ্বশুর বললেন, 'বাচুই অনুপতির (অনুপতি বৌদির) চেহারা দেখে

তোমার বন্ধু কোনো মন্তব্য করলেন না।

— করলেন না মানে। অনুপতি জেঠীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পেতলামোড়ার জুম ক্ষেত দিয়ে যেতে যেতে বন্ধুবর জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা কুমুদবাবু, আপনার এই জেঠশাশুড়ীর বয়েস কত? বেশিক্ষণ থাকা যায় না তাঁর সামনে।

— আমার এই শাশুড়ীর বয়েস পঞ্চাশের ওপর।

— বলেন কি, এখনো এমন চেহারা। আমি সারা বোডো-দিমাছা এলাকায় ঘুরেছি। কিন্তু এমন চেহারার ট্রাইবাল মহিলা আর কোথাও দেখিনি।

— জানেন অসিতবাবু, এই মোহিনী চেহারার জন্যে আমার এই শাশুড়ী বিয়ের আগে ও পরে কম বিপদের মধ্যে পড়েননি। বিয়ের আগে ও পরে বেশ ক'জন ডুয়েল লড়ে গেছেন।

— ডুয়েল লড়ে জয় করবার মতো চেহারা তাঁর। চোখ যেন হরিণের মতো কেটে কে বসিয়ে দিয়েছে। আর এমন গায়ের রঙ কমই দেখা যায়। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'যৌবনে যদি আমি আপনার এই শাশুড়ীকে দেখতাম, তাহলে আমিও ডুয়েল লড়ে যেতাম।

বন্ধুবরের কথা শুনে আমি হোঃ হোঃ করে হেসে ফেলাম। আমার কাকাশ্বশুর বীরকুমার বেশ আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন — তাহলে তুমি বলছো পরিব্রাজক বন্ধু আমাদের বাচুই অনুপতির সৌন্দর্য এ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন?

— এ্যাপ্রিসিয়েট না করলে কি আর তাঁকে পেতে ডুয়েল লড়ে যাবার কথা বলেন'?

— তারপর তুমি নিয়ে গেলে তোমার বন্ধুকে সুতারমোড়ায় মোহন চৌধুরীর বাড়ি?

— হ্যাঁ, আমরা পেতলামোড়ায় জুম পেরিয়ে চাঁদুরাম কপরা বাঁদিকে রেখে ভক্ত কপরা ও গয়ারাম কপরার ভেতর দিয়ে পৌঁছলাম পুরাইবাছা গ্রামে। জানেন তো, সুতারমোড়ায় যেতে হলে ওই গ্রামের আমার বড় পিসশাশুড়ী নলিনীর বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে হয়। আমার শুধু ভয় করতে লাগলো যদি কেউ দেখে ফেলে আমাদেরকে। দেখে ফেললে তো সর্বনাশ। অসিতবাবুকে জামাইয়ের বন্ধু বলে তিপ্রা চুয়াক দিয়ে একেবারে চান করিয়ে দিতেন। এদিক-ওদিক চোখ রেখে প্রায় গা ঢাকা দেয়ার অবস্থায় কোনোরকমে পৌঁছলাম দ্বিতীয় সুতারমোড়ায়। আর এর পরেই তো মোহন চৌধুরীর বাড়ি। টিলা-টঙ্কর ভাঙতে ভাঙতে বন্ধুবর বেশ টায়ার্ড হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁকে নিয়ে দ্বিতীয় সুতারমোড়ায় বটতলায় বসে একটু জিরিয়ে নিতে লাগলাম। এতক্ষণ পরে অসিতবাবু মুখ খুললেন, 'জানেন কুমুদবাবু, আমার মনে হচ্ছে যুগোস্লাভিয়ার গ্রামাঞ্চল দিয়ে হাঁটছি আমরা। যুগোস্লাভিয়ার গ্রামের স্বল্পবাস মেয়েদের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে এখানকার ট্রাইবাল মেয়েদের। চেহারাও অনেকটা একইরকম।

— ঠিক আছে, আমার আর তাহলে যুগোস্লাভিয়ায় যাবার দরকার পড়লো না। ত্রিপুরার উপজাতি এলাকায় থেকেই আমি ওই দেশের স্বল্পবাস ললনাদের বিলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এবার উঠে পড়া যাক। ওই দেখুন সুতারমোড়া। আর ওই যে সোজাসুজি টালির ঘরটা দেখছেন, ওটাই হলো সি পি আই-এর শান্তিসেনা (Public service corps)'র সেক্রেটারী জেনারেল মোহন চৌধুরীর বাড়ি। একটু বাদেই মোহনবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি শান্তিসেনার সেক্রেটারী জেনারেল তাঁর মোঙ্গলিনী স্ত্রীর সঙ্গে ইরিধান মাড়া দেয়ার কাজ শেষ করে মাথায় গামছা জড়িয়ে উঠোনে ধান নেড়ে দিচ্ছেন।

আমাদের দেখে মোহনদা ঘরে গিয়ে বসতে বললেন। মিলিটারি ফেরত কমিউনিষ্ট পার্টির শান্তিসেনার সেক্রেটারী জেনারেলকে এভাবে কৃষকের কাজ করতে দেখে বুঝলেন কাকা, আমার টলস্টয়ের যুদ্ধ ও শান্তি উপন্যাসের শেষপর্বের কথা মনে পড়ছিলো। সেখানে যুদ্ধশেষে আর্মির লোকেরা আবার তাঁদের কৃষক পরিবারে গিয়ে শান্তিতে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দিব্যি ঘরকরনা করতে লাগলেন। তা ঘরের ভেতর ঢুকে

অসিতবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'উনিই কি কমরেড মোহন চৌধুরী?

— হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ হচ্ছে আপনার ?

– না, মানে আমি বলছিলাম, শান্তিসেনার সেক্রেটারী জেনারেল কীভাবে এমন জীবন বেছে নিলেন। আর, আমি শুনেছি, উনি তো সি. পি আই.-এর ন্যাশনাল কাউন্সিলের মেম্বার।

— সবই ঠিক। দিল্লী থেকে সারা ভারত ঘুরে বেড়ান শান্তিসেনা সংগঠনের কাজে। আর বছরে দু'বার কৃষির সময়ে বেশ কিছুদিনের জন্যে চলে আসেন তাঁর শ্বশুর বাড়ির গ্রামে।

— আচ্ছা, কুমুদবাবু, তাহলে দেখছি মোহনবাবুও আপনার মতো উপজাতি পরিবারে বিয়ে করেছেন, তাই না?

— শুধু বিয়ে করা মানে, আমার মতো উনিও ট্রাইবাল বাড়ির ঘরজামাই, ককবরকে যাকে বলে চামারি অম্পা। মোহনদা ছিলেন সিলেটের লোক। কাছাড়ে স্কুলের পড়া শেষ করে চলে যান আর্মিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। ছিলেন প্যারাট্রুপার। তারপর আর্মি থেকে চলে আসেন ১৯৪৫ সালে বোম্বে শহরে নৌ বিদ্রোহের সময়। আর সেখানেই ঢুকে পড়েন কমিউনিষ্ট পার্টিতে। ১৯৪৯ সালে পার্টি বে-আইনী হলে তেলেঙ্গানায় যোগ দেন সশস্ত্র সংগ্রামে। সেখান থেকে উড়িষ্যা। উড়িষ্যা থেকে ১৯৫২ সালে বিপুল কান্তি কর নাম পরিবর্তন করে মোহন চৌধুরী নাম নিয়ে ঢুকে পড়লেন ত্রিপুরায়।

আমার শ্বশুরদ্বয় প্রায় মন্ত্রযুদ্ধের মতো গিলছিলেন আমার কথা। জ্যাঠা শ্বশুর বললেন, 'জামাই, এতো কথা তো জানতাম না কমরেড মোহন চৌধুরী সম্পর্কে।

— আসলে জানেন জ্যাঠা, কমিউনিষ্টরা অনেক সময় আত্মপরিচয় গোপন রাখেন। বাপ-মার দেয়া নাম বেমালুম ভুলে যান সর্বহারার আদর্শে। কি জাতি, কি পরিচয় সব চাপা পড়ে যায় আদর্শের কাছে। এর সব থেকে বড়ো উদাহরণ লেনিন ও স্তালিন। দু'টোই তাঁদের ছদ্মনাম।

তা যাক সে কথা। এমন সময় শুভ্রকেশ মোহনবাবু ঘরে ঢুকতেই আমার বন্ধু অসিতবাবু উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নোয়ালেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। মোহনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন Kumud please infroduce him to me. Sorry for coming late to attend you.'

—মোহনদা, ইনি অসিত চক্রবর্তী, আমার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে এম. এ পাশ করেছিলাম ভাষাতত্ত্ব নিয়ে। উনি চাকরি করেন দিল্লীর যুগোশ্লাভিয়ার এমব্যাসিতে। পূর্ব ইউরোপের প্রায় সব দেশ ঘুরেছেন তিনি। রুশ ভাষাও জানেন ভালো।

– What, Asit Chakraborty? working in the Yogoslav Embassy.' তারপর অসিতবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'I have heard of you, You have written some books on Soviet Union, not that ?

—ঠিকই শুনেছেন আপনি।' বিনীতভাবে বললেন বন্ধুবর অসিতবাবু।

— জানেন মোহনদা, অসিতবাবু ককবরকের সিস্টার ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর ওপর তুলনামূলক কাজ করছেন। তাই এসেছেন ত্রিপুরায়।

– Very good, you can, help him a lot, You lend him your linguistic knowledge of Kokborok.

—তারপর মোহনবাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বাঙলায় বললেন

— অসিতবাবু, আপনারা বসুন। সেই সকাল থেকে আমরা স্বামী-স্ত্রীতে ইরিধান মাড়া দিয়েছি। ধুলোয় ভর্তি হয়ে গেছে গা; একটু চান করে আসি and then my wife will offer tribal house wine in your honour বলেই ঘর কাঁপানো অট্টহাসি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

বন্ধুবর অসিত চক্রবর্তী তো অবাক। বললেন, আপনাদের শান্তিসেনার সেক্রেটারী জেনারেল তো দারুণ লোক। দিল্লীতে তো আমি হামেশাই কমিউনিষ্ট দুর্গ অজয় ভবনে গিয়ে দেখা করতেই পারি।

পারলে মাঝেমধ্যে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করলে দেশ-বিদেশে ট্রাইবালদের জাতিসত্তায় উত্তীর্ণ হবার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানতে পারবেন। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতিগত ও ভাষাগত সমস্যা কীভাবে সমাধা হয়েছিলো, এ সম্পর্কে তাঁর অসম্ভব জ্ঞান। তাছাড়া নিজেও তিনি একাধিকবার সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে দাগেস্তান, কাজাখস্তান, নর্থ ওসেটিয়া প্রভৃতি ছোট্ট ছোট্ট পার্বত্য রাজ্যে বেড়াতে গেছেন। আর সেখানকার জাতিগত ও ভাষাগত সমস্যাগুলো নিজের চোখে দেখে এসেছেন। এই যে আমাকে এই ককবরক ভাষার কাজে দেখছেন, তার মূলেও কিন্তু আপনার এই শান্তিসেনার সেক্রেটারী জেনারেল।

ইতিমধ্যে আমার ছোটশ্বশুর কাকা বীরকুমার বললেন, তোমার ওই শান্তিসেনার সেক্রেটারী জেনারেলের কথা রাখো। জেনারেলের বৌ তোমার বন্ধুকে কী অফার করলেন তাই বলো। আর আমাদের পাত্রও তো শেষ, তোমার তিপ্‌রা চুয়াকের কাহিনীও শেষ হয় না, এভাবে তো শুধু শুধু বসে থাকা যায় না কাজেই ....। একথা বলেই তিনি পকেট থেকে একখানা একশো টাকার নোট বের করে আমার ছোটশালা বিমলের হাতে দিয়ে বললেন, 'হঁ, বিমল, থাঙদি দদি, তাই থাইচা পাই তুফাইছিদি' (এই যে, বিমল, যাও তাড়াতাড়ি, আর একটা বোতল কিনে নিয়ে এসো)।

এদিকে আমার জ্যাঠাশ্বশুরেরও ঘুম ঘুম ভাব এসেছে একটু। তিনি মাদুরের ওপর কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন একটু। আমি রান্না ঘরে গিয়ে স্ত্রী ফুলকুমারীকে বললাম, 'কাকা বীরকুম (কাকা বীরকুমারকে আমরা অনেক সময় কাকা বীরকুম বলে ডাকি) তাই থাইচা পাইনা বাগৃই বিমলন' রহর'। বরগ আছুক হর' বাহাইকে থাঙমানাই'? চিনি অর' মাইমুই চায়ুই থুগৃরাথুন। আঙ কাকানি নগ' ফোন খৃলাইরুইগৃরানা (কাকা বীরকুম আব এক বোতল চুয়াক কেনার জন্যে বিমলকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা এতরাত্রে কীভাবে যাবেন? আমাদের এখানে ভাত-টাত খেয়ে ঘুমোন। আমি কাকার বাসায় ফোন করে দিয়ে আসি)। এই কথা বলে আমি পাশের বাসা থেকে কাকার বাসায় ফোন করে সব জানিয়ে দিয়ে আবার কাকার সামনে এসে বসলাম।

এর মধ্যে বিমল এক বোতল বিলিতি চুয়াক এনে সোমরসের আসরে দিতেই আমার জ্যাঠাশ্বশুর আবার উঠে বসলেন। তখন আমি বললাম, 'এখন রাত প্রায় দশটা। আপনাদের আজ আর বাসায় ফেরা হবে না। আপনাদের মেয়েকে বলে কাকার বাসায় ফোন করে সব বলে দিয়েছি। তাছাড়া গ্রামে তো এখন চুয়াক করার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি বহাল রয়েছে। কাজেই মেয়ে-জামাইয়ের বাসায় একটু এনজয় করুন ভালো করে।

— তুমি তো দেখছি কমনা। আমাদের বাসায় ফেরা আটকে দিয়েছো। ঠিক আছে, এবার বলো, তোমার বন্ধুকে মোহন কমরেড (কমরেড মোহন চৌধুরীকে সকলে মোহন কমরেড বলে ডাকতো) এর স্ত্রী কেমন করে আপ্যায়িত করলেন?

— শুনুন, মোহনবাবুর স্ত্রী স্নান সেরে ধূপ-ধুনো দিতে আমরা যে ঘরে বসে ছিলাম সে ঘরে ঢুকে আমাদের দিকেও আরতি করার মতো করে হাতের ধুনুচি ঘোরালেন। পরনে পাছড়া, বুকে কাঁচুলি ও কপালে চন্দনের ফোঁটা দেয়া শান্তিসেনার সেক্রেটারী জেনারেলের এই মোঙ্গলিনী গৃহিণীর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন বন্ধুবর অসিত চক্রবর্তী।

কিছুক্ষণ পরেই স্নান সেরে লুঙ্গি পরে আদুল গায়ে গৌরবর্ণ শুভ্রকেশ মোহনবাবু তাঁর লকলকে সুঠাম দীর্ঘকায় দেহকাঠামো নিয়ে ঘরে ঢুকেই একগাল হাসি দিয়ে বললেন, 'Then Asit Babu,

let us enjoy over an alcoholic drink in your honour.' বলেই একটা অট্টহাসি হেসে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন তিনি। মনে হলো বন্ধুবর অসিতবাবু একটু হকচকিয়ে গেছেন মোহনবাবুর এমন অদ্ভুত ব্যবহারে। সি. পি. আই.-এর শান্তিসেনার সেক্রেটারী জেনারেল তাঁর উপজাতি বৌয়ের সঙ্গে ধান মাড়াও দিচ্ছেন কৃষকের মতো মাথায় পাগড়ি বেঁধে, আবার চোস্ত ইংরিজি বলছেন বৃটিশ এ্যাকসেন্টে — এসবই তাঁকে মোহমুগ্ধ করেছিলো বলে মনে হলো।

রান্না ঘর থেকে ফিরেই মোহনবাবু আবার একটা হাসি দিয়ে বললেন, 'তোমার বন্ধুর ভাগ্যভালো কুমুদ, তোমার শাশুড়ীর ভাণ্ডারে দেখলাম বিন্নি চালের চুয়াক আছে। তাই দিয়ে তোমার ভাষাতাত্ত্বিক বন্ধুকে আপ্যায়ন করা যাক।'

এরপর অসিতবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই ককবরকের চুয়াক শব্দের অর্থ জানেন?

— হ্যাঁ, চুয়াক অর্থ মদ। হাসতে হাসতে বললেন বন্ধুবর।

— আচ্ছা অসিতবাবু, আপনি তো বোড়োদের ভাষার ওপর কাজ করছেন, তাই না? তাহলে বোড়োভাষায় ককবরক 'চুয়াক'কে কী বলে একটু বলবেন?

— বোড়ো ভাষায় চুয়াককে বলে 'জৌ (Jou)। এর অর্থ 'হাউজ বিয়ার'।

— চুয়াকও 'হাউজ বিয়ার', অসিতবাবু। এখন খেয়ে দেখুন। বোডো 'জৌ আর ককবরক 'চুয়াক' এর মধ্যে স্বাদ কোনটার বেশী'। বলে আবার অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন মোহনবাবু।

— 'আচ্ছা মোহনদা, চীনে গেছেন আপনি? চীনা মদ খেতে কেমন তো জানা থাকলে চুয়াক, জৌ আর চীনা মদের স্বাদের একটা কম্পারেটিভ স্টাডি করা যেতো।

— তা তোমার মাথাটা একেবারে গেছি দেখছি কুমুদ। কম্পারেটিভ ফিলোলোজি পড়ে দেখছি তুমি মদেব ওপরও কম্পারেটিভ স্টাডি করতে চাও।

— না, মানে, সেটা তো আপনারা করবেন। আমি শুধু ককবরক 'চুয়াক' ও বোডো 'জৌ' এর পাশে চীনা মদের প্রতিশব্দটা বসিয়ে দিতে পারি।

— তাই দাও তুমি, চীনা মদের বদলে চীনামদের নামটাই শোনা যাক, তাতে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো যাবে কী বলেন, অসিতবাবু '?

— চীনা মদের প্রতিশব্দ হলো — পুতাওজিউ (Putaojiu)।

—কি বললে, পুতাওজিউ? আরে আরে বোডো 'জৌ-এর সঙ্গে তো পুতওজিউ-এর জিউয়ের মিল আছে। আর চীনা 'পুতাও' এর সঙ্গে ককবরকের 'বুতুক' মানে পচুই শব্দের সাদৃশ্য আছে। কি দারুণ মিল, তাই না অসিতবাবু?

তা বুঝলেন কাকা, মোহনবাবুর কথা শেষ হতেই এক বোতল চুয়াক ও দুটো কাপ নিয়ে মোহনদার স্ত্রী মানে আমার পিসশাশুড়ী মঞ্জরী দেবী উপস্থিত। তিনি বিছানার ওপর চুয়াকের বোতলটা রাখতেই মোহনবাবু শিশুর মতন চিৎকার করে বলে উঠলেন — এই যে এই যে পুতাওজিউ এসে গেছে।

— জানেন মোহনদা, চীনা ভাষায় মদের বোতলকে বলে 'জিউপিঙ' (Jiuping)।

— ঠিক আছে, কুমুদ, এখন থেকে 'চুয়াক বতলছা' (একবতল মদ) না বলে এখন থেকে বোলবো 'জিউপিঙছা'। কেমন হবে বলো?

তারপর মোহনদা তার মোঙ্গলিনী জীবনসঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে ককবরকে বললেন, 'তাম' চারুনাই কুমুদছঙন'? (কী খাওয়াবে কুমুদদের) ?

— তগলা মাছা রাথারছিআনু তা হূন', চামারিছানি য়ার ফাইকাবূলে (একটা বড়ো মোরগ কাটবো আরকি, জামাইয়ের বন্ধু এসেছে তো)।' বলেই পিসশাশুড়ী বাঙলায় বললেন অসিতবাবুর দিকে

তাকিয়ে, 'জামাইয়ের বন্ধু আইছে, মোরগ তো কাটতো হইবই। কুমুদের বন্ধুর কপাল ভালা, বিন্নি মাইরুগু (বিন্নি চাল)-এর চুয়াক খাইতো পারতাছে। বলেই তিনি হাসতে হাসতে রান্না ঘরে গেলেন।

মোহনদার স্ত্রী চলে যেতেই মোহনদা বন্ধুবরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে অসিতবাবু, এবার শুরু করা যাক। তিনি ঢক ঢক করে অসিতবাবুর কাপ ভর্তি করে দিয়ে নিজের কাপে ঢাললেন বিন্নি চালের মদ। তারপর দু'জনে পান পাত্র ঠোকাঠুকি করে নিবিড় আনন্দে চুমুক দিলেন তাতে।

— তা বলুন, অসিতবাবু, তিপ্‌রা চুয়াক কেমন?

— এক কথায় অদ্ভুত। এমন সুগন্ধী মদ এর আগে খাইনি।

—'হতেই হবে। এযে বিন্নি চালের তিপ্‌রা চুয়াক' বলেই মোহনবাবু পুরো কাপটাই এক চুমুকে শেষ করে ফেললেন। মোহনবাবুর দেখাদেখি অসিতবাবুও দ্বিতীয় চুমুকে শেষ করলেন সবটা। বোঝা গেলো তিনিও মোহনদার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চলতে চান। অসিতবাবুর পানপাত্র পূর্ণ করে দিয়ে নিজের পানপাত্রও ভরলেন তিনি। আমি ভাবলাম এই কমপিটিশান কোথায় গিয়ে শেষ হবে কে জানে?

— আচ্ছা মোহনদা, আপনি তো সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেকবার গেছেন। তাহলে ভদকা তো ভালোমতোই খেয়েছেন। তা তার সঙ্গে আমাদের তিপ্‌রা চুয়াকের কি তুলনা চলে?

— আরে বলছো কি তুমি! তিপ্‌রা বাড়ির বিন্নি চালের চুয়াক তো বিয়ার নয়, এ তো রীতিমতো উয়াইন। ভদকা তো খানিকটা বিয়ারের মতো।

— তা ঠিক বলেছেন মোহনবাবু, ভদকা আর যুগোস্লাভিয়ার গ্রামাঞ্চলের মদের স্বাদ প্রায় একই। এখন যা খাচ্ছি, তাতো উঁচুমানের অ্যালকোহল।'

— তাহলে আপনিও অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন আমাদের শ্বশুরকুলের মদের। ব্রেভো ব্রেভো।' বলেই তিনি আবার পানপাত্র পূর্ণ করলেন দু'জনের। আবাব একচুমুকেই সাবাড় করলেন দু'জনে। জমে উঠলো চীনা ভাষার পুতাওজিউয়ের আসর।

— আচ্ছা মোহনদা, আপনি তো সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন, বিভিন্ন জায়গার ভদকা খেয়েছেন, তা সব ভদকাই কি একরকম স্বাদের?

— দেখো কুমুদ, আমি তাসখন্দ, দাগেস্তান, কাজাখাস্তান, নর্থ ওসেটিয়া এই জায়গাগুলোতে গিয়েছি সি. পি. আই.-এর ন্যাশনাল কাউন্সিলের মেম্বার হিসেবে। সব জায়গায় কমিউনিষ্ট পার্টির লোকাল সেক্রেটারী আমার অনারে ওইসব জায়গার লোকাল ভদকা খাইয়েছেন ডিনারের আসরে। আমি দেখেছি, প্রত্যেক জায়গার ভদকার আলাদা আলাদা নাম, আর স্বাদও আলাদা। তা শোনো, দাগেস্তানে একটা ঘটনা ঘটলো।

—দুপুর বেলায় কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানকার একটা যৌথ খামার দেখাতে। যৌথ খামার দেখা শেষ হলে খামারের গেষ্ট হাউসে আমার অনারে লাঞ্চ দেয়া হলো। লাঞ্চের আগেই একটা ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলো। দাগেস্তানী ফোক ডান্স আমি কখনো দেখিনি এর আগে। ফোক ডান্সের একটা মেয়ে.কে আমার এত্তো ভালো লাগলো যে আমার চোখ বারবার সেই মেয়েটির ওপর পড়ছিলো। কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারীর নজরে পড়ে সেটা। ব্যাপারটা তখনো আমি বুঝিনি। পরে যখন রাতের ডিনার খেতে বসলাম কমিউনিষ্ট পার্টির লোকাল সেক্রেটারীর সঙ্গে, তখন দেখি সেই ফোক ডান্সের মেয়েটাই ফোকডান্সের ড্রেস পরেই আমাদের পরিবেশন করছে। আমি তো অবাক। সেক্রেটারী তখন আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'যৌথ খামারের ফোকডান্সের অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে আপনার চোখ যে মেয়েটির ওপর বারবার পড়ছিলো, তার হাতেই আপনাকে ডিনার খাওয়াচ্ছি কমরেড।' সেক্রেটারীর কথা শুনে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলাম

আমি। তারপর পিতৃসুলভ চুমু দিলাম মেয়েটির কপালে। তা বুঝলে, কুমুদ, সোভিয়েতের লোকেরা রসিক বটে। সে তোমার কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী শুরু করে যৌথ খামারের একজন সাধারণ কৃষক পর্যন্ত।

অসিতবাবু দেখলাম মোহনদার এই গল্প গোগ্রাসে গিলছেন। এমন সময় মোহনদার চোখ গেলো শূন্য চুয়াকের বোতলের দিকে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাও কুমুদ, তোমার শাশুড়ীকে গিয়ে বলো এর এক বোতল চুয়াক দিয়ে যেতে।'

আমি রান্না ঘরে গিয়ে পিসশাশুড়ীকে বললাম, 'আমা, তাঁই বতলছা রহরদি ফুন' (মা, আর এক বোতল পাঠাতে বলেছেন)। আমি এ-কথা বলতেই রান্নাঘরের মিটসেফ থেকে বিন্নি চালের চুয়াক এক বোতল আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'ইঁ, তিলাঙছিদি, আঙ উল' পেলেত বাই চাখনি তুফাইআনৃ' (এই যে নিয়ে যাও, পরে আমি চাট নিয়ে আসবো।)

আমি চুয়াকের বোতল বিছানার ওপর রাখতেই মোহনদা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'চীনাভাষায় চুয়াকের বোতলকে তুমি কি যেন বলেছিলে ?'

— 'জিউপিঙ ।'

— 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জিউপিঙ , জিউপিঙ। তা অসিতবাবু, আপনার অনারে পুতাওজিউ জিউপিঙছা মিসেস চৌধুরী পাঠিয়েছেন , দিন আপনার পানপাত্রটা, ভর্তি করে দিই।' বলেই তিনি আবার দু'জনের পানপাত্র পূর্ণ করলেন। আবার এক চুমুকে জেনারেল চৌধুরী পানপাত্র শেষ করতেই আমি আমার দীর্ঘদিনের সুপ্ত কথাটা পাড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, মোহনদা, শুনেছি আপনি নাকি সিধাই থানা লুট করার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ?'

আমার কথা শুনেই জেনারেল হঠাৎ করে পানপাত্রটা রাখলেন বিছানার ওপর। তারপর আমার দিকে তাঁর কৌতূহলী চোখের ঝলক মেরে বললেন, হঠাৎ একথা কেন, কুমুদ?'

—'না, এই ঘটনা তো এখন প্রবাদের মতো হয়ে গেছে আপনাকে নিয়ে। মোহন কমরেড সিধাই থানা লুট করেছিলো, একথা কেনা বলে? কিন্তু কী করে মোহন কমরেড এই অসাধ্যসাধন করেছিলেন , তা কিন্তু কেউ জানেনা। অথচ এই ঘটনায় সারা ভারতে নাড়া পড়েছিলো সেদিন। তাছাড়া, দশরথের একটা বই বেরিয়েছে ককবরক ভাষায়। তাতে তিনি আপনাকে শুধুমাত্র 'গানম্যান' এই এপিথেট দিয়েছেন। আপনার বুদ্ধিমত্তা স্বীকার করেননি তিনি।'

আমার এই কথা শুনে পানপাত্রটা এক চুমুকে শেষ করলেন জেনারেল। দেখলাম, অসিতবাবুও কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করেছেন। তারপর জেনারেলের চোখ সহসা আমার ওপর নিবদ্ধ হলো। প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'শোনো কুমুদ, দশরথ দশরথ হতো না, যদি না মোহন চৌধুরীর মতো একজন অতিসাহসী আর্মিম্যান না পেতো। আমি ছিলাম প্যারাট্রুপার। বুদ্ধির এক ইঞ্চি এদিক-ওদিক হলে মৃত্যু ছিলো অনিবার্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফিল্ডে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছি আমি। কাজেই দশরথের ওই এপিথেটে আমার কিছু যায় আসে না। তবে আজ তুমি আমার একটা অতি গোপন জায়গায় আঘাত করেছো, যা আমি কোনোদিন বলে যেতে চাইনি। এবং তখনকার ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব আমার ওপর যে অবিচার করেছিলো তা এখন বলবো। তাহলে শোনো, সিধাই থানা লুটের কাহিনী। তখন মিলিটারী শাসন, থানার পুলিশ পাহাড়ে ঢুকে খুব অত্যাচার করছে, মেয়েরাও বাদ যাচ্ছে না তাদের অত্যাচার থেকে। তখন আমি সি. পি. আই.-এর শান্তিসেনার সেক্রেটারী জেনারেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করে ফেরা সোলজার আমি। খুন চড়ে গেলো আমার মাথায়ও। একটা প্রতিশোধ নিতেই হবে। একরাত্রে গোপনে বিদ্যার সঙ্গে পরামর্শ করলাম সিধাই থানা লুটের। বিদ্যাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মাফ্রন্টে

টলড়াই করেছিলো। ছক কষে ফেললাম আমরা দু'জনে। ঠিক করলাম থানাটা লুট করবো এক বাজারবারে বেগুনের ব্যবসায়ী সেজে। পরপর চারটে বাজারবার ওয়াচ করলাম আমরা সিধাই থানায়। দেখলাম, বাজারবারের দিন থানার পাশ দিয়ে যাবার তরকারি ব্যবসায়ীদের থানার লোকেরা ডেকে ভেতরে নিয়ে যায় একেবারে থানার অফিসের বারান্দায়। বেশ কিছুক্ষণ দরাদরি করার পর তরিতরকারি কিনে পুলিশরা ছেড়ে দেয় তাদের। দাম দেয় কম বাজারদরের চাইতে। বিদ্যার সঙ্গে আলাপ করে বিদ্যা আর আমি ছাড়া আরো পাঁচজন শান্তিসেনার জঙ্গী কর্মীকে বাছাই করলাম। এই পাঁচজনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা ফেরত ট্রাইবাল সোলজার। ঠিক হলো পেছনে থাকবে দু'জন, মাঝখানে ভাড়ে (বাকে) করে তিনজন বেগুন নিয়ে হাঁটবে, আর একেবারে সামনে থাকবো আমি, আমার পেছনে বিদ্যা। সাতজনের পরনে পরা থাকবে লুঙ্গি ও ওপরে আধময়লা জামা। সাতজনের কাছেই থাকবে পিস্তল লুঙ্গির নিচে খাকি প্যান্টের ভেতর। তারপর এসে গেলো বাজারবারের সেই মোক্ষম দিন। পূর্বের সিদ্ধান্ত মতো আমরা থানার সামনে দিয়ে যেতেই থানার বারান্দা থেকে হাঁক দিলো রাইফেল হাতে সেন্ট্রি — এই যে বেগুন, এদিকে নিয়ে এসো। আমরাও সুড়সুড় করে ঢুকে পড়লাম থানার চৌহদ্দির ভেতর। সেন্ট্রি আবার গলা হাঁকালো — অফিস ঘরের বারান্দায় ওঠো। আর বেগুন নিয়ে গেলাম তো গেলাম অফিস ঘরের দরজার সামনে। আমি এক ঝলকে দেখে নিলাম ঘরের ভেতরটা। দেখলাম, ঘরের ভেতর দু'জন পুলিশ তাদের অফিসিয়াল কাজ করছে। বেশ কটা রাইফেল আর বন্দুক সাজানো রয়েছে ঘরের এক কোণে। বেগুনের দরাদরি শুরু হলো। আমি ইঙ্গিত করতেই বিদ্যা সেন্ট্রিকে মারলো ইয়া এক লাথি। সে পড়ে যেতেই তার হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিলো আমাদের জঙ্গী কর্মীরা। আর তার মাথায় মারলো রাইফেল দিয়ে বাড়ি। আল্লারে বলে সে চিৎকার করে উঠতেই অফিস ঘরের ওই দু'জন পুলিশ খালি হাতে বেরিয়ে আসতেই আমি পিস্তল উঁচিয়ে ইঙ্গিত করতেই বিদ্যা, সোনারাম ও আরো দু'জন তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ফেলে দিলো বারান্দা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ও বিদ্যার ইঙ্গিতে শান্তিসেনার পাঁচজন জঙ্গী ঢুকে পড়লো অফিস ঘরের ভেতর। তারা ঢুকতেই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলাম আমি। আর নিমেষের ভেতর জড়ো করে রাখা রাইফেলগুলো নিয়ে অফিস ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে দৌড় দিলাম আমরা থানার পাশের জঙ্গলের ভেতর। এবং সেখান থেকে বাজারের দিকে এগিয়ে চললাম আমরা। এদিকে থানার পাগলা ঘন্টা বাজার শব্দ আসতে লাগলো আমাদের কানে। একটু পরেই থানার পুলিশরা আমাদের গতিপথ লক্ষ্য করে গোলাগুলি ছুঁড়তে লাগলো মুহুর্মুহুঃ। ততক্ষণে আমরা বাজারে পৌঁছে গেছি। আমার হাতে পিস্তল। আর বিদ্যা ও অন্যদের হাতে একটা করে রাইফেল। দেখলাম বাজারের লোক যে যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে। তাদের কানেও পৌঁছে গেছে সিধাই থানা লুটের খবর। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয় হয়। বাজারের মাঝখানে এসে আমি বক্তৃতা করলাম মাত্র দু'মিনিটের। বললাম, বন্ধুরা আপনারা পালাবেন না। ব্যবসায়ী বন্ধুদের সঙ্গেও শান্তিসেনার কোনো শত্রুতা নেই। শত্রুতা হলো আমাদের পুলিশ-মিলিটারীর সঙ্গে। পুলিশ-মিলিটারী পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে যে অত্যাচার করছে তার পাল্টা নিলাম আজ। আপনারা নির্ভয়ে বাজার করুন। এই কথা বলেই আমরা গা ঢাকা দিলাম আমাদের ডেরার দিকে। বাজার ছাড়তেই আবার কানে এলো কারা জোরে জোরে বলছে ওইতো মোহন কমরেড। মোহন কমরেডতো পিস্তল উঁচিয়ে বক্তৃতা করলো।

মোহনদার রোমহর্ষক কাহিনী বন্ধুবর অসিতবাবু ও আমি রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলাম। সিধাই থানার লুটের কথা শেষ করেই এক চুমুকে পিন্নি চালের চুয়াকের কাপ নিঃশেষিত করে ঢকঢক করে নিজের কাপটা আবার ভর্তি করলেন তিনি। তারপর অসিতবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'কি অসিতবাবু আপনারটা শেষ করুন।'

আমার শ্বশুরদ্বয় আমার কাছ থেকে সিধাই থানার লুটের প্রবাদ কাহিনী শুনতে শুনতে বিলিতি চুয়াকের পাত্রে চুমুক দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। ছোটশ্বশুর উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর?'

তারপর আপনাদের মোহন কমরেড ক্ষোভের সঙ্গে ফেটে পড়ে বললেন, 'আমি শুধু শান্তিসেনার গানম্যান ছিলাম না কুমুদ। বুদ্ধি না থাকলে দশ মিনিটের মধ্যে একটা থানা লুট করে বাজারে গিয়ে ওইরকম পোলারাইজড বক্তৃতা করতে পারতাম না আমি। দশরথ, দশরথের কথা ছেড়ে দাও তুমি। ওই তো বললাম, এই মোহন চৌধুরী না থাকলে দশরথ দশরথ হতো না। ত্রিপুরা রাজ্যে নৃপেন চক্রবর্তীর মতো একজন তাত্ত্বিক নেতা হয়েই থাকতে হতো তাকে। এতদিন চুপ করেছিলাম আমি। তাহলে দেখছি আমাকেও কলম ধরতে হবে। হুঁ, দশরথ, দশরথের অনেক কথাই জানি আমি, কমিউনিষ্ট নেতা হয়ে সে রীতিমতো পুজো নিতো ট্রাইবাল মেয়েদের কাছ থেকে।

— 'কি রকম?' কৌতূহল বেড়ে গেলো আমার।

—' একবার হেজামারায় হলো কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন। আমি আর নৃপেনদা একটা ঘরে। দশরথের সঙ্গে ভেতরের ঘরে কথা বলতে যেতেই দেখি উঠোনের মাঝখানে ট্রাইবাল মেয়েরা তার পা ধুইয়ে দিয়ে ধূপধুনো দিয়ে রীতিমতো পুজো করছে। আমি তো অবাক। দশরথ তাহলে নিজেকে দেবতার আসনে বসিয়েছে! ফিরে এসে নৃপেনদার কাছে ক্ষোভের সঙ্গে দশরথের পুজো নেয়ার কথা বলতেই তিনি কী বললেন জানো?

— 'কী বললেন?'

বললেন, 'ওটা হলো গিয়ে বুঝলেন মোহন, কমরেড দশরথের একটা টেকনিক।' নৃপেন চক্রবর্তীর কথা শুনে আমার তো মাথায় হাত, এতো নিছক ব্যক্তি পুজো না, যাকে বলে দেবতার পুজো, মার্ক্সবাদের চরম বিকৃতি !'

— 'আচ্ছা ওসব কথা থাক মোহনদা। আপনারা নেতায় নেতায় একে অন্যের মূল্যায়ন করুন ইচ্ছে মতো। এখন বলুন সিধাই থানা লুটের পর তার প্রতিক্রিয়া কেমন পড়লো চারদিকে?'

— 'শোনো, রাত্রেই অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো থেকে খবর শুনলাম — 'ত্রিপুরায় কমিউনিষ্ট গেরিলাদের সিধাই থানা লুট।' সারা ভারতে এই খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো। যাকে বলে it stirred up a storm throughout India। পরের দিন ভারতবর্ষের প্রথম শ্রেণীর কাগজগুলোতে ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট গেরিলাদের থানা লুটের খবর বেরেলো ফলাও করে। আমাদের ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট পার্টির প্রেস্টিজ বেড়ে গেলো সারা ভারতে। কিন্তু দুঃখের কথা কী জানো?

— 'কী?' — জিজ্ঞেস করলাম আমি পরম কৌতূহল নিয়ে।

— 'ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট পার্টি সিধাই থানা লুটের ঘটনা ভালোভাবে নেয়নি।'

— কেন, এই থানা লুটের বিষয়টি তাহলে পার্টির অনুমোদিত ছিলো না?

— 'আরে, এইসব ঘটনা কি পার্টির কাছ থেকে আগাম অনুমোদন করে করা যায়? এইসব দু'একটা ঘটনা ঘটাতে হয় প্রয়োজন পড়লে। জানো কুমুদ, সিধাই থানা লুটের পর আর পুলিশ-মিলিটারী আগের মতো পাহাড়ের ভেতর ঢুকতে সাহস করেনি, ট্রাইবাল মেয়েদের ইজ্জত লুট তো দূরের কথা।'

— 'তাহলে তো দেখছি, সিধাই থানা লুটের পর পার্টি আপনার কাছে নিশ্চয়ই কৈফিয়ত তলব করেছিলো।'

— 'সে কথা আর বলো না। পার্টি আমার এই দুঃসাহসিক কাজকে সেন্সার করলো, আমার বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব নিলো দশরথ-নৃপেন চক্রবর্তীরা। এই হলো তোমার কমিউনিষ্ট পার্টির

দূরদর্শিতা।'

এর মধ্যে আমার পিসশাশুড়ী এসে বললেন, 'মাই খুরবাইখা চাফাইছিদি' (ভাত বাড়া হয়েছে, খেতে এসো।) মোহনদা এই কথা শুনে অসিতবাবুর কাপে চুয়াক ঢেলে নিজের কাপও পূর্ণ করলেন। তারপর এক ঢোকে তা গলাধঃকরণ করে বললেন, 'চলো কমুদ, এবার বন্ধুকে নিয়ে ভাত খাওয়া যাক।'

আমরা ভাত খেতে বসলাম তিনজনে। অসিতবাবুর সৌজন্যে তিপ্রা খানার সঙ্গে বাঙালী খানাও রান্না করেছিলেন আমার শাশুড়ী। মাংস খেতে খেতে মোহনদা আরেকটা অবিশ্বাস্য কথা পরিবেশন করলেন।

— 'কি কথা?' আমার ছোটশ্বশুর জিজ্ঞেস করলেন?'

মাংস খেতে খেতে মোহনদা বললেন, 'জানো কুমুদ, হেমন্ত দেববর্মার মাংস খাবার কাহিনী?'

— না, আমি কী করে জানবো?

— শোনো, তোমরা বিশ্বাস করবে না। দু'তিনটে বিভিন্ন রঙের মোরগের মাংস মিশিয়ে রান্না করে খাওয়ালে হেমন্ত ধরতে পারতো কোন কোন রঙের মোরগের মাংস এক সঙ্গে রান্না করা হয়েছে।

— বলেন কি?

বললাম তো, তোমরা বিশ্বাস করবে না। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি ব্যাপারটা। একবার করলাম কি, লাল, কালো, সাদা ও খয়েরী রঙের মোরগের মাংস মিশিয়ে রান্না করে খাওয়াতেই সে খেতে খেতে বলতে লাগলো — এই মাংসর টুকরোটা সাদা মোরগের, এই মাংসের টুকরোটা লাল মোরগের, এইভাবে সে প্রত্যেকটি রঙের মোরগের মাংসের আলাদা আলাদা স্বাদের কথা বলতে লাগলো আমাদের। ব্যাপারটা আমরাও বুঝতে পারতাম না প্রথম প্রথম। আসলে হেমন্তটা ছিলো সত্যিই ভোজন রসিক। আর খেতেও পারতো সে। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমার মতো লোকের তিনজনের খাওয়া একাই খেতো সে। আর তার জন্যেই ডায়েবিটিস ধরলো তার। তারপর আশির জাতিদাঙ্গার হলাহল দেখেই গেলো মারা।

— ওঃ অনেক তথ্য পেলাম আপনার কাছ থেকে মোহনদা। আমার বন্ধু অসিত চক্রবর্তীও সাক্ষী রয়ে গেলেন দূরের অতিথি হিসেবে। আমি, মোহনদা, খেয়েই চলে যাবো আদিবাসী কলোনীতে। সেখানে মের্তাবাড়ি ও আদিবাসী মুসলমান পাড়া নিয়ে একটা মিটিং আছে। লাবণ্য দেববর্মাও আলী থাকবেন ওই মিটিঙে। অসিতবাবুকে আপনার কাছে রেখে গেলাম। ওঁরও কিছু ভাষার কাজ আছে। কমরেড নৈদ্যাবাসীর সঙ্গে একটু বসিয়ে দেবেন, ককবরক ফোকছঙ নিয়ে অসিতবাবু তাঁর সঙ্গে একটু আলোচনা করবেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর মোহনদাও বন্ধুবর অসিত চক্রবর্তী পড়লেন শুয়ে। আমি শাশুড়ীর কাছ থেকে পান খেয়ে রওনা দিলাম আদিবাসী কলোনীর দিকে। মনে আমার পরম তৃপ্তি। যাক, এতদিনে সিধাইথানা লুটের রহস্য ওই লুটের নায়ক মোহন কমরেডের কাছ থেকে বেব করা গেলো।

আমার কথা শেষ হলে ছোটশ্বশুর বললেন, তিপ্রা চুয়াকের জয়গান গাইতে গিয়ে সিধাইথানা লুট থেকে শুরু করে ভোজনরসিক হেমন্ত দেববর্মা পর্যন্ত কত কথাই না শোনালে তুমি। তোমার ভাণ্ডারে আরো কিছু থাকলে বলে ফেলো। আর কবে মেয়ে-জামাইয়ের বাসায় আসবো আমরা। যা দিনকাল পড়েছে, গ্রামে চুয়াক খাওয়াও মানা। আজ অনেকদিন পর সত্যিই মনে হলো আমাদের হেরমা গ্রামটা তোমার কর্তার বাসায় উঠে এসেছে। ঠিক আছে, আজ যখন বাসায় ফিরতে দিচ্ছ না তোমরা, তাহলে আমাদের তিপ্রা চুয়াকের আরো কিছু গল্প শোনা যাক তোমার কাছ থেকে।

— জানেন কাকা, বেশ ক'বছর আগে আমাদের সি. পি. আই. পার্টির মেঘালয়ের নেতা কমরেড

প্রফুল্ল মিশ্র এলেন আগরতলায়। উঠলেন সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের মেলারমাঠের বাসায়। বাসা মানে অনিলবাবুর স্ত্রীর কোয়ার্টার। তা প্রফুল্লদা ছিলেন আমার শিলঙ অবজার্ভার পত্রিকার সম্পাদক। আগরতলায় তিনি আসতেন সাংবাদিকতার কাজে। কাজেই থাকতেন তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত বন্ধু অনিল ভট্টাচার্যের কাছে। আর, বোঝেন তো, প্রফুল্লদা শিলঙের লোক, চুয়াক ছাড়া চলে না তাঁর। প্রফুল্লদা এলেই অনিলবাবু করতেন কি আগরতলার সাংবাদিকদের নিমন্ত্রণ করতেন প্রফুল্লদার সৌজন্যে। সাংবাদিকরা তো প্রফুল্লদা যে ক'দিন থাকতেন, জমিয়ে তুলতেন অনিলবাবুর বাড়ি। সাংবাদিকদের খুশী করার জন্যে বুঝতেই তো পারছেন, অনিলবাবু বাকি রাখতেন না কিছু। আর প্রফুল্লদার দিনের বেলার বাহন থাকতাম আমি। রাতের বেলায় আমি চলে যেতাম বীরচন্দ্র উকিলের পান্থশালায়।

— আচ্ছা, জামাই, তুমি যে অনিল ভট্টাচার্যের কথা বললে, তিনি তো শুনেছি ছিলেন কলকাতার যুগান্তর পত্রিকার রিপোর্টার। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর খুব নামডাক আছে, তাই না?

— নামডাক মানে? উনিই তো বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের হত্যার খবর সর্বপ্রথম জানতে পারেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে দেন সারা পৃথিবীতে।

— বলো কি তুমি? আমাদের আগরতলার একজন সাংবাদিক শেখ মুজিবর রহমানের হত্যার খবর সর্বপ্রথম জানতে পারেন! তাহলে দেখছি তিনি আমাদের ত্রিপুরার গর্ব।

— ত্রিপুরার গর্ব তো বটেই, সারা ভারতবর্ষের গর্ব আমাদের অনিল ভট্টাচার্য। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মূল নকশা তো তৈরী হয় তাঁর মেলারমাঠের বাসায়। তা সে অনেক কথা। আপনাদের ইচ্ছে আর ধৈর্য থাকলে পরে সে কাহিনী বলতে পারি আমি।

— না না, পরে না। আজই শোনাও সে-সব কথা, এমন সময় আর পাবো না জামাই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার হচ্ছে সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের মেলারমাঠের বাসা। ওঃ, দারুণ ব্যাপার দেখছি।

— দাঁড়ান, তিপ্‌রা চুয়াকের মূল কাহিনীটা আগে শেষ করি প্রফুল্লদাকে নিয়ে। তারপর বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য ও তার স্ত্রী সুনন্দা দেবীর ভূমিকার কথা শুনবেন।

— তা তোমাদেব ওই কমরেড প্রফুল্লবাবু কি কোনোদিন আমাদের হেরমা গ্রামে গেছেন তোমার সঙ্গে?

— আরে, সে-কথাই তো বলতে যাচ্ছি আমি। সেবার দিন দু'য়েক অনিলবাবুর বাড়িতে হৈহুল্লোড়ের মধ্যে কাটানোর পর হঠাৎ করে প্রফুল্লদা বললেন, চলুন কুমুদবাবু, আপনার শ্বশুরবাড়ির ট্রাইবালল্যাণ্ড থেকে একবার ঘুরে আসা যাক। প্রতিবারই ভাবি, আপনার ককবরক গবেষণার গ্রামটা একবার দেখে আসি, তা আর হয়ে ওঠে না। আজই চলুন বিকেলের দিকে।

— তা, বুঝলেন, কাকা, প্রফুল্ল মিশ্রের ওই কথা শুনে রাজি না হবার উপায় ছিলো না আমার। শিলঙে সেমিনার-টেমিনার সেরে ওঁর কাছে থাকি আমি পুলিশ বাজারে কাঠের দোতলা আমাদের পার্টি অফিসে। কাজেই দুপুর গড়াতেই অনিলবাবুর বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে। বটতলায় গিয়ে উঠে বসলাম আমাদের চড়িলামের বাসে। কিন্তু বাসে চেপে সবসময় একটা সমস্যার কথা মনে পড়তে লাগলো আমার।

— কি সমস্যার কথা শুনি।

সমস্যা হলো প্রফুল্লদাকে পায়খানা করাবো কোথায়? হেরমাতে তো একটাও পাকা পয়খানা নেই। আপনাদের পাকা পায়খানাও তখনো হয়নি। সারা রাস্তাটা একরম দুশ্চিন্তায় কাটালাম আমি। যা হোক, চড়িলামে নেমে সোজা হেরমার দিকে পা চালিয়ে সন্ধ্যের একটু আগে গিয়ে পৌঁছলাম হেরমা বাজারে।

হেরমার ট্রাইবাল বাজার দেখে প্রফুল্লদা তো অবাক। আমাকে বললেন, 'এ যে দেখছি, নির্ভেজাল একটা ট্রাইবাল বাজার।' অনিল দেববর্মার ভিড়ে ঠাসা চায়ের দোকানে আমার ভায়রাভাই কৃষ্ণকান্তর হেফাজতে তাঁকে রেখে আমি সোজা চলে গেলাম শূকরের মাংস কিনতে। পাতায় মোড়া এক কেজি মাংস কিনে আমার মেঝোশালা তুইয়ার হাত দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। আর তার দিদিকে প্রফুল্লদার আসার কথা বলে পাঠালাম।

— তা আর কী বললেন আমাদের হেরমার বাজার দেখে প্রফুল্লবাবু ?

— বললেন, জানেন কুমুদবাবু, আমাদের খাসি এলাকায় এমন ট্রাইবাল বাজার আছে। তবে পার্থক্য, খাসি বাজারগুলোতে খাসি মেয়েরাই বেচাকিনা করে বেশী।

তখন আমি তাঁকে নিয়ে গেলাম ট্রাইবাল মেয়েদের শাক-সব্জির বাজারে। আমাদের হেরমা বাজারের সব্জি পট্টিতে গিয়ে মেয়ে সব্জি বিক্রেতাদের কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাজ্জব বনে গেলেন তিনি। সব থেকে তিনি অবাক হলেন ঝুড়ি ঝুড়ি মুইয়া (বাঁশের কড়ুল) দেখে। হঠাৎ তাঁর চোখ গেলো একজন ট্রাইবাল মেয়ের লাঙ্গার ভেতর চুয়াকের বোতলের দিকে। তাই দেখে হঠাৎ মোটা গোঁফের তলায় হাসি দেখা দিলো তাঁর। আমার দিকে তাকাতেই বললাম, 'আপনাদের খাসি মেয়েদের মফলঙও মদ।'

—কিনে নিন এক বোতল কুমুদবাবু, ওটা ছাড়া তো আমার চলে না।

— বাজার থেকে কিনতে হবে না প্রফুল্লদা। আমার শাশুড়ীর হাতেব ভালো জিনিসই খাওয়াবো আপনাকে।

— দারুণ চোখ তো তোমাদের প্রফুল্ল মিশ্রর। পড়বি না পডবি একেবারে তিপ্‌রা মেয়েদের লাঙ্গার ভেতর গিয়ে পড়লো তাঁর চোখ।

— সাংবাদিকদের চোখ বুঝলেন না। ঠিক বাজারের তিপ্‌রা চুয়াক আবিষ্কাব করে ফেললেন।

— তারপর নিশ্চয়ই তিনি তাঁর কাগজে আমাদের হেরমার ট্রাইবাল বাজারের ওপর লিখেছেন কিছু। আর তিপ্‌রা মেয়েদের লাঙ্গার ভেতর রাখা চুয়াকের খবর ছড়িয়ে পড়েছে ইংরেজী কাগজের মারফত সারা দেশে।

-- পড়ুক নাপড়ুক আমার শ্বশুরকুলের ভুবনমোহিনী তিপ্‌রা চুয়াকের খবর ছড়িয়ে পড়ুক সারা দুনিয়ায়। দেবতাদের সোমরস। পাহাড়াড়ের ট্রাইবালরা তো দেবতা। সোমরসেই তাঁরা তুষ্ট থাকেন।

— ওঃ দারুণ বললে তো জামাই, পাহাড়ের ট্রাইবালরা দেবতা।' আমার জ্যাঠাশ্বশুর উঠে বসেন এবার।

— জানেন জ্যাঠা, আপনাদের আশির্বাদে আমার পরমায়ু যদি পার পায় তাহলে আমি একখানা বই লিখবো — 'দেবতারা পাহাড়ে থাকেন।'

— বলো কি, তুমি আমাদের দেবতা বলছো ?' ছোটশ্বশুর আবেগআপ্লুত হয়ে ওঠেন। তোমাকে আশির্বাদ করছি, তোমার পরমায়ু বাড়ুক। আর লিখে ফেলো – 'দেবতারা পাহাড়ে থাকেন' তোমার বই।

শ্বশুরদের আশির্বাদ মাথায় নিয়ে বললাম, জানেন কাকা, তারপর ভায়রা ভাই কৃষ্ণকান্তকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তিনজনে দাদা নরেন্দ্রর বাড়ির পাশ দিয়ে আঁদি নদীর ধার দিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে এগোলাম। আমাদের চানের ঘাঠে আসতেই প্রফুল্লদাকে বললাম আমি, 'প্রফুল্লদা, আমাদের কিন্তু পাকা পায়খানা নেই। কাঁচা পায়খানায় কাজ সারতে হবে আপনাকে।'

— তাতে কী হয়েছে? আমাকেও গারো এলাকার গ্রামে যেতে হয় পার্টির কাজে। সেখানেও এই

একই অবস্থা। কাজেই আপনার কোনো চিন্তা নেই। গারো গ্রামে তো আমরা জঙ্গলের ভেতর একাজ সারি। আর সেখানে শুখনো জলসৌচ করতে হয় লতাপাতা দিয়ে ।

—জানেন, দাদা, আমাদের ককবরক ভাষায় খিচোঙ বলে একটা শব্দ আছে, আর যার অর্থ শুখনো জলসৌচ ।

— এই জন্যেই তো তাঁরা পার্টির সাধারণ মানুষের নেতা হতে পেরেছেন। তাঁদের রাজনীতির মটোই ছিলো আলাদা। যেখানে রাত সেখানে কাত।' বলেই বিলিতি চুয়াকে ঠোঁট ভেজালেন আমার ছোট শ্বশুর।

— আমি শুনেছি, বুঝলেন কাকা, শচীন সিং, সুখময় সেনগুপ্ত, দশরথ, বীরেন দত্ত, নৃপেন চক্রবর্তী, সুধন্বা, হেমন্ত, অঘোর সবাই গ্রাম-পাহাড়ে পার্টি করতে গিয়ে কোনো কোনো বাচ-বিচার করতেন না, যেকোন জাতের, যেকোনো লোকের বাড়ি বাত কাটাতেন তাঁরা। আর পায়খানা-চানের কথা তো বাদই দিলাম, যেখানে যেমন ব্যবস্থা। জানেন কাকা, বিধানসভা বা লোকসভার নির্বাচনের সময় কমরেড সরোজ চন্দ মাঝেমধ্যে আমাদের হেরমা গ্রামে থাকতেন। আমি তাঁকে কখনো এঁদো পুকুরে, কখনো ছড়ার জলে, কখনো বা ওভারফ্লোর জলে স্নান করাতে নিয়ে যেতাম। সরোজদার মতো সফিস্টিকেটেড শহুরে নেতা পাহাড়ে ট্রাইবাল বাড়িতে গিযে ওই পবিবেশে যেভাবে অ্যাডজাস্ট করতেন, তা দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম।

– সেদিনের কথা ছেড়ে দেও। সে গেছে একটা ক্লাসিক্যাল যুগ, বুঝলে । হ্যাঁ, তা এখন তুমি বলো, শৈল শহর শিলঙেব তোমাদেব প্রফুল্ল মিশ্র আমাদেব ট্রাইবাল গণ্ড গ্রামের চুয়াক খেয়ে কী বললেন।

— হ্যাঁ, সে কথাই তো বলতে যাচ্ছি। তা প্রফুল্লদাকে নিয়ে তো বসালাম আমাদেব বিয়ের ঘরে। আপনাদেব মেয়ে আগের থেকেই আমাদেব বিয়েব খাটে বিত্রাক (ত্রিপুরী ট্রাইবেল তাতে বোনা বিছানার চাদব) পেতে সুন্দর করে বিছানা পেতে বেখেছিলো। ঘরে ঢুকেই বিছানায় বসতে গিয়ে প্রফুল্লদা বললেন, 'একেবাবে গারো মেয়েদের বোনা বিছানাব চাদরের মতো দেখছি এই চাদর। গাবো-বোড়ো যে এলাকাতেই গেছি, বুঝলেন কুমুদবাবু, বাতের বেলায় শোবার সময বিছানার চাদর ও গায়ের চাদর দেখেছি একই বকম ডিজাইনের।'

— আচ্ছা প্রফুল্লদা, আপনাকে তো মাঝেমধ্যে খাসি এলাকাতেও পার্টি কাজে যেতে হয়, তা আপনি কি গ্রামের খাসি বাড়িতে এ ধরনের বিছানার ও গায়ের চাদর লক্ষ্য করেছেন'?

— কই, না তো! তারা তো বাজার থেকে কেনা চাদর ব্যবহার কবে। আব তাদের মেয়েরাও গারো, বোডো বা আপনাদের এখানকার ট্রাইবাল মেয়েদেব মতো পাছড়া পরেনা, বুকে কাঁচুলিও দেয় না।

—তার কারণ কী জানেন প্রফুল্লদা'?

—কী কারণ আপনার ধারণা'? ব্যাপারটা তো এতদিন মাথায় ঢোকেনি আমার ।

—কারণ, খাসিদের কোনো তাঁত নেই। শুধু খাসি কেন, জয়ন্তিয়া বা সাঁওতালীদেরও কোনো তাঁত নেই। এদের মেয়েরা বোডো, গারো, ত্রিপুরী, দিমাছা, কোচ, মেচ, রাভা, হাজঙ বা চুতিয়া উপজাতি মেয়েদের মতো তাঁত বুনতে জানেনা।

— খুব ইন্টারস্টিংতো আপনার কথা! তা, কুমুদবাবু, আপনি খাসি-জয়ন্তিয়াদের কথা বলতে গিয়ে সাঁওতালীদের কথা আনলেন কেন?

— আসলে কি জানেন, প্রফুল্লদা, খাসি-জয়ন্তিয়া-সাঁওতালী এই তিন উপজাতি সম্প্রদায় একই অস্ট্রিক উপজাতি গোষ্ঠী থেকে এসেছে। অস্ট্রিক গোষ্ঠীব লোকেরা ভারতের অন্যতম প্রাচিন উপজাতি

গোষ্ঠীর তা তো আপনি জানেন। আর এরা ভারতে আর্যদের আসার ঢের ঢের আগে আসে। তা সে যাই হোক, এই অস্ট্রিক উপজাতিদের কেন আদিম তাঁত নেই, তা আমার মাথায় ঢোকে না। হয়তো বা একসময় তাদের এই তাঁত ছিলো, তারপর বিশেষ কোনো কারণে বোধ হয় সেই আদিম তাঁতের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে, গবেষণা ছাড়া এই তথ্য উদ্ঘাটন করা যাবে না।

— ওঃ, জামাই, দেখছি তুমি তোমার গবেষণার লাইনে চলে গেলে আমাদের তিপ্‌রা চুয়াকের কথা বলতে গিয়ে, এখন আসল কথায় এসো।

— ঠিক এমন সময় আপনাদের মেয়ে ও ভায়রাভাই কৃষ্ণকান্ত ঘরে ঢুকলো। আপনাদের মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করে দিতেই প্রফুল্লদা বললেন, আরে কুমুদবাবু, আপনার স্ত্রী দেখছি আমাদের কোকড়াঝাড়ের বোড়ো কমরেড মোহিনী রামছিয়ারীর বৌয়ের মতো। ঠিক একইরকমের পাছড়া আরা কাঁচুলি পরা।' বলেই তিনি ফুলটিব দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

— তা প্রফুল্লদার কথা শুনে আর তার চাহনি দেখে আপনাদের মেয়ে ফিক করে হেসে ফেলে আমাকে কক্‌বরকে জিজ্ঞেস করলো, 'নরগনি পরফুল্‌লদা বৃতৃক দা নৃঙ? কিছা ছুঙগ্‌রাদি বন' পি কুছুনি ন়গ' মামিনি বৃতৃক তঙগ, ব নৃঙনা মুচুঙখে অর' রূফাইআনৃ' (তোমাদের প্রফুল্লদা গড়া খায় নাকি? একটু জিজ্ঞেস কর তাঁকে। ছোটপিসির ঘরে বিন্নি চালের গড়া রয়েছে, তিনি খেতে ইচ্ছে করলে এখানে পাত্রটা এনে দেবো')।

— তারপর বুঝলেন কাকা, প্রফুল্লদাকে জিজ্ঞেস করলাম — 'প্রফুল্লদা আমার স্ত্রী জানতে চাইছেন আপনি বৃতৃক খাবেন কিনা। খেলে বিন্নি চালের বুতৃকের পাত্রটা এখানেই এনে দেবেন।

— বৃতৃক, সে আবার কি?

— গড়ার মতো। নল দিয়ে চুষে খেতে হয়। একেবারে জুমের বিন্নি চালের পচুই। এই মিষ্টি পচুই খেলে আর রক্ষে নেই, ঘুম ভাঙবে আপনার সেই সকাল আটটা-নটার পরে।

— বলেন কি, এমন জিনিষ না খেয়ে কি পারা যায়, ঘুম না হয় একটু দেরীতেই ভাঙলো, তবু এমন জিনিষ খেতেই হবে।' তারপর আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন — মিসেস রামছিয়ারী আপনার ওই বিন্নি চালের গড়া খেলে ঘুম ভাঙবে তো, না একেবারেই ভাঙবে না? যাক ওতে আমার কিছু যায় আসে না, বিয়ে-থা করিনি, পার্টি হোলটাইমার, কী আর হবে। পিছুটান নেই আমার, নিয়ে আসুন আপনার গড়া, খেয়েই দেখি।

প্রফুল্লদার সম্মতি পেয়ে ভায়রাভাই কৃষ্ণকান্তকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো ফুলটি ঘর থেকে। তারা যেতেই প্রফুল্লদা বললেন, 'দারুণ বৌ পেয়েছেন আপনি। জানলেন কুমুদবাবু, আমি একবার এক খাসি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম, খাসি মেয়ে বিয়ে করে ঘরজামাই থাকতে হবে, তখন পিছিয়ে এলাম আস্তে আস্তে। বুঝলেন, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ মানে যে কী, তা তো রোজই শিলঙে দেখি, যাকে বলে মেয়েদের স্বৈরতন্ত্র, পুরুষরা খাসি বৌদের যে ডরায়, তা আর কী বলবো।'

ঠিক এমন সময় ভায়রাভাই কৃষ্ণকান্ত বৃতৃকের ছোট কলসিটা এনে আল্টার ওপর বসালো ঘরের একদিকে মেঝের ওপর। ফুলটিও এলো তার পেছন পেছন একটা শীতল পাঠি নিয়ে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'হুঁ, আঙ লামথাই ব-ই-রূখা, তলাঅ নরগ আচুকলাইবাইছিদি।' (এই যে আমি মাদুর পেতে দিলাম, নিচে এসে বসো তোমরা) বলেই বেরিয়ে গেলো সে। একটু পরেই আবার এলো সে, একহাতে একটি ঘটি, অন্য হাতে এক বোতল চুয়াক।

— 'এই বার জমে উঠবে বৃতৃক-চুয়াকের আসর।' ছোট শ্বশুরের গলায় কৌতূহলের সুর।

— দাঁড়ান, আগে কনৌজী ব্রাহ্মণ প্রফুল্ল মিশ্রকে খাট থেকে নিচে নামাই।

— কনৌজী ব্রাহ্মণ মানে?

— আসলে প্রফুল্লদাদের পূর্ব পুরুষ শ'চারেক বছর আগে কনৌজ থেকে আসামে আসেন। প্রফুল্লদা আসলে অসমীয়া, বাঙালী নন।

— আমি ভাবছিলাম তোমাদের প্রফুল্লদা বাঙালী।

— না, তবে বাঙলা ভাষা বাঙালীদের মতোই বলতেও পারেন পড়তেও পারেন। জানেন কাকা, বরাবরই শিলঙে থাকতেন প্রফুল্লদা। সেখানেই লেখাপড়া, সেখানেই সি. পি. আই. পার্টির কাজ। তারপর আসাম ভাগের পর শিলঙ যখন মেঘালয়ের অংশ হয়ে গেলো, প্রফুল্লদা মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙেই রয়ে গেলেন। সেখানে কমরেড বিনয় লাহিড়ী ও প্রফুল্ল মিশ্র এই দুই ব্রাহ্মণ কমিউনিষ্ট তাত্ত্বিক খাসিয়া-জয়ন্তিয়া-গারো এই তিন খ্রিষ্টান পাহাড়ে মার্ক্সবাদের বীজ বপন করলেন শক্ত শেখড়ের আশায়। কিন্তু চেরাপুঞ্জীর ব্যাপটাইজড্ বৃষ্টিধারায় তা প্রায় প্রতিদিন ধুয়ে-মুছে যাচ্ছে শেকড় সমেত।

—আরে, এতো দেখছি তুমি কবিতা শুরু করলে। এখন প্রফুল্লবাবুকে লাঙ্গি খাওয়াও।

— এই তো খাওয়াচ্ছি। তা প্রফুল্লদাকে বললাম, দাদা এবার নিচে নামুন, সর্বহারার সাম্যবাদে বিশ্বাসী আপনাকে ওপরে আর অন্যদেব নিচে রাখা যাবে না, ট্রাইবালবাড়ির 'রাইদা' (রেওয়াজ) অনুযায়ী এক সঙ্গে একনলে বৃতুক চুষতে হবে।'

—তা বুঝলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লদা প্যান্ট খুলে লুঙ্গিটা পরে নিচে বসে গেলেন। সামনে মূর্ত্তিমান সোমরসের বোতল আর ভাণ্ডেও অন্য স্বাদের কারণবারি। এরপর ভায়রাভাই আমার ঘটিতে করে জল ভরে ভরে বৃতুকের কলসিটা করলো কানায় কানায় ভর্তি। তারপর 'তেঙ্গি' (মসৃণ সরু চটার ফালি যা সহজে বাঁকানো যায়। এই তেঙ্গির একটু অংশ বাঁকিয়ে বৃতুকের কলসির ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হয় এবং ভাঙার জায়গাটা থাকে কলসির অগ্রভাগে। বৃতুক চুষতে হবে ঠিক ওই ভাঙা জায়গা পর্যন্ত। তারপর আবার জল ঢেলে ওই ভাঙা অংশ পর্যন্ত জল দিয়ে ভরতে হবে। এইভাবে সকলেই বৃতুক সমান করে চুষতে পারবে — কারো কম বেশী হবে না) তেঙ্গি ঢুকিয়ে দিলো কলসির মুখে। আমার ভায়রাভায়ের এইসব কারিগরি দেখে প্রফুল্লদা কী বললেন জানেন?

— কী বললেন?

— বললেন, 'এটা কী করলেন আপনি কৃষ্ণকান্তবাবু, গড়াটা জল দিয়ে ভর্তি করে দিয়ে গড়ার রসটা তো দিলেন মাটি করে। এখন দেখছি তো জলই খেতে হবে।' প্রফুল্লদার গলায় আফসোশের সুর।

— তখন তুমি কী বললে?

— বললাম, হতাশ হবেন না প্রফুল্লদা, খাটার তলায় মিঠে আছে। শুনুন, কলসির ভেতর বিন্নি চালের সঙ্গে মদের মশলাপাতি-শেকড়বাকড় মাখা অবস্থায় থাকে। তারপর সেটা পচতে শুরু করে বেশ ক'দিন ধরে। যখন বোঝা যায় ওটা ভালো করে পচে ভুরভুরে সুগন্ধ ছাড়তে শুরু করেছে, তখন জল ঢেলে ওর পচা গেঁজলা তোলা সুস্বাদু রস চুষে খেয়ে মাতাল হতে হয়। তা আপনাকে অন্ততঃ আধঘণ্টা খানেক সবুর করতে হবে। এইমাত্র তো গড়ায় জল ঢালা হলো, ওটা মজতে তো একটু সময় দিতে হবে। এই ফাঁকে আপনারা আমার শাশুড়ীর দেয়া চুয়াক দিয়ে পানের পবিত্র আসর শুরু করুন।

— তা আপনাদের ট্রাইবাল রেওয়াজ দিয়ে শুরু করুন, কৃষ্ণকান্তবাবু।

দেখলাম, আমার দুই শ্বশুর কমরেড প্রফুল্ল মিশ্রের কথা ও আমার জবাব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। আমি বললাম, তারপর কৃষ্ণকান্ত শরাব পরিবেশন আরম্ভ করলো। রেওয়াজ অনুযায়ী তিপ্‌রা চুয়াকের উপচে পড়া প্রথম কাপটা গেলো বায়োজেষ্ঠ প্রফুল্লদার দিকে। এমন সময় আমার মেঝো শালা তুইয়া এসে যোগ দিলো আসরে। এবার দ্বিতীয় কাপটা গেলো তার দিকে। তারপর ভায়রা তার নিজের টাই

গ্লাসটা পূর্ণ করে নিলো। প্রফুল্লদা শিলঙের খানদানি কায়দায় তাঁর পানপাত্রটা উঁচু করে ঠোকাঠুকির ভঙ্গি করতেই সকলে একসঙ্গে পানপাত্রে চুমুক দিলেন।

— কেমন, প্রফুল্লদা?

দাঁড়ান, একপাত্র আগে শেষ করি আস্তে আস্তে। তারপরে স্বাদটা বুঝতে পারবো।

— ভয় পাবার কিছু নেই। এটা বাজারের ইউরিয়া সার বা গুড়ের মদ না, এ হচ্ছে তিপ্‌রা বাড়ির চালের চুয়াক। একেবারে নিখাদ সোনা, এতটুকু খাদ নেই। ইউরিয়া সারের চুয়াক খেয়ে বাঙালী বাঙালী যুবকরা লিভার ডামেজ করে অকালে পটল তুলছে। আমার ভায়রাভাই যাকে বলে চুয়াক বিলাসী। তার আর তর সইছিলো না। সে এক ঢোকে তার টাইগ্লাসটা মুখের ভেতর উপুড় করে দিলো। আমার মেঝেশালা একটু ধীরে সুস্থে খাচ্ছিলো প্রফুল্লদার সঙ্গে তাল রেখে। তারপর এককাপ গলাধঃকরণ করে প্রফুল্লদা বললেন, 'এ যে দেখছি খাসি মেয়েদের তৈরী করা মফলাঙ মদের মতো।'

—'মফলাঙ মদ?' জ্যাঠাশ্বশুর প্রশ্ন করেন?

— হ্যাঁ, জ্যাঠা, খাসি হিলসে চেরাপুঞ্জি যেতে মফলাঙ বলে খাসিদেব একটা খুব পুরনো গ্রাম আছে। সেই গ্রামের মদকে বলে মফলাঙ মদ। খুব নাম তার। সাহেবরা তো সেই মদ খেয়ে খাসি মেয়েদের প্রেমে পড়ে যেতো। একে তো খাসি মেয়েদের সুন্দর চেহারা, তারপর তাদের পরনে বাহারী পোষাক। সাহেবরা মফলাঙ মদেব লোভে ঢুকে পড়তো ওই মফলাঙ গ্রামে। কিন্তু মফলাঙ মদের নেশায় একটু বাড়াবাড়ি করলে খাসি ললনারা তাদের পোষাকের আস্তিনের ভেতর থেকে চকচকে ছুরি দেখিয়ে বলতো, 'খুব হয়েছে সাহেব, আর এগিয়ো না, দেখছো তো আমাদের আস্তিনের অস্ত্র বেরিয়ে পড়েছে। তারপর সাহেবারা সুড়সুড় করে কেটে পড়তো সুবোধ বালকের মতো।'

প্রফুল্লদাকে কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, প্রফুল্লদা, তিপ্‌রা মদ আপনার কাছে মফলাঙ মদের মতো লাগছে? তাহলে তো আমার সন্দেহটা ঠিক-ই।'

— কি সন্দেহ আপনার?

— না, মানে, সেবার পি. আই. বি (প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো) ট্যুরে শিলঙে গিয়ে দেখলাম আমাদের ত্রিপুরার ককবরকভাষী ট্রাইবাল ছেলেরা সব দল বেঁধে মফলাঙ মদের দোকানে ঢুকছে। এখন বুঝতে পারছি কেন তারা খাসি মেয়েদের তৈরী মফলাঙ মদের দোকানে যায়।

আমার কথা শুনে হাসলেন একটু প্রফুল্লদা। তারপর বললেন, 'মফলাঙ মদের স্বাদ তাদের কাছে নিজেদের মদের মতো লাগে, তাই তারা সেটা খেয়ে মজা পায়।'

এরপর ঘড়ি দেখে বললেন, 'কুমুদবাবু, আধঘন্টা তো হয়ে গেছে, এবার তাহলে গড়ার নলে টান দেয়া যাক।'

প্রফুল্লদার কথা শুনে ভায়রাভাই কৃষ্ণকান্ত বললো, 'বৃত্তক আর একটু মজুক কুমুই, না হলে চুষলে নলে রস আসবে না ঠিকমতো।'

প্রফুল্লদা ভায়রার কথা শুনে বললেন, ' মজতে দিন আপনাদের ওই বৃত্তককে তাহলে। এরপর তো আমাদেরই মজতে হবে। বলেই তাঁর পুরো কনৌজী টাকটায় হাত বুলিয়ে মোটা গোঁফের তলায় হাসলেন মুচকি হাসির মতন।'

এবার আবার পানপাত্র পুরো ভর্তি হতে দেখে প্রফুল্লদা তাতে একটা মুজসই চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কুমুদবাবু. আপনি বলছিলেন না সাঁওতালদের সঙ্গে খাসিদের রক্তের সম্পর্ক আছে, তাহলে....।'

— তাহলে কী?

— আমি বলছিলাম, আপনি বোধ হয় ঠিক বলেননি, খাসিদের এমন কাঁচা সোনার মতো রঙ, আর আপনার সাঁওতালরা তো কালো।

— শুধু কালো বলবেন না, বেশ কালো। নিগ্রোদের মতো দেখতেও অনেক সাঁওতালকে দেখেছি আমি শান্তিনিকেতনের পিয়র্সন পল্লী ও বীরভূমের গণপুর সংলগ্ন বিহারে।

— অনেক সাঁওতালের চুলও আবার নিগ্রোদের মতো। নিগ্রোদের মতো কুঁকড়া চুলের সাঁওতাল দেখা যায় আসামের কোকড়াঝাড়ের কাছে বোড়ো এলাকায়। সেখানে পার্টির কাজে গিয়ে এমন সব সাঁওতাল দেখেছি আমি কুমুদবাবু। তাই বলছিলাম, আপনার কথাটা...।

— না না, ঠিকই ধরেছেন প্রফুল্লদা আপনি। কিন্তু আমার কী ধারণা জানেন। খাসি আর সাঁওতালী অনেক অনেক আগে, মানে ভারতে আর্যরা আসার ঢের আগে আর কি, একই সঙ্গে বর্তমান খাসি পাহাড়েই ছিলো। তারপর তাদের একটা বড়ো অংশ বিহারের দিকে চলে যায়। তারপর সেখানে তাদের নিগ্রোয়েড জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রণ হয়, আর তারপর তাদের গায়রে রঙও পাল্টে যেতে থাকে হাজার হাজার বছর ধরে।

— আচ্ছা কুমুদবাবু, বিহারে নিগ্রোরক্তের জাতিগোষ্ঠী বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন, কোল উপজাতিদের কি?

— আমার আগে ধারণা ছিলো, প্রফুল্লদা, কোল উপজাতিগোষ্ঠীর লোকেরা নিগ্রোরেড রক্তের, তাদের দেহের গড়ন, চুলের নমুনাও তাই বলে। আর আমার মতো সাধারণ গবেষক কেন, পণ্ডিত ব্যক্তিরা, মানে নৃতত্ত্বের অভিজ্ঞ লোকেরাও তাই মনে করতেন। কিন্তু এতদিনকার এই লালিত ধারণায় বাদ সাধালেন ফরাসী পণ্ডিত ঝাঁ পশিলুসকি (Jean Przyluski)। কোলভাষা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি দাবী করলেন, ওই ভাষা নাকি বৃহত্তর অস্ট্রিক গোষ্ঠীরই ভাষা। আর এ তথ্য আমি পেয়েছি সুনীতিবাবুর 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' পড়তে গিয়ে।

— আমার তো মনে হয়, কুমুদবাবু, ওই ফরাসী পণ্ডিত, কি না নাম বললেন আপনি?

—ঝাঁ পশিলুসকি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ঝাঁ সাহেব যা বলেছেন, তা ঠিক হতে পাবে।

— কেমন?

— আমি বলছিলাম, ঝাঁ সাহেব তো কোল উপজাতিদের রক্তের সম্পর্ক নিয়ে কোনো কথা বলেননি, তিনি বলেছেন ভাষা নিয়ে। এমন তো হতে পারে, কোল উপজাতির লোকেরা রক্তের দিক থেকে নিগ্রোয়েড় আর ভাষার দিক থেকে অস্ট্রিক।

— ওঃ বেড়ে বলেছেন তো আপনি। আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে হাতের কাছেই তার প্রমাণ আছে।

— আপনার হাতের কাছেই প্রমাণ আছে?

— আছেই তো। আমাদের ত্রিপুরায় চাকমা আর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরাও বসবাস করেন। রক্তের দিক থেকে তাঁরা কিন্তু নিখাদ মোঙ্গলীর, আর ভাষার দিক থেকে আর্য। পেয়েছি পেয়েছি আপনার অনুমানের উদাহরণ পেয়েছি।

— চাকমা উপজাতি ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা আর্যভাষায় কথা বলেন, ঠিক মাথায় ঢুকছে না আমার।

— আর্যভাষায় তাঁরা কথা বলেন মানে বাঙলা ভাষার কাছাকাছি ভাষা হলো তাঁদের ভাষা। সুনীতি বাবু তো চাকমা ও বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাকে পূর্ব বাঙলার আঞ্চলিক বাঙলা ভাষা থেকে এসেছে বলে দাবী

করেছেন।

— তাহলে আর কী? ভাষাচার্য যখন বলেছেন, তখন তো প্রমাণ পাওয়াই গেলো।

— কিন্তু প্রফুল্লদা, কথা হচ্ছে, তাহলে এক রক্ত এক ভাষা — এই তত্ত্ব তো তাহলে মার খেয়ে যায়। আমার দৃঢ় ধারণা, চাকমা উপজাতি ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের লোকেরা আগে তিব্বত-বর্মীয় ভাষায় কথা বলতেন। কালক্রমে বিভিন্ন কারণে তাঁরা তাঁদের সেই ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। এমন ঘটনা ত্রিপুরার ককবরকভাষী দুটো উপজাতি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও ঘটেছে, প্রফুল্লদা।

— তাই নাকি, খুব ইন্টারেস্টিং তো!

—জানেন, ককবরকের 'কলই' ও 'রূপিনী' বলে দুটো উপভাষা আছে। এই দুই উপভাষাভাষী জনগোষ্ঠী কিন্তু সামাজিক দিক থেকে হালাম-কুকী সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তারা এখন কথা বলছেন ককবরক ভাষায়, হালাম-কুকীদের ভাষা তাঁরা আর বোঝেন না।

— তাহলে আপনি বলতে চান, কলই আর রূপিনীরা আগে হালাম-কুকীদের ভাষায় কথা বলতেন?

— আপনি ঠিকই ধরেছেন প্রফুল্লদা। আমি একটু গুছিয়ে বলি তাহলে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিব্বত-বর্মীয় ভাষার দুটো শাখা আছে। একটা হলো বোড়ো-নাগা শাখা, আরেকটা কুকীচিন শাখা। ককবরক পড়ে বোড়ো-নাগা শাখায় আর কুকীচিন শাখার ভাষাগুলো হলো কুকী, মিজো, কাইপেঙ, মরশুম, রাঙ্খল, দারলঙ আর হালাম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ছোট ছোট ভাষা। আমার কথা হলো ককবরকের কলই ও রূপিনীদের আগে কুকীচিন শাখার ভাষাই ছিলো। পরে তাঁরা ককবরককে তাদের মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

— দেখো জামাই, নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের গোলক ধাঁধায় পড়ে গড়া খাবার কথা ভুলে গেছো নাকি তোমরা? প্রফুল্লবাবুকে গড়া খাওয়াও, আমার ছোটশ্বশুরের গলায় অহিষ্ণুতার সুর।

— ঠিক ঠিক এখন টানা যায় গড়া। প্রফুল্লদা, বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে এখন আপনাকেই সর্বপ্রথম গড়া টানতে হবে। তা বুঝলেন কাকা আমার কথা শুনে প্রফুল্ল মিশ্র মাদুর থেকে উঠে একটু দূরে গিয়ে উঁবু হয়ে বসে নল দিয়ে গড়া টানতে শুরু করলেন। দশবার জোরে জোরে গড়া টানতেই বললাম আমি, 'প্রফুল্লদা, একবারে এতক্ষণ ধরে গড়া খাবেন না, শেষে বেশীক্ষণ টিকতে পারবেন না। উঠে আসুন।'

আমার কথা শুনতেই চলে এলেন প্রফুল্লদা। তারপর মুখ লুঙ্গির খুঁট দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, 'অপূর্ব জিনিষ তো কুমুদবাবু, কি মিষ্টি, আর গন্ধও তেমনি।'

—বিন্নি চালের পচুই, প্রফুল্লদা, যেমন মিষ্টি তেমনি স্বাদ। বেশীক্ষণ ধরে খেতে নেই, চুয়াকের ফাঁকে ফাঁকে খেতে হয়।

— বেশীক্ষণ ধরে খেলে কী হবে?

— হবে আর কি, রিপভ্যান উয়িঙ্কিলের মতো ঘুম দেবেন, আর উঠবেন কাল দুপুর বেলায়। কাজেই আবার একটু দেবতাদেব সোমরসে চুমুক দিন, ততক্ষণে আমার শালা আর ভায়রা টেনে আসুক।

প্রফুল্লদা তিপ্‌রা চুয়াকের কাপে আবার চুমুক দিতেই আমি বললাম, 'জানেন প্রফুল্লদা, ককবরক ভাষার সঙ্গে সাঁওতালীভাষার মিল আছে।'

আমার কথা শুনে লম্বা কনৌজী মাথার ব্রাহ্মণের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো।

— বলেন কী, ককবরক আর সাঁওতালী ভাষার মিতালি আবিষ্কার করে ফেলেছেন আপনি। একটা হলো তিব্বত-বর্মীয় ভাষা, আরেকটা হলো গিয়ে অস্ট্রিক ভাষা। দু'মেরুতে দু'ভাষা। আপনি এই দু'মেরুর ভাষার মধ্যেও মিল খুঁজে পেয়েছেন, দারুণ গবেষক তো আপনি মশায়। unity in contra-

diction.

—গবেষক আমি না প্রফুল্লদা, গবেষক হলেন বাস্তাসোরেন।

— বাস্তা সোরেন, মানে, আমাদের বিহারের সি. পি. আই. পার্টির এম. এল. এ., তিনিই তো? কোত্থেকে তো জেতেন তিনি প্রতিবার যেন?

— ঘাটশিলা থেকে।

— হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বাস্তার সঙ্গে তো দেখা হয় দিল্লীতে পার্টির ন্যাশন্যাল কাউন্সিলের মিটিঙে গেলে। কমরেড বাস্তা তো বেশ পণ্ডিত লোক। তা বাস্তা আবার সাঁওতলী ও ককবরক ভাষার ওপর গবেষণা করলেন কীভাবে? কোথায় ঘাটশিলা আর কোথায় ত্রিপুরা ?

— গবেষণার ব্যাপার না প্রফুল্লদা। একটা ঘটনা ঘটেছিলো, আর তা থেকে ......

— বিষয়টা তো বেশ গোলমেলে। ঘটনাটা কী ঘটেছিলো আর যা থেকে বাস্তা......

— তা হলে শুনুন প্রফুল্লদা। বেশ ক'বছর আগের কথা। সেবার অ্যাকমেড (AICMED –All India Council for Mass Education and Development)-এর কনফারেন্স হলো ঘাটশিলায়। আমরা আমাদের ত্রিপুরা ইউনিট থেকে তো ক'জন গেলাম সেখানে কনফারেন্সে যোগ দিতে। গিয়েই দেখি ওই লিটারেসী কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাস্তা সোরেন – ঘাটশিলার এম. এল. এ.।

তারপর? এ যে দেখছি বেশ মজার ঘটনা।

তারপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে এ্যাকমেডের সভাপতি সুধীর চ্যাটার্জী বাস্তা সোরেনের সঙ্গে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলেন একে একে— ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী বেবী গুপ্ত, ত্রিপুরাব নাম করা লেখিকা, নানারকম জনসেবার কাজে জড়িত আছেন তিনি। ইনি হচ্ছেন অধ্যাপক সুভাষ দাশ, আমাদের ত্রিপুরা ইউনিটের সভাপতি। ইনি যোগেন্দ্র দাশ, এ্যাকমেডের আজীবন সদস্য, ইনি হচ্ছেন লেখক জগৎজ্যোতি রায়, ইনি অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য, আর ইনি হলেন কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী, ত্রিপুরার ককবরক ভাষার গবেষক, আর ইনি হলেন শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র দেববর্মা, ত্রিপুরার বিধানসভার ডেপুটি সেক্রেটারী – আপনার উপজাতি ভাই, বককবরক ভাষার বিখ্যাত প্রবন্ধকার।

সুধীরদার কথা শেষ হতেই বাস্তা সোরেন আমাদের নরেশবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'আপনি উপজাতিদের গর্ব। আপনি একটা রাজ্যের বিধানসভার ডেপুটি সেক্রেটারী।' এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কথা আমরা জানি। কমরেড ডাঙ্গে আর ভবানী সেন আপনাকে ত্রিপুরায় পাঠিয়েছিলেন ককবরক ভাষার গবেষণার কাজে। কমরেড মোহন চৌধুরীর কাছ থেকে শুনেছি আপনি ওখানকার ট্রাইবাল পরিবারে বিয়েও করেছেন। তা আপনাদের সবাইকে চায়ের নিমন্ত্রণ করলাম আমার বাড়িতে। কনফারেন্সের পর আপনারা সবাই আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিন।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কমরেড চৌধুরী, আপনি একটু সময় দেবেন এখন, চলুন, পাশের একটা ঘরে গিয়ে বসা যাক, আমাদের সাঁওতালী ভাষার লিপি নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।' – বলেই আমাকে নিয়ে একটা নির্জন ঘরে বসলেন তিনি।

প্রথমেই আমি মুখ খুললাম , 'কমরেড সোরেন, আপনাদের সাঁওতালী ভাষার লিপি সমস্যার কথা আমি জানি। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সাঁওতালী ভাষার জন্যে যে ওলচিকি লিপি করেছেন, সেই বিতর্কিত লিপি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু বই পুস্তকও লিখেছেন। আপনাদের বিহার, উড়িষ্যা বা মধ্যপ্রদেশে অলচিকির ব্যবহার কেমন হচ্ছে জানি না।

—কমরেড চৌধুরী, আপনি তো জানেন, যে চার-পাঁচটা রাজ্যে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি,

সেসব রাজ্যে সেখানকার স্ক্রিপ্ট নিয়েই এতদিন আমরা কিছু সাহিত্য চর্চা করতাম। যেমন ধরুন, বিহারে দেবনাগরী ও রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়েই আমরা কিছুটা লেখাপড়া লেখার কাজ ও চিঠিপত্র লেখার কাজ চালাই। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে একাজ এতো দিন হতো বাঙলা হরফে। উড়িষ্যায় ওড়িয়া স্ক্রিপ্ট ও মধ্যপ্রদেশে দেবনাগরী স্ক্রিপ্টে সাহিত্যচর্চার কাজ খানিকটা ঘরোয়াভাবে চলে। এখন ওলচিকি আবিষ্কারের ফলে আমরাতো পড়েছি মহা বিপদে। এই নতুন লিপি কেউ তো আর জানে না। পরিচিত স্ক্রিপ্টগুলো বাদ দিয়ে এখন এই নতুন লিপি আয়ত্ত করা তো খুব সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

-- আসলে ব্যাপার কি জানেন, কমরেড সোরেন, আমার যা মনে হয়, ওলচিকি লিপি দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাঁওতালদের একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিকে নিযে যাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর তার জন্যে আপনাদের চাই একটা নিজস্ব রাজ্য। যেখানে ওলচিকিকে বাধ্যতামূলকভাবে চালু করতে পারেন লেখাপড়া ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে। তা না হলে এর কোন মূল্য নেই। আমার নিজের কি ধারণা জানেন, সাঁওতালী ভাষার জন্যে দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট-ই ছিলো আইডিয়াল। যাঁরা যে রাজ্যে আছেন আপনাদের উপজাতি গোষ্ঠীর লোক, কমবেশী তারা হিন্দি ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারেন। আর শিক্ষিত লোকেরা দেবনাগরী হরফের ব্যবহার জানেন-ই। কাজেই দেবনাগরী লিপি নিলে আপনাদের সাঁওতালী ভাষা বেশ তাড়াতাড়ি এগিযে যেতে পারতো।

-- জানেন, কমরেড সোরেন, কোনো ভাষার জন্যে নতুন হোক আর পরিচিতই হোক, কোনো লিপি গ্রহণ করতে হলে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে ওই ভাষা প্রথমে গবেষণা কবা দরকার। এই গবেষণা করলে বলা যায় ওই ভাষায় স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি কটা আছে, ভাষাটায় যুক্তাক্ষব আছে কিনা, তার বানান পদ্ধতিই বা কী হবে। ধরুন, ত্রিপুরার ককবরক ভাষা এতদিন বাঙলা বর্ণমালা দিয়েই লেখা হতো এবং তার জন্যে বাঙলা বর্ণমালার সব অক্ষবকেই ব্যবহাব করা হতো। এমন কি ককবরকে যুক্তাক্ষর আছে ভেবে বাংলা যুক্তাক্ষর ব্যবহার কবা হতো। কিন্তু ডঃ সুহাস চ্যাটার্জী ও আমি যখন ভাষাটা গবেষণা করলাম, তখন দেখলাম ককবরক ভাষায় স্বরধ্বনি আছে ৬টা, ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে ২০টা, আর যুক্তাক্ষর তো নেই-ই। কিন্তু রয়েছে টোন। আর এমন একটা কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি আছে যার বর্ণ বাঙলাতেও নেই রোমানেও নাই। কাজেই পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু তাঁর গবেষণা আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের আলোকে করেছেন কিনা তা তো আমার জানা নেই। আর তা না করা হলে ওলচিকির বর্ণমালা খুব বৈজ্ঞানিক হবে না। লিখতে গেলে উচ্চারণের সঙ্গে অনেক সময বর্ণগুলোর সঙ্গতি থাকবে না। তাতে লিখন পদ্ধতিতে জটিলতা দেখা দিতে বাধ্য।

— যাক আপনার কাছ থেকে লিপি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেলো। তা আপনি কি আমাদের সাঁওতালী ভাষাটা আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে গবেষণা করে দিতে পারেন?

— কেন পারবো না কমরেড, লিঙ্গুয়িষ্ট হিসেবে এটা হতো আমার কাজ। তবে এই গবেষণা সময় সাপেক্ষ, তিন-চার বছর লেগে যেতে পারে। এটা আপনারা বিহার পার্টিতে আলোচনা করে দেখতে পারেন। পরে আমাকে জানাবেন।

এই কথা বলেই আমি আমার কাঁধের লালঝোলা ব্যাগ থেকে আগরতলা থেকে প্রকাশিত উত্তর-পূর্ব'র একটা কপি দিয়ে বললাম, কমরেড এই সংখ্যায় আমার একটা লেখা আছে ককবরক ও বোড়ো ভাষার তুলনামূলক আলোচনা নামে, একটু পড়ে দেখবেন। দেখলাম, তিনি খুব আগ্রহসহকারে ম্যাগাজিনটা নিলেন আমার হাত থেকে। তারপর তাঁর বিরাট চামড়ার ব্যাগে ঢোকালেন সেটা। তারপর আমাকে বললেন, 'জানেন কমরেড চৌধুরী' আপনাদেব ত্রিপুরার এক রাজকন্যার বিয়ে হয়েছে আমাদের ঘাটশিলার রাজবাড়িতে।

— 'তাই নাকি।' আমার গলায় বিস্ময়ের সুর।

— পারলে রাজবাড়িটা একটু দেখে আসবেন। আর জানেন তো, আপনাদের সাহিত্যিক বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই রাজবাড়ির সাহিত্য আসরে গিয়ে নীল রঙের একরকম সিঙ্গাড়া খেয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর ঘাটশিলার বাড়িতে এসে দাস্ত-বমি করতে করতে মারা যান।

— কমরেড সোরেন, সত্যি আপনি একজন বড়মাপের ইনফরম্যান্ট।

— আর আমাদের বাড়িতে গেলে বিভুতিভূষণ সম্পর্কে আরো অনেক কিছু তথ্য জানতে পারবেন। আমার স্ত্রী তো সম্পর্কে বিভুতিভূষণের ভাগ্নী। তিনি তো তাঁর কোলে পিঠে খুব চড়েছেন শিশুকালে।

— বলেন কী কমরেড, তাহলে আপনি বিভুতিভূষণের ভাগ্নীজামাই, মানে বাঙালী পরিবারে ট্রাইবেল জামাই? এতো দেখছি লিটারেসি সম্মেলনে এসে অনেক কিছু বাড়তি পাওনা পাচ্ছি। ঠিক আছে, কমরেড এখন এই পর্যন্ত। বন্ধুদের সঙ্গে এখন গেস্ট হাউসে যেতে হবে। সম্মেলন শেষ হলে আপনার বাড়িতে আমরা যাচ্ছি, আর আপনার স্ত্রীকে বলে রাখবেন। ত্রিপুরার ট্রাইবাল পরিবারের একজন বাঙালীজামাই সঙ্গে আছে।

—তা বুঝলেন, কাকা, আমার কথা শেষ হতেই প্রফুল্ল মিশ্র বললেন, 'কুমুদবাবু, আপনিতো অন্যদিকে চলে গেলেন, ককবরক ও সাঁওতালী ভাষার মধ্যে কমরেড বাস্তা কী করে সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন তা বলুন এবার।'

—এই তো তা বলতে যাচ্ছি। তারপর কী হলো জানেন, প্রফুল্লদা, লিটারেসি সম্মেলনের তিনদিনের মধ্যে আমাদের বিধানসভার ডেপুটি সেক্রেটারী নরেশ দেববর্মার দারুণ ভাব হয়ে গেলো বাস্তা সোরেনের সঙ্গে। বাস্তা সোরেনের খুব ভালো লেগেছিলো নরেশবাবুকে। হাজার হোক দু'জনেই উপজাতি, পার্থক্য শুধু রঙে, নরেশবাবুর রঙ হচ্ছে কাঁচাসোনার মতো, আর বাস্তা সোরেনেরহ রঙ কালো মিসমিসে। আমরা বাস্তা সোরেনের বাড়ি যেদিন বিকেলে গেলাম, সেইদিন সকালে আমরা বিভুতিভূষণের পুরোনো বাড়িটা দেখতে গেলাম। বাড়িটার গলিতে ঢুকতেই দেখি অপুর পথ বলে লেখা রয়েছে। সেই গলি দিয়ে এগোতেই একটা পুরনো মাটির দেয়ালের খানিকটা হেলাঘর চোখে পড়লো। বুঝলেন প্রফুল্লদা, ওই ঘরটাতেই বিভুতিভূষণ মারা গিয়েছিলেন। ওইরকম একটা পোড়ো ঘরে ঢুকতে আমরা সব ইতস্তত করছি দেখে আমাদের রামেশ্বর ভট্টাচার্য সাহস করে ঢুকে পড়লেন সে ঘরে। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে বললেন, একজন বুড়ো-বুড়ী ছাড়া ঘরের ভেতর আর কিছুই চোখে পড়লো না। আর বিকেলে বাস্তাবাবুর বাড়ি গিয়েই তাঁর বাঙালী স্ত্রীকে ঘিরে ধরলাম আমরা। বিভুতিভূষণের কোলে-পিঠে চড়া ভাগ্নী কম কথা। আরো বড়ো কথা, তিনি ভালোবেসে একজন সাঁওতালী-ট্রাইবালকে স্বামী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বুঝলেন, প্রফুল্লদা, আমাদের বেবীদি আবার মিসেস সোরেনের পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন। বিভুতিভূষণের স্পর্শ পেয়েছে যে মেয়ে, তার গায়ে হাত বোলানো মানে বিভুতিভূষণের স্পর্শ লাভ করা। তা বেশ হৈ হুল্লোড়ের ভেতর কাটতে থাকলো বিভুতিভূষণের ভাগ্নিজামাইয়ের বাড়ি। এমন সময় বিভুতিভূষণের নাতনি, মানে বাস্তা সোরেনের যে মেয়ে মাধবী পাটনা মেডিকেল কলেজে পড়ে, সে ট্রেতে করে জলখাবার নিয়ে হলো উপস্থিত। সুন্দর চেহারা মেয়েটার। বাবা আর মায়ের চেহারা মিলে একটা দারুণ ইন্টার-বেসিয়াল চেহারা পেয়েছে সে। তারপর জলখাবার খেয়ে আমরা কমরেড সোরেনের ডাক্তারী পড়ুয়া মেয়ের সঙ্গে তার দাদুর স্মৃতি 'বিভুতিভূষণ গ্রন্থালয়' দেখতে গেলাম। বিদায় নেবার সময় বাস্তা সোরেন তাঁর ঠিকানা দিলেন তার ত্রিপুরার উপজাতি বন্ধু নরেশ চন্দ্র দেববর্মাকে। আর বললেন, কেয়ারফ বিভুতিভূষণ গ্রন্থালয় দিতে।

— তা আপনার ঘাটশিলা পর্ব তো শেষ, কুমুদবাবু। বাস্তা সোরেন কীভাবে ককবরক ও সাঁওতালী

ভাষার ভেতর মিল খুঁজে পেলেন। তা তো বললেন না। আমরা না হয় চুয়াক-বৃতৃক সেবন করছি, আপনার তো খেই হারিয়ে ফেলার কথা নয়?

— নানা প্রফুল্লদা, খেই আমি হারায়নি, এবার আসল কথায় আসছি। তা হলো কী জানেন, আমরা ত্রিপুরায় ফেরার দিন পনেরো পর কমরেড বাস্তা সোরেনের একটা দীর্ঘ চিঠি এলো নরেশবাবুর কাছে। চিঠি খুলেই নরেশবাবুর আনন্দ আর তো ধরে না, ইউরেকা-ইউরেকা বলে লাফিয়ে উঠলেন তিনি।

— মানে?

— মানে, বাস্তা সোরেন তাঁর উপজাতি বন্ধু নরেশবাবুকে লিখেছেন যে সন্তোষ রায় সম্পাদিত উত্তর-পূর্ব-এ প্রকাশিত আমার ককবরক ও বোড়োভাষাব তুলনামূলক আলোচনা প্রবন্ধটা পড়েছেন এবং অনেক সাঁওতালী শব্দের সঙ্গে ককবরকের মিল তার চোখে পড়েছে। বিশেষ করে পশু-পক্ষীর নামের ক্ষেত্রে। এমনকি তিনি হাতা অর্থে ককবরক শব্দ 'থারুক' এর সঙ্গে সাঁওতালী শব্দের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। সব থেকে মজার ব্যাপার ককবরক 'থাকক' শব্দের প্রায় সমোচ্চারিত সাঁওতালী একটা ছবিও একে দিয়েছেন তাঁর চিঠিতে।

— আপনি তো দেখছি, এবার সত্যি-সত্যি গোলকধাঁধায় ফেলে দিলেন আমাকে।

— গোলক-ধাঁধা তো বটেই। নরেশবাবু যখন বাস্তা সোরেনের চিঠিটা পড়তে দিলেন আমাকে, তখন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি।

— তারপর?

— তারপর আর কী, নরেশবাবু বললেন ককবরক ও সাঁওতালী শব্দ সাদৃশ্যের উৎস আমাকে খুঁজতে হবে। তখন আপনি কী করলেন?

— আমি আর কী করবো, গভীরভাবে ভাবতে শুরু করলাম বিষয়টা।

— তা কোনো গতি কি করতে পারলেন শেষ পর্যন্ত ?

— খুব ভেবে চিন্তে গতি একটা করলাম আমি।

— আচ্ছা, বলুন দেখি, কেমন?

— শেষ পর্যন্ত ককবরকে সুপুরির প্রতি শব্দ পথ দেখালো আমায়।

— ককবরকের সুপুরির প্রতিশব্দ পথ দেখালো আপনার? এতো দেখছি, আরো গোলক-ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছেন আপনি।

— শুনুন, প্রফুল্লদা। আপনি তো খাসিহিলসের লোক। খাসি ভাষায় সুপুরিকে 'কুয়াই' বলে কিনা, বলুন?

— ঠিক, খাসিরা সুপুরিকে কুয়াই বলে।

— জানেন আমাদের ককবরকেও সুপুরিকেও বলে কুয়াই।

— কী বলছেন আপনি!

— আর বোড়োভাষায় সুপুরিকে বলে গুয়াই বা গোই, বলেতো?

— ওঃ, রিয়েলি আপনি।

— এখন বলুন দেখি, কে কার কাছ থেকে শব্দ ধাব করলো? খাসীদের কাছ থেকে ককবরকভাষীরা ধার করলো, না খাসিরা ধার করলো ককবরভাষীদের কাছ থেকে। আর কুয়াই বা বোড়ো ভাষায় গুয়াই বা গোই হলো কি করে, আর যা থেকে পুব বাঙলায় হয়েছে গো।

— এই তো আবার গোলক-ধাঁধায় ফেললেন আপনি।

— দাঁড়ান, এই গোলক-ধাঁধা থেকে উদ্ধার করছি আমি। আমার যুক্তির পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন সুনীতিবাবু।

সুনীতিবাবু তাঁর 'ভারত সংস্কৃতি' বইয়ে ভারতের অস্ট্রিক সভ্যতার অবদান প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে পান-সুপুরির চাষ ভারতবর্ষে প্রথমে প্রচলন করেন অস্ট্রিকগোষ্ঠীর লোকেরা। কাজেই ককবরক শব্দ কুয়াই এবং বোড়ো শব্দ গুয়াই-দুই-ই এসেছে খাসি কুয়াই শব্দ থেকে। আমার কি মনে হয়, জানেন প্রফুল্লদা, খ্রীষ্টজন্মের অনেক অনেক আগে অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠীর খাসিয়া, জয়ন্তীয়া ও সাঁওতালরা তিব্বত-বর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা, বিশেষ করে বোড়ো শাখার লোকদের সঙ্গে আসাম-বিহার বর্ডারে এক সঙ্গে সহাবস্থান করতো। এবং এক গোষ্ঠীর লোক অন্য গোষ্ঠীর লোকের কাছ থেকে শব্দ ধার করতো। এবং এই প্রক্রিয়া চলছিল হাজার হাজার বছর ধরে। তাই স্বভাবতই এক গোষ্ঠীর শব্দ ভাণ্ডারে অন্যগোষ্ঠীর শব্দ ঢুকে পড়েছে। আর ত্রিপুরার ককবরক ভাষা তো বোড়োভাষার সহোদরা ভাষা। বোড়ো-দিমাছা-ককবরক — এই তিন ভাষার শব্দ ভাণ্ডারের সঙ্গে যদি খাসিয়া-জয়ন্তীয়া ও সাঁওতালী ভাষার শব্দভাণ্ডারের তুলনামূলক আলোচনা করা যায়, তাহলে এদের একের অন্যের কাছ থেকে শব্দ লেনদেনের ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে পারে। কমরেড বাস্তা সোরেনকে ধন্যবাদ, তিনি আমার লেখা পড়ে ভাষা গবেষণার একটা নতুন রাস্তায় নিয়ে গেছেন আমাদেরকে।

— খুব হয়েছে, কুমুদবাবু, খুব হাঁটুন আপনি আপনাদের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের রাস্তায়, আবিষ্কার করুন অস্ট্রিক আর তিব্বত-বর্মীয় ভাষাগোষ্ঠীর একের অন্যের ওপর প্রভাব, আমি আর নেই আপনাদের মধ্যে, এখন আমি যাই গড়ায় টান দিয়ে গিয়ে। বাবারে বাবা, মাথা গুলিয়ে গেছে একেবারে।

তা বুঝলেন কাকা, আমিও প্রফুল্লদাকে ভায়রাভাই কৃষ্ণকান্ত ও শ্যালক তুইয়ার হেফাজতে রেখে বেরিয়ে পড়ে রান্নাঘরে গেলাম কনৌজী ব্রাহ্মণের জন্যে কী কী তিপ্‌রা খানা রান্না করছেন আমার শাশুড়ীমা তা দেখবার জন্যে।

— তোমার শাশুড়ী কী কী রান্না করেছে দেখলে'?

— সেই তিপ্‌রা খানা। জামাইয়ের বন্ধু বলে কথা। উআহান (শূকরের মাংস) তো রয়েছেই, তার সঙ্গে গোদক (বাঁশের চোঙার ভেতর তৈরী করা একপ্রকার সুস্বাদু ত্রিপুরী ব্যঞ্জন) ও চাখই (খারপানির তৈরী হজমকারক ব্যঞ্জন। আর সবশেষে বাঙালী খানা ডাল, জামাই বাঙালী তো, কাজেই জামাইয়ের দিকটাও রেখেছেন শাশুড়ী মা।

—কিন্তু কি হলো জানেন'?

— কী হলো আবার'?

— আমি কিছুক্ষণ বাদে ফিরে দেখি প্রফুল্লদা আর গড়ার কাছ থেকে উঠতে পারছেন না। কথা প্রায় জড়িয়েছে গেছে। আমাকে দেখে বললেন, কুমুদবাবু বেড়ে লাগছে গড়া, ম-ফলাঙ-এর সঙ্গে পার-এ-না।

প্রফুল্লদার এই অবস্থা দেখে আমার ভায়রাভাই ও শালাকে ককবরকে বললাম, তাঙগৃই আছুক বৃতুক ছরূখা বন'? মারখেন ফেককা বেলে ব। (এত গড়া টানতে দিয়েছো কেন তাঁকে? নেশায় বুঁদ হয়েছেন তো তিনি।)

— চুঙ তাম' খূলাইনাই? বৃতুক বেতালা থকজাকখা ব, বৃতুক য়াকারনা ছইয়া, তাম' খূলাইচিনাই চুঙ? (আমরা কী করবো গড়া তাঁর কাছে খুব স্বাদ লেগেছে, গড়া ছেড়ে উঠতে চাননা কিছুতেই, কী করবো আর আমরা)।

— বুঝলেন, শ্বশুরদের দিক তাকিয়ে বললাম, বিনি চালের বৃতুক তো, নেশা ধরে গেছে তাড়াতাড়ি।

—'তারপর কী হলো', ছোটশ্বশুরের কৌতূহল।

— আমি তখন কী করি। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে আমাকে (শাশুড়ীমাকে) সব বললাম। ফুলটি তাড়াতাড়ি জ্যাঠা সতীন্দ্রর উঠোন থেকে কাগজী লেবু এনে নুন দিয়ে সরবতের মতো করলো। তারপর সেই সরবত খেতে দিলাম প্রফুল্লদাকে। কিছুক্ষণ বাদে নেশা একটু ছুটতেই ফুলটি আমাদের ভাত দিলো দু'জনকে। কিন্তু কী জানেন, প্রফুল্লদা ক'টুকরো শূকরের মাংস খেয়েই পাতে জল ঢেলে দিলেন। শাশুড়ীমার রান্নাগুলো জলে গেলো, বুঝলেন।

— তা পরের দিন কখন ঘুম ভাঙলো প্রফুল্লবাবুর?

— ঠিক দশটা নাগাদ ঘুম ভাঙলো প্রফুল্লদার। সারারাত নাক ডেকে ঘুমুলেন। আমি শুয়েছিলাম নিচে। তাঁর নাক ডাকার ঠেলায় ভালো ঘুম হলো না আমার। ভোর হতেই দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি। তারপর গাতি (নদীর ঘাট) গিয়ে চান করলাম আচ্ছা করে।

— প্রফুল্লবাবু ঘুম থেকে উঠে কী বললেন তারপর?

— কী আর বলবেন? বললেন, আপনি ঠিক বলেছিলেন কুমুদবাবু, যাকে বলে রিপভ্যান উয়িঙ্কিলের ঘুম ঘুমিয়েছি।

— এবার পায়খানায় যান। তারপর আমাদের গৌরচাঁন ঠাকুরের ওভার ফ্লোয় (আমার দাদা শ্বশুর গৌরচাঁন ঠাকুর আমার শ্বশুরবাড়ির পশ্চিম দিকে ধান খেতের ধারে একটা ওভার ফ্লো বসিয়েছিলেন: ওভার ফ্লোটা এত ভালো হয়েছিলো যে প্রায় এক হাত উঁচু হয়ে জল পড়তো) নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে চান করাবো।

— তা তোমাদের কাঁচাপায়খানায় যেতে পারলেন শিলঙের সাহেব?

— আরে নানা, আমাদের কাঁচাপায়খানায় উনি বসতে পারতেন না। শেষে দা ক্ষেত্র (আমার এক দাদা শ্বশুর ক্ষেত্রমণি দেববর্মা)-র কাঠ দিয়ে করা নতুন পায়খানায় নিয়ে গেলাম প্রফুল্লদাকে। জানেন কাকা, এত জোর পায়খানা পেয়েছিলো তাঁর। পুরো বুট জুতো পরেই ছুটলেন আমার সঙ্গে, পরে আমি জল নিয়ে যাই।

— খুব জোরে প্পায়খানা তো পাবেই। বিন্নি চালের গড়া খাইয়েছো, সেটাতো বেরোবে।

— আমি তো খুব ভয় পেয়েছিলাম, পেট-টেট ছেড়ে দেয় কিনা প্রফুল্লদার। কিন্তু না, পায়খানা থেকে বেরিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দারুণ পায়খানা হয়েছে, কুমুদবাবু। আগরতলা এসে পায়খানা কষে গিয়েছিলো, আজ সবটা বেরিয়ে গেছে। পায়খানা থেকে ফিরে এসে জুতো খুলে আমাদের বিয়ের খাটে একটু বসলেন প্রফুল্লদা। ঘরের এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, আপনাদের ঘরের দক্ষিণ দিকে জানালা দিয়ে রাত্রে খুব হাওয়া লেগেছে, তার ওপর বিন্নি চালের গড়া খাইয়েছেন, যাকে বলে রিপভ্যান উয়িঙ্কিলের ঘুম দিলাম। তা, আপনাদের ঘরখানা ছোট-খাটো হলে কী হবে, বেশ আলো বাতাস খেলে।

— জানেন প্রফুল্লদা, ঘরখানা আমার বিয়ের ঘর, ঘরজামাই হিসেবে পাওনা; শ্বশুরমশায় নিজের হাতে এই দেয়াল দেওয়া ঘর তুলে দিয়েছিলেন আমার বিয়ের মঙ্গলাচরণের পর।

— আপনার লাইফটা খুব ইন্টারেস্টিং। কোথাকার কলকাতার লোক আর কোথায় এসে ট্রাইবালবাড়িতে ঘরজামাই উঠলেন। আর দিব্যি ককবরক ভাষার কাজ করে যাচ্ছেন মোঙ্গলিনী বৌ নিয়ে। জানেন, কুমুদবাবু, আপনার লাইফের সঙ্গে না আমাদের ভেরিয়ার এলউইন সাহেবের বেশ মিশ আছে।

— মিল আছে আমাদের বিয়েতে, কাজে নয়।

— কেমন?

মিল মানে বলছি, এলউইন সাহেব আর আমি দু'জনেই ট্রাইবাল মেয়ে বিয়ে করেছি, দু'জনেই ট্রাইবালবাড়ির জামাই। তবে এলউইন সাহেব দু'বার বিয়ে করেছিলেন ট্রাইবাল মেয়ে, আর আমি এক বৌ নিয়েই বেশ আছি, বৌয়ের সঙ্গে জুম করি আর খাই।

— আপনি বলছেন, এলউইন সাহেবের দু'জন ট্রাইবাল বৌ ছিলো?

— এক সঙ্গে দু'জন ট্রাইবাল বৌ নিয়ে সাহেব ঘর করেছিলেন তা নয়।

— তবে?

— এলউইন সাহেবের প্রথম বৌ ছিলো বাস্তারের গোন্ড উপজাতির। তিনি আদর করে বৌয়ের নাম দিয়েছিলেন কোজী। দেখতেও দারুণ সুন্দরী ছিলো সাহেবে গোন্ড বৌ। কিন্তু কি যে হলো, মিষ্টার এলউইন অতি দুঃখে সেই বৌকে ডির্ভোস করেন। কিন্তু এর কারণ তিনি ব্যাখ্যা করতে চাননি কোনদিন।

– এর কারণ আপনার কী মনে হয়, কুমুদবাবু, যে অতি দুঃখে তাঁকে আদরের সুন্দরী বৌকে ডিভোর্স করতে হলো ?

— কি জানেন প্রফুল্লদা, এলউইন সাহেবের বৌ ছিলো একজন মোতিয়ারী (ঘটুলের অবিবাহিত মেয়ে)। সাহেবকে বিয়ে করার পরও ঘটুলের উদ্যাম রোমাঞ্চ তাকে টানতো। আমার মনে হয়, সাহেব সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই অতি দুঃখে তাকে ত্যাগ করেছিলেন।

— আচ্ছা, কুমুদবাবু, আপনি যে ট্রাইবে বিয়ে করেছেন, সেখানে কি ওই দরনের 'অবাধ মিলন' এর ঘটুল প্রথা আছে?

— আগে ছিলো কিনা জানিনে, কিন্তু এখন তো নেই। আসলে কি জানেন প্রফুল্লদা, প্রাক্ বিবাহিত জীবনে অবাধ মেলামেশার ধরনধারণ এক এক ট্রাইবে এক এক রকম। হুবাহু ঘটুল প্রথার মতো 'সেকস ট্রেনিঙ সেন্টার' ককবরকীভাষী ট্রাইবদের মধ্যে হয়তো কোনদিন ছিলো না। এখানে ছিলো জমাইখাটা প্রথা। ছেলে আসতো মেয়ের বাড়িতে ঘরজামাই হতে বিয়ের আগেই। এর একটা প্রোবেশন পিরিয়ড মানে পরীক্ষাকাল ছিলো। ছেলে হবু শ্বশুর-শাশুড়ীর মন যোগানোর জন্যে বাড়ির কাজ থেকে জুমের কৃষিকাজ পর্যন্ত সব করতো। হবু বৌয়ের সঙ্গে বিয়ের আগেই জুমে গিয়ে কাজকর্ম করতো এক সঙ্গে। এই কাজের ভেতর দিয়ে তাদের মনের সম্পর্ক গড়ে উঠতো। মেয়ে যদি মনে করতো ভবিষ্যতে সে ওই ছেলের সঙ্গে বিয়ে করে সুখী হবে, তবে আকার-ইঙ্গিতে সে তার মা-বাবাকে বলে দিতো সেটা। কাজের ভেতর দিয়ে শুধুমাত্র ভাবী বৌয়ের বিশ্বাস অর্জন করলেই হতো না, শ্বশুর-শাশুড়ীর, বিশেষ করে শাশুড়ীর আস্থা অর্জন করা ছিলো প্রোবেশন পিরিয়ডের বড়ো পরীক্ষা। এই দু'পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেই বিয়ে হতো, নয়তো ছেলেকে আবার ফিরে যেতে হতো বাড়িতে।

— বলেন কী?

— বলবো আর কী, এ-টাই ছিলো প্রথা।

— আচ্ছা কুমুদবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে, বিয়ের আগে হবু স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে কি একই ঘরে রাত্রিযাপন করতে পারতো ?

— সে প্রশ্নই ওঠে না। হবু স্বামী-স্ত্রী কেউ কাউকে বিয়ের আগে একে অন্যকে স্পর্শই করতে পারতো না।

— এতো রিজিড ছিলো বলছেন এই ট্রাইবের বিবাহ প্রথা।

— কি জানেন, কাজের ভেতর দিয়ে ছেলেমেয়ের মধ্যে ভালোবাসা গড়ে উঠলে অনেকসময় জুমের কাজের ফাঁকে দৈহিক মিলন যে একেবারে হতো না তা নয়। আর সেক্ষেত্রে মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে মা-বাবা বুঝে নিতেন মেয়েছেলে পছন্দ করেছে, কাজেই বিয়ে হয়ে যেতো তাড়াতাড়ি।

—জানেন কাকা, আমার কথা শুনে প্রফুল্ল মিশ্র বললেন, দেখুন, খোদ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শহরে লেখাপড়া করেছি, বড়ো হয়েছি, কিন্তু খাসিদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অন্দরের খবর এতটুকু জানতে পারলাম না। আর কোথাকার অক্সফোর্ড আর কলকাতার লোক এসে আপনারা দু'জনে ট্রাইবদের নাড়িনক্ষত্র জেনে গেলেন, এটা ভাবাই যায় না।

— প্রফুল্লদার কথা শুনে, জানেন কাকা, আমার সৈয়দ মুজতবা আলীর একটা কথা মনে পড়ে গেলো। আর সে কথা বলতে গেলে তো একটা গল্প হয়ে যায়।

— কী কথা, শোনাক না গল্পের মতো, বলো না তুমি, শুনি।

— তা, তখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। দীপ্তি চক্রবর্তী ও আমি গেলাম শান্তিনিকেতনে মুজতবা আলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। দু'জনেই আলী সাহেবের ভক্ত আমরা। শান্তিনিকেতনে গিয়ে দীপ্তি উঠলো বকুলবাগানে আমাদের বান্ধবী স্বপ্না দত্তর বাড়ি, আর আমি গেলাম যোগেশ বাগলের একখানা চিঠি নিয়ে বিশ্বভারতীর চাইনিজ বিভাগের হেড ডঃ সুজিত মুখার্জীর পীয়রসন পল্লীর বাড়ি। ডঃ মুখার্জী তাঁর মেয়ে রুচিরাকে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন 'পৌষালী'তে। পরের দিন বিকেলে ডঃ মুখার্জী আলী সাহেবকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন আমাদের হাতে। তাতে লিখলেন, 'প্রিয় মুজতবা, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির দু'জন পড়ুয়া তোমার লেখার খুব ভক্ত। তাদের একটু দর্শন দিয়ে বাধিত কোরো।' তা বুঝলেন, রুচিরা সেই চিঠি নিয়ে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলো বোলপুরের কবরখোলায় সৈয়দ মুজতবা আলীর বাড়িতে। আলী সাহেবেব একতলায় দেখি বিরাট একটা গ্লোব। অতোবড়ো গ্লোব জীবনে দেখিনি আমি। মনে মনে বললাম, বিশ্বভ্রমণের স্মৃতি এই গ্লোবটা। দোতলায় তাঁর ঘরে যেতে টিপ টিপ করতে লাগলো বুকের ভেতরটায়। রুচিরা আমাদেরকে আলী সাহেবের আমড়া আমড়া চোখের সামনে নিয়ে গিয়ে তার পিতৃদেবের চিঠিখানা দিয়েই পালালো সেখান থেকে। বুঝলেন, আমরা তো পড়লাম বিপদে। সে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন আমাদের আরাধ্য দেবতাই। আমাদের দু'জনের দিকে কাজী নজরুল ইসলামের মতো বড়ো বড়ো ধারালো চোখে তাকালেন তিনি। প্রথম পালা পড়লো আমার — কী পড় তুমি?

— কম্পারেটিভ ফিলোলজি।

— আর তুমি? দীপ্তির দিকে চোখ ঘোরালেন তিনি।

— ইংলিশ।

— কম্পারেটিভ ফিলোলজি। ভ্রূ কুঁচকোলেন তিনি। 'তা, সুনীতি চাটুজ্জে কিছু পড়ান তোমাদের?'

— গথিকে লেখা ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়ান।

— গথিক ভাষায় লেখা ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়ান, ওরে বাবা! আর তোমাদের ইংরিজির হেড কে এখন?

—ডঃ অমলেন্দু বসু।

— অমলেন্দু বোস। তিনিও তো ইংরিজির বড়োপণ্ডিত। তা এমন দু'জন পণ্ডিতের সান্নিধ্য পাবার পর আমার কাছে কেন?

— 'আপনার লেখার ভক্ত আমরা' দু'জনে একসঙ্গে বলে উঠলাম।

— তা, শোনে, গুরু মানলে একজনকেই মানতে হয়, তাঁকেই ভালো করে জানতে হয়। তা একবার হলো কি জানো? আঃ তা তোমরা এতো জড়োসড়ো হয়ে বসছো কেন, আমি বাঘ না ভালুক, স্বাভাবিক হয়ে বসো, আমার লেখার ভক্ত যখন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। বুঝলে, তখন আমি লণ্ডনে। হঠাৎ একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এলেন সেখানে। আমাকে খবর দিলেন দেখা করতে। আমি গিয়ে পায়ের

ধুলো নিতেই বললেন — আলী, যাবি তুই আমার সঙ্গে।

— কোথায়, গুরুদেব?

— কবি ইয়েটসের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

— তা, গুরুদেবের কথা শুনে আমি কী বললাম জানো?

— 'কী বললেন?' আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই।

— বললাম, গুরুদেব, আমি একজনকেই সারাজীবন ধরে বুঝতে চাই। আরেকজন নোবেল লরিয়েটকে বুঝতে চাইনে আমি।

এরপর আমাদের আরাধ্য দেবতা পৃথিবীর নানান দেশের বিচিত্রসব গল্প বলতে লাগলেন। কখনো চলে গেলেন প্যারিসের রাস্তার বইয়ের আরকেডের বিচিত্ররকম বই বাঁধানোর কথায়। কখনো চলে গেলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষক পৃথুল দেহী 'ইয়া বিরাট লাশ' মহাপণ্ডিত জার্মান সাহেব 'শ্মিট'-এর কথায়। দর্শনের এই মহাপণ্ডিত অধ্যাপকের বয়েস তাঁর কাছে লেগেছে 'সোয়া শো' বছরের মতো। ক্লাশে ঢুকে তাঁর বাজখাঁই গলায় কীভাবে হাঁক ছাড়তেন 'মাইনে ডামেন উনট হেরেন' — 'আমার মহিলা ও মহোদয়গণ' বলে এবং বক্তৃতার শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরকে 'আস্ত একটা গাধা বা বলদ' সম্বোধন করে কীভাবে গালি পাড়তেন — এই সব কথায়। আলী সাহেব এরপর বিচরণ করতে লাগলেন গথিক, গ্রীক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত — এইসব প্রচিন ভাষায়। তারপর চলে গেলেন ইংরিজি থেকে আধুনিক জার্মান ও ফরাসী ভাষার কৌলীন্য কোথায় সেই ব্যাখ্যায়। এরপর আমার দিকে তাঁর শাণিত চোখের চাহনি, বলো তো সংস্কৃত ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার কে?

— কেন, কালিদাস।

— হলো না হলো না, সংস্কৃত ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার হলেন ভাস। নাটককে যদি সত্যিকারের দৃশ্যকাব্য বলতে হয় তবে তা পাবে ভাসের নাটকে।

এরপর 'দেশে-বিদেশে'র লেখক হঠাৎ করে তাঁর দুই ভক্তের দিকে বুদ্ধিদীপ্ত হাসির বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে বললেন, দ্যাখো, সারা পৃথিবীর কতো মৃত ভাষার এ্যানাটমি ঘাঁটলাম, জার্মান, ফরাসী, ইংরিজির কৌলীন্য নিয়ে এতক্ষণ বক্তৃতা ঝাড়লাম তোমাদের কাছে। কিন্তু হায় আল্লা, আমি ঠকে গেলাম আমার নিজের জেলা সিলেটে গিয়ে গোল দোরের কাছে।

— গোলদোরের কাছে! — আমাদের সীমাহীন কৌতূহল।

— হ্যাঁ হ্যাঁ, গোলদোরের কাছে। গোলদোরের ঘাস গোরুতে খায়না, আমার হলো সেই অবস্থা। সিলেটের বাড়িতে গিয়ে একটা বাজারে বসে আছি একদিন। খুব কাছে পার্বত্য ত্রিপুরার ছোট ছোট সবুজ টিলা-টঙ্কর দেখা যাচ্ছে। ভাবছি, গুরুদেবের গোবিন্দ মাণিক্য-নক্ষত্র রায় ওই টিলা-টঙ্করের কোথাও ইতিহাসের পাতায় লুকিয়ে রয়েছেন। আর গোবিন্দ মাণিক্যকে হত্যা কবার জন্যে রঘুপতি জয়সিংহকে উত্যক্ত করছেন। ঠিক এমন সময় ইতিহাসের গোবিন্দ মাণিক্যের টিলা-টঙ্করের ট্রাইবাল মেয়েরা পিঠে লাঙ্গা ঝুলিয়ে জুমের তরমুজ, ভূট্টা, ফুটি নিয়ে কিচির মিচির করে তাদের মাতৃভাষায় কথা বলতে বলতে যাচ্ছে বাজারের ভেতর। ওদের কথা বোঝার ক্ষমতা নেই আমার। অথচ আমার বাড়ির কাছে টিলার ওপারেই থাকে ওরা। তখন নিজের দু'গালে চড় মারতে ইচ্ছে হলো আমার। সারা পৃথিবী ঘুরলাম, পৃথিবীর মরা ভাষাগুলোর পোষ্টমর্টেম করলাম। জার্মান-ফরাসী-ইংরিজি ভাষায় বুকনি ঝাড়ি সবসময়। আর কিনা আমার বাড়ির ধারের পাহাড়ী তিপ্রা ভাষাটা জানিনে আমি। আমার বাড়ি থেকে মাত্র মাইল পাঁচেক দূরের জীবন্ত ওই পাহাড়ী ভাষাটার কাছে আমিই মৃত। আবেগের মাথায় মনে হলো, যাই ওই পর্বত-ললনাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিই আমার প্রতিবেশীর ভাষা জানিনে বলে। চোখে

আন্দারা-গুন্দারা দেখতে লাগলাম আমি।

— তা, বুঝলেন কাকা, আমাদের প্রফুল্ল মিশ্রর ওই সৈয়দ মুজতবা আলীর অবস্থা। সারাজীবন ইংরিজি পত্রিকার এডিটর গিরি করলেন, অসমীয়া-বাংলা-ইংরিজি ভাষায় বক্তৃতা করেন। অথচ তাঁর প্রতিবেশীর ভাষা খাসি বলতে পারেন না, খাসিদের সামাজিক কাঠামোও জানেন না। তাঁর আফসোশ আলী সাহেবের আফসোশের মতো।

— ওঃ, দারুণ একটা গল্প শোনালে তো তুমি। কিন্তু তোমাদের ওই আলী সাহেব ওই যে 'আন্‌দারা-গুন্দারা' শব্দটা ব্যবহার করলেন, ওটা তো ককবরকে আমরা করি। অন্ধকারকে আমরা বলি আন্‌দারা-গুন্দারা।

— ঠিক বলেছেন আপনি। জানেন, আপনাদের হেরমা গ্রামে যখন ককবরক নিয়ে গবেষণা করি, তখন ওই আন্দারা-গুন্দারা শব্দটা শুনে আমার একদিন ইচ্ছে হয়েছিলো মুজতবা আলী সাহেবকে চিঠি লিখে জানতে তাঁর মুখের ওই প্রিয় শব্দটা ত্রিপুরার ককবরক ভাষায় কীভাবে ঢুকে পড়লো। কিন্তু ভয়ে চিঠি লেখা ওয়ে ওঠেনি তাঁর মতো মহাপণ্ডিতের কাছে।

'এখন বলো, প্রফুল্ল মিশ্রর কী হলো?' জিজ্ঞেস করলেন কাকাশ্বশুর।

— প্রফুল্লদাকে বললাম, চলুন, এবার ওভারফ্লোর জলে ভালো করে চান করিয়ে নিয়ে আসি আপনাকে। চান করলে দেখবেন শরীরটা ঝরঝরে লাগছে বেশ।

— ঠিক আছে চলুন।

— প্রফুল্লদাকে আমাব একটা লুঙ্গি আর গামছা দিয়ে হাতে একটা বালতি ও ঘটি নিয়ে চললাম কলতলায়। প্রফুল্লদা ওভারফ্লোর পাশে ইটের চাতালে বসতেই বালতি বালতি জল ঢাললাম তাঁর মাথায়। চান করতে করতে আঃ আঃ শব্দ করতে করতে বললেন, 'আপনার বালতি বালতি জলের ধারায় গা থেকে চুয়াক আর বৃতুকের গন্ধ যাবে এবার।'

— জানেন, প্রফুল্লদার কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেললাম আমি। চান করিয়ে তাঁকে ঘরে আনতেই তাঁর চোখ গেলো রাতের খাওয়া ওই বৃতুকের ছোট কলসিটার দিকে। সেদিকে চোখ যেতেই বললেন, আচ্ছা, কুমুদবাবু, একটা বোতলে করে আপনার শ্বশুরবাড়ির এই অদ্ভুত সোমরস নিয়ে যাওয়া যায় না? শিলঙে নিয়ে গিয়ে বন্ধুদের খাও‌য়াতাম রিপভ্যান উয়িঙ্কিলের ঘুম পাড়ানোর তরল ঔষধটা।

— তা আমার মেঝশালাকে ডাকি তাহলে। সে যদি নলের মুখে ন্যাকড়া জড়িয়ে চুষে চুষে আধ বোতলের মতো বের করতে পারে। ঠিক আছে, সে ব্যবস্থা করা যাবে। এখন চলুন আমার ককবরক শিক্ষক যোগেন্দ্র মাস্টারের কাছে আপনাকে নিয়ে যাই।

যোগেন্দ্রবাবুর ঘরে নিয়ে যেতেই দেখি তিনি চান করে স্বরূপানন্দের ফটোর সামনে বসে ধ্যান করছেন। আমরা যেতেই তিনি ধ্যান থেকে উঠলেন। পরিচয় করিয়ে দিলাম তাঁর সঙ্গে প্রফুল্লদার। শিলঙের কথা শুনে যোগেন্দ্রবাবু প্রফুল্লবাবুকে বললেন, 'আপনাদেব শিলঙ পাহাড়ে একবার আমরা গিয়েছিলাম তো বাবামনির উৎসবে। সিলেট দিয়ে গিয়ে শিলঙ পাহাড়ে উঠেছিলাম আমরা। তখন হিন্দুস্তান-পাকিস্তান হয়নি।'

— তাহলে সে তো অনেক দিনের কথা। প্রফুল্লদা বললেন।

— অনেক দিনের কথাই। তা জানেন প্রফুল্লবাবু, শিলঙ পাহাড় থেকে ফেরার পথে এক কাণ্ডই করেছিলাম আমরা। ট্রেন এসে পড়ায় আর টিকিট কাটা হয়নি, বিনা টিকিটে উঠে পড়লাম দা বাদু (বাদু দাদা) আর আমি। টিকিট ছাড়া উঠেছি, টি টি এসে ধরলে কী হবে। তারপর জানেন দা বাদু একটা বুদ্ধি

বের করলেন। টি টি এলে আমাদের ককবরক ভাষায় তার সঙ্গে কথা বলবেন। ককবরকের বিন্দুবিসর্গ বুঝবেন না তিনি। তারপর আমাদের 'আণ্ড-মুণ্ড-চুণ্ড' শুনে নিশ্চয়ই পালাবেন। হলোও তাই। রাতে এসে টি টি টিকিট দেখতে চাইলে দা বাদু তার মাথায় পাগড়ি বাঁধা দশাশই চেহারায় বলে উঠলেন — চিনি তিকিত কৃরুই। তানৃই মানলিয়া, আফুরু ছময় কৃরুইখা, তাম' খূলাইছিনাই চূণ্ড? (আমাদের টিকিট নেই, কাটতে পারিনি, তখন সময় ছিলো না, কী করবো আমরা?) তা দা বাদুর ওই অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতে শুনে ঘাবড়ে গেলো টি টি। তারপর আমাদের দিকে হা করে তাকিয়ে নেমে গেলো তাড়াতাড়ি। বুঝলেন, কুমুদবাবু, যতবার চিঠি এসেছে ততবার দা বাদু ভূত তাড়ানোর মতো তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের ককবরক ভাষা দিয়ে।

যোগেন্দ্রবাবুর ককবরক সম্পর্কে এমন একটা গল্প শুনে প্রফুল্ল মিশ্র হোঃ হোঃ করে হেসে ফেললেন – ওঃ, আপনার দা বাদু দেখছি জবর রসিক লোক, উপস্থিত বুদ্ধি আছে তারিফ করার মতো। তা, তিনি কি এখনো বেঁচে আছেন?

— এখনো আছেন, ওই তো রঙমালায় বাড়ি। আপনি আজ থাকলে খবর দিয়ে ডেকে আনতে পারি।

— না, মাস্টারবাবু, এখন তো খেয়ে চলে যাবো। কাল সকালের প্লেনে গৌহাটী হয়ে আপনার শিলঙ পাহাড়ে চড়বো। তবে আপনার দা বাদু এলে আমার কথা বলবেন। ককবরক দিয়ে টি টি তাড়িয়েছেন, এ-কথা অনেক দিন মনে থাকবে আমার। এর মধ্যে মাসিমা (যোগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী) চা করে আনলেন আমাদের খাওয়াতে। চা খেয়ে যোগেন্দ্রবাবুর বাড়ি থেকে ফিরতেই, বুঝলেন কাকা, তুইয়াকে বললাম, 'চুণ্ডগি মুরুই আদিছাছূক বৃতৃক তিখালৃই দা মান? ব তিলাঙনাই ফুন।' (নল দিয়ে চুষে আধ বোতলের মতো বৃতৃক বের করতে পারো কি উনি নিয়ে যাবেন বলছেন)।

এই কথা বলে প্রফুল্লদাকে নিয়ে গেলাম আমাদের রান্নাঘরে। গিয়ে দেখি বাবু (শ্বশুর মশায়) একটা ডেগের মধ্যে গতকাল বাজার থেকে আনা একটা ছোট শূকরের মাথা সেদ্ধ করছেন মছদেঙ (ভর্তা) করবেন বলে। আর আমা (শাশুড়ী মা) পেয়াজ-রসুন-আদা আর শুকনো লঙ্কা বেটে একটা সরার ওপর রাখছেন। প্রফুল্লদাকে একটা মোড়া দিলাম বসতে। বললাম, প্রফুল্লদা আপনার সৌজন্যে ট্রাইবাল বাড়ির সর্বশ্রেষ্ঠ খানা তৈরী হবে এখন, আপনি বসে বসে দেখুন। এর মধ্যে বাবু শূকরের মাথাটা ডেগের থেকে নামিয়ে একটা কলার পাতায় রাখলেন। সেদ্ধ করা কানওয়ালা শূকরের মাথা দেখে খানিকটা চমকে উঠলেন যেন কনৌজী মিশ্র। এরপর বাবু দু'হাত দিয়ে তুলতুলে শূকরের মাথাটার মাংস ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে একটা বড়ো কাঁসার থালায় রাখতে লাগলেন। মাথাটা ছাড়াতেই আমা তার ওপর পেঁয়াজ-রসুন-আদা আর লঙ্কা বাটা দিলেন। এবার সেই বাটনা দিয়ে মেখে শূকরের মাথার ভর্তা তৈরী করতে লাগলেন পরম যত্নে আমার শ্বশুর মশায়। আর, অপার কৌতূহলে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন শিলঙের প্রফুল্ল মিশ্র, তাঁরই জন্যে তৈরী হচ্ছে তিপ্রা বাড়ির শ্রেষ্ঠ খানা। 'ওয়াক বখববক মছদেঙ' (শূকরের মাথার ভর্তা)।

এরপর আমা ককবরকে বললেন, 'নরগ আচুগৃইদি, ফুতলু বিহিকরগ চুআক খাঁরুনাই ফুন। আবনি উল' মাইরগ চাদি। তাবুকফান' মুইআ ছঙজাগয়াখু' (তোমরা গিয়ে বোসো, ফুতলুর বৌ চুআক খাওয়াবে বলেছে। তারপর ভাত-টাত খাও। এখনো পর্যন্ত বাঁশের কড়ুল রান্না করা হয়নি)।

আমার মায়ের কথা শুনে প্রফুল্লদাকে বললাম, চলুন, আমার ঘরে, আমার বড়ো শালার বৌ আপনাকে কি আবার খাওয়াবে বলছে।

আমরা গিয়ে খাটের ওপর বসতেই আমার বড়োশালার বৌ বীণা এক বোতল সোমরস এনে

প্রফুল্লদার সামনে রাখতেই দারুণ খুশিতে ভরে উঠলো তাঁর মন। এরপর এলো আমার মেঝশালা তুইয়া দুটো টাই গ্লাস নিয়ে। এসেই বললো, 'কুমুই, নিনি য়ারনি বাগৃই বৃতৃক মুরুই কারিখা। থাঙফুর কাগজবাই দুলুই রহবানৃ দ' (জামাইবাবু, আপনার বন্ধুর জন্যে বুতৃক বের করেছি। যাবার সময় কাগজে মুড়ে দেবখনে আর কি)। প্রফুল্লদাকে সে কথা বলতেই চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাঁর। বললেন, এবার আমার শিলঙের বন্ধুদের সত্যিকারের তাজ্জব বনিয়ে দেবো।, হিপ হিপ হুর্‌রে। তুইয়া বাবু এবার তাহলে চুআক খাওয়া যাক। কিন্তু কুমুদবাবু, বালতি বালতি জল ঢেলে চুআকের গন্ধ দূর করলাম যে, এখন খেলে তো আবার গন্ধ বেরোবে।

— আপনি নিশ্চিন্তে পান করুন প্রফুল্লদা, আমাদের যেতে যেতে সেই বিকেল। তিপ্‌রা বাড়ি অতিথি এলে নিজের ইচ্ছেয় যেতে পারেনা কখনো। খেয়ে দেয়ে একটু রেস্ট নিয়ে যাবো আমরা, সন্ধ্যের আগেই অনিল ভট্টাচার্যের হেফাজতে পৌঁছে দেবো আপনাকে।

এবার প্রফুল্লদার পানপাত্র কলকল করে ডেকে উঠলো। শালার পাত্রটাও ভবে উঠলো ওই একই সুরে। তারপব দু'জনে টাইগ্লাস উঁচু করে সৌজন্য প্রকাশ করে চুমুক দিলেন কারণ বারিতে। একপাত্র খাবার পর প্রফুল্লদা মুখ খুললেন – জানেন, কুমুদবাবু, শীতের শিলঙে তো আমরা একরকম মদের মধ্যে ডুবে থাকি। কিন্তু এখানে এসে মনে হচ্ছে এ-মদ সে-মদ নয়, খাসি মেয়েদের মফলাঙ মদেব থেকেও এই তিপ্‌রা মদ আরো ভালো।

আবার নিঃশেষিত পানপাত্র ডেকে উঠলো সুর করে। এবার প্রফুল্লদা তাঁর গোঁফের তলায় হাসির ঝিলিক মেরে আমার দিকে তাকালেন। আচ্ছা, কুমুদবাবু, ট্রাইবাল বাড়ির জামাই হয়ে আপনি মদ খাচ্ছেন না, এতো ভারি তাজ্জব লাগছে আমার কাছে।

— জানেন প্রফুল্লদা, আমার বিয়ের পর এক কাণ্ডই করে বসলাম আমি। এখনো সে-কথা মনে পড়লে হাসি পায়।

— কেমন?

— শুনুন, হলো কি, বিয়ের পরে ট্রাইবাল বাড়ির এই অঢেল সোমরস পানের বিরুদ্ধে কেন যেন একটা সাত্ত্বিকভাবের উদয় হলো আমার মনে। কতো লোক খেতে পায় না, দু'মুঠো ভাতের জন্যে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘোরে, আর কিনা সেই ক্ষুধার অন্ন পচিয়ে মদ তৈরী করে নেশা করা ! শ্বশুর বাড়িতে মদ তৈরী করা বন্ধ করে দিতে হবে যেভাবে হোক।

—ওঃ, দারুণ অনুভূতি তো আপনার!

— তারপর করলাম কি, আমার স্ত্রীকে বললাম আমার মনে কথা।

—তা, আপনার এমন অদ্ভুত অনুভূতির কথা শুনে আপনার স্ত্রী কি বললেন?

— বললেন, 'নৃঙ কবর দা, তিপ্‌রাছানি নগ' বাতি তা বগদি হুননাই নৃঙ? আব' উঙগৃলাক' (তুমি পাগল, তিপরাবাড়িতে ভাটি বসাতে মানা করবে তুমি? ওটি হবে না)।

—নাহালা, বৃছুক বরক মাই চায়াউইতঙগ', মাই মচছানি বাগৃই কৃরুইরগ বৃছুক হালহাল উঙগৃইতঙ, নুগয়াদা? (দেখনা, কতলোক ভাত না খেয়ে থাকছে, এক মুঠো ভাতের জন্যে গরীব লোকেদের কতো দুর্গতি হচ্ছে, দেখনা কি?)

—'নৃঙ জেছাফান ছাদি অম', উঙগৃলাক, চিনি ছিরিছিতিনি লয় চুঙ কারুইমায়া' (তুমি যাই বলো না কেন, এটা হবে না, আমাদের চিরকালের অভ্যেস ছাড়তে পারিনে)।

— এই নিয়ে বুঝলেন, প্রফুল্লদা, নতুন বৌয়ের সঙ্গে আমার চলতে লাগলো মন কষাকষি, সবসময় মুখ ভার করে থাকেন তিনি। ঠিক এভাবে ক'দিন যাবার পর একদিন তিনি আমাকে রাত্রের

শোবার সময় বললেন, 'আমান' বুজগই ছাকা, আমা গছিকা। কেনতুক নানা ছাঅ, চুয়াক খুলাইয়াখে বাহাইকে গোপালন' রাঙপুইছা রহরনাই? নাইদি,"কাইলাবাড়ি পাইদরপ নৃঙ বৃছুক বেজাল ফুনাঙগুই খিপকা, দৃখুইঅ কৃলাইমা হাই তঙগ আঙ' (মাকে বুঝিয়ে বলেছি, মা রাজি হয়েছেন। কিন্তু ঠাকুরমা বলেছেন, মদ তৈরী না করলে গোপাল (আমার ছোটশ্বশুর। তখন তিনি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে সিপাইজলায় অ্যাপ্রেনটিস ছিলেন)কে টাকা-পয়সা পাঠাবো কী করে? দেখো, বিয়ে শেষ হতেই তুমি কতো ভেজাল লাগিয়ে দিয়েছো, ফাঁদে পড়ার মতো অবস্থায় আছি আমি)।

— 'তারপর কী হলো?' প্রফুল্লদার গলায় বিস্ময়ের সুর।

— তারপর আমার দিদিশাশুড়ী আর শাশুড়ী আলাপ-আলোচনা করে মদ তৈরী করা বন্ধ করে দিলেন একদিন।

— তাহলে দেখা যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত জিতলেন আপনি?

— জিতলাম মানে? আমার দাদাশ্বশুর গৌরচাঁনঠাকুর ও আমার শ্বশুর মশায় বেজাই খুশী হলেন কলকাতার জামাইয়ের এই নিষেধাজ্ঞায়।

— আপনার দাদাশ্বশুর ও শ্বশুর মশায় বলছেন খুশী হলেন?

— তাঁদের খুশী হবার কারণ কি জানেন, প্রফুল্লদা, তাঁরা আবার মদ খান না। আগে খেতেন, তারপর একটা বিশেষ বয়েসে এসে ছেড়ে দিয়েছেন।

— দারুণ ইন্টারেস্টিঙ তো।

— সব থেকে মজার কথা কি জানেন, আমার দিদিশাশুড়ী, মানে আমাব শ্বশুরমশায়ের মা, অন্যদের মতো ঘরে মদ তৈরী করে বিক্রী করেন ঠিক-ই, কিন্তু তিনি নাকি জীবনে কোনো দিন খাননি। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার।

— তাহলে আপনার শ্বশুর বাড়িতে সুরাপান করতেন কে কে?

— কেন, আমার শাশুড়ী আর আমার স্ত্রী?

— আপনার স্ত্রী সুরাপান করতেন?

— পান করতেন মানে, ট্রাইবাল লেডি, পান না করলে দলচ্যুত হবার ভয় ছিলো।

— আপনার শাশুড়ীরও কি ওই একই অবস্থা?

— শাশুড়ীমা-ব অবস্থা তো আরো খারাপ। তিনিই তো গৃহকর্ত্রী, তিনি তো নিজে খেতেন আত্মীয়-স্বজন এলে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে খেতেও হতো। তাছাড়া, পাড়ায় বাড়ি বাড়ি চুয়াকের নিমন্ত্রণ তো ছিলোই।

— তা হলে তো দেখছি আপনার জয়-ই হয়েছিলো।

— আমার জয় হলে কি আপনি এখন আমার বিয়ের খাটে বসে এমন মৌজ করে হিপ হিপ হুররে করতে করতে চুয়াক খেতে পারতেন?

— হ্যাঁ, তাও তো ঠিক, আবার ধাঁধায় ফেলে দিলেন আপনি।

— কোনো ধাঁধা না। আর এক কাপ গলাধঃকরণ করুন, তারপর হার-জিতের কাহিনী শোনাবো আমার।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই আমার মেজশালা সঙ্গে সঙ্গে পানপাত্র ভরে নিলো দু'জনের। মদিরাপাত্রে আবার চুমুক দিয়ে প্রফুল্লদা কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকালেন। 'আচ্ছা, কুমুদববু, আপনার শ্বশুর মশায় ওই যে শূকরের মাথায় ভর্তা করছিলেন, তাকে আপনি বলছেন তিপ্‌রা বাড়ির শ্রেষ্ঠখানা?

— আলবত। ফলেন পরিচিয়তে বৃক্ষঃ, বুঝলেন প্রফুল্লদা, খেলেই বুঝতে পারবেন আমার কথা

ঠিক না বেঠিক।

তা বুঝলেন কাকা, ঠিক এমন সময় আমার মেঝশালা তুইয়ার বৌ ফুতিয়া বড়ো বড়ো দুটো প্লেটে করে 'উআক বখরক মছদেঙ' আর জল এনে প্রফুল্লদার সামনে রাখতেই খানিকটা ভড়কে গেলেন তিনি।

— শেষে কী করলেন প্রফুল্লদা, খেলেন শূকরের মাথার ভর্তা?

— শুনুন না, মানে হলো একটু ইতস্তত করছেন তিনি। তখন আমি বললাম, প্রফুল্লদা, সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে মস্কোর হোটেলে বসে তো চাঙ চাঙ স্বাদহীন শূকরের মাংস খেয়েছেন নুনের জলের ভেজা। শিলঙেও যে খান না, তা নয়; তবে শূকরের মগজের ভর্তা তো আর খাননি কোনদিন, একবার মুখে পুরে দেখুন না, দেখবেন শেষে জিভ দিয়ে জল আসবে খাবো আরেকটু খাবো বলে। —'রিয়েলি? ঠিক আছে, দাঁড়ান, টাইগ্লাসটায় ভালো করে চুমুক দিয়ে নিই।' বলেই নিঃশোষিত টাইগ্লাসটা ঠক করে শব্দ করে রেখে শূকরের মাথার ভর্তা মুখে ভরলেন তিনি। আমার শালাও আবার দু'জনের টাইগ্লাস ভরে নিয়ে কনৌজী ব্রাহ্মণের সঙ্গে ওই ভর্তা মুখে পুরতে লাগলো চুক চুক শব্দ করে। লক্ষ্য করলাম, প্রফুল্লদার সারা চোখে-মুখে কেমন যেন পরিতৃপ্তির ছাপ। তখনো তিনি খেয়েই চলেছেন, আর আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন অদ্ভুতভাবে।

— কেমন লাগছে, প্রফুল্লদা, শূকরের মাতার ভর্তা?

— 'ওয়াণ্ডার ফুল, ওয়াণ্ডারফুল, কুমুদবাবু, এর স্বাদ বোঝানোর ভাষা পাচ্ছিনে আমি। কি খাওয়ালেন ভাই। দাড়ান আরেকটু চুমুক দিয়ে নিই, তারপর বলছি। ঠিক বলেছেন আপনি, মস্কো-শিলঙ ফেল মারলো আজ আপনার শ্বশুর বাড়ির গ্রাম হেরমাবাড়ির কাছে। শূকরের মাথার ভর্তার স্বাদ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, সে যতোই ইংরিজিই জানিনা কেন আমি।' বলতে বলতে পানপাত্রে চুমুকের সঙ্গে সঙ্গে প্লেটের সবটুকু শূকের মাথার ওয়াণ্ডারপুল ভর্তা সাবাড় করলেন তিনি। আর ঠিক তখনি আমার ছোটো পিসশাশুড়ী ললিতা আবার একটা আদিছা (আধ বোতল মদ) এনে জামাইয়ের বন্ধুর সৌজন্যে শিলঙের অতিথির সামনে ধরতেই আঁতকে উঠলেন যেন তিনি। পিসশাশুড়ীর শকুন্তলার পোশাকে আধবোতল সোমরস হাতে দেখে প্রফুল্লদার যেন মনে হচ্ছিলো তিনি কর্ণমুনির আশ্রমে বসে আছেন। হঠাৎ পি ললিতা (ললিতা পিসি) প্রফুল্লদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চিনি চামারিনি কিচিঙ নৃঙ, নন' তিনি চুয়াক বাই তুকুরুনাই' (আমাদের জামাইয়ের বন্ধু আপনি, আপনাকে আজ মদ দিয়ে স্নান করাবো।) এই কথা শুনে প্রফুল্লদা আমার দিকে তাকাতেই পিসশাশুড়ী বুঝলেন যে জামাইয়েব বন্ধু তাঁর ককবরকের আদরের ডায়লগ বুঝতে পারেননি। তাই তিনি মদের বোতোল প্রফুল্লদার একেবারে মুখের ওপর ধরেই বাঙলায় বললেন, 'আপনি হইতাছেন আমরার জামাইয়ের বন্, আপনারে আইজ মদ দিইয়া সান করাইমু।' বলে বোতলের ছিপি খোলার ভান করতেই প্রফুল্লদা ঘাবড়ে গিয়ে বাঁ-হাত দিয়ে মাথার টাকা ঢেকে খানিকটা চিৎকার করে হাসতে হাসতে বলে উঠলেন, 'দোহাই ধর্ম পিসি, আজ না, আজ না, আবার আসবো আমি, তখন চান করিয়ে দেবেন আমায়।' এই কথা শুনে পিসি হাতের মদের বোতলটা প্রফুল্লদার সদ্য সাবাড় করা শূকরের মাথার ভর্তার প্লেটের সামনে রেখেই এঁটো প্লেট দু'খানা নিয়ে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'চুয়াক খাইতে থাকুন, আবার লইয়া আমু হুয়োরের মাথার ভর্তা।'

'বড্ড বেঁচে গেলেন তোমাদের প্রফুল্ল মিশ্র, আমাদের বাই ললিতা (ললিতা দিদি) যে ফূর্তিবাজ, একটা কিছু হয়তো করে ফেলতেন তিনি। জামাইয়ের বন্ধু বলে কথা।' বলে উঠলেন কাকাশ্বশুর বীরকুমারবাবু পরম উৎসুক ভরে।

—'তা বুঝলেন কাকা, এবার তুইয়া পিসির মদের বোতল থেকে বিন্নি চালের দুষ্প্রাপ্য সুগন্ধি মদ ঢালতেই প্রফুল্লদা জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, কুমুদবাবু, এবার বলুন আপনার শ্বশুরবাড়িতে মদ তৈরী বন্ধ করার পর কী অবস্থা হলো?' — 'ওঃ হ্যাঁ, তা শুনুন এবার। এই যে আমার শালার সঙ্গে আপনি মদ্যপান করছেন, তখন সে খু-ব ছোটো, সে-সব কথা মনে নেই এর। আমার বড়ো শালা ফুতলুর হয়তো কিছু কিছু মনে আছে। সপ্তাখানিকের ভেতর লক্ষ্য করলাম, প্রফুল্লদা, মদের বিরুদ্ধে শ্বশুরবাড়িতে আমার ফরমান জারির বিরুদ্ধে শ্বশুরবাড়ির গ্রামে কেমন যেন গুঞ্জন শুরু হয়েছে। শ্বশুরবাড়িতেও থমথমে ভাব। আমার স্ত্রীর ব্যবহারও কেমন যেন অস্বাভাবিক। আত্মীয়-স্বজনেরা আসছেন, অথচ তাঁদেরকে সনাতনী মদিরা দিয়ে আপ্যায়ন করতে পারছেন না আমার শাশুড়ী। ফিস ফিস করে কি যেন বলেন তিনি তাঁদের সঙ্গে। আমি আমার বিয়ের নতুন ঘরে বসে দিন-রাত কাজ করি, সবই চোখে পড়ে আমার। এই ঘটনার তিন পনেরো পর আমার বড়ো পিসশাশুড়ী নলিনী এলেন বিয়ের পর নতুন জামাই কেমন আছে দেখতে। ছোট পিসশাশুড়ীর মতো তিনিও খুব ফুর্তিবাজ। তিনি এসে মদের বিরুদ্ধে কলকাতার জামাইয়ের ফরমান শুনে হতাশ হলেন খুব। প্রতিদিন নিদেন পক্ষে আধ বোতল মদ তাঁর চাই-ই চাই। বাপের বাড়ি এসে মদ না পেয়ে তিনি তাঁর ছোট বোন ললিতাকে নিয়ে সারা বিকেল মদ খেলেন জ্যাঠা-কাকার বাড়ি। সন্ধ্যের ঠিক একটু পরে দু'বনে মদ খেয়ে টলতে টলতে বাড়ি এলেন কোনমতে। আমার শাশুড়ী তখন উঠোনে বসে চরখায় তুলো কাটছেন এঁং এঁং কুকাই শব্দ করে। হঠাৎ আমার বড়ো পিসশাশুড়ী নলিনী নাচতে শুরু করলেন গান গাইতে গাইতে ঃ

'চামারিলে মাঙখা কাহামলে ব্যচূই
মকল ছে য়াছা ফুলি।'
('জামাই পেয়েছে ভালোই বৌদি
একটা চোখে তার ছানি।')

— তারপর?' প্রফুল্লদার গলায় পরম বিস্ময়ের সুর।

— তা, তাঁর এই নাচ দেখে আমার শাশুড়ী, মরা মরা বলে হাসতে লাগলেন। এর মধ্যে দক্ষিণের ঘর থেকে আমার দিদিশাশুড়ী শশীবাণী তাঁর নৃত্যরতা জেষ্ঠাকন্যাকে ডাকলেন গলা ছেড়ে, 'ও নলু, য়াঙ ফাইছিদি, তা মূছাদি আছূক, চামারি কৃতাল তাম' বাবিনাই?' (ও নলু, এদিকে আয় আগে, এতো নাচিসনা, নতুন জামাই কী ভাববে?)

আমার দিদিশাশুড়ীর এই কথা শুনে আমার বড়ো পিসশাশুড়ী চিৎকার করে বলে উঠলেন বাঙলায় ঃ অখন-ই যামু আমি জামাই-মাইয়ার ঘরো। কিরে মানা করলো সে মদ বানাইতো। তিপ্‌রা বারির জামাই হইয়া মদ বানাইতে মানা করে ক্যান।' এই কতা বলতে বলতে তিনি ঢুকে পড়লেন আমার বিয়ের ঘরে। তাঁর টলটলায়মান অবস্থা দেখে দারুণ ঘাবড়ে গেলাম আমি। তিনি আমার সামনে আসতেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম তাঁর। আমার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন, 'কাহাম-কৃরূঙ তঙ-বাইছিদি, আয়ুক লকখুন' (মঙ্গলমতো থাকো, আয়ু বাড়ুক)। তারপর বললেন অনুযোগের সুরে, 'তিপ্‌রা বারির জামাই হইছো, কইলকাতার জামাই তুমি আমরার, এম. এ. পাছ বলে তুমি। তা আমরার তিপ্‌রা সমাজ বুঝতো লাগবো তো তোমার। ট্রাইবাল বারিতো মদ বানাইতে বনদো কইরলে চলবো? চলতো না তো। পারায় মদ খাইতো গিয়া দেখি হক্কলে তোমার মনদো কইতাছে। অখন আমাগোর লগ্‌গে বইছা মদ খাইতো হইবো তোমার। অখন বাচূই তক (মোরগ) কাতবো। তারপর খাইবো এক সঙ্গে। ফুলতি (আমার স্ত্রীর ডাকলাম ফুলটি)'র ছুন্দর মুখখানা কালা হইয়া রইছে। আজ একলগগে বইছা চুয়াক খামু; কেমন? আমি আইলাম নতুন জামাইরে লইয়া যামু বলে। তোমার হালি

বীণাপানির 'ককছুঙমা' (বিয়ের মঙ্গলাচরণ) হইব কাইল। কইলকাতার জামাইরে দেখতে আইবো সব। সেখানে গিয়া আমোদ-ফুর্তি করতো হইতো না।' তোমার হালি-হালার বৌরা মদ দিয়া সান করাইতোনা তোমারে।' এই কথা বলে আবার টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

— 'পরে কী করলেন আপনি, কুমুদবাবু?' প্রফুল্লদার দারুণ কৌতূহল।

— কী আর করবো, হারলাম আমি বড়ো পিসশাশুড়ীর কাছে।

— তাহলে আপনি আপনার ফরমান তুলে নিলেন শ্বশুর বাড়িতে মদ তৈরী করার বিরুদ্ধে?

—শুধু ফরমান তুললাম না, সেই রাত্রে দুই পিসশাশুড়ী তাঁদের মেয়ে-জামাইকে নিয়ে এক সঙ্গে বসলেন। তারপর আমার বড়ো পিস শাশুড়ী আমার হাতে তুলে দিলেন উপছেপড়া পানপাত্র পরম স্নেহ ভরে।

— তাহলে আপনি শেষ পর্যন্ত মদ ছুঁলেন?

— কী আর করা, পাহাড়ের স্বয়ং ঈশ্বরী যখন তাঁদের জামাইয়ের হাতে সোমরসের পাত্র তুলে দিচ্ছেন, তখন সে পানপাত্র গ্রহণ করে তাতে চুমুক দেয়ার আগে পায়েয় ধুলো নিয়ে সম্মান জানাতে হলো তাঁদের।

—'ব্রেভো ব্রেভো একেই বলে ট্রাইবাল বাড়ির জামাই আদর।' চিৎকার করে উঠলেন প্রফুল্লদা পানপাত্রে চুমুক দিয়ে।

— জানেন প্রফুল্লদা, সেই রাত্রে আমোদ-ফুর্তি করে খাবার পরে শুতে যাবার আগে আমার হাতে পান তুলে দিলেন আমার নতুন বৌ আগের মতো হাসি মুখে। আমিও স্বস্তি পেলাম অনেকদিন পরে। পরেব দিন থেকে আবার আগের নিয়মে আমার শ্বশুর বাড়ি চলতে শুরু করলো। দিদিশাশুড়ী আবার মদ তৈরী করতে লাগলেন আমার ছোটশ্বশুরকে টাকা পাঠানোর জন্যে। শাশুড়ী ও ভাটি বসালেন হাসিমুখে। জানেন, প্রফুল্লদা, পরে আনি বুঝলাম, শুধু সামাজিক রীতিনীতিই নয়, ট্রাইবেল মেয়েদের শতশত বছবের অর্থনীতি ধরে টান মেরেছিলাম আমি। আজ সেই কথা মনে পড়লে বড্ড হাসি পায় আমার।

'ঠিক এমন সময়, বুঝলেন কাকা, আপনাদের মেয়ে এসে বললেন, 'মাই খুরছিনাই দা?' (ভাত বাড়বো কি?)

— 'হ্যাঁ, বাড়ো, এরপর প্রফুল্লদার দিকে তাকাতেই বললেন, কি সর্বনাশ দেড়টা বাজতে যায় কুমুদবাবু, একটু বিশ্রাম করে তো যেতে হবে।'

একটু পরে ফুলটি নিচে পিঁড়ি পেতে দিয়ে ভাত খেতে বসালো আমাদের। শাশুড়ীর রান্না করা বাঁশ কড়ুল, শূকরের মাংস আর চাখুই পরিবেশন করলো আমাদের। এমন সময় ছোট পিসি বাটিতে করে শূকরের মাথার ভর্তা একবাটি প্রফুল্লদার পাতে ঢেলে দিতেই তাঁর চোখে মুখে হাসির বন্যা বয়ে গেলো যেন। খাবার শুরুতেই তার হাত পড়লো প্রথমে শূকরের মাথার ভর্তার ওপর। বুঝলাম জগতের এই অদ্ভুত তিপ্রা খানা তাকে বশীভূত করে ফেলেছে একেবারে।

দুপুরে একটু ঘুমুলেন প্রফুল্লদা। ঠিক চারটের সময় ডেকে তুলাম তাঁকে। এবার তাঁর যাবার পালা। আমার মেঝো শালা তুইয়া গড়ার বোতলটা প্রফুল্লদার ব্যাগে কাগজে মুড়ে দিলো ভালো করে। প্রফুল্লদাকে ঘর থেকে নিয়ে বাইরে নামতেই দেখি দিদিশাশুড়ী, শ্বশুরমশায়, শাশুড়ীমা ও ছোট পিসশাশুড়ী দাঁড়িয়ে আছেন জামাইয়ের বন্ধুকে বিদায় জানাবেন বলে। প্রফুল্লদাকে নিয়ে তাঁদের সামনে গিয়ে একে একে প্রণাম করলাম আমি তাঁদেরকে। বাড়ি থেকে বেরুনোর আগে আমি সবসময় শ্বশুর-শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে বেরুই। দেখলাম, কেনৌজী ব্রাহ্মণেরও মাথা নত হয়ে গেলো আমার আদিবাসী

শ্বশুর-শাশুড়ীদের পায়ের ওপর। সকলের অলক্ষ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়লো আমার দু'চোখ দিয়ে।

তাহলে প্রফুল্ল মিশ্র পর্ব শেষ হলো, এখন তাহলে শুরু করো অনিল ভট্টাচার্য পর্ব শুনেই ভাত খাব। আমার কাকা শ্বশুরের গলায় আগ্রহের সুর।

হ্যাঁ, তাহলে শুনুন, হেরমার পর্ব চুকিয়ে দিয়ে পায়দলে প্রফুল্লদাকে নিয়ে এলাম চড়িলাম গেটের সামনে।

— 'চড়িলামের গেট আবার কোত্থেকে এলো?' কাকাশ্বশুর শুধোন।

— মানে, ওই বিজয় মজুমদারের বাড়ির সামনে।

— তা তুমি, বিজয়বাবুর বাড়ির সামনেকে গেট বলছো কেন?

— বিজয়বাবুর বাড়ি আর পাকা রাস্তার সংযোগস্থলকে আমি বলে থাকি চড়িলামের গেট। আর ওই গেটের মালিক কে জানেন?

— কে?

— আগরতলার নিউস্টার হোটেলের সাবেক মালিক বিজয় মজুমদার স্বয়ং। আর, বাইরে থেকে কোনো অথিতিকে নিয়ে যখন আমি হেরমা যাই, তখন ওই গেটের মালিককে দেখিয়ে নিয়ে যাই কাকে নিয়ে ট্রাইবেল এলাকায় ঢুকছি আমি।

— কারণটা কী?

— কারণ আর কিছু নয়, চড়িলামের মানুষকে সন্দেহ মুক্ত করতে।

— ব্যাপার কী, তুমি কি কোনো অবাঞ্ছিত লোক নিয়ে আমাদের গ্রামে যাও নাকি যে চড়িলামের বাঙালীরা তোমাকে সন্দেহ করবে?

— অতীতে আমার এমন কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, যা থেকে আমি 'ভোজকুমুরের ছা'র মতো চড়িলামের গেটের মালিককে দেখিয়েই নিয়ে যাই। তবে সেদিন প্রফুল্লদাকে নিয়ে যখন হেরমা যাই তখন আর দেখা করে যেতে পারিনি। তাই ফেরার পথে হাজিরা দিলাম বিজয়বাবুর নবরত্ন সভায়. হেরমা থেকে চার-পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে প্রফুল্লদা বেশ টায়ার্ড হয়ে পড়েছিলেন। বিজয়বাবু আমার সঙ্গে এমন একজন অদ্ভুতদর্শন লোককে দেখে ধরেই নিলেন কেউকেটা কেউ হবেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ির নিলাম থেকে কিনে আনা হাতলাঅলা বিরাট এক বেতেব চেয়ারে আবাম করে বসতে দিলেন প্রফুল্লদাকে। তখন বিজয়বাবুর বাড়ির দক্ষিণের দীঘি থেকে ফুরফুরে হাওয়া এসে চেরাপুঞ্জির ঠাণ্ডা হাওয়ায় অভ্যস্ত কমরেড মিশ্রের সারা শরীরে বইতে লাগলো।

— তা বিজয়বাবুর নবরত্নসভায় তখন রত্নরা কারা ছিলেন শুনি ?

— যাঁরা সবসময় চড়িলামের জমিদারকে সকাল-বিকাল পরিবৃত হয়ে থাকেন তাঁরা।

— নামগুলো শুনিই না।

— এই ধরুন, স্বাধীনতা সংগ্রামী চিন্তাহরণ চৌধুরী, হস্তরেখা বিশারদ হরিদাস আচার্যি, কবিরাজ ধীরেন্দ্র দেবনাথ, চড়িলামের মৎস্যজীবীদের নেতা প্রেমানন্দ দাস কংগ্রেস নেতা সুরেশ চৌধুরী, দক্ষিণ চড়িলামের প্রধান বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, আড়ালিয়ার বিখ্যাত শিকারী নেয়াতালী পলোয়ান আর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের একান্ত ভক্ত চন্ডীঠাকুর পাড়ার কার্ত্তিক কুমার দেববর্মা — আমার এক দাদাশ্বশুর আর নামকরা সালিশী বিচারক সাধন শীল।

— তা দেখছি, বিজয়বাবুর নবরত্নসভায় হিন্দু-মুসলামান-ট্রাইবাল সবাই আছেন।

—আছেন কেন, বলুন চাঁদের হাট বসে যায় বাঙালাদেশের জমিদার বাহাদুরের দালানের বারান্দায়। তারপর শুনুন কি হলো। যেই আমি পরিচয় করিয়েদিলাম 'শিলঙ অবজারভার' এর এডিটর আর

কনৌজী ব্রাহ্মণ বলে, তখন হাঁক-ডাক শুরু হয়ে গেলো বিজয়বাবুর। সঙ্গে সঙ্গে চা-মিষ্টির অর্ডার দিলেন নিকুঞ্জ ঘোষের দোকানে। আর কোকোকোলা পান সুপুরির অর্ডার গেলো তাঁর নিজের বাজারের যদু বসাকের দোকানে। কিন্তু এর মধ্যে হলো কি জানেন?

— 'কী হলো?'

— বিজয়বাবুর নবরত্নসভার অনেকেই নাকে হাত দিতে শুরু করলেন।

— কী ব্যাপার?

— তাই তো বলছি। বুঝলেন কাকা, প্রফুল্লদা একেবারে দক্ষিণ দিকের ত্রিপুরার রাজার চেয়ারে, আর সব একটু দূরে বসা। আমার আর বুঝতে বাকী রইলো না কেন সব নাকে হাত দিচ্ছেন। ওই আপনাদের ককবরক প্রবাদে আছে না — 'মূছা তূই বাখূলাই ফান' বিনি বমল কমরয়া'— বাঘ জল সাঁতারে গেলেও তার গায়ের চাকা-চাকা দাগ মুছে যায় না। হেরমাবাড়ির সোমরসের গন্ধ তখনো ভুরভুর করে বেরুচ্ছিলো প্রফুল্লদার গা থেকে, খেয়ে ঘুমুনোর পরেও তা যায়নি। আবার বসেছেন একেবারে দক্ষিণ দিকে, খুশবু তো সকলের নাকে লাগবেই।

— ' হোঃ হোঃ হোঃ ,' অট্টহাসি দিলেন কাকাশ্বশুর।

— না না, হাসবেন না কাকা। সে যে কী বিপদ প্রফুল্লদাকে নিয়ে তারপর আমার কি মনে হলো জানেন?

কী মনে হলো?

— আমার মনে হলো নবরত্নসভার সদস্যরা চন্ডীঠাকুর পাড়ার আমার দাদাশ্বশুর কার্ত্তিক ঠাকুরকে সকলে সন্দেহ করতে শুরু করলো। কারণ মাঝেমধ্যে তিনি বিজয়বাবুর নবরত্নসভায় মহারাজ বীরবিক্রম হয়ে আসেন (এখানে ত্রিপুরার মহারাজ বীরবিক্রমের কথা বলা হয়েছে)। তাতেই বেঁচে গেলাম আমি। তারপর জলপান শেষ হতেই বিজয়বাবুর নবরত্নসভা থেকে পড়ি কি মরি করে বিদায় নেয়ার চেষ্টা করতেই অবাক হয়ে গেলেন সবাই।

বিজয়বাবু বললেন, 'এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, কুমুদবাবু?'

— আর বলবেন না, সন্ধ্যে ঠিক ছ'টায় সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের বাসায় প্রফুল্লবাবুর জরুরী একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে, আগরতলার সাংবাদিকরা সব দেখা করতে আসবেন তাঁর সঙ্গে, আসাম থেকে বাঙালী খেদাও আন্দোলন সম্পর্কে ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শুনবেন তাঁরা। — বলেই প্রফুল্লদাকে নিয়ে চড়িলামের গেটে আসতেই পেয়ে গেলাম একটা জীপ। আগরতলা পর্যন্ত। বটতলায় নেমেই সোজা অনিলবাবুর বাসাতে। ঢুকেই প্রায় চিৎকার করে বললাম, 'অনিলবাবু, আপনার প্রফুল্লদাকে অক্ষত শরীরে ট্রাইবেল বেল্ট থেকে নিয়ে এসেছি, এই নিন জমা।'

— তাহলে সত্যি সত্যিই জমা দিলে প্রফুল্লবাবুকে সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের হাতে। ঠিক আছে, এবার তবে বলতে শুরু কর আমাদের ত্রিপুরার গর্ব অনিল ভট্টাচার্য কীভাবে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন, কীভাবেই বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুক্তিবর রহমানের হত্যার খবর ভারতবর্ষে প্রথম প্রচার করলেন তিনি ?

— বেশ, তবে শুনুন।

— শোন জামাই, ওই কাহিনী শুরু করবার আগে সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য সম্পর্কে দু'কথা বলে নাও, ওঁর সম্পর্কে কিছুই জানিনে তো আমরা।

— আচ্ছা, আপনাদের মনে আছে আপনাদের হেরমা গ্রামের পাশের গ্রাম চাঁদুরাম কপ্রা পাড়ার মনীন্দ্র চক্রবর্তীর কথা, মানে আমি মনীন্দ্র ঠাকুরের কথা বলছি আর কি।

— আচ্ছা, কী মুশকিল, মনীন্দ্র ঠাকুর আমাদের ট্রাইবেল এলাকার পুরোহিত, তুমি কি সব ভুলে যাচ্ছ না কি? কাকা শ্বশুর বিস্ময় প্রকাশ করেন।

'মনীন্দ্র ঠাকুর তো শেষ পর্যন্ত তো আমাদের বেয়াই হলেন। আমার দা মদনের মেয়ে বিশ্বরাণীকে বিয়ে করলো তাঁর ছেলে সত্য চক্রবর্তী। আশির দাঙ্গার আগে।' জ্যাঠা নন্দু এবার তাঁর ঘুম ঘুম ভাব কাটিয়ে উঠে বসে বিড়ি ধরালেন একটা।

— সত্য তো ছিলো আমার ভায়রাভাই। বেচারা মারা গেলো দাঙ্গার সময়, ট্রাইবাল বাড়ির জামাই বলে রক্ষা পেলো না সে। — আমার গলায় বেদনার সুর।

— 'শুধু সত্য তো মারা গেলো না, তার দাদা শচীন্দ্রও মারা পড়লো ওই দাঙ্গায়।'

— হ্যাঁ, আমাদের ট্রাইবেল এলাকায় দু'ছেলেই হারালেন আঁশির দাঙ্গায় মনীন্দ্র ঠাকুর।' আমার জ্যাঠাশ্বশুর দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

— আপনাদের ওই পুরোহিত মনীন্দ্র ঠাকুর ছিলেন সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের মাসতুতো কি পিসতুতো ভাই।

— 'আরে বলো কি তুমি, বিখ্যাত সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের সম্পর্কে ভাই আমাদের পুরোহিত মনীন্দ্র ঠাকুর!' আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠলেন কাকা শ্বশুর।

— 'তা, জামাই, তুমি এতসব খবর জানলে কী করে?' জ্যাঠা নন্দু জিজ্ঞেস করেন।

— জানলাম মানে, সেবার আমাদের চড়িলামের এম এল এ পরিমল সাহার খুনের পর বাই-ইলেকশন হলো, মনে আছে আপনাদের?

— কী বিপদেই না পড়লাম। মনে থাকবে না কেন, ওই বাই-ইলেকশনে পরিমল সাহার ভাই মতিলাল সাহা জিতলো, আর হারলো বামফ্রন্টের সি পি এম এর প্রার্থী রামু ভৌমিক, এখনো চোখের সামনে ভাসছে সব জ্বল জ্বল করে।

— ওই বাই-ইলেকশনের ক'দিন আগে একটা জীপে করে আমাদের হেরমা বাজারে এলেন সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য ও দৈনিক সংবাদের সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিক। আমি তখন বামফ্রন্টের প্রার্থী রামু ভৌমিকের পোষ্টার মারছি বাজারে। আমাকে ওই অবস্থায় দেখে অবাক হলেন ওঁরা। তারপর অনিল দেববর্মার চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে কানাভাঙা কাপে চা খাওয়ালাম ওঁদের। সাংবাদিকদের দেখে বাজারের লোকেরা ভিড় করে দাঁড়ালেন অনিলবাবুর চায়ের দোকানে। উপনির্বাচনে কে জিতবেন, মতিলাল সাহা না ব্রজগোপাল ভৌমিক? (ব্রজগোপালের ডাক নাম রামু) এ-সবের প্রশ্ন করতে লাগলেন দুঁদে ওই দু'সাংবাদিক। তা প্রশ্ন-টশনো করার পরে হঠাৎ করে অনিল ভট্টাচার্য বললেন, জানেন কুমুদবাবু, আপনার এই শ্বশুর বাড়ির গ্রামের কাছে আমার সম্পর্কে এক দাদা থাকেন।

— 'আপনার দাদা থাকেন'? সকলে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েন অনিলবাবুর ঘাড়ে।

— তা, দাদার নাম কী?

— মনীন্দ্র চক্রবর্তী।

—ম-মনীন্দ্র চক্রবর্তী. তাইন তো আমরার পুরুত ঠাকুর।

— আমার দাদার বাড়ি এই বাজারের কোন দিকে'? কাছে হলে দেখে যেতাম একটু।

— ওই তো, ওই তো, আমরার বাজারোর ছেরার পার ওই যে টিলা দেখা যাইতাছে, ছেহানো থাহেন আপনার দাদা।

— তা, দাদার গ্রামের নামটা যেন কি?

— চাঁদুরাম কপরা পারা।

— এখান থেকে জীপে যাওয়া যাবে ?

— জীপ তো যাইতো না। আঁদি ছেরার বিরিজ তো ভাঙছে। যাইলে হাঁইট্যা যাইতো হইবো।

– হেঁটে যেতে হবে। তা, কতদূর হবে এখান থেকে?

— কুছু দূর না হইবো। মোরগার ডাক হুনা যায় এহান থাইক্যা, কত দূর আর হইবো ?

এমন সময় ভূপেনবাবু বললেন, 'অনিল দা, এ যাত্রায় আর আপনার দাদাকে দেখা হবে না। এখন তো উঠতে হবে। বিশ্রামগঞ্জ বাজারে গিয়ে সি পি এম-এর দুর্গাদাশ শিকদারকে ধরতে হবে। তারপর বিশালগড়ে গিয়ে মতির সঙ্গেও একটু দেখা করে যেতে হবে।

— তাহলে আমরা যাই। আপনারা আমার দাদাকে আমার কথা একটু বলবেন।

— হ-হ- বলুম, বলুম।

এরপর অনিলবাবু আর ভূপেনবাবুকে নিয়ে জীপ ছুটতেই জ্যাঠা দশরথ কি বললেন জানেন?

— দা দশরথ আবার কী বললেন?

— বললেন, 'জামাই, তাইনরা কি আর আমরার বামফ্রন্টের কথা কইবো, তাইনরা তো মতিলাল সাহার পক্ষের লোক। বাপরে বাপ, ভূপেন দত্ত ভৌমিক আর অনিল ভট্টাচার্য আইছেন এলাকা সার্ভে করতো, বিপদ আছে এবার আমরার, এই কইলাম একটা কথা।'

— তা দা দছরথ তো ঠিকই ধরেছিলেন। জেতেনি তো বামফ্রন্টের প্রার্থী। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ছেড়ে দাও সে-কথা। গতস্য শোচনা নাস্তি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য সম্পর্কে আমাদেরও বেয়াই পড়েন।

— 'কেমন?' আমি চেয়ে থাকি কাকা বীরকুমারের দিকে।

— বুঝলে না। দাদা মদনের বেয়াই হচ্ছেন আমাদের মনীন্দ্র চক্রবর্তী। আবার মনীন্দ্র চক্রবর্তীর ভাই হচ্ছেন অনিলবাবু। তাহলে ?

— বুঝেছি বুঝেছি আর বলতে হবে না। তাহলে তো দেখছি সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের জামাই হই সম্পর্কে আমি।

আমাক কথা শুনে হেসে ফেলে আমার শ্বশুরদ্বয়। বললেন, 'কোথাকার সম্পর্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো। ছিলে তুমি আমাদের ট্রাইবেল বাড়ির জামাই, আর এখন হলে অনিল ভট্টাচার্যের জামাই।'

— 'জানেন আপনারা?' একটু উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

— কি?

– অনিলবাবুর বাবা রোহিনীকুমার ভট্টাচার্য ছিলেন রাজ আমলের একজন দুঁদে পুলিশ অফিসার। কিন্তু পুলিশ অফিসার হলে কী হবে, ভেতরে ভেতরে তিনি ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের ভক্ত। তখনকার দিনে অনেক স্বদেশী, মানে, অনুশীলন-যুগান্তর দলের লোক ফেরার হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে এসে তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে থাকতেন। আর অনিলবাবুর মামা নীরদ চক্রবর্তী ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, শচীন সিংয়ের বন্ধু। তিনিই দল-বল নিয়ে আসতেন।

– বলো কী। অনিলবাবুর বাবার সাহস তো কম ছিলো না। রাজার পুলিশ অফিসার হয়ে স্বদেশীদের আশ্রয় দিতেন নিজের বাড়িতে। রাজা জানতে পারলে তো নির্ঘাত গর্দান যেতো তাঁর।

– সে ভয় তিনি করতেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া, অনিলবাবুর মা সুহাসিনী দেবী ওই সব স্বদেশীদের লুকিয়ে রেখে তাঁদের খাওয়াতেন-পরাতেন। দিব্যি আরামে থাকতেন তাঁরা রাজভক্ত পুলিশ অফিসারের বাড়ি।

— তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের বাড়িতে আগের থেকেই ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রামের ঢেউ লেগেছিলো; কি বলো?

— আমার কি মনে হয় জানেন, অনিলবাবু বাঙলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজেকে যেভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন, আর যেভাবে খেদমত করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের নিজের বাসায় রেখে, তার পেছনে তাঁর বাবা-মার স্বাধীনতা সংগ্রামের পারিবারের ঐতিহ্য কাজ করেছিলো। তাঁর মামার প্রভাবও পড়েছিলো তাঁর ওপর।

— তা, এবার বলো, কীভাবে বাঙলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিলেন, আর কবে থেকে এই ঘটনা ঘটলো?

— শুনুন তাহলে, এর একটা ইতিহাস আছে। আসলে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনীর মতো। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্কও ছিলো অহিনকুলের মতো। পাকিস্তানের জনক জিন্নাসাহেব পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা বাঙলার পরিবর্তে উর্দুকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আর তখন থেকেই সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে। এরপর ৫২'র ভাষা আন্দোলনের কথা, অমর ২১শে ফেব্রুয়ারীর কথা তো আপনাদের জানা। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ছিলো পাকিস্তানে আয়ুবখাঁর নেতৃত্বে মিলিটারি শাসন। এই দশ বছরে পাকিস্তানে গণতন্ত্র বলতে কিছু ছিলো না। আয়ুবখাঁর পরে ইয়াহিয়াখাঁ হলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। তিনিও জারি রাখলেন মার্শাল ল। কিন্তু পাকিস্তানের দু'অংশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন করাতেই শেষমেস ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানে সাধারণ ভোট করতে চাইলেন। আর সেই ভোট হলো ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে।

— তারপর কী হলো?

— কী আর হবে? যা ভবিতব্য ছিলো তাই হলো। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে পূর্বপাকিস্তানের জন্যে রক্ষিত ছিলো ১৬৯টি আসন। এর মধ্যে মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ পার্টি পেয়ে গেলো একেবারে ১৬৭টি আসন। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৮টি আসনের ভেতর জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি পেয়ে গেলো ৮৩টা আসন।

— তাহলে তো মুজিবর রহমানের দু'পাকিস্তান মিলে সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী হবার কথা।

— কথা তো ছিলো তাই। বাস্তবে তা তো হলো না। ভুট্টোরও মনে মনে ইচ্ছে ছিলো সারা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে।

— কিন্তু ভুট্টোর পার্টি থেকে মুজিবের পার্টি তো বেশী সিট পেয়েছে, কাজেই ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হবেন কী করে?

— আসলে ব্যাপার কি জানেন, ভুট্টোই হোক আর ইয়াহিয়াই হোক কেউই চাইছিলেন না পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী একজন বাঙালী হোক।

— আর এই জন্যেই বোধ হয় বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো?

— মুক্তিযুদ্ধ শুরু হতে একটু দেরী হলো বলতে পারেন। আসলে প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যে তিনি নির্বাচনের রায় মেনে নিয়ে মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করবেন এবং সেইমতো ৭১-এর মার্চের তিন তারিখে তিনি ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করলেন।

— তার মানে মুজিবর রহমান তাহলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন।

— দাঁড়ান দাঁড়ান, মিঠের তলায় খাটা আছে।

— কেমন?

— ৭১'একর পয়লা মার্চ ইয়াহিয়া খাঁ তার আর এক ঘোষণায় ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন।

— বলো কি তুমি! এতো দেখছি ইতিহাসের আরেকজন মহম্মদ তুঘলক।

— তা সেই মহম্মদ তুঘলকের এই নতুন ফরমানে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান গর্জে উঠলো। পরপর দু'দিন হরতালের ডাক দিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব। আর ৭ই মার্চ রেসকোর্সে ভাষণ দেয়ার কথা ঘোষণা করলেন তিনি।

আসলে মুক্তিযুদ্ধ এগিয়ে আসছে দেখা যাচ্ছে।

এই মুক্তিযুদ্ধ এগিয়ে আনলো পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের একটা বৈপ্লবিক ঘোষণা।

— কেমন, শুনি !

৩রা মার্চ ছাত্রলীগের নেতারা ঢাকার পল্টন ময়দানে ডেকে বসলেন এক জরুরী জনসভা। সেই সভায় তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাঙলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করলেন। আর শেখ মুজিবর রহমানকে আখ্যায়িত করলেন জাতির পিতা। এরপর বেগতিক দেখে ৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ১০ই মার্চ তিনি এক রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরাসরি ওই রাজনৈতিক সম্মেলন প্রত্যাখ্যান করে। এতে শাহানশাহ্ ইয়াহিয়া গেলেন বেশ রেগে। আওয়ামী লীগ সম্পর্কে কটু কাটব্য করলেন তিনি। কিন্তু নিরুপায় হয়ে ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকলেন আবার। কিন্তু এর মধ্যে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। সামরিক বাহিনীর লোকদের সঙ্গে পূর্ব বাঙলার দামাল ছেলেদের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তখন বেসামাল বয়ে উঠেছেন।

—'তারপর?' কাকাশ্বশুর পানপাত্রের তলানি দিয়ে গলা ভেজালেন।

— তারপর আর কী? ইয়াহিয়া খাঁ বেয়াদব বাঙালীদের শায়েস্তা করতে 'বেলুচিস্তানের কশাই' টিক্কাখানকে পাঠালেন গভর্নর করে পূর্ব পাকিস্তানে।

— টিক্কাখান, টিক্কাখান। নামটা বেশ মনে পড়ছে এখন। লোকটা ভারী শয়তান ছিলো। তার অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ।

— হ্যাঁ, টিক্কাখানের নামে অনেক ছড়াও বেরিয়ে ছিলো তখন।

— এবার বলো দেখি, ৭ই মার্চের রেসকোর্সে মুজিবররহমান কী বললেন?

— ৭ই মার্চে রেসকোর্সের জনসভায় লক্ষ লক্ষ লোকের হাতে শুধু লাঠি আর লাঠি। জনতা উদ্বেল হয়ে পড়লো শেখ মুজিবের অপেক্ষায়। শেখ সাহেব এসেই বজ্রকণ্ঠে আহ্বান রাখলেন সেই বিশ্ববিশ্রুত কথা ঃ "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এই কথা বলতেই রেসকোর্সের জনসমুদ্র ফেটে পড়লো হাততালি দিয়ে। তখন তাদের সাজ সাজ রব। পারলেই তখনই টিক্কাখানকে গিয়ে পিটিয়ে মারেন। আর বলতে পারেন ৭ই মার্চ থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অসহযোগিতা শুরু করেছিলো। অফিস-আদালত বন্ধ হয়ে গেলো, স্কুল-কলেজের তো আর কথাই নেই। সরকারী-আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান সব পড়লো মুখ থুবড়ে। জানেন, বঙ্গ বন্ধু মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে এই অসহযোগ আন্দোলন এক সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিলো। তিনি তাঁর এক ঘোষণায় বললেন, " যে জাতি রক্ত দিতে জানে, কোন শক্তি তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। সাত কোটি মানুষের মুক্তি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ সংগ্রাম চলবেই চলবে।"

— 'তারপর?' কাকাশ্বশুরের গলায় উৎকণ্ঠার সুর।

— তারপর এক কান্ডই করে ফেললো বি বি সি।

— কেমন?

— বি বি সি লন্ডন থেকে তার রাতের খবরে প্রচার করলো যে শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করেছেন।

— এরপরও ইয়াহিয়া খাঁ চুপ করে বসে থাকলো তুমি বলছো?

— আরে তাঁর কি তখন চুপ করে বসে থাকার সময় আছে?

— তাহলে?

— তাহলে আর কি? — পড়ি কি মরি করে তিনি চলে এলেন ঢাকায় তাঁর সামরিক-বেসামরিক পরামর্শ দাতাদের নিয়ে। শুরু হলো 'ইয়াহিয়া-মুজিব' আলোচনা। আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে যোগ দিলেন পাকিস্তানের পিপলস পার্টির প্রধান, মানে বেনজির ভুট্টোর বাবা জুলফিকার আলী ভুট্টো।

— তারপর আলোচনায় হলোটা কি তাই বলো না।

—২৩শে মার্চ পর্যন্ত 'মুজিব-ইয়াহিয়া' আলোচনা মোটামুটি চললো। কিন্তু ২৫শে মার্চ বোঝা গেলো ইয়াহিয়া মুজিবের দাবী মানতে রাজী নন। এর মধ্যে রটে গেলো বিমানে ও জাহাজে করে ইয়াহিয়াখাঁ পূর্ব পাকিস্তানের বেয়াদব বাঙালীদের শায়েস্তা করতে হাজার হাজার সৈন্য আর ইয়া বড়ো বড়ো কামান আনছেন।

— সর্বনাশ, তাহলে যুদ্ধ বেধে গেলো দেখছি।

— দাঁড়ান, দাঁড়ান আরেকটু ধৈর্য ধরুন। তারপর কি হলো জানেন, পাকিস্তানের জাঁদরেল প্রেসিডেন্ট আলোচনা ভেস্তে দিয়ে ঢাকা থেকে করাচী চলে গেলেন বেয়াদব-বিদ্রোহী বাঙালীদের ওপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে। আর এদিকে 'জয় বাঙলা' ধ্বনি দিয়ে মুজিবর রহমানের ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ির সামনে একেরপর এক মিছিল আসতে লাগলো। মুজিব মিছিলের নেতাদের সঙ্গে কথা বললেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে বড্ড ক্লান্ত ও চিন্তিত দেখাচ্ছিলো তখন। মনে হচ্ছিলো মুজিব-সমুদ্রে বিরাট ঝড় আছড়ে পড়বে।

— তারপর কী হলো? অ্যারেস্ট করলো মুজিবকে ইয়াহিয়ার লোকেরা?

— শুনুন না, সম্ভবতঃ ২৫শে মার্চ রাত্রে মুজিবর রহমানের বাড়ির চারদিককার আকাশ আতস বাজির নীল আলোয় হঠাৎ করে আলোকিত হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিলো হাজার হাজার আতস বাজি এক সঙ্গে পুড়ছে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ওপর।

— মানে?' কাকা বীরকুমার তাঁর কৌতূহল আর রাখতে পারছিলেন না।

— মানে আর কী? বঙ্গবন্ধুকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবার সময় নাকি ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর লোকেরা দানবীয় উল্লাস ধ্বনি করতে করতে আতসবাজির মতো ওই আলোকরশ্মি ফুটিয়ে সেনাবাহিনীর সকলকে জানিয়ে দিলো যে তারা মুজিবর রহমানকে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়েছে।

— দারুণ ব্যাপার তো?

— এটা নাকি যুদ্ধক্ষেত্রের নীতি। বিজয়ী বাহিনী কোথাও বিরাট ভাবে জয়ী হলে নাকি এধরনের সিগন্যাল দেখিয়ে থাকে।

— রাতের অন্ধকারে একেবারে কাপুরুষের মতো মুজিবর রহমানকে ধরে নিয়ে গেলো।' কাকা শ্বশুরের গলায় আফসোসের সুর।

— তারপর কি হলো জানেন? ২৫শে মার্চের রাত পোহাতে না পোহাতেই কারফু জারী করলো সারা ঢাকা শহরে ইয়াহিয়ার দানবীয় সেনাবাহিনী। চারদিকে গোলাগুলী পড়তে লাগলো মুহুর্মুহুঃ।

রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেলো, রাস্তায় বেরুলেই গুলী করা হবে।

— তাতো বুঝলাম, এখন মুজিবর রহমানের বৌ-ছেলেমেয়ের কি হলো শুনি?

— মুজিবকে ধরে নিয়ে যাবার পর পরে মুজিবের বড়ো ছেলে কামাল দেয়াল টপকে কোনোরকমে পালালো। আর মুজিবের স্ত্রী তাঁর আর দু'ছেলে জামাল ও রাসেলকে নিয়ে পালিয়ে পাশের মোশারফ সাহেবের বাড়ির নিচের তলায় এসে কোনোরকমে আত্মরক্ষা করলেন। আর সেখান থেকে মুজিবর রহমানের পরিবারের সুখ-দুঃখের সাথী মমিনুল হক খোকা তাঁদেরকে নিয়ে তাঁর শ্বশুর বাড়ি উয়ারিতে নিয়ে গেলেন।

— তারপর ?

— তারপর আর কি। সেনাবাহিনীর লোকেরা বেছে বেছে আওয়ামী লীগের নেতাদের গুলি করে মারতে শুরু করলো। ২৬শে মার্চ সকালে ইয়াহিয়ার হায়েনার দল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামালার প্রধান আসামী কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে তাঁর পরিবারের সকলের সামনে গুলি করে মেরে ফেললো। তারপর তারা গেলো ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে। সেখানে ছাত্রদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করলো।

— 'ওঃ কি ভয়ঙ্কর'। আমার কাকা শ্বশুর দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকলেন তাঁর। আমার জ্যাঠাশ্বশুর নরেন্দ্র দেববর্মা শুয়ে শুয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে আমার কথা শুনছিলেন। তিনিও উঠে বসলেন, ইকবাল ও জগন্নাথ হলের ছাত্রদের খুনের কথা শুনে।

— এই অবস্থায় বাঙলাদেশের লোকেরা করলোটা কি?

— করবে আর কী? ২৬শে মার্চের পর থেকে বাঙলাদেশের অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগলো। সেনাবাহিনীর লোক সমস্ত জেলা শহরে গিয়ে গুলি চালাতে লাগলো। ঠিক এভাবে ক'দিন চলার পর এপ্রিল মাসের এক-দু তারিখ থেকে কী হিন্দু কী মুসলমান যে যেভাবে পারে ভারতে ঢুকে পড়তে শুরু করলো।

— আমাদের ত্রিপুরায় কবে থেকে শরণার্থী আসতে শুরু করলো তাহলে?

— আগরতলায় শরণার্থী এলো, মানে রাজনৈতিক শরণার্থী বলতে পারেন, এপ্রিলের ঠিক দু তারিখে । আর সে এক নাটকীয় ঘটনা। আর এই ঘটনায় আমাদের সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য জড়িয়ে পড়লেন আষ্টেপৃষ্টে জয়বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামে।

— কেমন?

— বলছি, শুনুন। এপ্রিলের দু'তারিখে টয়েটা কারে জয়বাঙলার পতাকা উড়িয়ে ফেনী ও বিলোনীয়া হয়ে ঠিক সন্ধ্যে সাতটার সময় সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের স্ত্রী সুনন্দা ভট্টাচার্যের মেলারমাঠের সরকারী বাসভবনে এলেন নোয়াখালি জেলার চৌমুহনীর এম পি মালেক উকিল, আওয়ামী লীগের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী চাঁদপুরের এম পি মিজানুর রহমান চৌধুরী, নোয়াখালির আরেক এম পি নুরুল হক, আওয়ামী লীগের ট্রেজারার মহসীন সাহেব আর চাঁদপুরের ছাত্রলীগ নেতা মুনীর আহমেদ সহ পঞ্চাশ-ষাট জনের মতো রাজনৈতিক নেতা।

— বলো কি !' কাকাশ্বশুরের গলায় রীতিমতো বিস্ময়ের সুর।

— ঠিক তাই। তাঁরা অনিলবাবুর সঙ্গে দেখা করে পরিচয় দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যার রোমহর্ষক সব বিবরণ দিয়ে বললেন, সাংবাদিক হিসেবে আপনার নাম আমরা খুব শুনেছি, আপনার কাছে আশ্রয় চাই, আমাদের মুক্তি যুদ্ধে আপনার সহযোগিতা খুব দরকার, আপনি আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। ক'দিন ধরে তেমন দানা-পানি পেটে পড়েনি আমাদের।

— এই কথা শুনে অনিলবাবু কি করলেন?

— করবেন আর কী, তাঁর বাজখাঁই গলায় ডাকলেন সুনন্দা দেবীকে । তিনি আসতেই বললেন, দ্যাখো কারা এসেছেন, এঁরা সব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নেতা। এঁদের খাওয়া-দাওয়া হয়নি, আগে চা-টোস্ট করে খাওয়াও।

আমি আমার শ্বশুরদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁরা এত রাতে গোগ্রাসে গিলতে চাইছেন আমার কথা। আমি বললাম, 'তারপর কি হলো জানেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রচার হয়ে গেলো সারা আগরতলায় সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের বাড়ি শেখ মুজিবর রহমান এসেছেন। পশ্চিম কোতওয়ালী থানা থেকে ও সি'র ফোনও এলো।' আমার কথা শুনে কাকা বীরকুমার সোৎসাবে বলে উঠলেন, দারুণ জমেছে তো।

— দারুণই বলতে পারেন। রাত আটটার মধ্যে অনিল ভট্টাচার্যের বাড়ি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক শরণার্থীরা পুরোপুরি দখল করে নিলেন বলতে পারেন। আর ঠিক রাত ন'টায় চট্টগ্রামের পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য জহুর আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে বাহান্ন জন রাজনৈতিক নেতার উপস্থিতিতে এক জরুরী মিটিং হলো। ওই ঐতিহাসিক মিটিঙে পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যার বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব পাশ করা হলো। এবং পি টি আই-এর মাধ্যমে তখনকার জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ. থান্টের কাছে বার্তা পাঠানো হলো Stop this genocide– এই গণহত্যা বন্ধ করুন। আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তাঁর কপি পাঠানো হলো।

— 'তাহলে তো দেখছি সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের বাসায় বসে একটা ঐতিহাসিক দলিলই তৈরী হলো।' বললেন আমার জ্যাঠাশ্বশুর।

— দলিল ও ঐতিহাসিক, বাসাটাও ঐতিহাসিক। জানেন জ্যাঠা, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হবার পরে অনিল ভট্টাচার্যের ওই বাসাকে শেখ মুজিব বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক বাড়িতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি।

— 'মুজিবর রহমান বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই তা হতো' কাকাশ্বশুর বললেন।

— হ্যাঁ, আগরতলার মেলার মাঠে আমরা পেয়ে যেতাম বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক এক বিরাট বাড়ি। জানেন, কাকা, অনিলবাবু চেয়েছিলেন ওই বাড়িতে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটা মূল্যবান সংগ্রহশালা করতে। যেখানে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার ভূমিকার গৌরবগাঁথা বিভিন্নভাবে সাজিয়ে সংরক্ষণ করে রাখা হতো দর্শকদের জন্যে। আর আগরতলা হতো বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের দ্বিতীয় তীর্থক্ষেত্র।

— আচ্ছা, ওই যে তুমি বললে, পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা সব অনিলবাবুর বাড়ি দখল করে ফেললো, তা তারা এত লোক থাকলো কোথায়?

— অনিলবাবু তাঁদেরকে মেলার মাঠের এম. এল এ হোস্টেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এদিকে কি হলো জানেন, ওই দোসরা এপ্রিলেই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের দু'জন এম পি এসে হাজির।

— কারা তাঁরা?

— তাঁরা হলেন এম আর সিদ্দিকী আর অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক। সিরাজুল হক আবার কসবার এম পি।

— তা শচীন সিং তাঁদের পেয়ে কি করলেন?

— কী আর করবেন, তাঁদের নিয়ে দিল্লী চলে গেলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে। কিন্তু

ভাগ্যের কি পরিহাস জানেন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন শচীন সিংহের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে দারুণ মতপার্থক্য দেখা দেয়।

— আমাদের শচীন সিং তাহলে তো কম বেটা নয়। বাব্বা, ইন্দিরা গান্ধীর মতো বেটীর সঙ্গে লাগতে গেলেন তিনি।

— তাতে ফল কি হলো জানেন ?

— কি হলো?

— ইন্দিরা গান্ধী শচীন সিংকে সরিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে।

— তা যাই বলো, বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের শচীন সিংহের ভূমিকা কম ছিলো না।

— আমার কি মনে হয় জানেন, বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ত্রিপুরা পর্ব সত্যি সত্যি যদি একদিন লেখা হয়, তাহলে শচীন সিং আর সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের ভূমিকার কথা সোনার অক্ষরে জ্বল জ্বল করবে।

— আচ্ছা, বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম যত দিন চলেছিলো, ততদিন নিশ্চয়ই অনিল ভট্টাচার্যের বাড়ি ভর্তি হয়ে থাকতো রাজনৈতিক শরণার্থীতে।

— ভর্তি হয়ে থাকতো মানে। জিয়াযুর রহমান, খালেদ মোশারফ, মেজর সফি উল্লাহ, ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া, তাজউদ্দিনের স্ত্রী জোহরা বেগম সকলই থাকতেন আসর আলো করে। তারপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হতেই যে যার দায়িত্ব নিয়ে ফ্রন্টে চলে যান।

—আচ্ছা, বলো দেখি, তখন যে মুজিবনগর বলতো, সেই জায়গাটা কোথায় ?

— কোথায় আর হবে, আগরতলায়।

— আর তার হেড কোয়ার্টার বোধহয় ছিলো মেলারমাঠ অনিল ভট্টাচার্যের বাসায়, কি বলো?

—আমি কাকা শ্বশুরের কথা শুনে একটু মুচকি হাসলাম। তারপর বললাম, জানেন, এখনো অনিলবাবু বাঙলাদেশ গেলে জোহরা বেগমের মেয়ে অনিলবাবুকে চাচা চাচা বলে অস্থির করে তোলে।

— সে তো করবেই। অনিলবাবু তাদের জন্যে এত করেছেন।

— একটা কথা শুনলে তো আপনারা অবাক হয়ে যাবেন।

— কি কথা, বলে ফেলো।

— শেখ মুজিবের মেজো ছেলে জামাল অনিলবাবুর বাসা থেকেই দেরাদুনে মিলিটারী ট্রেনিঙে চলে যায়। অনিলবাবুর স্ত্রী সুনন্দা দেবী জামালকে নিজের ছেলের মতো দেখতেন। জামালকে যখন তিনি বিদায় দেন, তখন মনে হচ্ছিলো নিজের ছেলেকেই মিলিটারী অ্যাকাডেমীতে পাঠাচ্ছেন।

— আচ্ছা, সুনন্দা দেবীর খুব খাটাখাটুনি গেছে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাই না?

— খাটাখাটুনি মানে, রোজ শত শত কাপ চা করতে হতো তাঁকে। লুচি-পরোটা সবসময় তৈরী রাখতে হতো মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে। কে যে কখন খাবে তার ঠিক নেই। সুনন্দা ভট্টাচার্য হয়ে গিয়েছিলেন তখন মুক্তিসংগ্রামের কমন ভাবী। তবে কম বয়েসের ছেলেমেয়েরা তাঁকে ডাকতো চাচী বলে। এভাবেই কেটে গেছে মুক্তিযুদ্ধের ন'নটা মাস। অনিল ভট্টাচার্য-সুনন্দা ভট্টাচার্য এই দুটো নাম বাঙলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা কখনোই ভুলতে পারেনি।

—'এবার তোমাকে একটা প্রশ্ন করি' কাকা বীরকুমার বলেন, 'বলোতো বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার পর অনিল ভট্টাচার্য যখন বাঙলাদেশে যান, তখন মুক্তিযোদ্ধারা বা সেদেশের রাষ্ট্রনেতারা তাঁর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন?'

— সে কথা আর বলবেন না। অনিলবাবু উঠেছিলেন একটা হোটেলে। সেখান থেকে তিনি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে যান তাঁর সরকারী অফিসে। পরিচয় দিতেই তিনি আবেগে অনিলবাবুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, ভাইগনা তুমি আইছো।

— তারপর!

— তারপর বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রেস সেক্রেটারী তোয়াব খানকে ডেকে বললেন, অনিল এলেই এবার থেকে আমার বাড়িতে নিয়ে রাখবে কোনো হোটেলে নয়, কোনো সরকারী বাসভবনে নয়। অনিল আমার ভাইগনা, সে মুক্তিযুদ্ধের সময় যা করছে; তার ঋণ শোধ করা যাইবো না।

— ওঃ বঙ্গবন্ধু সত্যিই মহৎ। ত্রিপুরার একজন সাংবাদিককে তিনি যেভাবে সম্মান দিলেন, তা ভাবাই যায় না।

এরপর বঙ্গবন্ধু অনিলবাবুকে তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চিলে কোঠায় একান্তে বসে বললেন, ভাইগনা, তুমি কী চাও আমার কাছে। মিসেস গান্ধীকে বইল্যা তোমারে আমি তোমার পছন্দমতো যেকোনো পদে বআইতে পারি। কও, ভাইগনা, কি তোমার মনের কথা।

— তখন অনিলবাবু কী বললেন? কাকাশ্বশুরের কৌতূহল আর ধরে না।

— অনিলবাবু কী বললেন জানেন?

— কী বললেন ?

— বললেন, বঙ্গবন্ধু আমি কিচ্ছু চাই না, নিজের জন্যে, শুধু চাই, আগরতলায় একটা ভিসা অফিস, বাঙলাদেশের ভিসা অফিস। আমাদের ত্রিপুরার লোকেদের খুব অসুবিধা হয় বাঙলাদেশে যেতে। সকলে কলকাতার ভিসা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে না।

— তুমি নিজের জন্যে কিচ্ছু চাওনা ভাইগনা, শুধু একটা ভিসা অফিস চাও আগবতলায়। ঠিক আছে, খুব তাড়াতাড়ি আগরতলায় আমি ভিসা অফিসের অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি, তুমি বাড়ি দ্যাখো।

— তারপর আর কি? ভিসা অফিস হয়ে গেলো আগরতলায় ক'মাসের মধ্যে। এখন যেখানে রয়েল গেষ্ট হাউসের গলিতে কেয়াব এণ্ড কিওর নার্সিং হোম, মানে ধ্রুব কর্তার বাড়ির সামনের বাড়িটার কথা বলছি, সেখানেই প্রথম হলো বাঙলাদেশের ভিসা অফিস। আর প্রথম ভিসা অফিসার হলেন শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাহেদুর রহমান।

— যাই বলো, জামাই, সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের মতো লোক হয় না। নিজের জন্যে কিছুই চাইলেন না বঙ্গবন্ধুর কাছে, শুধু চাইলেন ভিসা অফিস ত্রিপুরার লোকেদের সুবিধার জন্যে, এমন লোক ত্রিপুরার গর্ব।

— সে তো ঠিকই। সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য ত্রিপুরার গর্ব। এখনো তিনি আমাদের সামনে আছেন। কিন্তু যিনি সারা পৃথিবীর গর্ব। তিনি চিরবিদায় নিলেন ঘাতকের গুলিতে। এ শোক ভোলার নয়।

— আচ্ছা, জামাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, মুজিবকে মারলো কারা, এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড করলো কী করে ?

— জানেন, বার্ড (BARD)-এর কুমিল্লার অফিসে বসে মুজিব হত্যার প্ল্যান তৈরী হয়।

— বলো কী ?

—ঠিক তাই। তখন বার্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন মাহবুব আলম চাষী। মুজিব সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মুস্তাক, বাংলাদেশের তখনকার তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী তাহেরউদ্দীন ঠাকুর ও মাহবুব আলম চাষী এই তিনজন মিলিতভাবে বার্ডের অফিসে বসে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।

— আচ্ছা, মুজিব কি এই হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা আঁচ করতে পারেননি?

— মুজিব কোনোদিন ভাবতেই পারেননি যে বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু যতদূর শোনা যায়, বাংলাদেশের গোয়েন্দা বিভাগ মুজিবকে সতর্ক করে দিয়েছিলো। আর তিনি সে-সব কথা অট্টহাসিতে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এতো আত্মবিশ্বাসী ছিলেন মুজিব।

— সব তো বুঝলাম। বাংলাদেশের গোয়েন্দা বিভাগের কথা না হয় মুজিব উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু এতো বড়ো একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, তার কোনো খবর কি ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের কাছে ছিলো না। কুমিল্লার বার্ডের অফিসে বসে পৃথিবীর সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের হত্যার জঘন্য পরিকল্পনা হলো, অথচ সে-খবর সীমান্ত পেরিয়ে আগরতলায় পৌঁছলো না, সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের সোর্সও ফেল করলো, এটা কী করে হতে পারে!

— তবে শুনুন, আমি মুজিব হত্যার দিন কলকাতায় ২০৮, বহুবাজারের সি পি আই অফিসে ছিলাম। হঠাৎ বিকেলের দিকে সেখানে এসে হাজির হলেন বিশ্বশান্তি সংসদের সভাপতি রমেশ চন্দ্র। তখন তাঁর উপস্থিতিতে সি পি আই অফিসে একটা শোকসভা হয়। আর ওই শোকসভায় রমেশ চন্দ্র মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে এমন কতকগুলো কথা বলেন........।

— 'কী, কী বলেছিলেন রমেশচন্দ্র?' কাকা শ্বশুরের গলা যেন শুকিয়ে কাঠ।

— তিনি বলেছিলেন, মুজিব হত্যার মাত্র ক'দিন আগে তিনি ঢাকায় মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বিশ্বশান্তি নিয়ে কথাবার্তা বলতে। ঢাকার বিমানবন্দরে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন বিশ্বশান্তি সংসদের সভাপতিকে রিসিভ করতে। গাড়িতে মুজিবের পাশে রমেশ চন্দ্র। গাড়ি এগিয়ে চলেছে মুজিবের ধানমন্ডির বাড়ির দিকে। তখন মুজিবকে একান্তে পেয়ে ওই চলন্ত গাড়িতে ইংরিজিতে তিনি মুজিবের সম্ভাব্য বিপদের কথা বলেছিলেন এবং তাঁকে সাবধানে থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তখন মুজিব হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে ভালোবাসে, কাজেই চিন্তার কোনো কারণ নেই।

-- বলো কী! বিশ্বশান্তি সংসদের সভাপতির সতর্কবাণীও তিনি অগ্রাহ্য করলেন। আমার কী মনে হয় জানো, জামাই, বিশ্বশান্তি সংসদের সভাপতি রমেশচন্দ্র বোধ হয় ভারত সরকারের হয়ে মুজিবের বিপদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে গিয়েছিলেন।

— আপনি ঠিক বলেছেন কাকা, রমেশচন্দ্রের কথাবার্তা থেকে কিন্তু আমারও ওইরকম মনে হয়েছিলো তখন।

— আচ্ছা, মুজিবের হত্যাকান্ডের খবর এসে আগরতলায় পৌঁছনোর পর সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য কী করলেন, তখন তাঁর অবস্থা বোধ হয় খুবই খারাপ ছিলো, তাই না?

— মুজিব হত্যার খবর আগরতলায় এসে পৌঁছতেই অনিলবাবু পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগলেন সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্যে। ঠিক ওইদিন সকালে তাঁব স্ত্রী সুনন্দা ভট্টাচার্যের প্রসব যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় তাঁকে ভর্তি করে দিয়েছেন হাসপাতালে। তারপর মুজিব হত্যার খবর শুনেই সেই যে তিনি উধাও হলেন দুপুর পর্যন্ত খবর নেই। একবার ছুটছেন বিএস এফ-এর অফিসারদের কাছে, আরেকবার ছুটে যাচ্ছেন আখাউড়া রোডের কাস্টম অফিসে বি ডি আর-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে, কখনো ছুটছেন বাংলাদেশের ভিসা অফিসে, কিন্তু কোনো সোর্স থেকেই মুজিব হত্যার খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করতে পারছেন না। আর, অনবরত তাঁর মেলারমাঠের সেই ঐতিহাসিক বাসায় সরকারী অফিস থেকে ফোনের পর ফোন আসছে। মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত লোক পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে গেছেন তাঁকে বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর জানতে। কিন্তু অনিলবাবু বেশী কিছু বলতে পারছেন না। তবু সুখময়বাবু তাঁকে পীড়াপীড়ি করেই চলেছেন। ঠিক এমন সময় খবর এলো অনিলবাবুর ছেলে হয়েছে।

ওই অবস্থায় ছুটলেন ভি এম হাসপাতালে। গিয়ে দাঁড়ালেন স্ত্রীর পাশে। পরপর দু' মেয়ের পর অনেক বছর পরে ছেলে হয়েছে। অনিলবাবুর আনন্দ হবারই কথা। কিন্তু অনিলবাবুর গোমড়া মুখ দেখে সুনন্দা দেবী তো অবাক। লোকটার এমন অবস্থা কেন? পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অনিলবাবুদের পারিবারিক বন্ধু ডাঃ সুজিৎ দে। অনিলবাবুর এমন বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে তিনিও জিজ্ঞেস তকরলেন, কী ব্যাপার আপনার? তখন মুখ খুললেন তিনি। জানেন, ডাঃ দে, সর্বনাশ হয়ে গেছে !

—সর্বনাশ, কিসের সর্বনাশ?

— মুজিবর রহমান খুন হয়েছেন।

— মুজিবর রহমান, বঙ্গবন্ধু খুন হয়েছেন !

মুজিবর রহমানের খুনের খবর শুনেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন সুনন্দা দেবী। কিছুতেই তাঁর কান্না আর থামানো যাচ্ছে না। ডাঃ দে তাঁকে প্রবোধ দিলেন। আর ওই অবস্থায় কাঁদতে বারণ করলেন। তারপর পরে খবর নিয়ে জানা গেলো অনিলবাবুর ছেলে বাবুজীর জন্ম হয়েছে মুজিব হত্যার ঠিক বত্রিশ মিনিট পর।

— তারপর কী হলো? অনিলবাবু মুজিব হত্যার খুঁটিনাটি কোনো খবর নিতে পারছেন না '?

— খুব চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সীমান্ত ভেদ করে কোনো বাড়তি খবর কিছুতেই আসছে না। এভাবে পনেরো তারিখ গেলো, ষোলো তারিখও গেলো, সতেরো তারিখে একটা আশার আলো দেখতে পেলেন অনিলবাবু।

— 'কেমন !'

— মুজিব হত্যার ঠিক আগের দিন গৌহাটী হাইকোর্টের জজ ডি এম সেন গিয়েছিলেন ঢাকায়। ছিলেন ঢাকার ভারতের হাই কমিশনারের অফিসে অতীশ সিনহার আতিথ্যে। তিনি সতেরো তারিখে এসে উঠলেন আগরতলার সার্কিট হাউসে। খবর পেয়ে অনিল ভট্টাচার্য ছুটলেন তাঁর কাছে। কিন্তু তিনি মুজিব হত্যা সম্পর্কে মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন। অনিলবাবু তখন জজ সাহেবের পা জড়িয়ে ধরলেন। স্যার, সারাদেশের লোক জানতে চাইছে। কলকাতা, দিল্লী থেকে শুধু ফোন আসছে আমার কাছে। কিন্তু কোনো খবর দিতে পারছি না। আপনি নিশ্চয়ই সব শুনে এসেছেন, আপনাকে কিছু বলতেই হবে।

— তারপর'?

— জানেন, কিছুতেই জজ সাহেবের কাছ থেকে খবর নিতে পারলেন না অনিলবাবু।

— সাংঘাতিক শক্ত লোক তো ওই জজ সাহেব।

— বুঝলেন না, জজ তো। তাছাড়া, ভারত সরকারের অনুমতিরও বোধ হয় আইনী প্রয়োজন ছিলো।

— তাহলে কী করলেন এতোবড়ো সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য '?

— অনিলবাবুও ছাড়ার পাত্র নন। এবার তিনি ছুটে গেলেন ডি এম অজয় সিনহার কাছে। তাঁকে অনুরোধ করলেন জজ সাহেবের কাছে যাবার জন্যে। আর অন্যদিকে আগরতলা বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মনোরঞ্জন চৌধুরীকেও ফিট করলেন এ কাজে। তাঁকেও পাঠালেন গৌহাটী হাইকোর্টের জাঁদরেল জজ সাহেবের কাছে।

— তাতে কোনো কাজ কি হলো শেষ পর্যন্ত?

— হলো না মানে? যার নাম অনিল ভট্টাচার্য, সংবাদ সংগ্রহের জাদুকর।

— কী হলো তাই বলে ফেলো না।

— ডি এম অজয় সিনহা আর বার এসোসিয়েশনের সভাপতি মনোরঞ্জন চৌধুরী ঠিকই জজ সাহেবের কাছ থেকে মুজিবকে খুন করার রোমহর্ষক সব খবর বের করে নিতে পারলেন। তাঁদের সঙ্গে আবার বসলেন অনিলবাবু। কয়েক পাতার রিপোর্ট লিখে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ....।

— কিন্তু কি ?

— তখন চলছে ইমারজেন্সি, বুঝলেন, সব খবর সেনসরড্ করে খবরের কাগজে পাঠাতেই হয়।

— তা হলে ?

— অনিল ভট্টাচার্য সেই রিপোর্ট নিয়ে ছুটলেন আগরতলার পাব্লিসিটি অফিসে। কে পি দত্ত তখন পাব্লিসিটির ডাইরেক্টর। তা বুঝলেন, তিনি করলেন কী, সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের লেখা ওই রিপোর্ট ষাট শতাংশ ছেটে দিলেন।

— তারপর!

— তারপর সেই রিপোর্টের কপি নিয়ে অনিলবাবু ছুটলেন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তর বাড়ি। তাঁর তখন বুক ধড়ফড় করতে শুরু করেছে। এতো কষ্টকরে বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর সংগ্রহ করলেন, সারা দুনিয়াকে জানাতে হবে এ-খবর, আর নিজেদের আপনজন কিনা ইমারজেন্সির নাম করে সেই ঐতিহাসিক রিপোর্ট কেটে-ছেটে তছনছ করে দিলেন!

— তা মুখ্যমন্ত্রী তখন করলেনটা কী?

— সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডেকে পাঠালেন কে পি দত্তকে। আর, টেলিফোন করে ডেকে আনলেন সেক্রেটারিয়েট অফিস থেকে অমর সিংকে। অমর সিং বোধহয় তখন ত্রিপুরা সরকারের অ্যাডিশনাল চীফ সেক্রেটারী।

— দারুণ জমেছে তো ব্যাপারটা।

— শুনুন, তারপর কী হলো। অনিলবাবু তাঁর রিপোর্ট পড়তে বললেন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত। অনিলবাবু পড়া শেষ করতেই মুখ্যমন্ত্রী অমর সিংয়ের দিকে তাকালেন। সিং সাহেব সেই রিপোর্টই সামান্য একটু সংশোধন করতে বললেন। কিন্তু বাদ সাধলেন দত্ত সাহেব। তিনি নানারকম খুঁটিনাটি প্রশ্ন তুলতেই মুখ্যমন্ত্রী একটু রুষ্ট হলেন তাঁর ওপর। শেষে অনিলবাবুর সঙ্গে বসে দত্ত সাহেব ইমারজেন্সির সেনসরশিপের দাওয়াই অনেকটা কমিয়ে দিয়ে মুজিব হত্যার সেই সাড়া জাগানো রিপোর্ট ও-কে করে দিলেন।

— ওঃ, সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য বোধহয় পুনর্জন্ম পেলেন, কী বলো জামাই?

— আর বলবেন না। বাসায় ফিরেই সেই রিপোর্ট তিনি পাঠালেন যুগান্তর ও অমৃতবাজারে। আর সেখান থেকেই সেখ মুজিব হত্যার আদ্যপান্ত খবর ছড়িয়ে পড়লো সারা পৃথিবীতে।

— দেখছি, সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যই প্রথম সাংবাদিক যিনি বঙ্গবন্ধু হত্যার খুঁটিনাটি খবর পাঠাতে পেরেছিলেন সারা দুনিয়ায়।

— ঠিক তাই। তারপর কি হলো জানেন?

—বলো।

— সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লো আমাদের ত্রিপুরার সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের নাম। সারা ভারতবর্ষের সংবাদপত্র যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রিপোর্ট একটু এদিক-ওদিক করে ছাপলো। অনিলবাবু কীভাবে ওই রোমহর্ষক খবর সংগ্রহ করলেন তা নিয়ে সাংবাদিক মহলে বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্প তৈরী হতো লাগলো।

— তা হলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের ত্রিপুরার সাংবাদিক হিরো হয়ে গেলেন সাংবাদিক দুনিয়ায়।

— জানেন কাকা, এই ঘটনার দু'দিন পরে কমরেড মোহন চৌধুরীর সঙ্গে আমি গেলাম অনিলবাবুর মেলারমাঠের বাসায়। আমাদের দেখেই অনিলবাবু বললেন, মোহনদা, আমার কাছে খবর এসেছে, মুজিবর রহমানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন সোনামোড়ার যাত্রাপুর দিয়ে ভারতে ঢুকছেন। একবার যদি আপনারা যান, তবে এসব খবর পেয়ে যাবেন।

— তারপর তোমরা কী করলে, গেলে সোনামোড়ায়?

— যাবো না মানে। মোহনদা আমাকে নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়লেন। যাত্রাপুর বাজারে পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের রাত সাতটা বেজে গেলো। একটা দোকানে ঢুকে চা খেতে খেতে শুনলাম মুজিবের বাবাও নাকি সীমান্ত পেরিয়ে আজই এসেছেন মির্জা দিয়ে। আমরা খানিকটা ঘাপটি মেরে সব শুনতে লাগলাম। এর মধ্যে যাত্রাপুরের প্রধান মরণ ঘোষের নাম তাঁরা উল্লেখ করতে লাগলেন বারবার। মোহনদা চা খেয়ে বেরিয়ে এসেই আমাকে বললেন, চলো কুমুদ, প্রধান মরণ ঘোষের বাড়িতেই যাই। ভদ্রলোক আমার চেনা। রাতটা তাঁর ওখানে কাটিয়ে দিয়ে যতোটা পারি খবর নেবার চেষ্টা করি।

— তারপর?

— তারপর রাত আটটা নাগাদ পৌঁছলাম আমরা মরণ ঘোষ মশায়ের বাড়ি। মোহনদাকে দেখে মরণবাবু তো অবাক। এতো রাত্রে মোহন কমরেড! আমাদেরকে তাঁর সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বসতে দিলেন তিনি। ড্রয়িংরুমের চাকচিক্য দেখে আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম। প্রথমে মুখ খুললেন যাত্রাপুরের প্রধান মরণ ঘোষ ঃ — জানেন মোহনদা, আজ আমার বাড়িতে বি ডি ও কে নিয়ে একটা মিটিং ছিলো, তাই এ্যাতো সাজগোজ দেখছেন। কিছুক্ষণ পর মোহনদা আমাকে রেখে মরণবাবুকে নিয়ে অন্য ঘরে গেলেন কথাবার্তা বলতে। ওঁরা দু'জনে চলে যেতে আমার কেমন যেন একটু সন্দেহ হলো। মন বলে উঠলো, এ পথেই, এ-পথেই।

— কুমুদ, এবার চলো আমরা খেয়ে নিই। কাল সকালে সোনামোড়ায় গিয়ে সুবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ি উঠবো। সেখানেও কিছু.....। বলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন তিনি।

— তার মানে শিকার মিলেছে বোধ হয়? কাকাশ্বশুরের কৌতূহল বাড়ে।

— তারপর শুনুন, ড্রয়িংরুমে আমাদের খাবার এলো। খাবার দেখে তো আমরা অবাক। পোলাও, মুরগীর মাংস, বড়োমাছের দাগা, চাটনি, মিষ্টি, পান সব কিছু।

— তার মানে একটা ভোজই দিয়েছেন প্রধান মরণ ঘোষ।

— কিন্তু এই ভোজ খেয়েছেন কারা?

—বুঝতে পারছো না কারা?

কাকার ইঙ্গিতে হেসে ফেললাম আমি।

পরের দিন সকালে প্রধান মরণ ঘোষের বাড়ি থেকে সকালের চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা সোনামোড়ার দিকে। বেলা দশটা নাগাদ আমরা পৌঁছলাম সোনামোড়া কোর্টের উকিল সুবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ি। মোহনদাকে দেখে সুবোধবাবু ও তাঁর স্ত্রীর আনন্দ আর ধরে না। আমারও পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। তাড়াতাড়ি বাজারে লোক পাঠালেন সুবোধবাবু। বুঝলেন, তারপর একটা ঘটনা ঘটলো অপ্রত্যাশিতভাবে।

— কেমন?

মোহন চৌধুরী সি পি এম নেতা সমর চৌধুরীর কথা তুলতেই একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন সুবোধ গাঙ্গুলী ঃ — আর তার কথা আর তুলবেন না মোহনবাবু। তার কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে যায় আমাদের। বীরচন্দ্র দেববর্মা আর আপনি তাকে আমার এখানে থাকার ব্যবস্থা করেদিলেন। শেষ

পর্যন্ত কী ব্যবহারটা না করলো সে আমাদের সঙ্গে, ছিঃ ছিঃ।

— 'জানেন মোহনদা', সুবোধবাবুর স্ত্রী বললেন, সমরকে ছেলের মতো দেখতাম আমরা। এই হাতের ওপর জ্বরে বমি পর্যন্ত করেছে সে। সেই সমর কী যে হয়ে গেলো! খুব দাগা দিয়েছে সে আমাদের মনে।

— 'খুনাকা, হর থুক্‌কা বেলে, মাই চাফাইদি। মাই খুরবাইখা।'

(শুনছো, রাত বেশ হয়েছে, ভাত খেতে এসো। ভাত বাড়া হয়েছে)

— আমার স্ত্রী তাঁর বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় ডাকতেই উঠে পড়লাম আমরা। কর্তার ঘড়িতে তখন রাত বারোটা বাজলো ঢঙ ঢঙ করে। আমি আমার শ্বশুরদ্বয়কে হাসতে হাসতে বললাম ঃ জানেন, কবি বলেছেন ঃ

'মরণে হবে না সাথী,
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি।'

১৬ই সেপ্টেম্বর ,১৯৯৯, বৃহস্পতিবার । সারাদিনই 'সবুজ আন্দামান' এর পুজো সংখ্যার জন্যে 'সবুজ ত্রিপুরার ককবরক প্রবাদ' লেখার কাজে ব্যাপৃত ছিলাম । সন্ধ্যে বেলায় আমার শ্যালক সুনীল তার বৌকে নিয়ে বেড়াতে এলো । তার বৌয়ের পিঠে ডাব পড়েছে । আমার বাসার নিচে থাকেন ডাঃ গৌতম বসু । তাঁকে দেখিয়ে দিলাম । তারপর দর্পণে গেলাম । সেখান থেকে ফিরে আবার লেখার কাজে বসলাম । চললো রাত ১০ টা পর্যন্ত ।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, শুক্রবার । বিশ্বকর্মা পুজো । প্রাতর্ভ্রমণ সেরে আন্দামানের লেখাটা নিয়ে বসলাম । দুপুরে স্ত্রীর সঙ্গে দর্পণ সম্পাদক সমীরণ রায়ের বাড়ি গেলাম নিমন্ত্রণ খেতে এবং বিকেলে বড় মেয়ে তানিয়াকে নিয়ে গেলাম নিমন্ত্রণ খেতে অক্ষর প্রকাশনীর বাড়ি ।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, শনিবার। অধ্যাপক অমিতাভ সিন্‌হা এলেন 'অমর্ত্য সেন'-এর ওপর একটা লেখা নিয়ে । তাঁকে সঙ্গে কোরে ত্রিপুরা দর্পণে গেলাম এবং সম্পাদক লেখাটি পূজা সংখ্যায় ছাপাবেন বললেন ।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, রোববার। আজ ছিলো বামফ্রন্টের নির্বাচনী জনসভা । হরকিষান সিং সুরজিৎ, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন । ডঃ পি.কে. হালদার ত্রিপুরা দর্পণের পুজো সংখ্যার লেখা দিয়ে গেলেন সন্ধ্যে বেলায়।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, সোমবার। নিধু হাজরাদের সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে বাড়ি এলাম। চোখ ওঠা ভাব হওয়ায় ভাষার কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না । দশটায় স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। সেখানে ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদের সঙ্গে ককবরক সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করলাম । বিকেলে আমার কলেজজীবনের অধ্যাপক অরুণ বসুর সঙ্গে দেখা করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসে । তিনি বাঙলা বিভাগে ক্লাস নেয়ার জন্যে কলকাতা থেকে এসেছেন ২০.৯.৯৯ তারিখে ।

২১শে সেপ্টেম্বর,১৯৯৯, মঙ্গলবার । সকালে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে অক্ষর প্রকাশনীর লেখক দেবব্রত দেবের কাছে গেলাম সবুজ আন্দামানে লেখাটা (সবুজ ত্রিপুরার ককবরক প্রবাদ) একটু দেখে নিতে । ফিরতে মানিক মজুমদারের বাড়িতে গিয়ে ১০০ টাকা চাঁদা নিলাম সি পি আই পার্টির নির্বাচনের জন্যে । বিকেলে বনমালীপুরে অঘোর দেববর্মার বাড়ি গেলাম ।

২২শে সেপ্টেম্বর,১৯৯৯, বুধবার । বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে গেষ্ট হাউসে অবস্থানরত আমার কলেজজীবনের শিক্ষক অধ্যাপক অরুণ বসুর সঙ্গে দেখা করে আমার ত্রিপুরী রূপকথার বই

(কেরেঙকথমা)'র ইংরিজি অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করলাম যাতে অক্সফোর্ড পাব্লিকেশান বইখানা ছাপে ।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার। বিশ্ববিদ্যালয়ে গেষ্ট হাউসে গিয়ে দেখি আমার স্যার অধ্যাপক অরুণ বসু খানিকটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর জন্যে Unienzyme-এনে দিলাম কামান চৌমুহনী থেকে। পরে কবি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কোয়ার্টারে গেলাম অধ্যাপক অরুণ বসুর একটা খবর নিয়ে। কিন্তু তাঁকে পেলামনা। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের Dy. Regestrar K.B. Jamatia'র কোয়ার্টারে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতে করেই রবীন্দ্রভবন পর্যন্ত এলাম ।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, রবিবার। কবি রাতুল দেববর্মার বাড়িতে গিয়েছিলাম আমার বড়োমেয়ে তানিয়ার বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করতে। তিনি বললেন, 'অঙ্কুর কর্তার ইঞ্জিনীয়ার ছেলে আছে, আমি আলাপ করে দেখবো!' অঙ্কুর কর্তা হলেন কিরণ কর্তার ছেলে, শচীন কর্তা (গায়ক শচীন দেববর্মণ)'র আপন ভাইপো।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, সোমবার। বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরক সার্টিফিকেট কোর্স-এর সিলেবাস কমিটির মিটিং ছিলো। রাতে রবীন্দ্র পরিষদে ছড়া পড়ার আসরে আমার অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার বসু প্রধান অতিথি ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে একটা অদ্ভুত কথা বললেন। ছড়া পড়ার আসরে কবি চন্দ্রকান্ত মুড়া সিং ককবরকে ছড়া পড়েছিলেন। সেই ছড়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বললেন, 'ককবরক ছড়ার ছন্দ শুনে আমার মনে হয়েছে বাঙলার ছড়ার ছন্দ এসেছে ককবরক ও আদিবাসী অন্যান্য ভাষার ছড়ার ছন্দ থেকে। ককবরকের ছড়ার ছন্দের ঝঙ্কার শুনে তাই-ই আমার মনে হয়েছে।'

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, মঙ্গলবার। ৩.৩০ এ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেষ্ট হাউস-এ গিয়ে আমার শিক্ষক অরুণ বসুর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমার সবুজ ত্রিপুরার ককবরক প্রবন্ধ পড়ে তাঁর মন্তব্য জানালেন সমালোচকের দৃষ্টিতে। বললেন, 'প্রবাদগুলোর ব্যাখ্যা একটু অতিশয়োক্তিতে দুষ্ট হয়েছে। সেখান থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের Dy. Registrar K.B. Jamatia'র কোয়ার্টারে এসে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে চা-রুটি খেলাম।'

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, বুধবার। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বিকেল ৪.৩০ এ গেস্ট হাউসে আমার কলেজ জীবনের (৬১-৬৪ খ্রীঃ) শিক্ষক যিনি, আমাকে ভাষাতত্ত্ব পড়তে পাঠিয়েছিলেন, অধ্যাপক অরুণ বসুর সঙ্গে দেখা করে বন্ধুবর স্বপন বসুকে চিঠি দিলাম ।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার। খুব ভোরে উঠে ধলেশ্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের audit officer সুব্রত পালের পাড়ি গেলাম। বাড়ি ফিরে আবার ১০ টায় গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীর সঙ্গে একই রিক্সা চেপে। বিকেলে জি.বি. হাসপাতালে গেলাম ১৯নং কেবিনে ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদকে দেখতে। তারপর ডঃ কানুলাল ধরের সঙ্গে ফিরে ধ্রুব কর্তার বাসায় ফিরলাম। ফিরে তসলিমা নাসরিনের 'আমার মেয়েবেলা' উপন্যাস পড়লাম ।

১লা অক্টোবর, ১৯৯৯, শুক্রবার। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ৬৯১৬ টাকার চেক নিয়ে মঠচৌমুহনীর State Bank of India-য় ভাঙ্গালাম। বিকেলে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধী স্টাডি সেন্টারের গান্ধী জয়ন্তী পলনের জন্যে নিমন্ত্রণ করতে।

২রা অক্টোবর, ১৯৯৯, শনিবার। সকালে অঘোর দেববর্মার লেখা নিয়ে সুব্রত মজুমদারের কাছে গেলাম D.T.P করতে। বিকেলে গান্ধীঘাটে বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধী গবেষণা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে গেলাম ।

৩রা অক্টোবর, ১৯৯৯, রবিবার। ৩.১০.৯৯ তারিখে লোকসভার ভোট দেখতে দর্পণ সম্পাদক

সমীরণ রায়ের সঙ্গে প্রগতি ইস্কুলে গেলাম। দেখলাম ভোটদাতার সংখ্যা খুব কম। এমন ফাঁকা ভোটারের লাইন আগরতলার লোক কখনো দেখেনি। সকলের একই প্রশ্নই, কেন এমনটা হলো?

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৯৯, সোমবার। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম। ১০ টায় স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে Dy. Registrar K.B. Jamatia'র ঘরে এলেন চিত্রপরিচালক দীপক ভট্টাচার্য। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম Deputy Controller Mr. L.Darlong-এর কাছে। দীপক বাবু ঊণকোটি'র ওপর একটা সিনেমা করবেন। এই জন্যে দার্লং সাহেবের সাহায্য চান। দার্লং সাহেবের বাড়ি ঊণকোটি পাহাড়ের কাছে দারছৈতে। বিকেলে জি.বি. হাসপাতালে গেলাম অধ্যাপক সিরাজুদ্দীন আমেদকে দেখতে। তিনি ১৯ নং কেবিনে আছেন। সেখান থেকে ডঃ কানুলাল ধরের সঙ্গে ফিরে কর্নেল চৌমুহনীতে নেমে দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক সমীরণ রায়ের সঙ্গে দেখা করে সি.পি.আই নেতা অঘোর দেববর্মার বই ছাপার ব্যাপারে আলোচনা করলাম।

৫ই অক্টোবর, ১৯৯৯, মঙ্গলবার। আজ নিধু হাজরা, শ্যামল চৌধুরী ও কমল কুমার রায়চৌধুরীর সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণ সারলাম। তারপর দুধ-খবরের কাগজ নিয়ে বাড়ি ঢুকলাম। ককবরক অভিধানের কাজ সেরে টি.ভি. নিয়ে দোকানে গেলাম মেরামত করার জন্যে। পরে Studio Ckick-এ গিয়ে ছবি তুললাম Bank-এ Account খোলার জন্যে। সেখান থেকে কর্নেল চৌমুহনীতে দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক সমীরণ রায়ের ঘরে ঢুকলাম। সেখানে পেলাম মানিক মজুমদারকে। পরে বাড়ি ফিরে খেলাম। বিকেলে জি.বি. হাসপাতালে গেলাম। সিরাজুদ্দীন সাহেবকে দেখতে। পরে ডঃ কানুলাল ধরের সঙ্গে বাসায় ফিরলাম।

৬ই অক্টোবর, ১৯৯৯, বুধবার। সকালে ককবরক অভিধানের কাজ করলাম কিছুক্ষণ। তারপর ১০টায় বেরিয়ে গেলাম টি. ভি. মেরামত করার কাজে, লোকসভার ত্রৈয়োদশ নির্বাচনের ফলাফল জানার জন্যে। সেখান থেকে গেলাম Studio Click থেকে ফটো নিতে। ফটো লাগবে এস.বি.আই. কলেজটিলা শাখায় এ্যাকাউন্ট খোলার জন্যে। টি.ভি এনে সারাদিন নির্বচনী বুলেটিন শুনলাম। রাতের দিকে একটু ককবরক অভিধানের কাজ করলাম।

৭ই অক্টোবর, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার। ভোর ৪.৩০ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিলো। খালিহাতে কিছু ব্যায়াম করে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে দৈনিক সংবাদ, ত্রিপুরা দর্পণ ও স্যন্দন পত্রিকা নিয়ে কমরেড শ্যামল চৌধুরীর বাসায় গিয়ে টি.ভি তে নির্বাচনী ফলাফল দেখে বাড়ি ফিরলাম। ৮ টায় প্রেসারের ওষুধ খেয়ে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম। ১০ টায় স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে প্রথম মঠচৌমুহনীর S.B.I. তে গিয়ে Bank Account খুললাম। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রার দীপক চৌধুরীকে তসলিমা নাসনিনের 'আমার মেয়েবেলা' বইখানা দিয়ে M.B.B. কলেজের Common Room-এ গিয়ে অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করে স্বপন বসুর পাঠানো অধ্যাপক অরুণ বসুর সংবর্দ্ধনার Card দিলাম।

৮ই অক্টোবর, ১৯৯৯, শুক্রবার। প্রাতর্ভ্রমণ করতে গিয়ে ১নং এম.এল.এ হোস্টেলে গিয়ে এম.এল.এ. নগেন্দ্র জমাতিয়ার সঙ্গে দেখা করলাম। তারপর শান্তির বাজার বিধানসভার উপনির্বাচন ও সর্বভারতীয় নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে করতে চা খেলাম। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে টেম্পো চড়ে গেলাম কুমারীটিলায় ডঃ শিশির কুমার সিংহর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর কাছে অধ্যাপক অরুণ বসুর সংর্দ্ধনার জন্যে তোলা (যা অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য রবীন্দ্র পরিষদ থেকে তুলেছেন) ২৫০ টাকা জমা দিলাম। তারপর ৮ টায় এসে ওষুধ খেলাম।

৯ই অক্টোবর, ১৯৯৯, শনিবার, মহালয়া। খুব ভোরে বীরেন্দ্রকিশোর ভদ্রের গলায় ঘুম ভাঙলো। বেরিয়ে পড়লাম প্রাতর্ভ্রমণে। রাস্তায় যুবক-যুবতীদের উপচে পড়া ভিড়। মহালয়ার সকালে সব বেড়াতে বেরিয়েছে। আজ সারাদিন ককবরক অভিধানের কাজ করলাম। সন্ধ্যায় একটু বেরিয়ে দর্পণ অফিসে গেলাম। ফিরে এসে আবার অভিধানের কাজে বসলাম।

১০ই অক্টোবর, ১৯৯৯, রবিবার। সকালে ৮ টায় প্রথম গেলাম সুরেন্দ্র দেবনাথের বাড়ি। সেখান থেকে তাঁর Scooter-এ চেপে গেলাম রামনগরে অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যের বাড়ি। সেখানে পণপ্রথা বিরোধী একটা লেখা নিয়ে আলোচনা হলো। তারপর রামেশ্বর বাবুর সঙ্গে গেলাম কাছেই নৃত্যশিল্পী পদ্মিনী চক্রবর্তীর প্রাসাদোপম বাড়িতে। অধ্যাপক অরুণ বসুর সংর্ধনার জন্যে কিছু টাকা নিতে। তিনি নানারকম বৈধতার প্রশ্ন তুললেন। আমরা ফিলে এলাম খালি হাতে।

১১ই অক্টোবর, ১৯৯৯, সোমবার। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে নিধু হাজরা ও কমল রায়চৌধুরীর সঙ্গে কমরেড শ্যামল চৌধুরীর বাসায় গিয়ে চা খেলাম। শ্যামল বাবুর ছেলে গৌহাটিতে লেখাপড়া করে। গতকাল ফিরে এসেছে। সে বললো, গৌহাটীতে এ.জি.পি পার্টির কর্মীদের খুব ভয়। প্রকাশ্যে কাজ করতে পারেনা। তাই ত্রৈয়োদশ লোকসভার নির্বাচনে তারা ভালো ফল করতে পারেনি। শ্যামল বাবুর বাসা থেকে ফিরে ককবরক অভিধানের কাজ করলাম। ১০ টায় গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, পুজো advance-এর ১৫০০ টাকা পেলাম। ফিরে ভাষার কাজ করলাম।

১২ই অক্টোবর, ১৯৯৯, মঙ্গলবার। সকালে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে এসে দেখি এম.এল.এ নগেন্দ্র জমাতিয়া আমার বাসায় অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাকে ২০০ টাকা দিলেন আমার ককবরক 'ভাষা ও সাহিত্য'বইয়ের দাম। পরে রাজনীতির কথা উঠলো। তিনি বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছিলেন। লোকসভার নির্বাচনে উপজাতীয় খৃস্টান এবং মুসলমানরা আমাদের উপজাতি যুবসমিতিকে ভোট দেয়নি।' 'আমি বললাম, তারা কেন আপনাদের পার্টিকে ভোট দেবে, আপনারা তো এখন B.J.P'র সঙ্গে সমঝোতা করেছেন। আর বি.জে.পি তো তাদের ওপর অত্যাচার করে। কাজেই খৃস্টান ও মুসলমানরা এবং পাহাড়ের উগ্রপন্থীরাও আপনাদের বি.জে.পির সঙ্গে হাত মেলানোটা পছন্দ করছেন না। কাজেই আপনাদের পার্টির এখন উভয় সংকট।'

১৩ই অক্টোবর, ১৯৯৯, বুধবার। ভোর ৫ টার সময় বেরিয়ে প্রাতর্ভ্রমণ করতে করতে গেলাম বন্ধুবর নগেন্দ্র জমাতিয়ার এম.এল.এ -এর ১নং হোস্টেলে। তাঁকে আমার লেখা 'ককবরক ভাষা ও সাহিত্য' বই দু'খানা দিলাম। সেখান থেকে tempo করে ফিরে এলাম দৈনিক সংবাদে। দৈনিক সংবাদ নিয়ে গেলাম ত্রিপুরা দর্পণে। ফিরে এসেই সি.পি.আই. নেতা অঘোর দেববর্মার বাড়িতে কমরেড শ্যামল চৌধুরীর সঙ্গে রওনা দিলাম। অঘোর দেববর্মার বাড়িতে গিয়ে দেখি বিলোনীয়া পার্টি নেতা কমরেড তরণী বণিক এবং শ্রমিক নেতা ধনমণি সিং অপেক্ষা করছেন। অঘোর বাবুর ছোট ছেলের নিচেরতলায় আলোচনা হলো পার্টিসংক্রান্ত বিষয়ে। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে গেলাম ডাঃ বিজয় দেববর্মার বাসায়। আমার P.G. তে Refer করা কাগজপত্রে সই করার ব্যাপারে। দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রার সাহেব অধ্যাপক ডঃ দীপক চৌধুরীর ঘরে চা খেলাম। সেখানে Dy. Registrar অধ্যাপক কে.বি. জমাতিয়াও ছিলেন। এর মধ্যে সদ্য নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ডঃ সিরাজুদ্দীন আহমেদ এসে গেলেন। তাঁকে নিয়ে গেলাম ক্যাশে। পরে Controller Section -এর section in-charge মনস্তাত্ত্বিক লেখক মানিক ধরের ঘরে বসে সাহিত্য বিষয়ক অনেক আলোচনা হলো। বিকেল ৫ টায় গেলাম প্রেস ক্লাবে 'পূর্বাভাস' শারদ সংখ্যার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। সেখানে প্রধান অতিথি

ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এবং সভাপতি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার। অনিল বাবুর একটা কথা-লেখালেখি নিয়ে Collective farming হয় না, খুব ভালো লাগালো আমার। সেখানে পূর্বাভাস কিনলাম।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৯৯, শুক্রবার। সকালে প্রাতর্ভ্রমণ করে বাসায় ফিরে ককবরক অভিধানের কিছু কাজ করলাম। তারপর সকাল ৯ টায় গেলাম জি.বি.হাসপাতালে। সেখানে গিয়ে ডাঃ বিজয় দেববর্মার সঙ্গে দেখা করে আমার Refd, Case-এর reimbursement-এর ব্যাপারে আলোচনা করলাম। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন ডাঃ পি.কে.ভট্টাচার্যের কাছে। ডাঃ বাবু বললেন Clerk আমিত বাবুর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি ৩ ঘন্টা বসিয়ে রেখে বললেন, কাল আসুন আবার form পূরণ করতে হবে। বিকেলে অঘোর দেববর্মার বাড়ি গেলাম।

১৬ই অক্টোবর, ১৯৯৯, শনিবার। মহাসপ্তমী। খুব ভোরে প্রাতর্ভ্রমণ করে গেলাম বুদ্ধমন্দিরের কাছে ১নং এম.এল.এ হোস্টেলে বন্ধুবর নগেন্দ্র জমাতিয়াকে 'প্রতিদিন' এর শারদ সংখ্যা উপহার দেয়ার জন্যে। ১৪০৬ শারদ সংখ্যায় নোবেলজয়ী অমর্ত্ত সেনের দুটো লেখা আছে। নগেন্দ্র বাবু খুব খুশি হলেন। সেখান থেকে বাসায় ফিরে দেখি আমার ছোট শ্যালক বিমল হেরমা যাবার জন্যে তৈরী। তার কাছে যোগেন্দ্র দেববর্মার জন্যে আমার লেখা বই পাঠালাম। বিকেলে ত্রিপুরা দর্পণে গেলাম। রাজধানী আগরতলার শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। ডঃ অমিতাভ সিনহা ও ডঃ প্রলয় কান্তি হালদার এলেন 'রাজধানী আগরতলা'র শারদ সংখ্যা নিতে। ওই সংখ্যায় দু'জনেরই মূল্যবান লেখা আছে। আমারও একটা লেখা আছে। সম্পাদক সমীরণ রায় আমাদের হাতে শারদসংখ্যা তুলে দিয়ে চা খাওয়ালেন।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৯৯, রবিবার। মহাষ্টমী। সকাল ১০ টায় কমরেড অঘোর দেববর্মা ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার অফিসে এলেন। সমীরণ রায়কে ৫৫০০ টাকা দিলেন তার 'ত্রিপুরার উপজাতি জনজীবনে রাজনৈতিক ক্রম বিবর্তন' বইখানা ছাপার জন্যে। কমরেড শ্যামল চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন তখন। সন্ধ্যেবেলায় আমার বড়মেয়ে তানিয়া, ছোট মেয়ে দেবযানীকে নিয়ে আমার স্ত্রী পুজো দেখতে বরোলেন। তারপর ভিজতে ভিজতে বাড়ি এলেন। অথচ আগের রাত্রে তাঁর জ্বর হয়েছিলো। সন্ধ্যেবেলায় কমরেড নিধু হাজরা ও শ্যামল চৌধুরী এলেন আমার ধ্রুব কর্ত্তার বাসায়। তাঁদেরকে নিয়ে গেলাম প্রতিবেশী ফনীভূষণ ভট্টাচার্যের বাড়ি পারিবারিক দুর্গাপুজোয় নিমন্ত্রিত হয়ে।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৯৯, সোমবার। মহানবমী। সারাদিন বৃষ্টি। আজ সারাদিন বাড়ি থেকে কিছু লেখালেখি করলাম।

২১শে অক্টোবর, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে অঘোর দেববর্মার লেখা ইংরিজিতে অনুবাদ করলাম বেলা ১-৩০ পর্যন্ত। ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনে সি. পি. আই পার্টির ভরাডুবির জন্যে তিনি পার্টির সর্বভারতীয় সেক্রেটারী কমরেড এ. বি. বর্দ্ধনকে পদত্যাগ করার জন্যে দীর্ঘ একটানা চিঠি লিখেছেন বাংলায়, তারই ইংরিজি অনুবাদ। সন্ধ্যের সময় এই লেখা কমরেড শ্যামল চৌধুরীকে দিয়ে এলাম অঘোরবাবুর কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। বাড়ি ফিরে আমরা স্বামী-স্ত্রী গেলাম আমাদের বাসার মালিক ধ্রুব কর্তার সঙ্গে বিজয়া দশমীর কোলাকুলি করতে। গিয়ে দেখি কর্তার শাশুড়ী ঠাকুরাণী এসেছেন। তাঁর শাশুড়ী হলেন নন্দলাল কর্তার বোন। এরপরে গেলাম প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত পরশুরাম দেববর্মার বাড়ি বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে।

২২শে অক্টোবর, ১৯৯৯, শুক্রবার। আজ প্রাতর্ভ্রমণ সেরে শ্রীযুক্ত নিধু হাজরাকে ত্রিপুরা দর্পণ থেকে একখানা রাজধানী আগরতলা শারদ সংখ্যা উপহার দিলাম। তারপর শ্যামল চৌধুরীর বাসায় গিয়ে

চা খেলাম। ফিরে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম। তারপর ৯টার সময় গেলাম প্রতিবেশী পরশুরাম দেববর্মার বাড়ি । ১১টায় গেলাম 'অক্ষর প্রকাশনী'র বাড়ি Dropout Coaching Centre-এর মিটিং করতে। ফিরে এসে খেতে খেতে দুটো বেজে গেলো। একটু অনিয়ম হলো । সন্ধ্যে বেলায় আমরা সস্ত্রীক গেলাম আমাদের আগের বাসার মালিক দিলীপ দেবরায়ের বাড়ি বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে। সেখান থেকে গেলাম অক্ষর প্রকাশনীর অফিসে বই আনতে। ফিরে দেখি বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাকে রাজধানী আগরতলা শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত ডঃ পি কে হালদারের উপজাতি উন্নয়ন বিষয়ক লেখাটার জন্যে ধন্যবাদ জানালেন। নগেন্দ্রবাবু যেতেই আমার প্রেসার একটু বাড়লো। আমার স্ত্রী মাথা ধুইয়ে দিলেন। প্রেসারের ওষুধ এক ঘন্টা আগে খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

২৩শে অক্টোবর, ১৯৯৯, শনিবার। সারাদিনই ককবরক অভিধানের কাজ করলাম। বিকেলে আমরা সস্ত্রীক গেলাম অমিতা দেববর্মার বাড়ি গভরমেন্ট কোয়ার্টারের দরবার করতে। তিনি বললেন, পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী ও চীফ সেক্রেটারীর কাছে আবেদন করতে। সেখান থেকে গেলাম বিধানসভার Dy. Secretary. নরেশ দেববর্মার বাড়ি তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে । ফেরার পথে ঢুকলাম 'অক্ষর প্রকাশনী'তে এবং আমার লেখা 'ককবরক ভাষা ও সাহিত্য' বই নিলাম। সেখান থেকে গেলাম আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের অধিকর্তা নরেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি । তিনি বাড়ি ছিলেন না, গ্রামে গেছেন।

২৪শে অক্টোবর, ১৯৯৯, রবিবার। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। আজ সারাদিন অভিধানের কাজ করলাম। বিকেলে আগরতলা হাসপাতালে সস্ত্রীক গিয়ে হেরমার যোগেন্দ্রবাবুর মেয়ে গীতাকে দেখে এলাম। ফিরে আমাদের বাসার মালিক ধ্রুব কর্তার ঘরে লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ খেলাম। রাত্রে আমার কাকা শ্বশুর বীরকুমার দেববর্মা এলেন এবং রাত্রে থাকলেন।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৯৯, সোমবার। দুর্গাপুজোর পরে সরকারী অফিস খুলেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এখনো খোলেনি। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে খবরের কাগজ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ৮টায় প্রেসারের ওষুধ ও ৯টায় আরেকটি ওষুধ খেয়ে ককবরক অভিধানের কিছু কাজ করলাম। সকাল ৯.৩০-এ বেরিয়ে প্রথম গেলাম শ্রীযুক্ত মানিক মজুমদারের বাড়ি লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ খেতে। সেখান থেকে গেলাম ডঃ কমল কুমার সিংহের বাড়ি । সেখান থেকে কমরেড নিধু হাজরার বাড়ি হয়ে ১২.৩০ এ বাসায় ফিরলাম। ২.৩০ থেকে অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম। বিকেল ৪.৩০ এ কমরেড অঘোর দেববর্মার ফোন পেয়ে তাঁর বনমালীপুর বাড়িতে গিয়ে দেখি কমরেড ধনমণি সিং অপেক্ষা করছেন। সেখানে সি. পি. আই. পার্টির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। বাসায় ফিরলাম সাতটায়। তারপর একটু গেলাম দর্পণ পত্রিকায়। বাসায় ফিরে দিল্লীর কাগজগুলো পড়লাম। শুলাম ১১টায়।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৯৯, মঙ্গলবার। প্রাতর্ভ্রমণ করতে করতে বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়ার ১নং এম. এল এ হোস্টেলে গিয়ে দেখা করে আমার সরকারী কোয়ার্টারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। সেখানে যুব সমিতির নেতা সুখদলায় জমাতিয়া এবং এম. এল. এ রতিমোহন জমাতিয়া উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ককবরক গবেষণা নিয়ে আলোচনা হলো। ফিরে এসে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম। আজ বিশ্ববিদ্যালয় খুললো। কিন্তু যাওয়া হয়নি। সারা দিন ভাষার কাজ করলাম। আজ সকালে প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে এসেছিলেন আমার ছেলে সুরঞ্জনের কাছ থেকে তাঁর ইংরেজী Far East Focus কাগজের জন্যে একটা লেখা নিতে। তাঁর সঙ্গে ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হলো।

২৭শে অক্টোবর, ১৯৯৯, বুধবার। প্রাতর্ভ্রমণ করতে গিয়ে স্থানীয় অনেক সংবাদপত্র কিনলাম

। সংবাদপত্রে পড়লাম ধর্মনগর, কুমারঘাট প্রভৃতি জায়গায় উগ্রবদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার নামে উপজাতি কর্মচারীদের এবং উপজাতি এলাকায় হামলা সংঘটিত করেছে ৪৩ টি ক্লাবের যুবকরা । আমার স্ত্রীর আজ তাঁর নিজের গ্রামে যাওয়ার কিথা ছিলো । তাঁর এক ঠাকুরদা (কামিনী দেববর্মা)'র শ্রাদ্ধে । কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে তাঁর যাত্রা বন্ধ করতে হলো । আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম এবং সন্ধ্যায় ফিরে ভাষার কাজ করলাম । রাত ৮-৩০ ত্রিপুরা দর্পণে গিয়ে সমীরণ রায়ের ঘরে বসলাম।

২৮শে অক্টোবর, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার । তাড়াতাড়ি প্রাতর্ভ্রমণ সেরে সকাল ৭টায় বেরিয়ে পড়লাম বি. বি. সি'র প্রখ্যাত সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের সঙ্গে দেখা কোরতে তাঁর মেলারমাঠের বাড়িতে । পুজোর ছুটিতে তিনি বেড়াতে এসেছেন আগরতলার বাড়িতে । তাঁর বাবা খুব অসুস্থ । সুবীরকে আমার লেখা 'ককবরক ভাষা ও সাহিত্য' এবং 'হাচুক খুরিঅ' উপন্যাসের বাঙলা অনুবাদ পাহাড়ের কোলে উপহার দিলাম ! কিছুক্ষণ পরে আমার ছেলে সুরঞ্জন এলো সেখানে । সুবীর সুরঞ্জনকে 'Nagaland Post' কাগজে Sub-editor-এর পদে একটা কাজ দিতে চেয়েছেন, দিমাপুরে এই কাগজের অফিস । এই ইংরেজী সংবাদপত্রের editor হলেন একজন নাগা ভদ্রলোক । সুরঞ্জন সুবীরকে তার bio-data দিলো । সুবীর রাজ্যের রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে বললেন, রাজ্যে উগ্রপন্থী কাজকর্ম দমন করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে । এই সুযোগে আর. এস. এস সক্রিয় হবে।

৩০শে অক্টোবর, ১৯৯৯, শনিবার । তাড়াতাড়ি প্রাতভ্রর্মণ সেরে এসে ককবরক অভিধানের কাজ করলাম প্রেসারের ওষুধ খেয়ে । সকালে দিল্লীর mainstream এর সম্পাদক সুমিত চক্রবর্তীকে চিঠি লিখলাম আমার ছেলে সুরঞ্জনকে দিল্লীর কোনো ইংরিজি কাগজে Correspondent করে দেয়ার জন্যে । সকাল সাড়ে ৯টায় জি. বি. হাসপাতালে গেলাম ছেলেকে নিয়ে আমার Refd Case-এর adjustment দেয়ার কাজে । ১২ টায় ফিরে একটু ত্রিপুরা দর্পণে ঢুকলাম । তারপর বিশ্রাম নিয়ে ভাষার কাজ করলাম ।

৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৯, রবিবার । প্রাতর্ভ্রমণ শেষ কবে ভাষার কাজে বসার পর কমরেড ধনমণি সিং ও কমরেড তপন চক্রবর্তী এলেন সি. পি. আই পার্টির কিছু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আলোচনা করতে । আলোচনা থেকে বেলা দুটোর সময় উঠে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লাম । উঠলাম চারটের সময় । তারপর ১ ঘন্টা ভাষার কাজ করলাম । এবং ৫টার সময় সস্ত্রীক গেলাম গায়িকা ঝর্ণা দেববর্মার বাড়ি আমাদের বড়ো মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করতে । সেখান থেকে গেলাম আগরতলা আকাশবাণী কেন্দ্রের অধিকর্তা নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার বাড়ি । সেখানেও বড়ো মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা হলো! নরেনবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার স্ত্রী বাসায় ফিরে গেলেন আর আমি গেলাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধান ডঃ কমল কুমার সিনহার বাড়ি । সেখানে বসেই ৮টার প্রেসারের ওষুধ খেয়ে বাসায় ফিরে এসে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম রাত ১০টা পর্যন্ত।

১লা নভেম্বর, ১৯৯৯, সোমবার । ভোরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করতে করতে ১ নং এম.এল.এ. হোস্টেলে গিয়ে বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়ার সঙ্গে এক চা-এর আসরে মিলিত হলাম । আমার মারে (বান্ধবী-নগেন্দ্র বাবুর স্ত্রী) আমাকে তেলাকুচোর পাতা ধুয়ে খাইয়ে দিলেন । পরে চা খেয়ে বাসায় ফিরলাম । বাসায় ফিরে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে কিছুক্ষণ ভাষার কাজ করলাম এবং ১০ টার সময় স্ত্রীর সমভিব্যাহারে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম । আজ ১ তারিখ । বেতন পেলাম কেটে কুটে ৬৬১৬ টাকা । বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডঃ দীপক চৌধুরীকে সুধন্বা দেববর্মার সংখ্যা (গোমতী) দিলাম, তাতে আমার অনুবাদ করা সুধন্বা বাবুর 'হাচুক খুরিঅ' উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ 'পাহাড়ের কোলে' আছে । বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সি.পি.আই. নেতাঁ অঘোর দেববর্মার বাড়ি গেলাম । সেখানে

এলেন কমরেড ধনমণি সিং । পার্টির আভ্যন্তরীন ব্যাপারে আলোচনা হলো । বাসায় ফিরে স্ত্রীর পাশে শুয়ে বিশ্রাম কোরছি এমন সময় এলেন সমাজসেবী সুরেন্দ্র দেবনাথ তাঁর উদ্যোগে অসবর্ণ-অসধর্ম ও যৌতুকবিহীন গণ বিবাহের ব্যাপারে আলোচনা করতে । রাত ১১.৩০-এ শুলাম ।

২রা নভেম্বর, ১৯৯৯, মঙ্গলবার । গতকাল মর্ণিঙওয়াক করতে করতে বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়ার সঙ্গে দেখা করে তার ভাগ্নে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার কল্যাণবিজয় জমাতিয়ার মেয়ের অপারেশনের কথা জানালাম । সেখান থেকে সোজা চলে এলাম ভি.এম. হাসপাতালে শ্রীযুত জমাতিয়ার মেয়েকে দেখতে । সেখানে গিয়ে জানলাম জমাতিয়া সাহেবের মেয়ের তলপেট থেকে এক বড়ো টিউমার বেরিয়েছে । সেখান থেকে এসে প্রেসারের ওষুধ খেলাম, চোখ ওঠার ওষুধ দিলাম । তারপর ১০ টায় স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখান থেকে আমার Pay Certificate নিয়ে গেলাম P.W.D.'র Estate অফিসে কাগজ জমা দিয়ে আমার Govt. Quarter-এর ব্যাপারে তদবির করতে । সেখান থেকে দর্পণে এলাম ১.৩০-এ । সেখানে শ্রীযুত মানিক মজুমদারের সঙ্গে দেখা হতেই তাকে Far East Focus-কাগজে প্রকাশিত আমার পুত্রের নিবন্ধটি পড়তে দিলাম । তিনি বললেন, আপনার ছেলেকে আরো ভালো ইংরেজি লিখতে হবে আর তথ্য সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে । বাসায় ফিরে দেখি বড়োমেয়ে তানিয়ার বান্ধবী স্বপ্না দেববর্মা ও ছোট মেয়ের বান্ধবী মৌসুমী ভট্টাচার্য দিপ্রহরিক আহারের জন্যে তৈরি । তাঁদের সৌজন্যে মুরগীর মাংস রান্না করা হয়েছে । এরমধ্যে ছেলে সুরঞ্জন এলো । আমি ভাত খেতেই সে একটা ডাব কেটে দিলো । ডাবের জল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম এবং উঠলাম বিকেল ৪ টেয় । উঠে একটা আপেল খেলাম । তারপর ৪.৪৫-এর সময় হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম রামনগরে অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে দেখতে । তিনি, স্ত্রী-কন্যা সহ accident করেছেন রিক্সায় । অটোভ্যান এসে ধাক্কা মেরে তাঁদের রিক্সা ফেলে দেয় । তাঁরা ছিটকে পড়েন । অসুস্থ রামেশ্বর বাবুকে দেখতে সি.পি.আই.এম. এল. পার্টির রাজ্যসম্পাদক কমরেড অসিত চক্রবর্তী এসেছেন । আমি রামেশ্বর বাবুকে আমার লেখা 'ককবরক ভাষা ও সাহিত্য' বইখানা উপহার দিলাম দৈনিক সংবাদে সমালোচনার জন্যে । সেখানে পুত্র সুরঞ্জনের Far East Focus-এ বেরোনো লেখা নিয়ে মিঠে-কড়া আলোচনা হলো । আলোচনার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলো সে তার লেখায় রাজ্যের রাজনীতি ও সামাজিক অসন্তোষের ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়েছে । কাজেই ওইসব সত্যকথা লেখায় তার চাকরি-বাকরি পেতে কষ্ট হবে । রামেশ্বর বাবুর মা মুড়ি দুধ খাওয়ালেন । তারপর একটা রিক্সা নিয়ে এলাম ঠিক ৮ টায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে শুয়ে একটু বিশ্রাম করলাম ।

৩রা নভেম্বর, ১৯৯৯, বুধবার । সন্ধ্যে বেলায় অসুস্থ বন্ধু অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে দেখতে গেলাম তাঁর রামনগরের বাসভবনে। তিনি অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন স্ত্রী-কন্যা সহ। আমাদের বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছেন তিনি।

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৯৯, সোমবার । প্রাতর্ভ্রমণ করতে গিয়ে ভি. এম হাসপাতালে গিয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার কে বি জমাতিয়ার মেয়েকে দেখতে এলাম । মেয়েটির অপারেশন করা হয়েছে। জমাতিয়া সাহেবের স্ত্রীর হাতে দৈনিক সংবাদপত্র দিয়ে এলাম । বাসায় ফিরে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে ককবরক অভিধানের কাজ করলাম ১২.১৫ পর্যন্ত । তারপর বিশ্রাম করে ১.৩০ গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শুনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভি. সি আমার খোঁজে লোক পাঠিয়েছেন । সঙ্গে সঙ্গে ভি. সি.'র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম । তিনি বললেন ককবকক ভাষার সার্টিফিকেট কোর্সের নতুন সিলেবাস আগামী অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে পাশ করিয়ে নিতে হবে । কাজেই তার আগেই সিলেবাস কমিটির রিপোর্ট পেশ করতে হবে । বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে ভি. এম হাসপাতালে গিয়ে

জমাতিয়াকে দেখতে গেলাম আমার বাসার পাশে কেয়ার এন্ড কিউর নার্সিংহোমে। সারাদিন ভাষার কাজ করলাম আজ। সন্ধ্যে বেলায় গেলাম ১ নং এম.এল.এ হোস্টেলে নগেন্দ্রবাবুর কোয়ার্টারে। ফিরে এসে দেখি নগেন্দ্রবাবু আমার বাসায় অপেক্ষা করছেন। তিনি ফিরেছেন সি.পি.আই. নেতা অঘোর দেববর্মার সঙ্গে দেখা করে। তাঁর সঙ্গে সুখদয়াল বাবুর চিকিৎসার ব্যাপারে আলোচনা হলো।

২২শে নভেম্বর, ১৯৯৯, সোমবার। ভোরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়ার কোয়ার্টারে। রাজ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হলো। আমি চিফ সেক্রেটারির কাছে গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার পাবার জন্যে এপ্লিকেশান লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। নগেন্দ্র বাবু বললেন, এপ্লিকেশান খানা চীফ সেক্রেটারির পি.এ 'র কাছে জমা দিতে এবং তিনি চীফ সেক্রেটারিকে আমার কোয়ার্টার পাওয়ার বিষয়ে একখানা চিঠি দেবেন বললেন। আমি নগেন্দ্র বাবুকে বললাম, 'আদৌও কি আমি কোয়ার্টার পাব? গত দুবছর ধরেতো চেষ্টা করছি, আর বার দুয়েক দেখা করেছি পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর সঙ্গে। আমার গুরুতর অসুস্থতার কথা তাঁকে জানিয়েছি। আমার গবেষণার কাজের জন্যে যে একটা কোয়ার্টার দরকার সে ব্যাপারেও তাঁকে বুঝিয়ে বলেছি। কিন্তু কোন ফলতো আমি পেলাম না। স্বয়ং শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ও আপনি বাদল চৌধুরীকে অনুরোধ করেছেন কয়েকবার তাতেও তো কিছু হয়নি। এখন আপনি বলছেন চীফ সেক্রেটারির কাছে একখানা এপ্লিকেশান দিতে, ঠিক আছে করে দিচ্ছি, দেখা যাক বেড়ালের ভাগ্যে সিঁকে ছেড়ে কিনা? নগেন্দ্রবাবু আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন।

ফিরে এসে কেয়ার এন্ড কিউরে ভর্তি হওয়া সুখদয়াল জমাতিয়াকে দেখতে গেলাম। তারপর সকাল ১০.৩০ এ গেলাম মন্ত্রী অফিসে গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারের এপ্লিকেশান জমা দিতে। চীফ সেক্রেটারির পি.এ 'র হাতে দরখাস্তখানা তুলে দিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরার পথে অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে নিয়ে সি.পি.আই নেতা অঘোর দেববর্মার বাড়ি গেলাম। রামেশ্বর বাবু খুব মনোযোগ দিয়ে অঘোর বাবুর কাছ থেকে অতীতের জনশিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে অনেক কথা শুনলেন।

২৩শে নভেম্বর, ১৯৯৯, মঙ্গলবার। প্রাতর্ভ্রমণ করলাম আস্তাবল মাঠে। প্রেসার কমানোর জন্যে দারুণ শীতেও কচি ঘাঁসের ওপর হাটলাম কিছুক্ষণ। রাজ-আস্তাবলে প্রাতর্ভ্রমণ করতে করতে আমার অদ্ভুত সব প্রশ্ন মাথায় আসতে লাগলো। আচ্ছা, ত্রিপুরার এই রাজ আস্তাবলে কত ঘোড়া থাকতো? আরবদেশের ঘোড়া ছিলো কি ত্রিপুরার রাজাদের? এরপর রাজ-আস্তাবল থেকে বেরিয়ে গেলাম বিধায়ক বন্ধুবর নগেন্দ্র জমাতিয়ার কোয়ার্টারে। সেখানে আমার বান্ধবী পবিত্ররাণী জমাতিয়া চা খাওয়ালেন। বন্ধুবর পাউরুটি সেঁকে আনলেন। বললেন, সকাল সাতটায় তাদের পার্টির মিটিং আই.পি.এফ.টি এবং টি.এন.ভি 'র সঙ্গে।

আজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ গুরুনানকের জন্মদিনের জন্যে। সারাদিন ককবরক অভিধানের কাজ করলাম। বিকেলে গেলাম ওল্ড কালীবাড়ি লেনে লেখক নিধু ভূষণ হাজরার বাড়ি। তিনি সকালে এসেছিলেন আমাদের বাসায়। রাজ্য রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করলেন তিনি। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম ডাঃ সত্যরঞ্জন দেবর্বার এডভাইজার চৌমুহনীর বাড়ি আমার বড়ো মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে। ফিরতে ঢুকলাম দর্পণ পত্রিকার অফিসে। দেখলাম দর্পণ-সম্পাদক সমীরণ রায় খুব ব্যস্ত আসন্ন ফিল্ম ফেস্টিভাল নিয়ে। ফিরে এসে অভিধানের কাজ করলাম। তারপর ১১ টায় শোবার আগে Bertrand Russell এর 'Why I am not a Christian' বই খানা কিছুটা পড়লাম।

২৪শে নভেম্বর, ১৯৯৯, বুধবার। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে খবরের কাগজ সংগ্রহ করে এনে বাসায়

৬.৩০ এর মধ্যে ফিরে ককবরক অভিধানের কাজ নিয়ে বসলাম এবং তার আগে তেলাকুচোর পাতা খেলাম একগাদা। সাতটার সময় স্ত্রী ফুলকুমারী উঠলেন। তারপর উঠল বড়োমেয়ে তানিয়া। ছোটমেয়ে দেবযানী একটু ঘুমকাতুরে, ও উঠে একটু দেরী করে। আর সব থেকে দেরীতে ওঠে পুত্র সুরঞ্জন। তাঁর শুতে শুতে বেজে যায় রাত একটা থেকে দেড়টা, আর ওঠে সকাল ৮ টার পর। সারারাত সে জয় গোস্বামীর একগাদা কবিতার বই গোগ্রাসে গেলে।

দশটায় বেরিয়ে স্ত্রীকে পূর্বশায় নামিয়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। বিকেল তিনটেয় মাননীয় ডিন ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদের চেম্বারে ককবরক সিলেবাস কমিটির মিটিং হলো। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে গেলাম অঘোর বাবুর বাড়ি। অনেক কথা হলো তার সঙ্গে ত্রিপুরার বর্তমান ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে। অঘোর বাবুর বাড়ি থেকে ফিরে বাসায় ফিরতে কেয়ার এন্ড কিঁউর নাসিংহোমে গিয়ে সুখদয়াল জমাতিয়াকে দেখে এলাম। তিনি আজ অপেক্ষাকৃত ভালো।

২৫শে নভেম্বর, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার। খুব ভোরে উঠে খালি হাতে ব্যায়াম ও আসন করে ৫.৩০ এ বেরিয়ে পড়লাম জগন্নাথ মন্দিরের সামনে নেহেরু পার্কে। কাচা ঘাঁসের ওপর হাটলাম কিছুক্ষণ সেখানে এলেন বিধান সভার পুলিশ কর্মী অন্নপ্রসাদ জমাতিয়া। তিনি ইতিপূর্বে ককবরক ভাষায় গীতা অনুবাদ করেছেন। গীতা অনুবাদ নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক আলোচনা হলো। তাঁকে দিয়ে প্রয়াত সতীশ বণিক ককবরক ভাষায় গীতা অনুবাদ করে নিয়েছিলেন। আমি অন্ন বাবুকে বললাম, 'আপনি কি জানেন ককবরক ভাষায় প্রথম গীতা অনুবাদ কে করেন?' উনি বললেন, 'কেন আমাদের কবি নন্দকুমার দেববর্মা।' আমি বললাম, 'ককবরক ভাষায় প্রথম গীতা অনুবাদ করেন বংশী ঠাকুর। যদিও সে অনুবাদ ছাপার মুখ দেখেনি। অন্নপ্রসাদের সঙ্গে ককবরক গীতা প্রসঙ্গ শেষ করে দৈনিক সংবাদ ও ত্রিপুরা দর্পণ সংগ্রহ করলাম। পথে মোহন কর্তার বাড়ির দেয়াল থেকে তেলাকুচোর পাতা সংগ্রহ করে পকেটে পুরলাম। তারপর দুধ নিয়ে ধ্রুব কর্তার বাড়িতে আমার বাসায় ফিরলাম। আটটায় খেলাম প্রেসারের ওষুধ। বড় মেয়ে তানিয়া খাবার তৈরি করে দিলো। প্রেসারের ওষুধ খেয়ে আবার অভিধানের কাজে বসলাম এবং একটানা ১২ টা পর্যন্ত চালিয়ে গেলাম। তারপর দুপুরের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। দুটোর সময় উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম এবং আগামী কালের Academic Council' এর মিটিঙয়ে পেশ করার জন্যে ককবরক সার্টিফিকেট কোর্সের কাগজপত্র প্রস্তুত করলাম।

ফেরার পথে গেলাম অঘোর দেববর্মার বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখি কমরেড শ্যামল চৌধুরী ত্রিপুরার সি.পি.আই পার্টির ভবিষ্যৎ এবং ত্রিপুরার বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে অঘোর বাবুর সঙ্গে আলোচনা করছেন। অঘোর বাবু কমরেড ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে দেয়ার জন্যে চিঠির পান্ডুলিপি তৈরি করেছেন রাজ্য পার্টির বিষয় নিয়ে, সেখানা আমাকে পড়তে দিলেন। অঘোর বাবুর বাড়ি থেকে শ্যামল বাবুর সঙ্গে বাসায় ফিরলাম। খুব শীত করছিলো, তাই কাঁথার ভেতর ঢুকে পড়লাম।

২৬শে নভেম্বর, ১৯৯৯, শুক্রবার। আজ ছিলো ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং। সেই মিটিঙে উপাচার্য অধ্যাপক অজিত কুমার চক্রবর্তী, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক দীপক চৌধুরী এবং ডিন ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদ সহ বিভিন্ন কলেজের প্রিন্সিপালরা উপস্থিত ছিলেন। ওই মিটিঙে ককবরক সার্টিফিকেট কোর্সের নতুন সিলেবাস, রুলস ও রেগুলেশানস অনুমোদিত হলো এবং এখন থেকে তিন মাসের কোর্সের পরিবর্তে ছয় মাসের কোর্সের প্রস্তাব গৃহীত হলো। মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী শোভা দেববর্মা প্রস্তাব করলেন ককবরক সিলেবাসে ত্রিপুরী রূপকথা ঢুকানোর। মহিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা শ্রীমতী করবী দেববর্মণ তা সমর্থন করলেন।

২৭শে নভেম্বর, ১৯৯৯, শনিবার। সন্ধ্যা ৭ টায় প্রেসার একটু বেড়েছিলো। তারপর Anxit

টেবলেট খেলে কমে যায়। গা ঘেমে মাথা ব্যথা করছিলো। স্ত্রী ফুলকুমারী মাথা টিপে দিলেন। আগামীকাল আমার ডাক্তার অতনু ঘোষের কাছে যাব।

২৮শে নভেম্বর, ১৯৯৯, রবিবার। সকালে বেরিয়ে এসে আমার প্রেসকিপশান গুলো গুছিয়ে নিলাম ডাক্তারের কাছে যাবো বলে। বিকেলে ডাক্তার অতনু ঘোষকে দেখালাম। তিনি প্রেসার চেক করলেন। ওপরের প্রেসার ১৩৬ এবং নীচেরটা ৮৪। বললেন, প্রেসারতো নরমাল আছে সকালে ডাক্তার গৌতম বসু আমার প্রেসার দেখেছিলেন তখন আমার প্রেসার ছিলো ওপরের টা ১৩০ এবং নীচেরটা ৮০।

আজ প্রেস ক্লাবে চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং এর ককবরক একাডেমির মিটিং ছিলো। অসুস্থতার জন্যে আমি যেতে পারিনি। নগেন্দ্র জমাতিয়া এবং শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ককবরক একাডেমির মিটিং সেরে প্রেসক্লাব থেকে সোজা আমার ধ্রুব কর্তার বাড়ির বাসায় এসেছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি, গিয়েছিলাম ডাক্তার অতনু ঘোষের কাছে।

২৯শে নভেম্বর, ১৯৯৯, সোমবার। ভোর বেলায় বেড়াতে বেড়াতে নগেন্দ্র জমাতিয়ার কোয়র্টারে গেলাম। সেখানে গতকাল প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং-এর ককবরক সাহিত্য একাডেমির মিটিঙয়ের আলোচনা শুনলাম। ককবরক লিপি বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে এবং রাজনীতির শিবিরী বিভাজন কাটিয়ে কীভাবে ককবরক সাহিত্যের বিকাশ হয় তার জন্যে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মিটিঙ-এ শ্যামাচরণ ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন।

৩০শে নভেম্বর, ১৯৯৯, মঙ্গলবার। ভোর বেলায় বেড়াতে বেড়াতে টাউন প্রতাপগড়ে গেলাম সখিচরণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডঃ সুধীর মজুমদারের বাড়ি পুত্র সুরঞ্জনের ইস্কুলের চারকির ব্যাপারে। সেখান থেকে পাঁচ টাকায় রিক্সায় চেপে গেলাম উত্তর বণমালীপুরে ভগবান ঠাকুর পাড়ায় শিক্ষা বিভাগের উপঅধিকর্তা শ্রীযুত উপেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার বাড়ি। পুত্রের চারকির ব্যাপারে আলোচনা করলাম তাঁর সঙ্গে। তিনি বললেন, জুন মাসে মাস্টারী পেয়ে যাবে। তিনি ককবরকে লেখা ও ককবরক সম্পর্কিত বই কিনতে চাইলেন সরকারের পক্ষে।

বাড়ি ফিরে প্রেসারের ওষুধ খেলাম। তারপর দশটায় স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। আজ ছিলো সিন্ডিকেটের মিটিং।

বিকেল চারটেয় এলাম ত্রিপুরা দর্পণে। দর্পণ-সম্পাদক সমীরণ রায় সি.পি.আই. নেতা অঘোর দেববর্মার 'ত্রিপুরার উপজাতিদের রাজনীতির ক্রমবিবর্তন' বইয়ের প্রুফ দিলেন। তারপর বায়াস ফিরে একটু বিশ্রাম করে গেলাম বণমালীপুরে অঘোর দেববর্মার বাড়ি। অঘোর বাবু তাঁর বইয়ের ঝরঝরে প্রুফ দেখে খুব খুশি হলেন। সেখান থেকে হেঁটে গেলাম বিজয়কুমার চৌমুহনীর অক্ষর প্রকাশনীর অফিসে। সেখান থেকে শুভব্রত দেবের কাছ থেকে অক্ষর প্রকাশনীর কেটালগ নিলাম শিক্ষা উপঅধিকর্তা উপেন্দ্র দেববর্মাকে দেবার জন্যে।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৯, বুধবার। বিংশ শতাব্দীর শেষ মাসের প্রথম দিন। ভোরের হাওয়া খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বাসায় ফিরলাম। এরপর গেলাম উত্তর বনমালীপুরে উপশিক্ষা অধিকর্তা শ্রীযুত উপেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি। তাঁকে অক্ষর প্রকাশনীর কেটালগ দিলাম। তিনি ককবরক বই এবং ককবরকের ওপর গবেষণার বইগুলোর ওপর দাগ দিলেন এবং বুক পারচেজ কমিটির অন্য সদস্য চিত্ত জমাতিয়াকে আর একখানা ক্যাটালগ দিতে বললেন। তারপর তিনি তাঁর ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ করে কার্ড দিলেন।

বাসায় ফিরে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে স্নানে গেলাম। স্ত্রী সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেরিয়ে পড়লাম সকাল ১০ টায়। গিয়ে দেখি আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ-- বেতন হলো না। এদিকে চলছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের

মিটিং। তাই ৪.৩০ পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। রেজিস্ট্রার ডঃ দীপক চৌধুরী বেরিয়ে বললেন, 'ককবরকের নতুন কোর্স পাশ হয়ে গেছে কুমুদবাবু।' রেজিস্ট্রার সাহেবের কথা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন সফল হলো আজ।

তারপর বেরিয়ে পড়লাম বাসার দিকে। বাসায় ফিরতে মধ্য বনমালীপুরে অঘোর দেববর্মার বাড়ি গিয়ে তাঁর বইয়ের প্রুফ চাইলাম। তিনি বললেন, 'অনেক লাইন বাদ পড়ে গেছে, সমীরণ রায়কে ভাল করে ছাপতে বলবেন।' এলাম দর্পণ অফিসে, সমীরণ রায়কে সব বললাম।

২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার। সকালে বেরিয়ে গেলাম কুমারীটিলায় চিত্ত জমাতিয়ার কাছে। তাঁকে অক্ষর প্রকাশনীর একখানা ক্যাটালগ দিলাম ককবরক সম্পর্কিত বই কেনার জন্যে।

সেখান থেকে ফিরে প্রেসারের ওষুধ খেলাম। দশটায় স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। দুপুরে ডেপুটি রেজিস্ট্রার কল্যাণবিজয় জমাতিয়ার কোয়ার্টারে তাঁর স্ত্রী হাতের চা রুটি খেয়ে বাসায় ফিরলাম তিনটায়। একঘন্টা বিশ্রাম করে কমরেড নিধু ভূষণ হাজরার বাড়ি গেলাম। সেখান থেকে গেলাম ম্যাগনেট ক্লাবের পাশে অধ্যাপক ডঃ কমল কুমার সিংহের বাড়ি। গিয়ে শুনি কমলবাবুর স্ত্রী তাঁর ছোট মেয়ে বুবুকে নিয়ে আজই কলকাতায় গেছেন তার অপারেশানের জন্যে। ফিরতে ঢুমারলাম অক্ষর প্রকাশনীতে। তারপর বাসায়।

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯৯, শুক্রবার। কাকভোরে বেরিয়ে হাওয়া খেতে গিয়েছিলাম রাজবাড়ির দীঘির পাড়ে। ফেরার সময় দুধ ও কাগজ নিয়ে এলাম বাসায়। ফিরেই সাতটার সময় গেলাম ধলেশ্বরে ডাঃ সঞ্জয় নাথের চেম্বারে। সেখানে রক্ত দিলাম সোডিয়াম ও পটাশিয়াম পরীক্ষা করার জন্যে। সকাল ৮ টায় বাসায় ফিরে প্রেসারের ওষুধ খেলাম। তারপর চুল কাটতে গেলাম কর্ণেল চৌমুহনীতে নিতাই শীলের সেলুনে। ফিরে স্নান সেরে ভাষার কাজ নিয়ে বসলাম। দশটায় স্ত্রী অফিসে বেরিয়ে গেলেন। আমি তার সঙ্গে গেলাম না। দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ককবরক অভিধানের কাজ করে ভাত খেয়ে বিশ্রাম করে ২.৩০ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সিন্ডিকেটের রিপোর্ট সংগ্রহ করলাম। দেখলাম 'সেন্টার ফর ট্রাইবেল লেঙ্গুয়েজেস' পাশ হয়ে গেছে। তারপর ডেপুটি রেজিস্ট্রার অধ্যাপক কে.বি.জমাতিয়ার সঙ্গে তাঁর বাসায় এসে চা খেলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে ডাঃ সঞ্জয় নাথের চেম্বারে গিয়ে রক্তের রিপোর্ট নিলাম। তারপর গেলাম শিল্পী চিন্ময় রায়ের প্রদর্শনী দেখতে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯৯, শনিবার। সকাল ৭ টায় ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার চেম্বারে গেলাম রক্ত প্রস্রাব পরীক্ষা করানোর জন্যে। সেখান থেকে ফিরে প্রেসারের ওষুধ খেলাম। ইতি মধ্যে কমরেড অমূল্য শর্মা এলেন। তিনি যাবেন বম্বে এ.আই.টি.ইউ.সি'র সম্মেলনে। তাঁকে ২০০ টাকা দিলাম। দশটায় বেরিয়ে খাদির দোকানে গিয়ে ১২৫ টাকা দিয়ে শার্ট কিনলাম একটা। সেখান থেকে গেলাম নেতাজী চৌমুহনীর P.W.D এর Estate অফিসে অমিতা দেববর্মার কাছে সরকারী কোয়ার্টারের দরবার করতে। ফেরার পথে একটু দর্পণ পত্রিকার অফিসে ঢুকলাম। বাড়ি ফিরে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। চারটের সময় বেরিয়ে পড়লাম প্রয়াত কমরেড বীরেন দত্তর বাড়ি। সেখান থেকে এলাম শুভাশিস তলাপাত্রের বাড়ি। সেখান থেকে অক্ষর প্রকাশনীতে এই তিন জায়গায় গিয়েছিলাম এ.এই.টি.ইউ.সি'র চাঁদা নিতে।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯, রবিবার। খুব সকালে ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মা এলেন আমাদের বাসায়। বললেন, আজ সন্ধ্যায় ডাঃ পার্থ দেববর্মার আত্মীয় স্বজনেরা আপনার বড় মেয়েকে দেখতে আসবেন। এই শুভ খবরে খুব আনন্দ হলো আমার। যাক, তাহলে পাত্র ডাঃ পার্থ দেববর্মার মন ফিরেছে দেখা যাচ্ছে।

সন্ধ্যে ৬.৩০ এ পাত্র পক্ষের দশজন আমার বড় মেয়েকে দেখতে এলেন । ছেলে ডাঃ পার্থ দেববর্মার বৃদ্ধা মাও এসেছিলেন । মেয়ে দেখানোর সময় আমার বাড়ির মালিক ধ্রুব কর্তা ও তাঁর স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন । আমার শ্যালক সুনীল ও তাঁর বৌ-শালী তাঁরাও উপস্থিত ছিলো । পাত্রপক্ষ আমার মেয়ে দেখে পছন্দ করলেন এবং ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বিয়ের তারিখ ঠিক হলো । আমার মেয়ে পাত্র পক্ষের আত্মীয় স্বজনকে প্রণাম করতেই তাঁরা প্রত্যেকে ৫০ টাকা করে তাঁর হাতে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন । তাঁরা চলে গেলে পর আমি দর্পণ পত্রিকা অফিসে গিয়ে সমীরণ রায়কে সব জানালাম । তারপর সেখান থেকে ফিরে আমার প্রতিবেশী ও আত্মীয় শ্রীযুত পরশুরাম দেববর্মাকেও সব বললাম । পরশুরাম বাবুর বড় ভাগ্নে অরুণ বিয়ে করেছেন আমার হবু জামাই পার্থ দেববর্মার বোনকে । তিনি ছিলেন মেয়ে দেখার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে।

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯, সোমবার। সকালে ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার চেম্বারে গিয়ে আমার রক্ত ও প্রস্রাবের রিপোর্টগুলো নিলাম । রিপোর্টে কোন গন্ডগোল নেই দেখা গেল । কিডনির ক্রিয়াটিনিন দুই থেকে এক'এ নেমে এসেছে । রিপোর্ট দেখে মনে হলো পুনর্জন্ম লাভ করলাম। ঠিক করলাম, আজ রাতের বেলায় আমার পি. জি হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ পাহাড়ীকে ফোন করে এই ভালো খবরটা জানাবো। তিনিও কলকাতায় বসে আমার জন্যে উদ্বেগের মধ্যে থাকেন।

সন্ধ্যে বেলায় স্বামী-স্ত্রীতে গেলাম ভগবান ঠাকুর পাড়ায় উপশিক্ষা অধিকর্তা উপেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার ছেলের বৌভাতে । বিরাট ভোজের আয়োজন । আমার স্ত্রী মাংস খেলেন খুব বেশী করে । আমি খেলাম নিরামিষ । আগরতলার ঠাকুর কর্তার পরিবারের অনেককে দেখলাম সেখানে । আমাদের সামনে বসে খাচ্ছিলেন আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের অধীকর্তা শ্রীযুত নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা কিছু দুরে দেখলাম বিধানসভাব ডেপুটি সেক্রেটারি শ্রীযুত নরেশ চন্দ্র দেববর্মা ভুরিভোজন করছেন । উপেন্দ্রবাবুর পুত্রবধূটিকে খুব সুন্দরী দেখলাম । পুত্রবধূর পাশে উপেন্দ্রবাবুর ডাক্তার মেয়ে বসেছিলো । তাঁর নববিবাহিত পুত্র ইঞ্জিনিয়ার ছেলে প্যান্ট সুট নেক টাই পরে পাকা সাহেব ।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯, মঙ্গলবার । বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আমার কলেজ জীবনের অধ্যাপক ডঃ অরুণ বসুর সঙ্গে দেখা করলাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসে । তিনি কলকাতা থেকে এসেছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রশ্নপত্র মডারেশানের কাজে ।

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯, বুধবার। অসুস্থ হয়ে জি.বি. হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি রাত ১১ টার সময় । আমার সহভাড়াটীয়া ডাঃ গৌতম বসু সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন । আমার হার্টবিট ৪৫এ নেমে এসেছিলো । ডাঃ বসু অত রাত্রে কেয়ার এন্ড কিউর নার্সিংহোম থেকে ই.সি.জি. মেশিন এনে আমার ই.সি.জি. করেন এবং বলেন আমার হার্ট ব্লকেজ হয়েছে । তখন তিনি আমার বাসার মালিক ধ্রুবকর্তা (ধ্রুবকিশোর দেববর্মা) সঙ্গে আলোচনা করেন । কর্তা আমাকে তাঁর নিজেব গাড়ি নিজে ড্রাইভ করে জি.বি. হাসপাতালে নিয়ে যান । সেখানে বন্ধুবর অধ্যাপক অমিতাভ সিনহার ছোট ভাই ডাক্তার অরুনাভ সিনহা আমাকে দেখে চিনতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন । তিনি বাড়ি ফিরে তাঁর অধ্যাপক দাদাকে আমার অসুস্থতার কথা জানান । আজ সারা রাত আমার স্ত্রী ও পুত্র সুরঞ্জন আমার বেডের পাশে থেকে উদ্বেগের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার। আমি জি বি হাসপাতালের Male Medical Ward-এর ১৫নং বেডে আছি । আমার ডাক্তার হলেন ডাঃ গৌতম রায় চৌধুরী । তিনি প্রেসারের ওষুধ Stamlobeta'র পরিবর্তে Amlosyl খেতে বলেছেন । আর I-vit ট্যাবলেট খেতে দিয়েছেন । তাছাড়া আগের ওষুধ Libotryp এবং Florinef থাকছে । কিন্তু Florinef সপ্তায় তিন দিনের পরিবর্তে

দুই দিন খেতে হবে। Libotryp দিনে ৯টার এবং রাত ৯টার ১/২ এর পরিবর্তে রাত ৯টায় পুরো ১টা খেতে বলেছেন। বেলা ১০টায় বন্ধুবর বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া এসে আমাকে General bed থেকে ৬নং Cabin-এ এনে দিয়েছেন। ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মা এই সময়ে সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। ডাঃ গৌতম রায় চৌধুরী আমার হার্ট ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন। আমার হার্ট ব্লক হয়নি। ওষুধ পাল্টে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ... বললেন, after breakfast ১/২ Anxit tablet খেয়ে নিতে। জিবি হাসপবাতালে ভর্তি হবার পর যাঁরা দেখতে এসেছেন ঃ দীপক ভট্টাচার্য, নিধু হাজরা, শ্যামল চৌধুরী, কমল রায় চৌধুরী, অঘোর দেববর্মা, সীমা দাশগুপ্ত, নগেন্দ্র জমাতিয়া, কমল রায়চৌধুরী, পবিত্ররাণী জমাতিয়া, চন্দ্রোদয় রূপিনী, ডাঃ গৌতম বসু, ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মা, অধ্যাপক মনোরঞ্জন দত্ত, সুনীল দেববর্মা সস্ত্রীক, কম. সুনীল দাশগুপ্ত ও কমরেড সুরেন্দ্র দেবনাথ প্রমুখ।

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯, শনিবার। ডা: গৌতম রায় চৌধুরী বললেন, আমার ই সি জি রিপোর্ট ঠিক, হার্টে কোন দোষ নেই। Anxit প্রয়োজন না হলে খাবেন না। Libotryp সকালে আধখানা এবং রাতে শোবার সময় ১টা খেতে পারেন। Zyloric বন্ধ করে দিতে বললেন। I-VIT কয়েকদিন খেয়ে বন্ধ করতে বললেন। Florinef সপ্তায় ২দিন খেতে বললেন। বললেন, কুচো মাছ, ক্যাবেজ, টমেটো প্রভৃতি খেলে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায়। আর বললেন, ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মাকে সব বলে গেলেন। বললেন, আজ (১১.২.৯৯)-ই চলে যেতে পারেন, তবে আজ শনিবারের বারবেলা, আগামীকাল যাবেন। আজ সন্ধ্যে ৬.৪৫ মিনিটে ব্লাড প্রেসার বেড়েছিলো এবং উপরেরটা ছিল ১৪০ এবং নিচেরটা ছিল ৯০। ডা: গৌতম রায় চৌধুরী বললেন, ওটা কিছু নয়। ওষুধ অ্যাডজাস্ট হয়ে গেলে ব্লাড প্রেসার আর বাড়বে না। তিনি আরো দু'একদিন থাকতে বললেন, রাতের বেলায় আমার ছেলে সুরঞ্জন সব জানিয়ে আমার পি জি'র নেফ্রোলজি'র ডাক্তার ডা: ডি কে পাহাড়িকে কলকাতায় ফোন করে। ডা: পাহাড়ি বলেছেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই তবে Amlosyl এর পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিতে হবে। আমার দিনের প্রাইভেট নার্সের নাম শান্তা চক্রবর্তী ও রাতের নার্সের নাম নমিতা গোপ। তাঁরা আমাকে খুব সেবা-শুশ্রূষা করেছেন।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯, রবিবার। বিকেল ৪.১৫-এর সময় Anxit ট্যাবলেট খাওয়া সত্ত্বেও বিকেল ৪.৩০-এর সময় ব্লাড প্রেসার বাড়তে শুরু করলো এবং রাত ৯টা পর্যন্ত এইভাবে চললো, আমার স্ত্রী, শ্যালক বিমল ও প্রাইভেট নার্স জলবাতাস করতে লাগলো। পর পর ৩জন ডাক্তার এসে আমাকে দেখলেন। ব্লাড প্রেসার বেড়ে ১৭০/৯০ হলো। অর্থাৎ ওপরের প্রেসার ১৭০ এবং নিচের প্রেসার ৯০। এই ৩জন ডাক্তারের মধ্যে একজন জমাতিয়া ছিলেন এবং ডা: প্রদীপ ভৌমিক ছিলেন। ডা: জমাতিয়ার নাম স্বপন জমাতিয়া। তাঁর সঙ্গে আমার বড়ো মেয়ের বিয়ের কথা হয়েছিলো।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯, সোমবার। জি বি হাসপাতাল, ৫নং কেবিন। আজ সকাল সাতটায় ঘুম ভাঙলো। আমার স্ত্রী ফুলকুমারী আমার বেডের পাশে সোফায় রাতে ঘুমিয়েছিলেন, তাঁরও ঘুম ভেঙে গেলো। উঠেই দেখি হকার 'দৈনিক সংবাদ' দিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি তাতে চোখ বুলোলাম। এমন সময় প্রাইভেট নার্স নমিতা গোপ দাঁত মাজার জন্যে ব্রাশ এনে দিলো। তারপর ২খানা নোনতা বিস্কুট খেয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেলাম। এমন সময় আজ প্রথম ভিজিটর হিসেবে এলেন উপজাতি যুব সমিতির নেতা চন্দ্রোদয় রূপিনী। আমার সুসাস্থ্য কামনা করে তিনি দেখতে গেলেন উপজাতি যুব সমিতির আর এক নেতা সুখদয়াল জ মাতিয়াকে post operative ward-এ। চন্দ্রোদয় রূপিনী বললেন, 'কাল দুপুরে একবার এসেছিলাম, আপনি তখন ঘুমুচ্ছিলেন, আপনার ছেলে ও মেয়ে (তানিয়ার)র, সঙ্গে কথাবার্তা বলেগেলাম।' চন্দ্রোদয় বাবু যেতেই এলো শ্যালক বিমল। সে আসতেই

আমার স্ত্রী ফুলকুমারী বাসায় চলে গেলেন রাতের খাবার থালা-বাসন নিয়ে। আমি আটটায় প্রাতরাশ সেরে প্রেসারের ওষুধ amlosyl ৫ mg ১টি ট্যাবলেট নিলাম। তারপর কাগজ পড়তে পড়তে পায়খানার বেগ হতেই বাথ রুমে গেলাম। পায়খানায় আজ কাঠিন্য ছিলো না। পায়খানা সেরে এসে দেখি আমার পুত্র শ্রীমান সুরঞ্জন সাহেব সুবো সেজে উপস্থিত। সে আগরতলার আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে সকালে ককবরক ভাষায় খবর পড়ে এলো। তাকে একজন হাজাম ডাকতে বলতেই সে বেরিয়ে গিয়ে জিবি বাজার থেকে একজন হাজাম ডেকে আনলো। হাজাম আমার দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে ১০ টাকার বিনি১৻য়ে। দাড়ি কামিয়ে স্নানে গেলাম। স্নান সেরে Libotryb ১/২ খেলাম। এর মধ্যে দিনের নার্স শান্তা চক্রবর্তী এসে গেলেন। হাসপাতালের রোজনামচা লিখতে লিখতেই এলেন শ্রীযুক্ত অনিরুদ্ধ দাশ। তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের P.A ছিলেন। তিনি একজন তাত্ত্বিক কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচিত। তাঁর ভগ্নীপতি ছিলেন বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিং। মণি সিংয়ের ছেলে-মেয়ের কথা জানতে চাইলে তিনি বললেন, মণি সিংয়ের এক ছেলে। ছেলে ডাক্তার, ছেলের বৌও ডাক্তার। ঢাকায় থাকেন ওঁরা। মণি সিংয়ের এক ছেলে বাঙলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। তিনি তাঁর মামা অনিরুদ্ধ বাবুকে নিয়মিত ভাবে বাঙলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'একতা' পাঠান। কথায় কথায় অনিরুদ্ধ বাবু বললেন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মতো বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও দু'ভাগ হয়ে গেছে। তিনি সি পি আই ও সি পি এম—এই উভয় পার্টিকে সমালোচনা করলেন তাদের মধ্যে বিত্তসুলভ আচার-আচরণের জন্যে। ১০নং কেবিনে তাঁর স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়ে চিকিৎসিত হচ্ছেন। পড়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রী স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। বাড়িতে তাঁর ইঞ্জিনিয়ার ছেলে ও তার বৌ আছে। অনিরুদ্ধ বাবুর কোনো মেয়ে নেই, মাত্র দু'ছেলে।

বিকেল বেলায় আমার যখন ব্লাড প্রেসাব বেড়েছে তখন বন্ধুবর নগেন্দ্র জমাতিয়া ও জমাতিয়া হদা-অক্রা (জমাতিয়া উপজাতিদের নির্বাচিত সমাজপতি) বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া আমাকে দেখতে এলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ বসে চলে গেলেন। নগেন্দ্রবাবু বললেন, কাল সকাল ৯টায় এসে আমার চিকিৎসক ডা: গৌতম রায় চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করবেন।

আজ রাত্রে আমার স্ত্রী ও পুত্র সুরঞ্জন আমার সঙ্গে কেবিনে রাত কাটালো। প্রাইভেট নার্স নমিতা গোপও কেবিনে রাত্রে ঘুমুলেন।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯, মঙ্গলবার। (জি বি. হাসপাতাল, কেবিন নং ৫) আজ সকাল (১৪.১২.৯৯) ১০-৩০-এর সময় Dr. Gautam Roy Choudhury এবং Dr. Gan Choudhury দেখতে এলেন। Dr. Roy Choudhury কে গত কালের প্রেসার বাড়ার কথা বলনাম তিনি Anxit-এর পরিবর্তে petril (0.5 mg) খেতে বললেন সাকল ৮টায় ১টি এবং রাত ৮টায় ১টি একটি। Dr. Roy Choudhry এবং Dr. GanChoudhury থাকা কালীন বন্ধুবর নগেন্দ্র জমাতিয়া এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুমুদ বাবুকে কবে ছাড়ছেন ?' Dr. Roy Choudhury বললেন, 'উনি ভালোই আছেন, তবে উনাকে একটু observation -এ রেখেছি - বিকেলে কেন প্রেসার বাড়ছে।' দুপুরে স্নান করে ১২টায় খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঠিক তখন আমাকে দেখতে এলা আমার মামাতো শালী পরিমল দেববর্মা তার মেয়ে উষারাণীকে নিয়ে। তাদের সঙ্গে এলো আমার শ্যালক সুনীলের স্ত্রীও তার দিদির মেয়ে শুক্লা।

ঘুম থেকে উঠে ৩ টার সময় Anxit ট্যাবলেট ১টি খেয়ে নিলাম। একসময় ১০নং কেবিন থেকে অনিরুদ্ধবাবু আমাকে দেখতে এলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'আচ্ছা কুমুদবাবু, আপনার সঙ্গে আমার প্রথম কবে পরিচয় হয় ?' আমি বললাম, '৮০' দাঙ্গার সময় আমি প্লেন থেকে নেমে যে জিপে

করে বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়ি যাচ্ছিলাম, সেই জিপেই আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। আপনি বলছিলেন, লোকে বলছে জমাতিয়ারাই এই দাঙ্গা করেছে। এর মধ্যে জিপ এসে পৌঁছলো বীরচন্দ্র দেববর্মা বাড়ির সামনে। তাড়াহুড়ো করে নামতেই আমি ১টি ব্যাগ নামাতে ভুলে গেলাম। আপনি বিকেলে ব্যাগটি হাতে করে বীরচন্দ্র বাবুর কৃষ্ণনগরের বাড়ি এসে দিয়ে গেলেন। আর তখন থেকেই আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় বেড়ে গেলো।'

নার্স শান্তা চক্রবর্তী আমাকে বেশী কথা বলতে বারণ করলেন। ঠিক এর মধ্যেই আমার গা ঘামতে শুরু করে প্রেসার বেড়ে গেলো। মাথা, ঘাড় ব্যথা করতে লাগলো। আমি শুয়ে পড়লাম। আমার স্ত্রী-পুত্র আমার ঘাড়-মাথা টিপে দিতে দিতে বাতাস করতে লাগলো। রাতের নার্স নমিতা গোঁপ আমার মাথায় ঠান্ডা তেল - মালিশ করতে লাগল লো। ৮টার সময় অনেকটা স্বাভাবিক হলে ৮-২০ মিঃ-এ ১টি Libotryp খেলাম। তারপর ভাত খেলাম, তারপর Minipress XL ২.৫ খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯, বুধবার। G. B. হাসপাতাল কেবিন নং ৫ (Old Cabin)-এ আজ প্রথম Visitor যাঁরা আমাকে দেখতে এলেন, তাঁরা হলেন বিশিষ্ট ককবরক লেখক শ্যামলাল দেববর্মা ও তাঁর স্ত্রী। শ্যালাল বাবুর স্ত্রী পাছড়া পরে এসেছিলেন, দারুণ মানিয়েছিলো তাঁকে। তাঁরাই এসে আমদেরকে ঘুম থেকে তুললেন। আমার শরীরের কথা জিজ্ঞেস করলেন। পরে আমি বললাম, 'ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরক সার্টিফিকেট কোর্সে সুধন্বা দেববর্মার 'হাচুক খুরিঅ' (পাহাড়ের কোলে) পাঠ্য হয়েছে। এখন বই পাওয়া যাচ্ছে না।' তিনি বললেন, 'অক্ষর প্রকাশনী 'হাচুক খুরিঅ' উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছে প্রথম খণ্ডের, ওখানেই পাওয়া যাবে।' আমি বললাম, '১০টি আধুনিক ককবরক কবিতাও পাঠ্য হয়েছে, তার মধ্যে তাঁর কবিতাও আছে।' শ্যামলবাবু উঠে পড়লেন, বললেন, 'আজ খুমুলুঙে পঃবঙ্গের মন্ত্রী Visit করতে যাবেন, তাই তাড়াতাড়ি সেখানে যেতে হবে।

শ্যামলালু বাবু চলে যেতেই আমার ছোটো মেয়ে দেবযানী টিফিন ক্যারিয়ার করে আমার সকালের খাবার নিয়ে এলো। সকাল সাতটা Petrrl .05 mg ওষুধ খেলাম। এরপর সুরঞ্জন বাসায় চলে গেলো। দুটো সোফা এক করে সে গতরাতে জ্যামাপ্যান্ট পরে শোয় কোনো মতে। আমার মশারীর মধ্যে একদিকে আমার স্ত্রী কোনো মতে রাত কাটালেন। রাতের প্রাইভেট নার্স নমিতা গোপও আরেকটা লম্বা সোফায় শুয়েছিলো। আজ বোধ হয় ডাঃ গৌতম রায় চৌধুরী আমাকে ছেড়ে দেবেন। তাই নমিতাকে তার ৬ রাতের পাওনা 70 x 6 = 420 টাকা আমার স্ত্রী পেমেন্ট করে দিলেন। আমাকে সকালের খাবার খাইয়ে আমার স্ত্রী বাসায় চলে গেলেন সমস্ত বাসি জিনিষপত্র নিয়ে। আবার ছটায় খাবার নিয়ে আসবেন বললেন।

এর মধ্যে স্নান সেরে নিলাম ১০ টার মধ্যে। ঠিক ১০-৩০ আমার চিকিৎসক ডাঃ গৌতম রায় চৌধুরী এলেন। প্রথমে পাল্‌স দেখলেন, বললেন, পালস্‌ very good fiunction করছে। এরপরে প্রেসার দেখলেন ওপরের প্রেসার ১৬০ এবং নিচের প্রেসার ৮০। বললেন, সত্যর সঙ্গে কথা বলেছি, আজই বাড়ি যেতে পারবেন। এ সময় নগেন্দ্র জমাতিয়া এলেন, বললেন, 'কবে ছাড়বেন আমার বন্ধুকে?' আজই ছাড়ছি, সহাস্য ডাঃ চৌধুরী বললেন। বললেন Petril 0.5 সকাল ৭টা, বিকেল ৪টা এবং সন্ধ্যা ৭টায় দিয়েছি, প্রেসার আর বাড়বে না। এরপর তিনি আমার পুত্র সুরঞ্জনকে নিয়ে সিস্টারদের রুমে গেলেন রিপোর্ট লিখতে। discharge certificate -এর সঙ্গে Prescription ও করে দিলেন।

সব গুছিয়ে প্রাইভেট নার্সদের টাকা এবং কেবিন ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমরা ১টার সময় বেরিয়ে পড়লাম। পুত্র সুরঞ্জন আগের থেকে অটো রিজার্ভ করে রেখেছিলো। সে একটি ট্রলি করে আমাকে

নিয়ে উঠলো। সঙ্গে আমার স্ত্রী ও পুত্র। বেলা দেড়টায় বাসায় এলাম। বাসায় ঢুকতেই ধ্রুবকর্তার স্ত্রী অদিতা দি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন? বললাম, 'ভালোই, তবে শরীর খুব দুর্বল।' এরপর ঘুমিয়ে পড়লাম। উঠলাম ৪টের একটু আগে। উঠেই Petril 0.5 ১টি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য এসে ড্রয়িং রুমে বসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগলেন। এর মধ্যে ৭টা বেজে গেলো, আমি আরেটা Petril 0.5 খেয়ে নিলাম। এরপর রামেশ্বরবাবুকে আমার শোবার ঘরে ডাকলাম। তিনি এসে আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কথা বলতে লাগলেন। বললাম, শঙ্করী বসুর সংবর্দ্ধনার ব্যাপারে শিশিরবাবু কলকাতা থেকে ফিরলেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে। তিনি বললেন, আপনি এখন আর এই শরীরে বাড়তি আর কোন চিন্তা করবেন না।

রামেশ্বর বাবু চলে গেলে আবার তালা মেরে শুলাম। এর মধ্যে এলেন সুরেন্দ্র দেবনাথ। তিনি ড্রয়িং রুমে বসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন। রাত ৮টা বাজলো, প্রেসার আজ আর বাড়লো না বোঝা গেলো। আসলে Petril কাজ করেছে। এরপর রাত ৮টা ৩০ মিনিটে mini-Press 2.5 mg ১টি খেলাম। তার ২০ মিনিট পরে খেলাম ভাত। ঠিক রাত ৯টা Minipress 2.5 mg ১টি খেলাম। তারপর Uric Acid-এর ওষুধ Zyloric ১টি ট্যাবলেট খেয়ে নিলাম। তারপর শোবার আগে agorol ২ চামচ পায়খানার ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার স্ত্রীও আমার পাশে শুলেন। এবং বুঝতে পারলাম তিনি মাঝে মাঝে আমার শরীর ধরে দেখছিলেন, আমি কেমন আছি।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার। ধ্রুব কর্তার বাড়ির বাসায়। গতকাল রাতে আমার ছেলে সুরঞ্জন কলকাতায় P.G. হাসপাতালের Nephrology'র আমার চিকিৎসক ডাঃ D.K. pahari কে ফোন করেছিলো।

আজ উঠতে দেরী হলো, সকাল প্রায় ৭টায় উঠলাম। নোনতা বিস্কুট ২খানা খেয়ে Petril 0.5 একটা খেয়ে নিলাম। তারপর ৮টার সময় খেলাম Amlosyl। ৯টার সময় Libotryp ১/২ খেলাম। কিন্তু কিছুতেই পায়খানা হচ্ছিলো না। স্নান করে নিয়ে কিছু ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর উঠলাম। আমার স্ত্রী হাত দিয়ে পেটে মালিশ করতে লাগলেন, তাতেও পায়খানার বেগ হলো না। তারপর ১.৩০-এ দুপুরের ভাত খেয়ে অনেক চেষ্টা করে ৩.৩০'র পায়খানায় গেলাম একটু খানি পায়খানা বেরোলো। তারপর ৪টার সময় Petril 0.5 একটি খেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। সন্ধ্যের আগে আর উঠলাম না। শুনলাম বিকেলে চিত্র পরিচালক দীপক ভট্টাচার্য, ককবরক সংবাদ পাঠক নির্মলেন্দু আচার্য ও উষা (আমার মামাতো শালীর মেয়ে) ও তার স্বামী আমাকে দেখতে এসেছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯, শুক্রবার। ধ্রুব কর্তার বাড়ি। সকাল ৬.৪৫-এ ঘুম ভাঙলো। ডঃ পাহাড়ীর পরামর্শ অনুসারে সকাল ৭টায় আর Petril ট্যাবলেট খেলাম না। ৮টার সময় Amlosyl ১টি খেলাম। ৯টায় খেলাম ১/২ Libotryp, তার পরে পায়খানায় গেলাম। কিছুটা স্বাভাবিক পায়খানা হল। পরে একমুঠো ভাত খেয়ে নিলাম বৌ-ছেলে মেয়ের সঙ্গে। স্ত্রী অফিস চলে গেলেন, পুত্র কলেজে। বড়ো মেয়ে তানিয়ার ক'দিন ছুটি Test-এর খাতা দেখছে। সকালের খাওয়া খেয়ে শুয়ে পড়লাম। উঠলাম ১১.৩০ এ। এরপর K.P.S. Menon -এর Delhi - chungking বখানা নিয়ে পড়তে বসলাম। বইখানার ভূমিকা লিখেছেন জহরলাল নেহরু ১৯৪৬ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী। ভূমিকাটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান। ঠিক ১২টায় স্নান সারলাম। তাপর দক্ষিণের ঘরের রৌদে বসে আবার K.P.S Menon-এর বই খুললাম। বড় মেয়ে তানিয়া ভূগোলের খাতা দেখছে আমার পাশে বসে। ছোটো মেয়ে দেবযানী T.V. দেখছে। ১.৩০ মিনিটে ভাত খেলাম। ভাত খেয়ে আবার দক্ষিণের ঘরে

রৌদ্রে বসেছি। এমন সময় প্রাক্তন ছাত্র সুবীর অধিকারী এলো, লাইব্রেরি থেকে আমার কার্ডে তাকে বই ইস্যু করে দিয়েছিলাম, নেট পরীক্ষা দেবে সে।

একটু পরে পুত্র সুরঞ্জন কলেজ থেকে ফিরে এলো। সে রামঠাকুর কলেজে ইংরিজি পড়ায়। সঙ্গে করে নিয়ে এলো সে আমার নানারকম ওষুধ। সাড়ে তিনটে বাজলে আমার ছোট মেয়ে দেবযানী আমাকে কলমা লেবু খেতে দিলো। এখন ৪টা বাজলে প্রেসার যাতে না বাড়ে তার জন্যে Petril 0.5 mg ১টা খেয়ে শুয়ে পড়বো। এই ফাঁকে Times of India'য় একটু চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি। টি. ভি.তে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত 'উমারাহ্ যান' হচ্ছিল। আমার তিন ছেলে মেয়ে খুব তারিফ করে তা দেখছিলো। এরই ফাঁকে দেবযানী ঘর ঝাঁট দিয়ে দিনের কাজ শেষ করে ফেলছিল। ঠিক চারটের সময় ১টি Petril 0.5 খেয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম ভয়ে ভয়ে, যদি আবার প্রেসার বাড়ে। তাই ভেতরের ঘরে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর খাটে ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম। কিন্তু ঘুম আসে না। বাইরের ঘরে কারা আমার কুশল সংবাদ নিতে আসছেন তা আমি তাঁদের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারি। সন্ধ্যের দিকে এলেন চিত্র পরিচালক দীপক ভট্টাচার্য। তিনি আমার স্ত্রীর কাছে আমার স্বাস্থ্যের সংবাদ জেনে চলে গেলেন। পরে এলেন আমার প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত পরশুরাম দেববর্মার স্ত্রী ও কন্যা রিঙ্কি। তাঁরা অনেকক্ষণ ছিলেন। এরপর এলেন আমাদের জামাইতুল্য বাবুন সেনগুপ্ত (রূপার বর) বাবুন T.V'র ঘরে বসে অনেকক্ষণ কথা বলল, তারপর ৯টার সময় চলে গেল। যাবার সময় আমার কাছে এসে একটু দাঁড়িয়ে দু'একটি কথা বলে গেল। এদিকে আমার ওষুধ খাবার টাইম হয়েছে। ৮.৪০ মিনিটে Libotryp ১/২ খেলাম এবং ৯টায় ভাত খেলাম। তারপর Minipress 2.5 mg ১টি ও Zyloric (uric Acid-এর ওষুধ) ১টি ট্যাবলেট ও তারপর পায়খানার ওষুধ Agarol ৩ চামচ আমার স্ত্রী চামচি করে খাইয়ে দিলেন। ঠিক ৯-৩০-এ শুয়ে পড়লাম। কিন্তু রাতে খুব ভালো ঘুম হলো না। ১২.৩০-এ একবার প্রস্রাব করতে উঠলাম। তারপর ১ খানা নোনতা বিস্কুট সহ ১ গ্লাস জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। ভোর ৫টায় আমার ঘুম ভেঙে যায়, তখন আমি খালি হাতে ব্যায়াম করে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু এখন তা আর হচ্ছে না। উঠলাম ৬.৩০-এ।

১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯, শনিবার। আজ ঠিক ৬.৩০ -এ ঘুম থেকে উঠে মূত্র ত্যাগ করে পা ধুয়ে, ঘাড়ে জল দিয়ে, কানের পাতা ঠাণ্ডা জলে মুছে এবং দু'হাতের পোঁছা 'ওজু' করার মতো ধুয়ে চোখ মুখ ধুলাম। তারপর দু'খানা নোনতা বিস্কুট খেয়ে ১ গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেলাম। তারপর বাইরের হল ঘরে কিছুক্ষণ Free hand exercise করে খাটের ওপর বসে কিছুক্ষণ যোগ ব্যায়াম করলাম। ঠিক এই সময় আকাশবাণী আগরতলা সেন্টার থেকে স্থানীয় খবর পরিবেশিত হতে লাগলো। আমি চলে এলাম রান্না ঘরে। সেখানে ডাইনিং টেবিলে বসে আমার সারাদিনের খাওয়ার ওষুধ ঠিক করতে লাগলাম। খাতায় লিখলাম নিত্যকার মতো ওষুধের নাম। তারপর বড় মেয়ে তানিয়া দুধ-রুটি খাওয়ালো। তারপর ঠিক ৮টায় প্রেসারের ওষুধ Amlosyl 0.5mg ১টি খেলাম। তারপর রোজ নামচা লিখতে বসলাম। এবং তারপরে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা পড়তে শুরু করলাম। আজ সকাল থেকে কিছুতেই পায়খানা হচ্ছে না। গরম জল খেয়েও পায়খানা হলো না। তখন ১০টার সময় এক মুঠো ভাত খেয়ে দক্ষিণের রৌদ্র করোজ্জ্বল ঘরে বসে Whitsman-এর An aere of Green grass পড়তে শুরু করলাম। এমন সময় এলেন বন্ধুবর বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া আমার কুশল সংবাদ নিতে। তাঁর সঙ্গে উদ্বেগজনক কথা বলতে বলতে এলেন সি. পি. আই. নেতা অঘোর দেববর্মা, লাঠি হাতে কোনো মতে সিঁড়ির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর এই শরীরে তিন তলায় ওঠা সম্ভব নয়। তিনি বললেন, আমার ছেলে যাতে তাঁর ত্রিপুরার উপজাতিদের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের Proof একটু দেখে দেয়। তিনি দর্পণ সম্পাদক

সমীরণকে সব বলে গেলেন । সমীরণই তার এই বই ছেপে দিচ্ছে । কিন্তু প্রথম Proof-এ মারাত্মক সব ভুল হয়েছে, যা থেকে গেলে তাঁর এই বিতর্কমূলক বই একেবারে মাঠেমারা যাবে। তাকে আমি আশ্বাস জানিয়ে বিদায় দিয়ে আবার নগেন্দ্র বাবুকে নিয়ে ওপরে এলাম। নগেন্দ্রবাবুকে তিনি কাল তাঁর বাড়িতে যেতে বললেন । নগেন্দ্রবাবু সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'কাল সকালেই আপনার বাড়ি যাবো ।'

ঠিক বারোটায় স্নান করবার পূর্বে একটু পায়খানা হলো । ঠিক ১২.৩০-এ দক্ষিণের গরম ঘরে বসে জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাঙলা' পড়তে শুরু করলাম । তারপর কিছুক্ষণ বিদেশী লেখকদের Bilingualism-এর ওপর বই পড়তে শুরু করলাম । এর মধ্যে পুত্রের হাতে 'পণপ্রথা একটি সামাজিক অভিশাপ' এই নামে একটা লেখা দর্পণ পত্রিকায় পাঠালাম । দুটোর সময় ভাত খেলাম। ৪টের সময় আপেল ও কমলালেবু খেয়ে একটা Petril 0.5 খেয়ে শুয়ে পড়লাম । বাইরে আসা অতিথিরা সব ফিরে যাচ্ছেন বুঝলাম । আমার বড়ো মেয়ে বলছে, 'বাবা এখন ঘুমুচ্ছেন ।' অথচ আমার ঘুমই আসছিল না । রাত সাতটা নাগাদ বাইরের ঘরে এসে বন্ধুবর সুরেন্দ্র দেবনাথ এসে আমার স্ত্রীর কাছে কুশল সংবাদ নিয়ে গেলেন । রাত ৮টায় প্রেসার যাতে না ওঠে তার জন্যে Petril 0.5 খেয়ে নিলাম । তারপর বিছানায় উবু হয়ে একটু বসলাম । সেই বিকেল চারটে থেকে শুয়ে আছি । রাত ৮.৪০-এ Libotryp ট্যাবলেট ১টি খেলাম-এটি প্রেসার ও ঘুম-দুইয়েরই কাজ করে। তারপর ঠিক ন'টায় প্রেসারের ওষুধ Minipress XL 2.5 mg একটি ও Uric Acid-এর ওষুধ Zyloric এবং পায়খানার ওষুধ Agorol ২ চামচ আমার বড়ো মেয়ে খাইয়ে দিলো । আজ পুত্র একটু আগেই এসেছে । তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'অধ্যাপক কিশোর রায়কে কলকাতায় ফোন করেছিস ?' উত্তরে সে বললো, 'কিশোর কাকা তখনো বাড়ি ফেরেনি, তাঁর মামাকে সব বলেছি।' এরপর বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে, কানের পাতায় জল দিয়ে এবং পায়ের পাতা ধুয়ে মায়ের আশীর্বাদ চেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম । রাত চারটের সময় উঠে একবার পেচ্ছাব করলাম বাথরুমে গিয়ে। আমার স্ত্রী আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন । চারটেয় আসলে আমার ওঠার সময় । কিন্তু ডাক্তার বারণ করায় ওঠা আর হয়ে উঠলো না । উঠলাম আমার শ্যালক বিমলের গলার আওয়াজ পেয়ে- কুমুই (জামাইবাবু) পত্রিকা তুবুখা- জামাইবাবু, পত্রিকা এনেছি । তাড়াতাড়ি উঠে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় চোখ বুলোতে শুরু করলাম । বি. দ্র. এই দিন দুপুরে বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া এসে বললেন, তাঁর স্ত্রী পবিত্ররাণী জমাতিয়াকে তাঁদের হাতিছড়া বাড়ি থেকে উগ্রপন্থীরা তুলে নিয়ে দু'ঘন্টা পরে ছেড়ে দেয়। এই ঘটনায় আমি তাজ্জব বনে গেলাম । নগেন্দ্র জমাতিয়ার বৌকেও উগ্রপন্থীরা কিডন্যাপ করে !

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯, রবিবার । সকাল ৭টায় উঠে চোখমুখ ধুয়ে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা পড়তে লাগলাম। ৮ টায় Amlosyl প্রেসারের ওষুধ খেয়ে পায়খানার খুব চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু পায়খানা হলো না । পরে পুত্র সুরঞ্জন Milk of magnesia এনে দিল। তাই খেয়ে অল্প একটু পায়খানা হলো । সকালে স্নান সেরে ১ মুঠো ভাত খেয়ে নিলাম । তারপর শুয়ে পড়লাম । শ্রীমান সুরঞ্জন আমাকে বেলা ২ টের সময় Dr, Atanu Ghosh (ডিমসাগর)-এর কাছে নিয়ে গেলো । ডাক্তার বাবু বললেন, 'আপনার পালস্ আবার স্বাভাবিক হয়েছে । এই ওষুধ চলুক । Stamlobeta দীর্ঘদিন খেলে Pulse beat কমে যায় । তবে Sugar এর জন্যে PP টা ১৫ দিন পরে করে রিপোর্ট দেখাবেন । এটা একটু alarming ।' বাসায় ফিরে এসে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লাম এবং চারটের সময় ১ টি 0.5 mg petril tab খেলাম । এবং সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লাম । সন্ধ্যেবেলায় রূপা ও তার স্বামী জয়ন্ত গুপ্ত আমাকে দেখতে এলো । তারা রাত প্রায় ৯টা পর্যন্ত ছিলো । যাবার সময় ওরা স্বামী-স্ত্রী কথা বলে গেলো।

ঘন্টা খানেক পরে পায়খানা হলো সামান্য। তারপর স্নান করে ছোট মেয়ে দেবযানীকে বললাম কিছু ভাত দিতে। ভাত খেয়ে 'গবেষকের ডায়েরী'র অগোছালো অবস্থা ঠিকঠাক করতে করতে বেজে গেলো ১.৪৫। দুটোয় ভাত খেয়ে প্রেসার যাতে না বাড়ে তার জন্যে খেলাম Petril 0.5 mg ১/২ বড়ি। তারপর বাইরের গরম ঘরে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বিকেল ৪ টেয় উঠে দেবযানীর কাছ থেকে ফল খেলাম। পাঁচটা বাজতেই বেরিয়ে পড়লাম সান্ধ্যভ্রমণে। গেলাম হাঁটতে হাঁটতে শঙ্কর চৌমুহনীর কাছে 'গিরিরাজ' ফার্নিচারের দোকানে। সেখানে বড়ো মেয়ে তানিয়ার বিয়ের ফার্নিচার ইত্যাদি কিনতে হবে। সেখানে গিয়ে দোকানের মালিক বাদল সাহাকে ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার রেফারেন্স দিতেই খুব খাতির করলেন। এরপর চলে এলাম ওল্ড কালীবাড়ি লেনেন্ নিধু হাজরার বাড়ি। সেখানেই দেখা হয়ে গেলো সুরেন্দ্র দেবনাথের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'মাথার থেকে মেয়ের বিয়ের চিন্তা দূর করুন।'

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯, শুক্রবার। ভোর ৫.৩০-এ উঠে জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন রাজদীঘির পাড়ে জওহরলাল নেহরু পার্কে খালি পায়ে হাঁটার সময় বন্ধুবর কমরেড শ্যামল চৌধুরী এলেন। তাঁকে নিয়ে পদব্রজে গেলাম সূর্য চৌমুহনীর কাছে স্যন্দন অফিসে। সেখান থেকে নান্টু ভট্টাচার্যের কাছ থেকে একখানা স্যন্দন পত্রিকা নিয়ে পুরোনো RMS চৌমুহনী বাঁয়ে রেখে ডানদিকে রাধামোহন সরণীতে পড়ে ভিক্ষু ঠাকুরের বেড়ার গা থেকে তেলাকুচোর পাতা সংগ্রহ করে গেলাম দৈনিক সংবাদে। সেখান থেকে নিখিল সূত্রধর ও শুকলাল দেববর্মার কাছ থেকে একখানা দৈনিক সংবাদ নিয়ে এলাম কর্নেল চৌমুহনীর দর্পণ পত্রিকার অফিসে। সেখান থেকে শ্রীমান মনোজের কাছ থেকে ১ খানা দর্পণ নিয়ে শ্যামল চৌধুরীর সঙ্গে গেলাম তাঁর বন্ধু যজ্ঞেশ্বর সেনের বাসায়। সেখানে গিয়ে তেলাকুচো পাতা ধুয়ে খেতেই এলেন কমরেড নিধু হাজরা ও লেখক কমল রায় চৌধুরী (ছদ্মনাম অঙ্কুর গুপ্ত)। সেখানে রাজনৈতিক কথাবার্তা শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে ৭.৪৫ বেজে গেলো। আজ আর যোগাসন করা হলো না। স্ত্রীর তৈরি রুটি ও শাক খেয়ে প্রেসারের AMLOSYL 5 mg ১ টা খেয়ে নিলাম। তারপর ডায়েরী লিখে গেলাম পরশুরাম দেববর্মার বাড়ি। সেখান থকে সি.পি.আই. নেতা অঘোর দেববর্মাকে ফোন করলাম। উনি বললেন, 'ধনমণি সিংকে নিয়ে ১২ টার মধ্যে আপনার বাসায় আসছি।' অঘোর বাবু বেশ একটু আগেই এসে গেলেন। ধনমণি বাবু তখনো আসেননি। এই ফাঁকে স্নান সেরে নিতেই ছোট মেয়ে দেবযানী একমুঠো গরম ভাত দিলো। ভাত খেয়ে গেলাম শ্যামল চৌধুরীর বাসায় তাঁকে ডাকতে। এসে দেখি কমরেড ধনমনি সিং এসে উপস্থিত। আলোচনার বিষয়বস্তু হলো অঘোর দেববর্মা ক'দিন আগে রাজ্যের আর ৯ টি উপজাতি সংগঠনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সঙ্গে দেখা করে উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান নিয়ে একটা স্মারকলিপি পেশ করেছেন। এটাকে পার্টি বিরোধী কাজ ধরে সি.পি.আই. সেক্রেটারি কমরেড সুনীল দাশগুপ্ত তাঁকে 'শোকচ' করেছেন। কেন ওই ৯ টা সংগঠনের সঙ্গে সি.পি.আই. এর গণসংগঠন ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ-এর পক্ষ হয়ে পরিষদের সেক্রেটারি অঘোর দেববর্মা যোগ দিলেন ? এটা পার্টি ও বামফ্রন্ট বিরোধী কাজ। এই ফাঁকে রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা এলেন।

আজ বিকেল তিনটেয় Publicity Office-এ আগরতলার ১৭শ তম বইমেলার মিটিংয়ে গেলাম। শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার সভাপতি। রয়েছেন মন্ত্রী জিতেন চৌধুরী ও গোপাল দাশ মহাশয়। ঠিক হলো ২০০০ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ ই মার্চ পর্যন্ত মেলা হবে। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে সাহিত্যিক বিমল চৌধুরী সমেত আগরতলার নামকরা লেখকরা উপস্থিত ছিলেন। অপরাজিতা রায় ও শ্রীমতী করবী দেববর্মাও ছিলেন। কবি মিহির দেব আমার পাশে ছিলেন। তিনি বইমেলা সম্পর্কে অল্প-

মধুর সব পরামর্শ দিচ্ছিলেন।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯, শনিবার । আজ ছিলো 'বড়দিন' । প্রাতর্ভ্রমণ করতে ভোর ৫ টায় গেলাম আস্তাবল মাঠে । সেখানে খালি পায়ে বেশ কিছুক্ষণ ছুটলাম । তারপর উত্তর গেটের মধ্যে দিয়ে প্যালেস কমপাউন্ড-এ ঢুকে শ্বেতমহলের পাশ দিয়ে রাজদীঘির পাড় ধরে এলাম গৌহাটিগামী বাসগুলোর কাছে । সাগর ট্রাভেলসের বড় ঘড়িটায় দেখি ৫.৫৩ । এবার তুলসীবতী স্কুলের পেছন দিয়ে কাঁসারী পট্টি পেরিয়ে ঢুকে পড়লাম ঘোষপট্টিতে । সেখান থেকে ডান দিকে মোড় নিতেই দেখি মসজিদের সামনে কাগজ জ্বেলে সকলে আগুন পোহাচ্ছে । আরো একটু এগিয়ে কামন চৌমুহনী পড়তেই দেখি সি.পি.আই. পার্টি অফিসের সামনে কয়েকটি ভিখিরি ছেলে কাঠ জ্বেলে আগুন পোহাচ্ছে । সেখানে পায়ের তলাটা সেঁকে নিলাম কিছুক্ষণ । পরে বাদিকে মোড় নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী চৌমুহনী পেরিয়ে কিছুদুর হেঁটে গেলাম স্যন্দন অফিসে । সেখানে নান্টু ভট্টাচার্য স্যন্দনের সাথে Tripura Times পত্রিকা মাগনা দিলেন একখানা । তারপর দৈনিক সংবাদে আসতে আসতে তেলাকুচোর পাতা সংগ্রহ করলাম । দৈনিক সংবাদের সামনে হকারদের ভিড়ের মধ্য থেকে একখানা গতকালের আজকাল পত্রিকা সংগ্রহ করলাম । ত্রিপুরা দর্পণে ঢুকতেই কমরেড শ্যামল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা । তিনি তার যজ্ঞশ্বর সেনের বাসায় নিয়ে গেলেন । তাঁর মেয়ে গতকাল গুরুতর অসুস্থ হয়েছিলো । মেয়েটিকে কলকাতর চিকিৎসক ডাঃ মুনাচাকে দেখাতে চান । শুধু রক্ত পরীক্ষা করতে লাগে ৩০,০০০ টাকা । মুনাচা বৃটিশ ডাক্তার । আমেরিকা থেকে রক্ত পরীক্ষা করে আনতে হয় । শ্যামল বাবুর বাসা থেকে ফিরে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে পায়খানার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই পায়খানা হলোনা । এই অবস্থায় পেটপুরে ভাত খেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আস্তাবল বাজারে গেলাম ১০.৩০ এর পরে । বাজার থেকে বেল কিনে আনলাম । একটা আস্তপাকা বেল খেয়েও পায়খানা হলো না । এখন কি করি ? Cremaffin ২ চামচ খেয়ে নিলাম তারপরেও পায়খানা হলোনা । বিকেলে কিরণ মেডিকেল থেকে ওষুধ আনলাম গ্লীসারীন ডুজও দিলাম তাতেও না । পরে পুত্র সুরঞ্জন ডাঃ তাপস আচার্যর কাছ থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ এনে রাত্রে খাবার পরে খাওযালো তারপর শুয়ে পড়লাম । রাত্রে ১ বার উঠলাম । তারপর উঠলাম সকাল ৭ টায় ।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯, রবিবার । আজ সকালে উঠতে উঠতে ৭.৩০ বেজে গেলো। গত দুদিন ধরে পায়খানা হচ্ছে না, শরীরে খুবই অস্বস্তি । তাই প্রাতর্ভ্রমণে বেরোনো সম্ভব হয়নি । ৮ টায় প্রেসারের ওষুধ খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বিদুর কর্তা চৌমুহনী দৈনিক সংবাদ আনতে । রানামহলের পাশ দিয়ে যেতেই মহারানীর দেওয়া প্রচিন রাজপ্রাসাদের ট্রাইবাল হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এলো আমার শালী প্রভারানীর ছেলে বিশ্বজিৎ । বিশ্বজিৎকে আমার বাসায় আসতে বললাম । আমি যখন ১৯৬৮ সালে বিশ্বজিতের দাদা মশায় (যোগেন্দ্র দেববর্মা)-এর ঘরে থেকে ককবরক ভাষার কাজ করি তখন বিশ্বজিতের মা প্রভারানীর বয়েস ৪/৫ বছর হবে । আজ সেই প্রভারানীর ছেলে এস.এফ. পরীক্ষা দিচ্ছে । কত ভালোই না লাগলো ।

দৈনিক সংবাদ নিয়ে এলাম কর্নেল চৌমুহনীর দর্পণ পত্রিকার অফিসে এবং একখানা কাগজ নিয়ে বাসায় ফিরলাম । বাসায় ফিরে পত্রিকা খুলে দেখি বিশ্রামগঞ্জের পাঁচটি বাঙালি রিফিউজি পাড়া উগ্রপন্থীরা পুড়িয়ে দিয়েছে এবং তিনজন মহিলা ভষ্মীভূত হয়েছে । এই ঘটনা করা হয়েছে গত পরশু দিন লক্ষণ ঢেপা বাজারে উগ্রপন্থী হামলায় তিনজন বাঙালী মারা যাওয়ার পর বাঙালিরা বাজার সংলগ্ন হতদরিদ্র মরশুম উপজাতিদের গ্রাম সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে দেয় । তারই পাল্টা নিয়েছে বিশ্রামগঞ্জের উপজাতিরা।

আজ সারাদিন পায়খানা হয়নি । যদিও গতরাত্রে ডাঃ তাপস আচার্যর দেওয়া হোমিওপ্যাথি ওষুধ

খেয়েছিলাম। আজ তিনি আমার ছেলের কাছে হোমিও বড়ি দিয়েছেন ২ ঘন্টা অন্তর ২ টো করে বড়ি খেতে হবে। সকাল ১১ টায় পরশুরাম দেববর্মার পরামর্শ মতো আস্তাবল বাজারে গিয়ে শশা, কুল কিনে নিয়ে এসে খেলাম। সন্ধ্যায় অঘোর দেববর্মার বাড়ি থেকে ফিরেই ভালোই পায়খানা হলো।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯, সোমবার। আজ রাতে ডাঃ ডি.কে. পাহাড়ীকে পুত্র সুরঞ্জন আমার প্রেসারের ব্যাপারে Phone করেছিলো তিনি যাযা বলেছেন ঃ-

১) Petril ১ টাতেই চলবে।

২) Tension থেকে বিকেলে প্রেসার বাড়ছে চিন্তার কোনো কারণ নেই।

৩) পেচ্ছাবের deposit থাকছে কিনা দেখতে হবে, deposit বেশী থাকলে minipress পাল্টে বা dose বেশী করে দিতে হতে পারে।

৪) Urine Passage কেমন আছে তা দেখতে হবে Ultrasonography করে।

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম কাজে যোগ দিতে অসুস্থ হবার পর। V.C. Registrar, Dy. Registrar-দের সঙ্গে দেখা করলাম। FCPGS -এর সঙ্গে কথা হলো ককবরক সার্টিফিকেট কোর্স-এর ব্যাপারে Monitoring cell -এর একটা মিটিং করে বাড়তি শিক্ষকের একটা প্যানেল করতে হবে। ডিন ডঃ আহ্‌মেদ-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১২.১৫-এ বেরিয়ে সুখময় সেনগুপ্তর গলিতে সুব্রত মজুমদারের ডি.টি.পি. প্রেস-এ গিয়ে আমার গবেষকের ডায়েরী ছাপার ব্যাপারে আলোচনা করে বেরিয়ে আসতেই চিত্রপরিচালক দীপক ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি তাঁর F C I Office থেকে ফিরছিলেন। পাঁচ টাকা রিকসা ভাড়া দিয়ে দু'জনে কর্নেল চৌমুহনীতে নামলাম। বাসায় ফিরতেই দেখি আমার ভায়রাভাই কৃষ্ণকান্ত ও শালী ভারতী এসেছে। তাদের ছোট দেওরকে উগ্রপন্থী সন্দেহে সি.আর.পি.এফ. ধরে এন কোর্টে চালান দিয়েছে। তাকে ছাড়াতে এসেছে তারা। আর এসেছে বড় শালা বিশ্বকুমার। তার সূর্যমনি নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতে নাইট গার্ড হিসেবে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে একথা জানাতে। বিকেলে অঘোর বাবুর বাড়ি গেলাম। ফিরতেই শরীর ঘেমে প্রেসার বেড়ে গেলো। ডাঃ গৌতম বসু এসে দেখে বললেন B.P. ও Pulse ঠিক আছে।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯, মঙ্গলবার। প্রাতর্ভ্রমণ করে খবরের কাগজ নিয়ে বাসায় ফিরলাম। পুত্র সুরঞ্জন ও তার বড় মামা বিশ্বকুমারকে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের Dy Registrar Mr. K.B. Jamatia'র কাছে পাঠালাম তার (বিশ্বকুমার) চাকরির ব্যাপারে। সে সূর্যমনি নগরের নাইট গার্ড। কিন্তু রাজ্যের পরিস্থিতি খারাপ বলে সে নিয়মিত রাত্রে duty দিতে পারেনা। তাই তাকে Day'তে আনা যায় কিনা তাই নিয়ে জমাতিয়া সাহেবের কাছে আলোচনার জন্যে পাঠানো।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯, বুধবার। ডঃ সিরাজুদ্দীনের পারমর্শ অনুসারে সূর্য ওঠার পর ৬.৫০ এ প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে প্রথমে দৈনিক সংবাদ ও পরে ত্রিপুরা দর্পণ বগলদাবা কোরে ধ্রুব কর্তার দোতলায় আমার বাসায় উঠলাম। আজ ৮ টায় প্রেসারের ওষুধ খেয়ে একটা রিক্সা করে গেলাম অক্ষর প্রকাশনীর শুভ্রব্রত দেবের সঙ্গে কথা বলতে আমার গবেষকের ডায়েরী প্রকাশ করার ব্যাপারে কথা বলতে। আমি বললাম, 'আমি D T P টা কোরে দিচ্ছি সুব্রত মজুমদারের প্রেস থেকে। তারপর পারলে আপনি ছাপুন।' তখন তিনি বললেন, 'আচ্ছা দেখাযাক, D T P টা তো হয়ে থাকুক, তারপর সম্ভব হলে ছাপার চেষ্টা করবো। তবে এবার নতুন প্রেস ও বইয়ের দোকান খুলতে বেশ টাকাকড়ি চলে যাচ্ছে, তবু দেখবো প্রকাশ করা যায় কিনা।'

অক্ষর প্রকাশনী থেকে সোজা চলে এলাম এ্যাডভাইজার চৌমুহনীর ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার

চেম্বারে। ডাক্তার বাবু আমার বড়ো মেয়ে নন্দিনীর বিয়ের ঘটক। তাঁকে বললাম, 'ডাক্তার বাবু আমি ৪/৫ জানুয়ারি কলকাতায় যাচ্ছি medical checkup এর জন্যে, ১০/১২ দিন থাকবো, আপনি বিয়ের মঙ্গলাচরণের ব্যাপারে এগিয়ে যান।' ডাক্তার বাবু বললেন, 'সব হবে, কিছুই অসুবিধে হবে না। আপনি নিশ্চিন্তে কলকাতা থেকে ঘুরে আসুন।' এরপরে ডাক্তার বাবুর অন্দর মহলে ঢুকে তাঁর স্ত্রী রাণু পিসিকে আমার কলকাতায় যাবার কথা বললাম। তিনি চা দিতে দিতে বললেন, 'সব ঠিক আছে, আপনি কোনো চিন্তা কোরবেন না।' তখন আমি বললাম, আমরা বিয়ের টাকা-পয়সা সংগ্রহ করতে শুরু করেছি, আমার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ও একটা লোন পাবার চেষ্টা করছি।

সকাল ১১ টা নাগাদ গেলাম গোর্খাবস্তীতে Transport Deptt. এ। সেখানে Under Secretary শ্রীযুত নিশিকান্ত দেববর্মাকে আমার কলকাতায় যাবার কথা বললাম। তিনি বললেন, 'Govt. কোটায় টিকিট পাবার জন্যে একখানা দরখাস্ত দিয়ে যান, আর ১.১.২০০০-এ আসবেন খবর নিতে।' সেখানে ধলাই জেলার ADM Mr. L. Darlong -এর সঙ্গে দেখা হলো। আজ সন্ধ্যে বেলায় প্রেসার বাড়েনি।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯, বৃহস্পতিবার। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ দিন। আজ ভোর পাঁচটায় উঠে শীতের জামাকাপড় পরে রান্না ঘরের আলো জ্বেলে 'গবেষকের ডায়রী' ঠিকঠাক করতে শুরু কবলাম আসন্ন বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশ করার জন্যে। ঠিক ৬.৪৭-এ প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে প্রথম গেলাম সূর্য চৌমুহনীর কাছে 'স্যন্দন' পত্রিকা অফিসে। সেখান স্যন্দনের কর্মী নান্টু ভট্টাচার্য আমার ছবি তুললেন দুবার। এর আগেরদিন তিনি রাজ্যের উগ্রপন্থী সমস্যা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। তখনো জানিনে যে তিনি এ-সব তাঁর পত্রিকায় ব্যবহার করবেন। স্যন্দন পত্রিকা বগলদাবা করে চলে এলাম দৈনিক সংবাদের কাছে রাধামোহন ঠাকুরের বাড়ির পাশে। সেখান থেকে তেলাকুচোর পাতা সংগ্রহ করে প্যান্টের পকেটে ঢোকালাম। এবার দৈনিক সংবাদ অফিসে যেতে ডানদিকে দেখলাম 'রাজ যোগ'-এ অনেক যুবক-যুবতী, পৌঢ়-পৌঢ়া ঢুকছেন যোগ ব্যায়াম করার জন্যে। দৈনিক সংবাদে এসে পত্রিকা সংগ্রহ করে হকার মানিক আচার্যের কাছ থেকে একখানা আনন্দবাজার কিনে চলে এলাম দর্পণ পত্রিকার অফিসে। সেখান থেকে মনোজের কাছ থেকে পত্রিকা নিয়ে গেলাম শনিতলার ধীরু পালের দোকানে। সেখান থেকে ১ প্যাকেট নোনতা বিস্কুট কিনে বাসায় ফিরলাম। ৮টায় প্রেসারের ওষুধ খেলাম। আজ সকালে প্রেসারের ওষুধ খাওয়ার আগেই ভালোই পায়খানা হলো। দশটায় স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে তাঁকে পূর্বাশায় নামিয়ে দিয়ে গেলাম ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমে আমার Language Laboratory খুলে শ্রীযুক্ত সুজিৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে আসন্ন ককবরক সেসন খোলার ব্যাপারে আলোচনা করলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অধ্যাপক সিরাজুদ্দীনের কোয়ার্টারে ঢুকতেই দেখি অধ্যাপক মহাদেব চক্রবর্তী ও সিরাজ সাহেব একখানা নতুন গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে কি সব দেখছেন। ডীন সাহেব শরীর খারাপ বলে গাড়ি কিনেছেন। এরপরে গেলাম V.C.'র অফিসে। সেখানে রেজিস্ট্রারের ঘরে ঢুকতেই রেজিস্ট্রার সাহেব অধ্যাপক দীপক চৌধুরী চা খাওয়ালেন। এরপর আমি joining report জমা দিলাম। শালার দরখাস্তও জমা দিলাম। দেবযানীর রেজাল্ট নিয়ে কথা বলে ব্যাঙ্ক-এর loan নিয়ে পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে আলোচনা সেরে চলে এলাম সুব্রত মজুমদারের DTP Press-এ। তাঁর সঙ্গে গবেষকের ডায়েরীর DTP করা নিয়ে আলোচনা সেরে বাসায় ফিরলাম একটায়।

১লা জানুয়ারী, ২০০০, শুক্রবার। আজ ১লা জানুয়ারি ২০০০ খৃস্টাব্দ। ভোর সাড়ে চারটেয় উঠে গবেষকের ডায়েরীর 'গৌরীর মৃত্যু' শেষাংশ লিখে ঠিক সাতটায় বাসা থেকে বেরিয়ে বাজাজ স্কুটারের গলি দিয়ে ঢুকে সহদেব কর্তার বাড়ির পাশ দিয়ে রানামহল ডাইনে রেখে গিয়ে দাঁড়ালাম

রাজবাড়ীর পশ্চিম গেটে নতুন সূর্যোদয়ের মুখোমুখি। তারপর একটু আস্তে আস্তে দৌড়োতে দৌড়োতে গেলাম জগন্নাথ মন্দিরের সামনে। সেখানে একটু জিরিয়ে বেশ জোরে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম স্যন্দন পত্রিকালয়ে। সেখানে যেতেই নান্টু ভট্টাচার্য বললেন, স্যার, দেখুন আপনাদের সকলের ছবি বেরিয়েছে। দেখলাম বিগদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার ছবি। ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর সকলের বক্তব্য। সেখান থেকে নববর্ষের প্রথম দিনের স্যন্দনের সঙ্গে নববর্ষের একটা ক্যালেণ্ডারও পেলাম। সেখান থেকে এলাম ভিক্ষু ঠাকুরের বেড়ার ধারে। সেখান থেকে কিছু তেলাকুচোর পাতা প্যান্টের পকেটে পুরে গিয়ে দাঁড়ালাম দৈনিক সংবাদের সামনে। সেখানে ভীড়ে ভরা হকারদের কাছ থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা ও বর্তমান কিনলাম। ঢুকলাম এবার দৈনিক সংবাদের ভেতরে। সেখানে প্রথমে বন্ধুবর ভূপেন দত্ত ভৌমিকের উজ্জ্বল ছবিটাকে নমস্কার করে দৈনিক সংবাদের পুরনো কর্মী প্রভাতকে নববর্ষের সুপ্রভাত জানালাম। তারপর নিখিল সূত্রধরের কাছ থেকে নব শতাব্দীর প্রথম দিনের দৈনিক সংবাদের সঙ্গে একখানা ক্যালেণ্ডার নিয়ে ডান দিকের ঘোষ বাড়ির বেড়া থেকে লকলকে তেলাকুচোর পাতা কিছু পকেটে ভরলাম। তারপর তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এলাম কর্নেল চৌমুহনীর দর্পণ পত্রিকার অফিসে। কিন্তু মেশিন খারাপ থাকায় এখনো অব্দি দর্পণ বেরোয়নি। দর্পণ থেকে বেরিয়ে পালবাবুর দোকানে গিয়ে মাসকাবারি কত উঠেছে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ৩০৮ টাকা উঠেছে। সেখান থেকে বাসায় ফিরে তেলাকুচোর পাতা খেয়ে ৮টার সময় Amlosyl (প্রেসারের ওষুধ) খেয়ে ডায়েরী লিখলাম। তারপর গেলাম কর্নেল বাড়ির হাসি রায়ের মন্দিরে কর্নেল মহিম ঠাকুরের জামাই সীতানাথ সিংহরায়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করতে। তখন হাসিদি তাঁর আলেখ বাবার মন্দির সংলগ্ন বাড়ির বারান্দায় রৌদ্রে বসে পুজোর ভোগের ব্যবস্থা করছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সীতানাথ সিংহরায়ের ওপর সব তথ্য সংগ্রহ করলাম। হাসিদি মন্দিরের প্রসাদ খেতে দিলেন, তারপর এলো গরম চা। হাসিদির সঙ্গে তাঁর মেয়ে বা পুত্রবধূ কেউ ছিলেন। আমি ট্রাইবাল মেয়ে বিয়ে করেছি জেনে খুব পুলকিত হলেন। তিনি বললেন, 'দেখুন, আমরা তো উপজাতি-বাঙালি মিলেমিশে থাকতে চাই। কিন্তু সেদিন তুইরাজবাড়ি জিপে বোমা মারায় সবই তো মরলো উপজাতি অংশের লোকেরা। জিপটায় যারা ছিলো তারা সকলেই উপজাতি। কিন্তু খবরের কাগজগুলোতে তেমনভাবে খবরটা গুরুত্ব সহকারে ছাপানো হলো না।'

সকাল ১১টার সময় গেলাম গোর্খাবস্তির Transport Deptt-এ Air ticket-এর ব্যাপারে। জনৈক অফিসার বললেন, ৫ই জানুয়ারি টিকিটের জন্যে ৩ তারিখে 2nd half-এ আসবেন। সেখান থেকে গেলাম জিষ্ণু কর্তার বাড়ির পাশে অধ্যাপক অমিতাভ সিনহার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি খানদানী পোষাক পরে তাঁর স্নেহের ছাত্রী রুমা সাহার সঙ্গে তার (রুমার) থিসিস নিয়ে আলোচনা করছিলেন। থিসিসটা হলো ত্রিপুরার Food system-এর ওপর। এর মধ্যে অমিতাভ সিনহার ছোট মেয়ে এসে প্রণাম করলো নব শতাব্দীর। রুমার থিসিস নিয়ে আলাপ-আলোচনা হলো। Food System-এর ওপর এলো Food Production-এর কথা, distribution system-এর কথা এলো। অধ্যাপক অরুণোদয় সাহার হারিয়ে যাওয়া পুত্রের সম্পর্কে ডেলিকেট কিছু আলোচনাও হলো। হলো ডঃ কমল কুমার সিংহের ব্যাপারে কিছু আলোচনাও। কারণ অরুণোদয় সাহার ছেলের হারিয়ে যাবার ব্যাপারে কমলবাবুকে সন্দেহ করে arrest করে সি. আই. ডি কলকাতায় নিয়ে গেছে। যদিও তিনি এখন জামিনে মুক্ত হয়ে সল্টলেকের ত্রিপুরা ভবনে থাকছেন। সি বি আই এখন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

সেখান থেকে বেরিয়ে বাসায় ফিরলাম দেড়টায়। কাগজগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে দুটো বেজে গেলো। ঠিক দুটোর সময় প্রেসার না আসায় Petril tablet ১/২ খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

উঠলাম ৩.৪৫-এ। ৪ টেয় ফল খেয়ে সান্ধ্যভ্রমণে বেরোলাম জগন্নাথ বাড়ির মন্দিরের দিকে। মন্দিরের সামনে একখানা সুদর্শন প্রাইভেট কার অপেক্ষা করছিলো। দেখলাম, সেই সুদর্শন গাড়িতে জগন্নাথ মন্দিরের গেরুয়াবসনধারী এক সুদর্শন সাধু গেরুয়ারঙের একখানা দণ্ড হাতে নিয়ে সেই গাড়িতে চেপে কোথায় গেলেন। প্রেস ক্লাব এবং বাজাজ স্কুটারের ব্যবধানের মধ্যে আটবার হাঁটলাম। জগন্নাথ মন্দিরের সামনের পার্কে কিছু দৃশ্য আমার চোখে পড়লো। দেখলাম পার্কের দীঘির পাড়ে বাঁধানো জায়গায় লাইন করে যুবক-যবুতীরা বসে তাদের মনের কথা বলছে। কোথাও জোড়ায় জোড়ায় বসে বাদামও খাচ্ছে। দু'একটা গাছের বাঁধানো চত্বরে কিছু যৌনকর্মী বসে খদ্দেরের অপেক্ষা করছেন বলে মনে হলো। চোখে পড়লো মহারাণীর দেওয়া পুরনো রাজ প্রাসাদের চত্বরে হোস্টেলের উপজাতি ছেলেরা টেনিস খেলছে হৈচৈ করতে করতে। বাসায় ফিরতে পুত্র বলল, বাবা এতোটা হেঁটো না। বাসায় উঠে জানালাগুলো খুলে দিয়ে টি. ভি. দেখতে লাগলাম। আজ আর প্রেসার ওঠেনি।

২রা জানুয়ারী, ২০০০, শনিবার। গতকাল সকাল ৬-৫০-এ বেরিয়ে সহদেব কর্তাব গলিতে একটু দৌড়লাম। তারপর দৌড়তে দৌড়তে প্রেস ক্লাব পর্যন্ত গেলাম। সেখানে Life Line Nursing Home-এর সামনে রোগী দেখতে দেখতে একটু জিরিয়ে গেলাম স্যন্দন পত্রিকার অফিসে। সেখান থেকে পত্রিকা নিলাম নান্টু ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম দৈনিক সংবাদ অফিসের সামনে। হকারদের কাছ থেকে 'বর্তমান' সংগ্রহ করলাম দু'কপি। তারপর সংবাদের অফিসে ঢুকে নিখিল সূত্রধরের কাছ থেকে দৈনিক সংবাদ নিয়ে এলাম ঘোষ বাড়ির বেড়ার ধারে। বেড়ার গা থেকে তেলাকুচো পাতা সংগ্রহ করে পকেটে পুরে চলে এলাম কর্ণেল চৌমুহনীর ত্রিপুরা দর্পণ অফিসে। দেখি বটগাছে বোর্ডে রাখা দর্পণ হুমড়ি খেয়ে লোকে পড়ছে। অথচ তার খুব কাছেই বোর্ডে লাগানো সি. পি. আই.-এম ডেইলি দেশের কথা দু'একজন ছাড়া কেউ পড়ছে না। দর্পণ পত্রিকা বগলদাবা করে বাসায় ফিরে তেলাকুচোর পাতা চিবিয়ে খেয়ে একটু জল খেলাম। তারপর বড় মেয়ের করা রুটি ও শাক খেয়ে প্রেসারের ওষুধ 5mg. Amlosyl একটা খেলাম। তাবপর ডায়েরী লিখতে বসলাম। ডায়েরী লিখে গেলাম বাথরুমে। স্বাভাবিক পায়খানা হলো আজ। তবু পায়খানার শেষে টপটপ করে রক্ত পড়লো কিছুটা। দেবযানী (আমার ছোট মেয়ে)কে বললাম ডাঃ তাপস আচার্যের কাছ থেকে ওষুধ আনতে। ওষুধ নিয়ে এলো দেবযানী। দুটো করে বড়ি দিনে দু'বার খেতে হবে।

সকাল ৯টায় ওষুধ Libstryp খেয়ে গবেষকের ডায়েরী ঠিকঠাক করলাম প্রেসে নিয়ে যাবো বলে। ঠিক ১১টার সময় গবেষকের ডায়েরীর খাতাপত্র একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে করে রিক্সা চেপে গেলাম প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তের গলির ভেতর সুব্রত মজুমদারের DTP প্রেসে। গিয়েই পেয়ে গেলাম সুব্রতবাবুকে। তার সামনে বসে গবেষকের ডায়েরীর পাণ্ডুলিপি বছরওয়াবি সাজাতে লাগলাম। এমন সময় এলেন ছোট গল্পকার দেবব্রত দেব। তিনি ক'দিন আগে ঢাকাব সবকারী বইমেলা থেকে ফিরেছেন। ঢাকার সরকারী বইমেলা তেমন জমেনি বললেন। তবে বেসরকারী বইমেলা যা ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হয়, তা নাকি খুব ভালো জমে। তিনি বাঙলাদেশের উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভূয়সী **প্রশংসা করলেন। বললেন, কলকতাতেও এমন উচ্চমানের লেখা এখন লেখা হচ্ছেনা। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বললেন বাঙলা দেশের কমিউনিস্ট পার্টির দৈন্যদশার কথা। কমিউনিস্ট পার্টি সেখানেও আমাদের ভারতবর্ষের মতো ত্রিধাবিভক্ত। এবং পার্টিগুলো নাকি চলে সি.আই.এ'র টাকায়। সি.আই.এ'র টাকায় তারা N G O খুলে প্রচুর টাকা রোজগার করে।**

সুব্রত মজুমদারের বাসা থেকে ২.৪৫ এ বেরিয়ে হেঁটে বাসায় ফিরলাম। তারপর স্ত্রীর দেওয়া ফল খেয়ে ৪.৩০ এ বেরিয়ে পড়লাম সান্ধ্য ভ্রমণে। আজ ৭ টার মধ্যে প্রেসার বাড়েনি। তাবে ৯ টার সময়

খাবার পরে প্রেসার বাড়লো যা কখনো হয়না। ৯ টার সময় প্রেসারের ওষুধ খেয়েছি, ৮ টার সময়ও ওষুধ খেয়েছি তবে কেন প্রেসার বাড়লো ?

৩রা জানুয়ারী, ২০০০, রবিবার। ভোর ৫.৪৫ এ উঠে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করে ৬.৪৫ এ যখন প্রাতর্ভ্রমণে বেরোবো, তখন কমরেড নিধুভূষণ হাজরা ও লেখক কমল রায় চৌধুরী আমার সঙ্গে দেখা কোরতে এলেন। নিধুদা বললেন, 'আমার জন্যে জঙ্গল সাঁওতালের একখানা ছবি এনেদেবেন লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর কাছ থেকে।' তিনি উপজাতিদের ওপর একখানা বই লিখছেন, সেই বইয়ে নকশাল নেতা জঙ্গল সাঁওতালের একখানা ছবি দেবেন। বইয়ের নাম হবে 'অরণ্যের অশ্রু'।

সাতটার সময় তাঁদের সঙ্গে ঘন কোয়াশায় মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম আমার শাশুড়ীর উপজাতি তাঁতে বোনা চাদর মুড়ি দিয়ে। নিধুবাবুরা কর্নেল চৌমুহনীর দিকে পথ দিলেন, আর আমি বাঁয়ের মহারাজ কুমার সহদেব কর্তার গলি দিয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে জগন্নাথ মন্দির পর্যন্ত গেলাম। সেখানে বিধানসভার পুলিশ কর্মচারী অন্নপ্রসাদ জমাতিয়ার সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে কথা বলে আবার এক ছুট দিলাম ওরিয়েন্ট চৌমুহনীর দিকে ডাইনে শচীন কর্ত্তার বাড়ির পাশ দিয়ে। দৌড়তে দৌড়তে একেবারে স্যন্দন পত্রিকার অফিসে। সেখান থেকে স্যন্দনের রিপোর্টার নান্টু ভট্টাচার্যের কাছ থেকে একখানা পত্রিকা নিয়ে এলাম দৈনিক সংবাদ-এর সামনে। আজ দেরি হয়ে যাওয়ায় হকাররা সব চলেগেছে, তাই কোলকাতার পত্রিকা আর পেলামনা। শুধুমাত্র দৈনিক সংবাদ নিয়ে ঘোষ বাড়ির বেড়া থেকে তেলাকুচোর পাতা পকেটে পুরে আবার দিলাম ছুট। ঘন কোয়াশায় গা-হাত-পা একেবারে বরফ হয়ে যাচ্ছিলো। একছুটে একেবারে নন্দলাল কর্তার বাড়ি পর্যন্ত। সেখান থেকে আর এক ছুট দিয়ে এলাম রমণী ক্যাপটেনের বাড়ি পর্যন্ত। ছুটে গা-হাত-পা একটু গরম হলো। সেখান থেকে দর্পণ পত্রিকার অফিসে এসে মনোজের কাছ থেকে পত্রিকা নিয়ে সোজা বাসায়।

বাসায় ফিরে তেলাকুচোর পাতা ধুয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেললাম গপগপ করে। তারপর বড় মেয়ের তৈরি রুটি ও শাক খেয়ে প্রেসারের ওষুধ Amlosyl 5 mg খেলাম ১ টি। কিন্তু সকালে পায়খানা হলো না। সেই অবস্থায় ৯.৩০-এ ঠান্ডাজলে স্নান সেরে স্ত্রীর সঙ্গে খেতে বসলাম।

দশটায় আমরা স্বামী-স্ত্রী বেরিয়ে পড়লাম অফিসের দিকে। স্ত্রী ফুলকুমারীকে পূর্বশায় নামিয়ে দিয়ে ফিসারি অফিসের দিকে চললাম। রাস্তায় লেকের কিছুটা আগে অধ্যাপিকা মঞ্জু দাশ রিক্সা থেকে 'স্যার' বলে ডাকতেই আমি রিক্সাঅলাকে থামতে বললাম। মঞ্জুর রিকশাও এগিয়ে এলো। সে বললো, 'স্যার, আমি ১১ ই জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি একটা Refresher Course কোরতে।' আমি বললাম, 'আমিও ৫ ই জানুয়ারি যাচ্ছি কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভাষাগবেষণা কেন্দ্র খুলে গেলাম সুজিৎ চক্রবর্তীর কাছে। তাঁকে বললাম আমার কলকাতা যাবার কথা। তিনি বললেন, 'স্যার ১৯ শে জানুয়ারি থেকে ককবরক সার্টিফিকেট কোর্সের ক্লাস শুরু হবে। আপনি তারমধ্যে এসে গেলে হবে।' সেখান থেকে গেলাম ভি.সি'র বিল্ডিঙে। সেখানে যেতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী নেতা মানিক ধরের সঙ্গে দেখা। তিনি ডিসেম্বরের শেষে টুরে বেরিয়ে ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে উড়িষ্যার বন্যাবিধ্বস্ত করুণ কহিনী শুনলাম। আমি বললাম, 'আপনাকে তসলিমা নাসরিনের 'আমার মেয়েবেলা' পড়তে দিয়েছিলাম। পড়ে কি শেষ করেছেন।' উত্তরে তিনি বললেন, বইখানা এখন ডাঃ প্রদীপ ভৌমিরে কাছে রয়েছে।'

৪ঠা জানুয়ারী, ২০০০, সোমবার। ভোর ছ'টায় নোনতা বিস্কুট ও জল খেয়ে খালিহাতে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করলাম। তারপর ৬.৪৫-এ বেরিয়ে দৌড় দিলাম সহদেব কর্তার বাড়ির পাশ দিয়ে জগন্নাথ মন্দিরের দিকে। সেখান থেকে আর এক ছুট দিলাম রবীন্দ্রভবন পর্যন্ত। সেখান থেকে আরেক

ছুটে স্যন্দন পত্রিকার অফিস । স্যন্দন নিয়ে সোজা দৌড়োতে দৌড়োতে দৈনিক সংবাদ । সেখানে হুকারে ভরা ভিড়ের মধ্য থেকে আনন্দবাজার ও বর্তমান কিনলাম রবি ও সোমবারের একসঙ্গে । তারপর নিখিল সূত্রধর ও শুকলাল দেববর্মার কাছ থেকে দৈনিক সংবাদ নিয়ে ঘোষ বাড়ির বেড়া থেকে তেলাকুচোর পাতা সংগ্রহ করে একছুটে নন্দলাল কর্তার বাড়ি, মোহন কর্তার বাড়ি ও রমণী ক্যাপটেনের বাড়ির পাশ দিয়ে দর্পণ পত্রিকায় । সেখান থেকে মনোজের কাছ থেকে দর্পণ পত্রিকা নিয়ে পাল বাবুর দোকান থেকে নোনতা বিস্কুট নিয়ে বাসায় । বাসায় ফিরে বেল খেলাম একটা । তারপর Amlosyl প্রেসারের ওষুধ খেয়ে ডায়েরী লিখতে বসলাম । ঠিক ন'টায় গেলাম ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার চেম্বারে । তাঁকে আমার কলকাতায় যাবার কথা বললাম । তারপর ডাঃ বাবুর স্ত্রী পি রাণুকে আমার বড়ো মেয়ের মঙ্গলাচরণের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম । তিনি বললেন, 'পাত্রপক্ষ মাঘ মাসের ১ম সপ্তায় করতে চায় ।' আমিও বললাম, 'কলকাতা থেকে মেয়ের বেনারসী কাপড় ও ছেলের কোট-প্যান্টের সিট কাপড় নিয়ে আসবো ।' সেখান থেকে ফিরতেই সিনেমার ডাইরেক্টর দীপক ভট্টাচার্য বাসায় এলেন ।

৫ই জানুয়ারী, ২০০০, মঙ্গলবার । আজ সকাল ১০.২০'র প্লেনে কলকাতায় অধ্যাপক স্বপন বসুর বাড়ি যাচ্ছি চিকিৎসা করতে । আমার ডাক্তার হলেন ডাঃ প্রফেসর দিলীপ কুমার পাহাড়ী, পি.জি. হাসপাতালে Nephrology Deptt. এর Head ।

আজ সকাল ৮.৪৫ এ প্রেসারের ওষুধ, স্ত্রীর করা গরমভাত খেয়ে পুত্র সুরঞ্জন ও শ্যালক বিমলকে নিয়ে সমীরের অটো ভ্যান নিয়ে আগরতলা এয়ারপোর্ট-এ গেলাম । ওমা, গিয়ে দেখি ১০.২০'র IC/৭২৪২ ছাড়বে বিকেল ৫.৪০-এ । কোয়াশার জন্যে সব ফ্লাইট লেট্ । বিকেল ৪ টের সময় সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিমানকর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন IC/৭২৪২'র ফ্লাইট ক্যানসেল্ড, আগামীকাল ১ টায় ছাড়বে, ১১.৩০-এ রিপোর্টিং, আর ফ্লাইট হলো IC/৭২৪২D । আর, ক্যাশ কাউন্টার থেকে ১২০ টাকা সংগ্রহ করে নিতে হবে ।

পুত্রকে নিয়ে Auto ৫০ টাকায় রিজার্ভ করে বাসায় ফিরলাম ৫ টায় । ফিরে আস্তাবল বাজারে গিয়ে পাকা বেল, শাক, দুধ ও ওষুধ কিনে এনে বাসায় দিয়ে সহদেব কর্তার গলি দিয়ে জগন্নাথ বাড়ির দিকে এগোতেই ভূত দেখার মতো আমার স্ত্রী আমাকে দেখে ফেলে তো অবাক । তিনি অফিস থেকে ফিরছিলেন । দু'জনে বাসায় ফিরলাম । তারপর তিনি আস্তাবল বাজারে যেতেই আমি আবার বেরিয়ে পড়ে প্রেস ক্লাবের পাশে আসতেই শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকারের বক্তৃতা শুনেই দাঁড়িয়ে গেলাম । মনে হলো তিনি শূদ্রজাগরণের ওপর বক্তব্য রাখছিলেন । তিনি রাজ্যের উগ্রপন্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটা অভিনব কথা বললেন, 'ট্রাইবেলরা যদি ট্রাইবেল হতে পারে, তাহলে বাঙালিরাও মাঝে মাঝে ট্রাইবেল হয়ে ভয়ঙ্কর হোতে পারে ।' তাঁর কথার তাৎপর্য খুব গভীর । বাসায় ফিরে ৭ টায় Petril খেলাম, ৮ টায় প্রেসারের ওষুধ Amlosyl খেলাম, ৯ টায় Libotryp ও খাবার পরে আবার প্রেসারের ওষুধ Minipress খেয়ে শুয়ে পড়লাম ।

৬ই জানুয়ারী, ২০০০, বুধবার । আগরতলা থেকে প্লেনে Flight No 746 D তে চাপবো বলে ১০.৩০ এ সকালে পুত্র সুরঞ্জনকে নিয়ে অটো করে বেরিয়ে পড়লাম Airport-এর দিকে । খুব সকালে উঠে স্ত্রী রান্না করলেন । বড় মেয়ে তানিয়া রুটি করে দিলো । তারপর প্রেসারের ওষুধ খেলাম । ১০ টার আগেই সব গুছিয়ে নিলাম । ১০.১৫-তে এলেন কমরেড শ্যামল চৌধুরী । তিনি আমার চিকিৎসার ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিলেন । একটু আগেই ছোট মেয়ে দেবযানী প্রাইভেট পড়তে বেরিয়ে গেলো । বড় মেয়ে তানিয়া গেলো খুমুলুঙে মাস্টারিতে । শ্যালক বিমলও গেলো খুমুলুঙে ।

১০.৩০ এ স্ত্রী ফুলকুমারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অটোয় চেপে এয়ারপোর্ট এলাম । আজ গতকালের Cancelled Flight এর No, IC/7242 পরিবর্তিত হয়ে হলো IC/7446D । ঠিক ১ টা ১৫ মিনিটে প্লেন ছাড়লো । ৪০ মিনিটের মধ্যে দমদম এলাম । সেখান থেকে টেক্সি করে ১৮০ টাকা দিয়ে বালিগঞ্জে বন্ধু স্বপন বসুর ১১৫ এ বালিগঞ্জ গার্ডেনস-এ ।

এসেই ডাঃ পাহাড়ীর Chamber-এ চলে গেলাম । তিনি সব রিপোর্ট দেখলেন । আমার বুক, প্রস্রাব পরীক্ষা করলেন । কিছু ওষুধের পরিবর্তন করে দিলেন । Libotryp খেতে বারণ করলেন । আর Minipsoss XL 2.5 mg কে 5 mg করে দিলেন । আর, 'ডানকান'-এ সব পরীক্ষা করার জন্যে প্রেসক্রিপশানে লিখে দিলেন । প্রেসার আমার একটু বাড়তিই ছিলো ১৫৯/৮৯ । পরে ডানকানে গিয়ে পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সব জিজ্ঞেস করে ফিরলাম ।

৭ই জানুয়ারী, ২০০০, বৃহস্পতিবার । বন্ধুবর স্বপন বসুর বাড়িতে ভোর ৬ টায় ঘুম ভাঙলো। কিছুক্ষণ খালিহাতে ব্যায়াম করলাম । তারপর পাকা বেল খেয়ে পায়খানায় গেলাম । কিন্তু এখানেও সেই কোষ্ঠকাঠিন্য । স্নান সেরে ১০ টায় 'Duncan Gleneagles'-এ Ultrasonography এবং Eco cordiography করার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম । একটা রিক্সা ১৮ টাকা ভাড়া নিলো । Ecocardiography করতে ৩০ মিনিট সময় লাগলো । তারপর সিস্টার দুবোতল জল খেতে বললেন কিছু কিছু করে । খুব যখন পেচ্ছাবের বেগ পেলো তখন Ultrasonography টেবিলে শুইয়ে দিয়ে এক মহিলা তলপেটে আঠার মতো কি জিনিস দিয়ে কি একটা যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন । কিছুক্ষণ পর বললেন, একটু খানি পেচ্ছাব করে আসুন । একটুখানি পেচ্ছাব করে আবার টেবিলে শুয়ে পড়লাম । আবার কতক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা চললো । আবার যতটা পেচ্ছাব হয় পেচ্ছাব করতে বললেন । বেশখানিকটা পেচ্ছাব হবার পর হঠাৎ পেচ্ছাব বন্ধ হয়ে গেলো । মনে হলো আরো পেচ্ছাব রয়েছে, অর্ধেকের মতো হয়েছে । তারপর ডাক্তারবাবু বললেন, দশ'মিঃ হেঁটে বেড়ান দেখুন আরেকটু পেচ্ছাব হয় কিনা । কিন্তু পেচ্ছাব দু'চার ফোটা ছাড়া আর বেরোলোনা । আবার শুয়ে পড়লাম টেবিলে । আবার পরীক্ষা চললো । পরীক্ষা শেষ হলে লেডি ডাক্তার বললেন, বাইরে ১০ মিঃ অপেক্ষা করুন, ফটোটা দেখে নিই ঠিক হয়েছে কিনা । বাইরে এসেই দেখি স্বপনের মেয়ে চিনি আমাকে নিতে এসেছে । ১০ মিঃ পরে ডানকান থেকে ছাড়া পেয়ে চিনির সঙ্গে গেলাম ত্রিকোনপার্কে রামকৃষ্ণ ফার্মেসিতে প্রেসারের ওষুধ Amlosyl কিনতে । ওষুধ কিনে গোলপার্কে এসে দুটো ডাব ১০ টাকায় এবং একটি পেয়ারা ৬ টাকায় কিনে বাড়ি ফিরলাম ।

খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে যাদবপুর গেলাম জনসেবা পবিষদ অফিসে । সেখানে অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তীকে সমীরণ রায় ও হরিহর সাহার চিঠি দিলাম । আর ত্রিপুরার উগ্রপন্থী রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করলাম তার সমাধান কল্পে । সেখান থেকে ডানকানে এলাম রিপোর্ট নিতে । রিপোর্ট নিয়ে ডাঃ ডি. কে. পাহাড়ীর কাছে গেলাম । বললেন, 'আপনার হার্ট ভালো, আর সব ভালো, তবে Prostate কিছুটা বেড়েছে । তবে P S A'র রিপোর্ট দেখে ওষুধ দিয়ে দোবো । বা প্রয়োজন হলে Prostate Operation করতে হতে পারে ।'

ডাঃ পাহাড়ীর চেম্বার থেকে বেরিয়ে সোজা বন্ধুবর স্বপনের বাড়ি হেঁটে এসেই গোলপার্কের 'বেদুয়িন' এর দোকান থেকে আনা একখানা স্যাঁকারুটি খেয়ে নিলাম রাত ঠিক ৮ টায় । আগামীকাল ঠিক সকাল ৮ টায় ডানকান-এ গিয়ে রক্তের পরীক্ষাগুলো করতে হবে এবং যার জন্যে খরচ হবে ১৩০০ টাকা । আজ Ecocardiography এবং Ultrasonography পরীক্ষা কোরতে ১৪০০ টাকা খরচ হলো ।

৮ই জানুয়ারী, ২০০০, শুক্রবার। ৫.৪৫ এ ঘুম ভাঙলো। গতরাতে হালকা খাবার খেয়ে ছিলাম। গোলপার্কের বেদুয়িনের দোকান থেকে একখানা রমলা রুটি এনে রাত ৮ টায় ওই বিরাট রুটির অর্ধেক খেতে পেরেছিলাম। আজ সকাল থেকে জলস্পর্শ করিনি। না খেয়ে ব্লাড সুগার পরীক্ষা করাতে হবে। ঠিক সাতটায় স্বপনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাট মোড় থেকে একখানা প্রতিদিন কিনে পড়তে পড়তে Duncan Gleneagles Clinic-এ পৌঁছলাম। ঠিক ৮ টায় রক্ত দিতে হবে। আমি Pathology Dept এর দোতলায় গিয়ে সর্বপ্রথম ডাক্তারের Prescription জমা দিলাম। সঙ্গে করে প্রেসারের ওষুধ ও যশোদা দি (স্বপনের বাড়ির স্থায়ী রাধুনী) 'র তৈরি রুটি নিয়ে গিয়েছিলাম। রক্ত দিলাম ঠিক ৮.২৫ এ। তারপর সঙ্গে সঙ্গে একপাশে বসে রুটি খেয়ে প্রেসারের ওষুধ Amlosyl 5mg একটা খেয়ে নিলাম। তারপর ডানকান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গাড়িয়াহাট বাজারের ভেতর ঢুকে তরিতরকারি ও মাছের দর জিজ্ঞেস করলাম। গলদা চিংড়ি ৩৫০, ভেটকি ১০০-১৫০, কই ৫০০ থেকে ১০০, ইলিশ ১২০, আলু ৬, পিঁয়াজ ১০ টাকা ইত্যাদি। বাজার থেকে বেরিয়ে স্বপনের বাসায় ফিরে প্রাতরাশ দিলেন যশোদা দি। গীতাদি দুপুরে খাবার পর ডাব কেটেদিলেন। বন্ধুবর বন্ধুপত্নী পুষ্প (বৌমা)কে খুব বেশী করে আমাকে শাকসব্জি খেতে দিতে বললে। দুপুর ২ টোর Petril 0.5 mg ১/২ খেয়ে একটু শুয়ে নিলাম। ৩.৩০ এ বন্ধুর মেয়ে চিনি আমাকে একেবারে একটা আস্ত আপেল এনে দিলে।

বিকেল ৪ টের সময় গেলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসেবা পরিষদ অফিসে অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি ত্রিপুরার রাজনীতির জটিলতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন, ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্যে একটা Autonomous State করে দিলে সেটা হবে Hill Tripura এবং বাঙালিরা গড়বে সমতল ত্রিপুরা, তাহলে ত্রিপুরার শান্তি আসবে।

জনসেবা অফিস থেকে ফিরে সোজা চলে গেলাম Duncan Gleneagles clinic-এ রক্তের রিপোর্ট নিতে। দেখাগেলো creatinire ১.৯ হয়েছে, স্বাভাবিকের থেকে .৪ বেশী Blood sugar fasting নর্মাল রেঞ্জের .১ নিচে রয়েছে। রাতে ঘুমের ওষুধ খেতে হলো।

রাত্রে ১০ টায় আগরতলা থেকে পুত্র সুরঞ্জন ফোন করেছিলো। সে বললো, কলকাতায় যতদিন প্রয়োজন থাকতে।

৯ই জানুয়ারী, ২০০০, শনিবার। কলিকাতা ১১৫ এ বালিগঞ্জ গার্ডেনসে অধ্যাপক স্বপন বসুর পড়ার ছোট ঘরে ঘুম ভাঙলো ৬.৩০ এ। সঙ্গে সঙ্গে জামা প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়ে দৌঁড়াতে শুরু করলাম গড়িয়াহাট মোড় পর্যন্ত। দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে পৌঁছলাম পত্রিকার হকারদের কাছে। সেখান থেকে হকারদের কাছ থেকে একখানা আজকাল কিনে গড়িয়াহাট বাজারে ঢুকে খুব করে তেলাকুচোর পাতা খুঁজলাম। কিন্তু পেলাম না। একজন সবজি বিক্রেতা মঙ্গলবারে যেতে বললো। বললো ১০০ গ্রাম তেলাকুচো পাতা দশ টাকা লাগবে। তাই দেবো বলে বেরিয়ে এসে একজন মুসলমান ফল বিক্রেতার কাছ থেকে চারটে ছোট সবরিকলা ৫ টাকা দিয়ে কিনে বন্ধুবর স্বপন বসুর বাড়ি ফিরলাম। সকাল ৮ টায় প্রেসারের ওষুধ 5 mg ১ টি খেয়ে নিলাম যশোদাদির দেওয়া heavy breakfast খেয়ে। তারপর বাথরুম করে স্নান সেরে বেরিয়ে পড়লাম অধ্যাপক কমলেন্দু গাঙ্গুলীর ১৮/২৩ বি বালিগঞ্জ প্লেস ইস্ট বাড়িতে। গিয়েই বন্ধুবর ও আমার রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষা গুরু কমলদাকে অনেকদিন পরে দেখে খুব ভালো লাগলো। এর মধ্যে দু'বার Heart Attack হয়ে গেছে। প্রতি সপ্তায় Blood pressere Check করতে হয়। তবু তাঁর শরীর ভালো। দেখলাম তাঁকে নিতে এসেছেন একজন অবাঙালি শ্রমিক নেতা শেয়ালদার হকার্স ইউনিয়নের সর্বভারতীয়

সম্মেলনে নিয়ে যেতে। কমলদা আমাকে সঙ্গে যেতে বললেন। কিন্তু গেলাম না আমি। তবে আগামীকাল দুপুরে নিমন্ত্রণ করে দিলেন।

কমলদার ওখান থেকে বেরিয়ে আবার তেলাকুচোর পাতার সন্ধানে গড়িয়াহাট বাজারে ঢুকলাম। সেখানে খোলা ময়দান বাজারে খোঁড়াদার কাছ থেকে দু টাকা দিয়ে একমুঠো শাকপাতা-ডাঁটা সমেত তেলাকুচোর পাতা নিয়ে যশোদাদির হাতে দিলাম।

দুপুরে ১.৩০ টায় অধ্যাপক রমেন ও বন্ধুবর স্বপনের সঙ্গে মাঝের ঘরে চেয়ার টেবিলে খেতে বসলাম। স্বপনের স্ত্রী (বৌমা) ভুরিভোজ খাওয়ালেন আমাদের। বন্ধুবর তার পাতের কিছু শাকও আমার পাতে তুলে দিলেন আমি শাক খেতে পছন্দ করি বলে।

খাওয়ার পরে দু'টোর সময় ১ টা Petril 0.5 mg ১/২ খেয়ে ১ টা ডাব খেতে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে গড়িয়াহাট মোড়ে। জয়নগরের এক মহিলার কাছ থেকে ৫ টাকার একটা ডাবের জল খেয়ে পেট একেবারে ভরে গেলো।

সেখান থেকে ফিরে ৩ টের সময় শুয়ে পড়লাম একটু। ৪ টের সময় স্বপনের মেয়ে চিনি সরবতি লেবু ও পেয়ারা কেটে দিলো। তারপর আমি Evening Walk এ বেরিয়ে পড়লাম। ৩০ মিনিটে গিয়ে পৌঁছলাম ঢাকুরিয়া লেক ব্রিজে লেকের মাঝ দিয়ে। তখন দেখি যুবক-যুবতীরা ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশাপাশি বসে আছে। কেউ বান্ধবীর কোলে পা তুলে দিয়ে আরো ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে। লেক ব্রিজে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখে মোহিত হয়ে গেলাম। মনে হলো সূর্যটা তার রঙীন আভা নিয়ে ঢাকুরিয়া লেকে ডুবে গেলো। ফেরার সময় দেখি প্রেমিক প্রেমিকারা এবার আরো ঘনিষ্ট হয়ে একে অন্যকে চুমু খাচ্ছে। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। কোনো প্রেমিক প্রেমিকার বুকের মধ্যে মুখ রেখে স্বস্তি পাচ্ছে। ফিরতে ফিরতে এই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে মনে বললাম, আমাদের মতো প্রৌঢ়দের ঢাকুরিয়া লেকে বিকেলে আসা উচিত নয়।

স্বপনের বাড়িতে ঠিক ৬ টায় ঢুকে দেখি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বান্ধবী সরস্বতী মিশ্র আমার জন্যে বসে আছে। কথায় কথায় আমার বড়ো মেয়ে তানিয়ার বিয়ের কথা উঠলো। সরস্বতীদি বললো, 'কুমুদ, তুমি কি মেয়ের বিয়ের জন্যে কিছু কেনাকাটি করে নিয়ে যাবে?' উত্তর বললাম, 'চিকিৎসায় বেরিয়ে যাচ্ছে সব টাকা। কাজেই ও কথা ভাবছিনা।'

আমার কথা শোনার পর সরস্বতীদি নিচেরতলায় স্বপনের পড়ার ঘরে গেলো। কিছুক্ষণ পর স্বপনকে নিয়ে সরস্বতীদি ফিরে এলো। তখন বন্ধুবর স্বপন বললো, 'দেখ, আয়ুব, (স্বপন ও আমার কলেজের সহপাঠীরা এই নামে ডাকে) আমরা তোমার বড় মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করেছি। আমরা ঠিক কোরেছি সরস্বতী তোমার মেয়ের বিয়ের বেনীরসী কাপড় দেবে। আর আমি তোমার মেয়ের গলার হার দেবো।' তাদের কথা শুনে আমার চোখে আনন্দ অশ্রু এলো।

১০ই জানুয়ারী, ২০০০, রবিবার। ভোর ৬ টার প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। ঢাকুরিয়া লেকের ভেতর দিয়ে হেঁটে ঠিক ৬ টায় গিয়ে পৌঁছলাম ঢাকুরিয়া লেক ব্রিজের ওপর। এবং গতকাল যেখানে লেকের মধ্যে সূর্য ডুবে গিয়েছিলো, সেখানে নতুন সূর্যকে খুঁজতে গিয়ে পেলামনা। পরে আমার ভুল ভাঙলো। আমার ঠিক পাশেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দু'হাত জোড় করে সূর্য প্রণাম করছেন। দেখলাম সূর্যদেব ডগমগ করে লেকের পুবদিকের ভেতর থেকে উঠছেন। আর আমি কিনা তাঁকে খুঁজছি পশ্চিম দিকে, কাল যেখানে তিনি লেকের বুকে ডুব দিয়েছিলেন।

গতকাল সন্ধ্যে বেলায় দেখেছিলাম সারা লেক জুড়ে যুবক-যুবতী, প্রেমিক-প্রেমিকাদের ঢল নেমেছে। মনোরম লেকের পাড়ে একে অন্যকে বুকে জড়িয়ে ধরে সুখ-দুঃখের কথা বলছে। কোনো

প্রেমিক হয়তো প্রেমিকের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে । সারা লেকের বসার জায়গায় জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে ।

আর আজ ? আজ কাকভোরে দেখি যুবক-যুবতীদের পাত্তা নেই, নেই প্রেমিকের কোলে প্রেমিকা; শুধু বুড়ো-প্রৌঢ়রা ছুটোছুটি করছে সারা লেকে । মাঝ বয়েসের লোকেরা নানা ধরনের ব্যায়াম কোরছে সর্বত্র । পার্কের ভেতরের লায়ন্স ক্লাবের ভেতর থেকে ভেসে আসছে অট্টহাসি-হাহা-হোহো-হিহি-হুহু-হেহে । একজায়গায় দেখি প্রায় ২০ জন বুড়ো একটা বটগাছের চাতালে মুখোমুখি বসে একসঙ্গে তালে তালে হাততালি দিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে একসঙ্গে স্তোত্র উচ্চারণ করছেন ।

সকালে লেক থেকে ফিরে ওষুধ-পত্র খেয়ে ঠিক ১০.৩০ এ অধ্যাপক কমলেন্দু গাঙ্গুলীর ১৮/২৩ বি, বালিগঞ্জ পেলেস ইস্ট-এর বাড়ি গেলাম । সেখানে গিয়েই দেখি আমার জন্যে অপেক্ষা কোরছেন রেবন্ত সেন, আমাদের ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তর মামাতো /পিসতুতো ভাই । তিনি তাঁর Himadri Electrical Company'র Celling Fan-এর ত্রিপুরায় বিক্রির ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে চলে গেলেন । পরে কমলদা আমাকে নিয়ে গেলেন বালিগঞ্জফাঁড়ি সংলগ্ন C M C (Calcutta Metropolital Corporation)'র ৮ তলা গেস্ট হাউসে । সেখানে সদ্যসমাপ্ত সর্বভারতীয় হকার্স ইউনিয়নের নেতারা রয়েছেন । সেখানে কমলদা ও আমার পুরনো বন্ধু কলকাতা হকার্স ইউনিয়নের নেতা শক্তিমান ঘোষ আলোচনা করলেন । একজন খুব সুন্দরী গুজরাটী মহিলা ডেলিগেটকে দেখলাম সেখানে ।

সেখান থেকে ফিরে খেয়ে কমলদার সঙ্গে পুত্র সুরঞ্জনের কলকাতার English Paper-এ লেখালেখি নিয়ে আলোচনা করলাম । তিনি আগরতলার প্রাক্তন এম.এল.এ তাপস দে সম্পাদিত Fareast Focus-এ প্রকাশিত সুরঞ্জনের লেখা ' Small State with big trouble' পড়ে appreciate করলেন । তারপর তিনি কলকাতার Hindustan times এর Correspondent তপন দাশের সঙ্গে কথা বলতে বললেন ।

কমলদার ওখান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডাঃ পাহাড়ীর হিন্দুস্থান পার্কের চেম্বারে গেলাম বিকেল ৫ টায় । ডাঃ পাহাড়ী প্রেসারের ওষুধ ও ঘুমের ওষুধ একটু বদলে দিলেন । রাত সাতটায় Alzolam 0.5 mg একটি খেতে বললেন ।

১১ই জানুয়ারী, ২০০০, সোমবার । ভোর ছ'টায় খুব কুয়াশার মধ্যে বেরিয়ে ঢাকুরিয়া লেকে গেলাম এবং ঠিক ৬.৩০-এ ঢাকুরিয়া লেকব্রিজের ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম । সেখানে খালি হাতে কিছু ব্যায়াম করে হেঁটে গড়িয়াহাট মোড়ে গিয়ে আজকাল ও বর্তমান সংবাদপত্র কিনে গড়িয়াহাট বাজারে ঢুকে পাঁচটাকা দিয়ে একটা বেল ও পাঁচটাকার ৩ টি সবরি কলা নিয়ে বাসায় ফিরলাম । ফিরে তেলাকুচোর পাতা খেয়ে বেল খেলাম । তারপর যশোদাদির দেয়া প্রাতরাশ খেয়ে প্রেসারের ওষুধ Amlosyl 7.1/2 mg খেলাম । তারপর I-Vit ভিটামিন ট্যাবলেট খেলাম একটা ।

বন্ধুবর স্বপন ঠিক ৮.৪৫ এ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বেরিয়ে গেল । আমিও খেয়ে দেয়ে ১০.৩০ এ বেরিয়ে প্রথমে গেলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Linguistics -বিভাগে । সেখানে Linguistics Department এর হেড অধ্যাপক কিশোর রঢ়ীর সঙ্গে পুত্র সুরঞ্জনের Linguistics এ M.A করার ব্যাপারে আলোচনা করলাম । অধ্যাপক রঢ়ীর ঘরে খুব গরম লাগছিলো আমার । তাই এতো শীতেও পাখা চালাতে হলো ।

সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রিটের মনীষা গ্রন্থালয়ে । সেখানে মনীষার কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত প্রবোধ ব্যানার্জীর সঙ্গে আগরতলার বই মেলায় মনীষার কোন স্টল দেয়া যায় কিনা তা নিয়ে

আলোচনা হলো। দেখলাম তিনি আসন্ন আগরতলার বইমেলায় যেতে আগ্রহী।

সেখান থেকে বেরিয়ে ৬০, পটুয়াটোলা লেনে AICMED (All India Council For Mass Education and Development) 'র অফিসে গিয়ে সাক্ষরতা-কর্মী স্বপন মুখার্জী ও রত্নার সঙ্গে কথা বললাম। আমি কলকাতায় এসে বন্ধু স্বপন বসুর বাড়ি আছি সে কথা জানালাম। সেখান থেকে গেলাম কফি হাউসের পেছনে CAMP -এর বইয়ের দোকানে। সেখানে আমার ককবরক ভাষার ওপর লেখা বই আছে । ক্যাম্পের কর্ণধার বিপ্লব দাশ বললেন, আপনার ককবরক ভাষা ও সাহিত্য বইখানা সুকুমারী ভট্টাচার্য ও অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তর দাদা এসে নিয়ে গেছেন।

সেখান থেকে ট্রামে চেপে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগে এসে মিনি বাস ধরে পাঁচটার সময় স্বপনের বালিগঞ্জের বাড়ি পৌঁছলাম।

সন্ধ্যে সাতটায় ডাঃ পাহাড়ীর পরামর্শ মতো Alzolam 0.5 mg একটি খেলাম। কিন্তু রাত ৮ টায় আমার গা ঘামতে লাগলো, শরীরে অস্বস্তি হতে লাগলো। ডাঃ পাহাড়ীকে ৯ টায় ফোন করলাম। তিনি বললেন, ' Alzolam 0.5 mg আর খাওয়া যাবে না, Petril 0.5mg অর্ধেক খেতে হবে। Minipress (প্রেসারের ওষুধ) XL 5 mg'র পরিবর্তে 2.5 mg খেয়ে শুয়ে পড়ুন।' তাই করলাম। কিন্তু শরীর স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লাগলো। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আগামীকাল ডঃ পাহাড়ীকে দেখাতে যাবো।

১২ই জানুয়ারী, ২০০০, মঙ্গলবার । খুব ভোরে উঠলাম না। গতকাল রাত্রে শরীর খারাপ করেছিলো বলে বৌমা (স্বপনের স্ত্রীকে আমি বৌমা বলে ডাকি) আমাকে আর প্রাতর্ভ্রমণে যেতে দেননি। তবু ৬-৩০-এ ছাদে উঠে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। তারপর খালি হাতে ব্যায়াম। ঘরে ফিরে এসে বিছানায় বসে যোগ ব্যায়াম করলাম কিছুক্ষণ। এরপর যশোদাদির কাছ থেকে তেলাকুচোর পাতা ও বেল খেলাম। সকাল ৮টায় যশোদাদি প্রাতরাশ দিতেই প্রেসারের ওষুধ Amlosyl 5mg $^{1}/_{2}$ mg খেলাম। সকাল ৯টায় স্নান সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। আজ সকালের দিকে বেরুইনি কোথাও।

দুপুর ১২টায় ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুম এলো না। দুটোর সময় টি. ভি.-তে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলা দেখলাম কিছুক্ষণ। ঠিক তিনটের সময় Petril 0.5mg $^{১}/_{২}$ খেয়ে একটু শুয়ে থাকলাম। চারটের সময় উঠে আপেল ও পেয়ারা খেয়ে ডাঃ পাহাড়ীর চেম্বারে গেলাম। ডাঃ পাহাড়ীকে আমার গত রাতে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কথা বললাম। উনি বললেন, দেখুন আপনার ঘুমের ওষুধ - Anxit, Prtril, libotryp এগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিতে হবে। না হলে আপনার ম্যানিয়া ডেভালপ করে যাবে। ঠিক আছে, আজ আপনাকে প্রেসারের ওষুধ একটু বদলে দিচ্ছি ঃ সকাল ৮ টায় Amlosyl 10mg minipress 5 mg। আর anxiety কাটার ওষুধ Petril 0.5 এর অর্দ্ধেক দুপুর তিনটের সময় এবং রাত্রে ঘুমের ওষুধ Libotryp একটা। ঘুমুনোর আগে zyloric খাবেন।

ডাঃ সিরাজুদ্দীন আমেদ-এর Holter Minitoring-এর পরামর্শের কথা বলতে তিনি বললেন, ঠিক আছে, 'তাহলে ওটাও করে ফেলুন, তবে আপনার Heart তো ভালোই আছে, তবে এত দূর থেকে এসেছেন, মনে খুঁত রেখে যাবেন না। Duncun Clinic-এ যান। ওরা একটা মেশিন পরিয়ে দেবে ২৪ ঘন্টার জন্যে।' ডাঃ পাহাড়ীর পরামর্শ অনুসারে গড়িয়াহাটের কাছে Duncun Gleneagles Clinic-এ এসে Holter Minitoring এর কথা বললাম। ওঁরা বললেন, কাল এসে ৫০০টাকা দিয়ে Holter book করে যাবেন। পরশুদিন চান করে এলেHolter monitor পরিয়ে দেবো। এই সময় আরো ১২০০ টাকা জমা দিতে হবে। ২৪ ঘন্টা পরে আসবেন। তখন খুলে নেবো। Duncun থেকে বেরিয়ে বেল, কমলা, ওষুধ নিয়ে স্বপনের বাড়ি ৭টায় সময়।

১৩ই জানুয়ারী, ২০০০, বুধবার। ভোর ৬.৩০-এ উঠে বেরিয়ে গোলপার্ক পর্যন্ত গেলাম। সেখান থেকে ফিরে খালি হাতে একটু ব্যায়াম করলাম। তারপর পাকা বেল আস্ত একটা খেলাম। ইতিমধ্যে যশোদাদি প্রাতরাশ এনে দিলেন। প্রাতরাশ খেয়েই ঠিক সকাল ৮টায় প্রেসারের ওষুধ Amlosyl 5mg দুটো খেলাম। ৯টায় স্নান সারলাম। আজ পায়খানাও পরিষ্কার হলো। ঠিক দশটায় বন্ধুবর স্বপনকে বলে বৌমার কাছ থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম Duncun Gleneagles Clinic & Holter Monitoring (Cardioligical test by a machine) এর ব্যাপারে। সেখানে গিয়ে Receivig Counter-এ কথা বলতেই একজন মহিলা আমাকে ডাঃ পাহাড়ীর প্রেসক্রিপশন দিতে বললেন। তিনি একটা ফর্ম-এ আমার নাম-ধাম, ঠিকানা লিখলেন। তারপর ৫০০ টাকা দিতে বললেন। টাকা পেয়ে ভদ্রমহিলা পুরণ করা ফর্মটা দিয়ে বললেন, 'আগামীকাল আপনার বুকে Holter monitor পরিয়ে দেয়া হবে। ৩০মিঃ আগে এসে রিপোর্ট করবেন, আর সঙ্গে করে ১২০০ টাকা আনবেন। বুকে মেশিনটা ২৪ ঘন্টা রাখতে হবে। বুকের লোম ফেলে আসবেন, না হলে Holter machine টা ঠিকমতো বসানো যাবে না। সাবান দিয়ে স্নান করে আসবেন। কোন তেল মাখবেন না।'

Duncun GlenEagles থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাট বাজারে ঢুকে তেলাকুচোর পাতা খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। পরে কুলেখাড়া শাক ২ আঁটি ময়মনসিংহের হীরেন করের শাকের দোকান থেকে নিলাম। হীরেন বাবু ময়মনসিংহেব রাজা সূর্যকান্ত, শশীকান্ত প্রমুখদের অনেক কথা বললেন। তসলিমার 'আমার মেয়েবেলা' উপন্যাসে এই সব রাজাদের কথা আছে। করবাবুর দোকান থেকে বেরিয়ে ফলের দোকানে এসে একজন মুসলমান ফল বিক্রেতা (বাড়ি-জয়নগর) কাছ থেকে দুটো বেল, কলা নিলাম। গড়িয়াহাট বাজারের বাইরে বসা লক্ষ্মীকান্তপুরের এক মেয়ে ডাব বিক্রেতার কাছ থেকে একটা ডাব কিনে হাঁটতে হাঁটতে স্বপন বসুর বাড়ি ফিরলাম।

দুপুর দুটোয় খেলাম। বিকেল তিনটের Petril 0.5 mg ১/২ খেলাম। ৪ টের সময় ফল খেয়ে বৌমাকে বললাম আমার প্যান্টের হুক সেলাই করে দিতে। তারপর বেরিয়ে পড়লাম যাদবপুর। মিনিবাসে উঠতেই জনসেবাপরিষদের কর্মী বাপীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। সেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসেবা পরিষদের আপিসে যাবে। যেতে যেতে অধ্যাপক অরুণোদয় সাহার হারিয়ে যাওয়া ছেলের কথা উঠলো। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসেবা পরিষদের আপিসে গিয়ে অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তীকে আমার Holter monitoring-এর কথা বললাম। তারপর ত্রিপুরা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে পরিষদের কর্মী সঞ্জয় চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে সোজা হেঁটে চলে এলাম স্বপনবাবুর বাড়ি। প্রায় ৩ কিলোমিটার হবে।

রাত ৯.৪৫-এ পুত্র সুরঞ্জন আগরতলা থেকে ফোন করলো। তাকে Holter monitoring-এর কথা জানালাম। আর বললাম ১০০০ টাকা আগরতলার জনসেবা পরিষদেব মারফত পাঠাতে। রাত্রে minipress x L 5mg ১টি এবং Libotryp খেয়ে শুলাম।

১৪ই জানুয়ারী, ২০০০, বৃহস্পতিবার। পূর্বের কথা মতো ঠিক ১২-৩০-এ গিয়ে Duncun-এ গিয়ে রিপোর্ট করলাম। ১.৪০-এ আমার বুকে Holter monitor লাগিয়ে দেওয়া হলো এবং বলা হলো এই Holter লাগানোর পর শরীর খারাপ হলে তার প্রকৃতি কেমন তা ডায়েরীতে লিখতে হবে।

আরো বলা হলো - আগামীকাল ঠিক একটায় এসে হল্টার মেশিন খুলে যেতে। এই মেশিনে ২৪ ঘন্টার হৃদ যন্ত্রের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ধরা পড়বে।

ডানকান গ্লিন ঈগেলস-এ হল্টার মেশিন বুকের ওপর লাগিয়ে বৌমার দেয়া ছাতা মাথায় দিয়ে সোজা গড়িয়াহাট দিয়ে বন্ধুবর স্বপনবাবুর বাড়ি এলাম। বন্ধুবর বললে, 'হল্টার মনিটর বুকে নিয়ে সব

কিছু করে যাও। রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটো। ছোটো, তবেই তো বোঝা যাবে হার্টের অবস্থা কেমন।'

বিকেলে বন্ধুবরের কথামতো গোলপার্কের দিকে হাঁটতে বেরুলাম। গোলপার্কের গাঙ্গুরামের মিষ্টির দোকানে গিয়ে ৩ টাকা ৫০ পয়সা দিয়ে রাধাবল্লভী খেলাম বিকেলে বেরুনোর আগে তিনটের সময়।

১৫ই জানুয়ারী, ২০০০, শুক্রবার । ১৫.১.২০০০ -এ বন্ধুবর স্বপন বসুর বাড়িতে প্রায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে ভোর সাড়ে ছ'টায় প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে গড়িয়াহাট পর্যন্ত গেলাম বুকে হল্টার মনিটর লাগানো অবস্থায় । সেখান থেকে আজকাল, বর্তমান ও প্রতিদিন- এই তিনখানা খবরের কাগজ কিনে বাসায় ফিরলাম । বাসায় ফিরতেই যশোদাদি বেল ভেঙে দিলো। বেল খাবার ১০ মিনিট পর দুধ-রুটি-কলা দিয়ে প্রাতরাশ সেরে ঠিক ৯টায় প্রেসারের ওষুধ Ambosyl 10mg খেলাম এবং ভিটামিন ট্যাবলেট I-vitও খেলাম ১টি। এরপর খুব সন্তর্পণে প্যান্ট আন্ডারওয়ার খুললাম যাতে বুক থেকে কোমর পর্যন্ত পরানো হল্টার মনিটর-এর যন্ত্রপাতিগুলো ক্ষতি না হয়। বাথরুমে আরো সন্তর্পণে বসে পায়খানা করলাম। আজ হল্টার মনিটর নিয়ে স্নান করা বারণ। সেই ১টার সময় ওটা বুক থেকে খুলে তারপর স্নান।

সকালে বন্ধুবর স্বপনের 'বাঙলা অকাদমি'তে লিটল ম্যাগাজিনের ওপর গতকালের বক্তৃতার কথা জানলাম। শুনলাম, প্রতি বছরই নাকি বাঙলা অ্যাকাদমি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ওপর এরকম অনুষ্ঠান করে থাকে।

ঠিক ১১-৪৫ নাগাদ বন্ধুবর স্বপনকে বলে বেরিয়ে পড়লাম ডানকান ক্লিনিক-এ বুকের হল্টার মেশিন খোলার জন্যে। Duncun Gleneagles-এ গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। ঠিক ১২-৪৫-এ Cardiology Section-এ রিপোর্ট করলাম এবং সেই Holter Monitor diary জমা দিলাম, ঠিক ১টা ২০ মিনিটে আমার ডাক পড়লো এবং একজন ডাক্তারবাবু আমার বুকের হল্টার মেশিনটা আস্তে আস্তে খুলে নিলেন এবং আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। তারপর স্বপনের বাড়ি ফিরলাম।

বিকেল চারটের সময় সরস্বতীদি (সরস্বতী মিশ্র) এলেন স্বপনের বাড়ি। এসেই বললেন, 'কুমুদ, তোর মেয়ের বিয়ের হার করতে দিয়েছি। কিছু ভালো পাথর বসাতে বলেছি, আগামী বুধবার নাগাদ নিয়ে আসবো,' আর তোর বৌমা ও আমি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালে গিয়ে তোর মেয়ের বিয়ের লাল-খয়েরী বেনারসী শাড়ি কিনে নিয়ে আসবো!' এরপর আমি ৫টার সময় একটু সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে দিয়ে ঢাকুরিয়া লেকে ঘুরলাম কিছুক্ষণ। সেদিনকার মতো আজো যুবক-যুবতী, প্রেমিক-প্রেমিকাদের জড়িয়ে ধরে বসে থাকতে দেখলাম। আজ দেখলাম, বেশীর ভাগ প্রেমিকা প্রেমিকের ঘাড়ে মাথা রেখে শান্তি পাচ্ছে। লেক থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলাম গড়িয়াহাট বাজারে। সেখানে বেল খুঁজলাম। কিন্তু পেলাম না। তারপর ঘুমের ওষুধ Libotryp কিনে নিয়ে স্বপনের বাড়ি ফিরলাম। ফিরে এসে দেখি সরস্বতীদি বৌমার সঙ্গে আমার বড়ো মেয়ে তানিয়ার বিয়ের বেনারসী নিয়ে কথা বলছেন।

১৬ই জানুয়ারী, ২০০০, শনিবার । গত রাত্রে ঘুমের ওষুধ Libotryp খাওয়ায় আজ সকালে উঠতে ৭টা বেজে গেলো। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম গড়িয়াহাট বাজারে বেল ও কুলেখাড়া শাক কিনতে। রোজ সকালে বেল খাই পায়খানা হওয়ার জন্যে। কুলেখাঁড়া শাক খাই রক্ত বৃদ্ধির জন্যে। আমার হিমোগ্লোবিন একটু কম। বাজারে গিয়ে একজন মহিলা বিক্রেতার কাছ থেকে ২ টাকা করে ৪ টে বেল কিনলাম, আর ময়মনসিংহের সেই বৃদ্ধ হীরেন করের কাছ থেকে কিনলাম কুলেখাড়া শাক।

বাজার থেকে ফিরে তাড়াতাড়ি বেল খেয়ে যশোদাদির দেয়া দুধ-রুটি-কলা দিয়ে তৈরী প্রাতরাশ

খেলাম এবং ঠিক ৮টায় প্রেসারের ওষুধ Amlosyl 10 mg ও ভিটামিন ট্যাবলেট I-vit ১টা খেলাম।

বেশ সর্দি হওয়ায় আজ মাথায় ঠাণ্ডা জল ও গায়ে ঈষদ উষ্ণ গরম জল ঢাললাম। দুপুর একটায় ভাত খেতে বসলাম। পাশের ঘরে বন্ধুবর স্বপন অধ্যাপিকা সুজাতাকে নিয়ে খেতে বসলো। তারা খেয়ে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাঙ্গুর -এর বাড়িতে চলে গেলো একটা ইন্টারভিউ নিতে। তারপর তারা সেখান থেকে যাবে বাংলা অকাদেমিতে সুকুমার সেনের জন্মশত বার্ষিকী অনুষ্ঠানে। স্বপনের মেয়ে চিনি ও বিকেলে গেলো সুকুমার সেনের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে।

দুপুর ৩ টের সময় Petril 05 mg ১/২ খেলাম। ৪ টের সময় শরীরে একটু গরম গরম ভাব হলো। ৪-৩০-এ বেরিয়ে পড়লাম গড়িয়াহাটের দিকে একটা চপ্পল কিনতে। হাঁটতে হাঁটতে গেলাম বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত। সেখান থেকে ৩৮ টাকায় ১ জোড়া অজন্তার হাওয়াই চপ্পল কিনলাম। ফেরার পথে কমলালেবু তিনটে ১০ টাকায় কিনলাম তারপর কাঁকুলিয়ার মোড়ে মৌচাকে এসে কচুড়ি খেলাম।

স্বপন ও চিনি বাংলা অকাদেমি থেকে ফিরলো রাত সাড়ে ৯টায়। সভাপতি অসিত বাবুর বক্তৃতা খুব ভালো হয়েছে বললো বন্ধুবর। সুকুমার সেনের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সুকুমার সেনের ছেলে সুভদ্র সেন ও জামাই বিজিত দত্ত উপস্থিত ছিলেন বলে স্বপন জানালো। ত্রিপুরার লিটল ম্যাগাজিনের মেলা ও সুকুমার সেনের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান নিয়ে কথাবার্তা বলে ১০টায় ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৭ই জানুয়ারী, ২০০০, রবিবার । সকাল ৭টায় উঠে গড়িয়াহাট বাজারে গেলাম বেল, কুলেখাড়া শাক এবং ঘুম হবার জন্যে শুষনি শাক আনতে। বাজার থেকে ফিরে বেল খেলাম ও প্রাতরাশ সারলাম। ঠিক ৮টায় প্রেসারের ওষুধ Amlosyl 10mg খেলাম। সকাল ১১টায় পার্থ সেনগুপ্ত ফোন করে জানালেন - অঘোর দেববর্মার আদিবাসী সমস্যা নিয়ে লেখাটির ইংরেজী অনুবাদ হয়ে গেছে। আজই সেটা আগরতলায় পাঠাচ্ছেন।

বিকেল ৪ টেয় 'মনীষা'র প্রবোধ ব্যানার্জীকে ফোন করলাম। তিনি আমাকে আগামীকাল সি. পি. আই -এর ভূপেশভবনে যেতে বললেন। সেখানে আগরতলার বইমেলায় মনীষার স্টল খুলবার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

সন্ধ্যে ৬-৩০ টার সময় 'Duncun gleneagle's থেকে আমার 'হল্টার মনিটর'-এর রিপোর্ট নিয়ে ডাঃ পাহাড়ীর কাছে গেলাম। তিনি রিপোর্ট দেখে বললেন, "Echocardiographyতে বা ECGতে কোন দোষ ধরা না পড়লেও 'হল্টার মনিটরিং'-এ একটা দোষ ধরা পড়েছে। আপনি পি জি'র প্রফেসর ডাঃ এস এস চাটার্জীকে একবার দেখান। ১২-এ আব্দুল রাজ রোডে তিনি বসেন। তাঁর মন্তব্য শোনার পর হয়তো আপনার প্রেসারের ওষুধও পাল্টাতে হতে পারে। Amlosyl-এর বদলে হয়তো 'গার্ডিনাল' দিতে হতে পারে।" ডাঃ পাহাড়ীর চেম্বার থেকে বেরিয়ে স্বপনের বাড়িতে এলাম। রাত ৯-৪০ এ আগরতলা থেকে পুত্র সুরঞ্জন ফোন করলো। তাকে সব বললাম। শুক্রবার সে আবার ফোন করবে। সে ১০০০ টাকা পাঠিয়েছে জনসেবাপরিষদে বলে জানালো।

১৮ই জানুয়ারী, ২০০০, সোমবার । সকাল ৬-৪৫ উঠে একটু হেঁটে এলাম। তারপর বেল খেলাম ও প্রাতরাশ সেরে ৮টার সময় প্রেসারের ওষুধ Amlosyl 10mg খেলাম। আজ স্বপনের স্ত্রীর বড়ো ভাই লালুবাবু সস্ত্রীক বর্ধমান থেকে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর স্ত্রীর বুকে টিউমার, ডাক্তার দেখাবেন।

আমি আজ ৯টার সময় বেরিয়ে পি জি'র হার্ট-এর ডাক্তার ডাঃ সুধাংশু শেখর চ্যাটার্জী (ডাঃ এস এস চ্যাটার্জী)'র হাজরার মোড়ের কাছে 12A, Andul Raj Road-এর চেম্বার দেখে এলাম। রাতে তাঁর কাছে গেলাম। সাড়ে চার ঘন্টা অপেক্ষা করার পর তিনি দেখলেন। তিনি ভোল্টার মনিটরিং ECG

ভালো করে দেখলেন। তারপর বললেন, আপনার বুকে এমন কিছু দোষ নেই। তবে TMT পরীক্ষা করে আমার কাছে আসুন। creatinine ও PP পরীক্ষা করতে বললেন রায় ত্রিবেদী থেকে।

১৯শে জানুয়ারী,২০০০, মঙ্গলবার। বন্ধুবর অধ্যাপক স্বপন বসুর বাড়ি, ১১৫-এ বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলি ২৯ ফোন ৪৪০-৩৫৯২।

আজ সকাল সাতটায় বেরিয়ে পড়লাম গড়িয়া হাট বাজারে। সেখানে গিয়ে বেল কিনলাম ৩ টে ১১ টাকা দিয়ে। তারপর কিনলাম ২ আঁটি কুলেখাড়া শাক ৪ টাকা দিয়ে। তারপর নোনতা বিস্কুট ১ প্যাকেট সাড়ে ছ' টাকা দিয়ে কিনে স্বপনের বাড়িতে এলাম।

এসে দেখি যশোদাদি আমার প্রাতরাশ তৈরি করে ফেলেছেন। আমি তাড়াতাড়ি বেল খেয়ে প্রাতরাশ খেলাম এবং ৮ টায় প্রেসারের ওষুধ Amlosyl 10 mg গলাধঃকরণ করলাম। প্রেসারের ওষুধ খেয়ে স্নান সারলাম তারপর ঠিক ৯.৩০ -এ বেরিয়ে পড়লাম মিন্টো পার্কের কাছে 'ক্যালকাটা মেডিকেল সেন্টার'এ পি জি হাসপাতালের হার্টের বড়ো ডাক্তার প্রফেসর এস.এস. চ্যাটার্জীর পরামর্শমতো T M T (হার্টের একপ্রকার পরীক্ষা) করার ব্যাপারে বিষয়-আশয় জানতে। ১০০ টাকা দিয়ে T M T বুক করলাম। কিন্তু যে-মহিলা আমার T M T বুক কোরলেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার প্রেসার নর্মাল আছে তো ? প্রেসার নর্মাল না থাকলে T M T করা যাবে না।' তখন আমি বললাম, ' আমার প্রেসার নর্মাল না। গতকাল ডাঃ এস এস চ্যাটার্জী ব্লাডপ্রেসার চেক করেছেন, তখন আমার প্রেসার ওপরেরটা ছিলো ১৬০ এবং নিচেরটা ৯০।' আমার কথা শুনে ভদ্রমহিলা বললেন, " এত প্রেসারে তো আপনার T M T করা যাবেনা। আপনি আগামীকাল আসবার আগে Dr. S.S. Chatterjee কে একবার জিজ্ঞেস করে আসবেন।' আমি তথাস্তু বলে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে সোজা চলে গেলাম সেন্ট সেজভিয়ার্স কলেজের কাছে 'ত্রিবেদী ও রায়' তে PP (খাবার পর রক্ত পরীক্ষা) এবং Serum Creatinine (কিডনির বিষয়ে রক্ত পরীক্ষা) করার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। সেখান তেকে বেরিয়ে আবার হেঁটে চলে এলাম সেক্সপিয়র সরণী ও ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়ে ওষুধের দোকান 'শীতল স্টোর্স' এ আমার Florinef এই বিদেশী ওষুধটা কিনতে। কিন্তু ওষুধটা পাওয়া গেলোনা। আসলে ওই ওষুধটা black-এ বিক্রি হয় চড়া দামে। ১০০ বড়ি ১৬০০ টাকা দাম।

ওষুধের দোকান থেকে গেলাম প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে ত্রিপুরা ভবনে Joint Resident Commissioner Mr. T.K. Chakma'র সঙ্গে দেখা কোরে ত্রিপুরায় ফেরার টিকিট এর ব্যবস্থা করতে। কিন্তু চাকমা সাহেব নেই, ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে receive করতে Airport-এ গেছেন। চাকমা সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে ত্রিপুরা ভবনের Publicity বিভাগের কর্মী অজিত বাবুর সঙ্গে দেখা কোরতে। অজিত বাবু চা খাওয়ালেন।

ত্রিপুরা ভবন থেকে ফিরে স্বপনের সঙ্গে T M T পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করলাম। সে বললো, " দ্যাখো, T M T পরীক্ষা করা বেশ কঠিন। একটা চলন্ত মেশিনের ওপর উঠে ছুটতে হয় Stress পরীক্ষা করার জন্যে। তোমার প্রেসার নর্মাল নয়, পড়ে-টড়ে গেলে তখন একটা মহা বিপদেই পড়বে।'

বিকেলে ডাঃ পহাড়ীকে সব বললাম। তিনি Dr. S.S.Chatterjee'র দেওয়া আমার প্রেসক্রিপশান দেখলেন। তাতে পরিস্কার লেখা আছে ECG Within normal limit. তিনি বললেন, ' T M T করার দরকার নেই, PSA'র রিপোর্ট পাবার পর ত্রিপুরায় ফিরে যান।'

২০শে জানুয়ারী, ২০০০, বুধবার। কলকাতা, অধ্যাপক স্বপন বসুর বাড়ি। ৬.৩০ এ। উঠেই

একটু হেঁটে এসে বিছানায় কিছুক্ষণ যোগাসন করলাম। তারপর বেল খেয়ে প্রাতরাশ সারলাম। ঠিক ৮ টায় খেলাম প্রেসারের ওষুধ Amlosyl 10 mg । তারপর খেলাম ভিটামিন ট্যাবলেট I-vit।

বন্ধুবর স্বপন ৯ টার সময় বর্দ্ধমান বেরিয়ে যাবে, আজ তার বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস। খাওয়ার সময় বৌমার সঙ্গে একটু ঝগড়া হলো। বৌমার সঙ্গে গীতাদির জোরে জোরে কথাবলা নিয়ে। সে আধ খাওয়া করে উঠে পড়লো। বন্ধুবর চায়না যে বৌমা বাড়ির কাজের লোকদের সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলুন। স্বপন ঠিকমতো খেয়ে না যাওয়ায় বৌমা একটু কাঁদলেন। বন্ধুবর বর্দ্ধমানে বেরিয়ে গেলে বৌমা আমাকে বললেন, 'আয়ুব দা, আপনার বন্ধুকে একটু বোঝান একেবারে সামন্য ব্যাপারে এভাবে মেজাজ খারাপ না করতে।'

দুপুরে ১ টার সময় খেলাম। ৩ টের সময় ওষুধ খেলাম Petril 0.5 mg 1/2। ৪ টের সময় ফল খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বরীন্দ্র সরোবর। ঢাকুরিয়া লেকে বেড়াতে আজ একটু আগেই বেরোলাম। বেরিয়ে পোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে দিয়ে যেতেই চোখে পড়লো গান-বাজনার অনেক শিল্পী বেরিয়ে আসছেন মিশন তেকে তাঁদের যন্ত্রপাতি নিয়ে। দেখলাম, একজন অন্ধ গায়িকাকে একজন হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন একজন সুদর্শন যুবক।

লেকে ঢুকে হাঁটতে হাঁটতে গিয় বসলাম একটা নির্জন বেঞ্চে। সামনে উন্মুক্ত সরোবর রোয়িং ক্লাবের সদস্যরা প্রতিটি সিপ জাতীয় নৌকায় একজন করে বসে জোরে জোরে দু'হাতে দুখানা দাঁড় টেনে নৌকা বাইছেন। হঠাৎ চোঁখে পড়লো একজন তরুণী সজোরে দু'হাত দিয়ে নৌকা বাইতে বাইতে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে আর রবীন্দ্র সরোবরের লেকের জলে পশ্চিম দিকে তার রক্তিম আভা চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। সামনে লেকের ভেতর দু'টো দ্বীপের গাছে শত শত কাক আর বক তাদের রাতের ঠিকানা খুঁজছে কিচির-মিচির করে, মনে হলো তাদের সঙ্গে শালিকও গলা মিলিয়েছে। এমন মনোরম নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে কী ভালোই না লাগছিলো।

কিছুক্ষণ পরের সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম আমি। হাঁটতে শুরু করলাম সামনের দিকে। ঢাকুরিয়া ব্রিজের কাছে পৌছতেই দেখি বাঁ দিকের গাছের তলায় ছেলে-মেয়েরা কাঠবাদাম কুড়োচ্ছে। ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে দেখলাম।ছপ নৌকোগুলো সব ফিরতে শুরু করেছে Bengal Rowing Club-এর দিকে। ব্রিজ পেরিয়ে বাঁ দিকে Rowing Club রেখে লেকের দক্ষিণপাড় দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম সামনের দিকে। লেকের দক্ষিণপাড়টা খুবই নির্জন। লোকজন তেমন নেই, যুবক-যুবতী-প্রেমিক-প্রেমিকাদের বসার জায়গাও নেই এপাড়ে। ডান দিক দিয়ে রেলগাড়ি দ্রুত এগিয়ে চলেছে যাদবপুরের দিকে। লেকের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে এলাম Bengal Civil Defence-এর সামনে। Bengal Civil Defence-এর সামনে লেকের পাড়ে অযত্নে রক্ষিত তিনটে কামান রয়েছে উত্তর দিকে তাক করে। কামান তিনটে হয়তো কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন হবে। সেগুলোকে এভাবে থাকতে দেখে বেশ খারাপই লাগলো। আবার পা চালালাম সামনে। কিছুদূর হিয়ে দেখি লেকের একটা ঘাটে দেহাতী মেয়েরা সন্ধ্যে বেলার থালাবাসন মাজছে, কেউবা আদুল গায়ে স্নান করছে। আগে যখন লেকের দক্ষিণ পাড় দিয়ে হেঁটেছি, তখন সেখানে ছিলো তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুরা। এখনো কিছু কিছু ঘর রয়েছে বলে এদিকটা অনেকটা পাড়াগাঁ বলে মনে হচ্ছিল।

এবার লেক পেরিয়ে চলে এলাম Life Saving Club-এর কাছে। কিছুদূর এগিয়ে একটা নির্জন বেঞ্চে চোখ বুঁজে ধ্যানস্থ হয়ে বিশ্রাম করলাম কিছুক্ষণ। ধ্যানস্থ অবস্থায় আমার মন চলে গেলো ত্রিপুরায় আমার শ্বশুর বাড়ির ট্রাইবেল গ্রামে। চোখ বুজে গ্রামের প্রতিটি বাড়ি দেখতে লাগলাম। সেখানেও সন্ধ্যা নেমেছে। মেয়েরা জুমের কাজ, ক্ষেতের কাজ সেরে সব বাড়ি ফিরছে। পুরুষেরা হেরমা বাজারে

সওদা করছে সব।

২১শে জানুয়ারী, ২০০০, শুক্রবার। সকাল ৭ টায় উঠে গড়িয়াহাট বাজারে গেলাম হন্তদন্ত হয়ে। ক'দিন ধরে উঠতে বেশ দেরি হচ্ছে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শোবার জন্যে। গড়িয়াহাট বাজারে গিয়ে বেল কিনলাম আগে। তারপর শাক বিক্রেতার দোকানে গিয়ে ৪ আঁটি কুলেখাড়া শাক কিনলাম ৮ টাকায় আর তেলাকতুচোর পাতার অর্ডার দিলাম।

বাজার থেকে ফিরে বেল খেলাম, প্রাতরাশ সারলাম তারপর। ঠিক৮ টায় প্রেসারের ওষুধ Amlosyl 5mg দুটো ট্যাবলেট খেয়ে নিলাম, তারপর খেলাম I-vit-ভিটামিনের ওষুধ। ৮.৩০ এ স্নান সারলাম স্বপনদের নিচেরতলার নতুন বাথরুমে গিয়ে। ৯ টার সময় বেরিয়ে পড়লাম কাঁকুলিয়ার মোড়ে। প্রথম সেলুনে ঢুকে ৫ টাকায় দাড়ি কাটলাম। তারপর গেলাম S.D.Pharmacy তে। সেখান থেকে Minipress XL 5mg ১ প্যাকেট আর 2.5 mg ১ প্যাকেট কিনলাম ১৭৪.৩০ পয়সা দিয়ে। প্রেসারের ও পেচ্ছাবের ওষুধ 7.2 mg (5mg + 2.5 mg) minipress প্রতিদিন রাত্রে শোবার সময় খেতে হয়।

ঠিক ১২ টার সময় এলো আমার জ্ঞাতি ভাইপো প্রভাস। আমার থেকে সে মাত্র এক বছরের ছোটো আমার এখন ৫৮, আর ৫৭। প্রভাস ও আমি একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছিলাম আমাদের দেশের বাড়ি খুলনা জেলার সাতক্ষীরা বিভাগের আশাশুনি থানার খাজরা গ্রামে। আমরা রোজ আমাদের নদী বিশাল কপোতাক্ষ নদ পেরিয়ে ওপারে যেতাম আমাদী গ্রামে। আমাদী বাজারে নৌকো থেকে উঠে আমরা ছুটতাম সরকারী প্রাইমারি স্কুলে। আমাদী বাজার থেকে আমাদের স্কুল ছিলো দু'মাইলের মতো। প্রভাসের এক ক্লাস ওপরে পড়তাম আমি। আমাদের মধ্যে সেই ছিলো সব থেকে ভালো ছেলে। প্রাইমারিতে সে বৃত্তি পেয়েছিলো। প্রাইমারি স্কুল ছেড়ে আমরা গেলাম 'আমাদী জাইগীর মহল তকিমুদ্দিন হাইস্কুলে। স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন নিরঞ্জন রায় চৌধুরী। আমি ১৯৬০ সালে ম্যাট্রিক পাশ করলাম; আর প্রভাস ১৯৬১তে। পাশ করে আমরা এলাম কলকাতায়। আমি ভর্তি হলাম বঙ্গবাসী কলেজে। আর সে Science নিয়ে ভর্তি হলো গড়িয়ার একটি কলেজে। তারপর আমি M.A পাশ করে চলে গেলাম ত্রিপুরায়, প্রভাস হাওড়া RMS-এ চাকুরী পেয়ে থেকে গেলো কলকাতাতেই। সে আসতেই আমি আমাদের খাজরা গ্রামের নানা খবর জিজ্ঞেস করলাম। আমাদের পাড়ার প্রায় প্রত্যেক পরিবার রয়ে গেছে সেখানে। তবে আমাদের বাড়িতে কেউ নেই। অন্যেরা আমাদের বিশাল'বাগবাড়ি'র খন্ড খন্ড কিনে নিয়ে বসবাস করছে। নন্দীদের বাড়ির বিরাট পরিবর্তনের কথা বললো সে। নন্দীদের বিশাল দোতলা বাড়িটা কিনে নিয়েছে হাকিম মোড়ল। এবং বাড়িটা ভেঙে তার ইট নিয়ে লাউতাড়ায় তাঁদের গ্রামে মোড়ল সাহেব ইমারত তৈরি করেছেন। ওই দালানের খালি ভিটের ওপর এখন নরেন্দ্রনাথ নন্দীর পৌত্ররা গোলপাতার ঘর বেঁধে থাকে। নরেন নন্দীর ছেলে হোলী ওই দালান বাড়িতে খুন হয়। তার দেহ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে হোলীর বৌ এক মুসলিমকে বিয়ে করে আমাদের মুসলমান পাড়ায় চলে যায়। প্রভাসের কাছ থেকে আমাদের গ্রামের আরো খবর পেলাম। আমাদের কপোতাক্ষ নদ নাকি শুকিয়ে খালের মতো হয়ে গিয়েছে 'অব দা কোম্পানীর'র বাঁধ দেয়াতে। অথচ এই নদী কত বিশাল ও হিংস্র ছিলো আমাদের ছেলে বেলায়। কামোটের জন্যে জলে পা দেয়া যোতোনা। সেই নদী এখন প্রায় বুঁজে গেছে। আমার মামার বাড়ি ইসলামকাঠি। ইসলামকাঠি থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তর সাগরদাড়ি গ্রাম ৫/৬ মাইলের মতো। সাগরদাড়ি, ইসলামকাঠি, রাড়ুলী ও কাঠিপাড়া — এই চারটে গ্রাম কপোতাক্ষের গর্ব। রাড়ুলী গ্রামে জন্ম বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের। কাঠিপাড়া হলো মাইকেলের মামার বাড়ি। আর নৈসর্গিক চিত্রে ভরপুর ইসলাম কাঠি হলো কলকাতার বিখ্যাত 'কমলালয়' এর

প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়ি। ইসলামকাঠির কপোতাক্ষের স্নানের ঘাট থেকে আমার মাসিমা কালীকে কুমুরে নিয়ে গিয়ে ছিলো আমার মায়ের সামনে থেকে গত শতাব্দীর প্রথম দশকে। মাইকেলের সেই কপোতাক্ষ আমাদের গর্বের কপোতাক্ষ আজ বুঁজে গেছে। কপোতাক্ষের তীরে পূর্ববঙ্গের সর্ববৃহৎ হাট 'বড়দাল' এর আজ কী অবস্থা হয়েছে কপোতাক্ষ বুঁজে যাবার ফলে?

বিকেলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসেবা পরিষদ অফিসে গিয়ে অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করলাম। রাত ৯.৪৫-এ ত্রিপুরা থেকে ছেলে ফোন করলো। সে ১০০০ টাকা আগরতলার জনসেবা পরিষদ অফিসের হরিহর বাবুর কাছে জমা দিয়েছে। আমাকে অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তীর কাছ থেকে ১০০০ টাকা নিয়ে নিতে বললো। পুত্র জানালো-তানিয়া (আমার বড়ো মেয়ে)'র বিয়ের আশীর্বাদ আমি আগরতলায় ফিরে গেলেই হবে। ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মাকে নিয়ে আগামীকাল খাট-পালঙের অর্ডার দিতে যাবে। সে মঙ্গলবারে ফোন করবে বললো।

২২শে জানুয়ারী, ২০০০, শনিবার। আজ সকাল ৭ টায় গড়িয়াহাট বাজারে গিয়ে আগের দিনের বায়না দেওয়া তেলাকুচোপাতা চার আঁটি ১২ টাকার নিলাম। তারপর বেল কিনলাম দুটো ৪ টাকায়। বাড়ি ফিরে বেল খেয়ে ও যশোদাদির দেওয়া প্রাতরাশ সেরে ঠিক ৮ টার প্রেসারের ওষুধ Amlosyl 10 mg খেলাম। এরপর স্নান সেরে ৯.৩০ এ বেরিয়ে পড়লাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের H-Block এর জনসেবা পরিষদের অফিসে। গিয়ে দেখি গোপাল বাবু রৌদ্রে চেয়ার নিয়ে তাঁর সহকর্মী শ্রীযুত গোবিন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করছেন। গোবিন্দ বাবু পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী ও দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাম চ্যাটার্জীর সম্পর্কে অনেক খোসগল্প করছিলেন। আমি যেতেই গোপলবাবু আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ভালো করে। আমার ককবরক ভাষা গবেষণা ও উপজাতি রমণীর পাণিগ্রহণের কথাও বললেন। এবার গোবিন্দ বাবু ত্রিপুরার অশান্ত পরিস্থিতির কথা জানতে চাইলে আমি সবিস্তারে তার ঐতিহাসিক background বললাম। গোপালবাবু বললেন, ' ত্রিপুরার উপজাতিদের ADC কে Autonomous State-এ রূপান্তরিত করেদিলে সেখানে উপজাতিদের অসন্তোষ অনেক পরিমাণে কমে যাবে। আমবাসাকে Head Quarter করে সেখানে Autonomous State এর Capital হতে পারে। এরপর তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় আবার ভাই ভাই (উপজাতি-বাঙালি) মিল হবে।' গোবিন্দ বাবু প্রস্তাব দিলেন ত্রিপুরার বর্তমান অস্থির পরিস্থিতি ও উপজাতি বাঙালি সম্পর্ক নিয়ে কলকাতাতেই একটা সেমিনার করতে। গোপাল বাবু তাঁর কথায় রাজী হলেন। আমি বললাম, "বক্তা হিসেবে ত্রিপুরার রাজনৈতিক পার্টিগুলোর উপজাতি নেতৃবৃন্দকে তাঁদের সমস্যা সম্পর্কে বলতে দিতে হবে।' এরপর গোপাল বাবু বললেন, ' সি.পি.এম-এর জিতেন্দ্র চৌধুরী, উপজাতি যুবসমিতির নগেন্দ্র জমাতিয়া, টি.এন.ভি 'র বিজয় রাঙখল প্রমুখকে ডাকা যেতে পারে।'

গোবিন্দ বাবু চলে যেতেই গোপাল বাবুকে আমার ব্যক্তিগত কথা বললাম। গতকাল রাত্রে সুরঞ্জন যা আমাকে টাকার ব্যাপারে বলেছিলো তাও জনালাম। গোপাল বাবু তখন জনসেবা অফিসের একনিষ্ঠ কর্মী সঞ্জয় চক্রবর্তীকে ডেকে আমাকে এক হাজার টাকা দিতে বললেন। টাকা পাবার পরে আমি বললাম, "গোপাল বাবু, আমার আরো কিছু টাকার প্রয়োজন হতে পারে আমার ওষুধ কেনার জন্যে। তাছাড়া, আমি ত্রিপুরায় ফিরে গেলেই আমার বড়ো মেয়ে তানিয়ার বিয়ের আশীর্বাদ হবে, ছেলের জন্যে একটা ঘড়ি নিয়ে যেতে পারলে ভালো হতো।' তিনি আমার কথা শুনে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনার যা টাকা লাগে নিয়ে যাবেন।' প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, 'আমি ফিরে গিয়ে বেতন তুলে টাকা পাঠিয়ে দেব।' আমার হবু জামাই ট্রাইবেল ডাক্তার শুনে গোপাল বাবু খুব খুশি হলেন। বললেন, ' কুমুদ বাবু, ট্রাইবেল ভাল পাত্র পেলে আমি আমার বড় মেয়ের বিয়ে দিতে পারি; সেতো এখন এম. এ.

পড়ছে।' তারপর চোখ পড়লো গোপাল বাবুর মায়ের দিকে। তিনি একটা খাটিয়ায় রৌদ্রে শুধুমাত্র একখানা কাপড় গায়ে দিয়ে বসেছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে পদধূলি নিলাম। গোপাল বাবুর মাতৃদেবী ত্রিপুরায় আমবাসার বাড়িতে ছিলেন। একবছর হলো এখানে এসেছেন। এখন তাঁর মায়ের বয়স ১০১ বছর। তিনি ত্রিপুরার অনেক উত্থান পতনের সাক্ষী, সাক্ষী ৮০'র মহা জাতিদাঙ্গারও।

যাদবপুর থেকে ১২ টার সময় ফিরে দেখি স্বপন, বৌমা (স্বপনের স্ত্রী), চিনি (স্বনের মেয়ে) আমার বড়ো মেয়ে তানিয়ার বিয়ের বেনারসী শাড়ি কেনার জন্যে কলেজ স্ট্রিটে যাচ্ছে। সেখানে মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের দোকানে সরস্বতী মিশ্র অপেক্ষা করে থাকবেন। বিকেল তিনটের সময় বৌমা ও চিনি বেনারসী শাড়ি নিয়ে ফিরে এলো। দামী বেনারসী শাড়ি দেখে আমার আর আনন্দ ধরে না। বিয়ের হার হলো, বেনারসী শাড়ি হলো, আর কী লাগে? বিকেলে Duncan Gleaneagles Clinic থেকে আমার P.S.A.(Prostate Specific Antigen)'র রিপোর্ট নিয়ে এলাম।

২৩শে জানুয়ারী, ২০০০, রবিবার। আজ সকাল ৭ টায় উঠে চলেগেলাম গড়িয়াহাট বাজারে। সেখানে গিয়ে বেল ও কলা কিনলাম এবং কৌতূহলবশত মাছের বাজারে ঢুকলাম। দেখলাম ভেটকি মাছ ছোট ১২০ টাকা এবং বড়ো ১৫০ টাকা কেজি। গলদা চিংড়ি ৩০০ টাকা। কিন্তু বাগদা চিংড়ির দর শুনে চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেলো, ১ কেজির দাম ৮০০ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে আমার বাল্যকালের গ্রামের বাজারের কথা মনে পড়ে গেলো। এ ধরনের ২৬ টা (১ কুড়ি) বাগদা কখনোই ৮ আনার বেশী ছিলো না। আমাদের খুলনাজেলার সাতক্ষীরা বিভাগের আমদী-খাজরা গ্রামের দিকে ২৬ টা মাছে এক কুড়ি হতো--যা এক কেজি'র বেশী হবে। সেই ৮ আনার মাছ কিনা এখন ৮০০ টাকা!

বাজার থেকে ফিরে বেল-প্রাতরাশ খেয়ে ঠিক আটটায় প্রেসারের ওষুধ Amlosyl ১০ mg খেলাম। স্নান করলাম ন'টায়। খেলাম ১ টায়। খেয়ে একটু বিশ্রাম করে ৩ টের সময় Petril 0.5 mg ১/২ ট্যাবলেট খেলাম। ঠিক এইসময় পেচ্ছাবে একটু জ্বালা-পোড়া লাগছিলো। তাই গড়িয়াহাট মোড়ে গিয়ে চার টাকা দিয়ে এক ডাববিক্রেতা মহিলার কাছ থেকে ডাব খেলাম।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে বালিগঞ্জ স্টেশানের দিকে পা বাড়ালাম। স্টেশানের কাছেই যেতে দেখি বিজন সেতুর ওপর পুলিশ, সি.আর.পি. ঢাল-তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকালে কসবা বাজারে চাউল পট্টিতে সি.পি.এম. এর নেতা গুরুপদ বাগচি খুন হয়েছেন। তিনি মাছের বাজাবে মাছ কিনছিলেন, ঠিক এমন সময় একটা বন্দুকের গুলি এসে তাঁর মাথায় লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা যান। এই ঘটনার পাল্টা হিসেবে সি.পি.এম. এর কর্মীরা চাউল পট্টী সমেত ৪০০ স্টল তছনছ করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয় সেগুলোতে। বিজন সেতুর ওপর দিয়ে চলমান গাড়িও রেয়াই পায়নি, বহু গাড়ি দগ্ধ হয়েছে। আমি সাত-পাঁচ ভেবে আর স্টেশান পর্যন্ত গেলাম না। একডালীয়া রোড ধরে বস্তীর পাশ দিয়ে স্বপনদের বাড়ি চলে এলাম।

ঠিক ৪.৩০ এ এলো আমার ন'দা(হিমাংশু কুন্ডু চৌধুরী)'র ছেলে শ্যাম-আমার বাল্যকালের খেলার সাথী, আমার থেকে বছর দুয়েকের ছোট। আমরা দেশের খাজরা গ্রামের বাড়িতে একই সঙ্গে বড় হয়েছিলাম। শ্যামের ঠাকুরদা দেবেন্দ্রনাথ কুন্ডু চৌধুরী ছিলেন আমার আপন সেজজ্যাঠামশায়। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কবিরাজ এবং এখন থেকে ৮০ বছর আগে কলকাতার অষ্টাঙ্গ আর্য়ুবেদ কলেজের অধ্যাপক। এখন তাঁর প্রপৌত্র-শ্যামের ছোট ছেলে মনীষ (টুকাই) আর.জি. কর. ম্যাডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়ে। আমার দেশের গ্রাম কপোতাক্ষ নদীর ধারের খাজরা গ্রাম ছাড়ার আগে শ্যাম কলকাতায় চলে এসে তার দাদা গুরুসদয়ের কাছে থেকে দমদমের কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হয় এবং ক্লাস X এ উঠার সময় শ্যামদের পরিবারে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। তার সাহিত্যিক দাদা, যাঁকে স্বয়ং

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত স্নেহ করতেন, সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী রেখে নিরুদ্দেশ হয়। এখনও গুরুসদয় বাড়ি ফিরে আসেনি। খুব দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে করে বড় হয়েছে ওরা দুবোন, দুভাই। মা-বাবা গত হয়েছেন। ছোটভাই গোবিন্দ(কেনা) ৬০ এর দশকের শেষের দিকে বিরাটি-বেলঘরিয়া অঞ্চলে সি.পি.এম.এর দোর্দন্ড প্রতাপশালী যুবনেতা হিসেবে নাম করে। শ্যামের বড় ছেলে বাপ্পা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পাশ করেছে।

আমার শরীরের অবস্থা দেখে তার মন খারাপ হয়ে গেলো। সে তার ফ্যাক্টরির গাড়ি করে তাদের বেলঘরিয়ার বাড়ি নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু আমি না করি। পরের বার যাব বলি। এবার এলো আমার বড়ো মেয়ে তানিয়া(নন্দিনী)'র বিয়ের কথা। বিয়ের সময় তাকে ত্রিপুরায় যেতে অনুরোধ করলাম। সে রাজী হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। বলে, " আমি প্রভাস (আমার এক একান্ত ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি ভাইপো- সূর্যকান্ত কুন্ডু চৌধুরীর ছোট ছেলে) কে নিয়ে তানিয়ার বিয়েতে যাবো। আর যাওয়ার সময় তার বিয়ের বেনারসী শাড়িও নিয়ে যাবো।" উত্তরে আমি বলি, " তোর আর বেনারসী নিয়ে যেতে হবে না। স্বপন ও সরস্বতীদি মিলে গলার হার আর বেনারসী শাড়ি দিয়েছে।" তখন বৌমাকে সেগুলোকে দেখাতে বলি। সরস্বতীদিও ছিলো তখন। বৌমাও সরস্বতীদি মিলে আমার ভাইপো শ্যামকে তানিয়ার বিয়ের হার ও বেনারসী শাড়ি দেখালো। যাবার সময় সে আমাকে ১০০ টাকা দিয়ে যায় মিস্টি কিনে নিয়ে যাবার জন্যে।

২৪শে জানুয়ারী, ২০০০, সোমবার। কাকভোর ৪.৪৫ এ ঘুম ভেঙে গেলো। সময় পেয়ে খালি হাতে কিছুক্ষণ ব্যায়াম ও যোগাসন করলাম। তারপর ঠিক ৪.৪৫ এ ঢাকুরিয়া লেকে গিয়ে লেক প্রদক্ষিণ করলাম। সূর্য ওঠা দেখলাম ঢাকুরিয়া লেকব্রিজে দাঁড়িয়ে। তারপর লেক থেকে ফিরে রামকৃষ্ণ মিশনের চত্তরের সিঁড়িতে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম করে বাড়ি ফিরলাম। আজ আর গড়িয়াহাট বাজারে গেলাম না, বন্ধ ছিলো। গতকাল কসবা বাজারে সি.পি.এম. এর নেতা গুরুপদ বাগচির হত্যার বিরুদ্ধে এই বন্‌ধ।

বাড়ি ফিরে বেল-প্রাতরাশ খেয়ে প্রেসারের ওষুধ Amlosyl 10 mg খেলাম ঠিক ৮ টার সময়। ৯ টায় স্নান সেরে গেলাম গোলপার্কেব কাকুলিয়ার মোড়ে S.D.Pharmacy থেকে ওষুধ কিনতে। ওষুধ কিনে সেভ হবার জন্যে সেলুনে ঢুকতে গিয়ে দেখি, সেলুনও বন্‌ধ পালন করছে। অগত্যা রাস্তায় বসা এক বিহারী হাজামের কাছে গলা বাড়িয়ে দিলাম তিন টাকায়।

দুপুর একটায় যশোদাদি ভাত দিলেন। তিনটের সময় Petril 0.5mg ১/২ টেবলেট খেলাম।

আজ ডাক্তার পাহাড়ীর চেম্বারে গিয়ে আমার প্রস্টেটের রিপোর্ট P.S.A (Prostate Specific Antigen) দেখানোর কথা। ৪ টের সময় ডাক্তার পাহাড়ীর ৫ নং হিন্দুস্থান পার্কের চেম্বারে যাবো বলে বৌমাকে বলতেই তিনি বললেন, 'আম্বুবদা, আজ ডাক্তার পাহাড়ী চেম্বারে যাবেন না, গড়িয়াহাটের দিকে সি.পি.এম.-তৃণমূল কংগ্রেসে মারামারি হচ্ছে, কাল যাবেন, বোমটোম পড়লে শেষে অসুস্থ শরীরে পালাতে পারবেন না।' আমি বৌমাকে বললাম, ' গোলপার্কের সামনে গিয়ে যদি দেখি লোকজন যাতায়াত করছে তবে যাব, নইলে তোমার কথা মেনে কালই যাব।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গোলপার্কের সামনে এসে দেখি রাস্তার কিনার দিয়ে কিছু কিছু লোক যাচ্ছে। আমিও তাদের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করলাম। গড়িয়াহাট মোড়ে গিয়ে দেখি পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ, ঢাল-তলোয়ার নিয়ে তারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। আমি বাঁদিকে মোড় নিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে হিন্দুস্থান পার্কের দিকে এগোলাম। ডাঃ পাহাড়ীর চেম্বারে আজ তেমন আর ভীড় হবে না ভেবেছিলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি, সিরিয়াস সব কিডনি-পেসেন্ট লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি ডাঃ পাহাড়ীর চেম্বারের

এ্যাসিস্টেন্ট ভূদেব হালদারকে অনুরোধ করলাম আমাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে।

ডাঃ পাহাড়ীকে আমার পি.এস. এ. রিপোর্ট দেখাতেই তিনি হাসি মুখে বললেন, 'মাস্টার 'মশায়, আপনার পি.এস.এ. রিপোর্ট নর্মাল। যান, এখন ত্রিপুরায় ফিরে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার ককবরক ক্লাস করুন।' ডাঃ পাহাড়ীর কথায় আমার কীযে আনন্দ হলো তা আর কী বলবো। তিনি আমার প্রেসার চেক করলেন। ওপরের প্রেসার ১৫৬, নীচেরটা ৭১। বললেন, 'নীচের প্রেসার চমৎকার আছে, ওপরেরটা একটু বেশী, ত্রিপুরায় ফিরে গেলে নর্মাল হয়ে যাবে।

আমি ডাঃ পাহাড়ীকে জিজ্ঞেস করলাম, ডাক্তার বাবু কিডনির ওষুধ Florinef টেবলেট যদি না পাওয়া যায়, তখন বিকল্প হিসেবে কোন ওষুধ খাব? উত্তরে তিনি বললেন, তখন নুন একটু বেশী করে খাবেন। টক খাব কিনা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'খুব বেশী না খাওয়াই ভাল। তারপর বললেন, আপনার হার্টের জন্যে আলাদা কোন ওষুধ লাগবে না। আগে যে ওষুধ লিখে দিয়েছি, তাই খেয়ে যান। আর কোন অসুবিধে হলে, আগের মতো ফোনে আমাকে জানাবেন।'

ডাক্তার পাহাড়ীর চেম্বার থেকে বেরিয়ে ভূদেব বাবুকে ডেকে ২০ টাকা দিলাম তাঁর হাতে। বললাম, 'ভূদেব বাবু এই সামান্য টাকায় একটু মিস্টি কিনে খাবেন।' এবার আমি গড়িয়াহাট মোড় দিয়ে না গিয়ে হিন্দুস্থান পার্কের ভেতর দিয়ে গোলপার্কে এলাম। আমার কানে দু একটা বোমা ফাটার শব্দ হচ্ছিলো, তাই গড়িয়াহাট মোড়ে এ্যাভয়েড করলাম। বাড়ি ফিরতেই বৌমা আমাকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

২৫শে জানুয়ারী, ২০০০, মঙ্গলবার। ভোর ৬ টায় বেরিয়ে ঢাকুরিয়া লেক প্রদক্ষিণ করলাম। লেকে ঢোকার মুখে নজরুলমঞ্চে ডোভাবলেন মিউজিক সোসাইটির সারা রাত্রিব্যাপি শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুষ্ঠান চলছিলো। ভেসে এলো ভীমসেন যোশীর দরাজ গলা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনলাম। তারপর রামকৃষ্ণ মিশনের চত্তরের বসার জায়গায় যোগাসনে বসে কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করলাম। তারপর হেঁটে গেলাম গড়িয়াহাট বাজারে। সেখান থেকে কুলেখাড়া শাক, বেল ও কলা কিনে স্বপনদের বাড়ি ফিরলাম।

বেল ও প্রাতরাশ খেয়ে ঠিক ৮ টার সময় প্রেসারের ওষুধ Amlosyl 10 mg খেলাম। সকাল ৯ টার মধ্যে স্নান সেরে ৯.৩০-এ বেরিয়ে পড়লাম প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের ত্রিপুরা ভবনে ত্রিপুরায় ফেরার টিকিটের জন্যে। ত্রিপুরা ভবনে যাবার আগে গেলাম নিউ মার্কেটের কাছে Lindsay St. এর Blue Print ওষুধের দোকানে। সেখান থেকে আমার জীবনদায়িনী ওষুধ Florinef (যা খেলে শরীরে লবণ সঞ্চিত থাকে) এই বিদেশী ওষুধ কিনলাম। দুটো শিশি ট্যাবলেটের দাম নিলো ৭২০ টাকা। আগে ১৯৯৮ সালে আমি যখন পি.জি. হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম, তখন আমার ছেলে সুরঞ্জন এই ওষুধ কিনেছিলো ১৬০০ টাকা দিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটের শীতল স্টোর্স থেকে।

ওষুধ কিনে হেঁটেই গেলাম ত্রিপুরা ভবনে ছাতি মাথায় দিয়ে। ওষুধটা পেয়ে আমার মনের জোর বেশ বেড়ে গিয়েছিলো। ত্রিপুরা ভবনের Joint Resident Commissioner T.K.Chakma সাহেবের চেম্বারে ঢুকলাম। তাঁকে আমার চিকিৎসার কথা জানিয়ে Govt. কোটায় আমার প্লেনের টিকিট কেটে দিতে অনুরোধ করলাম। চাকমা সাহেব ত্রিপুরারই মানুষ, খুব দিলখোলা লোক। গতবার যখন Medical Checkup -এ কলকাতায় এসেছিলাম, তখন তিনিই আমার প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাঁকে বললাম, আমাকে ২৮ বা ৩০ শে জানুয়ারির ২nd Flight -এর টিকিট কেটে দিতে। 1st Flight হলে ধরতে পারবোনা, ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুতে হয় বলে সকাল ৭ টার আগে উঠতে পারিনা।

চাকমা সাহেবের হাতে ১৪৩০ টাকা দিলাম ত্রিপুরায় ফেরার টিকিটের জন্যে। বললেন, ২৭ তারিখ ৫ টার সময় এসে টিকিট নিয়ে যাবেন।

চাকমা সাহেবের কাছ থেকে শুনলাম কলকাতার বই মেলায় অংশ নিতে ত্রিপুরা থেকে জ্ঞান বিচিত্রা ও অক্ষরের প্রকাশকরা ত্রিপুরা ভবনেই অবস্থান করছেন। জ্ঞান বিচিত্রার দেবানন্দ দাম নতুন বাড়ির ২১১ নং রুমে এবং অক্ষরের প্রকাশক শুভব্রত দেব পুরোনো বাড়ির ২১২ নং রুমে। প্রথমে দেবানন্দ বাবুর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ সেরে গেলাম শুভব্রত দেবের সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখি সেখানে লেখক ও প্রকাশকের চাঁদের হাট জমেছে। শুভব্রত দেবের দাদা জনপ্রিয় ছোটগল্পকার দেবব্রত দেব, ত্রিপুরার নামকরা দুই ঔপন্যাসিক দুলাল ঘোষ ও অনুপ ভট্টাচার্য আসর জমিয়েছেন। আমাকে দেখে দেবব্রত দেব বললেন, 'এই নিন আন্দামানের সবুজ দ্বীপ পুজো সংখ্যা। আপনার লেখাটা ইতিমধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে।' সবুজ দ্বীপে আমার 'সবুজ ত্রিপুরার ককবরক প্রবাদ' নামে লেখাটি দেবব্রত বাবুই আমার কাছ থেকে আদাই করে নিয়েছিলেন। এর মধ্যে শুভব্রত দেব আমার সৌজন্যে চায়ের অর্ডার দিয়েছেন। তিনি আমার চারটি বইয়ের প্রকাশক। গতবার কলকাতার বইমেলায় আমার 'কেরেঙ কথমা' ত্রিপুরার রূপকথা অক্ষরে Best Seller হয়েছিলো। এবং কলকাতার আজকাল, প্রতিদিন প্রভৃতি পত্রিকায় খুব ভালো সমালোচনা বেরিয়েছিলো। শুভব্রত বাবু আমাকে মেলায় যাবার জন্যে ১ খানা গেটপাশ দিয়ে দিলেন আগামী কালের জন্যে।

ত্রিপুরা ভবন থেকে বালিগঞ্জে ফেরার পথে গড়িয়াহাটে নেমে আদি ঢাকেশ্বরী ভান্ডার থেকে আমার হবু জামাইয়ের জামাই বরণের ধুতি একখানা এবং আমার একখানা শান্তিপুরী ধুতি কিনে নিয়ে এলাম।

বিকেলে গেলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসেবা পরিষদ অফিসে। সেখানে গিয়ে অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী মশায়ের কাছ থেকে দু'হাজার টাকা হাওলাৎ নিলাম আমার ওষুধ ও মেয়ের বিয়ের জন্যে কিছু কেনাকাটার জন্যে। বললাম, বেতন পেয়েই পাঠিয়ে দেবো। জনসেবা পরিষদ অফিসে আমার বন্ধু কমরেড চিরব্রত বায়বর্মণের ছেলে সুমনের সঙ্গে দেখা হলো। দেখলাম ছেলেটি খুব ভদ্র ও স্মার্ট।

২৬শে জানুয়ারী, ২০০০, বুধবার। সাধারণতন্ত্র দিবস। ভোর ৫.৪৫ এ বেরিয়ে ঢাকুরিয়া লেকে প্রাতর্ভ্রমণে গিয়ে Lions Club -এর চৌইদ্দীর ভেতর ঢুকে পড়লাম। মনে হলো সমগ্র লেকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানেই আছে। কত না ছোট ছোট পার্ক। গাছ -গাছালিতে ভর্তি। একটা খরগোসের ডেরা দেখলাম তার দিয়ে ঘেরা। তাতে বিভিন্ন রঙের খরগোস গোঁফ ফুলিয়ে ফুলিয়ে ছোটাছুটি করছে। আগে আমি কলকাতায় এসে যখন গরচা লেনে থাকতাম, তখন আমার রাজনৈতিক গুরু কমলেন্দু গাঙ্গুলীর সঙ্গে প্রায় রোজই আসতাম। কমলদা এখানে যোগ ব্যায়াম করতেন। খড়ের ঘরে ঢুকতেই গেটে দুদিকে শিব ও পার্বতীর পাথরের মূর্তি রয়েছে বামে ও ডাইনে। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা ঘন ঝোপের মুখে মাটির টিলা। সেখানে ছেলেপিলেরা ছুটে ছুটে ওপরে উঠছে আর নামছে। লাইনস্ ক্লাবের গেটের বাঁ দিকে দেখি নারী-পুরুষ সব লাইন ধরে দাঁড়িয়ে প্রায় Parade-এর ভঙ্গিতে। তারা একজন নারী ও পুরুষের সংকেত অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হাসি হাসছে। হোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ-কত যে বিচিত্র ধরনের হাসি। এইসব হাসি নাকি যোগ ব্যায়ামের অঙ্গ। এ-ভাবে হাসলে নাকি হার্ট ভালো থাকে।

২৭শে জানুয়ারী, ২০০০, বৃহস্পতিবার। ভোর ৫.৪৫ এ উঠে ঢাকুরিয়া লেকে বেড়াতে গেলাম। বেড়াতে বেড়াতে বয়স্ক ব্যক্তিদের পাশে বসে তাঁদের নানারকমের কথোপকথন শুনতে লাগলাম। তাঁদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, "কসবা বাজারে সি.পি.এম. নেতা গুরুপদ বাগচী খুন

হয়েছে নিজেদের মধ্যে শেয়ারের গন্ডগোল নিয়ে। আর, দোষ পড়লো কিনা তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর। ওখানে তো তৃণমূরে একটিও তৃণ নেই। গতবার নির্বাচনে মমতা তো পোলিং এজেন্ট পর্যন্ত রাখতে পারেনি, সি.পি.এম-এর লোকেরা মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে।" ভদ্রলোকের কথা থামতেই আরেকজন বলে উঠলেন, 'সেদিনের মমতার কসবাবাজার অভিযান দেখেছেন, ৫/৭ হাজার লোক নিয়ে বিশাল মিছিল করেছে। সি.পি.এম এতোদিনে কসবা এলাকায় তৃণমূলের ঘাঁটি তৈরি করে দিলো। যাই বলুন, কসবা বাজার যেভাবে সি.পি.এম-এর ক্যাডার বাহিনী পুড়িয়ে দিয়েছে, তাতে করে জ্যোতিবাবুর মুখে চুনকালি পড়েছে। সি.পি.এম-এর ইমেজ খুব খারাপ হয়েছে।'

লেক থেকে ফিরে সোজা গেলাম গড়িয়াহাট বাজারে শুষনি শাকের খোঁজে। শুষনি শাক খেলে রাতে ভালো ঘুম হয়। আগরতলার বাজারগুলোয় এই শাক পাওয়া যায় কিনা জানিনে। তবু ক'আঁটি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে আস্তাবল বাজারের ত্রিপুরী শাক বিক্রেতাদের দেখাবো। শাকের দোকানের পাশেই দেখি ক্যানিং লাইনের এক রস বিক্রেতা খেজুরের রস বিক্রি করছে মাটির কলসি থেকে ঢেলে। খেজুরের রস দেখে লোভ সামলাতে পারলামনা আমি, দু টাকা দিয়ে এক গ্লাস ঢকঢক করে গিলে ফেললাম সকলের সামনে। আমার দেখাদেখি আমার থেকে আরেক জন বয়স্ক ব্যক্তিও খেলেন।

গরিয়াহাট বাজার থেকে ফিরতেই নিত্য দিনের মতো যশোদাদি বেল ভেঙে দিলেন। প্রাতরাশ দিলেন ৮ টায়। তারপর প্রেসারের ওষুধ খেয়ে অধ্যাপক কমলেন্দু গাঙ্গুলীকে ফোন করে আগামীকাল ত্রিপুরায় ফিরে যাবার কথা জানালাম। বললাম, 'বাড়ি থাকুন, দশটার মধ্যে আপনার কাছে পৌঁছে যাবো।'

ঠিক দশটায় কমলদার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। তিনি ছাড়লেন না। দুপুরে তাঁর সঙ্গে খেতেই হলো। খেতে খেতে তিনি বললেন, 'রাজধানী আগরতলা'য় গত পুজো সংখ্যায় তোর গবেষকের ডায়েরী পড়লাম। তুই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের যে ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছিস, তা এখন মনে পড়লে কী আনন্দই না হয়। তবে তোকে আরো সিরিয়াসভাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সংগ্রামী কর্মকান্ডের ওপর একটা বই লিখতে হবে।'

আমি কমলদাকে বললাম, 'আচ্ছা কমলদা, বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনারা সাহেব কোন সনের কোন তারিখে কলকাতায় এসেছিলেন আপনার মনে আছে কি?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'তুই ফিরে গিয়ে একটা চিঠিতে তোর ওই সময়কার কোন কোন তথ্য লাগবে তা জানাস, আমি পাঠিয়ে দোবো।'

এরমধ্যে কমলদার ছেলে মুঙ্কা (হীরকেন্দু গাঙ্গুলী) তার সফিস্টিকেটেড ইয়াঙ বন্ধুদের নিয়ে তার পড়ার ঘরে ঢুকলো। তাদের গা থেকে সিগেরেটের উগ্রগন্ধ পাওয়া যাচ্ছিলো।

খেয়ে দেয়ে দু'বন্ধুতে পুরনো দিনের অনেক কথা বলতে বলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কমলদা গেলেন ১৪৪, ধর্মতলা স্ট্রিটের AITUC অফিসে, আমি গেলাম ডাঃ পাহাড়ীর চেম্বারে।

২৮শে জানুয়ারী, ২০০০, শুক্রবার। ভোর চারটে উঠে আগরতলায় যাবো বলে গোছাতে লাগলাম। ৬টায় বেরোতে হবে ৭টায় IC/ ৭২৪১-এর reporting করতে হবে। ভোর ৫টায় বৌমা ও যশোদাদি উঠে পড়লেন। বন্ধুবর স্বপনও উঠে নিজে চা করতে করতে বললো, 'আয়ুব, ৬টার আগে কিছুতেই বেরোবে না, খুব ভোরে ইস্টার্ণ বাইপাসে ছিনতাই টিনতাই হয়ে যায়। তাছাড়া তোমার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ের জিনিষপত্র রয়েছে, শেষে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।'

বন্ধুবরের কথামতো ঠিক ৬টা বাজতে ১০ মিনিট আগে গেলাম গেলপার্কের কাঁকুলিয়ার মোড়ে টেক্সি ডাকতে। টেক্সি নিয়ে এলাম ঠিক ৬টায়। ইতিমধ্যে বন্ধুবর কিছু জিনিসপত্র দোতলা থেকে

একতলায় তার পড়ার ঘরে নিয়ে এসেছে। বৌমা ও আমি বড় ব্যাগটা দু'জনে মিলে নামালাম। চিনি (স্বপনের মেয়ে) তখনো ওঠেনি। বৌমা ও স্বপন মিলে টেক্সিতে সব মালপত্র ঢুকিয়ে দিলো। তারপর অশ্রুসজল চোখে বিদায় দিলো তারা স্বামী-স্ত্রী। টেক্সি ঠিক ৬টায় ছাড়লো, আর আমার দু'চোখ ভরে জল এলো। টেক্সি চললো বিজন সেতু দিয়ে সাঁই সাঁই করে বাইপাসের দিকে। আমি বিজন সেতু থেকে অগ্নিদগ্ধ কসবার বাজারের দিকে চোখ ফেরালাম। এই বাজারেই ক'দিন আগে সি. পি. এম-এর নেতা গুরুপদ বাগচীকে সটডেড করা হয়েছে। তারপর সি. পি. এম -এর লোকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে সমস্ত বাজারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পুলিশকে জ্বলন্ত বাজারে আসতে না দিয়ে খোদ থানাই আক্রমণ করেছে তারা। এই ঘটনার দু'দিন পরে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যয় ছ'সাত হাজার লোক নিয়ে মিছিল করে কসবা বাজার অভিযানে গেছেন। ট্যাক্সি বাইপাস ধরে সল্ট লেকের দিকে দ্রুত ধেয়ে চলেছে দু'পাশের শাকসব্জির সবুজ মাঠ ফেলে রেখে। ধাপার ময়লা ফেলার জায়গা এখন সবুজ শাক-সব্জিতে ভরপুর, ভাবতে কেমন যেন অবাক লাগে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো বন্ধুবর স্বপন বসুর। গত রাতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সে বললো, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ Civil war -এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা গ্রাম আক্রান্ত হলে পার্শ্ববর্তী সব গ্রামই পাল্টা আক্রান্ত হচ্ছে। কেশপুরের ঘটনায় অন্ততঃ পনেরোটা গ্রাম বিধ্বস্ত হয়েছে।' - বন্ধুবরের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে মনে হলো, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একটা পরিবর্তন চাইছে। কিন্তু পরিবর্তনটা কোন দিকে? শ্রেণী শত্রুরা বামদুর্গ দখল করবে, না বাম দুর্গ শ্রেণী-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে শ্রেণী শত্রু খতম করে আরো এগিয়ে যাবে? কিন্তু মনে প্রশ্ন এলো একটা। পশ্চিমবঙ্গের সনাতনী বাম হাওয়ার ভেতর হিন্দু মৌলবাদী বাড়বাড়ন্ত হাওয়া বইছে কেমন করে? আবার, সুভাষ চক্রবর্তী. সৈফুদ্দিন, পুততুণ্ডরাই বা কেন জঙ্গি বাম শিবিরকে উদারবাদী চিন্তায় সংক্রামিত করতে চাইছেন ?

ভাবনায় ছেদ পড়লো ট্যাক্সি এয়ারপোর্টে এসে থেমে যেতেই। আগরতলা IC/৭২৪১ বিমানে রিপোর্টিং করে এঁসে বসলাম একটা গদি আটা চেয়ারে বিমান ছেড়ে যাওয়ার বোর্ডের দিকে মুখ করে। হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন আগরতলার কৃষ্ণনগরের সুধারঞ্জন দেববর্মা- এ. ডি. সি'র কৃষি বিভাগের অধিকর্তা। তিনি প্রয়াগে মা-বাবার পিণ্ডদান করে গয়া-কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র ঘুরে সস্ত্রীক ত্রিপুরায় ফিরছেন। মনে মনে বললাম, যে-ভাবে ত্রিপুরার পাহাড়ী সমাজে দ্রুত ধর্মীয় পরিবর্তন আসছে, তাতে করে আর ক'বছর পরে হয়তো আর এ'ধরনের মুণ্ডিত মস্তক ত্রিপুরার উপজাতি তীর্থযাত্রী চোখে পড়বে না।

সুধাবাবু আমার সঙ্গে কথাবার্তা সেরে চলে যেতেই শ্রীমতী অনুরূপা মুখার্জীর ভাইপো জগদীশ বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী দেববর্মা আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন। তিনি আদিবাসী মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে দিল্লীতে একটা সেমিনারে গিয়েছিলেন। আমাকে তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'কুণ্ডুবাবু, শুনলাম আপনার বড়ো মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়েছে এক ডাক্তার ছেলের সঙ্গে।' বললাম হ্যাঁ, ক'দিনের মধ্যেই আশীর্বাদ হবে।'

ইতিমধ্যে ত্রিপুরার ট্রাইবেল ইনস্টিটিউটের রিসার্স অফিসার রতন আচার্য আমার পাশে এসে বসলেন। তিনি কলকাতার বইমেলা থেকে ফিরছেন। তাঁর পাশের সিটে বসেই আগরতলায় নামলাম। দেখি বাইরে পুত্র সুরঞ্জন অপেক্ষা করছে। রতনবাবু তাঁর সরকারী গাড়িতে আমাদের তুলে নিলেন। সুরঞ্জনকে তানিয়ার বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই সে তার মাতৃভাষা ককবরকে বললো 'বেবাক ঠিক তঙগ'। খূনা ডাঃ এস. আর. দেববর্মা বাই ফারনিচারনি দকান' থাঙগূই রাঙ ৫০০০ এ্যাডভানস খূলাইনাই, ('সব ঠিক আছে কাল ডাঃ এস. আর. দেববর্মার সঙ্গে ফার্নিচারের দোকানে গিয়ে ৫০০০

টাকা এ্যাডভানস্ করবো)। আমি বড়ো মেয়ে তানিয়ার বিয়ের সওদা করে কলকাতা থেকে এসেছি এমন একটা রমণীয় ভাব বাড়িতে ম-ম করতে লাগলো। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আমার 'ভাষা গবেষণা' (Language laboratory) খুললাম প্রায় এক মাস পরে। এরপর গেলাম সেক্রেটারির রুমে । তাঁকে ও সুজিৎ চক্রবর্তীকে আমার জয়েন করার কথা জানাতেই তাঁরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন । তাঁরা ককবরক সার্টিফিকেট কোর্সের সিলেকশন লিস্ট তৈরি করে ফেলেছেন আমার অনুপস্থিতিতেই । সুজিৎ বাবু আমাকে ককবরক সার্টিফিকেট কোর্সের এ্যাডমিশন লিস্ট দেখালেন । দেখলাম ৪০ জনের নাম রয়েছে লিস্টে । ককবরক সার্টিফিকেট কোর্সে আগের সেশনগুলোতে ভর্তি হতে পারতো ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী । এবার নতুন কোর্স অনুযায়ী আরো ১০ জন বেশি ভর্তি হতে পারছে । সব দেখেশুনে বেশ ভালোই লাগলো আমার । যাক, ক'দিনের মধ্যেই ককবরক ক্লাস শুরু হয়ে যাবে ।

সেক্রেটারির রুম থেকে বেরিয়ে গেলাম ভাইসচ্যান্সেলরের বিল্ডিংএ । সেখানে গিয়ে ভি.সি'র পিয়ে অজয় চৌধুরীর কাছে আমার জয়নিঙ রিপোর্ট জমা দিলাম । সেখান থেকে বেরিয়ে ঢুকলাম রেজিস্ট্রার অধ্যাপক দীপক ডঃ চৌধুরীর রুমে । তাঁকে আমার জয়নিঙের কথা জানালাম । রেজিস্ট্রার মহোদয় সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্যে চায়ের অর্ডার দিলেন । কিছুক্ষণের ভেতর চিনি-দুধ ছাড়া চা দিয়েগেলেন অমর বাবু । রেজিস্ট্রার সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে ঢুকলাম ডেপুটি রেজিস্ট্রার অধ্যাপক কল্যাণ বিজয় জমাতিয়ার রুমে । সেখানে এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অধ্যাপক নিত্যানন্দ দাসও বসেন । ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও এ্যাসিট্যান্ট রেজিস্ট্রারের পাশাপাশি দুটো টেবিল । তাঁরা দু'জনে আমাকে দেখেই দারুণ খুশি হলেন । সঙ্গে সঙ্গে চায়ের অর্ডার দিলেন অমর বাবুকে । এ্যাস্ট্যিান্ট রেজিস্ট্রারের সামনে খুব ভিড় ছিলো । আমি ডেপুটি রেজিস্ট্রারের সামনা সামনি বসে কথা বলতে লাগলাম । তাঁকে জানালাম আমার মেয়ের বিয়ের জন্যে কেনা-কাটির কথাও। তিনি খুব খুশি হয়ে তাঁর মাতৃভাষা ককবরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বুফুরু ককছুঙনাই ?'(কবে মঙ্গলাচরণ হবে ?) বললাম, ' খৃনা রাইবাই ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মা বাই মলোইখে ছাইমানানৃ ব দিন' কক ছুঙমা উঙনাই ।' (কাল ঘটক ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার সঙ্গে দেখা করলে জানতে পারবো কোন দিন মঙ্গলাচরণ হবে) । এবার ডেপুটি রেজিস্ট্রার সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'কুমুদ বাবুর মাইয়ার বিয়া, দামী একটা কিছু দিতা হইব তো ।' আমিও হেসে ফেললাম তাঁর কথায় । এর পর চা এলো । চা খেতে খেতে অনেক কথা হলো কলকাতায় আমার চিকিৎসা নিয়ে ।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ খোশ মেজাজে সন্ধ্যের সময় বাসায় ফিরতেই দেখি বাড়িতে একটা বিয়ে বিয়ে ভাব । প্রতিবেশী শ্রীযুত পরশুরামবাবুর স্ত্রী এসেছেন । তাঁকে আমার স্ত্রী ও ছোট মেয়ে দেবযানী আমার আনা বিয়ের বেনারসী শাড়ি, হার ও দামী ভেলভেটের বিছানার চাদর দেখাযাচ্ছে খুশিতে ডগমগ হয়ে । বড়ো মেয়ে তানিয়ার ও খুব পছন্দ হয়েছে তার বিয়ের বেনারসী শাড়ি ও গলার হার ।

এবার আমি একটু বেরোলাম । প্রথম গেলাম ত্রিপুরাদর্পণ পত্রিকা অফিসে । দর্পণ-সম্পাদক সমীরণ রায়কে সব বললাম । সমীরণ বললেন, 'আপনার মেয়ের বিয়ের জন্যে তো ব্রাইডওয়ে হোটেল মোটামুটি বুক করে রেখেছি । তিরিশ হাজার টাকার ভেতর লোকজন খাওয়ানো-টাওয়ানো সব হয়ে যাবে । এখন আপনি সত্যদা (ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মা)'র সঙ্গে বসে বিয়ের তারিখ ঠিক করুন । এখনই যান সত্যদার ওখানে, তারিখ ঠিক হলে হাজার পাঁচেক টাকা এ্যাডভানস দিয়ে হোটেল বুক করতে হবে।'

সমীরণের দর্পণ অফিস থেকে বেরিয়ে দেখি বাইরে লোডশেডিং চলছে । তাই এই অন্ধকারের

ভেতর ডাক্তার সত্যরঞ্জন দেববর্মার বাড়ি না গিয়ে বাসাতেই ফিরে এলাম। বেশ ক্লান্ত লাগছিলো শরীর। সকালে চার ঘন্টা লেট ছিলো প্লেন। উদ্বেগের সঙ্গে চার ঘন্টা অপেক্ষা করতে করতে বেশ খারাপই হয়েছিলো শরীর। বিছানা নিতে চাইছিলো দেহ। রাত ৯ টায় ঘুমোনের ওষুধ Libotryp খেয়ে তার কুড়িমিনিট বাদে ভাত খেলাম। পুত্র সুরঞ্জন ফিরলো রাত পৌনে দশটায়। ফিরতেই সে আমাকে বললো, 'খূনা ফঙগ' দাই' সত্য নূঙবাই মালাইনা ফাইনাই।' (আগামীকাল সকালে সত্যদাদু তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন)। আমি পুত্রের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। তার কথা শুনেই পড়লাম শুয়ে। শুতে শুতে মনে মনে বললাম, বাড়িতে বিয়ে এগিয়ে আসছে। ডেটটা ফাইনাল করেই নববারাকপুরে দাদাদের জানাতে হবে। আর ফোন করতে হবে বন্ধুবর স্বপন বসু ও ডঃ সরস্বতী মিশ্রকে। বারাসতে ছোটদিকে ও জানাতে হবে। বেলঘরিয়ার ভাইপো শ্যামল চৌধুরীকে ও ফোনে সব বলতে হবে।

২৯শে জানুয়ারী, ২০০০, শনিবার। খুব ভোরে উঠে অনেক দিন পরে রাজার আস্তাবলে হাওয়া খেতে গেলাম। দেখলাম, ওই কাকভোরে আস্তাবল মাঠে খালি পায়ে লোক হাঁটছে, কেউ খালি হাতে ব্যায়ামও করছে। আমিও দু'বার মাঠের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ছুটলাম খালি পায়ে। তারপর কিছুক্ষণ ব্যায়াম করলাম খালি হাতে নরম কচি ঘাসের ডগার ওপর দাঁড়িয়ে। ঠিক ৫-৪৫-এ মাঠ ছেড়ে পথ দিলাম বুদ্ধমন্দিরের দিকে বন্ধুবর নগেন্দ্র জমাতিয়া ও মারে (বান্ধবী) পবিত্ররাণী জমাতিয়ার সঙ্গে মোলাকাত করতে এম. এল. এ. হোস্টেলে তাঁদের কোয়ার্টারে। লম্বা লম্বা পা ফেলে কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায় এম. এল. এ. হোস্টেলের গেটে পৌঁছতেই একজন সিকিউরিটি গেট খুলে দিলেন। কিন্তু গিয়ে দেখি, বন্ধু-বান্ধবী তখনো ওঠেননি। আমি বন্ধুবরের মেয়ে হামারীকে জোরে জোরে ডাকতে শুরু করতেই ঘরের ভেতর থেকে গলা এলো, 'কিচিঙ দা?' (বন্ধু নাকি?)। আমি বললাম, 'হুঁ, কিচিঙ-ন, দাতি বাচাদি' (হুঁ, বন্ধুই, তাড়াতাড়ি উঠুন)। বন্ধুবর নগেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে মুছতে দরজা খুলে শুধোলেন, 'বুফুরু ছকপাইছূলা কিচিঙ, বাহাই তঙ তাবুক, কাহাম-কুবূঙ দা তঙ?' (কখন এসে পৌঁছুলেন বন্ধু, কেমন আছেন এখন, মঙ্গলমত আছেন তো?)

—কাহাম-কুবূঙ-ন তাবুক, মিয়াছে ছকপাইঅ (এখন ভালোই, কালই এসে পৌঁছেছি)। ইতিমধ্যে বান্ধবী পবিত্ররাণী জমাতিয়া আমাদের কথা-বার্তা শুনে উঠে গেছেন। তিনিও বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তাবুক ছরির বাহাই তঙ কিচিঙ, কলকাতানি দাকতর তূমা হিন? (এখন শরীর কেমন আছে বন্ধু, কলকাতার ডাক্তার কী বললো?

—তাবুক কাহাম বূলা, কলকাতানি দাকতর পদেরপদ পরিক্খা খূলাইকা, রাঙ আছত' হাজার বাইথাঙকা বূলা (এখন ভালোই তো, কলকাতার ডাক্তার নানারকম পরীক্ষা করেছেন, টাকা আট হাজার ভাঙলো তো?)

—জাক, তাবুক চিনি উআনামা পাইখা, নূঙ কলকাতা থাঙমানি কিচিঙ, চূঙ জবই উআনাজাগূইতঙখ' (যাক, এখন আমাদের দুশ্চিন্তা শেষ হয়েছে, আপনি কলকাতা যাবার পর বন্ধু আমরা খুবই চিন্তিত ছিলাম) খুশিতে ডগমগ হয়ে বললেন নগেন্দ্রবাবু।

— তাবুক খূনাদি আলকা কক (এখন শুনুন অন্য কথা)।

—তূমা আলকা কক কিচিঙ? (কী অন্য কথা বন্ধু?)

— তানিয়ান' কক ছুঙনানাইখা (তানিয়ার মঙ্গলাচরণ হতে যাচ্ছে)।

— ব দিন' উঙনাই, মারে ছূঙগ (কবে হবে, বান্ধবী শুধোয়)।

— তিনি ফুঙগ' কাইলাবারিনি রাইবাই ডাঃ এস আর দেববর্মা ফাইনাই ফুন চিনি নগ', ব ফাইকে

ছাইমানানৃ (আজ সকালে বিয়ের ঘটক ডাঃ এস আর দেববর্মা আমাদের বাসায় আসবেন বলে জানিয়েছেন, তিনি এলে বলতে পারবো)।

— ফাগুন তাল'-ন কাইছিদি নূছাজূকন' (ফাল্গুন মাসেই বিয়ে দিন আপনার মেয়েকে) বান্ধবী বললেন।

—আও, নিনি মারে-ব আব'- ন হূন'। ব-ব ফাগুন'-ন তানিয়ান' কাইনা মূচূঙগূইতঙখা (হ্যাঁ, আপনার বান্ধবীও তাই বলছেন, তিনি ফাল্গুন মাসেই তানিয়াকে বিয়ে দিতে ইচ্ছে করছেন)। আমার কথা শুনে বন্ধুবর হাসতে হাসতে বললেন,—মারে-ব দাতি চামারি মাননা মূচূঙগূইতঙখা, আবনি বাগূই বূছাজূকন' দাতি কাইনা নাইঅ (বান্ধবীও তাড়াতাড়ি জামাই পেতে ইচ্ছে করছেন, আজ তার জন্যে মেয়েকে শিগগিরি বিয়ে দিতে চান)।

—হুঁ, আঙ-ব হাই-ন ইয়ার, কগ' তঙগ' শুভস্যং শীঘ্রম, লেরখে-ন ছামুঙ দেরাইথাঙগ' (হুঁ, আমিও তাই, বন্ধু, কথায় আছে শুভকাজ শিগগিরি করাই ভালো, দেরি করলে কাজ বাধাবিঘ্নের মধ্যে পড়ে যায়) এই কথা বলে বন্ধু ও বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে বললাম, — 'থাঙচিনু তাবুক আঙ, আয়াঙ-ব ছইত দাকতর ফাইনাই ফুন (এখন যাই আমি, ওদিকে সত্য ডাক্তার আসবেন বলে জানিয়েছেন)।

—চারগ নূঙগূই থাঙয়া দা কিচিঙ? (চা-টা খেয়ে যাবেন না বন্ধু?) বান্ধবী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন।

—ইঁহি, তাবুক চারগ নূঙলয়া মারে, লেরইথাঙনাই, দুদ, কাগজরগ তুবজাগয়াখু, নরগ তানিয়ানি কাইলাবারিনি মানূই-খূনূহরগ আঙ কলকাতানি তুবমানি নাইফাইদি তিনি ছারিগ' (না, চা-টা খাবো না, দেরি হয়ে যাবে, দুধ, খবরের কাগজ-টাগজ আনা হয়নি। তানিয়ার বিয়ের জন্যে কলকাতা থেকে যে জিনিসপত্র এনেছি বিকেলে এসে আপনারা দেখে যান)।

— তিনি থাঙমাঙগূলাক কিচিঙ, তিনি ছারিগ' তিনি ত্রিপুরা সুন্দরী নারিবাহিনিনি মিতিঙ তঙগ, খুনা ছানজাঅ থাঙগূই নাইলাইআনূ তানিয়ানি কাইলাবারিনি মানূই খূনূইরগ কিচিঙ। (আজ যেতে পারবো না বন্ধু, আজ বিকেলবেলায় আমাদের ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনীর মিটিঙ আছে, কাল সন্ধ্যে বেলা গিয়ে দেখে আসবো তানিয়ার বিয়ের জিনিসপত্র)।

এম. এল. এ. হোস্টেলের গেট দিয়ে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালালাম বুদ্ধমন্দিরের দিকে। তারপর বুদ্ধমন্দিরের সামনে থেকে একটা অটো ধরে চলে গেলাম বিদুর কর্তা চৌমুহনীর 'দৈনিক সংবাদ' অফিসে। সেখান থেকে একখানা পত্রিকা নিয়ে সোজা হেঁটে এলাম কর্ণেল চৌমুহনীর 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকার দপ্তরে। জানলা দিয়ে হাত বাড়াতেই শ্রীমান মনোজ একখানা পত্রিকা দিলো আমার হাতে। তারপর ডেয়ারির দুধ নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

ঠিক আটটার সময় এলেন ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মা। আমি ডাক্তারবাবুর সারা বছরের পেশেন্ট। আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাঃ পাহাড়ী কী বললেন আপনাকে দেখে?'

— ডাঃ পাহাড়ী অনেকগুলো পরীক্ষা করালেন। তারপর হার্টের জন্যে হল্টার মনিটারিং করতে হলো। প্রেসারটা এখন অনেকটা নর্মাল হয়েছে।

— 'ঠিক আছে। এখন মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে লেগে যান।'

—আচ্ছা পিয়া (পিয়া— ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মা সম্পর্কে আমার পিসেশ্বশুর) পাত্রপাক্ষ মঙ্গলাচরণ কবে করবে তা কি কিছু জানিয়েছে?

— না ওঁরা বলেছেন, আপনি কলকাতা থেকে ফিরলে মঙ্গলাচরণের ডেট ঠিক করবেন। আর আজ সুরঞ্জন তো যাবে আমার সঙ্গে ফার্নিচারের দোকানে অ্যাডভান্স করতে। সুরঞ্জনকে বিকেল চারটে

নাগাদ পাঠিয়ে দেবেন আমার চেম্বারে।

এর মধ্যে আমার স্ত্রী চা-পান নিয়ে এসে গেছেন। তিনি বললেন, 'ফার্নিচারনি দোকান' তানিয়া থাঙনা মুচুঙগ, ব ছাইউই অরদার রূনাই ফুন' (ফার্নিচারের দোকানে তানিয়া যেতে চায়, সে নিজে দেখে অর্ডার দেবে বলেছে)।

আমার স্ত্রীর কথা শুনে ডাক্তারবাবু বলেন, 'নিজের বিয়ের ফার্নিচার নিজে দেখে অর্ডার দেবে সে তো ভালো কথা, সুরঞ্জন্যের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন তানিয়াকে। ঠিক আছে, এই কথা, আর বসি না, আস্তাবল বাজারে যাবো একটু।' বলেই ডাক্তার সত্যরঞ্জন দেববর্মা গেলেন বেরিয়ে।

দশটার সময় আমার স্ত্রী গেলেন তাঁর অফিসে। সুরঞ্জনও বেরিয়ে গেলো রামঠাকুর কলেজে পড়াতে। আজ ছিলো শনিবার, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। আমিও বেরিয়ে পড়লাম ম্যাগনেট ক্লাবের কাছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধান ডঃ কমলকুমার সিংহর বাড়ি। কলকাতা থেকে ফিরে শুনলাম অধ্যাপক সিংহ দীর্ঘদিন পর কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ডঃঅরুণোদয় সাহার ছেলে দেবর্ষি'র নিখোঁজ হবার ব্যাপারে কেসে পড়েছেন অধ্যাপক সিংহ। অথচ তিনি হলেন ডঃ সাহার স্ত্রী অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জরী চৌধুরীর সহকর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেবর্ষি কলকাতা থেকে দক্ষিণ ভারতে ওয়ারেঙ্গেলে তার কলেজে যাবার সময় হাওড়া স্টেশন থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। যেদিন দেবর্ষি কলকাতা ছাড়ে, সেদিন ডঃ সিংহ কলকাতার সল্টলেকের ত্রিপুরা ভবনে স্ত্রী ও ছোট মেয়ে বুবুকে নিয়ে ছিলেন। তিনি দিল্লী থেকে ফিরছিলেন তাঁর বড়ো মেয়ের কাছ থেকে। ডঃ সিংহর মেয়ে ডাঃ জয়া সিনহা দিল্লীর 'অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স'-এ এম. ডি. করছে। দেবর্ষি নিখোঁজ হবার আগে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের পরীক্ষার ফল বেরোনো নিয়ে ডীন মহোদয়ের সঙ্গে বাঙলা বিভাগের প্রধান ডঃ সিংহর কথা কাটাকাটি হয়। বাঙলাতে ৯জন ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ায় এই বিপত্তি। ৯ জন ফার্স্ট ক্লাস! একেবারেই মেনে নিতে পারেননি ডীন মহোদয়। তিনি পরীক্ষার ফল বেরোনোর আগেই আপত্তি জানান। কিন্তু তড়িঘড়ি করে নাকি বিভাগীয় প্রধান ডঃ সিংহ বাঙলা বিভাগের ফল প্রকাশ করানোর ব্যবস্থা করেন। এই নিয়ে ডঃ সিংহর সঙ্গে ডীন মহোদয়ের বাকবিতণ্ডা হয়। ডঃ সিংহ নাকি টেলিফোনে ডঃ সাহাকে 'দেখে নেবো' বলে হুমকি দেন। বাঙলা বিভাগের ৯জন ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া নিয়ে আগরতলার খবরের কাগজে নানারকম খবর বেরোতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ত্রিপুরার রাজ্যপাল অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ আগরতলার এম. বি. বি. কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুশান্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে একটা কমিশনও বসান। ঠিক এমন সময় ডঃ অরুণোদয় সাহার ছেলে দেবর্ষি নিখোঁজ হয়ে যায়। ডঃ সাহা ও তাঁর স্ত্রী অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুরী চৌধুরী সন্দেহ করেন বাঙলার বিভাগীয় প্রধান ডঃ কমল কুমার সিংহকে। এবং তাঁরা হাওড়া কোর্টে কেসও করেন তাঁর ও তাঁদের ছাত্র প্রভাত সৎপথীর বিরুদ্ধে। তার জের ধরে কলকাতা থেকে সি. আই. ডি. অফিসাররা আসেন আগরতলায়। ডঃ সিংহকে তাঁরা সার্কিট হাউসে নিয়ে গিয়ে জোর জেরা করেন দু'দিন ধরে এবং পরে এ্যারেস্ট করে কলকাতায় নিয়ে যান তাঁকে। ডঃ সিংহও আইনের আশ্রয় নেন। আগরতলা কোর্টের প্রখ্যাত উকিল মনীষ কর ভৌমিক ও হাওড়া কোর্টের সনাতন মুখার্জী ডঃ কমলকুমার সিংহর পক্ষে দাঁড়ান। কয়েক মাস অসুস্থ অবস্থায় জেলে থাকার পর তিনি জামিনে মুক্তি পেয়ে কলকাতার সল্টলেকের ত্রিপুরা ভবনে একরকম নজরবন্দী থাকেন বেশ ক'মাস ধরে। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে সি. আই. ডি. সিংহর বিরুদ্ধে কোনো চার্জশিট দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ডঃ সাহার আবেদনক্রমে সি. বি. আই. দেবর্ষি নিখোঁজ মামলাটি হাতে নেয়। তারপর সি. বি. আই. কর্তৃপক্ষ তাঁকে আগরতলায় ফিরে যাবার অনুমতি দেন। ডঃ সিংহ ফিরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করবার জন্যে ভিসিকে চিঠি দেন। ওই চিঠি

সিন্ডিকেটের মিটিঙে তোলেন উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ অজিত কুমার চক্রবর্তী। কিন্তু সি বি আই তদন্ত চলতে থাকায় সিন্ডিকেট ডঃ সিংহের বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করবার প্রস্তাব দুঃখ প্রকাশ করে খারিজ করেছেন।

ডঃ কমল কুমার সিংহকে দেখে চমকে উঠলাম আমি। এ কি চেহারা হয়েছে তাঁর। চুল পেকে গেছে একেবারে, অনেকটা বুড়িয়ে গেছেন, চেহারাও হয়েছে কঙ্কালসার। আমি যেতেই তাঁর তিন নাগা কুকুর আমাকে আপ্যায়ন জানাতেই তিনি ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর পড়ার ঘরে ঢুকেই জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। বললেন, ' সব শুনেছি আমি। আমি কলকাতায় চলে গেলে একমাত্র আপনিই এসে খবর নিতেন। আমার এই বিপদে আর কেউ আসতো না নাকি। সত্যিই আপনি আমাদের বিপদের বন্ধু। যাক সে কথা। এখন বলুন আপনি কেমন আছেন?

— আমার শরীরও তেমন ভালো যাচ্ছে না। এখনো হাইপ্রেসারটা কন্ট্রোলড় হয়নি। ডাক্তার পাহাড়ী খুব সাবধানে থাকতে বলেছেন। আপনার মতোই আমারও কিডনির ট্রাবল। আপনি এসেছেন শুনেই চলে এলাম।

— ভালোই হয়েছে আপনি এসেছেন। জানেন, ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে ত্রিপুরার একটা ম্যাপ এনেছি ১৮৬২ সালের। তখন ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য। ওই ম্যাপ নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু বসতে হবে, একটা কাজ করবো ওই ম্যাপটা নিয়ে।

— আপনি এই শরীর নিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যেতেন?

— কি করবো বলুন, সময় কাটবে কী করে, রোজ দুপুরে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে চলে যেতাম। আমার এই বিপদটা, জানেন কুমুদবাবু, শাপে বর হয়েছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে মনে হলো আরো কিছুদিন বাঁচতে হবে, ত্রিপুরার ওপর একটা ভালো কাজ করবো আমি। তাই মহরাজ বীরচন্দ্রের আমলের ওই ম্যামটা এনেছি আড়াইশো টাকা ফিস দিয়ে।

—ওঃ, দারুণ লোক তো আপনি। এমন বিপদেও একটা সিরায়াস কাজের কথা আপনার মাথায় এসেছে ?

—বললাম না আপনাকে, এই বিপদটা আমার শাপে বরহয়েছে, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে না গেলে আমার চোখ খুলতো না। কি ভেবেছি জানেন, কেসটা মিটেগেলে এখন থেকে পুজো আর গ্রীষ্মের ছুটিটা কলকাতায় গিয়ে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে কাটাবো।

—আমারো তো মনে হয় ছুটিগুলো কলকাতায় গিয়ে কাটাই, ন্যাশ্যান্যাল লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটিতে গিয়ে পৃথিবীর নানান দেশের ট্রাইবেল-ভাষা নিয়ে একটু পড়াশুনো কোরি। কিন্তু চতুর্দশ দেবতার মাটি থেকে বেরোতে পারি কই ?

—শুনুন, আপনার সঙ্গে আরেকটা জরুরি কথা। আমার স্ত্রী বলছিলেন, আপনি নাকি 'দেবর্ষি মিসিং' এর ওপর একটা ফাইল কোরেছেন ?

—ফাইল মানে অন্য কিছু না। আগরতলা বা বাইরের কাগজে দেবর্ষি নিখোঁজের ওপর যে খবর বেরিয়েছে, তার প্রেস কাটিং আমি যতোটা পারি রেখেছি। আমার কি মনে হয়েছে জানেন, দেবর্ষি মিসিং কেসে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিভাগীয় প্রধানের জড়িয়ে যাওয়া ব্যাপারটা একটা সামাজিক মূল্য পাবে। তাছাড়া, বলতে পারেন, এটা সমস্ত ত্রিপুরার একটা সাড়া জাগানো ঘটনা।

—এই ঘটনার ওপর আপনার ওই প্রেসকাটিং আমার দরকার। আমি জেরক্স কোরে একটা কপি সি.বি. আই. কে দিতে চাই। দেখুক ওঁরা দেবর্ষি মিসিং কেসে আগরতলার কাগজে কি বেরিয়েছে। তাছাড়া, ওঁরাও আমাকে এ-ধরনের প্রেসকাটিং থাকলে দিতে বলেছেন।

—ঠিক আছে। ব্যাগ ভর্তি কোরে কালই আপনাকে দিয়ে যাবো আমি। কমল বাবু, এখন আমি উঠি হ্যাঁ, ভালো কথা, শুনুন, আমার বড়োমেয়ে তানিয়ার বিয়ের ঠিক হয়েছে এক ডাক্তার ছেলের সঙ্গে, ক'দিন বাদে মঙ্গলাচরণ হবে, এই শুভ খবরটা দিয়েগেলাম আপনাকে।

—আপনাকে বলা হয়নি কুমুদ বাবু, আমার ডাক্তার মেয়েরও বিয়ের ঠিক হয়েছে।

—জয়ার বিয়ের ঠিক হয়েছে ? ছেলে কি করে ?

—সেও ডাক্তার। আমার মেয়ের সঙ্গে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে-এ একই সঙ্গে এম.ডি. কোরছে। আসামের ছেলে। আমার হবু বেহাইমশায় একজন নামকরা লেখক আসামের। আসামের ওপর অনেক গবেষণামূলক বই লিখেছেন তিনি। গতকালই এক প্যাকেট বই পাঠিয়েছেন তাঁর লেখা। কাল এলে দেখাবো আপনাকে।

দেবর্ষি মিসিং কেসের জড়িত বিতর্কিত ব্যক্তি অধ্যাপক কমল কুমার সিংহর বাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতে বেলা দু'টো বেজে গেলো। খেয়েই বিশ্রাম করলাম একটু। তারপর ফেলে রেখে যাওয়া ককবরক অভিধানের কার্ডগুলো নিয়ে বসলাম আবার। মাত্র 'খ' পর্যন্ত এন্ট্রি হয়েছে, তাতেই চারশো পাতার ওপর গেছে। শরীরটা বারবার খারাপ হচ্ছে, কাজটা কি শেষ করে রেখে যেতে পারবো আমি ? প্রশ্ন জাগলো আমার মনে। অক্ষর প্রকাশনের পাব্লিশার শুভব্রত দেবকে বলেছিলাম স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ-– এই দু'খন্ড করে অভিধানটা ছাপতে, কিন্তু তিনি ব্যাবসায়িকদিক চিন্তা করে একটা খন্ডেই ককবরকের ত্রৈভাষিক অভিধান খানা ছাপতে আগ্রহী।

চারটের সময় সুরঞ্জন, বড়োমেয়ে তানিয়া, ছোটমেয়ে দেবযানী ফার্নিচারের অর্ডার দেয়ার জন্যে ডাঃ এস.আর. দেববর্মার বাড়ি বেরিয়ে গেছে। পৌনে পাঁচটার সময় আমিও বেরিয়ে পড়লাম তুলসীবতী বাজাবের দিকে। আমার স্ত্রী ফিরবেন অফিস থেকে। দু'জনে মিলে বাজার করে ফিরবো বাসায়। আমরা আগে দু'জনে প্রায়ই এমনভাবে তুলসীবতী বাজার থেকে বাজার করে একসঙ্গে ফিরতাম। রাজবাড়ির গেটের সামনে অপেক্ষা করতেই আমার পাছড়াপরা মোঙ্গলিনী গৃহিণী পড়লেন আমার চোখে। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পেরিয়ে ধরলাম তাঁকে। তিনি আমাকে দেখে খুশীই হলেন। তারপর বাজার করে তানিয়ার মঙ্গলাচরণের ব্যাপারে নানা কথাবার্তা বলতে বলতে পেস্ ক্লাবের পাশদিয়ে রানামহল ও সহদেব কর্ত্তার বাড়ির সামনে দিয়ে এলাম আমাদের বাসার মালিক ধ্রুব কর্তার বাড়ি।

সন্ধ্যে ছ'টার সময় তানিয়া আর দেবযানী এলো বাড়িতে ফার্নিচারের টাকা এ্যাডভানস করে। তাদের দু'জনেরই একটা তৃপ্তি তৃপ্তি ভাব। বিশেষ করে তানিয়ার। সে নিজে তার বিয়ের খাট-পালঙ-শোফা-আলমারি দেখে শুনে নিজে অর্ডার দিয়েছে, আত্মতৃপ্তি তো থাকবেই। কিছুক্ষণ পর সুরঞ্জন ফিরলো, হাতে তার এ্যাডভাইজর চৌমুহনী থেকে আনা এক পুটলা 'উআক বরক বাহান' (ত্রিপুরী শূকরের মাংস)। তানিয়া আবার শূকরের মাংস খায়না। প্রেসারের পর আমিও ছেড়ে দিয়েছি আমার প্রিয় শূকরের মাংস। আমাদের দু'জনের জন্যে রান্না করা হলো টমেটো আলু দিয়ে 'আকৃরান বৃতুই' (শুকনো মাছের ঝোল)। খেয়েদেয়ে ঠিক দশটায় প্রেসার ও কিড্নির ওষুধ খেলাম। তারপর ঘুমোনোর আগে খেলাম একটা লিবোট্রিপ ট্যাবলেট। আমার স্ত্রী আমার শোবার ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে চলে গেলেন ড্রয়িংরুমে ছেলে-মেয়ে নিয়ে সিনেমা দেখতে।

৩০শে জানুয়ারী, ২০০০, রবিবার। খুব ভোরে উঠে ওল্ড কালিবাড়ি লেনে গিয়ে শয্যা থেকে তুললাম কমরেড নিধুভূষণ হাজরাকে। তিনি আগরতলার আসন্ন বইমেলায় একটা বই লিখছেন। সেই বইয়ে প্রয়াত নকশাল নেতা জঙ্গল সাঁওতালের একটা ছবি ছাপতে চান। কলকাতা থেকে ওই নকশাল নেতার ছবিটা আমাকে আনতে বলেছিলেন। কিন্তু ছবিটা আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। বন্ধুবর

স্বপন বসু বলেছিলো, সীতারাম স্ট্রীটের 'পুস্তক বিপনি' দোকানের কাছে নকশাল ছেলেদের একটা আড্ডা আছে, তাদের ঘরও একটা আছে সেখানে, সেখানে গিয়ে খোঁজ করলে হয়তো জঙ্গল সাওতালের একটা ছবি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অসুস্থ শরীর নিয়ে আর অতোটা দৌড়ঝাঁপ করতে পারিনি। তবে ঠিকানাটা নিয়ে এসেছি নকশাল ছেলেদের তাদের ডেরার। ওখানে চিঠি লিখলে তাঁরা জঙ্গল সাঁওতালের একটা ছবি নিধুদাকে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

নিধুদা উঠেই কুশলসংবাদ জিজ্ঞেস করলেন আমার। তারপর জঙ্গল সাঁওতালের ছবির ব্যাপারে সব জানালাম আমি। তিনি বললেন, 'ঠিকানাটা দিন, আজই চিঠি লিখবো আমি।' ঠিকানাটা দিতেই তিনি নোটবুকে টুকলেন সেটা। এরমধ্যে প্রতিবেশী শিক্ষক কমল রায় চৌধুরী এসে গেলেন নিধুদার বাড়ি। সেখান থেকে আমরা তিনজনে গিয়ে হানা দিলাম কর্নেল চৌমুহনীর সেন মহলে কমরেড শ্যামল চৌধুরীর বাসায়। তিনিও একখানা বই লিখেছেন উপমহাদেশে মৌলবাদের বিপদ সম্পর্কে। আগরতলার বই মেলায় গতবছর শ্যামল বাবু ওই বই প্রকাশ করেছিলেন। এবার বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে আরো কয়েকটিমূল্যবান নিবন্ধ সংযোজন করছেন তিনি। বই খানার নাম — 'ভারতের ধর্মীয় মৌলবাদ ও উপমহাদেশের সমস্যা প্রসঙ্গে'।

চৌধুরী গিন্নী অনেকদিন পরে আমাদের একসঙ্গে তাঁর ঘরে মজলিসী আসর বসতে দেখে খুশীই হলেন। তারপর চা-জলখাবার খাইয়ে পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন তিনি।

সাতটার সময় খবরের কাগজ নিয়ে বাড়ি ঢুকলাম। আটটায় প্রেসারের ওষুধ খেয়ে স্নান সেরে গেলাম প্রতিবেশী আমার শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় পরশুরাম দেববর্মার বাড়ি। আমাকে দেখে খুশী হলেন তিনি। তাঁর স্ত্রীও এলেন আমাকে দেখে। পরশুরাম বাবু খুব মজলিসী লোক। তাঁর পছন্দের কাউকে পেলে ছাড়তে চান না কাউকে। কোথা থেকে যে ঘন্টা দেড়েক কেটে গেলো বোঝাই গেলনা।

বাসায় ফিরলাম দশটায়। আমার গৃহিনী সকালে আস্তাবল বাজারে গিয়ে ট্রাইবেল সবজি বিক্রেতাদের কাছ থেকে নানা প্রকার জুমের শাক-পাতা কিনে এনেছেন আমার জন্যে। আর এনেছেন ব্যাঙের ছাতা কিনে। ব্যাঙের ছাতা ট্রাইবেল শাক-সবজি বিক্রেতারা 'ফ্রি কালেকশন' হিসেবে বড়োমোড়া পাহাড়ের জঙ্গলে ঢুকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন, এর জন্যে তাঁদেরকে কোন ইনভেস্ট করতে হয়না। তবে ব্যাঙের ছাতা সব জায়গায় হয়না। খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হতে হয় তাঁদের। টলস্টয়ের উপন্যাস 'আন্নাকারেনিনা'য় এই ব্যাঙের ছাতা খোঁজার এক চমৎকার আরণ্যক চিত্র আছে।

দুপুরে খুব রেলিশ করে জুমের শাক-পাতা আর ব্যাঙের ছাতা দিয়ে ভাত খেলাম। ভাত খেয়ে শুতেই অনেকদিন পর একটু স্বাভাবিক ঘুম হলো। ঘুম থেকে উঠতেই স্ত্রী বললেন, ' দেখলে তো জুমের শাক-পাতার গুণ, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছো তুমি।' উত্তরে আমি বললাম, 'শোনো, দেখো তো ট্রাইবেলদের শাক-সবজির বাজারে শুষনি শাক পাওয়া যায় কিনা। বালিগঞ্জের গড়িয়াহাট বাজারে শুষনি শাক পাওয়া যেতো। বৌমা আমাকে মাঝে-মধ্যে শুষনি শাকের ঝোল খাওয়াতেন।'

আমার কথা শুনে স্ত্রী তাঁর মাতৃভাষা ককবরকে বললেন, 'ছিদ', চিনি ককবরক বাই নরগনি ছুছনি ছাকন' তাম' হিন (কিজানি, আমাদের ককবরক ভাষায় তোমাদের শুষনি শাককে কি বলে)।

—'শোনো, ফুল, (আমার স্ত্রী ডাকনাম ফুলটি। আমি ফুল বলে ডাকি) তোমাদের ককবরকে মঙ্গলাচরণকে তো বলে ' ককছূঙমা', তাইনা?

—ইঁ, তাম' বা? (হ্যাঁ, কি ব্যাপার?)

বলছিলাম, 'তানিয়ার তোমাদের ট্রাইবেলদের মতে যদি 'ককছূঙমা' হয়, তবে তো খাওয়া-দাওয়ার খরচপাতি উভয়পক্ষকে সমান সমান দিতে হবে, তাই না?'

—হঁহিঁ, চিনি রাইদা বাই কুইন্‌নানি পকখ' ছিমি মাইরুঙ বৃনাই। তাই বেবাগ চূলানি পকখ' বৃনাই (না, আমাদের নিয়ম অনুযায়ী কন্যাপক্ষ শুধু চাল দেবে। আর সব পাত্রপক্ষ দেবে)।

—সব দেবে মানে ?

—থক, মছ', মুইখুতুঙ, উআহান, চুআক, বৃতৃক, কুআই-ফাতৃই বেবাক চূলাছঙ মা তুবনাই বৃবৃইনি নগ' (তেল, লঙ্কা, তরিতরকতারি, শূকরের মাংস, মদ, লাঙ্গি (ভাঁড় বা ছোট কলসীর মধ্যে পচানো অশোধিত মদ যা কঞ্চির নল দিয়ে রসের মতো চুষে খেতে হয়), পান-সুপুরি পাত্রপক্ষ সব নিয়ে আসবে কন্যার বাড়িতে)

ফুলকুমারীর কথা শুনে হাসতে হাসতে বললাম আমি, 'তা হলে আমাদের খরচ তো খুব কম হবে, শুধু চাল দিলেই চলে যাবে।'

—"আবরগ আগিনি দিননি রাইদানি কক। তাবুক ছহর' তাম' যে খৃলাই, আগিনি রাইদা বতক বেবাগ দা তুবনাই, না চূঙ চা বৃনাই, বরগ বাই ককলাম ছালাইয়াখে ছাইছিমাইয়া (ওসব তো আগেকার দিনের নিয়ম-নীতির কথা। এখন শহরে যে কি করে, আগের নিয়ম অনুযায়ী সব কি নিয়ে আসবে, না আমারই খাওয়াবো, তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলাছাড়া বলতে পারবোনা)।

—হ্যাঁ আরেকটা কথা। মঙ্গলাচরণের দিনতো পাত্রপক্ষ মেয়ের জন্যে গয়না-গাটি সব নিয়ে আসবে, তাই না ?

—'মা তুবনাই তা হূন'। রাঙচাকনি মানৃইরগ কুইন্‌না মা কানৃইরূনাই। যে খৃনামানি, পারথ' দাকতর বিনি বুমানি য়াগ' রাঙ পঁচিছ হাজার বেঙক্‌নি তিছাউই বৃখা ফুন রাঙচাকনি মানৃইরগ তাগরূনানি' (অবশ্যই আনবে, একথা কি বলতে হয়। সোনার জিনিসপত্র কন্যাকে সব পরিয়ে দেবে। যা শুনলাম, পার্থ ডাক্তার ব্যাঙ্ক থেকে পঁচিশ হাজার টাকা তুলে তার মা-র হাতে দিয়েছে সোনার গয়না-গাটি তৈরি করার জন্যে)। এই কথা বলার পর আমার স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'খৃনাদি, আঙ কিছা পরছুরাম বাবুন্নি বিহিকরগবাই মালাইফাইগৃরানা, ব তাম' হূন খৃনাই গৃরানা। কক ছুঙফুরু চূঙ তাম' তাম' বৃথাই, ছৃঙগৃই-আকৃই আঙ ফাইআনৃ (শোন, আমি পরশুরাম বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসি। উনি কি বলেন শুনে আসি গিয়ে। মঙ্গলাচরণের সময় আমরা কি কি দেবো, জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা করে আমি আসব।)

—'শোনো, তাড়াতাড়ি এসো, আজ সন্ধ্যেবেলায় বান্ধবী পবিত্ররাণী জমাতিয়া হামারীকে নিয়ে আসবেন তানিয়ার জিনিসপত্র দেখতে।'

আমার স্ত্রী চলে যেতেই আমার মন চলে গেল আমার স্ত্রীর গ্রাম হেরমা বাড়িতে। ককবরকের অভিধান সংকলন করতে করতে যোগেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি থেকে বিয়ে করে মাস ছয়েক হলো আমি শ্বশুরবাড়িতে এসেছি। শ্বশুর মশায় আমাদের স্বামী-স্ত্রী থাকার জন্যে একটা মাটির ঘর তৈরি করে দিয়েছেন, সেখানেই আমরা থাকি। ঠিক এই সময় যোগেন্দ্র বাবুর মেঝো ছেলে তুইনা (ভালনাম ধীরেন্দ্র দেববর্মা)'র বিয়ের ঠিক হলো হেরমার কাছের গ্রাম পুরাইবাছাতে। মাস্টার মশায় (যোগেন্দ্র বাবু ছিলেন স্কুল শিক্ষক, তাই তাঁকে আমি প্রথম থেকেই মাস্টারমশায় বলে ডাকতাম) আমাকে বললেন, 'কুমুদবাবু, আপনাকে তুইনার বিয়ের মঙ্গলাচরণে নিয়ে যাবো। আমাদের উপজাতিদের মঙ্গলাচরণের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো আপনি নিজের চোখে দেখে লিখে রাখতে পারবেন।' মাস্টারমশায়ের প্রস্তাবে আমার আনন্দ আর ধরেনা। যদিও এর আগে আমি উপজাতি পরিবারে বিয়ে করেছি, কিন্তু নিজের বিয়ের মঙ্গলাচরণ নিজে দেখা যায়না, আত্মীয়-স্বজনেরাই মঙ্গলাচরণ করতে যান। তাই তুইনার বিয়ের মঙ্গলাচরণের অপেক্ষায় রইলাম আমি।

সেই শুভদিনটি ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসের ২৯ তারিখে এসে গেল। যোগেন্দ্রবাবু মঙ্গলাচরণে নিয়ে যাবার জন্যে সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছেন। একটা চটের থলের মধ্যে পাঁচ বোতল মদ, একটি কানা উঁচু ঝুড়ি (ওড়া) তে ছোটো দু'কলসি 'বৃতূক' (তরলকৃত পচুই) আরেকটি ওড়াতে কিছু শুকনো মাছ ও তরি-তরকারি এবং কলা-বাতাসা নেয়া হলো আলাদা একটা থলের মধ্যে করে। আরেকটি বিশ-পঁচিশ কেজির শূকর পুড়িয়ে নেয়া হয়েছে। বেলা ঠিক দশটার সময় আমরা বেরিয়ে পড়লাম কন্যার বাড়ির উদ্দেশে। সংখ্যায় মোট আমরা পনের জন—সাতজন পুরুষ লোক এবং আটজন স্ত্রীলোক। মাস্টার মশায়ের স্ত্রী চাঁদলক্ষ্মী দেবী আমার নববিবাহিতা স্ত্রী ফুলকুমারীকেও সঙ্গে নিলেন।

আমাদের মধ্যে মেয়েরাই আগে। তাঁরা ত্রিপুরী পাছড়া পরেছেন সবাই। খোপায় দিয়েছেন গোলাপফুল ও কেউ কেউ কানে গুঁজে নিয়েছেন রক্তজবা। মেয়েদের পরেই পুরুষরা। অনেকের পরনে ধুতি, কেউ কেউ ত্রিপুরী তাঁতে বোনা গামছাও পরে নিয়েছেন। আমাদের সব শেষে ঝলসানো মুন্ডুকাটা শূকরটা চোখা বাঁশ দিয়ে পেছন থেকে মাথা পর্যন্ত এফোঁড় ওফোঁড় করে বয়ে নিয়ে চলেছেন যোগেন্দ্র বাবুর দুই ভায়রাভাই—চাঁদরাই দেববর্মা ও যুগল দেববর্মা। হেরমা গ্রামের দক্ষিণ দিকে আঁদি নদী। নদী পেরিয়ে ধান ক্ষেত (মাঠ)-এর ভেতর দিয়ে লাইন করে চলতে চলতে আমরা এসে পৌঁছলাম যোগেন্দ্র বাবুর নিজের গ্রাম লেম্বুস্থলে। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন, যোগেন্দ্র বাবু এই গ্রাম থেকে আমার শ্বশুর বাড়ির গ্রাম হেরমাবাড়িতে জামাই উঠে আছেন। তিনি বিয়ে কবেছেন হেরমাবাড়ির গিবিমণি দেববর্মার মেয়ে চাঁদলক্ষ্মী দেবীকে। যোগেন্দ্রবাবু ও আমি দু'জনেই ঘরজামাই হেরমাবাড়ির — একজন পাশের গ্রামের, আরেকজন কলকাতার।

লেম্বুস্থলে এসে যোগেন্দ্রবাবুর বড়োভাই মুনিচরণ বাবুর বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম আমরা। একে একে যোগেন্দ্রবাবুর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনেরা যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। এবার আমরা হলাম পঁচিশজন। প্রায় মিছিলের মত করে আমরা হাঁটতে লাগলাম কন্যার বাড়ির দিকে। পুরাইবাছা গ্রাম পুরোনো লেম্বস্থলের কাছেই। কাজেই খুব তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেলাম আমরা কন্যার বাড়িতে।

আমরা যেতেই কন্যার বাবা ও অন্য আত্মীয়-স্বজনেরা আপ্যায়ন করলেন আমাদের। প্রথমে কলসি ভরে জল দিলেন হাত-পা ধুতে। হাত-পা ধুয়ে আমরা গিয়ে বসলাম মাটির ঘরে। আমাদের জন্যে আগের থেকে মাদুর পাতাই ছিলো। বাঁশের হুঁকোয় তামাক ও বিড়ি দেয়া হলো আমাদেরকে। পাত্রপক্ষের তরফ থেকে যোগেন্দ্র বাবুর ছোটশালা হরিচরণ দেববর্মা সিগারেট বের করে কন্যাপক্ষের আত্মীয়স্বজনকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে মঙ্গলাচরণের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হলো। সিন্দুর প্রলেপিত দুটো মঙ্গল ঘট বসানো হলো—একটি ছেলের নামে, অন্যটি মেয়ের নামে। ছেলের নাম ধীরেন্দ্র নারায়ণ দেববর্মা আর মেয়ের নাম শম্ভু কন্যা দেববর্মা। মঙ্গলঘটের মুখে আম্রপল্লব (থাইচুক বছক) দেওয়া হলো। একখানা আগযুক্ত কলাপাতার ওপরে মঙ্গল ঘট দুটো বসানো হয়েছে। ঘট দুটোর গলা ফুলের মালা দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হল। মালা দুটো তুলোর সুতো (নতুন) দিয়ে গাঁথা হয়েছে। যে সুতোয় কোন মাড় দেওয়া হয় নি অর্থাৎ পবিত্র সুতো দিয়ে মালা গাঁথা হয় এবং তা ঘটে পরিয়ে দেওয়া হয়। মঙ্গলঘট জলে পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। একটি বড় আগযুক্ত কলাপাতার ওপর আবার দুটো ছোট আগযুক্ত কলাপাতার ওপর ধান(মাইচুলাম), তিল (ছিপিঙ) ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর মঙ্গল ঘট বসানো হয়েছে। মঙ্গল ঘটের দুপাশে দুটো প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপ দুটো কলাপাতার ওপর রাখা হয়েছে। মঙ্গলঘটের সমানে আবার দুটো আগযুক্ত কলাপাতা দেওয়া আছে। কিছু ফুল,দূর্বা ও তুলসীপাতা কলাপাতার ওপর রয়েছে। মঙ্গলঘটের কলাপাতায় ধান ও তিলের ওপর একটি করে তুলসীপাতা, বাতাসা ও ফুল দেওয়া

হয়েছে। মঙ্গলঘটের সামনে রাখা কলাপাতায় নটি করে কলা ছুলে দেওয়া হয়েছে। কলার ওপরে আছে কয়েকখানা বাতাসা ও কিছু ফুল। মঙ্গলঘটের সামনে রাখা আগযুক্ত কলাপাতা দুখানার মাঝখানে একটি শান্তি জলের ঘট বসানো রয়েছে। ঘটটি জলপূর্ণ এবং একটি ডগা সমেত তুলসীর ডাল দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে। একটা ধুনুচি থেকে ধুনোর ধোঁয়া বেরচ্ছে অনবরত।

আগযুক্ত কলাপাতা দুখানার সামনে একটি বড় পিতলের বাটায় ধান ও তিলের ওপর একটি মাটির ঢেলা রাখা হয়েছে। এই বাটার দক্ষিণপাশে অপর একটি বাটা সাদাকাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। সাদা কাপড়ের ওপর কিছু তুলো। তুলোর ওপর পাঁচটাকার নোট রাখা আছে একখানা। তুলোর সঙ্গে কিছু ফুলও আছে। এইবার অচাই (পুরোহিত) বাঁ দিকের বাটার ধান, তিল ও মাটির ঢেলা জল দিয়ে ভিজিয়ে ফেললেন এবং সেই জল মঙ্গল ঘটের আসনের দিকে ছিটিয়ে দিলেন। এইসময় উপস্থিত মেয়েরা উলুধ্বনি দিলেন সবাই। এর পরেই পাত্রের বাবা ও মা মঙ্গলঘটের আসরে প্রণাম করলেন এবং পরে তাঁরা উপস্থিত সকলকে নমস্কার করলেন। অনুরূপভাবে পাত্রীর বাবা মাও করলেন। বাটার পাঁচটাকা পাত্রপক্ষ কন্যার মাতৃঋণস্বরূপ সম্মানার্থে দিয়েছেন। এখন সকলে পানসুপুরি খেতে শুরু করলেন।

এইবার ঘরের মাঝখানে দুটো 'বৃতূক' (তরলীকৃত পচুই) বসানো হল অর্থাৎ পচুই মদের ছোট কলস বসিয়ে দেওয়া হল। কলস দুটো নতুন চটার তৈরী আল্টার ওপর বসানো হয়েছে। এইবার কলস দুটো জল দিয়ে পূর্ণ করে দেওয়া হলো। পচুই মদের কলসের পাশে রয়েছে একটি বড় ডেগে জল। এই ডেগ থেকে কিছু পরে পরে পচুই মদের কলসীতে জল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। পচুই মদের কলসীর মুখে দুটো বাঁশের সরু চটা দেওয়া হয়েছে। পচুই মদ চুষে খাবার জন্যে কলসীর মধ্যে একটি করে কঞ্চির নল দেওয়া হয়েছে। এই পচুই মদের কলস দুটোর মধ্যে পাত্রপক্ষ দিয়েছেন একটি এবং অন্যটি দিয়েছেন কন্যাপক্ষ। মঙ্গলাচরণ করতে এসে কন্যার বাড়িতে পাত্রপক্ষ তাঁদের আনা পচুই মদের কলসী ও মদের বতলগুলো মঙ্গলঘটের আসরের কাছাকাছি রেখে দিয়েছেন। মঙ্গলঘটের আসরে দেয়ার জন্যে পাত্রপক্ষ বাতাসাও এনেছেন। এখন পচুই মদের কলস দুটোর কাছে এক বতল মদ রাখা হলো।

এইবার বিবাহের ককছুঙমা(জিজ্ঞাসাবাদ) শুরু হলো। কথাবার্তার শেষে প্রথমে সবথেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি একটি বাটিতে করে কিছু মদ খেলেন। খাবার আগে তিনি সকলকে নমস্কার করলেন। এরপরে তিনি কলসের পচুই মদ নলদিয়ে টেনে টেনে খেতে থাকলেন। এরপরেই অন্যসকলে প্রথমে মদ খেয়ে পচুই মদের কলসীর কাছে গিয়ে নল দিয়ে পচুই মদ চুষতে শুরু করলেন। একটু একটু করে পচুই মদ খাওয়া হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে জল দিয়ে কলস পূর্ণ করে দেওয়া হয়। দেখলাম, পাত্রপক্ষের একজন মদ পরিবেশন করছেন এবং তিনিই ঘটিকরে জল ঢেলে দিয়ে পচুইমদের কলস পূর্ণ করে দিচ্ছেন। পচুইমদের কলসীর মুখে বুদবুদ উঠছে। কলসীর ভেতরে পচাভাত ও মদের পিঠে (চুয়ান) আছে এবং তা গ্যাসে পরিণত হয়েছে। মদের কলসীর মুখে একটি পরিমাপক কাঠি আছে। তাকে ককবরক ভাষায় বলে 'তেঙগৃই'। সকলেই ঠিক সমানভাবে সমপরিমাণ মদ খাচ্ছেন। কিছুক্ষণ বাদে মেয়েরাও মদ পান করতে শুরু করলেন। একটু পরে মেয়েরা পচুইমদের নলে মুখ দিয়ে চুষতে লাগলেন। তৃতীয় একটি পচুই মদের কলস এনে দেওয়া হলো। এর পরেই কন্যা পক্ষের তরফ থেকে কয়েক বতল মদ আসরে নিয়ে আসা হল। মঙ্গলাচরণের কথাবার্তা শেষ হবার পর দুপুর বারটা থেকে পচুই মদ ও বোতলের মদ পান করতে শুরু করলেন সবাই। এইভাবে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত মেয়েপুরুষ সকলে একটানা পচুইমদ ও বোতলের মদ খেয়ে চললেন।

ঘরের একদিকে মেয়েরা অন্যদিকে পুরুষরা বসে আছেন। মেয়েদের কাছে ভিন্ন বোতলে মদ

দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের মধ্য থেকে একজন পরিবেশন করছেন। পচুই মদের কলস ছিল পুরুষদের দিকে। তাই মেয়েরা একে একে উঠে এসে পুরুষদের নমস্কার করে ওই একি নলে পচুই মদ খেতে থাকলেন। লক্ষ্য করলাম, মেয়েদের থেকে পুরুষদের নেশা হয় একটু আগে। মেয়েদের কাউকে মদ খেয়ে তেমন অসংলগ্ন হতে দেখলাম না। পুরুষদের মধ্যে মাত্র দু'একজন একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন; তাই তাঁরা আর মঙ্গলাচরণের আসরে থাকলেন না— বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

মদপানের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পুরুষ সকলেই বিড়ি সিগেরেট খাচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে তামাকও খাচ্ছিলেন সকলে বাঁশের হুঁকোয়। শেষ অপরাহ্নে বাড়ির অন্দর থেকে মেয়েদের কান্না শুনতে পেলাম। মেয়েকে পরের বাড়িতে পাঠাতে হবে সেটা মঙ্গলাচরণের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েগেছে আজ। তাই কন্যার মা কাঁদতে শুরু করেছেন। মা একটু থামতেই মেয়েও কাঁদতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে মা-মেয়ে পরপর কেঁদেই চললেন। এদের কান্না অনেকটা বিলাপের মতো—কথোপকথনের মধ্য দিয়ে হয়। মা মেয়েকে উদ্দেশ করে তাঁর এত দিনের লালন পালনের কথা এবং পরিশেষে মেয়ে কোন অরণ্যসংকুল দূরবর্তী পরিবেশে চলে যাবে, শ্বাপদসংকুল দেশে গিয়ে সে আর খুব বেশি বাপের বাড়ি আসতে পারবে না, পথে কত ভয়, এসবেরই কথা মায়ের কান্নার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। অন্যদিকে মেয়েও মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, তার এত দিনের স্মৃতিমাখা পরিবেশ থেকে কোন দূরবর্তী জায়গায় চলে যাচ্ছে এসবই তাকে ব্যথার ভারে আক্রান্ত করছে। তার কান্নার মধ্য দিয়ে মাকে কেন্দ্র করে এসবই ফুটে উঠছিলো। এ যেন শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা।

কিছুক্ষণ বাদে কন্যা এলেন মঙ্গলাচরণের আসরে গুরুজনদের প্রণাম করতে। পবনে তার ত্রিপুরা পাছড়া ও বুকে রিছা (বক্ষবন্ধনী)। বেশ সেজে গুজেই এসেছেন তিনি। খোঁপায় গোলাপফুল গোঁজা ছিলো অনেকগুলো। অন্য একজন মহিলা তাঁকে ধরে এনেছেন। কন্যার মাকেও একটু আগেই মেয়েরা বুঝিয়ে সুজিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে ধরে এনেছেন এখানে। তিনি মেয়েদের কাছে বসে তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।

কন্যা মঙ্গলাচরণের আসরের সামনে এসেই সকলের উদ্দেশে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। তারপর মেয়েদের দিকে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো। মেয়েদের পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে হাত জোড় অবস্থায় প্রণাম করলেন তিনি। তবে লক্ষ্য করলাম, কন্যা কারো পদস্পর্শ করলেন না। মেয়েদের দিকে প্রণাম শেষ করে এবার তিনি এলেন পুরুষদের দিকে এবং ওই একই প্রথায় প্রণাম করলেন গুরুজনদের। দেখলাম, মেয়েপুরুষ সকলেই কন্যার প্রণামের সময় কিছুনা কিছু অর্থ দিলেন। তবে একটাকা থেকে পাঁচটার মধ্যেই সকলেই দিয়েছেন।

ত্রিপুরী উপজাতি সমাজের প্রথা অনুযায়ী পাত্রপক্ষকে মঙ্গলাচরণের সময় শাকান্ন ভোজনের(বৈষ্ণব বিনয় অর্থে) খরচের সিংহভাগ বহন করতে হয়। এমনকি কন্যার পিতা অপারগ থাকলে পাত্র পক্ষকে সমস্ত খরচ বহন করতে হয়। তবে খরচের খুঁটি নাটি সব কিছুই উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়ে একটা মধ্যস্থতার মধ্যে আসে। ধরাযাক, মাংসের জন্যে একটা শূকর কেনা হলো শূকরের দাম হয়তো ৭৫ টাকা। পাত্রপক্ষ ৫০ বা ৬০ টাকা দিলেন, বাকিটা কন্যাপক্ষ দিয়ে দিলেন। পাত্র পক্ষের অবস্থা একটু সচ্ছল হলে, সাধারনত এরূপ অনুষ্ঠানে শূকরই মারা হয়। তবে মাছ বা মোরগ-মুরগীর মাংসও রান্না করা হয়।

উভয় পক্ষের দেনাপাওনা বা শাকান্ন ভোজনের আলোচনার পর সাধারনত পাত্র পক্ষের তরফ থেকে নিকটবর্তী বাজারে মাছ তরিতরকারি কেনার জন্যে লোক পাঠানো হয়। আমাদের সঙ্গে বিশ কেজির মত শূকর ছিলো, শুকনো মাছও ছিল কিছু, তবে জ্যান্ত মাছ ছিল না। তাই ছেলের বাবা

যোগেন্দ্রবাবু জ্যান্ত মাছ ও আরো কিছু তরিতরকারি কেনার জন্যে নিকটবর্তী লালসিংমোড়া বাজারে লোক পাঠালেন। সন্ধ্যের একটু আগেই তাঁরা বাজার করে ফিরলেন এবং কন্যার প্রণামের অব্যবহিত পরেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো।

মঙ্গলাচরণের ঘরেই গোল করে ঘিরে ঘরের চারিদিকে বসেছিলাম জনা পনের লোক আমরা এবং সকলেই পুরুষ। মেয়েদের খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল অন্দর মহলে। মাদুরের ওপর মোটা চাদর (ট্রাইবেল তাঁতে বোনা) বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমাদের খাবার বসবার জায়গায়। কলাপাতাতেই খেলাম আমরা। ডাল, আলুভাজা, বেগুন আর মাছ দিয়ে একটা তরকারি আর মাছের ঝোল রান্না হয়েছিল। মাছের তরকারিতে কিছু সিদলও দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই বেগুন দিয়ে মাছের তরকারী দেওয়া হল পাতে। তারপরে এলো মাছের ঝোল। এরপরেই এলো পাত্রপক্ষের আনা শূকরের মাংস। সবশেষে দেওয়া হল ডাল। ডালকে ত্রিপুরীরা বাঙালি খানা বলেন। তাই এটি শেষেই দেওয়া হয়েছে। এমনকি মাংস থাকলেও ডাল পরেই দেওয়া হয়, এটি অন্য জায়গায়ও আমি দেখেছি। রান্নাকরা জিনিসগুলো ঘরের এক কোনে রাখা হয়েছে এবং সেখান থেকে একজন আলাদা পাত্র করে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সকলকে দিচ্ছিলেন। আমরা সকলেই একই সঙ্গে খেতে বসেছিলাম। ভাত মুখে দেওয়ার পূর্বে কন্যাপক্ষের একজন এসে আমাদেরকে বললেন, 'য়াক ছুদি' (হাত ধুন)। এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়, ত্রিপুরীরা যদি কাউকে ভাত খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেন, তাহলে বলেন, আমি একটু হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করেছি। এটি এদের বৈষ্ণব বিনয়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা উঠোনে পেতে দেওয়া মাদুরের ওপর কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম করলাম। সকলে পানতামাক খেলেন। এবার অন্য একটি ঘরে পাত্র পক্ষের সঙ্গে কন্যার বাবা কি যেন আলাপ আলোচনা করলেন। এরপরে আমরা সকলকে নমস্কার করে দলবেঁধে আমাদের বাড়ির দিকে রোওনা দিলাম। হেরমা পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত বেজে গেল প্রায় ১১টা। পুরুষদের হাতে ছিল লাল মশাল।

হঠাৎ আমার স্মৃতিচারণে বাধা পড়লো। আমার ধর্মবান্ধবী পবিত্ররাণী জমাতিয়া ও তাঁর মেয়ে হামারী এসে উপস্থিত। তাঁদের পেছন পেছন আমার স্ত্রীও ঘরে ঢুকলেন। আমার দু'মেয়ে তানিয়া ও দেবযানী তাদের মাউইমা ও হামারীকে দেখে দারুণ খুশী হল। এর মধ্যে এসে গেল আমার মামাতো শালীর মেয়ে উষা দলবল নিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে আমাদের বাসাটার চেহারা নিলো বিয়েবাড়ির। উষারাণী ও বেলারাণীর ছেলে-মেয়েরা ছোটাছুটি করতে লাগলো কর্ত্তার বড়ো বড়ো ঘরে। প্রথমে মিস্টিমুখ করানো হলো তাদের আমার আনা কলকাতার মিস্টি দিয়ে। এরপর শুরু হলো মেয়ের হার, বেনারসী শাড়ি, ভেলভেটের বিছানার চাদর দেখা। আমি মঙ্গলাচরণের দিন তানিয়ার পরবার জন্যে সাউথ ইন্ডিয়ান সিল্কের শাড়ি এনেছিলাম। ছেলের জন্যে এনেছিলাম শান্তিপুরী ধুতি। শাশুড়ীমা ও শ্বশুরমশায়ের জন্যে কাপড়ও আছে। আলমারি থেকে সব একে একে নামিয়ে মেঝের ওপর রাখলেন আমার স্ত্রী। সরস্বতীদি (সরস্বতী মিশ্র)'র দেয়া হারের ডিজাইন দেখে সবাই তো অবাক। তানিয়া গলায় হারটা পরতেই তার চেহারা গেলো পাল্টে, গলাটা যেন ভরে গেলো তার। বৌমা (বন্ধুবর স্বপনের স্ত্রী)'র দেয়া দামী বেনারসী শাড়ি দেখে তারিফ করলো সবাই। শাড়িখানা খুলে তার লাল-খয়েরী জমিনের ওপর জরির কাজ দেখে মুগ্ধ হলো সকলে। ঠিক এমন সময় এসে উপস্থিত রূপা (আমাদের নব বারাকপুর বাড়ির পাশেই লাগোয়া বাড়ি তাদের। দিলীপ দাশগুপ্তর মেয়ে, বিয়ে হয়েছে আগরতলায়) তার বর জয়ন্ত গুপ্ত ও মেয়ে সোনাই। তারা এসেই বসে পড়লো বিয়ের কাপড়-চোপড় দেখতে। রূপা ও সোনাই মাতিয়ে তুললো বাড়িটা। জয়ন্ত এসে বসলো খাটের ওপর আমার পাশে।

রূপা আমাদের মেয়ের মতো। জয়ন্ত আমাদের জামাইয়ের থেকেও বড়ো। এবার আরেক প্রস্থ মিস্টি এলো। সকলে মিলে মিস্টি খেতে খেতে তানিয়াকে নিয়ে মেতে উঠলো। কয়েকবার তাকে হার আর শাড়ি পরে হাঁটতে হলো সকলের অনুরোধে। এই করতে করতে রাত বেজে গেলো সাড়ে নটা। আস্তে আস্তে ভাঙলো 'মিলন মেলা'। আমারও প্রেসারের ওষুধ খাবার টাইম হয়েছে। ওষুধ খেয়ে আমার স্ত্রীকে বললাম, 'দ্যাখো, কাল সকালে শিল্পী স্বপন নন্দীর বাড়ি যেতে হবে। বিয়ের কার্ডে মোঙ্গল ও আর্য বিবাহের প্রতীক চিহ্ন এঁকে দিতে বলবো তাঁকে। আর কাল তুমি ও আমি মিলে বিয়ের নিমন্ত্রণের লিস্টটা করে ফেলবো। রাজা-রাণীকে বলবো ভাবছি।'

রাজা-রাণীর কথা শুনে ফুলকুমারারীর চোখ কপালে উঠলো একেবারে। বললেন, 'তাম' হিন নৃঙ, রাজা-রাণী য়াক ছুনা ফাইনাই চিনি নগ', কবর দা নৃঙ!, (কি বললে তুমি, রাজা-রাণী হাত ধুতে আসবেন আমাদের বাড়িতে, পাগল নাকি তুমি!)। জনান্তিকে বলে রাখি, ককবরক ভাষায় কাউকে খাবার নিমন্ত্রণ করলে বিনীতভাবে বলতে হয় আজ আপনি আমাদের বাড়িতে একটু হাত ধুতে আসবেন। এই 'হাত ধোয়া' কথাটা নিমন্ত্রণের একটি শোভন অভিব্যক্তি। ককবরক ভাষায় এমন সুভাষণ বা শোভন অভিব্যক্তি আছে মোঙ্গল সভ্যতার প্রতীক হিসেবে।

স্ত্রীর কথা শুনে থতমত খেয়ে গেলাম আমি। গলার স্বর একটু নামিয়ে বললাম, 'দ্যাখো, রাজা-রাণী দু'জনেই আমাকে পছন্দ করেন। কাজেই তাঁদের নিমন্ত্রণ করাটায় দোষ কোথায় ? ঠিক আছে, আমি মহারাণীর সেক্রেটারী তাপস দের সঙ্গে এ-ব্যাপারে একটু কথা বলে নেব।'

রাত দশটা বেজে যেতেই আমি একটু অস্থির হয়ে পড়লাম। পুত্র সুরঞ্জন এখনো ফিরছে না কেন ? আমি ভাত খেয়ে নিলাম। ঠিক সাড়ে দশটায় ফিরলো সে। দেখলাম তার মুখটা ভারভার। সে ফিরতেই আমি ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়লাম পুত্রের ভারভার মুখের কথা ভাবতে ভাবতে।

৩১শে জানুয়ারী, ২০০০, সোমবার। খুব ভোরে উঠে বেরোলাম। প্রথমে গেলাম স্যন্দন পত্রিকায়, সেখান থেকে এলাম রাধামোহন ঠাকুর সরণীর ভিক্ষু ঠাকুরের বাড়ির পাশে। দেখলাম, তেলাকুচোর পাতা একেবারে উধাও। সেখান থেকে দৈনিক সংবাদে আসতে আসতে গতকাল রাতে সুরঞ্জনের ফিরতে দেরি হওয়া ও তার ভারভার মুখের কথা ভাবছিলাম আমি। একহাতে স্যন্দন ও অন্যহাতে দৈনিক সংবাদ নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরের সামনে রাজদীঘির পাড়ে আসতেই দেখি কমরেড শ্যামল চৌধুরী ও কমল রায় চৌধুরীর সঙ্গে শ্রীযুত নিধুভূষণ হাজরা জমিয়ে রাজনীতির আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। আমাকে দেখে আরো উৎফুল্ল হলেন তিনি। আমার মেয়ের মঙ্গলাচরণ কবে হতে যাচ্ছে, এসবও জিজ্ঞেস করলেন তিনি। আমি বললাম, শুভস্যং শীঘ্রম, যতো তাড়াতাড়ি হয় ততোই ভালো। এবার আমরা চারজনে উঠে পড়লাম, বেলা পৌনে সাতটা বাজতে যায়। আগরতলার প্রচিন রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে রানামহলের গা ঘেঁষে সহদেব কর্তার সুরম্য অট্টালিকা ডাইনে এবং নকুল কর্ত্তার নতুন সুদর্শন দোতলা দালান বাঁয়ে রেখে আমরা চলে এলাম কর্নেল চৌমুহনীর কাছে। সেখান থেকে ডাইনে মোড় নিয়ে আমি চলে এলাম ধ্রুবকর্ত্তার বাড়িতে।

বাসায় এসে রান্নাঘরের ডাইনিং টেবিলের ওপর খবরের কাগজ দু'খানা রাখলাম। অন্যদিন খবরের কাগজ আনতেই চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে যায় তানিয়া। আজ দেখলাম সে এলোনা কাগজ নিতে। আমি আস্তে আস্তে আগের মতো ওষুধের বাক্স, রোজকার ওষুধ লেখার খাতা, বোতলে জল নিয়ে বসলাম। স্ত্রী আমাকে বেল ফেঁড়ে দিলেন খেতে। তারপর রুটি করতে লাগলেন আমার জন্যে। ওষুধ খাওয়ার আগে ভালোমতো প্রাতরাশ করে নিই আমি। আমার মনে হলো, আমার স্ত্রীও খুব স্বাভাবিক ব্যবহার করছেননা আমার সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'কী ব্যাপার, তানিয়া-দেবযানী কাউকে

দেখছিনা।' আমার কথায় কিছুটা বেজার মুখে বললেন, 'বাচায়ুখু তা হূন' (এখনো ওঠেনি আর কি)।

সাড়ে সাতটা বেজে যায় তুলে দাও তাদের। অতো রাত জেগে টিভি দ্যাখা ভালো না। ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ে নাকডাকি। তুমি ওদেরকে অতোরাত জেগে টিভি দেখতে দিয়োনা।

এমন সময় আমার কাকাশ্বশুর বীরকুমারবাবু ও জ্যাঠতুতো শ্যালক লেখক সুনীল এসে উপস্থিত। তাঁদের এমন সময় দু'জনকে একই সঙ্গে আসতে দেখে কেমন যেনো মনে হলো আমার। স্ত্রী আমাকে বললেন, 'কাকা বীরকুমার তাই সুনীল নূঙ বাই মালাইনা ফাইঅ। বিথি চাউই বরগ বাই ককলাম ছালাইছিদি' (বীরকুমার কাকা ও সুনীল তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তুমি ওষুধ খেয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলো গিয়ে)।

—ব্যাপার কি, তাঁরা দু'জনে এতো সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন ?

—'আঙ বাহাইকে ছাইমানাই' (আমি কী করে জানবো ?) -স্ত্রীর গলায় একটু বেসুরো ভাব।

আমি তাড়াতাড়ি দুধ-রুটি খেয়ে প্রেসারের দশ মিলিগ্রাম ওষুধ গলাধঃকরণ করলাম। তারপর বড়ো ঘরের ভেতর দিয়ে হলঘরে আসতে দেখি তানিয়া ও দেবযানী তখনো ঘুমোচ্ছে। আমি যেতেই কাকা বীরকুমার ও সুনীল নড়েচড়ে বসলেন একটু। দেখলাম পড়ার ঘর থেকে সুরঞ্জন ও তার ছোট মামা বিমলও চলে এলো। আমার স্ত্রীও এলেন সঙ্গে সঙ্গে। আমি কাকা শ্বশুর ও শ্যালক সুনীলের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কি ব্যাপার, এতো সকালে আপনারা এলেন। অফিস-টফিস নেই নাকি আজ ?

আমার কথা শুনে কাকা বীরকুমার বললেন, 'বাস্তবকে মেনে না নিয়ে উপায় কি, যা শুনলাম তাতে আমাদের সকলের মন খারাপ হয়ে গেছে। কথাটা তোমাকে না বলে তো উপায় নেই, তানিয়ার বিয়ে ভেঙে গেছে, পার্থ ডাক্তার এখন বিয়ে করবে না বলেছে।' 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য' কুমুই (জামাইবাবু) আপনি এই খবরে ভেঙে পড়বেন না।' সুনীল প্রবোধ দেয় আমায়।

শ্বশুর ও শালার কথা শুনে জোর দিয়ে আমি চেয়ারের হাতল দুটো মুঠো করে ধরলাম। মাথাটা ঘুরছে যেন। টপটপ করে জল পড়তে লাগলো আমার চোখ দিয়ে। বাকরোধ হয়ে গিয়েছিলো আমার। বললাম, শরীরটা ভালো লাগছে না আমার, আপনারা কথা বলুন, আমি শুয়ে পড়ি গিয়ে।'

আমি উঠতেই সুরঞ্জন আমাকে হাত ধরে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলো আমার খাটের ওপর। বললাম, 'বাবু, লিবোট্রিপ (ঘুমের বড়ি) আধখানা খেতে দে আমায়। মাকে আজ অফিসে যেতে বারণ কর। বিকেলে তোর মাকে নিয়ে ডাক্তার সত্যরঞ্জন দেববর্মার বাড়ি যাবো। বিয়েটা কী করে ভাঙলো জানতে হবে ভালো করে।'

আমার কথা শুনে সুরঞ্জন বললো, 'কাল রাতে দাই (দাদা) সত্যর বাড়িতেই ছিলাম, তাই ফিরতে অতো রাত হয়েছিলো। দাই খবর দিয়েছিলেন আমাকে যেতে। ওখানে গিয়ে সব জানতে পারলাম। রাতে মাকে বলেছি সব, তানিয়া দেবযানীও জেনে গেছে ব্যাপারটা।

ঘুম ভাঙতে ভাঙতে বেলা দুটো বেজে গেল। স্ত্রী বললেন, 'তুকুছিদি তাবুক, কৃপাল' যে খচাজাক উঙখা, আছূক তা উআনাদি। নিনি বৃখা আছূক বাইথাঙকে চিনি বৃখা বাহাই উঙনাই বুচিনা চেরেছতা খূলাইদি। থাঙদি বাথরুম', আঙ তূই মথুঙুগূইরূখা (চান কর এখন, কপালে যা ছিলো তাই হয়েছে, এতো চিন্তা কোরোনা। তোমার মন এত ভেঙে গেলে আমাদের মনের অবস্থা কি হবে একটু বোঝার চেষ্টা কর। বাথরুমে যাও, আমি জল গরম করতে দিয়েছি।'

ঈষদুষ্ণ জলে স্নান সেরে ভাত খেতে বসলাম। মুখ দিয়ে আমার কথা বেরোচ্ছিলো না। স্ত্রীও আমার সঙ্গে ভাত বেড়ে নিয়েছেন। খেতে খেতে বললেন, 'তিনি থ ছানজাঅ, পিয়া ছইত' তাই পি

রাণু বাই মালাইগূরানা, বরগ-ব দুক্‌খ মাঙখা না (চলো সন্ধ্যেবেলায় সত্য পিসা ও রাণু পিসির সঙ্গে গিয়ে দেখা করি গিয়ে। তাঁরাও দুঃখ পেয়েছেন।'

—ঠিক বলেছো তুমি, ফুল। ডাক্তার বাবু তো এই বিয়ের 'রাইবাই' (ঘটক)। তিনি এতো আপনলোক আমাদের। আমাদের অসুখে-বিসুখে কিনা করেন। তিনিও লজ্জায় পড়েগেছেন। পি রাণু (রাণু পিসি)রও খুব অস্বস্তি লাগছে ব্যাপারটাতে। সন্ধ্যেবেলায় চলো যাই তাঁদের সঙ্গে দেখা করি গিয়ে। আসল বিষয়টা তারা বলেতে পারবেন।'

খাবার পরে আমাকে আর ঘুমুতে দিলেননা আমার স্ত্রী। বললেন, 'চাইনীজ চেকার থূঙদি আঙবাই, উআনামা ছূরাঙগানূ (চাইনিজ চেকার খেলো আমার সঙ্গে, চিন্তা ছুটে যাবে)।' তানিয়া ও দেবযানী দুপুরে খেয়ে আবার ঘুমিয়েছে। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চাইনিজ চেকার খেললাম। প্রতিবারই হারলাম আমি। তানিয়া ও দেবযানী ঘুম থেকে উঠে তাদের বাবা-মাকে এমন স্বাভাবিক ভাবে চাইনিজ চেকার খেলতে দেখে খুব খুশী হলো। তাদের ভয় ছিলো আমার জন্যে। এমন দুঃসংবাদে আমার শরীর যদি আবার খারাপ হয়! তানিয়া ও দেবযানী এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। আদর করে তাদের বললাম, 'যা মা, তোরা দু'জনে চা করে নিয়ে আয়। চা খেয়ে ডাক্তার বাবুর বাড়িতে যাই, সব জেনে আসি।'

সন্ধ্যে ঠিক ছ'টার সময় ডাক্তার সত্যরঞ্জন দেববর্মার এ্যাডভাইজার চৌমুহনীর বাড়ি গেলাম আমরা। আমাদের দু'জনকে দেখেই ডাক্তার বাবু বললেন, 'আপনারা চলে এসেছেন, আমরাই না যাচ্ছিলাম আপনাদের বাসায়। এমন যে হবে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। ছেলেটা এতো ভালো বলে জানতাম, শেষ মুহূর্তে কী যে হলো তার!'

ডাক্তার বাবুর কথার পরে পি রাণু বললেন, 'লাচিমা ছিঙছা, চূঙ জবই লাচিজাগূইতঙগ' নরগন' (লজ্জায় মরে যাচ্ছি, আমরা তোমাদের কাছে খুব লজ্জিত)। আমি বললাম, 'লজ্জার আর কি আছে বলুন। যা হবার হয়েছে, আবাব একটা ভালো ছেলে দেখে দিন আপনারা। মেয়ে যখন আমাদের, বিয়েতো দিতেই হবে।' আমার কথা শুনে পি রাণু ককবরকে একটা প্রবাদ বললেন, 'তূক তাকজাগমানি ছরক তাকজাগযা দা তঙ?' (হাঁড়ি যখন তৈরি হয়েছে, সরা কি তখন তৈরি না হয়ে পারে।) হেসে ফেললাম আমরা স্বামী-স্ত্রী তার কথা শুনে। তারা চা-মিস্টি খাওয়ালেন খুব করে। তারপর পি রাণু বললেন, 'পারথ দাকতরনি বুমা কাবমাঙ কাবমাঙ তঙফুন (পার্থ ডাক্তারের মা সবসময় নাকি কাঁদছেন)। পি রাণুর কথা শুনে আমার স্ত্রী বললেন, 'কাবনাই বূলে, বূছূক বদর' পারথ দাকতারনি বুমা' (কাঁদবেনই তো, কত ভদ্র পার্থ ডাক্তারের মা)।

ঠিক আছে, ডাক্তার বাবু, উঠি আমরা। আরেকটা পাত্র দেখে দিন আপনারা। কাউকে দোষারোপ করিনা আমরা। কোনো দিন কারুর ক্ষতি করিনি আমি, তাই মনে খুব দুঃখ পেয়েছি।

—আপনি সংগ্রামী মানুষ, সারাজীবন সর্বহারার পার্টি করে এসেছেন, এত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়লে চলবে কেন।' বলে হাসতে লাগলেন ডাক্তার বাবু। এর মধ্যে পি রাণু জর্দা দিয়ে পান সেজে আমার স্ত্রীর হাতে দিলেন একটা। দু'জনে একটা রিক্সা নিয়ে বাসার দিকে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। রিক্সায় যেতে যেতে আমি বললাম, 'কাল খুব ভোরে গিয়ে ইয়ার নগেন্দ্র জমাতিয়া ও মারে (বান্ধবী) কে জানাতে হবে সব।'

১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০০, মঙ্গলবার। আজ ভোর ৫-৩০-এ প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে সোজা চলে গেলাম আসাম রাইফেলস-এর কাছে ২নং M.L.A হোস্টেলে নগেন্দ্র জমাতিয়ার কাছে। তখনো তিনি ওঠেননি। আমার ধর্মবান্ধবী পবিত্ররাণী জমাতিয়া (নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী) ও তখনো ঘুমোচ্ছেন। আমি

তাঁকে মারে মারে (ককবরকে বান্ধবীকে 'মারে' বলে) ডাকতেই তিনি উঠে এলেন। মারে চা করতে গেলেন। এদিকে আমি বন্ধুবর নগেন্দ্র জমাতিয়ার হাতে আন্দামান থেকে প্রকাশিত 'শারদীয় সবুজ দ্বীপ' সংখ্যাটি তুলে দিলাম। ওই সংখ্যায় আমার 'সবুজ ত্রিপুরার ককবরক প্রবাদ' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বেরিয়েছে। এবং ছোট গল্পকার দেবব্রত দেব, যিনি আমার কাছ থেকে প্রবন্ধটি আদায় করে নিয়েছিলেন, বললেন, লেখাটি ইতিমধ্যে কলকাতার বিদগ্ধ পাঠক মহলে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে।

তারপর আমি আমার বন্ধু নগেন্দ্রবাবু ও বান্ধবী পবিত্ররাণী জমাতিয়াকে বললাম, 'তানিয়ার বিয়ে পার্থ ডাক্তারের সঙ্গে হলো না। সে বলেছে, এখন বিয়ে কোরবে না। পাত্রপক্ষের কাছ থেকে এই দুঃসংবাদ এনে দিয়েছেন ডাঃ এস. আর. দেববর্মা।' তাঁরা আমার কথা শুনে খুব দুঃখ পেলেন। বন্ধুবর নগেন্দ্রবাবু বললেন, 'এমন তো হবার কথা নয়ে। ওদের পরিবারের সকলকে চিনি আমি। পার্থ ডাক্তারের বাবা ছিলেন মাস্টার, কী ভদ্রলোক তিনি। তার মা-ও খুব ভদ্র। পার্থ এ কী কোরলো, আশীর্বাদের মুখে পেছিয়ে গেলো। ঠিক আছে, আমি চন্দ্রোদয় রূপিনী ও অমিয় দেববর্মাকে দিয়ে সব খবর নেবো। আপনি ভেঙে পড়বেন না।'

এর মধ্যে আমার বান্ধবী লাল টকটকে লিকাব চা নিয়ে উপস্থিত। চা দিতে দিতে বললেন, 'তাম' হিন কিচিঙ, পারথ দাকতর উছলই থাঙকা, ব তানিয়ান' কাইজাগয়া?' (কি বললেন বন্ধু, পার্থ ডাক্তার পিছিয়ে গেছে, সে তানিয়াকে বিয়ে করবে না?)

— মিয়া দাক্তর এস. আর. দেববরমা মুকতি (সুরঞ্জন) ন নৃঙহরই অ কক ছাকা ফুন (গতকাল ডাক্তার এস. আর. দেববর্মা মুক্তি (সুরঞ্জন)কে এ-কথা বলেছেন)।

— কৃচার' মাছা-মুছু কেবেঙ উঙগৃই বাচাখানা, কিচিঙ। (মাঝখানে কেউ হয়তো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বন্ধু।) বান্ধবী মুখ কালো করে বললেন।

বন্ধুবর নগেন্দ্র জমাতিয়া বললেন, 'হতেও পারে, শেষ মুহূর্তে কেউ ভালোরকম বাধা দিয়েছে।'
— এ কীরকম বাধা আমি বুঝতে পারিনে। আমি গত মাসে কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে গেলে পর তারা মেয়ের হাতের ও গলার মাপ নিয়ে গেছে! মুক্তি ফোনে আমাকে সব জানিয়েছে, তারপরেনা আমি বিয়ের এটা-ওটা বাজার করে এনেছি। তাছাড়া, কলকাতা থেকে ফেরার পর ডাঃ দেববর্মা মুক্তিকে নিয়ে গিয়ে ফার্নিচারের দোকানে পাঁচ হাজার টাকা এ্যাডভান্স করে এসেছেন। আর ঠিক মঙ্গলাচরণের আগে কিনা ---।

— দুক্খ তা খৃলাইদি কিচিঙ, কগ' তঙগ' ইছ্ছর জা খৃলাইঅ কাহামনি বাগৃই ফুন। হামকা কিচিঙ, দেছ-রাইজঅ চুলানি বিয়াল কৃরূই। নৃছাজৃকনি বাগৃই রাজপুত্র নাইছিঙগৃইতঙগ (দুঃখ করোনা বন্ধু, কথায় আছে ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে। ভালোই হয়েছে বন্ধু, দেশ-বাজ্যে ছেলের অভাব নেই। তোমার মেয়ের জন্যে রাজপুত্র অপেক্ষা করছে) বলে একটু মিষ্টি হাসি হাসলেন তিনি। অতি দুঃখেও আমারও মুখে হাসি ফুটে বেরোলো।

— জুড়িয়ে যাচ্ছে, চা খান ইয়ার (বন্ধু)। আপনার বান্ধবী যা বলেছেন তা-ই ঠিক; ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন।

— দেখুন, নগেন্দ্রবাবু, সারা জীবন তো আমি মানুষের মঙ্গল কামনা করে এসেছি, ক্ষতি করিনি কাউকে কোনোদিন। আপনাদের ভাষার কাজে এসে আপনাদের ভালোবেসে রয়ে গেলাম আমি 'চামারি অম্পা' (আজীবন ঘর জামাই) হয়ে। বীরচন্দ্র ঠাকুর (এ্যাডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মণ)-এর মুহুরি শ্রীশ দেববর্মা আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কুমুদবাবু, কতদিন থাকবেন আপনি আমাদের এই রাজ্যে?' হাসতে হাসতে আমি বলেছিলাম, 'কেন, ককবরক অভিধান সংকলনের কাজ

শেষ হলে আমি কলকাতায় ফিরে যাবো।' তখন তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'এটা হলো চতুর্দশ দেবতার মাটি। চতুর্দশ দেবতা ইচ্ছে না করলে আপনি নিজের ইচ্ছেয় ফিরে যেতে পারবেন না।' শ্রীশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি তার কথা শুনে। তিনি বললেন, 'আমাদের ত্রিপুরায় একটা কথা চালু আছে- ''চতুর্দশ দেবতার মাটি সেলাম করে হাঁটি।'' এই অভিমন্যুর চক্রব্যূহে যখন একবার ঢুকে পড়েছেন, তখন আর বেরোতে পারবে না, চতুর্দশ দেবতার মাটিকে সারা জীবন সেলাম করে যেতে হবে আপনাকে।' জানেন, নগেন্দ্রবাবু, মাঝে মাঝে আমার শ্রীশবাবুর সেই কথা মনে হয়, কই আমি তো বেরোতে পারলাম না, আপনাদের ককবরক ভাষা, আপনাদের সমাজকে ভালোবেসে থেকে গেলাম আপনাদের চতুর্দশ দেবতার মাটিতে; আপনাদের সুখ-দুঃখ সব ভাগ করে নিলাম আমি। আমি তো কোনো অপরাধ করিনি।

—কাজেই আপনাকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। হাসি মুখে এই সাময়িক দুঃখ আপনাকে মেনে নিতে হবে। জানেন, ইয়ার, আমাদের ট্রাইবেল সমাজ হলো এক ফুটন্ত গোলাপ। তার ওপর প্রজাপতিও বসে মৌমাছিও বসে, কিন্তু তার একেবারে ভেতরে আরো অনেক জিনিস আছে। কাজেই, বাস্তব অবস্থা আপনাকে মেনে নিতে হবে বন্ধু।

মনে হলো, প্রাক্তন মন্ত্রী নগেন্দ্রবাবু, আমার ত্রিশ বছরের ধর্মবন্ধু, মাসানবু ফুকুওকা ও পান্নালাল দাশগুপ্তের মন্ত্রশিষ্য একজন দার্শনিকের মতো কথা বলছেন। তাঁর শেষ কথাটা আমার বোধগম্য হলো না। বললাম, 'যাই আমি এখন, আপনারা একবার বিকেলে আমাদের বাসায় আসুন, আপনাদের মারে (বান্ধবী)কে একটু প্রবোধ দেয়া দরকার, তিনি তো ভেঙ্গে পড়েছেন একেবারে।'

আমি উঠতেই বন্ধু ও বান্ধবী এম. এল. এ. হোস্টেলের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন আমাকে। আমিও দ্রুত পা ফেললাম, সাড়ে সাতটা বাজে, আটটায় গিয়ে প্রেসারের ওষুধ খেতে হবে। বন্ধু-বান্ধবীর প্রবোধ সত্ত্বেও মনটায় কেমন যেন উতলা উতলা ভাব। কিছুটা আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম আমি। বুদ্ধ মন্দিরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে বি. এড. কলেজের গা ঘেঁষে রাধানগর বাস স্ট্যাণ্ডের ভেতর দিয়ে যেতেই পেছন থেকে একটা বাস হঠাৎ করে আমার পেছনে এসে খুব জোরে ব্রেক কষে সশব্দে দাঁড়িয়ে গেলো। আশেপাশে লোকজন ছুটে এলো আমার সামনে। বাসের ড্রাইভার অশ্রাব্য ভাষায় গলাগালি দিলেন আমাকে। তারপর বললেন, 'একটু হলেই চাপা পড়েছিলেন তো আপনি, দ্যাখেননি একটা বাস ঢুকছে ভেতরে। আপনিও মরতেন, আর আমারও হাতে পড়তো দড়ি। যান বেঁচে গেছেন।'

সত্যিই আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম আমি। পাকা রাস্তায় উঠে খুব সাবধানে পা চালালাম এবার কাটাখালের ব্রীজের উপর দিয়ে প্যালেস কম্পাউন্ডের দিকে। সত্যিই তো, অনেক দিন বাঁচতে হবে আমাকে। দু'মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তারপর পুত্র সুরঞ্জনের পালা। আর আমার ককবরক অভিধান, ককবরক ব্যাকরণ, আদিবাসী জীবনের ডায়েরী? মোঙ্গলিনী স্ত্রী ফুলকুমারী কি আমাকে এতো তাড়াতাড়ি ছাড়বেন ? শেষ জীবনে না আমাদের বিয়ের সেই মাটির ঘরে থাকার কথা ?

সমাপ্ত

ব্যক্তি পরিচিতি

অখিল দেববর্মা ঃ সি. পি. আই নেতা। ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর টাকারজলার আমতলী গ্রামে আমার বন্ধু শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ও আমি ১৯৬৭ সালের জুনে ককবরক ভাষার গবেষণা কাজের তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। অখিলবাবু এই গবেষণার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। বর্তমানে অখিলবাবুর ছেলে-মেয়েরা বেশিরভাগ খ্রীষ্টান।

অগ্নি আচার্য ঃ ত্রিপুরা সরকারের পাব্লিসিটি ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন অফিসার। অগ্নি আচার্য একজন সুলেখক হিসেবে খ্যাত।

অঘোর দেববর্মা ঃ ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধাপুরুষ। 'ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ'-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্য থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (অবিভক্ত সি. পি. আই)-এর প্রথম সদস্য। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক কমরেড পি. সি. জোশী অঘোর দেববর্মার হাতে পার্টি সদস্যের লালকার্ড তুলে দেন ১৯৪৮ সালে। ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ও বিধানসভার পরপর চারবার সদস্য নির্বাচিত হন চড়িলাম থেকে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে তিনি বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হন। পার্টির দীর্ঘজীবনে তিনি ছিলেন কমরেড দশরথ দেববর্মার প্রতিদ্বন্দ্বী। উভয়ের মধ্যে কৌশল ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তীব্র মতপার্থক্য ছিলো। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে এই মতপার্থক্য আরও তীব্র হয়। ১৯৬৪ সনে সি. পি. আই বিভক্ত হবার পর তিনি সি. পি. আই-এর রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং বেশ ক'বছর ধরে জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। অঘোর দেববর্মা ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক দুর্ধর্ষ বিতর্কিত নেতা। ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট আন্দোলন করার জন্যে তিনি বারবার কারাবরণ করেন। একসময় সরকারের কাছে তাঁর মাথাও বিক্রি হয়েছিলো। অঘোর দেববর্মার লিখিত বইগুলিও বিতর্কিত; তাঁর বিতর্কিত বইগুলির নাম ঃ (১) ত্রিপুরার দাঙ্গা একটি পর্যালোচনা; (২) ত্রিপুরার কমিউনিস্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর; (৩) বিগত কংগ্রেস আমলে এবং সি. পি. আই (এম)-এর গত ১০ বছর শাসনে ত্রিপুরার উপজাতিদের অবস্থা; (৪) জনশিক্ষা সমিতির ইতিকথা; (৫) ইনার লাইনের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও চালু হচ্ছে না কেন? (৬) On the Fundamental Reasons of Origin of Extremism in Tripura and the Steps to Solve this Problem.

অঙ্কুর কর্তা ঃ অঙ্কুর দেববর্মণ। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁর পিতা কিরণ কর্তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বার্মাফ্রন্টে যুদ্ধ করে খুব নাম করেছিলেন। পরে একসময় আগরতলায় কামানে অগ্নিসংযোগ করার সময় অ্যাকসিডেন্ট করে মারা যান। অঙ্কুর কর্তা গায়ক শচীন কর্তা (শচীন দেববর্মণ)'র আপন ভ্রাতুষ্পুত্র। কৃতী গায়ক ও মননশীল পাঠক হিসেবে অঙ্কুরবাবুর নাম আছে। বর্তমান ঠিকানা আগরতলার ওল্ড কালীবাড়ি লেন।

অঙ্কুর গুপ্ত ঃ ত্রিপুরার বিখ্যাত নাট্যকার কমল রায়চৌধুরীর ছদ্মনাথ। এই নামে তিনি পত্র-পত্রিকায় মননশীল রাজনৈতিক ও সমাজ সচেতনমূলক প্রবন্ধ লিখে থাকেন নিয়মিতভাবে। পেশায় শিক্ষক। অঙ্কুর গুপ্তর বাড়ি খোয়াই শহরে।

অজয় ঘোষ ঃ সি. পি. আই পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। তিনি ছিলেন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির শেষ সাধারণ সম্পাদক।

অজয় রায় ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পি. এ। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক জে. বি. গাঙ্গুলীর সময় থেকেই তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

অজয়বাবু ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পি. এ অজয় রায়।

অজয় সিনহা ঃ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার প্রাক্তন ডি. এম।

অজিত দাশ ঃ ডাঃ অজিত দাশ। আগরতলার জি বি হাসপাতালের বিশিষ্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ। ঠিকানা প্যালেস কম্পাউন্ড, ওয়েস্ট গেট, আগরতলা।

অজিতবন্ধু দেববর্মা ঃ অজিতবন্ধু দেববর্মা আগরতলা ঠাকুর লোক সমাজের একটি অতি পরিচিত নাম। ককবরক ভাষার পুস্তক প্রণেতা হিসেবে তাঁর পরিচয় সর্বাধিক। চেরাই সুরুংমা বাকসা, চেরাই সুরুংমা বাগনুই — তাঁর শিশুপাঠ্য এই বই দু'খানি খুব জনপ্রিয়। তাছাড়া 'কক রবাম' নামে তিনি ককবরক ভাষায় একখানি মূল্যবান অভিধান লিখে গেছেন। তিনি ককবরকে রূপকথাও সংগ্রহ করে ছাপিয়ে ছিলেন বলে জানা যায়। 'ত্রিপুর সংহতি বা ত্রিপুরা সংহতি' নামে তিনি একখানি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। সম্পর্কে অজিতবন্ধু লালু কর্তা (মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর)'র জামাই। অজিতবন্ধুর পুত্র প্রিয়বন্ধু দেববর্মা আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে ককবরক ভাষায় খবর পড়তেন। এডভাইজার চৌমুহনীতে অজিতবন্ধু দেববর্মার বাড়ি।

অজিতবাবু ঃ অজিতবাবু কলকাতা ত্রিপুরাভবন (প্রিটোরিয়া স্ট্রীট)-এর ট্যুরিজিম ডিপার্টমেন্টের কর্মী। বাড়ি মেদিনীপুর। আগরতলায় বিমান-যাত্রীদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন তিনি।

অঞ্জলি চক্রবর্তী ঃ অধ্যাপিকা অঞ্জলি চক্রবর্তী, মহারাজ বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা। বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও

বিশেষ করে নারীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপিকা চক্রবর্তী। সুলেখিকা ও সুবক্তা হিসেবে তাঁর নাম আছে।

অঞ্জলি চ্যাটার্জী : আগরতলা পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলর। সম্পর্কে অধ্যাপিকা করবী দেববর্মণের ভ্রাতৃবধূ — কুশল দেববর্মণের স্ত্রী।

অঞ্জলি রূপিনী : অঞ্জলি রূপিনী চম্পকনগরের কাছে চন্দ্র সাধুপাড়ার উপজাতীয় পরিবারের মহিলা।

অঞ্জু মগ : ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন এম. এল. এ। মনু-বঙ্কুলের বর্ষীয়ান জনপ্রিয় মগ নেতা। দক্ষিণ ত্রিপুরার উপজাতি-বাঙালীর কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য নেতা তিনি। তাঁর নিজের তৈরী একটা মগ বাজার আছে মনুবঙ্কুলে। দো-অঙ মগ চৌধুরীর পুত্র অঞ্জুবাবু দক্ষিণ ত্রিপুরার বিশেষ বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। অঞ্জু মগের পরিবারে বাদশাহী খানাপিনার প্রচলন আছে। তাঁর দালান বাড়িতে অতিথিদের সদা আগমন লক্ষণীয়। অঞ্জু মগের চালচলন অনেকটা মগ রাজার মতো।

অণুপতি : শ্রীমতী অণুপতি দেববর্মা : চড়িলামের কাছে দক্ষিণ ধারিয়াথলের প্রয়াত লালু দেববর্মার স্ত্রী এবং জগৎ কপ্রার পুত্রবধূ। রূপলাবণ্যের জন্যে তাঁর একসময় খুব খ্যাতি ছিলো। বিয়ের পরেও তাঁকে খুব সাবধানে থাকতে হতো। যৌবনে রূপের জন্যে প্রাক্-বিবাহ পর্বে একাধিকবার বিপদে পড়তে হয় তাঁকে। সম্পর্কে তিনি আমার জেঠিশাশুড়ী।

অণু কুন্ডু চৌধুরী : আমার মেজদা শ্রীযুক্ত পৃথ্বীরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরীর সেজ মেয়ে।

অতুল দেববর্মা : অতুল দেববর্মার বাড়ি বিশ্রামগঞ্জের কাছে খেঙরাবাড়ি। একসময়কার বিখ্যাত কমিউনিস্ট সংগঠক এবং সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ভাষাবিদ ডঃ সুহাস চ্যাটার্জীর সঙ্গে আমি যখন খেঙরাবাড়িতে ককবরক ভাষার গবেষণা-ক্যাম্প করি, তখন অতুলবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়।

অনঙ্গমোহিনী দেবী : মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের কন্যা। বিখ্যাত মহিলা কবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অনঙ্গমোহিনী ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমবয়সী ছিলেন। অনঙ্গমোহিনীর বিখ্যাত কাব্যের নাম : শোক-গাথা। এই কাব্যের ভূমিকা লিখে দেন সেকালের বিখ্যাত কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি 'শোক-গাথা' কাব্য লেখেন। কাব্যের 'নিবেদন' অংশে অনঙ্গমোহিনী লিখেছেন, 'শোক-গাথা' আমার জীবনের ঘোর বিষাদময়ী ঘটনার ও দীর্ণ হৃদয়ের নিদর্শন মাত্র।'

অনন্ত : অনন্ত বর্মণ। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির বিশিষ্ট কর্মী। বাড়ি উত্তরবঙ্গে কুচবিহারে, জাতিতে রাজবংশী।

অনন্ত দাস : আসামের শোয়ালকুছি গ্রামের রেশম উৎপাদন সমিতির সদস্য।

অনন্ত দেববর্মা : ত্রিপুরার টি. এন. ভি (ত্রিপুরা ন্যাশন্যাল ভলিন্টিয়ার) নেতা এবং বিজয় রাঙ্খলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। অনন্তবাবু একাধিকবার বিধানসভা ও স্বশাসিত জেলা পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

অনিতা দেববর্মা : আগরতলার বিজয়কুমার চৌমুহনীতে বাড়ি। পিতার নাম ভগবান ঠাকুর। তিনি রাজভাতা পেয়ে থাকেন। তাঁর সম্পর্কিত এক পিসির মহারাজের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো। তাঁর স্বামী নান্টু দেবরায় বাঙালী। তাঁর একই মেয়ে ডাক নাম মুক্কু। মুক্কু এখন কালো কোট গায়ে দিয়ে আগরতলা কোর্টে ওকালতি করে। চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্যে অনিতা দেববর্মাকে পাড়ার সব ভয় পায়। তিনি খুবই স্পষ্টবাদিনী। শ্রীমতী দেববর্মার বাড়িতে আমি সপরিবার অনেক দিন ভাড়া ছিলাম।

অনিন্দিতা দাশগুপ্ত : ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী।

অনিরুদ্ধ দাশ : সি. পি. আই (এম) পার্টির তাত্ত্বিক সমর্থক। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের ব্যক্তিগত সহায়ক ছিলেন চাকুরী জীবনে। বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিং ছিলেন তাঁর আপন ভগ্নীপতি। অনিরুদ্ধবাবুর কাছ থেকে বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক তথ্য জানা যায়। তাঁর অরুন্ধতীনগর বাড়িতে এখনো বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র একতা আসে।

অনিল কৃষ্ণ : ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মা। আগরতলা উজিরবাড়ির অতি সম্মানিত ব্যক্তি। বিখ্যাত সংগীত শিল্পী। নিজের হাতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করতে পারতেন অনিল কৃষ্ণ ঠাকুর। তিনি নতুন কিছু রাগিনীর সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর নামে উজিরবাড়িতে এখনো একটা সংগীত ঘরণা আছে। বিবাহ সূত্রে তিনি লালসিংমোড়া-আমতলীর গোপাল ঠাকুরের দ্বিতীয় জামাই। অনিল কৃষ্ণ ঠাকুরের চার পুত্র : সলিল কৃষ্ণ দেববর্মা, উৎপল কৃষ্ণ দেববর্মা, প্রাঞ্জল কৃষ্ণ দেববর্মা ও ধবল কৃষ্ণ দেববর্মা। সলিল কৃষ্ণ ছিলেন ত্রিপুরার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, তিনি কবিও ছিলেন। উৎপল কৃষ্ণের এসরাজবাদক হিসেবে খুব নাম ছিলো। প্রাঞ্জল কৃষ্ণ তাঁর বাঁশ-বেতের শিল্পকর্মের জন্যে ভারত বিখ্যাত। ধবল কৃষ্ণ ত্রিপুরার বিখ্যাত লেখক ও সংস্কৃতিজগতের পুরোধা পুরুষ। অনিল কৃষ্ণের বড়ো মেয়ে উমা দেববর্মা। আর ছোট মেয়ে সুরমা হলেন ভারত সোভিয়েত মৈত্রী সমতির ত্রিপুরা শাখার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত হরিহর সাহার স্ত্রী।

অনিল দেববর্মা : অনিল দেববর্মার বাড়ি কৃষ্ণনগরের পদ্মপুকুরে। তিনি হলেন যোগেন্দ্র ক্যাপ্টেনের ছেলে। যোগেন্দ্র ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মাফ্রন্টে খুব নাম করেছিলেন। মহারাজা বীরবিক্রম তাঁকে খুব পছন্দ করতেন।

অনিলবাবুর কাছ থেকে জানা যায় যে তাঁর পিতার শ্রাদ্ধবাসরে স্বয়ং মহারাজা বীরবিক্রম উপস্থিত ছিলেন। অনিলবাবুর ভগ্নীপতি হলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মনোমোহন দেববর্মা।

অনিল দেববর্মা ঃ চড়িলামের কাছে হেরমাবাজারের চায়ের দোকানের মালিক। গৌর কপ্‌রা পাড়ার প্রয়াত নীলমণি দেববর্মার ছোট ছেলে তিনি। অনিলবাবুর কাছ থেকে জানা যায় একবার ত্রিপুরার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি (সি. পি. আই) উপজাতিদের মধ্যে বিড়ি বিক্রি বন্ধ করে দেয়ার জন্যে ফরমান জারি করে। আর তখন থেকেই তাঁর বাবা নীলমণিবাবু জীবনে কোনদিন বিড়ি খাননি। অনিলবাবুর বাবার একটা দোকান ছিলো তাঁর নিজের বাড়িতেই।

অনিল সরকার ঃ বর্তমানে ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী। সি. পি. আই (এম) পার্টির বর্ষীয়ান তাত্ত্বিক নেতা। সুবক্তা। তাঁর শহরের বিদগ্ধ সমাজে যেমন বক্তৃতা করবার জাদুকরী ক্ষমতা আছে তেমনি ক্ষমতা আছে গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করার। গ্রামের মানুষদের মধ্যে একটা কথা চালু আছে। অনিল সরকার বক্তৃতা করতে করতে মাটির সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি 'বন্ধুগণ তুলসী গাছ না লাগিয়ে বেগুন গাছ লাগান' গ্রামাঞ্চলের লোকদের মুখে মুখে ফেরে এখনো। বেদের ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী শূদ্রজাগরণী সত্তার জন্যে অনিল সরকার ত্রিপুরায় অতি বিতর্কিত নেতা। ত্রিপুরার সমগ্র শূদ্র সমাজকে সম্মানের আসনে বসানোর জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। এবং এই কাজে তিনি বেছে নিয়েছেন বাবা সাহেব ডক্টর আম্বেদকরের দর্শন বা চিন্তাধারা। তিনি মার্ক্সবাদের সঙ্গে আম্বেদকর-দর্শনের মিলন ঘটিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্ত করতে চান। ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার এম. এ পাশ করেছেন বাঙলায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ত্রিপুরায় কবি ও ছড়াকার হিসেবে সংস্কৃতি জগতে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। জীবনমুখী ছড়া লিখতে তিনি সিদ্ধহস্ত। অপরাজিতা রায় তাঁকে ত্রিপুরার সর্বশ্রেষ্ঠ ছড়াকার হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর কবিসত্তা কাজ করে দলিতদের নিয়ে। এই জন্যে অনিল সরকারকে দলিত কবি বলা হয় ত্রিপুরায়। তাঁর একাধিক জনপ্রিয় কবিতার বই বেরিয়েছে। হীরাসিং হরিজন তাঁর অতি বিখ্যাত একটি কবিতা। এই কবিতার ককবরক ভাষায় অনুবাদ করেছেন কবি নন্দকুমার দেববর্মা। দলিত সাহিত্য বলে একটা স্বতন্ত্র সাহিত্য ধারার প্রবর্তন করেছেন তিনি ত্রিপুরায় তাঁর সহোযোদ্ধা কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে। দলিত সাহিত্য চর্চার জন্যে তিনি সম্প্রতি দিল্লী থেকে ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে কবি অনিল সরকারকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় তা একটা সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

অনুপ কুমার ঘোষ ঃ মেঘালয়ের NEPA (North-East Police Academy)'র প্রতিবন্ধী পুলিশ কর্মী। তিনি ত্রিপুরার লোক।

অনুপ ভট্টাচার্য ঃ ত্রিপুরার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তাঁর জনপ্রিয় দু'খানি গল্পসঙ্কলন ঃ 'পাখি ও পালক' এবং 'ছবিমানুষ'। এ. জি অফিসের কর্মী অনুপবাবু থাকেন ইন্দ্রনগরের জগৎপুরে।

অনুপমা সিনহা ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ভাষাতত্ত্বের মণিপুরী ছাত্রী। অনুপমা সিনহার বাড়ি কমলপুরের হালাহালিতে।

অনুরাধা ঃ অনুরাধা দেববর্মা। মহিম কর্ণেলের নাতিন্নী। কন্যা রেণুকাপ্রভা ও জামাই সীতানাথ সিংহরায়ের মেয়ে।

অন্নপ্রসাদ জমাতিয়া ঃ তাঁকে দিয়ে প্রয়াত সতীশ বণিক ককবরক ভাষায় গীতার অনুবাদ করিয়ে নেন। অন্নপ্রসাদ ত্রিপুরা বিধানসভার একজন পুলিশকর্মী।

অপর্ণাদি ঃ অপর্ণা দেব। সাহিত্যিক অপর্ণা দেবের বোন। প্রখ্যাত সমাজসেবিকা। মেলাঘরের কাছে লক্ষ্মণঢেপার মরশুম উপজাতিদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ করতেন তিনি।

অপরাজিতা রায় ঃ ত্রিপুরার প্রখ্যাত লেখিকা। একাধারে কবি, প্রবন্ধকার ও ছোটগল্প লেখিকা পত্রিকায় তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধ বইয়ের প্রশংসামূলক রিভিউ বেরিয়েছিলো। আগরতলার সাহিত্যের আসরে অপরাজিতা রায় একজন অপরিহার্য বক্তা। তাঁর বক্তৃতা বা সমালোচনা শুনতে পাঠকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। কর্মজীবনে শিক্ষিকা ছিলেন। পরে বিদ্যালয় শিক্ষাধিকর্তা হন। প্রাক্-বিবাহজীবনে অপরাজিতা রায়ের পদবী ছিলো মুখোপাধ্যায়। তাঁর এক দাদা মোহনলাল মুখার্জী আসামে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি (সি. পি. আই)'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অপরাজিতা রায় একসময় গৌহাটী থেকে আগরতলায় এসেছিলেন।

অপু ঃ অপু দেববর্মা। সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার বড়ো মেয়ে। স্বামী নিবিড়বরণ চক্রবর্তী সি. পি. আই (এম) পার্টির কর্মী। অপু সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়। সে ভালো সেতার বাজাতে পারতো। বি. এ পাশ করেছিলো সে।

অবনী কর ঃ অবনী কর ত্রিপুরার ফরওয়ার্ড ব্লকের বর্ষীয়ান নেতা।

অবনী মজুমদার ঃ ডাঃ অবনী মজুমদার। ডাঃ মজুমদার আগরতলার জি. বি. হাসপাতালের প্রাক্তন চিকিৎসক। রাজ্যের এই কৃতী চিকিৎসক বর্তমানে দিল্লী প্রবাসী। আগরতলা মেলারমাঠে সি. পি. আই (এম) অফিসের পাশেই তাঁর বাড়ি ছিলো।

অভিজিত মজুমদার ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের তরুণ অধ্যাপক। বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ পরেশ চন্দ্র

মজুমদারের পুত্র।

অমরবাবু : অমর সাহা। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন বিল্ডিঙের কর্মী। তাঁর একটা ক্যানটীন আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফদের জন্যে।

অমর সিং : ত্রিপুরা সরকারের প্রাক্তন এডিশনাল চিফ সেক্রেটারী। তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় শচীন্দ্রলাল সিংহ ও সুখময় সেনগুপ্তের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁর পদাবনতি হয়। দক্ষ প্রশাসক হিসেবে সুখ্যাতি ছিলো তাঁর। অমর সিং ছিলেন কৈলাসহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের শিক্ষিত পরিবার হিসেবে অমর সিংহের পরিবারের সুখ্যাতি ছিলো।

অমরেন্দ্র দেববর্মা : বিজয় কুমার পাঠশালার মহেন্দ্র মাস্টারের পুত্র। তিনি ত্রিপুরা সরকারের পুলিশ বিভাগে চাকুরী করতেন। ডি. এস. পি হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণনগরের প্রতাপ রায় রোডে তাঁর বাড়ি। ভালো শিকারী হিসেবে তাঁর নাম আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের শিকারের কাহিনী শুনতে হলে তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া দরকার। অবসর গ্রহণের পর অমরেন্দ্রবাবু প্রতাপ রায় রোডে একটা মুদিখানার দোকান দিয়েছেন এবং বেশ ক'বছর ধরে টিকে আছে দোকানটা। তাঁর দোকানে তিনি বেজি পোষেন।

অমলেন্দু গাঙ্গুলী : বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্তের সহকর্মী। পান্নালাল দাশগুপ্ত ১৯৬৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে Hills People Seminar করেছিলেন, সেই সেমিনারে আগত পার্বত্য নেতাদের আতিথ্যের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তিনি আমার বন্ধু অধ্যাপক কমলেন্দু গাঙ্গুলীর মেজদা। পূর্ব নিবাস ঢাকা। পিতার নাম সুধেন্দু গাঙ্গুলী। সুধেন্দু গাঙ্গুলী হাইস্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন এবং স্বদেশী হিসেবে চরখায় সুতো কাটতেন। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীদের পরিচিত ছিলেন সুধেন্দুবাবু।

অমিত চৌধুরী : সি. পি. আই নেতা কমরেড মোহন চৌধুরীর কনিষ্ঠপুত্র। সি. পি. আই-এর যুবকর্মী। গ্রাম সুতারমোড়া।

অমিতবাবু : জি. বি. হাসপাতালের ক্লার্ক। মেডিকেল বিল 'রিএমবার্সমেন্ট-এর কাজ করেন।

অমিত বাবু : অমিত রায়। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাশ সেকশনের কর্মী।

অমিতা দেববর্মা : অমিতা দেববর্মার বাড়ি কৃষ্ণনগরের প্রতাপ রায় রোডে। পি. ডব্লিউ. ডি অফিসের এস্টেট সেকশনে কাজ করেন তিনি।

অমিতাভ কর : অমিতাভবাবু ত্রিপুরা সরকারের পুলিশ বিভাগে চাকুরী করেন। বর্তমানে এস. পি ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার হিসেবে তাঁর নাম আছে। অমিতাভ কর কবিতাও লেখেন। বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি করের খুড়তুতো ভাই তিনি।

অমিতাভ সিনহা : ডঃ অমিতাভ সিনহা। বর্তমানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান। বিশিষ্ট ছাত্রদরদী শিক্ষক। অর্থনীতি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধকার। ত্রিপুরার উপজাতীয় অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিশ্লেষক। তিনি Delhi School of Economics-এ নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনের ছাত্র। তাঁর পিতা অমর সিং ত্রিপুরা সরকারের এডিশন্যাল চীফ সেক্রেটারী ছিলেন। আগরতলার কুঞ্জবনে বাড়ি। মহারাজকুমারী কমলপ্রভার প্রতিবেশী।

অমিতেশ কর : দৈনিক সংবাদের বিশিষ্ট সাংবাদিক মৃণালকান্তি করের খুড়তুতো ভাই।

অমিয় কিসকু : অধ্যাপক অমিয় কিসকু। কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্নেহভাজন সাঁওতাল নেতা প্রিন্সিপাল কিসকু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন।

অমিয় চক্রবর্তী : কবি অমিয় চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত সচিব। একসময় কবি অমিয় চক্রবর্তী শান্তিনিকেতনের পীয়র্সনপল্লীতে থাকতেন।

অমিয় দেববর্মা : ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য। সজ্জন, অমায়িক ও পরোপকারী হিসেবে শ্রীযুক্ত দেববর্মার নাম আছে। লেখায়ও অমিয়বাবুর হাত আছে। সাহিত্যেরও তিনি একজন সুপাঠক।

অমিয় বালা : সম্পর্কে আমার দাদাশ্বশুর কামিনী ঠাকুর (দেববর্মা)-এর ছোট মেয়ে। সম্পর্কে আমারও পিসি শাশুড়ী। অমিয়বালা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে খ্রীষ্টান স্বামী গ্রহণ করেন একই গ্রামে। সেই স্বামী সম্পর্কে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, নাতিও বটে।

অমূল্য শর্মা : বিশিষ্ট সি. পি. আই নেতা। সাংবাদিক ও সাহসী লেখক। অমূল্য শর্মা আগে চড়িলামে থাকতেন। বর্তমানে থাকেন আগরতলার উপকণ্ঠে আড়ালিয়ায়।

অম্লান দত্ত : অধ্যাপক অম্লান দত্ত। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর 'On Democracy' বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

অরুণ কর্তা : ত্রিপুরার রাজপরিবারের রাজপুত্র। খুব মেজাজী কর্তা হিসেবে নাম ছিলো তাঁর। গান্ধীঘাটের বর্তমান

পাব্লিসিটি অফিসের প্রাক্তন মালিক। সম্ভবত তিনি ছিলেন মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের পুত্র।

অরুণ কুমার বসু ঃ অধ্যাপক অরুণ কুমার বসু। বঙ্গবাসী কলেজ ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। আমার কলেজ জীবনের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক। তিনিই আমাকে এম. এ-তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব পড়তে পাঠান। বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে পড়াতে আসেন। আগরতলার রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্র সংগীতের বিশেষজ্ঞ পরীক্ষক হিসেবে তাঁকে মাঝে মধ্যে আসতে হয়।

অরুণ দেববর্মা ঃ ত্রিপুরা সরকারের ট্রাইবেল রিসার্চ)' এর গবেষক কর্মী। অরুণ দেববর্মা খুব তীক্ষ্ণধী ও মেধাবী উপজাতি যুবক। তাঁর স্মৃতিশক্তি ঈর্ষণীয়। ত্রিপুরার রাজাদের অতীত ইতিহাসের খুঁটিনাটি ঘটনা, সাল-তারিখ তাঁর মুখস্থ। মহারাজা কিরীট বিক্রম ও মহারাজ কুমার সহদেব বিক্রমের কাছে তাঁর অবারিতদ্বার। রাজবাড়ির পুরোনো দিনের বিচিত্র রকমের তথ্য জানা তাঁর একপ্রকার নেশার মতো। ইতিমধ্যে রাজবাড়ি সম্পর্কিত তাঁর কিছু লেখা গবেষকদের খুব কাজে লাগছে। ককবরক ভাষা শিক্ষারও বই লিখেছেন তিনি যুগ্মভাবে। অরুণ দেববর্মার বাড়ি জিরানীয়া, মোহনপুরের উপজাতি জনপদে। আশির মহা জাতিদাঙ্গায় তাঁদের বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার সর্বস্বান্ত হয়। সাম্প্রতিক জাতিদাঙ্গায়ও আরেকবার তাঁরা একেবারে নিঃস্ব হয়েছেন। এখন তাঁদের পরিবারকে ক্যাম্পের জীবন কাটাতে হয়। তাঁদের পরিবারের লোকেরা নিরাপত্তার অভাবে এখনো বাড়ির পোড়া ভিটেতে ফিরতে পারেননি। তাঁর বাবার নাম রাণা দেববর্মা। উপজাতিদের মধ্যে বিত্তশালী হিসেবে রাণা দেববর্মার নাম আছে।

অরুণ দেববর্মা ঃ ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন ডেপুটি চীফ অফিসার পরশুরাম দেববর্মার ভাগ্নে। বাবার নাম পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা, স্কুল শিক্ষক।

অরুণ ভৌমিক ঃ জনতা দলের নেতা। তিনি আগরতলা কোর্টের একজন জনপ্রিয় এডভোকেট। শ্রীযুক্ত ভৌমিক একজন সুবক্তাও বটে।

অরুণোদয় সাহা ঃ অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা। বর্তমানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের 'প্রফেসর'। ছাত্র হিসেবে তিনি খুব মেধাবী ছিলেন। প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় তিনি স্ট্যান্ড করেছিলেন বলে জানা যায়। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অর্থনীতি নিয়ে পড়েন। পরে আমেরিকায় যান উচ্চ শিক্ষার্থে এবং সেখানে ডক্টরেট করেন। অর্থনীতিবিদের বাইরে অধ্যাপক সাহার আরো একটা পরিচয় আছে। তিনি একজন লেখক। ত্রিপুরার জনপ্রিয় কথা-শিল্পীদের অন্যতম। কড়চা লেখায় ত্রিপুরায় তাঁর জুড়ী নেই। তাঁর লেখা 'চলার পথে' 'দৈনিক সংবাদ'-এ ধারাবাহিকভাবে বেরিয়ে বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। 'দেজ' প্রকাশিত 'চলার পথে' খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। বর্তমানে তিনি 'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর' নামে ত্রিপুরার প্রাক্তন মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যকে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে 'দৈনিক সংবাদে' উপন্যাস লিখে চলেছেন। ত্রিপুরার রাজবাড়িকেন্দ্রিক বর্তমান লেখা ইতিমধ্যেই নাম করেছে। তবে কিছু চরিত্র অঙ্কনের ব্যাপারে আগরতলার ঠাকুর মহিমচন্দ্র কর্ণেলের পরিবার থেকে মৃদু সমালোচনাও এসেছে। অরুণোদয়বাবুদের পরিবার বিশালগড়ের।

অরুন্ধতী রায় ঃ ডঃ অরুন্ধতী রায়। ত্রিপুরার রূপকথার প্রখ্যাত গবেষক। তিনি তাঁর রূপকথার ওপর অতি আধুনিক আঙ্গিকে ডক্টরেট করেছেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদের কাছে। তাঁর লেখা গবেষণামূলক রূপকথার বই সুধীসমাজে খুব নাম করেছে। তিনি সুকবি ও লেখকও বটে। তাবৎ পৃথিবীর প্রায় হারিয়ে যাওয়া উপজাতিদের নিয়ে তিনি কয়েকশত লেখা লিখে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। আগরতলার কান-নাক-গলার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ পি রায়ের স্ত্রী তিনি।

অলিভা কুমকুম দাস ঃ কলকাতা পুরসভার চেতলা কেন্দ্রের পি. পি. আই-এর প্রার্থী।

অশেষ দেববর্মণ ঃ ককবরক ভাষার লেখ্যরূপের অন্যতম রূপকার ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মার প্রপৌত্র এবং যোগেশ ঠাকুর (দেববর্মণ)-এর কৃতী ইঞ্জিনীয়ার পুত্র। লেখিকা শ্রীমতী করবী দেববর্মণের আপন ছোট ভাই অশেষবাবু। শ্রীযুক্ত দেববর্মণ বর্তমানে থাকেন প্যালেস কম্পাউন্ডের ওয়েস্ট গেটে মহারাজকুমার সহদেব বিক্রমের বাড়ির কাছে। অশেষবাবুর বড়ো ছেলে আমেরিকায় থাকেন।

অশোক চ্যাটার্জী ঃ অধ্যাপক অশোক চ্যাটার্জী। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অতিথি অধ্যাপিকা। (বর্তমানে) ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী শিপ্রা [illegible]য়ের রিসার্চ গাইড। থাকেন কলকাতার সল্টলেকের করুণাময়ীতে।

অশ্বিনী দেববর্মা ঃ অশ্বিনী দেববর্মার বাড়ি বিশ্রামগঞ্জের কাছে খেওরাবাড়িতে। একসময়ে সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। বর্তমানে সি. পি. এম কর্মী। অশ্বিনীবাবু ককবরক ভাষার সুগায়ক। খেওরাবাড়িতে ১৯৬৮ সালে আমার পূজনীয় অধ্যাপক ভাষাবিদ ডঃ সুহাস চ্যাটার্জীর সঙ্গে যখন ককবরক ভাষার গবেষণার কাজ করি তখন অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয় আমার।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙলা সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অসিত চক্রবর্তী : সি. পি. আই (এম-এল)-এর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক।

অসিত বাবু : ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক।

অসীমা দেববর্মা : ডেপুটি ডাইরেক্টর, সোস্যাল এজুকেশন, ত্রিপুরা সরকার। প্রয়াত চিত্রশিল্পী হৃষীকেশ দেববর্মা (হৃষীকেশ কর্তা)'র স্ত্রী। সম্পর্কে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেশরথ দেবর বৈবাহিকা। শ্রীমতী দেববর্মা আগরতলার কর্ণেল বাড়ির মেয়ে। অসীমা দেবী ক'বছর আগে বিশ্বনারী সম্মেলনে চীনে গিয়েছিলেন।

আতিকুল ইসলাম : সি. পি. আই পার্টির বিখ্যাত নেতা। ত্রিপুরার বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক। তিনি বেশিরভাগ সময় সোনামোড়া থেকে বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। ১৯৬৭ সালে তিনি আগরতলার কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পরে ১৯৮০ সালের কিছু আগে তিনি ত্রিপুরা ত্যাগ করে পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। আতিকুল ইসলামের পিতা আরমান আলী মুন্সী ছিলেন আগরতলার কোর্টের আইনজীবী। তিনি একবার রাজ্যসভার সদস্য হিসেবেও নির্বাচিত হন। আতিকুল ইসলামদের বাড়ি ছিলো ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনী সংলগ্ন জায়গায় — ১নং রামনগর রোডে।

আদিত্য কর্তা : মহারাজ কুমার আদিত্য কিশোর দেববর্মণ। আদিত্য কর্তা ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের পুত্র। হেমন্ত কর্তা ও চন্দ্রমা কর্তা ছিলেন তাঁর ভাই। তিনি মহারাজার নিজস্ব সেনাবাহিনী (স্পেশাল রয়েল ফোর্স)'র ক্যাপ্টেন পদে থেকে মহারাজার সিকিউরিটি হিসেবে থাকতেন। প্যালেস থেকে বেরিয়ে তিনি বুদ্ধমন্দিরের কাছে এক সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করে সেখানে থাকতেন। পরে ওই বাড়ি ত্রিপুরা সরকারের কাছে বিক্রি করে দেন অর্থনৈতিক দুরবস্থা কাটাতে। পরে সেখানে বি এইড কলেজ হয়। পরে আদিত্য কর্তা তাঁর মূল বাড়ির পশ্চিম দিকে নক্ষত্র কর্তার বাড়িটি কিনে সেখানে চলে যান। আদিত্য কর্তার অপর ভাই চন্দ্রমা কর্তা প্রথম জীবনে ত্রিপুরা রাইফেলস-এর ক্যাপ্টেন ছিলেন। রাজতন্ত্রের পতনের পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং কর্ণেলের পদ অলঙ্কৃত করেন। আগরতলার কাটাখালের পারে বর্তমান হিন্দী স্কুলটাই ছিলো চন্দ্রমা কর্তার বাড়ি। পরে কর্তা আগরতলা ত্যাগ করে দিল্লীতে বসতি স্থাপন করেন।

আনন্দমোহন শঙ্খনিধি : জহর আচার্যের রাজেন্দ্র কীর্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতা থেকে আগত যোগদানকারী প্রতিনিধি।

আনন্দ জমাতিয়া : আনন্দ জমাতিয়ার সঙ্গে ১৯৬৭ সালে বগাফা আশ্রম বিদ্যালয়ে আমার সঙ্গে পরিচয়। আমরা ওই বিদ্যালয়ে ককবরক ভাষা ক্যাম্প করেছিলাম। তিনি তাঁর জমাতিয়া উপভাষার তথ্য দিয়ে আমার বন্ধু শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ও আমাকে সাহায্য করেছিলেন। ককবরকের সুগায়ক আনন্দ জমাতিয়ার বাড়ি উদয়পুরের কাছে মহারাণীতে। মহারাণীতে আমরা চরণ জমাতিয়ার বাড়িতে জমাতিয়া ভাষার ওপর কাজ করেছিলাম।

আনন্দ ঠাকুর : সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার শ্বশুর নলিনী ঠাকুরের ঠাকুরদার নাম হলো আনন্দ ঠাকুর। যোগেন্দ্রনগরের কাছে আনন্দনগর গ্রামটি এই আনন্দ ঠাকুরের নামেই হয়েছে। আনন্দ ঠাকুরের বাড়ি আগরতলার মধ্য বনমালীপুরে। তাঁর বংশধরেরা এখন সেখানে বসবাস করছেন।

আফিফ ফোয়াদ : কলকাতার প্রখ্যাত লেখক ও লেখক-সংগঠক। 'দিবারাত্রির কাব্য' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে সাধন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল ভট্টাচার্য, দীপক দেব প্রমুখ সাহিত্যিক পরিবৃত হয়ে প্রচন্ড আড্ডা জমান সপ্তায় দু'বার। ফোয়াদ সাহেব আগরতলার বইমেলায় বার দুয়েক এসেছেন এবং আমার বাসায় এসেও চা খেয়েছেন।

আভা বর্মণ রায় : অধ্যাপিকা আভা বর্মণ রায়। শ্রীমতী বর্মণ রায় আগরতলার মহিলা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর গবেষণাধর্মী মন আছে। আগরতলার শঙ্কর চৌমুহনীর কাছে তাঁর বাড়ি।

আম্রপলী : আম্রপলী মগ। দক্ষিণ ত্রিপুরার মগ অধ্যুষিত কলসী গ্রামের শ্রীযুক্ত বাসু মগের স্ত্রী। বাসু মগ ও তাঁর স্ত্রীর সযত্ন আতিথ্যে একাধিকবার আমি গবেষণার কাজে তাঁদের বাড়িতে থেকেছি। ভগবান বুদ্ধের আরাধনার ঘরে আমাকে রাখতেন তাঁরা। বুদ্ধের মূর্তির পাশে শয্যা নিতাম আমি।

আয়াব : আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রাম হেরমার যোগেন্দ্র দেববর্মার পুত্র রমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্মার ডাক নাম। এই নাম রাখেন তাঁর দিদিমা তখিতী দেববর্মা। এই অদ্ভুত নামটির ব্যুৎপত্তি হলো নায়েব থেকে। তখিতী দেববর্মাদের বাড়িতে এক নয়েব থাকতেন। ভদ্রমহিলা নায়েব শব্দটিকে আয়াব বলে উচ্চারণ করতেন। এবং পরবর্তীকালে তাঁর নাতির নাম রাখেন আয়াব।

আয়ুব খাঁ : ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ। তিনি ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত পাকিস্তানের মিলিটারী শাসক ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মার্শাল ল জারি করেন।

আয়ুব দা : বর্তমান বইয়ের লেখক কুমুদ কুন্ডু চৌধুরীর কলেজ জীবনের ডাক নাম আয়ুব। আয়ুব খাঁর দেশ থেকে আশায় আমার কলেজ জীবনের বন্ধু অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের ছেলে অরূপ আমার এই অদ্ভুত নাম দেয়। বন্ধুবর স্বপন সেই সূত্রে আমাকে আয়ুব বলেই ডাকে। স্বপনের স্ত্রী আমাকে আয়ুবদা বলেই ডেকে থাকেন।

আরতি হোড় : আমার আপন মামাতো বোন। আমার মেজোমামা প্রয়াত নলিনী পালের কন্যা। স্বামীর নাম নির্মল চন্দ্র

হোড়। বর্তমান নিবাস ন'পাড়া বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ।

আলতাফ হোসেন ঃ ন্যাফ (মোজাফ্ফর গোষ্ঠী)-এর প্রথম সারির নেতা। বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময় অগ্নি কন্যা মতিয়া চৌধুরী ও তাঁকে নিয়ে গিয়ে চড়িলামে বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে মিটিং করেছিলাম। সুন্দর চেহারার মধ্যবয়সী আলতাফ হোসেন সাহেবের মাথায় সুন্দর টাক ছিলো।

আলপনা সিনহা ঃ অধ্যাপিকা আলপনা সিনহা। মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপিকা শ্রীমতী সিনহা একাধিক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। ত্রিপুরা ক্রেতা সংরক্ষণ সমিতির নেত্রী। All India Council for Mass Education and Development (AICMED)'এর ত্রিপুরার শাখার সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। আলপনা সিনহা এক ভাই কমিউনিস্ট পার্টি করতে গিয়ে বহুবার জেল খেটেছেন।

আলী ঃ আলী মিঞা। সি. পি. আই পার্টির দক্ষিণ চড়িলামের কর্মী। দক্ষিণ চড়িলাম গাঁওসভার আদিবাসী মুসলমান পাড়ায় বাড়ি। তাঁর বৃদ্ধা মা পাশের ট্রাইবেল গ্রামগুলোতে ঝুড়িতে করে তামাকের টিক্কা বিক্রি করতেন।

আশাবুদ্দিন সাহেব ঃ চড়িলামের আড়ালিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তি। পূর্বে বাড়ি ছিলো বিশালগড়ের চন্দ্রনগরে। বিখ্যাত গো-ব্যবসায়ী তাঁর পরিবার। পাহাড়ের উপজাতি এলাকা থেকে গোরু কিনে চড়িলাম, মেলাঘর প্রভৃতি গোরুর বাজারে বিক্রি করা তাদের পরিবারের কাজ। আশাবুদ্দিন সাহেব আমার শ্বশুর মশায় গণেশ চন্দ্র দেববর্মার ধর্ম বন্ধু এবং সেই সূত্রে আমি তাঁর জামাই।

আশিস দাস ঃ কবি আশিস দাস। তাঁর বিখ্যাত কবিতার বইয়ের নাম — 'সামনে কুরুক্ষেত্র আবার।' পেশায় ইংরেজীর শিক্ষক। নিবাস অরুন্ধতীনগর হাইস্কুলের পাশে। কমরেড বীরেন দত্তর দাদা জিতু দত্তর জামাই। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সদালাপী এই প্রতিভাবান কবির অকাল প্রয়াণ হয়েছে।

আশিস বর্দ্ধন ঃ লেখক। তাঁর লেখা বই পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে।

ইন্দুঠাকুর ঃ পিতার নাম ঠাকুর শারদাচরণ দেববর্মা। শারদাচরণ বিয়ে করেছিলেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের কন্যা।

রাজবাড়ি খাস সেরেস্তাদার ছিলেন (মহারাজ বীরবিক্রমের আমলে — বীরেন্দ্র কিশোর থেকে কেরানী — বীরবিক্রমের সময় খাস সেরেস্তাদার)।

পুরোনো বাড়ি ঃ বনমালীপুর পাওয়ার হাউসের ৮ কানি জমির ওপর। ভূতের ভয়ে পূর্ব বাড়ি ছেড়ে বনমালীপুর রামঠাকুর আশ্রমের পাশে গোপাল দে কন্ট্রাক্টারের বাড়িটা খরিদ করেন — সাড়ে ৩ কানি বাড়ি।

পাওয়ার হাউস ছেড়ে বিদুরকর্তা চৌমুহনী সংলগ্ন রাজার (সরকারী) কোয়ার্টারে স্বল্পকালীন অবস্থান। গোপাল কন্ট্রাক্টারের বাড়ি বিক্রি করে বীরবিক্রমের সময় অভয়নগরে বৃদ্ধ দেববর্মাদের বাড়িসহ সাড়ে ৩ কানি জমির ওপর বাড়ি করেন। পরে ওই বাড়িও বিক্রি হয়।

ইন্দু ঠাকুরের ৯ বোন। ইন্দুঠাকুর একা ভাই। আগরতলার ঠাকুর কর্তা পরিবারে তাদের বিয়ে হয়।

শারদাচরণ ঠাকুর ছিলেন রাজার আমলে খাস আদালতের জজ।

ইন্দু ঠাকুর ভালো ইংরেজী জানতেন। রাজার নির্দেশে তিনি হিটলারের কাছে চিঠি ড্রাফ্‌ট করেন এবং সেই চিঠিই হিটলারের কাছে পাঠিয়ে দেন।

ইন্দু ঠাকুরের ৫ ছেলে ১ মেয়ে।

ছেলেরা ঃ হেমন্ত দেববর্মা, হরিশচন্দ্র দেববর্মা, হীরালাল দেববর্মা, অজয় দেববর্মা ও শশাঙ্ক দেববর্মা। মেয়ে ঃ অনুরাধা দেববর্মা — ছেলেমেয়েরা সবাই বেঁচে আছেন।

ঠাকুর শারদাচরণের বাবা হলেন চন্ডীচরণ ঠাকুর। পাওয়ার হাউসের বাড়িতে থাকতেন। চাকরি করতেন রাজবাড়িতে মহারাজ বীরচন্দ্রের সময়ে।

মৃত্যু ঃ ভাগ্নে বীরচন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতেই ইন্দু ঠাকুর মারা যান।

ইন্দুঠাকুর থিয়েটার করতেন ও ভালো ছবি আঁকতেন। শ্বশুর ঃ গোপাল ঠাকুর। গোপাল ঠাকুরের বড়ো মেয়ে বিয়েকে করেছিলেন তিনি। ৫ মেয়ে ছিল গোপাল ঠাকুরের। উজির বাড়ির অনিল কৃষ্ণ ঠাকুর মেজো মেয়ে বিয়ে করেছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধী ঃ জহরলাল নেহরুর কন্যা। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

ইলা মিত্র ঃ সি. পি. আই-এর বিশিষ্ট নেত্রী। তাঁকে লেনিন দুহিতা বলে অভিহিত করা হয়। তিনি সাঁতার দিয়ে পদ্মা পেরিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে আসেন বলে জনশ্রুতি। ভারতবর্ষের মহিলা প্রতিনিধি হিসেবে এশিয়ান গেমসে যোগদান করেন। আমার কাছের মানুষ।

ইনু ঃ ইনু কুন্ডু চৌধুরী। আমার মেজদা শ্রীযুক্ত পৃথ্বীরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরীর ছোট মেয়ে।

ইলা দাশগুপ্ত ঃ সি. পি. আই-এর গণসংগঠন ভারতের মহিলা ফেডারেশনের নেত্রী। প্রয়াত শিক্ষক ননী দাশগুপ্তর স্ত্রী।

ইন্দু ঠাকুর ঃ বিখ্যাত এডভোকেট বীরন্দ্র দেববর্মার মামা।

ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ ঃ সি. পি. আই (এম)-এর সর্বভারতীয় প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। বিশিষ্ট তাত্ত্বিক মার্ক্সবাদী নেতা। পার্টি বিভাজনের আগে তিনি ১৯৫৭ সালে সি. পি. আই-এর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কেরলা রাজ্যের।

ইলাদি ঃ সি. পি. আই নেত্রী ইলা মিত্র।

ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা ঃ সম্পর্কে অনুরূপা মুখার্জী (দেববর্মা)'র মামাতো ভাই। কৃষ্ণনগর রোড, এডভাইজার চৌমুহনী, আগরতলা।

ইয়াহিয়া খান ঃ ফিল্ড মর্শাল আয়ুব খাঁর পরে তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁর সময়েই সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাঙলাদেশের জন্ম হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

উদিতা সেনগুপ্ত ঃ কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ। প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী নীলিমা সেন সম্পর্কে তার দিদিমা।

উয়াখিরাই ঠাকুর ঃ উমাকান্ত একাডেমীর উপজাতি ছাত্রদের নতুন ত্রিপুরা বোর্ডিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও অভিভাবক। বংশী ঠাকুর এই বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন। উয়াখিরাই ঠাকুরের বাড়ি ছিলো গোলাঘাটির পেকুয়াজলায়।

উমেশ দেববর্মা ঃ চন্ডী ঠাকুরের ছেলে, চন্ডী ঠাকুর পাড়া, চড়িলাম।

উত্তরা ঃ উত্তরা দেববর্মা রামনগরের মাস্টার ননীগোপাল দেববর্মার স্ত্রীর আগের পক্ষের বাঙালী স্বামীর কন্যা। ননীগোপালবাবু সম্পর্কে আমার সম্বন্ধী।

উৎপল কুমার ঃ উৎপল কুমার দেববর্মা। আমার শালী ছায়ারাণীর বড়ো ছেলে। গৌরকপরা পাড়া, বাঁশতলী, চড়িলাম।

উপেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা ঃ ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগ (বিদ্যালয়)-এর উপ অধিকর্তা। পাহাড় ত্রিপুরার সর্বপ্রথম এম. এ পাশ করা ব্যক্তি।

উদয় জমাদার ঃ উদয় দেববর্মা, টাকারজলার খুব গণ্যমান্য ব্যক্তি। তার নামে উদয় জমাদার পাড়া।

উ. থান্ট ঃ বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল (প্রথম দিকে)।

ঊষা গাঙ্গুলী ঃঅধ্যাপিকা ঊষা গাঙ্গুলী, 'রঙ্গকর্মী'র নামকরা অভিনেত্রী। আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বান্ধবী। বন্ধুবর অধ্যাপক কমলেন্দু গাঙ্গুলীর স্ত্রী।

ঊষারাণী ঃ ঊষারাণী দেববর্মা, ককবরক লেখক হরিপদ দেববর্মার স্ত্রী, নাজির বাড়ি। ঊষা সম্পর্কে আমার মামাতো বোন পরিমলদির বড় মেয়ে। তার বাবা চড়িলামের রামনগরের ডাকসাইটে সি. পি. এম নেতা।

ঋতুপর্ণা ঃ ঋতুপর্ণা চক্রবর্তী। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের ছাত্রী।

এইচ এ গ্লিসন ঃ এইচ এ গ্লিসন (জুনিয়র)। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের প্রাক্তন অধ্যাপক। তাঁর বিখ্যাত বইয়ের নাম ঃ An Introdution to Descriptive Linguistics. আমার পূজনীয় অধ্যাপক ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের ভাষাতত্ত্বের শিক্ষক।

এস আর দেববর্মা ঃ ডাঃ এস আর দেববর্মা (সত্যরঞ্জন দেববর্মা)। আগরতলা শহরের জনপ্রিয় চিকিৎসক। জি বি হাসপাতালের বিখ্যাত প্যাথলজিষ্ট। কলকাতার Troptrical school. Dr. N. Sen-এর অধীনে প্যাথলজির ওপর ডিগ্রি নিয়েছেন। আগরতলার এডভাইজার চৌমুহনীতে তার একটি প্যাথলজিক্যাল ইন্সিস্টিটিউ আছে। সদালাপী নিষ্ঠাবান ডাক্তার।

এন সি দেববর্মা ঃ আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের অধিকর্তা। এন সি দেববর্মার আসল নাম নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। তিনি ককবরকভাষী উপজাতিদের মধ্যে একজন বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী। একাধারে কবি ও লেখক, ককবরকের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকও বটে। তিনি তাঁর মাতৃভাষা ককবরকে রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্য অনুবাদ করেছেন। ককবরক ককলাম তাঁর একখানি ককবরক শিক্ষার বিখ্যাত বই।

এস পি মজুমদার ঃ ডাঃ এস পি মজুমদার, সুপারিনটেন্ডেন্ট, জি বি হাসপাতাল।

এম এল সাহা ঃ ডাঃ এম এল সাহা, আগরতলা শহরের একজন প্রথিতযশা প্রসূতি বিশেষজ্ঞ। কর্ণেল চৌমুহনী ও বিদুর কর্তা চৌমুহনীর মাঝখানে নন্দলাল কর্তার বাড়ির পাশে তাঁর প্রখ্যাত সাহা নার্সিং হোম।

এম আর সিদ্দিকী ঃ বাঙলাদেশের স্বাধীনতার সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এম পি।

এল ডার্লঙ ঃ লেনথুয়া ডার্লঙ। গ্রাম উত্তর ত্রিপুরার দারছই। বর্তমানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি কন্ট্রোলার।

এল এম মুখার্জী ঃ ডঃ এল এম মুখার্জী, অধ্যাপক, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়।

ওয়াই ডি পান্ডে ঃ অধ্যাপক যমুনা ধর পান্ডে, প্রাক্তন উপাচার্য, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়।

ওয়াখিরাই ঃ ওয়াখিরাই দেববর্মা, হেরমাবাড়ি, চড়িলাম। আমার কাকাশ্বশুর হরিচরণ দেববর্মার ছেলে।

ওয়াঙখেম বীরমঙ্গল ঃ মণিপুরী ভাষার প্রখ্যাত লেখক, বাড়ি ধলেশ্বর। ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের সক্রিয় কর্মী।

কমলকুমারী দেববর্মণ ঃ মহারাজ কুমারী কমলপ্রভা। রাজকুমারী কমলপ্রভা হলেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরের কন্যা এবং মহারাজা বীরবিক্রমের ছোট বোন। বিবাহসূত্রে তিনি ননী কর্তা (রমেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ)'র দ্বিতীয়া স্ত্রী।

কমলপ্রভার গুণের শেষ নেই, যেমন সুন্দরী তেমনি গুণী। ত্রিপুরার বাঁশজাত আধুনিক ডিজাইনের তিনি স্রষ্টা। পাহাড়ী তাঁতে বিভিন্ন নয়নমনোহার ডিজাইন তিনিই সৃষ্টি করেন। রাজকুমারী একজন চিত্রশিল্পীও সুলেখিকাও বটে। তাঁর লেখা 'খেলাঘর' ত্রিপুরার রাজঅন্দর নিয়ে লেখা একখানা মূল্যবান বই। তাঁর নিজস্ব একটা মন্দির আছে — কিশোরীলাল মন্দির।

কমলেন্দু গাঙ্গুলী ঃ অধ্যাপক কমলেন্দু গাঙ্গুলী। একসময়কার বি. পি. এস. এফ-এর ডাইসাইটে ছাত্রনেতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সম্পাদক। ৬৬'র খাদ্য আদোলনে জেলে যান। বর্তমানে সি. পি. আই. পার্টির তাত্ত্বিক নেতা এবং একজন জনপ্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন লিডার।

ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন সাংমা ঃ ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন সাংমা ছিলেন মেঘালয় রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৬৬ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত 'হিলস পিপল সেমিনার' এ আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার।

ক্ষেম্পাহা রিয়াঙ ঃ ক্ষেম্পাহা রিয়াঙের বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরার বগাফা ব্লকে। ১৯৬৭ সালের জুনে আমরা যখন ককবরকের রিয়াঙ উপভাষার ওপর গবেষণা করি তিনি তখন আমাদেরকে ভাষার কাজে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। সম্পর্কে তিনি সি. পি. এম নেতা বাজুবন রিয়াঙের পিসেমশায়।

কুম্ভরাম রিয়াঙ ঃ কুম্ভরাম রিয়াঙের বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোড়ার কাছে পূর্ব চড়কবাই গ্রামে। তিনি আমাকে রিয়াঙ উপভাষার কাজে তাঁদের গ্রামে তথ্য সরবরাহ করেছিলেন।

কার্ত্তিককুমার দেববর্মা ঃ কার্ত্তিক কুমার দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের কাছে নতুন লেম্বুখল গ্রামে। তিনি ছিলেন অবিভক্ত সি. পি. আই পার্টির আঞ্চলিক কমিটির প্রভাবশালী সেক্রেটারী এবং সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তাদের গ্রামে তাঁরই তত্ত্বাবধানে ককবরক ভাষার গবেষণার কাজ হয়। এই গবেষণা কাজের সময় আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায় এক সপ্তাহ এই গ্রামে ছিলেন। এবং আগরতলার অরুন্ধতীনগরের মিশনেরর তদানীন্তন প্রধান বি কে স্মিথ সাহেব ডঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে এসে দেখা করেন এবং ককবরকের হরফ নিয়ে আলোচনা করেন।

করবী দেববর্মণ ঃ অধ্যাপিকা করবী দেববর্মণ। তিনি আগরতলার মহিলা কলেজ (উইমেনস্ কলেজে) -এর প্রাক্তন অধ্যক্ষা। একাধারে কবি ও লেখিকা। একজন উচ্চমানের প্রবন্ধকার হিসেবেও তাঁর খ্যাতি আছে। তিনি আগরতলার নতুন প্রজন্মের কবি-লেখকদের প্রেরণাদাত্রী। তাঁকে একটা ইন্সস্টিটিউশন বলা যায়। শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক সেমিনারে তাঁর বাগ্মিতা সকলকে মোহিত করে তোলে। তিনি ককবরক ভাষার লিখিত রূপের অন্যতম রূপকার ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মণের প্রোপৌত্রী এবং যোগেশ ঠাকুরের কন্যা। তাঁর স্বামী ডাঃ নীলমণি দেববর্মা ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের একজন অন্যতম স্থপতি। বর্তমানে করবী ম্যাডাম বিজয় কুমার চৌমুহনীর 'নীল-করবী' বাসভবনে থাকেন। তাঁর পাঁচখানা কবিতার বই বেরিয়েছে এ পর্যন্ত। বইগুলোর নাম - লুণ্ঠিত সময় সীতা, মেরুদন্ড দাও, কবিতা আমার সময় অসময়, কিছু স্বগতোক্তি ঃ কিছু ব্যক্তিগত সংলাপ ও সৃজনে উৎসবে।

কল্যাণবিজয় জমাতিয়া ঃ কল্যাণ বিজয় জমাতিয়া শিলঙের নেহু (NEHU) থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ পাশ করে প্রথমে কমলপুর কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার হিসেবে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি ডেপুটি রেজিস্ট্রার। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। জমাতিয়া সাহেব খুব বিনয়ী ও নম্র। বর্তমানে তিনি জমাতিয়া সমাজের ওপর গবেষণা করছেন তাঁর পি. এইচ. ডি থিসিসের জন্যে। তাঁর এই থিসিসের নাম ঃ The Jamatias of Tripura : A Historical Study.

কামিনী দেববর্মা ঃ কামিনী দেববর্মার বাড়ি হেরমা গ্রামে। সম্পর্কে আমার দাদাশ্বশুর। উমাকান্ত স্কুলের পড়াশুনো সেরে তিনি তহশিলে কাছারীর মুহুরীর কাজে যোগ দেন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের আগ মুহূর্তে মাত্র আট আনা পয়সা ঘুষ নেয়ার অভিযোগে তাঁর চাকরি চলে যায়। এই ঘটনা ত্রিপুরায় নজীরবিহীন। কামিনীবাবু একজন অত্যন্ত দক্ষ শিকারী ছিলেন। চড়িলামের জঙ্গল থেকে তিনি শত শত হরিণ, বনশূকর ও বন মোরগ শিকার করেছেন। তার ৫টি শিকারী কুকুর ছিলো।

কার্ত্তিক কুমার দেববর্মা ঃ কার্ত্তিক কুমার দেববর্মার বাড়ি হেরমায়। আমার বড়শালীর ছেলে। তার বাবার নাম চিকন্দ্রী ও মায়ের নাম শেফালী। কার্ত্তিক কুমার তরুণ বয়েসেই খ্রীষ্টান হয়ে গেছে।

কৃষ্ণকান্ত দেববর্মা ঃ আমার শালী ছায়ারাণীর স্বামী। পিতা চিকন্দ্রী দেববর্মা, গৌরকপরাপাড়া, বাঁশতলী। পেশায় বিদ্যালয় শিক্ষক।

কৃপারাণী ঃ কৃপারাণী দেববর্মা। একসময়ের জনপ্রিয় নেত্রী ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি পার্টির। বর্তমানে আই. পি. এফ. টি করেন। তিনি ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য হরিনাথ দেববর্মার স্ত্রী। কৃপারাণী ত্রিপুরী তাঁতে নানারকম ডিজাইন তুলতে পারেন। ককবরক রূপকথা বলার জন্যে তাঁর খ্যাতি আছে।

কমল কুমার সিংহ ঃ ডঃ কমলকুমার সিংহ। ডঃ কমল কুমার সিংহ বর্তমানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের সিনিয়র রিডার। তিনি একাধিক গ্রন্থের লেখক। দলিত সাহিত্য ধারার তিনি ত্রিপুরায় কবি অনিল সরকারের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী। দলিতদের নিয়ে সাহিত্য চর্চা করায় তিনি ইতিমধ্যে বাবা সাহেব আম্বেদকর পুরস্কারও পেয়েছেন। ডঃ কমলকুমার সিংহের বিচিত্র জীবন। খুব গরীবের সন্তান তিনি। তাঁর মা-বাবা শ্রমিক ছিলেন। শোনা যায় তাঁর মা পথে বসে শ্রমিক হিসেবে

রাস্তায় ইঁট ভাঙতেন। আপন প্রতিভার বলে তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ও বাসনা চক্রবর্তীর চোখে পড়েন। তাঁরাই তাঁকে মানুষ করেন। একসময় তিনি সি. এফ. ডি প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ান। 'জনপদ' নামে একটি জনপ্রিয় সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন তিনি।

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী ঃ কল্যাণব্রত চক্রবর্তীর আসল নাম সত্যব্রত চক্রবর্তী। সত্যব্রত চক্রবর্তী স্টেটসম্যান পত্রিকার ত্রিপুরা রাজ্যের করেসপণ্ডেন্ট। কবি হিসেবে তিনি কল্যাণব্রত চক্রবর্তী নামে পরিচিত। একাধিক কবিতার বই আছে তাঁর। কবি কল্যাণব্রত শুধু কবি নন, কবি সংগঠকও। ত্রিপুরায় সাহিত্য- সংস্কৃতি চর্চার তিনি একজন পুরোধা পুরুষ। তাঁকে ঘিরে কবি ও লেখকদের একটা ঘরাণা তৈরী হয়েছে বলা যেতে পারে। সাহিত্যের আসরে সুবক্তা ও সুসমালোচক হিসেব তাঁর খ্যাতি ঈর্ষণীয়। তাঁর কবিতার বই ঃ অন্ধকারে প্রণামের ইচ্ছা হয়, লোকালয়ে উদ্ভাসিত মুখ, নির্বাচিত কবিতা, গঙ্গা-গোমতী (সম্পাদিত কবিতা সংকলন) ইত্যাদি।

কোষা ঃ কোষাচন্দ্র দেববর্মা। কোষাচন্দ্র দেববর্মার বাড়ি হেরমায়। সম্পর্কে আমার দাদাশ্বশুর। তিনি চড়িলামের জঙ্গলে মৃল শিকারী দলে অংশ নিতেন। এবং এর জন্যে তাঁর খ্যাতি আছে।

কাকা সুবল ঃ সুবল দেববর্মা। সুবল দেববর্মা সম্পর্কে আমার কাকা শ্বশুর। বি. এ পাশ। ত্রিপুরা সরকারের কৃষি বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মী। গ্রাম হেরমা। বাবার নাম নরেন্দ্র দেববর্মা।

কাকা চিন্তাহরণ ঃ চিন্তাহরণ জমাতিয়া ঃ গ্রাম হেরমা। ত্রিপুরা সবকারের পুলিশ বিভাগের কর্মী। গ্রামে কৃষি-জমিও আছে। সম্প্রতি তিনি একটা পাওয়ারটিলার কিনেছেন।

কাহামনুক ঃ কাহামনুক জমাতিয়া ঃ ত্রিপুরা প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র জমাতিয়ার পুত্র কাহামনুক এবার কৃতিত্বের সঙ্গে স্কুল ফাইনাল (আই. সি. এস. ই.) পাশ করেছে। ইংরেজী সাহিত্যে তার অনুরাগ লক্ষণীয়।

ক্ষিতি বর্মণ ঃ ক্ষিতি বর্মণ একসময়ে আগরতলায় থাকতেন। তিনি একাধিকাবার বজবজের (পশ্চিমবঙ্গ) এম. এল. এ নির্বাচিত হন সি. পি. আই (এম) পার্টির প্রার্থী হিসেবে। তিনি বিয়ে করেন আগরতলার বংশীঠাকুর (অমরেন্দ্র দেববর্মা — প্রাক্তন এম. পি)- এর মেয়ে গীতা দেববর্মাকে।

কৃষ্ণকর্তা (কৃষ্ণ ঠাকুর) ঃ কৃষ্ণ দেববর্মা ছিলেন লালু কর্তা (মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ)'র জামাই। তিনি ১৯৬৭ সালে চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু সি. পি. আই প্রার্থী অঘোর দেববর্মার কাছে পরাজিত হন।

কানুলাল ধর ঃ ডঃ কানলাল ধর। ডঃ ধর ত্রিপুরা সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের একজন শিক্ষক। তিনি বর্তমানে মহারাজ বীরবিক্রম কলেজের সান্ধ্যবিভাগের অতিথি অধ্যাপক।

কানু সেন ঃ কমরেড কানু সেনের বাড়ি আগরতলার মধ্যপাড়ায়। তিনি আগরতলা শহরের প্রচীনতম কমিউনিস্টদের মধ্যে অন্যতম। সি. পি. আই পার্টি ভাগ হবার পরেও তিনি মূল পার্টিতে থেকে যান। কিন্তু তাঁর মধ্যম ভ্রাতা কমরেড বেণু সেন নতুন পার্টি সি. পি. আই (এম)-এ যোগ দেন। আগরতলা শহরে কমরেড কানু সেন ও বেণু সেনের নাম প্রবাদের মতো লোকের মুখে মুখে ফেরে।

কেশব চক্রবর্তী ঃ কেশব চক্রবর্তীর বাড়ি চড়িলামের পুরানবাড়িতে। তিনি রেশনসপের একজন ডিলার।

ক্যাপ্টেন ঃ সুবোধ দেববর্মার ডাকনাম ক্যাপ্টেন। চড়িলামের কাছে রামনগরের ধনাচরে তার বাড়ি। সি. পি. এম পার্টির মিলিট্যান্ট যুবকর্মী হিসেবে তার খুব নাম। ক্যাপ্টেনের বাবা সুধন দেববর্মা সি. পি. এম পার্টির একজন নামকরা সংগঠক।

ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জী ঃ ক্যাপ্টেন বিভুরঞ্জন চ্যাটার্জী একসময় ভারতীয় আর্মিতে ছিলেন। বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি দক্ষিণ চড়িলামের বিশ হাজার মুক্তিফৌজের ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করেন। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি চড়িলামে খামার বাড়ি করে থেকে যান এবং সেখান থেকে কংগ্রেস পার্টির নেতা হিসেবে কাজ করেন। চড়িলাম থেকে বিধানসভায়ও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

কাননবালা ঃ কাননবালা দেববর্মা, সম্পর্কে আমার শালী। সোসাল এজুকেশন বিভাগের একজন শিক্ষিকা সে। বর্তমানে বিশ্রামগঞ্জ আদিবাসী কলোনীতে বাড়ি করেছে।

কুমারী দেববর্মা ঃ সি. পি. এম এর নারী সমিতির কর্মী। বিশ্রামগঞ্জ কলোনী।

কেশব দেববর্মা ঃ সি. পি. এম কর্মী, গুলিরাই, বিশ্রামগঞ্জ। যুব কর্মী হিসেবে কেশবের বেশ নাম আছে। ভালো বক্তৃতা দিতে পারে সে।

কুলচন্দ্র ঠাকুর ঃ কুলচন্দ্র দেববর্মা, চন্ডীঠাকুরপাড়া, চড়িলাম। কুলচন্দ্র ঠাকুর ছিলেন চন্ডী ঠাকুরের ঘরজামাই। কুলচন্দ্র ঠাকুর আগে ছিলেন আমার শ্বশুরবাড়ি হেরমাতে। সেখান থেকে গিয়ে তিনি চন্ডী ঠাকুরের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরজামাই থাকেন।

কার্ত্তিক দেববর্মা ঃ চন্ডী ঠাকুরপাড়া, চড়িলাম। কার্ত্তিক কুমার দেববর্মা ছিলেন কুলচন্দ্র ঠাকুরের বড় ছেলে ও চন্ডী ঠাকুরের দৌহিত্রী। তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের তাঁর খুব

সম্ভাব ছিলো।

কুঞ্জেশ্বরী দেববর্মা ঃ চন্ডীঠাকুর পাড়ার সুধাংশু দেববর্মার স্ত্রী। তাঁর বাপের বাড়ি বিশ্রামগঞ্জের দেওয়ান ত্রিপুরার বাড়ির কাছে।

কালা মিঞা ঃ সি. পি. আই-এর কর্মী, আড়ালিয়া, চড়িলাম। কালা মিঞার সি. পি. আই পার্টির যুবকর্মী হিসেবে নাম আছে।

কৃষ্ণা ঃ কৃষ্ণা দেববর্মা, ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মেম্বার মানস দেববর্মণের স্ত্রী, হরিশ ঠাকুর রোড, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

কমল চক্রবর্তী ঃ বসন্ত রায় রোডের পুরোনো সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা। কমলবাবুরা আগরতলার রাজ আমলের লোক। তাঁর বাবা কর্ণেল বাড়ির আইনজীবী ছিলেন। ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর খুব নাম ছিলো। বীরেন্দ্র ক্লাবের সদস্য হয়ে পূর্বাঞ্চলের বহু জায়গায় খেলতে যেতেন তিনি। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন আগরতলার ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ভীষণ হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন কমলবাবু। সহৃদয় আলাপচারিতার জন্যে তাঁর খুব খ্যাতি ছিলো।

কিশোর দেববর্মা ঃ প্রয়াত প্রভাত রায়ের পুত্র। ত্রিপুরা সরকারের এস. পি। একসময় ত্রিপুরার রাজ্যপালের এডিকং ছিলেন। কিশোরবাবুর মা হলেন হাসি রায়। কর্ণেল বাড়ির ভেতরেই কিশোরবাবুদের বাড়ি।

কাঙ্গাচাঁদ জমাতিয়া ঃ আর. এস. পি পার্টির কর্মী।

কমলাদি ঃ কমলা সূত্রধব, কমলা সূত্রধরের বাড়ি উত্তর ত্রিপুরার কমলপুরের কাছে হালাহালিতে। একসময় তিনি আগরতলার ক্যাকস্টন প্রিন্টার্স ও অক্ষর প্রকাশনীর কর্মী ছিলেন। বর্তমানে কাজ করছেন ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায়। কর্মদক্ষতার জন্যে কমলা সূত্রধরের খুব খ্যাতি আছে।

কে সি চৌধুরী ঃ সাংবাদিক মহলে কে. সি. চৌধুরী একটি পুরোনো মুখ। চৌদ্দ বছর তিনি ছিলেন ইম্ফলে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে। সেখান থেকে বদলি হয়ে তিনি আসেন শিলঙে। আনন্দবাজার ছাড়াও হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড পত্রিকায়ও তিনি লিখতেন। শিলঙ থেকে তিনি চলে আসেন ত্রিপুরায় আশির দশকে। শেষ জীবনে 'ত্রিপুরা অবজার্ভার'-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় আগরতলায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কেশব ভট্টাচার্য ঃ পি. ডব্লিও. ডি'র সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার। পুরো সাহেবী চালচলনের লোক কেশববাবু। ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে তাঁর বেশ সুনাম আছে। একসময় তিনি আমবাসায় থাকতেন। তখন এক বড়ো ভেড়ার পাল ছিলো তাঁর।

কুমুদ সাহা ঃ একসময়ে খোয়াইয়ে ট্রাইবাল এলাকায় শিক্ষক ছিলেন। সেখানে ককবরক ভাষা শেখেন। একজন ককবরক বিশেষজ্ঞ বলা যায় তাঁকে।

কল্যাণজিৎ সিং ঃ সাংবাদিক, পিতা রাজকুমার কমলজিৎ সিং, মণিপুরী মরুপ পত্রিকার সহ সম্পাদক। মঠ চৌমুহনী, আগরতলা। কল্যাণবাবু মণিপুর থেকে প্রকাশিত Manipur Mail ও প্রজাতন্ত্র পত্রিকার করেসপন্ডেন্ট। তিনি মরুপ পত্রিকার নিউজ এডিটর।

কর্ণকর্তা ঃ মহারাজ কুমার কর্ণকিশোর দেববর্মা। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের পুত্র। মহারাজ কুমারী কমলপ্রভার বড়োভাই। প্যালেস কম্পাউন্ড, আগরতলা।

কৃত্তিবাস চক্রবর্তী ঃ ত্রিপুরার বিশিষ্ট যুব কবি। উত্তর-পূর্ব সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম সংগঠক। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক, কৃষ্ণনগর নতুনপল্লীতে বাড়ি। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ উৎস অন্তহীন পথে, পদচিহ্ন পড়ে আছে একা এবং কিশোর গল্প সংকলন এক কুড়ি এক (যৌথ)। ত্রিপুরায় বাংলা গল্প ঃ চল্লিশ থেকে নব্বই গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক। তিনি 'উত্তরপক্ষ' নামে নিয়মিতভাবে লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন।

কাকা কৃথুঙ ঃ কালীকৃষ্ণ দেববর্মা। সম্পর্কে আমার কাকাশ্বশুর। বাড়ি চড়িলামের হেরমা গ্রামে। তিনি কবিরাজ দয়াল কৃষ্ণ দেববর্মার পৌত্র।

কাকা বারা ঃ হরিচরণ দেববর্মা, পিতা গিরিমণি কপরা, হেরমা বাড়ি, চড়িলাম। সম্পর্কে আমার কাকাশ্বশুর, বিশিষ্ট তবলচী, মৃদঙ্গবাদক ও কীর্তনীয়া।

ক্ষেত্রমণি দেববর্মা ঃ পিতা রামচরণ দেববর্মা। হেরমাবাড়ি, চড়িলাম। সম্পর্কে আমার দাদাশ্বশুর। বিশিষ্ট কৃষক।

ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া ঃ বাঙলাদেশ-স্বাধীনতা সংগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা।

কে পি দত্ত ঃ প্রাক্তন ডাইরেক্টর, পাব্লিসিটি ডিপার্টমেন্ট, ত্রিপুরা সরকার। ইংরিজি ভাষায় পারঙ্গম ব্যক্তি ও বিশিষ্ট সমালোচক।

কমল রায় চৌধুরী ঃ পেশায় শিক্ষিক, বিশিষ্ট রাজনীতিক ভাষ্যকার ও সমালোচক। অঙ্কুর গুপ্ত এই ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখেন।

কে. পি. এস. মেনন ঃ বিশিষ্ট কূটনীতিক। কে. পি. এস. মেনন দীর্ঘ বছর ধরে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ঃ প্রাক্তন বাগেশ্বরী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন উপাচার্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কলাসমালোচক।

ক্ষীরগোপাল কর্তা ঃ শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুকিশোর দেববর্মা, রবীন্দ্র সান্নিধ্যধন্য মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর (লালুকর্তা)-এর পুত্র। প্রাক্তন সচিব ত্রিপুরা বিধানসভা। বিশিষ্ট সমাজসেবী।

কামিনী সরকার ঃ কামিনী সরকার। চড়িলাম পুরোনো বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। এবং চড়িলামের প্রখ্যাত গোরুর বাজারের অংশীদার-মালিক।

কুমুদরঞ্জন দেববর্মা ঃ ককবরক ভাষার বয়োজ্যেষ্ঠ বিশিষ্ট কবি। আগরতলার রাজপরিবারের লোক (কুমিল্লার কর্তা), এডভাইজর চৌমুহনী, আগরতলা।

কালামিঞা ঃ কালামিঞা মাস্টার, ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের কর্মী। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, অফিসার্স কোয়ার্টার লেন, আগরতলা।

কিরীটকর্তা ঃ কিরীট দেববর্মা। দেহসৌষ্ঠবে ত্রিপুরাশ্রী ও হারকিউলিস উপাধিধারী। ভারতশ্রীতে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। রাজ্যের ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন। মায়ের দিক থেকে ত্রিপুরার রাজবাড়ির সঙ্গে আত্মীয়তা।

কুণাল দেববর্মা ঃ অধ্যাপিকা করবী দেববর্মণের ছোট ভাই। যোগেশ ঠাকুরের ছোট ছেলে। রাধামোহন ঠাকুরের প্রপৌত্র। রাধামোহন ঠাকুর সরণী, আগরতলা।

কিরীট দত্ত ঃ আগরতলার এ. জি অফিসের কর্মী। সি. পি. আই পার্টির সমর্থক, বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীযুক্ত মিহির দত্তর ভ্রাতুষ্পুত্র। বিশিষ্ট সমালোচক। রামনগর।

ক্যাপ্টেন পি. সি. রায় ঃ প্রবোধ চন্দ্র রায়। ত্রিপুরার রাজা নক্ষত্র রায়ের বংশধর। প্রতাপ রায়ের পুত্র ও ত্রিপুরার বিশিষ্ট রাজনীতিক প্রভাত রায়ের ভ্রাতা। তিনি ১৯৬৬ সালে বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্ত আয়োজিত 'হিলস্ পিপল সেমিনার' এ ত্রিপুরার প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেই আমার সঙ্গে পরিচয়। ঠিকানা প্রতাপ রায় রোড, কৃষ্ণনগর। তাঁর কিছু অপ্রকাশিত মূল্যবান লেখা আছে তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে। একসময় উপন্যাসও লিখেছেন।

খেলা ঃ খেলা দেববর্মা। স্বামী বিষ্ণু দেববর্মা (শিক্ষক), বিশ্রামগঞ্জ কলোনী। সম্পর্কে আমার জেঠতুতো শালী। ধারিয়াথলের হরিপদ মাস্টারের মেয়ে।

খালেদ মিঞা পলোয়ান ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের আমার ভাষাতত্ত্বের ছাত্র। বাড়ি উদয়পুর।

খালেদ মোশারফ ঃ স্বাধীন বাঙলাদেশের সেনানায়ক। পরবর্তীকালে মুজিবপন্থী হিসেবে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করলে নিহত হন।

খন্দকার মুস্তাক ঃ মুজিব সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্রীকারী।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো ও বিশিষ্ট শিল্পী।

গোবিন্দ মাণিক্য ঃ ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য। রবীন্দ্রনাথ মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য ও তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের কাহিনী অবলম্বনে তাঁর বিসর্জন নাটক ও রাজর্ষি উপন্যাস লেখেন।

গদাধর দেববর্মা ঃ গদাধর দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের ধারিয়াথলে। তিনি মাস্টারি করতেন বলে তাকে গদাধর মাস্টার বলে ডাকা হতো। ত্রিপুরার পাহাড়ের মধ্যে এমন কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক নেতা আমার আর চোখে পড়েনি। কমিউনিস্ট লিটারেচারের বাইরে ও অন্য ধরনের বইও পড়তেন তিনি। কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা সবসময় তাঁর বাড়িতে থাকতেন। গদাধরবাবুর বাবা লালমণি ঠাকুর ছিলেন বৈষ্ণব ও সমাজপতি। একসময় তিনি তাঁর নিজের গ্রামে মদ্যপান নিষেধ করেছিলেন এবং তাঁর নির্দেশে ধারিয়াথলে শূকর পালন করা যেতো না, এমনকি মোরগ-মুরগী ও পোষা যেতো না।

গুরুদাস দাশগুপ্ত ঃ গুরুদাস দাশগুপ্ত সি. পি. আই পার্টির প্রথম সারির নেতা। রাজ্যসভার ডাকসাইটে প্রাক্তন সদস্য। বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নিয়ে পড়ে আছেন।

গিরিমণি কপরা ঃ গিরিমণি দেববর্মার হেরমাবাড়ি, চড়িলাম। গিরিমণি দেববর্মার বাবা বিশ্রামগঞ্জের খেঙরাবাড়ি থেকে হেরমাবাড়ি এসে ঘরজামাই উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন নতুন হেরমাবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা মনা ঠাকুরের জামাই। গিরিমণি দেববর্মা হেরমার একজন ধনী কৃষক ছিলেন। তাঁর জামাই জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য যোগেন্দ্র দেববর্মা।

গৌরী ঃ গৌরী দেববর্মা। আমার বড়শালা বিশ্বকুমারের বড়ো মেয়ে। তার অকালপ্রয়াণ হয়।

গৌরচাঁন ঠাকুর ঃ গৌরচাঁন দেববর্মা। আমার শ্বশুরমশায়ের বাবা। চড়িলাম-বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় তিনি গৌরচাঁন সেক্রেটারী হিসেবে জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন। চড়িলাম-বিশ্রামগঞ্জ ও বিশালগড়ের স্কুল ও উপজাতি ছাত্রদের বোর্ডিং তাঁর নিজের হাতেই গড়া। ওই এলাকায় বাজারঘাটও তিনি অন্যদের সঙ্গে থেকে গড়ে তোলেন। বাঙালী ও উপজাতিদের মধ্যে তিনি ছিলেন মৈত্রীর সেতু। চড়িলাম- বিশ্রামগঞ্জে যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা তাঁর হস্তক্ষেপে মীমাংসা হয়ে যেতো। তিনি সুবক্তাও ছিলেন। ১৯৭২ সনে তিনি চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্দল সদস্য হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন সিং ও প্রাক্তন সি. এফ. ও নরেশ ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মৃত্যুর আগে তিনি

নিজের জমির ওপর হেরমাবাজার প্রতিষ্ঠা করে যান। তাঁর নামে হেরমায় গৌরচাঁন ল্যাম্পস আছে।

গুণমণি ঃ গুণমণি দেববর্মা, আমার মামা শ্বশুর ধলেশ্বরের স্কুলের কাছে বাড়ি। গুণমণি দেববর্মার বাবা ও আমার শাশুড়ীর বাবা দুই ভাই। গুণমণিবাবুদের আগে বাড়ি ছিলো চড়িলামের রামনগরে।

গোপাল ঠাকুর ঃ গোপাল দেববর্মা, আমতলী, লালসিংমোড়া। গোপাল ঠাকুরকে উপজাতিরা পাহাড়ের দ্বিতীয় রাজা বলতেন। ত্রিপুরার রাজবাড়ির সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, সেই সুবাদে রাজাদের সঙ্গেও। তাঁর মতো সুদর্শন পুরুষ পাহাড়ের উপজাতিদের মধ্যে আর নাকি কেউ ছিলেন না। পাহাড়ের জমিদার ছিলেন তিনি। তাঁর প্রায় সব মেয়েদের আগরতলা ঠাকুর কর্তা পরিবারে বিয়ে হয়। তাঁর এক জামাই ছিলেন উজির বাড়ির অনিল কৃষ্ণ ঠাকুর। তাঁর ছোট জামাই সুরেশ দেববর্মা ৪২ সালের ম্যাট্রিকুলেট ও ঘরজামাই।

গোবিন্দ ঃ গোবিন্দ পাল, আমার ছোটদি নীলিমা পালের ছোট ছেলে। পিতার নাম শচীন্দ্র প্রসাদ পাল, অরবিন্দ পল্লী বারাসাত।

গীতা দেববর্মা ঃ আমার পিসতুতো শালী। হেরমার যোগেন্দ্র দেববর্মার বড়ো মেয়ে। গীতার বাড়িতেই বিয়ে হয়েছে ঘরজামাই এনে। তার স্বামীর নাম রেণু দেববর্মা। রেণু দেববর্মার নিজের বাড়ি সুতারমোড়ায়।

গুরুদাস দেববর্মা ঃ বিশ্রামগঞ্জ, বরকুবাড়ি। গুরুদাস বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় খেঙরা বাড়ি ককবরক ভাষার কাজ করার সময়। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির প্রথম দিককার জনপ্রিয় সংগঠক ছিলেন তিনি।

গজভীম নারায়ণ ঃ চন্ডী ঠাকুরের ঠাকুরদাদা, চন্ডিঠাকুর পাড়া, চড়িলাম। তিনি একবার ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে বনে শিকার করতে যান। এবং হাতির দাঁত উপড়িয়ে তার ওপর বসতে দেন। তখন থেকে তাঁর নাম হয় গজভীম নারায়ণ।

গোরা চক্রবর্তী ঃ সি. পি. আই (এম) পার্টির কর্মী, এ ডি সি নির্বাচনে সি. পি. আই প্রার্থী কুঞ্জ দেববর্মার ইলেকশন এজেন্ট।

জি. এন. চ্যাটার্জী ঃ গোবিন্দ নারায়ণ চ্যাটার্জী। জি. এন. চ্যাটার্জী ছিলেন প্রথমে আগরতলার এম. বি. বি. কলেজের প্রিন্সিপাল। তারপর ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকর্তা হন। তাঁর কর্মদক্ষতায় ত্রিপুরায় শিক্ষাজগতের বিশেষভাবে মানোন্নয়ন হয়। ত্রিপুরার শিক্ষানুরাগীরা তাঁর কথা কখনো ভুলতে পারেন না। তাঁর স্ত্রী নীরা চ্যাটার্জীর কথাও এই প্রসঙ্গে এসে যায়। ডঃ চ্যাটার্জী ছিলেন আমার শিক্ষাগুরু ভাষাবিদ ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের আপন ভায়রা ভাই।

গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ঃ গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ছিলেন ত্রিপুরার রাজপন্ডিতের ছেলে। অতীব বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন শ্রুতিধর পুরুষ। বেদ-বেদান্ত সব মুখস্থ বলতে পারতেন তিনি। ইংরেজী ভাষাতেও তাঁর দক্ষতা ছিলো। ত্রিপুরার কংগ্রেস-কমিউনিস্ট সব পার্টির নেতাদের তিনি ছিলেন প্রিয় গঙ্গাদা। তাঁর রসিকতাবোধ প্রবাদের মতো। আগরতলার লোকের মুখে মুখে এখনো ফেরেন গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা।

গণেশ ভৌমিক ঃ গণেশ চন্দ্র ভৌমিক, সি. পি. আই-এর ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, দক্ষিণ চড়িলাম।

গৌতম দাস ঃ গৌতমবাবু সি. পি. আই (এম)-এর রাজ্য পরিষদের সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য। সি. পি. আই (এম)-এর মুখপত্র 'ডেইলী দেশের কথা'রও তিনি সম্পাদক। এছাড়া 'ত্রিপুরা প্রিন্টার্স ও পাব্লিশার্স' (ডেইলী দেশের কথার ছাপাখানা) - এরও ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

গৌরাঙ্গ ঃ গৌরাঙ্গ দেববর্মা, আমার মামাশ্বশুর, ধলেশ্বর স্কুলের পাশে বাড়ি।

গেঁদু মিঞা ঃ রাজ আমলের বিখ্যাত কন্ট্রাক্টর, ধনাঢ্যব্যক্তি। তাঁর নামে আগরতলায় গেঁদু মিয়ার মসজিদ আছে। আগরতলার এয়ারপোর্ট তৈরীর সময় তিনি কন্ট্রাক্টর ছিলেন। রাজ আমলের অন্তিমপর্বে তাঁর গাড়িও ছিলো।

গোবিন্দ রূপিনী ঃ চম্পকনগরের কাছে ভৃগুদাস বাড়ির বিশিষ্ট ব্যক্তি ও তাঁর পুত্র দীনমণি দেববর্মা একজন এম. বি. বি. এস ডাক্তার।

গীতা ঃ গীতা দেববর্মা। আমার বড়ো পিসিশাশুড়ী নলিনী দেববর্মার সেজো মেয়ে। নাম করা তাঁতী। বিয়ে হয়েছে জলাজলা, বক্সনগর। পাহাড়ী তাঁতে সে নানারকম ফোক-ডিজাইন তুলতে পাবে।

গীতা ঃ গীতা দেববর্মা, বনমালীপুরের নলিনী ঠাকুরের মেয়ে। সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার মেজো শালী। দিল্লীতে পড়াকালীন জনৈক মহাজনের সঙ্গে বিয়ে হয়। তিনি কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। তাঁর নাম সুকুমার মহাজন।

গৌরাঙ্গ দেববর্মা ঃ সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার শ্বশুর নলিনী ঠাকুরের মেজো ছেলে। তিনি ত্রিপুরার সি. পি. আই পার্টির গঠনকালের কর্মী। গৌরাঙ্গ বাবু নৃপেন চক্রবর্তীকে তাঁদের বনমালীপুরের বাড়ি থেকে তাঁর শ্বশুর বাড়ি দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় পৌঁছে দিয়ে আন্ডার গ্রাউন্ডে নিয়ে যান।

গিরিজা সুন্দরী ঃ গিরিজা সুন্দরী দেববর্মা, সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার দিদিশাশুড়ী। নলিনী ঠাকুরের শাশুড়ী মা। অঘোর দেববর্মার স্ত্রী দুলালী দেববর্মার দিদিমা।

গোলক চন্দ্র ঠাকুর ঃ গোলকচন্দ্র দেববর্মা ঃ আগরতলা পুরোনো কালীবাড়ির যামানী ঠাকুরের বাবা এবং মাধুরী দেববর্মণের ঠাকুরদা। গোলকচন্দ্র ঠাকুর মহারাজ বীরবিক্রম ও তাঁর পিতৃদেব মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের খুব প্রিয়পাত্র

ছিলেন। ত্রিপুরা সেন্সাস বিবরণীতে আলাদাভাবে জনৈক ভদ্রলোকের যে ছবি আছে, তা গোলকচন্দ্র ঠাকুরের। মহারাজ কুমার সহদেব বিক্রমের কাছে আগরতলার এই প্রাচিন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ছবি আছে মহারাজ বীরবিক্রমের পাশে। সেই ছবির একপাশে গোলকচন্দ্র ঠাকুর ও অন্যপাশে বিশিষ্ট শিল্পী উজির বাড়ির অনিলকৃষ্ণ ঠাকুরের ছবি রয়েছে। এই গোলকচন্দ্র ঠাকুরের আপন ভাগ্নে ছিলেন হেরমার মনা ঠাকুর। যাঁর নামে হেরেমার মরশুম উপজাতীয় গ্রামের নাম হয়েছে মনাঠাকুর পাড়া। হেরমা গ্রামে পূর্বে মরশুম উপজাতিরা থাকতেন।

গিরিশ কর্তা ঃ গিরিশ দেববর্মা। মহারাজ রাধাকিশোরের বড়োভাই লেবুকর্তার ছেলে।

গৌরাঙ্গ সাহা ঃ কৃষ্ণনগর প্রতাপ রায় রোডের সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা এবং বিখ্যাত ব্যবসায়ী, উষা কোম্পানী (উষা পাখা)'র প্রখ্যাত এজেন্ট। এবং সেই সূত্রে তিনি একাধিকবার বিদেশ ভ্রমণে গেছেন।

গোবিন্দ রায় ঃ ত্রিপুরার রাজা মহারাজ নক্ষত্র রায়ের বংশধর, প্রভাত রায়ের ছোট ভাই ও প্রতাপ রায়ের পুত্র। বর্তমানে প্রগতি রোডের বাসিন্দা। তিনি প্রথমে ত্রিপুরা পুলিশের কমান্ডান্ট ছিলেন, পরে ডি. আই. জি হন। প্রথম জীবনে ভারত স্বাধীন হবার আগে নেভিতে চাকুরী করেছেন। একসময় আর্মির ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি আগরতলার ঠাকুর কর্তা পরিবারের অন্য তথ্য জানেন।

গোপাল দেববর্মা ঃ হেরমাবাড়ির গৌরচাঁন ঠাকুরের ছেলে। আমার ছোট শ্বশুর। তিনি গোলাঘাটীর আসরাম সর্দারের মেয়েকে বিয়ে করে সেখানে ঘরজামাই হিসেবে থাকাকালীন অতিবিক্ত মদ্যপানে অকালে মারা যান। তিনি প্রথমে ত্রিপুরা সরকারের ফরেষ্ট বিভাগে চাকুরী করেন পরে ত্রিপুরা হ্যান্ডলুম ও হ্যান্ডিক্রাফ্টস কর্পোরেশনে ঢোকেন এবং চাকুরীরত অবস্থায় মারা যান। তাঁর ডাক নাম ছিলো চশমা। ভালো ছবি আঁকতেন তিনি। তাঁর ইংরেজী ও বাংলা হাতের লেখা ছিলো মুক্তোর মতো।

গৌতম বসু ঃ ডাঃ গৌতম বসু। আগরতলার জি. বি. হাসপাতালের বিশিষ্ট অস্থিবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি প্যালেস কম্পাউন্ডে ধ্রুব কর্তার বাড়ি আমার সহভাড়াটে ছিলেন। একদিন রাতে আমার হার্ট ব্লক হয়ে যাওয়ায় তিনি আমাকে জি. বি. হাসপাতালের ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে ধ্রুব কর্তার বাড়ির গেটের সঙ্গে তাঁর চেম্বার। তিনি অল্প বয়সে টাকারজলা হাসপাতালে ছিলেন। সেখানে থাকতেই তিনি ত্রিপুরার উপজাতিদের ভাষা ককবরক আয়ত্ত করেন।

গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী ঃ ডাঃ গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী। আগরতলার বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক। আগরতলার আফিস লেনে তাঁর স্থায়ী চেম্বার। চোখের ছানি অপারেশনে তিনি বিশেষ পারঙ্গম। তাঁর পিতা ডাঃ ফণী চক্রবর্তী দীর্ঘদিন চড়িলাম দাতব্য চিকিৎসালয়ের জনপ্রিয় ডাক্তার ছিলেন। ফণীবাবু ছিলেন সত্যিকারের উপজাতি দরদী ডাক্তার। চড়িলামের উপজাতি এলাকায় অনেক ধর্মপুত্র ও কন্যা আছে। তাঁর রঙমালার বাদু দেববর্মা তাঁর একজন ধর্মপুত্র।

গণচৌধুরী ঃ ডাঃ গণচৌধুরী, জি. বি. হাসপাতালের বহুমূত্রের নামকরা চিকিৎসক।

গীতাদি ঃ বন্ধুবর স্বপন বসুর বাড়ির কাজের লোক। ১১৫/এ, বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলি ২৯

গোবিন্দ চক্রবর্তী ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসেবা পরিষদের কর্ণধার অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী মশায়ের সহকর্মী ও বন্ধু।

গুরুপদ বাগচি ঃ সি. পি. আই (এম)-এর নেতা। তিনি বালিগঞ্জের কাছে কসবাবাজারে আততায়ীর গুলীতে নিহত হন।

গোবিন্দ কুন্ডু চৌধুরী ঃ আমার জেঠতুতো দাদা হিমাংশু কুন্ডু চৌধুরীর ছোট ছেলে। বেলঘরিয়ার কাছে এম. বি. রোডে বাড়ি। কারখানার কর্মী ও শ্রমিক নেতা।

চরণ জমাতিয়া ঃ মহারাণী, অমরপুর। তাঁর বাড়িতে ১৯৬৭ সালের জুনে ককবরক উন্নয়ন পরিষদের তত্ত্বাবধানে ককবরক ভাষার গবেষণা হয় জমাতিয়া উপভাষার ওপর। সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মা গাড়ি করে আমার বন্ধু শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ও আমাকে সেখানে নিয়ে যান। চরণ জমাতিয়া ও তাঁর এলাকার জনসাধারণ আমাদের ভাষার কাজে খুব সাহায্য করেন।

চন্দ্রকুমার দেববর্মা ঃ খেঙরাবাড়ি, বিশ্রামগঞ্জ। এঁর বাড়িতেই ককবরক উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগে প্রথমে ককবরক ভাষা গবেষণার কাজ হয়। এই ভাষা ক্যাম্পে প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ আমার শিক্ষক ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। ভাষা ক্যাম্পের আয়োজক ছিলেন সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মা।

চাঁদলক্ষ্মী দেবী ঃ চাঁদলক্ষ্মী দেববর্মা, হেরমাবাড়ির যোগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী। আমি ককবরক গবেষণার কাজে যোগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে প্রায় এক বছর ছিলাম। তখন চাঁদলক্ষ্মী দেবীর তত্ত্বাবধানে থাকতাম আমি। তিনিই আমাকে ককবরক বলতে শিখিয়েছিলেন। তাঁকে আমি মাসিমা বলে ডাকতাম। এই মাসিমাই আমার উপজাতি সমাজে বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন।

চিন্ময় রায় ঃ আগরতলার প্রখ্যাত শিল্পী। আগরতলার আর্ট কলেজে তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের আর্ট কলেজের ছাত্র। শিল্পী নন্দলাল বসু, ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের সান্নিধ্যে আসেন

তিনি। নন্দলাল বসুর সংকারে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। বর্তমান নিবাস ডিমসাগর, আগরতলা, ত্রিপুরা।

চিকন্ত্রী দেববর্মা ঃ হেরমাবাড়ি, চড়িলাম। সম্পর্কে আমার বড় ভায়রাভাই। বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক ও কীর্তনগায়ক। অন্যদিকে কবিয়াল ও কবিরাজ।

চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং ঃ ত্রিপুরার ককবরক ভাষার প্রখ্যাত কবি। তিনিই সর্বপ্রথম দিল্লীর সাহিত্য একাডেমী কর্তৃক বিশেষ ভাষা পুরস্কারে ভূষিত হয়ে ককবরক ভাষার মর্যাদা বাড়ান।

চন্দ্রা ঃ চন্দ্রা দেববর্মা, সুপুরি বাগানের শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ দেববর্মার মেয়ে এবং বঙ্গ ঠাকুর দেওয়ানে প্রপৌত্রী। বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের ইলেকশন ডিপার্টমেন্টে চাকুরী করেন।

চিনি ঃ বন্ধুবর অধ্যাপক স্বপন বসুর মেয়ে। তার ভালো নাম কঙ্কা বসু। সে আমার মেয়ের মতন। আমার চোখ কাটানোর পরে সে-ই তাদের বাড়িতে রেখে আমার সেবা-শুশ্রূষা করে।

চিন্ময় হোড় ঃ ন'পাড়া, বারাসত। আমার মামাতো বোন আরতি হোড়ের ছেলে। পিতার নাম শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র হোড়। শ্রীমান চিন্ময় একবার জাহাজ ডুবিতে মৃত্যুর মুখে পড়েছিলো। তারপর সমুদ্রে অসীম সাহসে সাঁতার দিতে দিতে বেঁচে যায়।

চণ্ডথণ্ড মগ ঃ স্কুল শিক্ষক। নিবাস কলসী, বিলোনীয়া, ত্রিপুরা। তিনি ক্যানসার রোগে প্রয়াত হয়েছেন। এমন একজন হৃদয়বান লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া ভার। তিনিই চিত্র পরিচালক দীপক ভট্টাচার্যের 'পিলাক' ছবির সুটিঙের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আমার এক মগ শাশুড়ীর আত্মীয়। মাঝে মাঝে আগরতলায় এলে আমার বাসায় এসে থাকতেন।

চন্দনা ভদ্র ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে আমার ছাত্রী। ত্রিপুরার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও লেখক জগৎজ্যোতি রায়ের ভাগ্নী।

চন্ডীঠাকুর ঃ চন্ডীচরণ দেববর্মা। চন্ডীঠাকুরপাড়া, চড়িলাম। চন্ডীঠাকুর ছিলেন গজভীম নারায়ণের ঠাকুরদাদা। চন্ডীঠাকুরের হাতি ছিলো। সেই হাতিতে চড়ে তিনি ত্রিপুরার রাজদরবারে যেতেন।

শচীন্দ্র ঃ শচীন্দ্র দেববর্মা। চন্ডীঠাকুরের পুত্র হরেন্দ্র ঠাকুরের (মাস্টার) পুত্র। সম্পর্কে আমার মামাতো ভায়রাভাই। শালী শম্পিনীর স্বামী।

চিত্তরঞ্জন মোহন্তদাস ঃ কামরাজ কলোনী, দক্ষিণ চড়িলাম। পেশায় চিকিৎসক। উপজাতি এলাকার অপরিহার্য ডাক্তার। চড়িলামের সি. পি. আই-এর নিষ্ঠাবান কর্মী।

চপলা বিশ্বাস ঃ সি. পি. আই (এম)-এর মহিলা ফ্রন্টের একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি মাঝে মাঝে আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রাম হেরমায় গিয়ে আমার কাকী শাশুড়ী, সি. পি. আই (এম)-এর কর্মী শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেববর্মার বাড়িতে থেকে এলাকায় মিটিং করেন।

চিরব্রত রায় বর্মণ ঃ ঠাকুরপল্লী রোড, কৃষ্ণনগর। সি. পি. আই নেতা।

চতুরানন মিশ্র ঃ সি. পি. আই- এর জাতীয় পরিষদের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য। ভারত সরকারের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী। নিবাস বিহার।

চাফু/চাফুতী ঃ গৌতমী দেববর্মা। হেরমা বাড়ির রমেন্দ্র নারায়ণ দেববর্মার মেয়ে ও যোগেন্দ্র দেববর্মার পৌত্রী। আমার বড়ো মেয়ে নন্দিনীর বান্ধবী।

চন্দন মজুমদার ঃ আগরতলার বিশিষ্ট শিল্পী, বাড়ি জয়নগর। তিনি ভারত বিখ্যাত শিল্পী নলিনী মজুমদারের কৃতী পুত্র।

চুনীবাবু ঃ রয়েল গেস্ট হাউসের মালিক। তিনি খুব ছোট থেকে বড়ো হয়েছেন। এর পেছনে তাঁর রয়েছে অধ্যাবসায়।

চন্দ্রোদয় রূপিনী ঃ উপজাতি যুব সমিতির নেতা। একসময় ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলাপরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি নানারকম যোগব্যায়াম জানেন। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি চম্পকনগরের কাছে চন্দ্র সাধুপাড়ায়। চন্দ্রসাধুপাড়ার বৈষ্ণব উপজাতিরা এখন অনেকে খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছেন।

চম্পা দাশগুপ্ত ঃ অধ্যাপিকা, আগরতলা মহিলা কলেজ। বাঙলার অধ্যাপিকা হিসেবে তাঁর খুব নাম।

চন্দন সেনগুপ্ত ঃ অধ্যাপক, টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্সেস, মুম্বাই।

চুমকি ঃ বন্ধুবর স্বপন বসুর ভাগ্নী, এয়ারলাইন্স কর্পোরেশনের অফিসার।

চিন্তাহরণ চৌধুরী ঃ চড়িলামের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামী, চড়িলামে এসে পোস্ট মাস্টারের চাকুরী করেন। বিজয় মজুমদারের বৈঠকখানায় তিনি ছিলেন আসল মজলিশী লোক। তাঁর প্রয়াণে চড়িলামে সামাজিক শৃঙ্খলায় ভাঁটা পড়েছে।

চিত্ত জমাতিয়া ঃ ত্রিপুরার ককবরক ভাষার একজন বিশিষ্ট লেখক ও সংগঠক। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সিনেট সদস্য। পেশায় শিক্ষক। বর্তমানে ট্রাইবেল ল্যাঙ্গুয়েজ সেলের বিশেষ দায়িত্বে আছেন। সি. পি. আই (এম)-এর কর্মচারী নেতা। বহুমুখী গুণ আছে চিত্তবাবুর। নিবাস উদয়পুরের হদ্রা গ্রাম।

চাঁদরাই দেববর্মা : গ্রাম রঙমালার দুরন্ত কপরাপাড়া । একসময় খুব ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন । ফুটবল খেলায় ছিলো তার খুব শখ । ক্যাপ্টেন হয়ে তাঁর জমিজায়গা সব চলে যায় । তাঁর বাবা রুদ্রসাগরে সদলবলে মৎস্য শিকার করতে গিয়ে পরের পোলোর নিচে পড়ে মারা যান । সম্পর্কে তিনি হেরেমার যোগেন্দ্র দেববর্মার ভায়রাভাই । আমার সম্পর্কে শ্বশুর তিনি ।

ছোটদি : নীলিমারাণী পাল, স্বামী শচিন্দ্রপ্রসাদ পাল, অরবিন্দ পল্লী বারাসত । আমার আপন ছোটদি । মায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমার মাতৃআসন পূরণ করেছেন । অত্যন্ত অতিথি বৎসল । বারাসতের তাঁর বাড়িতে সবসময় আত্মীয়স্বজনের ভিড় থাকে । তিনি আত্মীয়-স্বজনের সত্যিকারের বিপদের বন্ধু । বর্তমানে বাতের আক্রমণে শারীরিকভাবে প্রায় অচল হয়ে গেছেন ।

ছোটজামাইবাবু : শ্রীযুক্ত শচিন্দ্র প্রসাদ পাল, অরবিন্দ পল্লী বারাসত । আমার আপন ছোট জামাইবাবু নীলিমাদির স্বামী । তাঁর মতো পরোপকরী ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না । আত্মীয়-স্বজন ও সাধারণ মানুষের দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদে এবং তাঁদের জন্যে যথাসাধ্য করেন । আত্মীয়-স্বজনের কমন ঠিকানা হলো বারাসতের শচীন পালের বাড়ি । আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন।

ছায়ারাণী : ছায়ারাণী দেববর্মা, স্বামী কৃষ্ণকান্ত দেববর্মা, গৌরকপরাপাড়া, বাঁশতলী । ছায়ারাণী আমার আপন ছোট শালী। তাঁর স্বামী কৃষ্ণকান্ত স্কুল শিক্ষক ।

ছায়ারাণী : ছায়ারাণী দেববর্মা, চড়িলাম, রামনগরের সি. পি. আই (এম) পার্টির নেতা সুধন দেববর্মার কন্যা । স্বামী স্কুল শিক্ষক । বিশ্রামগঞ্জ কলোনীতে তাদের সুন্দর বাড়ি ছিলো । একদিন বাস এক্সিডেন্টে ছায়ারাণী প্রাণ হারায় । তাঁর শ্রাদ্ধে গিয়ে ভীষণ কেঁদেছিলাম । সে ছিলো আমার আপন মামাতো শালী, বাই (দিদি) পরিমলের মেয়ে ।

ছত্রজিৎ দেববর্মা : মহারাজ রাধাকিশোরের পুত্র টীকাজীকর্তার ছেলে । বিয়ে করেছেন চড়িলাম রামনগরে হরেন্দ্র দেববর্মার কন্যাকে সাধারণ কৃষক পরিবারে। ত্রিপুরা হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্র্যাফটস কর্পোরেশনের অফিসার । স্ত্রীও সিভিল সেক্রেটারিয়েটে ভালো চাকুরী করেন ।

জে. বি. গাঙ্গুলী : ডঃ জলদবরণ গঙ্গোপাধ্যায় । ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য । প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ । ত্রিপুরার জুমিয়াদের ওপর তাঁর একখানি প্রামাণ্য বই আছে । ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনি একজন দিকপাল অর্থনীতিবিদ ।

জগৎজ্যোতি রায় : ত্রিপুরার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও লেখক । ইংরেজী ও বাঙলায় তাঁর সমান দখল ছিলো । একসময়ে সমর সেনের 'ফ্রন্টিয়ার' কাগজে লিখে নাম করেছিলেন । আগরতলার বহু সংবাদপত্রে তিনি স্বনামে ও বেনামে লিখতেন । অরুণাংশ রায় এই ছদ্মনামে তিনি 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর । শেষের দিকে তিনি অরুণ নাথ সম্পাদিত ত্রিপুরা অবজার্ভার পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন । ত্রিপুরা দর্পণ প্রকাশনী তাঁর কয়েকখানা অমূল্য বই প্রকাশ করেছেন । তার মধ্যে 'বিদ্রোহ-বিবর্তন ও ত্রিপুরা' অতি জনপ্রিয় বই ।

জয়ন্ত : জয়ন্ত দেববর্মা । দেওয়ান বাড়ি, সুপুরি বাগান, কৃষ্ণনগর । পিতার নাম শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ দেববর্মা । বঙ্গঠাকুর দেওয়ানে পৌত্র । তরুণ ইঞ্জিনীয়ার ।

জগদীশ দেববর্মা : দেওয়ানবাড়ি, সুপুরি বাগান, আগরতলা । পিতা জ্যোতিষ দেববর্মা, বঙ্গ ঠাকুর দেওয়ানের কৃতী পৌত্র । পেশায় ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনীয়ার ।

জগদীশ দেববর্মার স্ত্রী : শ্রীমতী লতিকা দেববর্মা । প্রয়াতা অনুরূপা মুখার্জীর ভাইপোর স্ত্রী । ত্রিপুরা আদিবাসী মহিলা সমিতির বর্তমান কর্ণধার । তিনি শাড়ি পরে স্কুটার চালিয়ে কর্মস্থলে যান ।

জগদীশ দেববর্মা : কৃষ্ণনগর রোড, আগরতলা । প্রয়াতা অনুরূপা মুখার্জীর ভাইপো । জগদীশবাবু ত্রিপুরা সরকারের কৃষি বিভাগের অফিসার ছিলেন । তাঁর হাতে কয়েকটি 'সাকসেসফুল' জুমিয়া পুনর্বাসন কলোনী হয়েছিলো ।

জহর আচার্য : আগরতলার রাজেন্দ্র কীর্ত্তিশালার কর্ণধার । রাজেন্দ্র কীর্ত্তিশালা মিউজিয়মে বিভিন্ন প্রকারের অতি মূল্যবান দর্শন সমগ্রী আছে। জহরবাবু মূলত একজন মুদ্রা সংগ্রাহক । তাঁর সংগ্রহশালায় ত্রিপুরার সব রাজাদের প্রচিনমুদ্রা আছে। তাছাড়া ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামন্ত ও উপজাতীয় রাজাদের প্রচলিত মুদ্রাও রয়েছে এই সংগ্রহশালায় । ত্রিপুরার উপজাতীয় জীবনের এমন সংগ্রহ আর কারুর সংগ্রহশালায় নেই । মুদ্রা বিশেষজ্ঞ অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী একাধিকবার রাজেন্দ্র সংগ্রহশালায় এসেছেন । ঐতিহাসিক অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও ডঃ ডি সি সরকার প্রমুখ মুদ্রা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে জহরবাবুর নিবিড় যোগাযোগ ছিলো । অধ্যাপক লাহিড়ী রাজেন্দ্র কীর্ত্তিশালার রৌপ্যজয়ন্তী উৎসবে যোগ দিতে এসে আগরতলাতেই মারা যান । জহরবাবু একজন লেখকও বটে । তিনি লালনগীতির একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ।

জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য : আগরতলার সংস্কৃতি কর্মী । কবিতা লোক ও 'সিনেডেলভ' এর মতো সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত ।

জলধর মল্লিক : ডঃ জলধর মল্লিক : আগরতলার মহারাজ বীরবিক্রম কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের পাব্লিসিটি দপ্তরের সফল অফিসার । বিখ্যাত সাক্ষরতা কর্মী ।

জয়দুর্লভ দেববর্মা : পাকুলিবাড়ি, রামনগর চড়িলাম । রামনগর বাজারে তার একটি প্রচিন মুদিখানা দোকান আছে । সম্পর্কে আমার মামা শ্বশুর খুব ধনাঢ্য কৃষক ।

জহরলাল দেবনাথ ঃ দক্ষিণ চড়িলামের কামরাজের বাসিন্দা।

জাহ্নবী দেববর্মা ঃ পিতার নাম কার্তিক সুবেদার। গ্রাম বাথানমোড়া। সম্পর্কে আমার পিসশ্বশুর। আমার পিসশাশুড়ী রঞ্জনী দেববর্মা মারা গেলে একজন বাঙালী মেয়েকে পুনরায় বিয়ে করেছেন।

জিতুমোহন দেববর্মা ঃ রঘুনাথ ঠাকুর পাড়া, চড়িলাম। জিতুমোহনবাবু একজন শিক্ষিত কমিউনিস্ট ছিলেন। সি. পি. আই পার্টি ভাগ হয়ে যাবার পর তিনি নতুন সি. পি. আই (এম)-এ যোগ দেন কমরেড সুধন্বা দেববর্মার অনুগামী হয়ে।

জ্যোতি বসু ঃ সি. পি. আই (এম) পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য। পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতো দীর্ঘ বছর ধরে পৃথিবীর আর কোনো দেশের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় ছিলেন না। তিনি একাধিক্রমে ২৩ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের নেতৃত্ব করেছেন। জ্যোতি বসু হচ্ছেন আমার আপন জ্যাঠতুতো ভাগ্নে পঙ্কজ নন্দীর বিলেতের ক্লাসমেট, একই সঙ্গে ব্যারিস্টারি পড়তেন।

জয়পাল সিং মুন্ডা ঃ ঝাড়খন্ড আন্দোলনে মুকুটহীন সম্রাট, বিলেতে পড়াশুনা। কিন্তু একসময় তিনি ঝাড়খন্ড আন্দোলন পরিত্যাগ করে জহরলাল নেহরুর পরামর্শে কংগ্রেসে যোগদান করে এম. পি. হন।

জে এম দাশ ঃ অধ্যাপক জে এম দাশ। বর্তমানে হায়ার এডুকেশনে ও. এস. ডি. হিসেবে কর্মরত।

জগদীশ গণ চৌধুরী ঃ অধ্যাপক এম. বি. বি. কলেজ। তিনি ত্রিপুরা সম্পর্কিত গবেষণামূলক অনেক বইয়ের লেখক। মহারাজ কুমার সহদেব বিক্রমের সহযোগী লেখক হিসেবেও তিনি কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য বই লেখেন।

জিষ্ণু কর্তা ঃ শ্রীযুক্ত জিষ্ণু দেববর্মা। রমেন্দ্রকিশোর ও মহারাজকুমারী কমলপ্রভার সন্তান। একসময় INTACH ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের কর্ণধার ছিলেন। ত্রিপুবার রাজপরিবারে এমন বুদ্ধিদীপ্ত যুবক দেখাই যায় না। বর্তমানে বিজেপি পার্টি করেন খুব সক্রিয়ভাবে। এই পার্টির টিকিটে কয়েকবার লোকসভার আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তিনি।

জয়ন্ত ভট্টাচার্য ঃ আগরতলার তরুণ সাংবাদিক। পি. টি. আইতে আছেন। আগরতলা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী সংবাদ পত্রের সঙ্গে জড়িত। ত্রিপুরার বাইরে থেকে প্রকাশিত ইংরেজী সংবাদপত্রের সাংবাদিক হিসেবেও তিনি পরিচিত।

জয়া ঃ ডাঃ জয়া সিনহা। অধ্যাপক কমলকুমাব সিংহব ডাক্তার মেয়ে। জয়া AIMS থেকে M.D করেছে।

জীবন মেটা ঃ ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশ্ববিশ্রুত অর্কেস্ট্রা শিল্পী।

জহর ঃ জহর চক্রবর্তী। ডেইলী দেশের কথার তরুণ সাংবাদিক।

জয় ঃ জয় কুন্ডু চৌধুরী। আমার বড়দা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরীর ছোট ছেলে।

জিতেন সরকার ঃ অধ্যক্ষ, ত্রিপুরা বিধানসভা। সি. পি. আই (এম) পার্টির বিশিষ্ট বর্ষীয়ান নেতা।

জগদীশ দেববর্মা ঃ ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির বিশিষ্ট কর্মী। ত্রিপুরার উগ্রপন্থীরা তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে দীর্ঘদিন রেখে দেন। পরবর্তীকালে মুক্ত হয়ে আসেন।

জিতেন পাল ঃ সম্পাদক, জাগরণ পত্রিকা। তিনিই প্রথম আগরতলায় দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে। অশিতিপর বিশিষ্ট সাংবাদিক। তিনি বর্তমানে ত্রিপুরায় বাঙালী জাগরণের নেতা। বাঙালীরা ত্রিপুরায় চিরদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো একথা তিনি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে চান।

জ্যাঠা বকুল ঃ বকুল দেববর্মা, আমার জ্যাঠাশ্বশুর। গ্রাম হেরমা, চড়িলাম। বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক ও কীর্তনিয়া।

জুলফিকার আলী ভুটো ঃ পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট।

জুহুর আহমেদ চৌধুরী ঃ বাঙলাদেশ স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানেব জাতীয় পরিষদের সদস্য।

জিয়ায়ুর রহমান ঃ বাঙলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা।

জোহরা বেগম ঃ বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের স্ত্রী। বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময় তিনি আগরতলা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ক্যাম্পে ছিলেন।

জামাল ঃ শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যমপুত্র। শোনা যায় তিনি প্রখ্যাত সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের বাড়ি থেকে দেরাদুনে মিলিটারী একাডেমীতে পড়তে যান।

জয়শ্রী দেববর্মা ঃ আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের কর্মী। কমলপুরের সি. পি. আই. নেতা ধর্মরাই দেববর্মার বড়ো মেয়ে।

জয়ন্ত গুপ্ত ঃ জয়ন্ত গুপ্তর ডাকনাম বাবুন। ঠিকানা অফিসলেন, আগরতলা। সে বিয়ে করেছে আমাদের নববারাকপুরের বাড়ির পাশে। সেই সূত্রে সে আমার জামাই। তার স্ত্রী রূপাও আমাদের মেয়ের মতো।

ঝুনুরাণী ঃ ঝুনুরাণী দেববর্মা ঃ হেরমাবাড়ির যোগেন্দ্র দেববর্মার মেজো মেয়ে। বিয়ে হয়েছে পেকুয়ারজলায়। তার স্বামী রমেশ দেববর্মা একজন নাট্যকার। ঝুনুরাণী সম্পর্কে আমার পিসতুতো শালী, সোস্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে চাকুরী করেন।

ঝুলন ভট্টাচার্য ঃ এডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার জ্যাঠতুতো দিদি বসন্তলতার পালিতা কন্যা। বিজয় কুমার চৌমুহনী।

ঝরণা দেববর্মা ঃ আগরতলার বিখ্যাত গায়িকা। ত্রিপুরার রাজপরিবারের বিখ্যাত সেতারবাদক রাজকুমার হেমন্ত কর্তার

বড়ো মেয়ে। ঠিকানা প্যারাডাইস চৌমুহনী। বিশেষভাবে শাস্ত্রীয় সংগীত ও নজরুল গীতিতে পারঙ্গম তিনি। শোনা যায়, একসময় নাকি গায়ক শচীন দেববর্মণ তাঁকে বোম্বেতে তাঁর সান্নিধ্যে সংগীতচর্চার পরামর্শ দেন। কিন্তু আগরতলা ছেড়ে শ্রীমতী দেববর্মা আর বেরুতে পারেননি।

টিকাজীকর্তা : রাজকুমার রণবীর কর্তার পুত্র। বর্তমান উইমেন্স কলেজের পাশেই ছিলো তাঁর বাড়ি এবং তা গণরাজ চৌমুহনী ও নন্দলাল কর্তার বাড়ি পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো। কিন্তু রাজতন্ত্র চলে যাবার পরে স্ট্যাটাস বাঁচানোর জন্যে আস্তে আস্তে তার ওইসব জমি জলের দরে বিক্রি করে গোর্খাবস্তির পাশে গিয়ে সাধারণ বাড়ি করে আছেন।

টিয়াদি : টিয়া বসু। অধ্যাপক স্বপন বসুর দিদি।

টি. কে. চাকমা : রেসিডেন্ট কমিশিনার, ত্রিপুরা ভবন, (প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলকাতা) অতীব সজ্জন ও পরোপকারী ব্যক্তি।

টগর ভট্টাচার্য : কবি, অপরাজিতা রায়ের ছায়াসঙ্গিনী। রবীন্দ্র পরিষদের সদস্যা।

টিক্কা খাঁন : বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক। তিনি মুক্তযুদ্ধকামী বাঙালী জাতির ওপর নিদারুণ অত্যাচার চালান। তাঁর অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে লোক সংগীত পর্যন্ত তৈরী হয়েছে।

টুকাই : মনীষ চৌধুরী। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্যামল চৌধুরীর পুত্র। শ্রীমান টুকাই দাদু বর্তমানে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ে।

ডালিয়া : আগরতলার মহিম কর্ণেলের জামাই সীতানাথ সিংহরায়ের ছোট মেয়ে। মায়ের নাম রেণুকাপ্রভা। ডালিয়ার বিয়ে হয়েছিলো ত্রিপুরার বাইরে বড় এক জমিদার পরিবারে।

ত্রিপুরচন্দ্র সেন : আগরতলার পুরনো বাসিন্দা। লক্ষ্মী বেকারীর পাশে অনেকখানি জমি নিয়ে বাড়ি ছিলো। তিনি ছিলেন বি. এ. বি এল — আগরতলার কোর্টের সর্বজনশ্রদ্ধেয় উকিল। তিনি কলকাতার এক জজসাহেবের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আত্মভোলা চরিত্রের জন্যে স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি। শেষ জীবনে সুশিক্ষিতা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নিজের হাতে রান্না করে খেতেন। তাঁর এক অতি উচ্চশিক্ষিতা কন্যা বর্তমান। বাঙলাদেশের যুদ্ধের পরে তিনি তাঁর বাড়ির বিশাল চৌহদ্দী রেখে মারা যান। পরে তাঁর স্ত্রী ওই বাড়ি বিক্রি করে কলকাতায় চলে যান। উকিল বীরচন্দ্র দেববর্মা ছিলেন তাঁর পরম হিতৈষী বন্ধু। বীরচন্দ্রবাবু ত্রিপুরবাবুর বাড়ির সামনে প্রগ্রেসিভ বুকস্টল নামে একটি সাম্যবাদী বইয়ের দোকান খোলেন। ত্রিপুরচন্দ্র সেন ছিলেন আসলে গবেষক-লেখক। তিনি ত্রিপুরা সম্পর্কে কয়েকখানা গবেষণাধর্মী বই লিখে গেছেন। ত্রিপুরা-আসাম সম্পর্কের ওপরও তিনি বই লিখেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে প্রথমে আমি ত্রিপুরা বুরঞ্জী ও আসাম বুরুঞ্জী বইয়ের নাম শুনি। তাঁর অতি বিখ্যাত বইয়ের নাম হলো Tripura in Transition। বইখানিকে আধুনিক ত্রিপুরার আকরগ্রন্থ বলা যায়। কিন্তু এহেন মূল্যবান বইখানি এখন দুষ্প্রাপ্য।

তুইয়া : নগেন্দ্র দেববর্মা, আমার আপন মেজশালা, হেরমা, চড়িলাম।

তুইয়ার বৌ : বাসনা দেববর্মা। আমার মেজশালা তুইয়া (নগেন্দ্র জমাতিয়া)'র স্ত্রী। তার ডাকনাম ফুতিয়া। সম্পর্কে সে সি. পি. আই (এম) নেতা নিরঞ্জন দেববর্মার আপন ভাগ্নী।

তিথি দেববর্মা : টি. পি. এস. সির প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত মানস দেববর্মার কন্যা ও অ্যাডভোকেট শুভাশিস তলাপাত্রের স্ত্রী। বিখ্যাত রবীন্দ্র সংগীক গায়িকা। হরিশ ঠাকুর রোড, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

তৈয়েতী ইসলাম : বেগম তৈয়েতী ইসলাম, স্বামী মহম্মদ ইউনুস মিঞা, আদিবাসী মুসলমান পাড়া, দক্ষিণ চড়িলাম। তিনি বাথানমোড়ার প্রয়াত লাবণ্য দেববর্মার পালিতা কন্যা। মাতৃভাষার মতো ককবরক বলতে পারেন। আগে উপজাতি গ্রামে ঝুড়িতে করে চুরি-আলতা- লিপিসটিক ফেরি করতেন। তাঁর বোধ হয় আগে একবার বিয়ে হয়েছিলো। তাই তাকে উপজাতি লোকেরা তায়েব আলীর বৌ বলে ডাকে। তিনি বর্তমানে সন্ন্যাসিনী হয়ে চড়িলামের উপজাতি গ্রামে নানারকম ঝাড়ফুক করেন এবং উপজাতিপল্লীতেই থাকেন। তাঁকে ত্রিপুরী বাড়ির মেয়ে বললেই চলে। একসময় তিনি চড়িলামে সি. পি. আই পার্টির সক্রিয় ও খুব সাহসী মহিলা নেত্রী ছিলেন।

তুলসী দেববর্মা : চড়িলামের ধারিয়াথল গ্রামের সুনীল দেববর্মা (মাস্টার)'র স্ত্রী ও প্রয়াত গদাধর দেববর্মার পুত্রবধূ। তিনি একজন সি. পি. আই (এম) পার্টির নারীনেত্রী, বিশালগড় ব্লক এডভাইজারী কমিটির সদস্যা। নারীনেত্রী হিসেবে তিনি এলাকায় খুবই জনপ্রিয় এবং বর্তমান বনমন্ত্রী মাননীয় নারায়ণ রূপিনীর একান্ত বিশ্বস্ত কর্মী। সম্পর্কে তুলসী দেবী আমার পিসতুতো শালার স্ত্রী। আমার বৌদি।

তড়িত দাশগুপ্ত : তড়িতমোহন দাশগুপ্ত। ত্রিপুরার রাজআমলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁর দাদা ত্রিপুরার রাজবাড়ির চিকিৎসক ছিলেন। তড়িতবাবু একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী। একাধিকবার তিনি ত্রিপুরার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। তিনি একাধারে লেখক ও সমালোচক। রিয়াং বিদ্রোহী নেতা রতনমণির ওপর তাঁর একখানা মূল্যবান বই আছে।

তপন দত্ত : সি. পি. আই পার্টির রাজ্যপরিষদ সদস্য। দীর্ঘদিন তিনি আগরতলার সি. পি. আই দপ্তরের সেক্রেটারি

ছিলেন। মূলত তিনি বিলোনীয়া বিভাগের কর্মী।

তৃপ্তি মিত্র : প্রখ্যাত অভিনেত্রী, অভিনেতা শম্ভু মিত্রর স্ত্রী। তাঁকে ঊষা গাঙ্গুলীদের রঙ্গকর্মীর নাটকের রিহার্সালে দেখেছি আমি।

তাপস আচার্য : কৃষ্ণনগরের সুপুরি বাগানের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক। সুপুরিবাগানের রবীন্দ্র স্নেহধন্য শতবর্ষী যামিনী আচার্য ছিলেন তাঁর বাবার আপন মামা। ডাঃ তাপস আচার্যের শখ হলো ফুলের বাগান পরিচার্য করা। একসময় তাঁর ফুল বাগানে বিচিত্র রকমের ফুল ছিলো। মাটির থালার ওর বোধিবৃক্ষ লাগাতেন তিনি জাপানী প্রথায়। একে বলে বনসাই। একসময় ডঃ জি এন চ্যাটার্জীর মতো গুনিজন তাঁর ফুল বাগান থেকে ফুলের চারা নিতেন। ত্রিপুরার উপজাতিদের পাহাড়ের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান আছে। তিনি নিজের চোখে উলঙ্গ কুকী মেয়েদের ধান রোপণ করতে দেখেছেন ত্রিপুরায়।

তপন চক্রবর্তী : সি. পি. আই (এম) নেতা, ত্রিপুরার প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী। মিষ্টভাষী ও সুবক্তা, মূলত কলকাতার মানুষ।

তাপস দে : শালগড়ার প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক। বর্তমানে ত্রিপুরার মহারাণী বিভূকুমারী দেবীর রাজনৈতিক সচিব। তাপসবাবু Far East Focus বলে একখানি ইংরেজী ম্যাগাজিন সম্পাদনা করে খুব খ্যাতি অর্জন করেছেন। মিষ্টভাষী ও পরোপকারী বলে তাঁর খুব নাম আছে। আরতলার বিভিন্ন লেখকগোষ্ঠী ও বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

তসলামফা : তাঁর আসল নাম হলো রাজপ্রসাদ রিয়াঙ। তিনি প্রথম জীবনে বিদ্রোহী রতনমণির সহচর ছিলেন। পরে কংগ্রেস-রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করে তিনি শচীন্দ্রলাল সিংহর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তিনি লেখাপড়া না জানলেও তাঁর বাস্তব বুদ্ধি ছিলো অত্যন্ত প্রখর। তিনি শচীন সিংকে 'ছিছিংদা' বলে ডাকতেন। তাঁকে নিয়ে অনেক লোককাহিনী আছে। তসলাম নামে তার এক সুন্দরী মেয়েছিলো। লোকে তাকে তসলামের বাবা বলে ডাকতো। ককবরক ভাষায় বাবাকে বলে 'ফা'। তাই তিনি ছিলেন তসলামফা।

তরুণ দেববর্মা : তরুণ দেববর্মা একজন তরুণ টি. সি. এস অফিসার। বর্তমানে জম্পুইজলা টি. ডি ব্লকে। এডিশন্যাল বি. বি. ও'র পদে অধিষ্ঠিত আছেন। পূর্বের গ্রাম চড়িলাম চন্ডীঠাকুরপাড়া, বর্তমানে মোহরছড়া, খোয়াই। তাঁর ঠাকুরদা আগে আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পরে চন্ডীঠাকুর পাড়ার জামাই উঠে সেখানে বসবাস করেন। পরে তরুণবাবুর বাবা হাকিম দেববর্মা মোহরছড়ায় চলে গিয়ে সেখানে জামাই ওঠেন এবং অবস্থা বিশেষ ভালো করেন। খোদ মোহরছড়া বাজারে তাঁর একখানা পাকা দালানে দোকান ছিলো। পরে আশির জাতিদাঙ্গায় সব পুড়ে যায়। তার কিছু দিন পর তিনি মারা যান। পরে হাকিমবাবুর পুত্রেরা সব খৃষ্টান হয়ে যান এবং শিলঙে গিয়ে পড়াশুনা করে উচ্চশিক্ষিত হন। তরুণবাবুর একভাই ডাক্তার, বিয়ে করেছেন খাসী মেয়ে তিনিও ডাক্তার। সম্পর্কে তরুণবাবু আমার কাকাশ্বশুর। তরুণবাবুর আরেক দাদা বলিন দেববর্মা ট্রেজারী অফিসার। টি. সি. এস তিনি।

তরণী বণিক : বিশিষ্ট সি. পি. আই নেতা। বর্তমনে পার্টির বিলোনীয়া বিভাগের সেক্রেটারী। পূর্বে বিলোনীয়া কলেজের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। বিলোনীয়ার একজন শিক্ষিত তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে তিনি খুব জনপ্রিয়। তিনি এখন সি. পি. আই-এর ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য।

তপন চক্রবর্তী : সি. পি. আই পার্টির বিলোনীয়া বিভাগের পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। নিজে বি. এ পাশ ও স্ত্রী এম. এ পাশ হয়েও বেকার। এমন কষ্টসহিষ্ণু যে-কোন পার্টিতে বিরল। তিনি সি. পি. আই-এর ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের সদস্য। বর্তমানে থাকেন বাইখোড়ায়।

তোয়াবখান : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রেস সেক্রেটারি।

তাহের উদ্দিন ঠাকুর : বাঙলাদেশের মুজিব সরকারের তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী।

তুইনা : তুইনার ভালো নাম ধীরেন্দ্র দেববর্মা : হেরেমাবাড়ির যোগেন্দ্র দেববর্মার মেজো ছেলে। হেরেমা বাজারে তার একটা দীর্ঘদিনের মুদিখানার দোকান আছে। সম্প্রতি সে রেশনশপের মালিক। সম্পর্কে সে আমার পিসতুতো শালা।

থইঅ মগ : ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের প্রাক্তন গবেষক বিজ্ঞানী। ঠিকানা মনুবঙ্কুলের দো-অং মগপাড়ার বাসিন্দা। বাবার নাম মধু মগ (মাস্টার) মধুবাবু খুব ভোরে নদি পেরিয়ে বুদ্ধের ভোগ নিয়ে যাবার সময় জলের তোড়ে ভেসে যান। থইঅ একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। লেখাপড়া নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে। বম্বের ইংরেজী জার্নালে তার উচ্চাঙ্গের কবিতা প্রকাশিত হয়। শ্রীমান থইঅ'র সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমার মনুবঙ্কুলের হাসপাতালে ডাঃ বিজয় দেববর্মার কোয়ার্টারে। তাঁদের বাড়ি থেকে তার মায়ের তত্ত্বাবধানে থেকে আমি Class formation among the Mogs in Tripura এই গবেষণা কাজ করতাম। অঞ্জু সম্পর্কে থইঅ কংগ্রেস নেতা অঞ্জু মগের নাতি।

দুর্বাজয় রিয়াঙ : সি. পি. আই পার্টির প্রয়াত জনপ্রিয় নেতা। তিনি ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। পরে তিনি বামফ্রন্টের জেলমন্ত্রীও হন। এবং জেলমন্ত্রী থাকা অবস্থায় প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন ত্রিপুরার

জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনের বিলোনীয়া বিভাগের প্রথম সারির নেতা। তাঁর নিজের বাড়ি লক্ষ্মীছড়া, বিলোনীয়া বিভাগ। তিনি খুব দৃঢ়নেতা ছিলেন। উগ্রপন্থীরা তাঁর কাছে চাঁদা ধার্য করে। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করায় প্রকাশ্যে দিবালোকে উগ্রপন্থীরা বামফ্রন্টের সময়কালে প্রকাশ্য দিবালোকে তার ঘরে অগ্নিসংযোগ করে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করে দেয়।

দিলীপ দেবরায় ঃ আগরতলার বিখ্যাত ফটোগ্রাফার। পুরনো আর. এম. এস চৌমুহনীতে Studio Click নামে একটা স্টুডিও আছে। বর্তমান বাড়ি প্রতাপ রায় রোড, কৃষ্ণনগর, আগরতলা। দিলীপ আগরতলার নানান সংস্কৃতি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত।

দশরথ দেব ঃ দশরথ দেববর্মা। ত্রিপুরার পাহাড়ের মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন তিনি। রাজতন্ত্র অবসানের পরে তাকেই ত্রিপুরার মুকুটহীন রাজা বলা হতো। ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা। পরবর্তীকালে ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি। তাঁর নেতৃত্বে ত্রিপুরার উপজাতি জনগণ সার্বিকভাবে কমিউনিস্ট প্রভাবিত হয়ে যান। তিনি ছিলেন এক বিরল প্রজাতির কমিউনিস্ট সংগঠক। সারা পৃথিবীতে তাঁর মতো উপজাতীয় কমিউনিস্ট সংগঠক আর বোধ হয় কেউ নেই। তিনি একাধিকবার সি. পি. আই. পার্টির লোকসভার সদস্য ছিলেন। পরে পার্টি বিভাজনের পর সি. পি. আই (এম)-এ যোগদান করেন। ত্রিপুরা প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন দশরথ দেব। পরবর্তীকালে তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হন। দশরথ দেবের মাতৃভাষা ককবরকের ওপর ছিলো বিশেষ অনুরাগ। শিক্ষামন্ত্রী হয়েই তিনি ককবরক ভাষাকে ত্রিপুরার দ্বিতীয় সরকারী রাজ্যভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা করেন এবং সেই সময় থেকে ককবরক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিদ্যালয়ের প্রাথমিকস্তরে চালু হয় 'ককবরক সৗরীং' নামে ককবরক ভাষা শিক্ষার একখানা বই লেখেন তিনি। তিনি ককবরকের জন্যে বাঙলা হরফের একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁর লেখা 'মুক্তি পরিষদের ইতিকথা' একখনা মূল্যবান বই।

দীপক ভট্টাচার্য ঃ ত্রিপুরায় প্রথমে সিনেমা ডিরেক্টর । ককবরক ভাষায় তিনিই লংতরাই নামে প্রথম ছবি পরিচালনা করেন। ছবিটি ককবরকের রিয়াং উপভাষায় তৈরী।

দীলু জমাতিয়া ঃ দীলু জমাতিয়া ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মী। তিনি ত্রিপুরার বিশিষ্ট খ্রীষ্টান গাত্রী মহানন্দ নায়রাই জমাতিয়ার ছোট ভাই।

দীনেশ ঃ দীনেশ দেববর্মা। পিতা রমেশ দেববর্মা, হেরমাবাড়ি। পেশায় শিক্ষক। সম্পর্কে আমার খুড়তুতো শালী।

দেবযানী ঃ দেবযানী কুন্ডু চৌধুরী। আমার ছোট মেয়ে। তার মামার বাড়ি হেরমা গ্রামে ১৩৭৬ সালে জন্ম। বর্তমানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নিয়ে এম. এ পড়ছে। ক'বছর আগে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় সে মিস গ্রেসফুল হয়েছিলো।

ধীরেন্দ্র ঃ ধীরেন্দ্র দেববর্মা। পিতার নাম রাজেন্দ্র দেববর্মা। গ্রাম হেরমা। প্রাক্তন পুলিশ কর্মী। সম্পর্কে আমার বড়ো শালা।

দিনমণি ঃ দিনমণি দেববর্মা। সম্পর্কে আমার মামা শ্বশুর, আমার শাশুড়ীর খুড়তুতো ভাই। বাড়ি ধলেশ্বরের স্কুলের কাছে। পিতা প্রয়াত ভগিরথ দেববর্মা।

দিনমণি রূপিনী ঃ ডাঃ দিনমণি রূপিনী। পিতা গোবিন্দ রূপিনী (ডাক্তার) দিনমণি বাবু একজন এম. বি. বি. এস ডাক্তার। গ্রাম ভৃগুদাস বাড়ি। এমন বর্ধিষ্ণু উপজাতীয় গ্রাম ত্রিপুরায় বিরল।

দেবব্রত দেবরায় ঃ ত্রিপুরার একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধকার। শিক্ষা বিষয়ক মৌলিক রচনার জন্যে তিনি বিদগ্ধমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। বিভিন্ন সেমিনারে তিনি প্রায়শঃ ঘোষকের ভূমিকা পালন করেন। আগরতলায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। ঠিকানা ঃ কৃষ্ণায়ন, এডভাইজার চৌমুহনী, আগরতলা।

দা অমূল্য ঃ অমূল্য দেববর্মা, বাবার নাম রাজেন্দ্র দেববর্মা। গ্রাম রামনগর-তুইদুবাড়ি। পেশায় শিক্ষক। ধর্মে খ্রীষ্টান। সম্পর্কে আমার আপন মামাতো সম্বন্ধী।

দশরথ দেববর্মা ঃ বিশিষ্ট সি. পি. আই (এম)কর্মী। গ্রাম দক্ষিণ হেরমা, রঙমালা। সম্পর্কে আমার জেঠাশ্বশুর।

দীপক দেব ঃ ত্রিপুরার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখা রক্তমাংসের শরীর যুবক-যুবতীদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। তাঁর লেখা উপন্যাসের সংখ্যা প্রচুর। তিনি বোধ হয় ত্রিপুরায় সব থেকে বেশী উপন্যাস লিখেছেন। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে তিনি একজন ফ্রয়েডীয় ।

দেবীদা ঃ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে 'Books' বইয়ের দোকানের মালিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী অনার্স ও এম. এ-এর সব দুষ্প্রাপ্য বই সেখানে পাওয়া যায়। দেবীদা ইংরেজী সাহিত্যের খুঁটিনাটি খবর রাখেন এবং ইংরেজী সাহিত্যের দিকপালদের সম্পর্কে সমস্ত রকমের খবর জানেন। আমি ষাটের দশকে এবং আমার পুত্র নব্বয়ের দশকে ওই একই দেবীদার বইয়ের দোকান থেকে বই কিনেছি।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ শিশির ভাদুড়ীর আমলের বিখ্যাত অভিনেতা। গত কয়েক বছর আগে ত্রিপুরার লেখক দীপক দেবের সঙ্গে গিয়ে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির প্রাসাদোপম বাড়ির অন্দরে ঢুকে অনেক কিছু দুষ্প্রাপ্য জিনিষ দেখি।

দীপ্তা দেববর্মা ঃ লালুকর্তার জামাই কৃষ্ণ ঠাকুরের জামাইয়ের অতি সুন্দরী কন্যা। প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুশান্ত চৌধুরীর স্ত্রী তাঁর রঙের খুব তারিফ করতেন। বিবাহ সূত্রে তিনি আগরতলার শ্রীযুক্ত কপিল ভট্টাচার্যের স্ত্রী।

দেসমন্ড খার্মাফ্লেং : শিলঙের খাসিভাষার কবি। ইংরেজী ভাষার কবি হিসেবে সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তাঁর নাম আছে। তিনি শিলঙের North-East Hills Universityতে পড়ান। একবার তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চল সাহিত্য সম্মেলনে আগরতলায় এসে কর্ণেল চৌমুহনীর ব্রডওয়ে হোটেলে ছিলেন। তিনি ককবরক ভাষার জনপ্রিয় কবি চন্দ্রকান্ত মুড়াসিংয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

দুলাল চক্রবর্তী : ডঃ দুলাল চক্রবর্তী। বাংলার জনপ্রিয় অধ্যাপক। দীর্ঘদিন আগরতলার উইমেনস্ কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি মূলত ভাষাতত্ত্বের লোক। বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অধ্যাপক ডঃ দ্বিজেন বসুর কাছে তিনি ডক্টরেট করেন।

দিব্যেন্দু নাগ : আগরতলার প্রথিতযশা কবি। দিব্যেন্দু নাগকে বাদ দিয়ে ত্রিপুরার আধুনিক কবিদের কথা ভাবাই যায় না। কবিতার ভালো সমালোচক। বিভিন্ন সেমিনার এবং কবিতা পাঠের আসরে তাঁর বিতর্কিত এবং বিদগ্ধ বক্তৃতা সকলে মুগ্ধ হয়ে শোনেন। পেশায় তিনি একজন ইঞ্জিনীয়ার।

দুর্গাদাস সিকদার : বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি একসময় আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দী জীবন কাটিয়েছেন। বর্তমানে তিনি বিশ্রামগঞ্জের সি. পি. আই (এম)-এর বিশিষ্ট জনপ্রিয় নেতা। তাঁর মতো নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট দেখাই যায় না। ত্রিপুরী-বাঙালী উভয় সম্প্রদায়ের কাছে তিনি দুগা মাস্টার বলে পরিচিত। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বিশ্রামগঞ্জের কাছে খেঙরাবাড়িতে ভাষাক্যাম্পে। তখন তিনি বিশ্রামগঞ্জের সি. পি. আই-এর প্রধান ছিলেন। তারপর সি. পি. আই (এম) পার্টিতে যোগদান করেন। প্রায় শতবর্ষী এই জননেতার সঙ্গে দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছি।

দিলীপ রায় : চড়িলাম-বিশ্রামগঞ্জ এলাকার সি. পি. আই (এম) পার্টির বিশিষ্ট যুব কর্মী। সম্ভবত তিনি সি. পি. আই (এম) পার্টির চড়িলাম লোক্যাল কমিটির সেক্রেটারিও। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে শ্রীমান দিলীপ পার্টির সামনের সারিতে এসেছেন। উপজাতি এলাকায় তার জনপ্রিয়তা খুব বেশী। চড়িলামের শ্রীযুক্ত ঊষা ডাক্তার তার পিতৃদেব।

দিনেশ দেববর্মা : লালসিংমোড়ার কাছে গোপাল ঠাকুর পাড়ায় বাড়ি। তিনি স্বনামধন্য গোপাল ঠাকুরের পৌত্র এবং মথুর ঠাকুরের পুত্র। তিনি একাধিকবার চড়িলাম কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। একসময় তিনি যতনবাড়ী থেকে কন্ট্রাক্টারি করে সুনাম অর্জন করেন।

দুর্লভী দেববর্মা : বিশ্রামগঞ্জের কাছে পদ্মনগরের জনপ্রিয়তম সি. পি. আই (এম)-এর মহিলা গাঁও প্রধান। তাঁর মতো একনিষ্ঠ মহিলা কমিউনিস্ট কর্মী আমি জীবনে কম দেখেছি। তাঁর স্বামী মনীন্দ্র দেববর্মাও সাম্যবাদী আন্দোলনে বিশ্বাস করেন। পদ্মনগরে মিটিংয়ে গিয়ে একাধিকবার কমরেড দুর্লভীর বাড়িতে অন্ন ভক্ষণ করেছি।

দা খগেন্দ্র : খগেন্দ্র দেববর্মা। গ্রাম চড়িলামের চন্তীঠাকুর পাড়া। রাজার আমলের স্বনামধন্য চন্তীঠাকুরের পৌত্র। তাঁর কাছ থেকে আমি উপজাতীয় জীবন সম্পর্কে অনেক কথা শুনি। সম্পর্কে তিনি আমার দাদাশ্বশুর।

দেবব্রত দেব : ত্রিপুরার বিশিষ্ট ছোটগল্পকার। তাঁর ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের জন্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পে ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির কথ্যভাষা এক ওজস্বিনী রূপ পেয়েছে। তাঁর গল্পের প্লটও ত্রিপুরার অতি সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে। আমার ধারণা, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দেবব্রত দেব-ই হলেন সব থেকে শক্তিমান ছোটগল্পকার। ত্রিপুরার এই ছোটগল্পকার বয়সে যুবক এবং একজন সংগঠক-লেখক। তাঁর জনপ্রিয় গল্প সংকলনগুলো হলো : স্বতন্ত্র সূর্যোদয়, মাটি ও অন্যান্য গল্প, এই আমি দিগন্ত ও অন্য কেউ।

দিনেশ সাহা : ত্রিপুরার সি. পি. আই পার্টির বিশিষ্ট তাত্ত্বিক নেতা। চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় তিনি হাজারীবাগ জেলে গিয়েছিলেন ত্রিপুরার অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। বর্তমানে তিনি সি. পি. আই পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য।

দুলালী দেববর্মা : সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার স্ত্রী ও নলিনী ঠাকুরের কন্যা। সি. পি. আই-এর এক আন্ডার গ্রাউন্ড গামী বিপ্লবীকে বিয়ে করে তাঁকে সীমাহীন দুঃখকষ্টের জীবন-যাপন করতে হয় একসময়। পরে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে সচ্ছল অবস্থায় ছিলেন।

দুলাল চক্রবর্তী : ব্যাঙ্কের অফিসার। আগরতলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

দা বাদু : বাদুচন্দ্র দেববর্মা। পূর্বে বাড়ি ছিলো চড়িলামের পুরনো লেম্বুথল গ্রামে। পরে বিয়ে করে রঙমালায় ঘরজামাই ওঠেন। তিনি প্রথম দিকে জনশিক্ষা সমিতির কর্মী ছিলেন এবং পরে সি. পি. আই-এর সদস্য ছিলেন। এরপরে কমিউনিস্ট পার্টি দু'ভাগ হয়ে যাবার পর তিনি সি. পি. আই পার্টিতেই ছিলেন। পরে অবশ্য ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক হয়ে যান। প্রয়াত বাদু দেববর্মা ছিলেন একজন লোক গল্পকার। তিনি তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে ককবরক রূপকথা বলে সকলকে বিশেষ করে শিশুদের মুগ্ধ করে রাখতেন। তাঁর খুব উপস্থিত বুদ্ধি ছিলো। সদাহাস্য ময় বাদুবাবু ছ'ফুটের ওপর লম্বা ছিলেন এবং তার গায়ের রঙ ছিলো গৌরবর্ণ। তিনি চড়িলাম সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের জনপ্রিয় চিকিৎসক ডাঃ ফনী চক্রবর্তীর ধর্মপুত্র ছিলেন।

দুলাল ঘোষ ঃ ত্রিপুরার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখা 'অগ্নিসূত্র' উপন্যাস ত্রিপুরা ও কলকাতায় খুব নাম করেছে। 'হেই সঞ্জীব' নামে গল্প সংকলন আছে তাঁর।

দিনেশ দেববর্মা ঃ হেরমাবাড়ির রমেশ দেববর্মার পুত্র এবং ক্ষেত্রমণি দেববর্মার পৌত্র। পেশায় শিক্ষক। খুব সাহসী ও পরোপকারী যুবক। সম্পর্কে আমার খুড়তুতো শালা।

দিলীপ দা ঃ দিলীপ গুপ্ত। উত্তর চব্বিশ পরগণার নববরাকপুরের মাড়োয়ারী বাগানের প্রচিন বাসিন্দা। তাঁর বাড়ির পার্শেই আমার নিজের দাদাদের বাড়ি।

দেবব্রত কলই ঃ বর্তমানে তিনি ত্রিপুরা এরিয়া স্বশাসিত জেলাপরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য। একসময় তিনি ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির ডাকসাইটে নেতা ও অগ্নিবর্ষী নেতা ছিলেন। পরে মতপার্থক্যের কারণে যুব সমিতির থেকে বেরিয়ে ত্রিপুরা হিলস পিপল পার্টি তৈরী করেন এবং ত্রিপুরার বামফ্রন্টের শরিকের মতো হয়ে বামফ্রন্টের সঙ্গেই থাকেন। তিনি অম্পি সিটে প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রীকে হারিয়ে ত্রিপুরার বিধানসভার বিধায়ক নির্বাচিত হন। পরে বামফ্রন্টের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে তিনি তাঁর সহযোগীদের নিয়ে আই. পি. এফ টি পার্টি গঠন করে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বামফ্রন্টকে পরাজিত করে পার্টিকে নাটকীয়ভাবে জেলাপরিষদের ক্ষমতায় বসান। তখন তাঁকে এ. ডি. সি-র সর্বেসর্বা বলা যায়।

দিবাচন্দ্র রাঙ্খল ঃ ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির একসময়কার বিখ্যাত নেতা ও বাগ্মী। পরে তিনি যুব সমিতির সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। একসময় তিনি ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির এম. এল. এ ছিলেন।

দেবরায় ঃ ডঃ দেবরায়। জি. বি. হাসপাতালের ডাক্তার।

দেওয়ান ঃ বঙ্গঠাকুর দেওয়ান। তিনি ত্রিপুরার রাজার দেওয়ান ছিলেন। তিনি ছিলেন খুব সৌখীন লোক। ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করতেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ত্রিপুরার মহারাজার তরফ থেকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়েছিলো। তিনি সুপুরীবাগানে এক বিশাল ভূখন্ডের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁর পৌত্র জ্যোতিষ দেববর্মার দখলে মাত্র ক'গন্ডা জমি আছে।

দীনবন্ধু ঃ দীনবন্ধু নমঃ। দক্ষিণ চড়িলামের বাল্লাছড়ি পাড়ায় তার বাড়ি। রাজনীতিতে কংগ্রেস। বাল্লাছড়ি পাড়ায় উঠতেই তার একটা চায়ের দোকান ছিলো।

দেবাশিস সাহা ঃ ত্রিপুরার প্রতিভাবান চিত্র পরিচালক। বলা যেতে পারে ১৯৯০ সাল থেকে চিত্র পরিচালনা করতে শুরু করেছেন তিনি। 'রূপান্তর' নামে ত্রিপুরায় তিনিই প্রথম বাঙলা ফিচার ফ্লিম করেন। এছাড়া Muiya-Role of bamboo in tribal life and culture এবং Ker Festival নামে দু'খানা উৎকৃষ্টমানের উপজাতীয় তথ্যচিত্র তৈরী করেছেন।

দিলীপ ঃ দিলীপ বর্মণ। কয়েক বছর আগে তার বাবা নৃপেন বর্মণ বিশ্রামগঞ্জের ইটভাট্টার বাড়িতে উগ্রপন্থীদের দ্বারা নৃশংসভাবে নিহত হন।

দীনেশ মজুমদার ঃ আস্তাবল বাজারের স্থায়ী দোকানদার।

দিলীপ সাহা ঃ সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার মেয়ে বুটলির স্বামী। পেশায় দোকানদার ও কন্ট্রাক্টার। বুধজং বয়েজ হাইস্কুলের কাছে বাড়ি। তাঁর বাবার সূর্য চৌমুহনীতে বিরাট এক লটকনের দোকান আছে।

দিলীপ দা ঃ দিলীপ গুপ্ত (দাশগুপ্ত)। নববারাকপুরের মাড়োয়ারী বাগানের বাসিন্দা। আমাদের নববারাকপুরের বাড়ির প্রতিবেশী। দিলীপদার মেয়ে রূপার বিয়ে হয়েছে আগরতলার অফিস লেনের জয়ন্ত গুপ্তর সঙ্গে।

দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ঃ দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত আগরতলা শহরের একটি প্রবাদপুরুষ নাম। ত্রিপুরার প্রাচীনতম স্বাধীনতা সংগ্রামী তিনি। বয়স এখন নব্বইয়ের কাছাকাছি। বঙ্গবাসী কলেজে লেখাপড়া করার সময় 'অনুশীলন' পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং সন্ত্রাসবাদী কাজে নিজেকে দৃঢ়চেতাভাবে লিপ্ত রাখেন। বহুবার কারাবরণ করেছেন তিনি। ত্রিপুরায় তাঁরই কারাবাসের পরিধিকাল বোধহয় সব থেকে বেশী। দমদম সেন্ট্রাল জেলে থাকার সময় মহাত্মা গান্ধীর দর্শন পান। এই জেলে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও তাঁর সহযোগীরা উনচল্লিশ দিন ধরে হাঙ্গার স্ট্রাইক করেন। আন্দামানের জেলবন্দীদের ফেরার ও সমস্ত জেলবন্দীদের স্ট্যাটাসের দাবিতে। তখন সেখানে মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ বসু, শরৎ বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, মহাদেব দেশাই ও মুজাফ্ফর আহম্মেদ প্রমুখ জননেতা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। স্বাধীনতার ক'বছর আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সি. পি. আই পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন তাঁর একান্ত সহযোগী বন্ধু বীরেন দত্তের সঙ্গে। দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারী। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে প্রাক-স্বাধীনতা যুগেই কমিউনিস্ট পার্টির ক্লাস নিতেন। আগরতলা শহরে এই পার্টি ক্লাস হতো সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার শ্বশুর বনমালীপুরের নলিনী ঠাকুরের বাড়ি। সেখানে কাঠের এক দোতলা বাড়িতে এই ক্লাস হতো। স্বাধীনতার পরেও তিনি জেলে যান এবং আগরতলার সেন্ট্রাল জেলে থাকেন। এরপরে পারিবারিক কারণে ত্রিপুরা সরকারের চাকুরী গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং বি ডি ও হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরীতে থাকাকালীন রুদ্রসাগরের মৎস্যচাষীদের নিয়ে সমবায় গড়ে তোলেন এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত মৎস্যচাষীদের মৎস্যচাষ নির্ভর সুষ্ঠু

পুনর্বাসন দেন। রুদ্রসাগরের মৎস চাষীরা এখনো তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন পরম শ্রদ্ধাভরে। রুদ্রসাগরকে একটা আধুনিক মৎস্যাগার হিসেবে গড়ে তোলার কৃতিত্ব তাঁরাই। দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে ত্রিপুরার উপজাতির সমস্যা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সেইসব সমস্যা নিরসনের জন্যে অনেক মৌলিক প্রবন্ধও লিখেছেন। মহারাজ বীরবিক্রমের সময় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কাজে একবার টাকারজলায় যান। তখন তাঁকে এক প্রবীণ উপজাতি ভদ্রলোক বলেন, 'বাঙালীরা তো সব চোর।' এই কথা তিনি আগরতলায় এসে একটি কাগজে ছাপেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই কাগজের সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করা হয় মহারাজের নির্দেশে এবং তাঁকে ত্রিপুরা থেকে বহিষ্কার করা হয়। দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তদের আদি নিবাস ছিলো ফরিদপুর জেলায়। তাঁর পিতৃদেব যতীন্দ্রমোহন সেন মাস্টারির চাকুরী নিয়ে ত্রিপুরায় আসেন এবং পরে সেনসাস অফিসার হন। দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর বাড়ি আগরতলার মেলারমাঠে। দেবুবাবু এখনো সি. পি. আই-এর প্রথম সারির নেতা। এই বয়েসেও কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'কালান্তর' ও নিউএজ' ফেরি করেন। তিনি তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর বই লিখেছেন। ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ওপরও তাঁর মৌলিক বই আছে। তাঁর বইগুলোর নাম ঃ ত্রিপুরার গণআন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ইতিকথা; এবং স্মৃতি আলোয়।

ধ্রুব ঃ ধ্রুব নারায়ণ পাল। আমার ছোটদি নীলিমা পালের বড়ো ছেলে, আমার ভাগ্নে। সিভিসি ইঞ্জিনীয়ার। নিবাস অরবিন্দ পল্লী, বারাসত, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

ধনমাণ সিং ঃ সি. পি. আই পার্টির বিশালনগর বিভাগের সম্পাদক। ত্রিপুরা জুট মিলের জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা। ত্রিপুরা রাজ্য এ. আই. টি. সি'র সম্পাদক। উৎকৃষ্টমানের শ্রমিক নেতা।

ধীরেন্দ্র কবিরাজ ঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ। চড়িলামে তিনি ধীরেন্দ্র কবিরাজ নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথমে চড়িলামের পুরোবাজারে তার একটি ওষুধের দোকান ছিলো। পরে বাজার পুড়ে যাবার পরে তাঁর ছোট ভাই বীরেন্দ্র ও তিনি নতুন বাজারে ওই ওষুধের দোকান স্থানান্তরিত করেন। ধীরেন্দ্রবাবু চড়িলামে জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা ছিলেন।

ধুর্জটি গুপ্ত ঃ ত্রিপুরার পাব্লিসিটি ডিপার্টমেন্টের অফিসার।

ধীরেন্দ্র ক্যাপ্টেন ঃ আগরতলার প্রতাপ রায় রোডের অতি সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মাফ্রন্টের যুদ্ধে গিয়ে খুবই নাম করেছিলেন। শোনা যায়, আগরতলায় সর্বপ্রথম তিনি স্কুটার ক্রয় করেন। দীর্ঘদেহী এই ক্যাপ্টেনের একখানা অতিপ্রচিন আটচালা ঘর ছিলো। এমন ঘর আগরতলা ঠাকুর লোকদের বাড়ি সাধারণত দেখা যেতো না। তিনি প্রায় শতবর্ষী হয়েছিলেন। শেষ বয়সে তিনি প্রায় বধির হয়ে যান। তিনি প্রয়াত হলে পর তাঁর ছেলেরা ওই আটচালা ঘর ভেঙে ফেলে দালান বাড়ি করেছেন। শোনা যায় ধীরেন্দ্র ক্যাপ্টেনের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে রাঙ্খল উপজাতিদের রক্তের সম্পর্ক ছিলো।

ধীরাজ গুহ ঃ আগরতলা কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী। একসময় সি. পি. আই (এম) পার্টিব জনপ্রিয় যুব নেতা ছিলেন। পরে মতপার্থক্যের কারণে সি. পি. এম থেকে বেরিয়ে তাঁর সহযোগীদের নিয়ে পি. ডি. এফ পার্টি করেন। তাঁর লেখার হাত খুব ভালো। একজন মননশীল প্রবন্ধকার। লেখা খুব স্বচ্ছ ও হৃদয়গ্রাহী। একজন বাগ্মী হিসেবেও তার নাম আছে। ধীরাজ গুহদের পূর্ব নিবাস নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানার শাহাপুর গ্রামে। তাঁদেরকে গুহরাজা বলা হতো। তাঁদের বাড়ির নাম শাহাপুব রাজবাড়ি।

ধীরেন্দ্র দেববর্মা ঃ হেরমার যোগেন্দ্র দেববর্মার ছেলে। তার ডাকনাম তুইনা। হেরমা বাজারে তার একটা দীর্ঘদিনের মুদিখানা দোকান আছে। বর্তমানে সে রেশনশপের মালিক।

ধ্রুব কর্তা ঃ ধ্রুবকিশোর দেববর্মা। তাঁর পিতৃদেবের নাম জগুকর্তা, তাঁর মেঘ কর্তার বংশধর। জগুকর্তাদের গোল বাজারের কাছে পূর্বতন এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন-এর পেছনে এখনও প্রচিন মডেলের সুন্দর বাড়ি আছে। এয়ারলাইন্স-এর জায়গাটি নাকি ছিলো ধ্রুবকর্তাদের। বর্তমানে ধ্রুবকর্তার গোলবাজারের প্রচীন বাড়ির পাশে চারতলা আধুনিক বাড়ি আছে। কর্তা এখন প্যালেস কম্পাউন্ডের ওয়েস্ট গেটে সুরম্য অট্টালিকা করেছেন। আমি এই অট্টালিকার দোতলায় ১৯৯৭-এর ৬ই ডিসেম্বর থেকে ২০০০ সালের ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অতি সুখে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে ছিলাম। ধ্রুবকর্তা মোটর ভেহিকলস-এ চাকরি করতেন। এই কর্তা ত্রিপুরার রাজপরিবারের অন্যান্য কর্তাদের মতো নিজেকে আড়াল করে রাখেননি। তিনি তাঁর রাজকীয় আভিজাত্য বজায় রেখেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে বেশ স্বাভাবিকভাবেই মিশতে পারেন। প্রাতর্ভ্রমণ করে তিনি প্রায়ই কর্ণেল চৌমুহনীর তপন সাহার চায়ের দোকানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বসে চা পান এবং অন্যদেরও খাওয়ান এবং নানা প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্য দিয়ে সেখানে দীর্ঘক্ষণ থাকেন ও বলা যেতে পারে বেশ উপভোগ্যভাবে আসর জমিয়ে রাখেন। তাঁর প্যালেস কম্পাউন্ডের ওয়েস্ট গেটের বাড়ির নাম বাবাজী নিকেতন। ধ্রুবকর্তা চাকুরী জীবনে 'ডেপুটী ট্রান্সপোর্ট কমিশন' (মোটর ভেহিকলস ডিপার্টমেন্ট)-এর অফিসে উর্ধ্বতন পদে আসীন ছিলেন। ধ্রুবকর্তা তাঁদের গোলবাজারের খোশমহলের বাড়ি ছেড়ে প্যালেস কম্পাউন্ডের পশ্চিম গেটের নতুন বাড়িতে চলে আসেন ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে।

নৃপেন চক্রবর্তী ঃ নৃপেন চক্রবর্তী ত্রিপুরার বামফ্রন্টের আমলে দু'দুবার সি. পি. আই (এম) পার্টির নেতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অনেকে বলেন প্রথম বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি দারুণভাবে সফল এবং তিনিই নাকি ত্রিপুরার সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী। বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী হবার আগেও তিনি সি. পি. আই (এম)- সি এফ ডি জনতা রাজের সময়কালেও স্বল্পকালের

জন্যে মন্ত্রী হয়েছিলেন। প্রথম বামফ্রন্টের আমলে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি উপজাতিদের পশ্চাদপদ অর্থনীতির আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে উপজাতি এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে তিনি LAMPS এর প্রবর্তন করেন। এই প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে 'অকুপেশন্যাল চেঞ্জ' আনার চেষ্টা করেন। তাঁর সময়েই তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেবের সহায়তায় তিনি বামফ্রন্টের নেতা হিসেবে ত্রিপুরার অবহেলিত ককবরক ভাষাকে রাজ্যের সরকারী ভাষার মর্যাদা দান করেন এবং বিদ্যালয়ের প্রাথমিকস্তরে তা প্রবর্তন করে KBT (ককবরক টিচার) নিয়োগে করেন। এই সময়ে ত্রিপুরার উপজাতীয় অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সাধারণ উপজাতিরাও ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের জনমুখী অর্থনীতির ফল ভোগ করে দারুণভাবে উপকৃত হন। অনেকে বলেন ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার গণতান্ত্রিক ত্রিপুরায় উপজাতিদের জন্যে স্বর্ণযুগ। কিন্তু চাঁদেও কলঙ্ক আছে। তাঁর প্রথম মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে ত্রিপুরার ১৯৮০ সালের জুনে ভয়াবহ জাতিদাঙ্গা দেখা দেয়। এই দাঙ্গায় বাঙালী-উপজাতির লোকের নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন ত্রিপুরার উপজাতিরা। এই দাঙ্গা হয়েছিলো, অনেকে বলেন, চক্রবর্তী মশায়ের একটা ভুল থিয়োরির জন্যে। একদিকে তিনি উপজাতিদের যে আইনী জমি হস্তান্তরের জন্যে উঠে পড়ে লাগেন এবং অন্যদিকে বাঙালীদের মুখ দিয়ে বলান 'রক্ত দেবো জমি দেবো না।' আর ঠিক এই সময়ে 'আমরা বাঙালী' পার্টি ত্রিপুরায় ভয়ালরূপে আত্মপ্রকাশ করে। উপজাতিরা বলছেন বেআইনী জমি ফেরত দিতেই হবে। অন্যদিকে আমরা বাঙালী দল বলছেন — 'রক্ত দেবো জমি দেবো না।' কাজেই দুটো পরস্পর বিরোধী শক্তি একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ত্রিপুরায় মহা জাতিদাঙ্গার সৃষ্টি করেন এবং হাজার হাজার বছরের ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির মধ্যে বিরাজমান শান্তি-সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। যার ক্ষত এখনো শুকোয়নি। নৃপেন চক্রবর্তীর আর একটি বড়ো ভুল হলো উপজাতি এলাকায় কমিউনিটি ল্যান্ডের বিলোপ সাধন করা। ত্রিপুরার উপজাতি এলাকায় এখনো কমন প্রপার্টির খুব প্রয়োজন। নৃপেন চক্রবর্তী মশায় তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে তিন তিনবার পার্টি পরিবর্তন করেছেন। প্রথম জীবনে তিনি করেছেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩০ সাল পর্যন্ত। পরে সি. পি. আই পার্টিতে যোগ দিয়ে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এই পার্টিতে থাকেন। এবং যখন সি. পি. আই পার্টির জঠর থেকে সি. পি. আই (এম) পার্টির জন্ম হয়। তখন তিনি ওই নতুন পার্টিতে যোগদান করেন। পরে মতপার্থক্যের কারণে তাঁকে সি. পি. আই (এম) পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। বর্তমানে শতবর্ষী নৃপেন চক্রবর্তী আর কোনো পার্টির সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁর সাজানো বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি আক্ষেপ করে থাকেন। নৃপেন চক্রবর্তীরা ঢাকার লোক। তাঁরা ন'ভাই। প্রায় প্রতিটি ভাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর মাতৃদেবী ছিলেন স্বর্ণগর্ভা। নৃপেনবাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ডাঃ নন্দলাল চক্রবর্তী আগরতলার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। সি. পি. আই -এর সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাও একসময় তাকে (নৃপেন) পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে পার্টি থেকে বহিস্কাব করে নেপালে পাঠানোর প্রস্তাব কবেন। তখন তিনি কমরেড রাজেশ্বর রাওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ত্রিপুরায় চলে আসেন এবং তাঁর দাদা ডাক্তার নন্দলাল চক্রবর্তীর কাছে কিছুদিন থাকার পর তিনি ত্রিপুরার উপজাতি এলাকায় আত্মগোপন করেন 'জগৎদা' এই নামে। সম্ভবতঃ তখনই তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'লঙতরাই আমার ঘর' লেখেন। এর আগে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় সাব এডিটরের কাজ করেছিলেন, কাজেই লেখার হাত তার ভালোই ছিলো এবং তারই ফসলই বোধ হয় তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ উপজাতি জীবনের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর আলেখ্য লঙতরাই আমার ঘর। সব মিলিয়ে তিনিই ত্রিপুরার জনপ্রিয়তম মুখ্যমন্ত্রী এ-কথা। অনেকেই বলে থাকেন।

রেণুকা প্রভা ঃ আগরতলার স্বনামধন্য ঠাকুর মহিম কর্ণেলের দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয়াকন্যা।

নক্ষত্র রায় ঃ ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজা, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের ছোট ভাই। রবীন্দ্রনাথ মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও নক্ষত্র রায়ের কাহিনী নিয়ে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস রাজর্ষি লিখেছিলেন।

নীলমণি দেববর্মা ঃ ডাঃ নীলমণি দেববর্মা। ত্রিপুরার পাহাড়ের উপজাতিদের মধ্যে প্রথম পাশ করা ডাক্তার। ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা পুরুষ। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ত্রিপুরার স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তার পদ অলঙ্কৃত করেন। ভদ্র, বিনয়ী ও সুলেখকের জন্যে তাঁর খ্যাতি আছে। বিবাহ সূত্রে তিনি রাধামোহন ঠাকুরের প্রপৌত্রী ও যোগেশ ঠাকুর (দেববর্মণ)-এর কন্যা করবী দেববর্মণকে বিবাহ করেন। তিনি ককবরক ভাষায় উপজাতিদের মধ্যে অসুখ-বিসুখ ও তার প্রতিকারের উপর 'বেমার তাই কাসুনানি কক' ও 'বেমার তাই বিনি হামরিমুঙ' নামে দু'খানা বই লিখেছেন।

নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী। তিনি ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির অন্যতম নেতা। অনেকে মনে করেন দশরথ দেববর্মার পরে তিনিই উপজাতি-বাঙালীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী নেতা। ককবরক ও বাঙলা ভাষার কৃতী সাহিত্যিক। তিনি ককবরক ভাষার অন্যতম প্রখ্যাত ছোটগল্পকার। ১৯৬৭ সালে তিনি 'হাথাই' নামে একটা বই প্রকাশ করেন। সেই বইয়ে কতকগুলো অতি উৎকৃষ্টমানের ছোটগল্প আছে। তিনি একসময় 'চবা' নামে ককবরক ভাষায় একখানা সাহিত্য-রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে এই পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে রাখেন দুংগুর। নগেন্দ্র জমাতিয়া তাঁদের জমাতিয়া সমাজের গড়িয়াপূজার সাতদিন (বিছু হরচিনি) উৎসবকে কেন্দ্র করে যে-বই লেখেন তা চশায়ের 'ক্যানটারবারি টেলস'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া 'বলঙ' (উগ্রপন্থী?) নামে তিনি সমাজ সংস্কারমূলক একখানি বিতর্কিত বইও

লেখেন।

নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা ঃ তাঁকে সকলে এন. সি. দেববর্মা বলে ডাকেন। বর্তমানে তিনি আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের অধিকর্তা। উপজাতি ও বাঙালীদের মধ্যে তিনি ত্রিপুরার অন্যতম বুদ্ধিজীবী। মূলত তিনি তাঁর মাতৃভাষা ককবরকের কনিষ্ঠ লেখক। ককবরক ভাষায় লেখা তাঁর বহু মূল্যবান সমাজ সচেতনমূলক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি সার্থক অনুবাদকও বটেন। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র মতো কঠিনভাবের ককবরক অনুবাদ করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন তিনি। 'বলাকা'র ককবরক অনুবাদ তিনি করেছেন 'তাখুম বদল'। বইখানি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরক সার্টিফিকেট কোর্সে পাঠ্য হয়েছে। এছাড়া তাঁর মাতৃভাষা ককবরক সেখানোর জন্যেও দু'খানি জনপ্রিয় বই লিখেছেন। প্রথম বইখানার নাম 'ককবরক ককলাম' (ককবরক কথোপকথন) এবং ককবরক রেপিডেকস্। নগেন্দ্র দেববর্মার সাহিত্যিক সভার সাথে সাথে একটা রাজনৈতিক সত্তাও আছে। তিনি ত্রিপুরার উপজাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেন এবং সেই লক্ষ্যে তিনি ত্রিপুরার বিশেষ উপজাতীয় দলে নিজেকে জড়িয়েও রেখেছেন। ত্রিপুরার উপজাতিদের এক অংশের কর্মচারী নেতাও বটেন তিনি।

নরেন্দ্র দেববর্মা ঃ নরেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের দক্ষিণ হেরমা। অবশ্য এখন তিনি মূল হেরমা গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তিনি কর্মজীবনে ভেটেরেনারি বিভাগে চাকরি করতেন। তাঁর পরিবারের ছেলেরা সব উচ্চশিক্ষিত এবং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত।

নিতাইচন্দ্র দেববর্মা ঃ নিতাইচন্দ্র দেববর্মার বাড়ি ধলেশ্বরের স্কুলের একেবারে পাশে। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ দেববর্মা। তিনি তহশিল কাছারির নায়েব ছিলেন। ভগীরথ দেববর্মাকে সকলে ভগীরথ বলে জানেন। ভগীরথ দেববর্মার আগের বাড়ি ছিলো চড়িলামের রামনগরে। তিনি আমার আপন শাশুড়ীর কাকা। আমার শাশুড়ীর বাবার নাম ছিলো চন্দ্রকুমার দেববর্মা। চন্দ্রকুমার দেববর্মা ও ভগীরথ দেববর্মা দুই ভাই। কিন্তু মা আলাদা। নিতাইচন্দ্র দেববর্মা সম্পর্কে আমার মামাশ্বশুর। শোনা যায় তাঁরা একসময় বাঙলাদেশের চাঁদপুরের দিকের লোক ছিলেন এবং তাঁদের সম্প্রদায় ছিলো ককবরক ভাষী মুড়াসিং।

নগেন্দ্রবাবুর মা ঃ নগেন্দ্রবাবুর মায়ের নাম শ্রীমতী গান্ধীকন্যা জমাতিয়া। তাঁর বাপের বাড়ি উপজাতীয় বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম শিলঘাটী। তাঁর আপন ভাই ছিলেন প্রখ্যাত জনার্দন দারোগা। যাকে দাঙ্গাবাজরা তাঁর নিজ বাসভবনে গুলী করে হত্যা করেছিলো। নগেন্দ্রবাবুর মা খুব বুদ্ধিমতী ও মৃদুভাষী। কিন্তু যে-কোনো সামাজিক সমস্যা সমাধান করতে তিনি অত্যন্ত বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন।

নকুল দাস ঃ নকুল দাস মশায় একজন বাংলার এম. এ. একসময় সি. পি আই (এম)-এর ডাকসাইটে জনপ্রিয় এম. এল. এ ছিলেন। পরে মতাদর্শগত কারণে সি. পি. আই (এম) পার্টি পরিত্যাগ করে নবগঠিত পি. ডি. এফ পার্টিতে যোগদান করেন। সুবক্তা ও সুলেখক হিসেবে তাঁর নাম আছে।

নাড়ু ঃ ইন্দ্রনাথ কুন্ডু চৌধুরী। আমার আপন সেজদা শ্রীযুক্ত শক্তিরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। কলেজের পড়াশুনো শেষ করে শ্রীমান নাড়ু এখন ব্যবসায়িক জীবন শুরু করেছে।

নকুল দাস ঃ নকুল দাসের বাড়ি আগরতলার উপকণ্ঠে জগৎপুরে। কবি নকুল দাস হিসেবে তিনি খ্যাত। যুব কবিদের মধ্যে তাঁর একটা আলাদা স্বাতন্ত্র্য আছে। কর্মজীবনে তিনি একজন এ. জি-র কর্মী। তিনি উন্নতমানের ফুলচাষের জন্যে একসময় খুব নাম করেন। পুষ্প প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে তিনি পুরস্কারও পেয়েছেন।

ননীগোপাল দেববর্মা ঃ বাঁশতলী গাঁওসভার মোরচাবাড়িতে তাঁর বাড়ি। এলাকার খুব প্রভাবশালী সি. পি. আই (এম) নেতা। একাধিকবার তিনি গাঁওসভার প্রধান হয়েছেন। তাঁর বাড়িতেই সবসময় নির্বাচনী খাওয়া-দাওয়া হতো।

নরেন্দ্র দেববর্মা ঃ চড়িলামের কাছে চন্ডীঠাকুর পাড়ায় বাড়ি। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ও সামাজিকভাবে সম্মানীত চন্ডী ঠাকুরের ছেলে।

নন্দিনী ঃ নন্দিনী কুন্ডু চৌধুরী। আমার বড়ো মেয়ে। সোস্যাল সায়েন্সে বি. এস. সি পাশ করেছে। বর্তমানে সে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের হেড কোয়ার্টার খুমুলুঙে ড্রপআউট কোচিং সেন্টারে শিক্ষকতা করে। তার লেখার হাত বেশ ভালো। আগরতলার সংবাদপত্রে মননশীল প্রবন্ধ লেখে সে। নন্দিনীর ডাক নাম তানিয়া।

নিবারণ দেববর্মা ঃ বাড়ি চড়িলামের রঘুনাথ ঠাকুর পাড়ায়। তিনি ছিলেন সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

নৃপেন্দ্র মজুমদার ঃ চড়িলামের বিখ্যাত ধানাঢ্য ব্যক্তি। আগরতলায় কামান চৌমুহনীতে তার প্রসিদ্ধ নিউস্টার হোটেল ছিলো। নৃপেন্দ্র মজুমদার চড়িলাম এলাকার আধুনিক আলুর খামারের মালিক হিসেবে একসময় সারা ত্রিপুরায় খুব নাম করেছিলেন। তাঁর বিরাট এক ভেড়ার পাল ছিলো। ওই ভেড়ার মাংস তিনি তাঁর নিউস্টার হোটেলে যোগান দিতেন। খুব দিলদরিয়া লোক হিসেবে তাঁর খুব নাম ছিলো।

নারায়ণ রূপিনী ঃ বর্তমানে তিনি ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের বনমন্ত্রী। গত নির্বাচনে চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের তিনিই ছিলেন প্রথম চেয়ারম্যান। সি. পি. আই (এম) পার্টির একজন অন্যতম তাত্ত্বিক প্রবক্তা। চম্পকনগরের কাছে ভৃগুদাসবাড়ীতে তাঁর নিজের বাড়ি। তাঁর বাড়ির বেহাল অবস্থা দেখলে মনেই

হয়না তিনি যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন বা বর্তমানে একজন মন্ত্রী।

নিরঞ্জন দেববর্মা : নিরঞ্জন দেববর্মা বর্তমানে ত্রিপুরার সমবায়মন্ত্রী। একসময় তিনি ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষও ছিলেন। আত্মীয়তা সূত্রে তিনি সি. পি. আই (এম) পার্টির প্রথম সারির নেতা সুধন্বা দেববর্মার আপন ভায়রাভাই। বর্তমানে সি. পি. এম-এর ককবরক ভাষার সাহিত্য সংস্কৃতি 'লামা' পত্রিকার সম্পাদক। শোনা যায়, তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা বাঙলাদেশের চাঁদপুর থেকে ত্রিপুরায় চলে আসেন।

ননীগোপাল দেববর্মা : বর্তমানে তিনি বিশ্রামগঞ্জ স্কুলের পাশে থাকেন। পেশায় শিক্ষক। তাঁর পূর্বতন বাড়ি চড়িলামের রামনগরে। তিনি পূর্বে ত্রিপুরা হিলস্ পিপল পার্টি করতেন এবং দেবব্রত কলইয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। সম্পর্কে তিনি আমার মামাশ্বশুরের ছেলে, আমার স্ত্রীর বড়োভাই।

নকুল রায় : মধ্যবয়স্ক নকুল রায় আগরতলায় একজন প্রখ্যাত কবি। কবিতার স্বাতন্ত্র্যের জন্যে তার নাম আছে। তিনি একজন উঁচুমানের সাহিত্য সমালোচক। আর্থিক দিক থেকে তিনি বড়ই দুর্বল, কিন্তু তাঁর লেখনী খুবই সবল।

নন্দলাল কর্তা : নন্দলাল দেববর্মা। তিনি মহারাজ পুত্র। কর্মজীবনে তিনি ত্রিপুরা সরকারের সেক্রেটারি ছিলেন। খুব মেজাজী কর্তা হিসেবে তাঁর নাম ছিলো। যে-কোন লোককে নানি যে-কোন কথা বলে দিতেন তিনি। কর্ণেল চৌমুহনী ও বিদুর কর্তার মাঝখানে একসময় তাঁর নয়নমনোহর বাড়ি ছিলো। তাঁর বিলিতি কুকুর ছিলো সাত-আটটার মতো এবং তাদের নিজস্ব ঘর ছিলো। নন্দলাল কর্তার বাড়ির বিশেষ আকর্ষণ ছিলো তার ফুলবাগান। মেজাজী কর্তা হলেও তার মন ছিলো খুব নরম এবং তিনি দান-ধ্যান করতেন দু'হাতে।

এন সি দেববর্মা : আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের বর্তমান অধিকর্তা। এন সি দেববর্মা ও নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা একই ব্যক্তি।

নিতাই আচার্য : নিতা আচার্য বাঙালী হয়েও ত্রিপুরার ককবরক ভাষার একজন গবেষক ও লেখক। তার লেখা ককবরক অভিধান খুব জনপ্রিয়। এছাড়া তিনি ককবরক শিক্ষাব জন্যে অতি সহজভাবে ককবরক ও বাঙলা ভাষায় প্রায় ১৪ খানা বই প্রণয়ন করেছেন। তিনি বর্তমানে আগরতলার অভয়নগর বি. টি. কলেজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এছাড়া তিনি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ককবরক সার্টিফিকেট কোর্সের একজন কৃতী অতিথি-শিক্ষক।

নিবেদিতা ম্যাডাম : আমার বড়োমেয়ে নন্দিনন্দী কুন্ডু চৌধুরীর ভূগোলের শিক্ষিকা।

নির্মল : নির্মল দেববর্মা। বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ বাজারের কাছে। পিতার নাম গাজী দেববর্মা। সি. পি. আই. এম-এর মিলিট্যাণ্ট যুব কর্মী। প্রখ্যাত সাহিত্যিক নন্দকুমার দেববর্মার আপন ছোট ভাই।

নবকুমার দেববর্মা : আমার আপন মামা শ্বশুর। ক্যানসার রোগে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি ছিলেন সি. পি. আই (এম) নেতা সুধন্বা দেববর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। কলকাতা থেকে কসমচোরা দিয়ে ভারতে ঢুকে নবকুমার দেববর্মার কাছ থেকেই জানতে পারেন তাঁর প্রথম স্ত্রী ওয়াকিরাই ঠাকুরের কন্যা আগরতলায় টাইফয়েড রোগে মারা গেছেন। নবকুমার দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের কাছে রামনগরের পাকলিবাড়িতে। তার একটা ২০ কানির লেক আছে। আগে তিনি মাস্টারি করতেন তাই তাঁকে সকলে নবকুমার মাস্টার বলে জানতো। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী, খুব ধনাঢ্য বক্তি। চড়িলামে নতুন বাজার তাব বড়ো দোকান ছিলো। তিনি এমন গোঁড়া কমিউনিস্ট ছিলেন যে এক বিধানসভা নির্বাচনের সময় নিজে পোলিং এজেন্ট থেকে নিজের আপন ভাইপোকে ফলস ভোট দেয়ার সময় ধরিয়ে দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

নরেশ দেববর্মণ : নরেশ চন্দ্র দেববর্মা। কিছুদিন আগে তিনি ত্রিপুরার বিধানসভার ডেপুটি সেক্রেটারী (এডিটিং) ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। বর্তমানে তিনি বিধানসভার ও. এস. ডি। নরেশবাবুর জীবন খুব বিচিত্র। তাঁর পাহাড়ের বাড়ি চড়িলামের নতুন লেম্বুথলে। প্রথম জীবনে তিনি ধারিয়াথল প্রাইমারী স্কুলে পড়তেন সেখান থেকে তিনি দু'দুবার বৃত্তি পান মেধবী ছাত্র হিসেবে। পরে তিনি বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া হাইস্কুলে ভর্তি হন। তখন তাঁকে চড়িলামের গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাঘ-ভাল্লুকের মুখে পড়ে স্কুলে যাতায়াত করতে হতো। তাঁর ঠাকুরদা একজন বিখ্যাত সাধু ছিলেন।

নরেশ দেববর্মা ককবরক ভাষার একজন খ্যাতনামা প্রবন্ধকার। তিনিই ত্রিপুরায় সর্বপ্রথম ককবরক ভাষার ব্যাকরণকার ও লেখক কাজী দৌলত আহম্মদের সাহিত্য কৃতী সম্পর্কে আলোকপাত করেন। আর ঠিক তখন থেকেই কাজী দৌলত আহম্মদ সম্পর্কে গবেষক ও পাঠক সমাজের ঔৎসুক্য দেখা দেয়।

নরেন্দ্রবাবু : নরেন্দ্র দেববর্মা সম্পর্কে আমার দাদাশ্বশুর। তাঁর দাদা ব্রজকুমার দেববর্মা (শিক্ষক) ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। নরেন্দ্রবাবু হেরমা গ্রামে একজন সুকৃষক ও ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন।

নীরদ সি চৌধুরী : নীরদ চন্দ্র চৌধুরী। মৈমন সিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার বনগ্রামে বাড়ি। শেষ জীবন তাঁর কাটে অক্সফোর্ডে। তিনি বাঙলা তথা ভারতবর্ষের একজন অতি বিতর্কিত লেখক। তাঁর ইংরেজী বইয়ের জন্যে তিনি একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান। তাঁর বিখ্যাত বইগুলো হলো : The Autobiograbhy of An Unknown Indian, Thy Hand, Great Anarch, The Conlinent of Circie, Passage to England, Robert Clive

ইত্যাদি। 'বাঙালী জীবনে রমণী' বই লিখে তিনি বাঙালী পাঠক সমাজে দারুণভাবে বিতর্কিত হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখা 'আমার দেবত্তোর সম্পত্তি' বাঙলা সাহিত্যের একখানা অমর গ্রন্থ। তিনি Modern Review পত্রিকার সাব-এডিটর ছিলেন। একসময় শনিবারের চিঠিও সম্পাদন করেন তিনি। তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্র বসুর প্রাইভেট সেক্রেটারী। ১০১ বছর বয়েসে অক্সফোর্ডে মারা যান তিনি।

নিরঞ্জন চক্রবর্তী ঃ চড়িলামের কড়ইমোড়ায় বাড়ি। পিতার নাম সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী। নিরঞ্জন চক্রবর্তী সি. পি. আই পার্টির চড়িলাম লোকাল কমিটির সেক্রেটারি। সি. পি. আই-এর যুব কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে তাঁর খুব নাম আছে। তাঁর একটা প্রসিদ্ধ বাঁশবেতের কারখানা আছে এবং ওই কারখানার বাঁশ-বেতজাত দ্রব্য সারা ভারতে নাম করেছে।

নিখিল দাস ঃ অধ্যাপক নিখিল দাস। তিনি আগে আগরতলার মহিলা কলেজের বাঙলার অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে তিনি ধর্মনগর কলেজের অধ্যক্ষ। ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর তিনি একখানি অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণামূলক বই (পি. এইচ. ডি থিসিস) প্রকাশ করেছেন।

নকুলেন্দ্র মলসুম ঃ নকুলেন্দ্র মলসুমের বাড়ি অম্পি। ছাত্র নকুলেন্দ্র বর্তমানে পাঞ্জাবে Architecture নিয়ে লেখাপড়া করে এবং একজন উপজাতীর ছাত্র হিসেবে সে তার মেধার পরিচয় দিয়েছে। প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া তার পড়াশুনার ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করেন থাকেন।

নীলমাধব সেন ঃ অধ্যাপক নীলমাধব সেন একজন ভারত বিখ্যাত সংস্কৃত পন্ডিত। পঞ্চাশের দশকে তিনি আগরতলার এম. বি. বি. কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আগরতলায় থাকাকালীন তিনি আবিষ্কার করেন যে ককবরক ভাষার জলবাচক শব্দ 'তৃই' সংস্কৃত 'তোয়ঃ' শব্দ থেকে আসেনি। বরঞ্চ ককবরক 'তৃই' সংস্কৃতে অনুপ্রবেশ করে 'তোয়ঃ' হয়েছে। এবং তাঁর এই মতামত বিশ্বের ভাষাতাত্ত্বিক পন্ডিতেরা অনেকেই মেনে নিয়েছেন। ডঃ নীলমাধব সেন পরে আগরতলার এম. বি. বি. কলেজে ছেলে পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান এবং সেখানে তিনি মনীষার পরিচয় দেন।

নৃপেন্দ্র বর্মণ ঃ নৃপেন্দ্র বর্মণ বিশ্রামগঞ্জের কাছে ইটভাট্টার লোক। তিনি রাইমোহন জমাতিয়া নামে এক ডাকাতের হাতে এক রাত্রে নৃশংসভাবে নিহত হন।

নন্দকুমারী রূপিনী ঃ নন্দকুমারী রূপিনীর বাড়ি চম্পকনগর বাজারের কাছে চন্দ্রসাধু পাড়ায়।

নৈদ্যাবাসী দেববর্মা ঃ নৈদ্যাবাসী দেববর্মা ছিলেন সি. পি. আই পার্টির প্রবীণ তাত্ত্বিক নেতা। পার্টি বিভাজনের পরেও তিনি সি. পি. আই পার্টিতে রয়ে যান। তিনি ছিলেন সুতারমোড়ার বিন্দু ঠাকুর পাড়ার বাসিন্দা এবং কমরেড মোহন চৌধুরীর স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তিনি আগে খুব ধনী ছিলেন। পরে পার্টির কাজ করতে করতে বেশ গরীব হয়ে যান। পার্টির বাইরে তাঁর পরিচয় ছিল পার্টির গণসংগীত গায়ক ও সনাতনী বাউল গায়ক হিসেবে। বাউল গানে তিনি খুব নাম করেছিলেন। তাঁর নিজের মেজদি ছিলেন নামকরা বাউল গায়িকা। তিনি নেচে নেচে একতারা হাতে বাউল গেয়ে সকলকে মোহিত করে দিতেন। পরে তাঁর এই দিদি আত্মহত্যা করেন। গণসংগীত গায়ক ও বাউল গায়ক হিসেবে সমগ্র বিশালগড়-চড়িলাম এলাকায় জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৮০ সালে তিনি যখন রিসার্সের কাজে শান্তিনিকেতনে থাকি, তখন তিনি আমার সঙ্গে গিয়ে আমাদের রিসার্চ প্রোজেক্ট CRESSIDAয় যোগ দেন এবং সেখানে দু'মাস কাজ করেন। বাড়িতে ফিরে বিশালগড়ে এক দুর্ঘটনায় এই প্রতিভাবান ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

নলিনী ঠাকুর ঃ নলিনী দেববর্মা। তিনি ছিলেন বনমালীপুরের প্রকাশ ঠাকুরের ছেলে। রাজবাড়ির কবিরাজ ছিলেন তিনি। কবিরাজ হিসেবে আগরতলায় তাঁর খুব নাম ছিলো। এখনো তাঁর বাড়িতে কবিরাজি ওষুধ জ্বাল দেয়ার বড়ো বড়ো কড়াই আছে। তিনি বিয়ে করেছিলেন রাজ পরিবাবের মেয়ে। সম্পর্কে তিনি সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার আপন শ্বশুর।

নাফুরাই জমাতিয়া ঃ নাফুরাই জমাতিয়ার আসল নাম মহানন্দ জমাতিয়া।

নলিনী দেববর্মা ঃ ডাক নাম নলু। আমার আপন বড়ো পিসি শাশুড়ী। শ্বশুরবাড়ি রাঙামাটি-পুরাইবাছা। স্বামীর নাম রমেশ দেববর্মা।

নীরদচন্দ্র দাস ঃ নীরচন্দ্র দাস ত্রিপুরা রাজ্যের আই. এন. টি. ইউ. সি নেতা। সুবক্তা ও সদালাপী বলে সুনাম আছে।

নন্দদুলাল দেববর্মা ঃ জনপ্রিয় বামপন্থী কর্মচারী নেতা। সম্পর্কে ত্রিপুরা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং বর্তমানে ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মেম্বার শ্রীযুক্ত মানস দেববর্মণের আপন মাসতুতো ভাই। বাড়ি আগরতলার পুরোনো কালীবাড়ির রাস্তায়।

নিবিড়বরণ চক্রবর্তী ঃ একসময় কার সি. পি. আই (এম) যুব নেতা। সম্পর্কে সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার বড়ো মেয়ে অপুর স্বামী।

নিরুপমা দত্ত ঃ সি. পি. আই (এম) পার্টির আগরতলা-পুরসভার সদস্যা। ভদ্র মহিলার বাড়ি অভয়নগরে। তিনি মণিপুরী।

নির্মল ভৌমিক ঃ সি. পি. আই পার্টির কর্মী। বাড়ি লালসিংমোড়ার রাঙাপানিয়ায়।

নৃপেন্দ্র দেববর্মা ঃ নৃপেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি ত্রিপুরার সিধাই-মোহনপুরের কাছে কাতলামারায়। শিলঙ শহরের পুলিশ বাজারে ব্রডওয়ে হোটেলে বয়ের কাজ করে।

নিলয় ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত জনসেবা পরিষদের কর্মী এবং অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী মশায়ের স্নেহভাজন অনুগামী।

নীলমণি দত্ত ঃ নীলমণি বাবু মূলত কবি। কয়েক বছর আগে তাঁর একখানা কবিতার বই তাঁকে কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমানে তিনি আগরতলার রবীন্দ্র পরিষদের সেক্রেটারী। তিনি আগরতলার উপকণ্ঠে অভয়নগরে অবস্থিত বেসিক ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক।

নরেন্দু ভট্টাচার্য ঃ নরেন্দু ভট্টাচার্য বর্তমানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে তিনি জড়িত। আগরতলার 'একলব্য' সংস্কৃতি সংস্থার তিনি একজন কর্ণধার। বর্তমানে নবগঠিত 'ভারত-ত্রিপুরা মৈত্রীসঙ্ঘ'-এর অন্যতম কর্ণধার। সুপাঠক ও লেখক হিসেবে তাঁর নাম আছে।

নন্দু দেববর্মা ঃ নন্দু দেববর্মার ভালো নাম নরেন্দ্র দেববর্মা, সম্পর্কে আমার জ্যাঠা শ্বশুর।

নাতু ঃ আমার স্ত্রী ফুলকুমারীকে আমার শ্বশুর-শাশুড়ী আদর করে নাতু নামে ডেকে থাকেন।

নেয়াতালী পলোয়ান ঃ চড়িলামের আড়ালিয়ার সম্মানিত কৃষক। তাঁর মতো দক্ষ শিকারী চড়িলাম অঞ্চলে ছিলোনা। তাঁর দীর্ঘজীবনে তিনি শত শত হরিণ, শূকর এবং একাধিক বাঘ মেরেছেন। চড়িলামের প্রচীন বাসিন্দা হিসেবে তিনি চড়িলাম-সিপাহীজলার অনেক রোমহর্ষক কাহিনী জানতেন। জানা যায় শূকর শিকার করে তিনি পার্শ্ববর্তী উপজাতিগ্রামে খবর পাঠিয়ে দিলে ওই বন্যশূকর উপজাতিরা নিয়ে যেতেন।

নূরুল হক ঃ বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নোয়াখালীর এম. পি।

মনোরঞ্জন চৌধুরী ঃ আগরতলার বার এসোসিয়েশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট।

নির্মলেন্দু আচার্য ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ককবরক সার্টিফিকেট কোর্সের আমার প্রাক্তন ছাত্র। ককবরকের বহু পুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত নিতাই আচার্যের ছোট ভাই তিনি। নির্মলেন্দুদের জন্ম খোয়াইয়ের আমপুরার উপজাতি এলাকায়। কাজেই তাঁরা মাতৃভাষার মতো ককবরক বলতে পারেন। শ্রীমান নির্মলেন্দু ইতিমধ্যে ককবরক শিক্ষার একখানা বড়ো আকারের বই লিখেছেন।

নান্টু ভট্টাচার্য ঃ আগরতলা থেকে প্রকাশিত স্যন্দন পত্রিকার রিপোর্টার ও প্রভাতী কর্মী।

নিখিল সূত্রধর ঃ আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সংবাদ' এর প্রভাতী কর্মী।

নিশিকান্ত দেববর্মা ঃ নিশিকান্ত দেববর্মা বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডার সেক্রেটারী। নিশিকান্তবাবুর একটি বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তাধারা আছে। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির তাত্ত্বিক কর্মচারী নেতা হিসেবে একসময় তাঁর নাম ছিলো। সম্ভবতঃ ১৯৭২ সালে তিনি ত্রিপুরা বিধানসভায় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নিশিকান্তবাবু বিশ্রামগঞ্জের কাছের উপজাতি জনপদের লোক। খেঙরাবাড়িতে ১৯৬৭ সালে ডঃ সুহাস চ্যাটার্জী ও আমি যখন ককবরক ভাষার গবেষণা-ক্যাম্প করি তখন সেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। নিশিকান্ত বাবুর নিজের পরিবার খুবই শিক্ষিত। তাঁর এক মেয়ে এম. বি. বি. এস পাশ করে দিল্লীতে ডাক্তারি করেন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কলকাতার বর্ষীয়ান কবি-সাংবাদিক।

নিত্যানন্দ দাস ঃ অধ্যাপক নিত্যানন্দ দাস। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার। বিশিষ্ট মার্ক্সীয় বুদ্ধিজীবী, তাত্ত্বিক প্রবন্ধকার ও সুবক্তা। নিত্যানন্দবাবু উদয়পুরের উপজাতি জনপদের পাশের গ্রামের লোক। একেবারে বাল্যকাল থেকেই উপজাতি পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি সমাজের একেবারে অবহেলিত ও নিপীড়িতস্তর থেকে বুদ্ধিজীবীদের একেবারে প্রথম সারিতে উঠে এসেছেন।

নকুল কর্তা ঃ মহারাজ কুমার নকুল বিক্রম দেববর্মা। তিনি মহারাজ বীরবিক্রমের পুত্র। প্যালেস কম্পাউন্ডের রাণা বোধজঙের পাশেই তাঁর সুরম্যবাড়ি।

প্রভাত রায় ঃ ত্রিপুরার মহারাজা নক্ষত্র রায়ের বংশধর। পিতার নাম প্রতাপ রায়। আগরতলার কৃষ্ণনগরের প্রতাপ রায় রোডে রায়দের পৈতৃক ভিটে। প্রভাত রায় ত্রিপুরার একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতা। রাজতন্ত্রের শেষলগ্নে উচ্চশিক্ষিত প্রভাত রায় আর এক শ্রদ্ধেয় জননেতা বংশী ঠাকুরের সঙ্গে রাজনীতি শুরু করেন। একসময় ত্রিপুরায় প্রভাত-বংশী ঠাকুর এই দুটি নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হতো।

পার্থ সেনগুপ্ত ঃ পার্থ সেনগুপ্ত ষাটের দশকের শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় জোরদার সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলেন। এবং তৎকালীন উপাচার্য সত্যেন সেনের সাহায্যে সারা পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতা কর্মসূচীর ফলিতরূপ দেন। সাক্ষরতার প্রথমসারির কর্মীদের সাহায্যে ৬০ পটুয়াটোলা লেনে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সাক্ষরতা সমিতি গড়ে তোলেন এবং সাক্ষরতা ভবনটির নাম দেন বিদ্যাসাগর ভবন। সাক্ষরতার কর্মসূচী রূপায়ণ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সাক্ষরতা সমিতি প্রকাশনার কাজেও হাত দেন। এবং অতি অল্প মূল্যে বাঙলা সাহিত্যের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করেন

এবং এ-কাজে পার্থ সেনগুপ্তের কর্মপটুতা রীতিমতো ঈর্ষণীয় ছিলো।

পান্নালাল দাশগুপ্ত ঃ বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্তের নাম বাঙালীর ঘরে ঘরে পরিচিত। তিনি আর. সি. পি. আই পার্টি নেতা ছিলেন। ভারত স্বাধীন হবার পর তিনি তাঁর সশস্ত্র দল নিয়ে দমদমের কেন্দ্রীয় সরকারের অস্ত্র কারখানা লুট করতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং দীর্ঘদিন তিনি কারাবাসে কাটান। তিনি কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু জেলে বসে তিনি গান্ধীবাদ অনুশীলন করতে করতে গান্ধীদর্শনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। এবং জেলে বসে তিনি তাঁর বিখ্যাত বই 'গান্ধী গবেষণা' লিখে ফেলেন। কথিত আছে, পান্নালাল দাসগুপ্ত লালটুপি মাথায় দিয়ে জেলে ঢোকেন এবং সাদা টুপি মাথায় দিয়ে জেল থেকে বেরোন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি ভারতবর্ষের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহায়তায় সারা ভারতের উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৬ সনে Hills People Seminar করেন এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আমার ভাষাতত্ত্বের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের মারফত। ওই বিখ্যাত সেমিনারে গঠিত প্রবন্ধাবলী নিয়ে পান্নাবাবু পরবর্তীকালে নামে একখানি অতি উচ্চমানের পুস্তক প্রকাশ করেন। ওই পুস্তকে ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের নামে একটা অত্যন্ত মূল্যবান ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ আছে। যেখানে তিনি ত্রিপুরার ককবরক ভাষা নিয়ে সারগর্ব আলোচনা করেছেন। পান্নালাল দাসগুপ্তকে আমি পান্নাদা বলে ডাকতাম। ত্রিপুরায় এসে তিনি শিশু চিকিৎসক ডাক্তার সুজিৎ দের বাসায় থাকতেন। ডাক্তার দে'র দাদা পান্নাবাবুর সহযোগী ছিলেন। পান্নাদা একবার আমার সঙ্গে আমার শ্বশুর বাড়ির গ্রাম হেরমা পরিদর্শনে যান এবং কয়েকটি উপজাতি গ্রাম আমাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং উপজাতীয় সমস্যা সম্পর্কে নানা বিষয়ে আমার চোখ খুলে দেন। ত্রিপুরার প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র জমাতিয়াকে অত্যন্ত ভালো বাসতেন এবং উপজাতিদের উন্নতির জন্যে তাঁকে সবসময় মূল্যবান পরামর্শ যুগিয়ে যেতেন। পান্নালাল দাশগুপ্ত 'কম্পাস' নামে একখানি অতি উৎকৃষ্ট পত্রিকা প্রকাশ করতেন এবং আমৃত্যু তিনি ওই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

প্রশান্ত কপালী ঃ প্রশান্ত কপালী বর্তমানে সি. পি. আই পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের সম্পাদক। তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী সারা জীবন ধরে। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকে সি. পি. আই-এর সঙ্গে যুক্ত। তিনি উত্তরবঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় এসে তাঁর পিসিমার বাড়ি থাকতেন।

প্রমোদবাবু ঃ ত্রিপুরার প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার সিকিউরিটি।

পার্থসারথি চক্রবর্তী ঃ ডাঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী। ত্রিপুরার রাজবাড়ির শিক্ষক হেম চক্রবর্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

প্রদীপ ঃ প্রদীপ দত্ত ভৌমিক। দৈনিক সংবাদের প্রয়াত সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিকের ভ্রাতুষ্পুত্র।

পি কে দে ঃ ডাঃ পি কে দে।

পারিনী দেব ঃ পারিনী দেববর্মা। আমার আপন ছোট দিদিশাশুড়ী, দাদাশ্বশুর শ্রীযুক্ত তারিনী দেববর্মার স্ত্রী।

প্রতিভা মন্ডল ঃ প্রতিভা মন্ডল কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির রিসার্চ স্কলার। তিনি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রূপকথার উপর গবেষণা করেছেন।

প্রফুল্ল রিয়াঙ ঃ (ট্রাইবেল রিসার্চের কর্মী) বাড়ি বিলোনীয়ার বাইখোড়ার কাছে কালমা গ্রামে।

পিতর ঃ পিতর দেববর্মা। আমার মামাতো সম্বন্ধী অমূল্য দেববর্মার খ্রীষ্টান পুত্র।

প্রমোদ দেববর্মা ঃ আগরতলার তিপ্রা (ত্রিপুরী) বোর্ডিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা খোয়াইয়ের স্বনামধন্য রামকুমার ঠাকুরের পৌত্র অথবা দৌহিত্র।

পলাশ বণিক ঃ আমার পুত্র শ্রীমান সুরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরীর বন্ধু। কৃষ্ণনগরে সুপুরিবাগানে বাড়ি; কলকাতায় Wireless Operator পড়ার সময় জনসেবা পরিষদে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতো।

পাতু ঃ পশ্চিমবঙ্গের বনসাঁলাইনে অবস্থিত নববারাকপুর মাড়োয়ারী বাগানের শ্রীযুক্ত দিলীপ দাশগুপ্তর ছোটো ছেলে, রূপার ছোট ভাই।

প্রবুদ্ধশঙ্কর কর ঃ আগরতলার বিতর্কিত তরুণ কবি। তরুণ কবিদের এক বিশেষ গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন শ্রীমান প্রবুদ্ধ। জি বি হাসপাতালের কাছে জগৎপুরের বাসিন্দা প্রবুদ্ধ।

প্রদীপ ঃ প্রদীপ দেববর্মা। ত্রিপুরার হ্যান্ডলুম এন্ড হ্যান্ডিক্রাফ্‌টস (পূর্বাশা)-এর কর্মচারী।

প্রত্যোষ চক্রবর্তী ঃ প্রত্যোষ চক্রবর্তী সি. পি. আই. পার্টির একজন যুবকর্মী। সে পার্টির ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন সুন্দরভাবে লিখে দেয়।

প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের বাড়ি দক্ষিণ চড়িলামে। ছাত্রাবস্থা থেকে সে দীর্ঘকাল সি. পি. আই পার্টি করেছিল। চড়িলামে সর্বক্ষণের সি. পি. আই-এর কর্মী হিসেবে তার সুনামও ছিলো। চড়িলামের সি. পি. আই-এর লোকাল কমিটির সেক্রেটারীও ছিলেন দীর্ঘ বৎসর। কিন্তু মাত্র ক'বছর আগে নাটকীয়ভাবে সি. পি. আই পার্টি ত্যাগ করে আর. এস. পি পার্টিতে যোগ দিয়েছেন তিনি।

পিসি শাশুড়ী ঃ চড়িলামের ছেছরিমাইয়ের প্রাক্তন উপপ্রধান আততায়ীর দ্বারা নিহত রেবতী দেববর্মার স্ত্রী। সম্পর্কে তিনি আমার পিসিশাশুড়ী। তাঁর শ্বশুর বাড়ি বাঁশতলী গাঁওসভার রামদাস বৈষ্ণবপাড়ায়। আগরতলার সঞ্জীবনী নার্সিং হোমের

মালিক ডাঃ মঙ্গল দেববর্মার বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী আমার এই পিসি শাশুড়ী।

পুনিরাম ঠাকুর ঃ গোলাঘাটির কাছে পুনিরাম ঠাকুরের বাড়ি। তাঁর নামে পুনিরাম ঠাকুর পাড়া। তিনি আমার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়।

প্রমোদ দাশগুপ্ত ঃ সি. পি. আই (এম) পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে তার পপুলার নাম ছিলো পি. ডি. জি। পশ্চিমবঙ্গের অপারেশন বর্গার তাত্ত্বিক প্রবক্তা ছিলেন কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত। চুরুটমুখে তাঁর ছবি এখনো আমাদের সামনে ভাসে। তাঁর প্রিয় সমাজতান্ত্রিক চীনে চিকিৎসিত হয়ে গিয়ে সেখানেই তিনি মারা যান। আর. সি. পি. আই নেতা বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্ত ও প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন আপন জ্যাঠাতো-খুড়াতো ভাই।

প্রবোধ কর ঃ চাকুরীজীবনের পরে কিছুদিন প্রবোধ কর মশায় সি. পি. আই পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি আর. এস. পি পার্টির তাত্ত্বিক নেতা।

প্রমোদ গগৈ ঃ আসামের বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট নেতা এবং বর্তমানে আসাম সরকারের মন্ত্রী।

পদ্মলক্ষ্মী ঃ পদ্মলক্ষ্মী দেববর্মা। চড়িলামের রঙমালা গাঁওসভার সি. পি. আই পার্টির প্রাক্তন চেয়ারম্যান হরমণি দেববর্মার স্ত্রী। কয়েক বছর আগে থাইরয়েড রোগে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন।

পার্থ সাহা ঃ ডাঃ ডাক্তার পার্থ সাহা। আগরতলা শহরের বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি ত্রিপুরার প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার খুবই স্নেহের পাত্র। ডাঃ লন্ডনে গিয়ে স্ত্রীরোগ সম্পর্কে পড়াশুনো করে এসেছেন। আগরতলার ডিমসাগরে তাঁর বাড়ি।

প্রতিমা ভট্টাচার্য ঃ বিজয়কুমার বালিকা বিদ্যালয় (দ্বাদশ শ্রেণী)-এর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা।

প্রভাত দেবনাথ ঃ শ্রীযুক্ত প্রভাত দেবনাথের বাড়ি উত্তর চড়িলামে। তিনি একসময় উত্তর চড়িলাম গাঁওসভার সি. পি. এম-এর জনপ্রিয় প্রধান ছিলেন। পরে মতাদর্শ কারণে সি. পি. এম থেকে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পার্টিতে যোগদান করেন।

পরেশ কলই ঃ পরেশ কলইয়ের বাড়ি অম্পি। তিনি ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির কর্মী।

পিরান দেলো ঃ ইটালীর প্রখ্যাত নাট্যকার। কলকাতার নান্দিকার গোষ্ঠীর শিল্পীরা একসময় পিরান দেলোর নাটক বাঙলায় অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করতেন।

পরিতোষ পাল ঃ পরিতোষ কুমার পাল ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য সরকারের Socio-Economics-এর অনেক সমীক্ষার কাজে যুক্ত।

পরেশ চৌধুরী ঃ অধ্যাপক পরেশ চৌধুরী একজন রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি একসময় মহারাজ বীরবিক্রম সান্ধ্য কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বাড়ি কমলপুর। তাঁরা কমলপুরের আদি বাসিন্দা। যতদূর জেনেছি তাঁর পিতৃদেব কমলপুর হাইস্কুলের জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন।

প্রশান্তবাবু ঃ প্রশান্ত দেববর্মা। সি. পি. আই (এম) পার্টির নেতা ও জনশিক্ষা সমিতির প্রেসিডেন্ট সুধন্বা দেববর্মার বড়ো ছেলে।

প্রভাত ঃ প্রভাত মজুমদার। দৈনিক সংবাদের প্রভাতী কর্মী। শ্রীমান প্রভাত দৈনিক সংবাদের প্রয়াত সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিকের হাতেগড়া স্নেহভাজন কর্মী।

পথিকা ঃ পথিকা দেববর্মা। প্রখ্যাত গায়ক মহেন্দ্র দেববর্মার সুগায়িকা কন্যা।

প্রভাসচন্দ্র ধর ঃ ডঃ প্রভাসচন্দ্র ধর। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের একজন কৃতী অধ্যাপক। তিনি তাঁর আসল পরিচয় ককবরক ভাষার কর্মকান্ড নিয়ে। তিনি এক ভিন্ন আঙ্গিকে 'ককবরক ছুরুংমা' নামে একখানি বই লেখেন। তাঁর মহৎ কাজ হলো পায়ার ছন্দে ককবরক ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ। বৃহদাকারের এই অনুবাদ গ্রন্থ তাঁর দীর্ঘদিনের অধ্যাবসায়ের ফসল। ককবরক ভাষার ওপর ডক্টরেট করে বিতর্কিত কথা বলে একসময় ককবরকভাষী বুদ্ধিজীবীদের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি।

পি. সি. যোশী ঃ পূরণ চাঁদ যোশী। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। তাঁর পরে বি. টি. রণদিভে সি. পি. আই-এর সম্পাদক হন। পি. সি. যোশীর সুদক্ষ কর্মতৎপরতায় 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ (IPTA) গড়ে ওঠে।

পি. আর লস্কর ঃ ডাঃ পি. আর লস্কর। আগরতলার জিবি হাসপাতালের যক্ষ্মারোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। আস্তাবল বাজারের কাছেই তাঁর সুবৃহৎ বাড়ি।

পারুল দেববর্মা ঃ পারুল দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের ধারিয়াথল গ্রামে। সম্পর্কে তিনি আমার বড়োশালী।

প্রণব সাহা ঃ বিশিষ্ট আবৃত্তিকার, আগরতলা।

প্রবীর ঘোষ ঃ প্রখ্যাত আবৃত্তিকর, কলকাতা।

পুরুষোত্তম রায় বর্মণ ঃ আগরতলা কোর্টের এডভোকেট। মননশীল প্রাবন্ধিক। বিশিষ্ট বাগ্মী হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে। মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক। একসময় সি. পি. আই (এম) পার্টির সক্রিয় যুব কর্মী ছিলেন। বর্তমানে সি. পি. এম থেকে মতাদর্শ কারণে

অনেকটা দূরে।

প্রফুল্ল সেন ঃ প্রয়াত প্রফুল্ল সেনের বর্তমান বাসস্থান আগরতলার মধ্যপাড়ায়। রাজ আমলের কৃতী ফটোগ্রাফার, প্রখ্যাত জাদুকর ও কবিরাজ হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন তিনি। তিনি দীর্ঘায় হয়েছিলেন। রাজবাড়িতে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিলো। তিনি ছিলেন বংশী ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রফুল্ল সেনের বাড়ি ছিলো কমিউনিস্ট প্রভাবিত। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতারা তাঁর বাড়িতে উঠতেন। তাঁর দুই পুত্র কানু সেন ও বেণু সেন কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে অনেকটা প্রবাদের মতো লোকের মুখে মুখে ফেরে। তাঁর অপর পুত্র রবি সেন প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার ও শিল্পী।

পল্টুবাবু ঃ গবেষক রমাপ্রসাদ দত্তকে আগরতলার সকলে পল্টুবাবু বলে ডাকেন। গান্ধীঘাটে রমাপ্রসাদ গ্রন্থাগার বলে তাঁর একটি অতিমূল্য গবেষণাগার আছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও বাঙলাদেশের রিসার্চ স্কলাররা তাঁর এই মূল্যবান গবেষণাগার থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। তাঁর গবেষণাগারে অমূল্য সব প্রচীনগ্রন্থ ও পুঁথি আছে। তিনি একজন বিশিষ্ট লেখকও।

পিয়ারী মোহন দেববর্মা ঃ ত্রিপুরার ককবরক ভাষার অন্যতম রূপকার রাধামোহন ঠাকুরের পুত্র ছিলেন তিনি। তিনি শিবপুর রোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রথম ভারতীয় কিউরেটর হয়েছিলেন। বোটানিক্যাল রিসার্স জার্নাল-এ প্রকাশিত তাঁর লেখা মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ এরিস্টিক সোসাইটি-তে পাওয়া যেতে পারে। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের পাশে এখনো পিয়ারী মোহন ঠাকুরের বংশধরেরা তাঁদের মোঙ্গলীয় ত্রিপুরী চেহারা নিয়ে বসবাস করছেন।

প্রকাশ ঠাকুর ঃ প্রকাশ দেববর্মা। বনমালীপুরের প্রকাশ ঠাকুর ছিলেন সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার শ্বশুর, নলিনী ঠাকুরের পিতা। প্রকাশ ঠাকুরের আগের বাড়ি ছিলো কৃষ্ণনগরের পদ্মপুকুরে। কিন্তু ভূতের উপদ্রব হওয়ায় তিনি ওই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বনমালীপুরে চলে যান। পরে ওই পোড়ো ভূতুড়ে বাড়ি কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্যের বাবা হরিদাস ভট্টাচার্য কেনেন।

প্রদীপ দে ঃ কৃষ্ণনগরের হারাধন সঙ্ঘের কাছে বাড়ি। সি.পি.আই (এম)-এর বিশিষ্ট কর্মী। প্রখ্যাত হারাধন কন্ট্রাক্টারের বংশধর তিনি।

প্রফেসর কুন্ডু ঃ কৃষ্ণনগরের পাল্লা-বাটখারা অফিসের পাশে নাজির পুকুরপাড়ে তাঁর বাড়ি। তিনি গণিতের একজন জনপ্রিয় অধ্যাপক। যতদূর জানা যায় তিনি ডাঃ ফনী দাশের জামাই।

পানিগ্রাহী ঃ শ্রীযুক্ত পানিগ্রাহী ইউ এন আই এ-এর আগরতলার করেসপন্ডেন্ট।

পাঁচু ঃ শ্রীপতি হরি। তাঁর পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানের ঠিকানা ঃ গ্রাম - খাজরা (আমদী-খাজরা), থানা - আশাশুনী, জেলা - খুলনা। পাঁচু ছিলো আমার ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু। একই গ্রামে আমরা বড়ো হয়েছিলাম। পাঁচুদের ছিলো কাপড়ের ব্যবসা। বিশাল নৌকো করে তারা বগার হাট, হোগলার, আমদীর হাট, খাজরার হাট প্রভৃতি বিখ্যাত হাটে যেতো এবং সব কাপড় কিন্তু অতি বিখ্যাত বড়দান হাট থেকে। আমি তাদের কাপড়ের নৌকোয় অনেকবার উঠে বিভিন্ন হাটে গিয়েছি। পাঁচু এখন নববরাকপুরে আমার দাদাদের ব্যবসায়ে যুক্ত।

প্রণব চক্রবর্তী ঃ ডাঃ প্রণব চক্রবর্তী। কলকাতার জনপ্রিয় চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ। ঢাকুরিয়ায় তাঁর মূল চেম্বার। তিনি গুনগুন করে রবীন্দ্র সংগীত গাইতে গাইতে আমার বাঁ চোখের ছানি অপারেশন করেছিলেন। তাঁর চেম্বারে লেখক বুদ্ধদেব গুহর রবীন্দ্র সংগীতের ক্যাসেট শুনতে শুনতে রোগী দেখেন।

প্রভাস ঃ প্রভাস কুন্ডু চৌধুরী। আমার খুড়তুতো দাদা সূর্যকান্ত কুন্ডু চৌধুরীর ছোট ছেলে। আমরা আমাদের বাঙলাদেশের খাজরা গ্রামে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি এবং ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত আমদী-জায়গায় মহল তকিমুদ্দীন হাই স্কুলে পড়েছি। প্রভাসের সঙ্গে আমার বাল্যস্মৃতি অত্যন্ত মধুর।

প্রতুল লাহিড়ী ঃ অধ্যাপক প্রতুল লাহিড়ী। তিনি একসময় অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে সি. পি. আই পার্টির হোলটাইমার হয়ে দিল্লীর পার্টির হেড কোয়ার্টার অজয় ভবনে থেকে পার্টির বিদেশ দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন।

প্রশান্ত পাল ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী লেখক।

পান্নালাল রায় ঃ পি. আই. বি'র আগরতলা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। পান্নালাল রায় মূলত লেখক-সাংবাদিক। উপজাতি জীবনের ওপর তাঁর কিছু মূল্যবান লেখা আছে। পান্নালাল রায়ের আসল বাড়ি কৈলাসহর শহরে। এখন বাড়ি করেছেন কৃষ্ণনগরের কালীবাড়ী লেনে।

প্রেমানন্দ দাস ঃ উত্তর চড়িলামের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি। ভদ্র ব্যবহারের জন্যে সমগ্র চড়িলামবাসীর কাছে তিনি খুব জনপ্রিয়। নানাপ্রকার সামাজিক সংগঠনের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গে তিনি জড়িত।

পরিমল সাহা ঃ পরিমল সাহা ১৯৭৮ সালে চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। এম. এল. এ নির্বাচিত হবার মাত্র ক'মাসের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে বিশালগড় তাঁর বাড়ির কাছেই এই কংগ্রেসী যুবনেতা খুন হন। বিশালগড়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শুকলাল সাহার ছেলে ছিলেন তিনি। তাঁর ছোট ভাই মতিলাল সাহা তাঁর দাদার নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে উপনির্বাচনে এম. এল এ নির্বাচিত হন।

পি. কে. হালদার ঃ ডঃ প্রলয়কান্তি হালদার। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স ডিপার্টমেন্টের কৃতী অধ্যাপক তিনি। ত্রিপুরায় উপজাতিদের উন্নয়ন নিয়ে উন্নতমানের গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে পাঠক মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন ডঃ হালদার। তাঁর বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণার বনসাঁলাইনে নববারাকপুরে।

পি. কে. ভট্টাচার্য ঃ ডাঃ পি. কে. ভট্টাচার্য। ডাঃ ভট্টাচার্য আগরতলার জি. বি. হাসপাতালের বহুমূত্র রোগের বিশিষ্ট চিকিৎসক।

প্রতাপ সান্যাল ঃ ডাঃ প্রতাপ সান্যাল আগরতলার জি. বি. হাসপাতালের একজন প্রখ্যাত শৈল চিকিৎসক।

পরমার্থ দত্ত ঃ জয়নগর ১ নং রোডের পরমার্থ দত্ত একজন প্রতিভাবান আইনজীবী। ত্রিপুরার প্রবাদপ্রতিম কমিউনিস্ট নেতা বীরেন দত্তের পুত্র তিনি।

প্রদীপ ভৌমিক ঃ ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক। ডাঃ ভৌমিক আগরতলার জি. বি. হাসপাতালের একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক।

পরিমল দেববর্মা ঃ শ্রীমতী পরিমল দেববর্মা। তাঁর বাড়ি চড়িলামের কাছে রামনগরের ধনাচরে। তাঁর স্বামী প্রখ্যাত কমিউনিস্ট সংগঠক ও সি. পি. এম নেতা সুধন দেববর্মা। শ্রীমতী দেববর্মা সম্পর্কে আমার আপন মামাতো বড়শালী। আমার বড় মামা শ্বশুর রাজেন্দ্র দেববর্মার মেয়ে।

পালবাবু ঃ ধীরু পাল। কর্ণেল চৌমুহনী শনিতলায় তাঁর দোকান। আমি একসময় পালবাবুর বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে ছিলাম।

পরিতোষ ঃ পরিতোষ সরকার। দৈনিক সংবাদের হকার।

পূর্ণেন্দুবাবু ঃ পূর্ণেন্দু মজুমদার ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইগ্রেশন সেকশনের দায়িত্বশীল কর্মী।

পুষ্প ঃ শ্রীমতী পুষ্প বসু। বন্ধুবর স্বপন বসুর স্ত্রী। স্বপনের স্ত্রীকে খোকা মামা (স্বপনের মামা) ও আমি বর্ধমানের গলশী থেকে পছন্দ করি এবং বন্ধুবর স্বপনের সঙ্গে বিয়ে হয়। স্বপনের স্ত্রীকে আমি বৌমা বলে ডেকে থাকি। বৌমা নিজে দায়িত্ব নিয়ে আমার চোখ কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এবং একমাস তাঁর কাছে রেখে সেবাশুশ্রূষা করে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রবোধ ব্যানার্জী ঃ কলকাতার বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রীটের 'মনীষা গ্রন্থালয়' এর কর্মাধ্যক্ষ। এবং আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু।

ফুলকুমারী দেববর্মা ঃ পিতার নাম গণেশ চন্দ্র দেববর্মা। মাতা শান্তিলতা দেববর্মা। গ্রাম হেরমা, পোঃ রঙমালা, থানা বিশালগড়, পশ্চিম ত্রিপুরা। ফুলকুমারী ভাষাগবেষক কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরীকে বিয়ে করেন ১৯৭০ সালের ২৫শে ফাল্গুন তারিখে নিজের গ্রামেই। ককবরক ভাষা-গবেষণায় তাঁর স্বামীকে সবসময় নিরলসভাবে তথ্য সরবরাহ করে চলেছেন। তিনি তাঁর গবেষক স্বামীর সঙ্গে ককবরক রূপকথা সংগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে 'কেরেঙকথমা' (ত্রিপুরার রূপকথা মালা) নামে এই বইটি প্রকাশ করেন আগরতলার 'অক্ষর' প্রকাশনী। মূল ককবরক রূপকথাগুলি বাঙলায় অনুবাদ করেন তাঁর স্বামী নিজেই। ফুলকুমারী মূলত উপজাতি কৃষক পরিবারের মেয়ে। জুমচাষ ও সমতল কৃষির চাষ — এই উভয় চাষকার্যে তিনি সমান দক্ষ। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর গবেষক স্বামীর সঙ্গে ১৯৮০-৮৩ সাল পর্যন্ত পুত্র-কন্যা নিয়ে শান্তিনিকেতনে থাকেন। বর্তমানে তিনি ত্রিপুরা সরকারের হ্যান্ডলুম এন্ড হ্যান্ডিক্র্যাফ্টস কর্পোরেশনের জেলখানা রোড অফিসে Skilled Worker পদে কর্মরত আছেন। ত্রিপুরা তাঁতের একজন দক্ষ কারিগর হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে। তিনি নিজের গ্রামে 'মনাঠাকুরপাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি' নামে একটা কোঅপারেটিভ গঠন করে নিজের বাড়িতেই সরকারী লোন নিয়ে ১০টি ফ্রেমলুম বসান। এবং ওই সমবায় তাঁত কেন্দ্র থেকে সূক্ষ্মসুতোয় শাড়ি বুনে তিনি সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তাঁতে ট্রেনিঙ নেন এবং 'টানা' দেয়ার কাজও শেখেন। এবং সেই শিক্ষার সাহায্যে তিনি ফ্রেমলুমে শাড়ির টানা দিতে পেরেছিলেন। আগে ট্রাইবেল মেয়েরা ফ্রেমলুমে শাড়ির টানা দেয়ার কাজ করতে পারতো না। ফুলকুমারী এই প্রথা ভেঙে ফেলেন এবং ট্রাইবেল তাঁতী মেয়েদের ফ্রেমলুমে শাড়ি-ধুতির টানা দেয়ার কাজ শিখিয়ে দেন। তাঁর দুই পুত্র দুই কন্যা। কনিষ্ঠপুত্র শুভরঞ্জন চার বছর বয়সে মারা যায়। বর্তমানে পুত্র সুরঞ্জন কুণ্ডু চৌধুরী ও দুই কন্যা নন্দিনী ও দেবযানী সুস্থ শরীরেই আছে। সুরঞ্জন ইংরেজীতে এম. এ পাশ করে রামঠাকুর কলেজে পড়ায়। নন্দিনী স্যোসাল সায়েন্সে বি. এস. সি পাশ করে এ. ডি. সি'র হেড কোয়ার্টার খুমুলুঙে এ. ডি. সি পরিচালিত ড্রপআউট উপজাতি ছাত্রদের কোসিং সেন্টারে ভূগোল পড়ায়। আর দেবযানী বাঙলায় এম. এ পড়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ফিজোর বোন ঃ নাগাল্যান্ডের বিদ্রোহী নেতা মিঃ ফিজোর বোন এই অতি সুশিক্ষিতা নাগা রমণীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় ১৯৬৬ সালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত পার্বত্য নেতাদের সেমিনারে। সেমিনারের সংগঠক ছিলেন বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্ত।

ফুলন ভট্টাচার্য ঃ ত্রিপুরার বিখ্যাত সাংবাদিক ও দৃঢ়চেতা সাহসী লেখিকা। শ্রীমতী ভট্টাচার্য ত্রিপুরার ৮০ সালের দাঙ্গায় খুব সাহস করে দাঙ্গাবিধ্বস্ত উপজাতিদের দুঃখকষ্ট ও মহাবিপদের করুণ কাহিনী সর্বপ্রথম সভ্যজগতে তুলে ধরেন। তিনি তাঁর সেই সময়কার রোমহর্ষক লেখায় দেখান যে বাঙালীদের পাশাপাশি উপজাতিরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, বরঞ্চ উপজাতিদের ক্ষতির মাত্রা ক্ষতির মাত্রা অনেকাংশে বেশী। ফুলন ভট্টাচার্য ত্রিপুরার একটি আপোষহীন বিদ্রোহী নাম। এমন পরোপকারী মহিলা সচরাচর দেখা যায় না। অন্যের দুঃখকষ্টে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। ত্রিপুরার বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি

জড়িত আছেন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক আলোচনা চক্রে তাঁর স্পষ্টবাদিতা সকলকে মোহিত করে ভাবিয়েও তোলে। বর্তমানে তিনি আগরতলার এডভাইজার চৌমুহনীতে থাকেন। তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত শঙ্কর দাশ একজন প্রখ্যাত আইনজীবী এবং বর্তমানে আগরতলার পুরসভার চেয়ারম্যান।

ফণীন্দ্র রায় ঃ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র রায় একসময় আগরতলায় থাকতেন এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নিয়ে আন্দোলন করতেন। তাঁর বাড়ী ছিলো বর্তমানে রামঠাকুর কলেজের পাশে। তাঁর শিক্ষিতা মা স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে তিনি ত্রিপুরা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের নববরাকপুর কলোনীতে গিয়ে বাড়ি করেন। আগরতলার কৃষ্ণনগর রোডের বাসিন্দা শ্রীযুক্ত চিত্ত দেব (প্রাক্তন পুলিশ অফিসার) তাঁর ভগ্নিপতি। লেখক ও বিখ্যাত ছোট গল্পকার দেবব্রত দেব হলেন ফনীবাবুর ভাগ্নে

ফুলরেণু গুহ ঃ ডঃ ফুলরেণু গুহ একসময় কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরেব মন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি পার্লামেন্টের সদস্যা ছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আমাদের সকলের ফুলদি। এমন নিরলস সমাজসেবী ভারতবর্ষে কমই আছেন। বর্তমানে তিনি All India Council for Mass Education and Development-এর সভানেত্রী। সাক্ষরতা ও অন্যান্য কাজে শ্রীমতী গুহ একাধিকবার আমাদের ত্রিপুরায় এসেছেন।

ফটিক চাটার্জী ঃ শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জীর বাড়ি দক্ষিণ গড়িয়ায় প্রখ্যাত শিল্পী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সঙ্গে। ফটিকবাবুর বাড়িতে ত্রিপুরার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক দীপক দেব একসময় ভাড়া থাকতেন। তখন আমি সেখানে বেড়াতে যাই।

ফটিক ভৌমিক ঃ কমরেড ফটিক ভৌমিক। কমরেড ভৌমিক ছিলেন সি. পি. আই পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। পার্টির তাত্ত্বিক পত্রপত্রিকায় মানুষের হাতে তুলে দিতেন তিনি। পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেরও সক্রিয় কর্মী ছিলেন তিনি। আগরতলার পুরসভার বর্তমান নির্বাচনের আগের নির্বাচনে ফটিকবাবু জয়নগর কেন্দ্র থেকে সি. পি. আই-এর প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। জয়নগরেই ফটিকবাবুদের বাড়ি।

ফকর উদ্দিন ঃ উদয়পুরের যুব কবি ফকর উদ্দিন আমেদ তাঁর বাকচাতুর্যে সকলের নজর কেড়ে নেন। সাধারণ মেহনতী মানুষই তাঁর কবিতায় বিষয়বস্তু। প্রকৃতি প্রেমের কবিতাও লেখেন তিনি। বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ আছে। বর্তমানে ফকর উদ্দিন সাহেব ত্রিপুরার সরকারের প্রচার দপ্তরের আই. সি. ও পদে চাকুরী করেন।

ফাল্গুনী দেববর্মা ঃ ফাল্গুনী দেববর্মার বাড়ি কৃষ্ণনগরের বিজয়কুমার চৌমুহনীর কাছে। পেশায় তিনি একজন শিক্ষক। কিন্তু গায়ক হিসেবেই তাঁর পরিচয়। শচীন দেববর্মার গান গেয়ে ত্রিপুরা ও কলকাতায় খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি। ক্যাসেটে তাঁর কণ্ঠের শচীন দেববর্মার গান শুনলে মনে হয় আসল শচীন কর্তাই বুঝি গান গাইছেন।

ফুলকুমারী জমাতিয়া ঃ ফুলকুমারী জমাতিয়ার বাড়ি বাগমার বগাবাসা গ্রামে। ৮০'র দাঙ্গায় তাঁর নিজের পরিবারের ৪১ জন নিহত হন। তিনি কোনক্রমে বেঁচে যান। আগরতলার কৃষ্ণনগরে চারুকুটীরের পাশে নিজের বাড়িতে থাকেন তিনি।

ফুতিয়া ঃ আমার মেজ শালা নগেন্দ্র দেববর্মার বৌ। এই নাম রেখেছিলেন আমার দিদি শাশুড়ী শশীরাণী।

ফুতলু ঃ বিশ্বকুমার দেববর্মা। বিশ্বকুমার আমার বড়ো শালা। তার ডাক নাম ফুতলু। বি. এস. এফ-এর চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সে এখন বাড়িতে থেকে কৃষিকাজ করে।

ফণীভূষণ ভট্টাচার্য ঃ ফনীবাবু এ. জি'র প্রাক্তন কর্মী। দীর্ঘদিন শিলঙে ছিলেন। বর্তমানে প্যালেস কম্পাউন্ডের ওয়েস্ট গেটের বাসিন্দা। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য কিছু ধর্মীয় গ্রন্থ লিখেছেন। উপনিষদের ওপর তাঁর বই আছে। ফনীবাবু খুব পরোপকারী। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত দুঃস্থ রোগীদের তিনি এককালীন বেশ মোটা অঙ্কের দান করে থাকেন।

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঃ প্রখ্যাত কবি।

বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় ঃ ডঃ বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। তিনি জহরলাল নেহরু ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি কলকাতায় তাঁর চেতলার বাড়িতে (Centre for Regional Ecological Science Studies inorder to Devclopment an alternative) নামে একটা রিসার্স সেন্টার গড়ে তোলেন। UNICEF-UNRISD থেকে এই সামাজিক-অর্থনৈতিক গবেষণা কেন্দ্র আর্থিক অনুদান পেতো। বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় সি. পি. আই. পার্টির তাত্ত্বিক প্রবক্তা ছিলেন।

বি. কে. রায়বর্মণ ঃ প্রফেসর বি. কে. রায়বর্মণ। একজন অতি বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হিসেবে সারা ভারতে অধ্যাপক রায়বর্মণের খ্যাতি। তিনি উপজাতি বিশেষজ্ঞ এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে এ-বিষয়ে ভারত-সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি ভারত সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী একসময় তাঁকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন পল্লী মঙ্গল কেন্দ্রের দায়িত্বে। বহুবার তিনি ত্রিপুরায় এসেছেন উপজাতিদের নিয়ে গবেষণার কাজে। তিনি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এবং প্রাক্তন উপাচার্য ড: জে. বি. গাঙ্গুলীর পরামর্শে 'Land Based Development Among the Tribals in Tripura' একটা গবেষণামূলক কাজ করেন। আগরতলায় অধ্যাপক রায়বর্মণের ছোট বোনের বাড়ি। প্রগতি রোডের প্রমোদ ঠাকুর (প্রমোদ দেববর্মা) ছিলেন তাঁর ভগ্নীপতি।

বীরবিক্রম : স্বাধীন ত্রিপুরায় শেষ মহারাজা। মহারাজা বীরবিক্রম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তিনি প্রজারঞ্জক রাজা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ত্রিপুরায় জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি চারশ'র মতো স্কুল অনুমোদন করেন এবং ত্রিপুরার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাউন সাহেবকে এ-ব্যাপারে দায়িত্ব দেন। তাঁর নামে আগরতলায় মহারাজ বীরবিক্রম কলেজ আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং হিটলার ও মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর নেতৃত্বে বার্মাফ্রন্ট ত্রিপুরার সৈন্যরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশেষ সাফল্য লাভ করে এবং এর ফলে তিনি ইংরেজ সরকারের বিশেষ আস্থাভাজন হন।

বিজয় রাঙ্খল : ত্রিপুরার বিখ্যাত টি. এন. ভি নেতা। ত্রিপুরাকে স্বাধীন করার জন্যে তিনি একসময় অস্ত্র ধরেন এবং দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরায় উগ্রবাদী কাজকর্ম চালান। পরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে এক শান্তি চুক্তি করে অস্ত্র সংবরণ করেন। বর্তমানে তিনি ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য। অতি সম্প্রতি রাঙ্খল সাহেব তাঁর টি. এন. ভি পার্টি তুলে দিয়ে 'আই. পি. এফ. টি'তে যোগ দিয়েছেন।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। ত্রিপুরার আগরতলার কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরের বন্ধু-সহপাঠী।

বীরচন্দ্র দেববর্মণ : বীরচন্দ্র দেববর্মণ ছিলেন ত্রিপুরার প্রবাদপ্রতীম আইনজীবী। তিনি একইসঙ্গে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ পাশ ও আইন পাশ করেন। তিনি ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের বেদান্তের ছাত্র। তাঁর এম. এ. ক্লাসের সহপাঠী ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বামপন্থী। একসময় সি. পি. আই পার্টির রাজ্যসভার সদস্যও ছিলেন তিনি। টাকারজলা কেন্দ্র থেকে একাধিকবার তিনি ত্রিপুরা বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ককবরক ভাষার উন্নতির জন্যে সারাজীবন কাজ করে গেছেন তিনি। ১৯৬৭ সালে তাঁর সভাপতিত্বে 'ককবরক উন্নয়ন পরিষদ' গড়ে তোলেন কেন্দ্রীয়ভাবে সি. পি. আই পার্টির সহায়তায়। এবং ভাষাবিদ ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর দুই ছাত্র শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ও কুমুদ কুন্ডু চৌধুরীকে কলকাতা থেকে এনে ককবরক ভাষার বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থা করেন। বীরচন্দ্র দেববর্মাকে সকলে বীরচন্দ্র ঠাকুর বলে ডাকতেন। তাঁর বাড়ি ছিলো পান্থশালা বিশেষ। সবসময় পাহাড়ের উপজাতি কমরেডরা তাঁর বাড়িতে থাকতেন ও খেতেন। বীরচন্দ্র ঠাকুর নিজের হাতে রান্না করে তাঁদেরকে খাওয়াতেন। তাঁর বাড়িতে দাবা খেলারও আসর বসতো। তাঁর সঙ্গে ত্রিপুরচন্দ্র সেন ও বংশী ঠাকুর (অমরেন্দ্র দেববর্মা — প্রাক্তন এম. পি) কে আমি দাবা খেলতে দেখেছি। এছাড়া বংশী ঠাকুরের ছোটভাই ও গিরি ঠাকুরও বীরচন্দ্রবাবুর সঙ্গে দাবা খেলতেন। বীরচন্দ্র ঠাকুরের পিতৃদেব সতীশ ঠাকুর ছিলেন ঘরজামাই। উমাকান্ত স্কুলের মাস্টার। তাঁর মা ছিলেন মহারাজ বীরচন্দ্রের দৌহিত্রী। বীরচন্দ্র ঠাকুরদের আদি বাড়ি খোয়াই সাব ডিভিশনে ছিলো বলে জানা যায়। বীরচন্দ্র ঠাকুরদের সি. পি. আই-এর জন্যে তাঁর নিজের বাড়িতে একটা ঘর করে দেন। পরে রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর খবর পেয়ে দুষ্কৃতীরা সেই ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। সেই বীভৎস দৃশ্য দেখার পর থেকেই তাঁর শরীর খারাপ করতে থাকে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পাকাবাড়ির এক অংশ সি. পি. আই পার্টিকে দান করে যান।

ব্রজ দেববর্মা : টাকারজলার আমতলীতে উদয়জমাদার বাড়িতে তাঁর বাড়ি। তিনি ছিলেন বুদ্ধিচন্দ্র দেববর্মার বাড়ির ঘরজামাই। ১৯৬৭ সালে বুদ্ধিচন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে যখন ককবরক ভাষার গবেষণার কাজ করি আমরা, তখন তিনি নানান তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন আমাদেরকে।

বুদ্ধিচন্দ্র দেববর্মা : টাকারজলার আমতলীতে উদয়জমাদার পাড়ায় বাড়ি। তাঁর বাড়িতেই ককবরক ভাষার গবেষণার কাজ করেছিলাম আমার বন্ধু শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ও আমি। তাঁর একটি চোখ অন্ধ ছিলো।

বাজুবন রিয়াং : বাজুবন রিয়াঙদের বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরার বগাফায়। বি. এ পাশ করার পরে তিনি কংগ্রেসের রাজনীতি করতেন এবং এম. এল. এ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি স্বল্পকালের জন্যে সি. পি. আই পার্টিতে যোগ দেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সি. পি. আই (এম)-এ চলে যান। তিনি ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের একাধিকবার মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে এম. পি। তাঁর বাড়িতে ১৯৬৭ সালে আমরা ভাষার কাজ করেছিলাম। তথ্য দিয়েছিলেন তাঁর পিসেমশায় ক্ষেম্পাহা রিয়াং।

বিষ্ণু দেববর্মা : বিষ্ণু দেববর্মার বাড়ি বিশ্রামগঞ্জের কাছে কড়ইমোড়ায়। ১৯৬৭ সালে খেওরাবাড়ি ককবরক ভাষা গবেষণার কাজে সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিষ্ণু দেববর্মা একজন সি. পি. আই-এর কর্মী ও সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী। বিষ্ণুবাবুদের ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত বিশাল বাগান বাড়ি ছিলো। এবং অতিথিদের মোরগ-শূকরের মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। কিন্তু অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে এই বাড়ি বিক্রি হয়ে যায় নবাগত উদ্বাস্তুদের কাছে এবং একটা কুঁড়ে ঘর বেঁধে কোনোরকমে টিলার নিচে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। কোনো ধানের জমি না থাকায় স্ত্রী সংসার চালাতেন বিশ্রামগঞ্জের মহাজনদের দেয়া টাকায় সোমরস তৈরী করে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে বিক্রি করে।

বরদাকান্ত দেববর্মা : বরদাকান্ত দেববর্মা ছিলেন সি. পি. আই-এর চড়িলাম লোকাল কমিটির দোর্দন্ড প্রতাপশালী সেক্রেটারী কার্তিক কুমার দেববর্মার ছেলে। বাড়ি চড়িলামের নতুন লেম্বুখলে। তাঁদের গ্রামে যখন ককবরক ভাষা গবেষণার

কাজ হয় তখন রাত্রে বন্দুক দিয়ে খরগোস শিকার করে আমাদের খাওয়াতেন। আমার অধ্যাপক ডঃ সুহাস চ্যাটার্জী খরগোসের মাংস খুব তারিফ করে খেতেন। বরদাবাবু ১৯৬৭ সালে নবগঠিত ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি পার্টিতে যোগ দেন এবং ১৯৭২ সালের লোকসভার নির্বাচনে তাঁর পার্টির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

ব্রায়ান স্মিথ ঃ মিঃ বি. কে স্মিথ। তিনি ছিলেন আগরতলার অরুন্ধতীনগর মিশনের প্রধান পাদ্রী। আমরা যখন লেম্বুথলে ককবরক ভাষার কাজ করি। তখন তিনি সেখানে গিয়ে ভাষাবিদ ডঃ সুহাস চ্যাটার্জীর সঙ্গে ককবরক ভাষার হরফ নিয়ে আলোচনা করেন। এবং পরে তাঁর মিশন অফিসে আমাদেরকে প্রাতরাশে আপ্যায়ন করেন এবং ককবরকের জন্যে রোমান হরফের সুপারিশ করেন।

বীরকুমার দেববর্মা ঃ আমার ছোট কাকাশ্বশুর। তিনি একজন গ্রাজুয়েট। প্রথম জীবনে স্কুলে মাস্টারি করতেন। পরে আগরতলার সিভিল সেক্রেটারিয়েটে চাকুরী নেন এবং এখনো সেখানেই কর্মরত আছেন। আমার এই শ্বশুর আমার শ্বশুর বাড়ি হেরমার একজন খুব মানাগণ্য ব্যক্তি। অবস্থাও বিরাট। পাকাবাড়ি, পাকা পায়খানা, শান বাঁধানো পুকুর সবই আছে তাঁর — যা সাধারণত ট্রাইবেল ভিলেজে থাকে না। পরোপকারী হিসেবে খুব নাম তাঁর। সমস্ত গ্রামকে সনাতন কৃষ্টির পক্ষে রাখার জন্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন তিনি।

বিজয় রায় ঃ বিজয় রায় রিয়াং উপজাতি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি। কর্মজীবনে তিনি দারোগা ছিলেন। বাড়ি ছিলো অমরপুরে।

ব্রজকুমার মাস্টার ঃ ব্রজকুমার দেববর্মা। সম্পর্কে আমার দাদাশ্বশুর। হেরমা গ্রামের এখন তিনি প্রচিনতম ব্যক্তি। একসময় ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরে কর্মজীবনে স্কুলের মাস্টারি নেন। তাঁর গায়ের লাল টুকটুকের মতো রঙ খুব কমই দেখা যায়। আমার এই দাদাশ্বশুর খোল বাজিয়ে ভালো হরি সংকীর্তন গাইতে পারেন এবং গলার স্বরও খুব মধুর।

বিমল ঃ বিমল দেববর্মা। আমার আপন ছোটশালা। বর্তমানে আগরতলায় আমাদের সঙ্গে থেকে উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের হেড কোয়ার্টার খুমুলুঙে চাকুরী করে। সে একজন জুনিয়র মোটর ম্যাকানিক। শ্রীমান বিমল সবসময় আমাকে আমার ভাষার কাজে সাহায্য করে থাকে।

বিশ্বকুমার দেববর্মা ঃ আমার আপন বড়োশালা। আগে বি. এস. এফ-এ চাকুরী করতো। এখন নিজের গ্রাম হেরমাতে চাষ- কারগিত ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে সংসার চালায়। সম্পর্কে সে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন মুখ্য আধিকারিক শ্রীযুক্ত হরিনাথ দেববর্মার আপন ভাগ্নে জামাই। খোল বাজিয়ে হরিনাম সংকীর্তন গাইবার জন্যে গ্রামে তার বেশ নাম আছে।

বিজয় মজুমদার ঃ শ্রীযুক্ত বিজয় দত্ত মজুমদারের বাড়ি চড়িলামের নতুন বাজারের পাশে। চড়িলামের পুরোনো বাজার পুড়ে গেলে তিনি মূল সড়কের পাশে নানান গ্রামীণ দলাদলির মধ্য দিয়ে নিজে জায়গা কিনে এই বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। তাই চড়িলামের নতুন বাজারকে বিজয় মজুমদারের বাজার বলা হয়। চড়িলামে বিরাট দীঘি নিয়ে বিজয়বাবুর পাকাবাড়ি। এই দীঘিতে বড়শিতে মাছ ধরার জন্যে আগরতলা থেকে রাজপরিবারের লোকেরা যান। বিজয়বাবুর বাবা ছিলেন আগরতলার বিখ্যাত হোটেল 'নিউস্টার' এর মালিক নৃপেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার। নৃপেন মজুমদারের চড়িলামের বাড়িতে প্রায় সব রাজনীতির নেতারা এসে রাত্রিযাপন করতেন। এখনো সেই ধারা বজায় রেখেছেন বিজয়বাবু ও তাঁর ভাইয়েরা। চড়িলামের উপজাতি-বাঙালীর মধ্যে শান্তি সংস্থাপনের পক্ষে বিজয় মজুমদার সেতু বিশেষ। তাঁর বাড়িতে চড়িলামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মজলিসী আসর সকাল-বিকাল জমজমাটভাবে বসে থাকে।

ব্রজগোপাল রায় ঃ ডঃ ব্রজগোপাল রায়। ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টির রাজ্য নেতা। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের দু'দুবার মন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। ত্রিপুরার খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে বেশ নাম করেন তিনি। ব্রজগোপালবাবু একজন সুবক্তা। রাজনীতির বাইরেও সাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর নাম আছে। তিনি সাহিত্যে পি. এইচ. ডি লাভ করেন।

বাদল ঃ বাদল রায়। ত্রিপুরা দর্পণের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সমীরণ রায়ের ছোটভাই বাদলবাবু। কর্ণেল চৌমুহনীতে তার একটা প্রেস আছে।

বুদ্ধ দেববর্মা ঃ ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা। তাঁর অভয়নগরের নিজের বাড়িতেই একসময় যুব সমিতির অফিস ছিলো দীর্ঘদিন ধরে। তিনি উপজাতি যুব সমিতির এম. এল. এ ছিলেন একাধিকবার। উপজাতি যুব সমিতি গঠনের মূলে বুদ্ধ দেববর্মার সেক্রিফাইস সর্বজন বিদিত। আশির দাঙ্গার সময় অন্যান্য উপজাতি নেতাদের সঙ্গে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার তাঁকেও জেলে রাখেন। তখন তাঁর বাঙালী স্ত্রী উপজাতি যুব সমিতির অফিস আগলে রাখতেন। উপজাতি যুব সমিতির জন্যে এই ভদ্রমহিলাও দারুণভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বুদ্ধ দেববর্মা পূর্বে আগরতলার ঠাকুর পরিবারে বিয়ে কেন। কিন্তু সেই স্ত্রী মারা গেলে তিনি দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ করেন। সম্পর্কে মহারাজ কুমার টীকাজী কর্তা তাঁর ভায়রাভাই। বুদ্ধ দেববর্মার গ্রামে বাড়ি ছিলো চড়িলামের বিখ্যাত চন্ডীঠাকুর পাড়ায়। চন্ডীঠাকুরের আপন পৌত্র তিনি এবং গজভীম নারায়ণের বংশধর। আত্মীয়তাসূত্রে তিনি সি. পি. আই (এম) নেতা সুধন্বা দেববর্মার ভাই। আর আমারও বিবাহ সূত্রে তিনি আমার দাদাশ্বশুর। তাঁর কাছ থেকে ত্রিপুরার উপজাতীয় জীবনের অনেক তথ্য আমি সবসময় সংগ্রহ করে

থাকি। আমার কাকাশ্বশুর ধীরেন্দ্র দেববর্মারর শ্বশুর তিনি। আমার কাকাশ্বশুরের ছেলে বাপ্পু ডাক্তারি পাশ করেছে এবং তাঁর ছোট বোন ইতিহাসে এম. এ পাশ করে এখন মাস্টারি করছে এবং পি. এইচ. ডি করার কাজে লিপ্ত আছে।

বীরেন্দ্র দত্ত : বীরেন দত্ত ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রবাদপ্রতীম নেতা। তাঁর হাতেই হাঁটিহাঁটি পাপা করে ত্রিপুরা রাজ্যে একসময় সি. পি. আই পার্টি গড়ে ওঠে। তিনি পেছনে থেকে রাজ্যে জনশিক্ষা আন্দোলনেরও অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্ব দেন। সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মা, ডাঃ নীলমণি প্রমুখের কমিউনিস্ট আন্দোলনে হাতেখড়ি দেন। তিনি উমাকান্ত স্কুলের বোর্ডিঙে গিয়ে উপজাতি ছাত্রদের সঙ্গে রাজনীতিক বিষয়ক আলোচনা করতেন এবং তাদেরকে আস্তে আস্তে জনশিক্ষা আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে টেনে আনতেন আস্তে আস্তে। ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের উষালগ্নে বীরেন দত্ত ও তাঁর স্ত্রী সরযু দেবী যে আত্মত্যাগ করেছেন, সে-কথা এ রাজ্যের সকলেই জানেন। সি. পি. আই পার্টি'র একাধিকবার এম. পি ছিলেন তিনি। পরে পার্টি ভাগ হলে নতুন পার্টি সি. পি. আই (এম)-এ যোগ দেন তিনি এবং প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের লেবার ও রেভিনিউ মিনিস্টার হন তিনি। মন্ত্রী হয়েই কৃষকদের খাজনা মকুব করে দেন তিনি। পরবর্তীকালে পার্টির মধ্যে দলীয় নেতৃত্বের কোন্দলের জন্যে অনেকটা কোণঠাসা অবস্থায় পার্টি থেকে অনেকটা দূরে সরে যেতে বাধ্য হন তিনি। তাঁর মতো সুভাষী ভদ্র জননেতা ত্রিপুরায় বিরল। লেখক ও প্রবন্ধকার হিসেবেও তাঁর নাম ছিলো। তিনি প্রথম জীবনে একখানা উপন্যাসও লিখেছিলেন। জানা যায়, তিনি ত্রিপুরী লোককথাও সংগ্রহ করে মুদ্রিত করেছিলেন।

বৌমা : পুষ্প বসু। বন্ধুবর অধ্যাপক স্বপন বসুর স্ত্রী। স্বপনের স্ত্রীকে আমি বৌমা বলেই ডাকি।

বি. কে. রায়চৌধুরী : ডাঃ বারীণ কুমার রায় চৌধুরী। কলকাতার বিখ্যাত কান-নাক-গলার ডাক্তার। তিনি কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের এমিরিটাস প্রফেসার ছিলেন। তাঁকে আমার পুত্র সুরঞ্জনের কান দেখিয়েছিলাম। তিনি তার ান অপারেশনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। নর্সিংহোমে ভর্তির ব্যবস্থাও হয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকার অভাবে সুরঞ্জনের কান অপারেশন করা যায়নি।

বড়দা : শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরী। তিনি ক্যালকাটা কর্পোরেশনের এসটাব্লিশমেন্ট সেকশনের চীফ একাউন্টট্যান্ট ছিলেন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর বনগাঁ লাইনে নববারাকপুরের মাড়োয়ারী বাগানে বাড়ি করেছেন। বড়দা ছাত্র জীবনে খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি আমাদের মামার বাড়ি ইসলামকাবী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কপোতাক্ষ নদীব ধারের রমণীয় এই স্কুলটি গড়েছিলেন কলকাতার কমলার স্টোর্সের মালিক সুরেন্দ্র চক্রবর্তী ও তাঁর ভাইয়েরা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরামর্শে নাকি এই আদর্শ বিদ্যালয়টি গড়ে ওঠে। আমার বড়দা আমাদের খাজরা গ্রামের আদর্শ ছেলে হিসেবে সকলের অতি প্রিয় ছিলেন। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে নানা জনহিতকর কাজ করতেন তিনি হিন্দু - মুসলমান সকলের সঙ্গে মিলে। আমার কাছে বড়দা আরাধ্য দেবতার মতো। বাল্যকাল থেকে তিনি আমাকে লেখাপড়ায় উৎসাহ দিতেন। প্রকৃত অর্থে মেজদা, সেজদা, ও আমাকে বড়দাই মানুষ করেছেন এবং বড়ো হতে সাহায্য করেছেন।

বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য : বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য আমাদের নববারাকপুরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। নববারাকপুর কলোনী গড়ার কাজে তিনি ওই কলোনীর মূল হোতা হরিপদ বিশ্বাসের ডান হাত ছিলেন। বহু ঝামেলা পোহাতে হয় তাঁকে এই কলোনী গড়তে গিয়ে। নববারাকপুর কলোনীর প্রথম যুগে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র জাগৃতি সঙ্ঘ গড়ে তোলেন। এই কাজে আমার বড়দা চিত্তরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরীও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বীরেনবাবু হচ্ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকপাল অধ্যাপক দুঃখহরণ-চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর ভাগ্নে। আমাদের পারিবারিক বিপদ-আপনেদর বন্ধু বীরেনবাবু।

বর্ধন : আমার পুত্র সুরঞ্জনের বন্ধু।

মিঃ বোস : ত্রিপুরার প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার পি. এ.।

বসু মগ : বসু মগের বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরার মগ অধ্যুষিত কলসী গ্রামে। তিনি একজন ধনী কৃষক। নিজের পাওয়ার টিলার আছে। একসময় ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। আমি বিভিন্ন সময়ে গবেষণার কাজে গিয়ে তাঁর বাড়িতে থাকতাম এবং তাঁর স্ত্রী আম্রপলী আমাকে খুব আদরযত্ন করে খাওয়াতেন। একবার চিত্রপরিচালক দীপক ভট্টাচার্যকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে উঠেছিলাম। এই বাড়িতে থেকে দীপকবাবু তাঁর 'পিলাক' সিনেমার জন্যে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

বেটোফেন : জগৎ বিখ্যাত জার্মান সুরকার।

বিজয় দেববর্মা : ডাক্তার বিজয় দেববর্মা। বিজয় দেববর্মা হলেন কমলপুরের সি. পি. আই নেতা ধর্মরায় দেববর্মার ছোট ছেলে। ডাক্তারি শাস্ত্রের বাইরেও তিনি রীতিমতো সাহিত্যচর্চা করেন। ককবরক কবিতা লেখায় তার ভালো হাত আছে। বাংলাতেও তিনি বেশ উঁচুমানের কবিতা লিখে থাকেন।

বসন্ত চৌধুরী : অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী। বিভিন্ন সময়ে প্রাচীনমুদ্রা সংগ্রহের কাজে তিনি ত্রিপুরায় আসতেন এবং রাজেন্দ্রকীর্তিশালার কর্ণধার জহর আচার্যের সংগ্রহশালায় যেতেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন মঠ-মন্দির ঘুরে দেখতেন তিনি। একবার ডম্বুর জলাশয় দেখতে গিয়ে একটা বাঘের বাচ্চা নিয়ে আসেন তিনি। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

ছিলো। মহারাজকুমার সহদেব কর্তা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ব্রজগোপাল মজুমদার ঃ ডঃ মজুমদার ত্রিপুরার সাক্ষরতা আন্দোলনে একজন বিশিষ্ট কর্মী। সাক্ষরতার বই লেখার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর মতো ত্রিপুরার আর কারো নেই। ত্রিপুরায় সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির পেছনে ডঃ মজুমদারের অবদান অসীম। বর্তমানে তিনি 'ত্রিপুরা স্টেট রিসোর্স সেন্টার' এর কর্ণধার।

বিশু দেববর্মা ঃ বিশু দেববর্মার বাড়ি বিশ্রামগঞ্জের সর্বজয় পাড়ায়। বামফ্রন্টের সি. পি. আই (এম) কর্মী।

বীণাপাণি ঃ বীণাপাণি দেববর্মা। আমার বড়ো পিসিশাশুড়ীর নলিনীর বড়ো মেয়ে। বাপের বাড়ি লালসিংমোড়ার পাশে পুরাইবাছাই গ্রামে। বিয়ে হয়েছে বাপের বাড়ির কাছে রামনগরের পুরাতন বাকলীতে অশ্বিনী দেববর্মা (লিগিলাগাই)'র পৌত্রের সঙ্গে। বীণাপাণির স্বামীর নাম চিত্তরাই দেববর্মা।

বাই পরিমল ঃ শ্রীমতী পরিমল দেববর্মা। আমার বড়ো মামাশ্বশুর রাজেন্দ্র দেববর্মার মেয়ে। বাড়ি রামনগরের রামনারায়ণ ঠাকুরপাড়ায়। বিয়ে হয়েছে পাশের পাড়া ধনাচরে সুধন দেববর্মার সঙ্গে। সুধনবাবু সি. পি. এম-এর একজন বড়ো সংগঠক। ককবরক ভাষায় 'বাই' অর্থ দিদি। ককবরকে আত্মীয়তা বাচক বিশেষণ নামের আগে বসে। তাই বাই পরিমলের অর্থ পরিমল দিদি)।

ব্রজগোপাল ভৌমিক ঃ ব্রজগোপাল ভৌমিকের বাড়ি চড়িলামের ছেছরিমাইয়ে। তাঁর বাবার নাম শচীন্দ্র ভৌমিক। ব্রজগোপাল ভৌমিকের ডাক নাম রামু ভৌমিক। ব্রজগোপাল সি. পি. এম-এর কর্মী এবং বিধায়ক পরিমল সাহার মৃত্যুর পরে চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সি. পি. এম-এর প্রার্থী হিসেবে পরিমল সাহার ছোটভাই মতিলাল সাহার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন।

বিধি দেববর্মা ঃ বিধি দেববর্মার বাড়ি বিশ্রামগঞ্জের কাছে বাঁশতলী গাঁওসভার জোততলীতে। তিনি এলাকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি।

বসন্ত দেববর্মা ঃ বসন্ত দেববর্মার বাড়ি দক্ষিণ চড়িলামের রামদাস পাড়ায়। পিতার নাম মনোমোহন দেববর্মা। তাঁর দাদা হলেন ডাক্তার মঙ্গল দেববর্মা। বসন্তবাবু একসময় উপজাতি যুব সমিতি পার্টি করতেন। বর্তমানে বামফ্রন্টের কর্মী এবং সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার অনুগামী।

বাঁশীচন্দ্র দেববর্মা ঃ আমার শ্বশুর বাড়ি হেবমা গ্রামের রামহরি ঠাকুরের বড়ো ছেলে। সম্পর্কে আমার বড়ো দাদা শ্বশুর, আমার আপন দাদাশ্বশুর গৌরচাঁন ঠাকুরের বড়োভাই। তিনি একটু কম বয়েসে বহুমূত্র রোগে মারা যান।

বলাই দেববর্মা ঃ বলাই দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের কাছে চণ্ডীঠাকুর পাড়ায়। তাঁর পিতার নাম যোগেন্দ্র দেববর্মা। তিনি শিল্পী ধীরেন কৃষ্ণ ঠাকুরের সময়ে শান্তিনিকেতনে পড়তেন। কিন্তু ছুটিতে বাড়ি এসে কলেরা হয়ে মারা যান।

বিতু ঃ শ্রীমতী বিতু দেববর্মা। পিতার নাম কোষাচন্দ্র দেববর্মা। গ্রাম হেরমা। সম্পর্কে আমার পিসি শাশুড়ী। তিনি উপজাতীয় তাঁতে নানাপ্রকার ডিজাইনের পরিধেয় বস্ত্র, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরী করতে পারেন।

বিমল সিনহা ঃ বিমল সিনহার বাড়ি কমলপুর শহরে। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের লোক। তিনি ছিলেন সি. পি. আই (এম) পার্টির বড়োমাপের নেতা। ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে মন্ত্রীও হন। মন্ত্রী থাকাকালীন কমলপুরে আভাঙ্গার কাছে আততায়ীর গুলীতে নিহত হন। রাজনীতির বাইরে বিমল সিনহার পরিচয় ছিলো সাহিত্যিক হিসেবে। বাঙলা ভাষায় তিনি বেশ কয়েকখানা উপন্যাস ও কিছু ছোটগল্প লিখে গেছেন। রিয়াঙ উপজাতিদের নিয়ে তিনি লঙতরাই উপন্যাস লেখেন। এবং পরবর্তীকালে চিত্রপরিচালক দীপক ভট্টাচার্য এই উপন্যাস অবলম্বনে রিয়াঙ ভাষায় চলচ্চিত্র তৈরী করেন।

বিষ্ণুপদ গোস্বামী ঃ বিষ্ণুপদ গোস্বামীর বাড়ি উদয়পুরের কাছে। তিনি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা বিভাগে আমার কাছে ভাষাতত্ত্ব পড়েছেন। নানাপ্রকার সোসাল ওয়ার্কের সঙ্গে বিষ্ণুপদ জড়িত। সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পুরস্কৃতও হয়েছেন।

বনবিহারী মোদক ঃ বনবিহারী মোদকের পূর্ব নিবাস নবদ্বীপ শহরে। চাকুরী সূত্রে তিনি ত্রিপুরায় আসেন ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ছিলেন। আগরতলার মহিলা কলেজের লাইব্রেরিয়ান পদে থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বনবিহারীবাবু মূলত লেখক। একসময় কলকাতার যুগান্তর কাগজে ত্রিপুরা প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি একাধিক লেখা লিখেছেন। তিনি যখন অমরপুরের হাইস্কুলের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন তখন কিছু অমূল্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন ত্রিপুরার উপজাতিদের নিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি 'দৈনিক সংবাদ'-এ সিরিয়াস লেখা লিখেছেন।

বেণুধর গোস্বামী ঃ বেণুধর গোস্বামী আগরতলার প্রভুবাড়ির লোক। উজির বাড়ির সাংস্কৃতিক ঘরণার সঙ্গে তিনি যুক্ত এবং শিল্পী প্রাঞ্জল দেববর্মার বিশিষ্ট বন্ধু। বেণুধরবাবু আগরতলায় অনেক নাটকের অভিনয় করেছেন।

বিজন চৌধুরী ঃ অধ্যাপক বিজন চৌধুরী। বিজন চৌধুরী আগরতলা মহারাজ বীরবিক্রম কলেজে অধ্যাপনা করতেন। অধ্যাপনা ও সাহিত্যচর্চার বাইরে তিনি ছিলেন অত্যন্ত রবীন্দ্র অনুরাগী। তিনি শ্রীযুক্ত নেপাল দে প্রমুখ রবীন্দ্র ভক্তদের নিয়ে একসময় আগরতলায় বিদুর কর্তা চৌমুহনীর কাছে রাধামোহন ঠাকুর সরণীতে 'রবীন্দ্র পরিষদ' গড়ে তোলেন। তাঁর একান্ত

প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র রবীন্দ্র পরিষদ এক মহীরুহের আকার ধারণ করে। এমন একটি উচ্চমানের রবীন্দ্রিক সংগঠন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আর নেই। মৃত্যু পর্যন্ত বিজন চৌধুরী ছিলেন এর প্রাণপুরুষ। রবীন্দ্র-সংস্কৃতি চর্চার বাইরে ব্যাপকভাবে সাহিত্য চর্চাও করতেন অধ্যাপক চৌধুরী। তাঁর লেখা বইও আছে। অনেক মূল্যবান প্রবন্ধও লিখে গেছেন তিনি। তিনি ত্রিপুরার আর্য-মোঙ্গলীয় ভাষাগুলোর একটা বিশ্বকোষ করবার আশাও ব্যক্ত করেছিলেন। বিজন চৌধুরীর কর্মপরিধি ছিলো একটু বিস্তৃত। তিনি নানারকম সমাজসেবামূলক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। আশির দাঙ্গার সময় তিনি ক্ষীরগোপাল কর্তা ও অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে একটা মৈত্রী সংগঠনও গড়ে তোলেন এবং বিবদমান উভয় জাতিগোষ্ঠীর ক্ষত নিরাময় করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ত্রিপুরার সামাজিক অসন্তোষ ও বিপদের সময় বিজন চৌধুরী এক বীর যোদ্ধার ভূমিকা পালন করে গেছেন।

বীরচন্দ্র মাণিক্য : বীরচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা। তিনি ১৮৯৬ পর্যন্ত রাজ সিংহাসনে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য পড়ে মোহিত হয়ে তিনি কিশোর কবি রবি ঠাকুরকে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রাজ উপঢৌকন পাঠিয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে। বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁর কার্শিয়াং ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন যে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র তাঁর প্রতিভা আবিষ্কার করেছিলেন। বীরচন্দ্রের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরার রাজ পরিবারের মিত্রতা গড়ে ওঠে এবং ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন রাজা বীরবিক্রমের সময়কাল পর্যন্ত এই ধারা বহমান ছিলো। বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময়কাল থেকে ইংরেজ সরকারের পরামর্শে আধুনিক ত্রিপুরার সূত্রপাত হয়। তাঁর সময়েই ত্রিপুরায় সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বালেশ্বর প্রসাদ : বালেশ্বর প্রসাদ ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল।

বিকাশ ভট্টাচার্য : বিকাশ ভট্টাচার্যের বাড়ি আগরতলার পুরোনো কালীবাড়ি লেন। তিনি জি. বি. হাসপাতালের প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবারোটোরির একজন দায়িত্বশীল কর্মী। তিনি ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার বন্ধু এবং উভয়েই খোয়ায়ের লোক।

বুদ্ধশঙ্কর গোস্বামী : বুদ্ধশঙ্কর গোস্বামী একসময় আজকাল পত্রিকার ত্রিপুরার রিপোর্টার ছিলেন।

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য : বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য আগরতলার রাজপন্ডিতের বাড়ির ছেলে। সম্পর্কে তিনি গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার দৌহিত্র। বিশ্বজিৎ একজন স্কুল মাস্টার। বিশ্বজিৎ বিয়ে করেছে আমার আপন মামাতো শালীকে শ্রীমতী পরিমল দেববর্মার মেয়ে বেলারাণীকে।

বিভাস চক্রবর্তী : প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা। আমি যখন ষাটের দশকের শেষপাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন তিনি অভিজেতা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের পরামর্শে আমাদের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতার অভিনয়ে তালিম দিতেন। তখন আমরা বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার 'পিরানদেলো'র একটা নাটক অভিনয় করেছিলাম। নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তী ত্রিপুরাতেও এসেছেন এবং একবার ত্রিপুরা দর্পণের সম্পাদক সমীরণ রায়ের চেম্বারে তাঁর সঙ্গে অনেক বছর পরে দেখা হয়েছিলো।

বামাপ্রদ মুখোপাধ্যায় : ডঃ বামাপদ মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে আগরতলার মহারাজ বীরবিক্রম কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদেও ছিলেন। বর্তমানে তিনি ত্রিপুরা মধ্য পর্ষদের সভাপতি। ইংরেজী সাহিত্যের কৃতী অধ্যাপক হিসেবে তাঁর খুব নাম। তিনি হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষাও ভালো জানেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের সংস্কৃত টোল বলে জানা যায়। তিনি বর্ধমানের লোক।

বলরাম : বলরামের আগরতলার কর্ণেল চৌমুহনীতে একটা লন্ড্রী ছিলো। পরে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে অন্যত্র চলে যায়।

বীরজিৎ সিনহা : কংগ্রেস নেতা বীরজিৎ সিনহার বাড়ি কৈলাসহরে। তিনি একজন মেইতি মণিপুরী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি। ত্রিপুরার মন্ত্রীও ছিলেন তিনি। একসময় কংগ্রেসের প্রভাবশালী যুবনেতা হিসেবে নাম ছিলো তাঁর। বর্তমানে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং বাড়ি করেছেন আগরতলার এডভাইজর চৌমুহনীতে।

বিশ্বজিৎ দাশ : বিশ্বজিৎ দাশ আগরতলার দূরদর্শনের একজন জনপ্রিয় কর্মী। সম্পর্কে তিনি লেখক ভীষণ দেব ভট্টাচার্যের ভাগ্নে জামাই।

বিপিন কর্তা : ত্রিপুরাজার মহারাজার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লেবু কর্তার পুত্র। আস্তাবল বাজারের কাছে বাড়ি। বিপিন কর্তা ছিলেন একজন গুণী শিল্পী। নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন অতীব পারঙ্গমতার সঙ্গে। তাঁর ভ্রাতা বঙ্কিম কর্তাও ওই একই গুণে ভূষিত ছিলেন। পুরনো আগরতলায় বিপিন-বঙ্কিম কর্তাদের বাড়ি ছিলো সংস্কৃতি জগতের পীঠস্থান। তাঁরা লেবু কর্তার ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন।

বি. এল. দেববর্মা : বদ্রীলাল দেববর্মা। বদ্রলীল দেববর্মা হলেন ত্রিপুরার বিখ্যাত রাজনীতিক ও প্রাক্তন এম. পি বংশীঠাকুর (অমরেন্দ্রনাথ দেববর্মা)-এর ছেলে। তিনি ত্রিপুরা সরকারের কৃষি বিভাগের অধিকর্তা হয়েছিলেন। উত্তর বনমালীপুরে তাঁর বাড়ি।

বুটলী : সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার ছোট মেয়ে। সে বি. এ পাশ করে স্কুলে মাস্টারি করে। তার বিয়ে হয়েছে

বোধজং চৌমুহনীর দীলিপ সাহার সঙ্গে। দিলীপবাবুরা খুব ধনী লোক। আগরতলার সূর্য চৌমুহনীতে তাঁদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে।

বীরেন্দ্র কিশোর ঃ ত্রিপুরা মহারাজা, ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন রাজা মহারাজ বীরবিক্রমের পিতা। বীরেন্দ্র কিশোর অল্প বয়সেই মারা যান। তার নয় রাণী ছিলো বলে জানা যায়। মহারাজকুমারী কমলপ্রভা তাঁর কন্যা। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর খুব উঁচুমানের চিত্রশিল্পী ছিলেন। এছাড়া শাস্ত্রীয় সংগীতও গাইতে পারতেন বিশেষ পারঙ্গমতার সঙ্গে। তাঁর সুর দেওয়া ও নিজের কণ্ঠস্বরের শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্যাসেট রাজবাড়িতে রক্ষিত আছে বলে জানা যায়। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় হোলীর গানও গাইতে পারতেন। ব্রজবুলি ভাষায় কিছু হোলীর গানও লিখে গেছেন বলে জানা যায়। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের সময়ে ত্রিপুরার রাজবাড়িতে খুব ঘটা করে বসন্ত-উৎসব পালন করা হতো। মহারাজের নেপালী রাণীর ঘরে মহারাজ বীরবিক্রম জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ব্রজেন্দ্র কিশোর ঃ মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর ছিলেন ত্রিপুরার মহাবাজা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু রাধাকিশোরের পুত্র ও মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের ছোট ভাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং নিয়মিতভাবে চিঠি লিখতেন নানাপ্রকার উপদেশ দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণের সঙ্গী চিলেন ব্রজেন্দ্র কিশোর। প্যারিসে রোমারোলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন দেখা করেন তখন ব্রজেন্দ্রকিশোর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও রোমারোলার সঙ্গে একই ছবিতে ব্রজেন্দ্র কিশোর আছেন বলে জানা যায়। ব্রজেন্দ্র কিশোরেব ডাক নাম ছিলো লালু কর্তা। লালু কর্তা দু'বার ত্রিপুরার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। প্রথমবার মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেহত্যাগ করলে এবং দ্বিতীয়বার মহারাজ বীরবিক্রম মারা গেলে। লালু কর্তার নানান গুণ ছিলো। তাঁর চরিত্রে অনেকটা ত্রিপুরার পাহাড়ের সাধারণ উপজাতির গুণ ছিলো। তিনি নিজের হাতে বাঁশ বেতের নানারকম জিনিষ তৈরী করতে পারতেন। তাঁর হাতের তৈরী কাঠের বাক্স এখনো আছে। লালু কর্তার বর্তমান কুঞ্জবনের বাড়ির লনে যে বসার জায়গাগুলো আছে তা তাঁর নিজের হাতের তৈরী। লালু কর্তা পাখিদের খুব ভালো বাসতেন। তাঁর পূর্ববাড়ি (বর্তমানে আগরতলার মহিলা কলেজ)'র বাগানে প্রচুর পাখি থাকতো। কর্তা তাদের নিজের হাতে খাওয়াতেন এবং পাখিরা তাঁর মাথায়-ঘাড়ে এসে বসতো। ব্রজেন্দ্র কিশোর আগরতলার রবীন্দ্র পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি ৯৯ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর কৃতী দুই হলেন ননী কর্তা ও ক্ষীরগোপাল কর্তা।

বুবু ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কমলকুমার সিংহর ছোট মেয়ে। সে আগরতলার আর্ট কলেজে পড়ে।

বাহাদুর দেববর্মা ঃ আগরতলার অরুন্ধতীনগরের ব্যাপটিস্ট মিশনের হেড পাদ্রী। সম্পর্কে আমার স্ত্রীর মাসতো ভাই। তিনি জঙ বাহাদুর বলে পরিচিত। চড়িলামের কাছে রামনগরে তাঁর বাড়ি। তাঁর পরিবারের নতুন প্রজন্ম সকলেই খ্রীষ্টান হয়ে গেছে।

ব্রাউন সাহেব ঃ ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন রাজা মহারাজ বীরবিক্রমের আমলে ত্রিপুরার জনপ্রিয় শিক্ষামন্ত্রী। জনশিক্ষা আন্দোলনের দাবী মেনে মহারাজ বীরবিক্রম যখন পাহাড়ে চারশোর মতো স্কুল খোলার প্রতিশ্রুতি দেন, তখন সেই কাজের বাস্তবায়নের কঠিন দায়িত্ব পড়ে ব্রাউন সাহেব ওপর। ব্রাউন সাহেব সেই কঠিন দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। এখনো আগরতলায় ব্রাউন সাহেবের বাংলো আছে। সেই বাংলো এখন ২ নম্বর এম. এল. এ হোস্টেল।

বঙ্কিম কর্তা ঃ ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা লেবু কর্তার গুণী পুত্র। বঙ্কিম কর্তা ও বিপিন কর্তা দুই ভাই। দুই ভাই-ই শিল্পী। তাঁরা এসরাজ, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে ওস্তাদ ছিলেন। তাঁদের বাড়িকে কেন্দ্র করে রাজন্য আমলের আগরতলায় একটা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

বলরাম ঃ বলরাম দেববর্মা। বলরাম দেববর্মার বাড়ি হেরমায়। সম্পর্কে আমার শালা, জ্যাঠাশ্বশুর কিরীন্দ্র দেববর্মার ছেলে। হেরমার উপজাতীয় বাজারে বলরামের একটা সাইকেল রিপেয়ারিঙের দোকান আছে। সাইকেল রিপেয়ারিঙে বলরামের খুব নাম। অথচ কোনো বিশেষজ্ঞ কাছ থেকে সে এই টেকনিক্যাল বিদ্যা শেখেনি। লেখাপড়াও কম। মাত্র ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে। তার হাতের কাজ ভালো বলে সুদূর চড়িলাম থেকেও লোক আসে কাছে সাইকেল মেরামতের কাজে। আগরতলায় মহাজনদের সঙ্গেও তার কাজ-কারবার ভালো। মহাজনেরা কাজ কথা ঠিক রাখার জন্যে তাকে খুব বিশ্বাস করে ভালোবাসে। এই সাইকেল মেরামতির কাজ করে বলরামদের গরীব অবস্থার খুব উন্নতি হয়েছে।

বকুল ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের ছাত্র।

বিদ্যাধর দে ঃ বিদ্যাধর দের বাড়ি আগরতলার কৃষ্ণনগরের কাছে ছাত্রসঙ্ঘের পাশে। বিদ্যাধর বাবুরা রাজার আমলের লোক। ত্রিপুরার রাজবাড়িতে একসময় কসবা কালীবাড়ির দীঘি থেকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মধ্য দিয়ে 'ভারি' দিয়ে খাবার জল আনা হতো। প্রতি এক মাইল অন্তর 'ভারি' দাঁড়িয়ে থাকতো এবং এভাবে মুগরার রাস্তা দিয়ে ভারি প্রথায় খাবার জল এসে যেতো আগরতলার রাজবাড়িতে। বিদ্যাধরবাবুদের পূর্বপুরুষ নাকি রাজবাড়ির সেই জল সরবরাহ কাজের তত্ত্বাবধান করতেন।

বাদল মুখার্জী ঃ সি. পি. আই (এম) পার্টির সমর্থক। বাড়ি আগরতলার পদ্মপুকুরে।

ব্রজদুলাল ভট্টাচার্য ঃ ব্রজদুলাল বাবু ত্রিপুরা সরকারের কৃষি বিভাগের অফিসার ছিলেন। আগরতলার নাজির পুকুর পাড়ে বাড়ি করেছেন। তিনি বিয়ে করেছেন আগরতলার বিশিষ্ট উপজাতীয় ঠাকুরলোক পরিবারে।

বিনন্দ জমাতিয়া ঃ বিনন্দ জমাতিয়ার বাড়ি উদয়পুরের শিলঘাটী গ্রামে। তাঁর সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, তখন তিনি থাকতেন শিলঘাটীর জনার্দন দারোগার বাড়ি। তিনি একসময় বগাফায় থাকতেন কর্মসূত্রে। তাঁর কাছ থেকে সি. পি. এম নেতা বাজুবন রিয়াঙের শিকারের অনেক গল্প শুনেছি। বিনন্দবাবু বাজুবন রিয়াঙের সঙ্গে শিকারে অংশ নিতেন।

বিশু দেববর্মা ঃ বিশু দেববর্মার বাড়ি জিরানীয়ার মাধববাড়ি। তিনি সি. পি. এম পার্টির একজন সক্রিয় সমর্থক।

ব্রজবিহারী রায় ঃ ব্রজবিহারী রায় হলেন ত্রিপুরার ইতিহাসখ্যাত রাজা নক্ষত্র রায়ের বংশধর। তাঁর পিতার নাম প্রতাপ রায়। প্রতাপ রায়ের নামে আগরতলার নাজির বাড়ির পাশ দিয়ে একটা রাস্তা আছে। ব্রজবিহারীবাবু একজন ইংরেজী জানা উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। একসময় তিনি উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক ছিলেন ওই সমিতির গঠনকালপর্বে।

বাপী ঃ বাপী হচ্ছেন 'জনসেবা পরিষদ' এর কর্ণধার অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তীর সম্পর্কিত ভাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর জনসেবা পরিষদের যে অফিস আছে, সেই অফিসের একজন দক্ষ কর্মী বাপী। ত্রিপুরার লোকেদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন বাপী। বাপীর বাড়ি ত্রিপুরার আমবাসাতে।

বরুণ সেনগুপ্ত ঃ কলকাতার ত্রিপুরা ভবন (পিটোরিয়াস্ট্রীট)-এর ট্যুরিজিম বিভাগের অফিসার। তাঁর সময়কালে কলকাতা হয়ে ত্রিপুরায় প্রচুর পর্যটক যেতেন এবং তাঁরা ত্রিপুরা ভবনে এসে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তর সক্রিয় সহযোগিতা পেতেন। তাঁর হাতে কলকাতার ত্রিপুরা ভবনের ট্যুরিজিম বিভাগের মান অনেক বেড়ে যায়। বিভাগটিকে আধুনিকভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন তিনি। বরুণবাবু ত্রিপুরার লোক। বর্তমানে বাড়ি করেছেন গড়িয়ায়।

ব্রজেন সাহা ঃ ব্রজেন সাহা প্রথম জীবনে কুমিল্লার শ্রীকাইল কলেজের বাঙলার অধ্যাপক ছিলেন। ত্রিপুরার প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ও ককবরক ভাষার প্রথম ঔপন্যাসিক সুধন্বা দেববর্মা ছিলেন শ্রীকাইল কলেজে অধ্যাপক সাহার ছাত্র। ব্রজেন সাহা পরবর্তীকালে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তখন আমি ছিলাম তাঁর ছাত্র। অধ্যাপক সাহা যাদবপুরের কাছে হালতুতে বাড়ি করেছেন।

ব্রজেন্দ্র দেববর্মা ঃ ব্রজেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের উপজাতি জনপদ ধারিয়াথলে। তিনি খায়রা-হেরমা এলাকায় ব্রজেন্দ্র সেক্রেটারী নামে পরিচিত। সম্পর্কে তিনি বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা সুধন্বা দেববর্মার বড়ো ভগ্নীপতি। ব্রজেন্দ্র সেক্রেটারীর দুই ছেলে — ডাঃ সুশীল দেববর্মা ও সুবল দেববর্মা। আর দুই মেয়ে। দুই মেয়েরই বিয়ে হয়েছে বাইরে থেকে জামাই এনে। তাঁর এক জামাই হরিপদ দেববর্মা (শিক্ষক) সম্পর্কে আমার জ্যাঠাশ্বশুর।

বীণা ঃ বন্ধুবর অধ্যাপক স্বপনবাবুর বাড়ির কাজের মেয়ে।

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ি আগরতলার রামনগরে। তিনি কর্মসূত্রে একজন ব্যাঙ্ক কর্মী। বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর আসল পরিচয় তিনি কবি এবং অত্যন্ত উন্নতমানের ছড়া লেখক। শিশুদের জন্যে লেখা অজস্র কবিতাও আছে তাঁর। ইতিমধ্যে ছড়ার বইও বেরিয়েছে তার। কলকাতার সমস্ত 'এ-ক্লাস' পত্রিকায় তাঁর ছড়া বেরিয়ে থাকে। ছড়া লেখক হিসাবে তিনি বাঙলা সাহিত্যে ইতিমধ্যে একটা স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় শিশুদের 'শৈশব' আসরটি তিনি-ই পরিচালনা করে থাকেন।

বিশ্বজিৎ দেববর্মা ঃ ডাঃ বিশ্বজিৎ দেববর্মা। সম্পর্কে আমার শালা, কাকা শ্বশুর শম্ভু দেববর্মার ছেলে। বিশ্বজিতের মা বাঙালী, উদয়পুরের ফুলকুমারীর মেয়ে। বিশ্বজিতের বাবা হেরমা ছেড়ে এখন তেলিয়ামোড়ায় বাড়ি করেছেন। তিনি ও আমার কাকীশাশুড়ী দু'জনেই তেলিয়ামোড়া হাসপাতালের কর্মী।

বাদল চৌধুরী ঃ বাদল চৌধুরী বর্তমানে ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী। এর আগেও তিনি বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। একবার এম. পি হয়েছিলেন। বর্তমানে সি. পি. আই (এম) পার্টির প্রথম সারির নেতা এবং একজন দক্ষ পার্টি সংগঠক। বিলোনীয়ায় তাঁর বাড়ি। ছাত্রজীবনে তিনি আগরতলার নেতাজী স্কুলে লেখাপড়া করেছেন এবং মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর নাম ছিলো।

বেলারাণী ঃ বেলারাণী দেববর্মা। চড়িলামের কাছে রামনগরের সি. পি. এম. পার্টির নেতা সুধন দেববর্মার মেয়ে। বেলারাণীর বিয়ে হয়েছে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য (শিক্ষক)-এর সঙ্গে। বিশ্বজিৎ আগরতলার রাজপন্ডিত পরিবারের ছেলে। সম্পর্কে গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার দৌহিত্র। বেলারাণী আমার মামাতো শালী বাই (দিদি) পরিমলের মেয়ে।

বিপুল কান্তি কর ঃ সি. পি. আই নেতা মোহন চৌধুরীর আসল নাম। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে ত্রিপুরায় এসে তিনি মোহন চৌধুরী এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন বলে জানা যায়।

বিদ্যা ঃ বিদ্যা দেববর্মা ঃ অবিভক্ত সি. পি. আই পার্টির খোয়াই অঞ্চলের বিরাট উপজাতিয় নেতা। পার্টি বিভাজনের পর তিনি সি. পি. আই (এম) পার্টিতে যোগ দেন এবং বহুবার এম. এল. এ হন। তিনি বোধ হয় বিধানসভার কোনো নির্বাচনেই হারেননি। তিনি ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদেরও বড়ো নেতা ছিলেন। ত্রিপুরার খোয়াইয়ের উপজাতি-বাঙালী অধ্যুষিত এলাকায় তিনি এখনো মৈত্রীর সেতু হিসেবে কাজ করে চলেছেন।

বাস্তা সোরেন ঃ বাস্তা সোরেন বিহারের সাঁওতাল উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক। তিনি ঘাটশিলা থেকে সি. পি. আই-

এর এম. এল. এ হিসেবে বহুবার জিতেছেন। বিহারের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির নেতা। পরম পন্ডিত ব্যক্তি বাস্তা সোরেন। বহু বিষয়ে জ্ঞান আছে তাঁর। ঘাটশিলায় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের বাড়ির কাছে তাঁর বাড়ি। সম্পর্কে তিনি বিভূতিভূষণের পালিতা কন্যার স্বামী। একবার All India Council for Mess Education and Development (AICMED)-এর ঘাটশিলার সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় এবং ত্রিপুরার ডেলিগেট — কুমারী বেবী গুপ্ত, অধ্যাপক সুভাষ দাস, জগৎজ্যোতি রায়, নরেশ চন্দ্র দেববর্মা, বড়দোয়ালী স্কুলের হেড মাস্টার যোগেন্দ্রচন্দ্র দাশ ও অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে নিয়ে বাস্তা সোরেনের বাড়িতে গিয়ে কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে অনেক কিছু অজানা তথ্য জানতে পেরেছিলাম।

বেবী গুপ্ত ঃ কুমারী বেবী গুপ্ত। আগরতলার প্রচীন রাজনীতিক মহিলার মধ্যে তিনি অন্যতম। একসময় তিনি তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। সেই শিক্ষকতায় ইস্তফা দিয়ে তিনি কংগ্রেস পার্টির রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং আগরতলা থেকে বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কুমারী বেবী গুপ্ত সংস্কৃতি জগতেরও লোক। তিনি লেখিকা। মহিলা বিপ্লবীদের নিয়ে লেখা তাঁর একখানা বইও আছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে একখানা সাময়িক পত্রিকাও চালান।

বাবামণি ঃ পরমহংস স্বরূপানন্দ। তিনি একজন অতি পন্ডিত ধর্মপুরুষ। ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে তাঁর অসংখ্য শিষ্য আছে।

বীণা ঃ বীণা দেববর্মা। আমার বড়ো শালা বিশ্বকুমারের স্ত্রী। বাপের বাড়ি সুতারমোড়ায়।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর বাড়ি দক্ষিণ চড়িলামের বাল্লাছড়িতে। তাঁর পিতা পঞ্চানন্দ চক্রবর্তী চড়িলামে জনপ্রিয় ও কৃতী ডাক্তার ছিলেন। ছাত্রজীবনে বিশ্বনাথবাবু প্রথম দিকে এ. আই. এস. এফ করতেন। পরবর্তীকালে কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দেন এবং একবার সি. পি. আই প্রার্থী রাখাল দেবনাথকে হারিয়ে দক্ষিণ চড়িলামের গাঁওপ্রধান হন তিনি। প্রধান হিসেবে খুব নাম করেন বিশ্বনাথবাবু। একসময় তিনি ত্রিপুরার কৃষিমন্ত্রী মনছুর আলী সাহেবের খুব কাছের লোক ছিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বর্তমানে চড়িলামের ধারিয়াথল স্কুলের শিক্ষক। শিক্ষকতার বাইরেও তিনি ডাক্তারিও করেন এবং তাঁর বাবার চড়িলাম বাজারের চেম্বারে বসেন।

বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া ঃ বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া বর্তমানে ত্রিপুরার একটি বিশেষ নাম। তিনি জমাতিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ের সামাজিক সংগঠন 'হদা'র অক্রা (সর্বাধিনায়ক)। তিনি জমাতিয়া সমাজের প্রচীনতম রীতিনীতি বজায় রেখে সংস্কারের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে চান। তিনি চাননা জমাতিয়া সম্প্রদায় নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করুক। বর্তমানে জমাতিয়া সম্প্রদায়ের নব্য শিক্ষিতদের একাংশ খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছেন। হদা অক্রা হিসেবে তিনি এর বিরুদ্ধে অতি সাহসের সঙ্গে জেহাদ ঘোষণা করেছেন এবং বিশাল বিশাল মিটিং করে তাঁর সমাজের সামাজিক অসন্তোষ দূর করার জন্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছেন। তাঁর 'হদা'র রামপদ জমাতিয়া প্রমুখ অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে। ত্রিপুরার উপজাতিদের উগ্রপন্থার বিরুদ্ধেও তিনি খুব সোচ্চার এবং তাদের মোকাবিলার কাজেও তিনি খুব সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। বিক্রমজিত জমাতিয়ার বাড়ি তেলিয়ামোড়ার মোহরছড়ার কাছে। কর্মজীবনে তিনি ত্রিপুরা সরকারের ফিনান্স দপ্তরের অফিসার ছিলেন।

বাবুন সেনগুপ্ত ঃ বাবুন সেনগুপ্ত হলো জয়ন্ত সেনগুপ্তর ডাক নাম। বাড়ি ডি. এম. অফিসের পাশে অফিস লেনে। বাবুন সেনগুপ্তরা রাজ আমলের লোক। বাবা ছিলেন নাম করা কন্ট্রাক্টর। অফিস লেনে গুপ্ত বাড়ি বললে সকলেই চেনে তাদের বাড়ি। বাবুন বিয়ে করেছে আমাদের নববারাকপুরের প্রতিবেশী দিলীপ দাশগুপ্তর মেয়ে রূপাকে। রূপা আমাদের মেয়ের মতো। শ্রীমান বাবুনও আমাদের জামাই।

বোধজং বাহাদুর ঃ রাণা বোধজং। ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন মহারাজা বীরবিক্রমের আপন মাতুল। রাণা বোধজংয়ের বাড়ি নেপালে এবং নেপালের রাজ পরিবারের লোক। বীরবিক্রমের মন্ত্রিসভার সদস্যও ছিলেন তিনি। আগরতলা বোধজং স্কুলটি রাণা বোধজংয়ের নামেই। ত্রিপুরার রাজপ্রসাদের পাশেই রাণা মহল। এই রাণা মহলে রাণা বোধজংয়ের উত্তর-পুরুষেরা থাকেন।

বিদুর কর্তা ঃ ত্রিপুরার রাজপরিবারের রাজকুমার। তাঁর নামেই আগরতলার বিদুর কর্তা চৌমুহনী। বিদুর কর্তা চৌমুহনীতেই বিদুর কর্তার বাড়ি ছিলো। সেই বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যরা কলেজটিলার ফুটবল মাঠের পাশে বিশাল বাগান বাড়িতে থাকেন। বিদুর কর্তার পূর্বতন বাড়িতে বর্তমানে আই. বি অফিস।

বাদল সাহা ঃ আগরতলার শঙ্কর চৌমুহনীর কাছে অবস্থিত গিরিরাজ ফার্নিচারের সুবিশাল দোকানের মালিক।

বিমল চৌধুরী ঃ ত্রিপুরার প্রবীণতম ছোটগল্পকার। সম্ভবত ১৯৪৮ সালেই তাঁর প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। আগরতলা নতুন প্রজন্মের ছোটগল্পকাররা তাঁর হাত দিয়েই বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর ছোটগল্পের বইও আছে। ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি খুব উচ্চমানের। তাঁর কিছু ছোটগল্প বাঙলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন পাবার মতো। তাঁর 'কল্পজ' গল্পটি আন্তর্জাতিক মানের। ত্রিপুরার উপজাতিদের জীবন তাঁর কলমেই প্রথমে ধরা পড়ে। বিমলবাবু পেশায় একজন কবিরাজ। কামান চৌমুহনীতে তাঁর কবিরাজী চেম্বার ছিলো। বর্তমানে বোধজং স্কুলের পাশে থাকেন।

বিশ্বজিৎ দেববর্মা : বিশ্বজিৎ দেববর্মার বাড়ি তকসাপাড়ার কাছে তুইজিলিঙ পাড়ায়। সে আমার পিসতুতো শালী প্রভারাণীর ছেলে। আগরতলায় থেকে লেখাপড়া করেন।

বিপ্লব দাস : কলেজস্ট্রিট কফি হাউসের পাশের শ্যামাচরণ স্ট্রীটের ক্যাম্প (CAMP) বইয়ের দোকানের মালিক। তাঁর বইয়ের দোকানে আগরতলা 'অক্ষর' প্রকাশনীর বই পাওয়া যায়।

বিজিৎ দত্ত : অধ্যাপক বিজিৎ দত্ত। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। বিজিৎ দত্ত একজন অতি পন্ডিত ব্যক্তি। ভাষাবিদ ডঃ সুকুমার সেনের জামাই বলে তাঁকে জানি।

ভারতী : ভারতী দেববর্মা। আমার ছোট শালী। বিয়ে হয়েছে হেরমার পাশের গ্রাম গৌর রূপরা পাড়ার শিক্ষক কৃষ্ণকান্ত দেববর্মার সঙ্গে। ভারতীর ডাক নাম ছায়ারাণী। তার দুই ছেলে, তিন মেয়ে।

ভগীরথ নায়েব : ভগীরথ দেববর্মা। বর্তমানে বাড়ি ধলেশ্বরের স্কুলের পাশে। পূর্বতন বাড়ি চড়িলামের রামনগরের রামনারায়ণ ঠাকুর পাড়ায়। আমার শাশুড়ী শান্তিলতা দেববর্মার আপন কাকা। আমার দাদাশ্বশুর (শাশুড়ীর বাবা) চন্দ্রকুমার মাস্টারের ছোট ভাই ভগীরথ দেববর্মা।

ভূপেন দত্ত ভৌমিক : আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সংবাদ' এর প্রয়াত সম্পাদক। জীবিত অবস্থায় দৈনিক সংবাদের সম্পাদক হিসেবে তিনি ছিলেন কিংবদন্তী বিশেষ। তিনি ছিলেন আপোষহীন সম্পাদক। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা সবসময় সরকার বিরোধী ভূমিকা নিতো। সমালোচক ভূমিকার জন্যে তিনি ত্রিপুরার কোনো সরকারেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন না। ত্রিপুরায় কোন রাজনৈতিক পার্টি ক্ষমতা দখল করবে তা সবসময় বহুলাংশে ভূপেন দত্ত ভৌমিকের কলমের ওপর নির্ভর করতো। সরকারের উত্থান-পতনে তিনি বাস্তবিকই এক নিয়ামক ভূমিকা পালন করতেন। প্রয়াত দত্ত ভৌমিক নিজের প্রতিভাবান ও সাংগঠনিক ক্ষমতার দক্ষতার জোরে 'দৈনিক সংবাদ'কে সর্বভারতীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভ্রমণসাথী হয়ে একাধিকবার বিদেশ ভ্রমণে গেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার সদস্যও ছিলেন। 'দৈনিক সংবাদ' এর আগে নাম ছিলো দৈনিক গণ অভিযান। 'দৈনিক গণ অভিযান' থেকে 'দৈনিক সংবাদ' এ উত্তরণ পর্বে ভূপেন দত্ত ভৌমিককে খুব কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আজ 'দৈনিক সংবাদ'কে ত্রিপুরার আনন্দবাজার বলে অভিহিত করে থাকেন সকলে। শত শত পরিবার দৈনিক সংবাদ বিক্রি করে সংসার চালায়। দৈনিক সংবাদের বিশাল পাঁচতলা অফিস কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার কথা মনে করিয়ে দেয়। সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শুধুমাত্র দৈনিক সংবাদের কর্মীদের বেতন কাঠামো আছে। এবং ভূপেনবাবু প্রয়াত হবার পরেও দৈনিক সংবাদ তার পূর্বতন ঐতিহ্য বজায় রেখে সমানতালে এগিয়ে চলেছে। ভূপেনবাবু একসময় সি. পি. আই (এম) পার্টির ছাত্র সংগঠন এস. এফ. আই. করতেন বলে জানা যায়। পরে মতপার্থক্যের জন্যে সি. পি. এম থেকে সরে আসেন। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী একসময় ভূপেন দত্ত ভৌমিককে তাঁর ক্ষুরধার কলমে একেবারে তুলোধুনো করতেন। কিন্তু সি. পি. এম পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হবার পর তিনি ভূপেন দত্ত ভৌমিকের বন্ধু হয়ে যান এবং নিয়মিতভাবে দৈনিক সংবাদে লিখতে থাকেন। ভূপেনবাবু খুব পরোপকারী লোকও ছিলেন। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে তিনি অর্থ সাহায্য করতেন তাদের আপদে-বিপদে। ভূপেনবাবুর পরামর্শে আমি দৈনিক সংবাদে দীর্ঘদিন ধরে 'ককবরক ভাষা শিক্ষার আসর' লিখেছিলাম।

ভানুলাল সাহা : ভানুলাল সাহার মূল বাড়ি বিশালগড়ে। তিনি সত্তরের দশকের প্রথম দিকে চড়িলামের হাইস্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। তারপর শিক্ষকতায় ইস্তফা দিয়ে সি. পি. আই (এম) পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন। এবং বিশালগড়-চড়িলাম এলাকায় বিশাল সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর মতো ডায়নেমিক কমিউনিস্ট কর্মী বিরল বলা যেতে পারে। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে বিশালগড় এলাকায় পার্টি গড়ার সময় তাঁকে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। চড়িলামের বিধায়ক পরিমল সাহার হত্যার পর তাঁর বাড়ি সম্পূর্ণভাবে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। একসময় বিশালগড়ের এম. এল. এ ছিলেন তিনি। তিনি বর্তমানে পশ্চিম জেলা পঞ্চায়েতের সভাধিপতি।

ভগীরথ দেববর্মা : ভগীরথ দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের নতুন লেম্বুথলে। তাঁর বাড়ির মাটির দেয়াল দেয়া ঘরে ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি ককবরক ভাষার কাজ করেছিলাম ১৯৬৯ সালে। পরবর্তীকালে আমার বিয়ের পর জানতে পারি তিনি আমার পিসশ্বশুর।

ভানু ঘোষ : সি. পি. আই (এম) পার্টির প্রয়াত নেতা। তিনি একসময় ত্রিপুরার বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ছিলেন সি. পি. আই (এম) পার্টির প্রথম সারির নেতা।

ভবানী সেন : কমরেড ভবানী সেন। সি. পি. আই পার্টির সর্বভারতীয় নেতা। ভারতের উপজাতিদের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর তাত্ত্বিক জ্ঞান ছিলো। ত্রিপুরার ককবরক ভাষার গবেষণার কাজে তিনি আমাকে নানাভাবে পরামর্শ দিতেন। তাঁরই পরামর্শে ও 'ককবরক উন্নয়ন পরিষদ' এর আমন্ত্রণে আমি ত্রিপুরায় ককবরক ভাষা গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করি।

ভিক্ষুঠাকুর : ভিক্ষু ঠাকুরের ভালো নাম হৃষীকেশ দেববর্মা। কিন্তু ভিক্ষু ঠাকুর হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি ককবরক ভাষার লিখিতরূপের অন্যতম রূপকার রাধামোহন ঠাকুরের পৌত্র ও হৃদয়রঞ্জন ঠাকুরের পুত্র। তিনি ত্রিপুরা সরকারের পুলিশের কমান্ডান্ট ছিলেন। একবার তাঁকে ত্রিপুরার বর্ডার থেকে তদানীন্তন ই. পি. আর-এর লোকেরা অপহরণ

করে নিয়ে যায় এবং বেশ কিছুকাল বাদে ভারতে ফিরে আসেন তিনি। ভিক্ষু ঠাকুর সম্পর্কে সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার জ্ঞাতি দাদা।

ভুলু বর্মণ ঃ ভুলু বর্মণের বাড়ি ছিলো বিশ্রামগঞ্জের ইটভাট্টায়। তাঁর পিতার নাম নৃপেন্দ্র বর্মণ। কয়েক বছর আগে উগ্রপন্থীরা তাঁর নিজের বাড়িতেই খুন করে যায়। এই ঘটনার পরে সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মা আমাকে নিয়ে প্রয়াত বর্মণের বাড়িতে যান।

ভুবনেশ্বরী ঃ ভুবনেশ্বরী দেববর্মা। স্বর্ণময়ীর মা, সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার শ্বশুর নলিনী ঠাকুরের শাশুড়ীর দিদিমা। ভুবনেশ্বরী ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রের আমলের লোক ছিলেন। বাড়ি মধ্য বনমালীপুর।

ভানু দেববর্মা ঃ ভালো নাম ভানু বিকাশ দেববর্মা। নলিনী ঠাকুরের ছোট ছেলে। সি. পি. আই নেতা কমরেড অঘোর দেববর্মার ছোট শালা। ভানুবাবু ত্রিপুরা সরকারের পি. ডব্লিউ. ডি অফিসের অকাউন্টস অফিসার। ভানুবাবুদের বাড়িতেই ছিলো রাজআমলে কমিউনিস্টদের আনাগোনা। তাঁর দাদা গৌরাঙ্গ দেববর্মা ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টির গঠন কালে আগরতলা শহরের নাম করা কর্মী ছিলেন। তিনিই তাঁদের বনমালীপুরের বাড়ি থেকে ত্রিপুরায় আগত কমিউনিস্ট নেতা নৃপেন চক্রবর্তীকে দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় নিয়ে যান বলে জানা যায় এবং সেখান থেকে নৃপেনবাবু আন্ডার গ্রাউন্ডে যান। একসময় কমরেড দশরথ দেব এবং সুধন্বা দেববর্মা ভানুবাবুদের বাড়ি থাকতেন এবং তাঁর মা তাঁদেরকে দারুণভাবে সেবাশুশ্রূষা করতেন। ভানুবাবুর বড়দা নিতাই দেববর্মাও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিতাই-গৌর এই দু'ভাগ মিলে আন্ডা গ্রাউন্ডে থাকা কমিউনিস্টদের কুপি জ্বালিয়ে তাঁদের বাঁশঝাড়ের ভেতর মিটিং করতেন। বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়িতেই দু'ভাগ সবসময় যেতেন। নিতাই বাবু ভালো আর্টিস্ট ছিলেন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকুরী করতেন তিনি।

ভগবান ঠাকুর ঃ ভগবান দেববর্মা ঃ বিজয় কুমার চৌমুহনীর শ্রীমতী অনিতা দেববর্মার বাবা।

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক ঃ ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক। ডঃ মল্লিক কলকাতার সংস্কৃত কলেজের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। তিনি অপরাধজগতের ভাষা নিয়ে বই লিখে সারা পৃথিবী ব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি জাপানে গিয়ে সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য কম্পিউটারাইজড করেন জাপানী ভাষা বিজ্ঞানীদের সাহায্যে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'Suniti Kumar Chatterji Commemoration Volume' সম্পাদনা করেন। একসময় তিনি West Bengal of Linguistics এবং I.S.I এর যুগ্ম সহযোগিতায় ত্রিপুরার ককবরক ভাষায় Shorthand উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেবের সময়কালে। এই কাজে ডঃ মল্লিক I.S.I. এর দিকপাল সোসিওলিঙ্গুয়িস্ট অধ্যাপক নিখিলেশ ভট্টাচার্যের পরামর্শ নেন। এবং আমাকে এই দুরূহ কাজের ফিল্ড ওয়ার্কের কাজে নিযুক্ত করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেই কাজ পরিণতির মুখ দেখতে পায়নি।

ভবানন্দ মজুমদাব ঃ ত্রিপুরার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অফিসার। বাড়ি বড়দোয়ালী। সম্পর্কে তিনি বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের ভাইঝি জামাই। ডঃ মল্লিক ত্রিপুরায় এলে ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ি যেতেন আমাকে নিয়ে।

ভল্টু ঃ সিদ্ধার্থ দেববর্মা। সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার ছোট ছেলে। ব্যাঙ্কের বড়ো অফিসার।

ভক্ত সাইমল ঃ গন্ডাছড়া মডেল ট্রাইবেল কলোনীর উপজাতি বাসিন্দা। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়ার এলুইন সাহেব একবার কমলপুরের তৎকালীন সার্কেল অফিসার মানিক মজুমদারকে নিয়ে ভক্ত সাইমলের বাড়িতে যান এবং উপজাতীয় তাঁতে উপজাতীয় পাছড়ার নয়নাভিরাম বিভিন্ন রঙের 'টানা' দেখে বিস্মিত হন এবং ওই পাছড়ার ডিজাইনের খুব তারিফ করেন।

ভূপেন হাজারিকা ঃ আসামের বিখ্যাত গায়ক।

ভেল্টু ঃ আমাদের নববারাকপুরের প্রতিবেশী দিলীপ দাশগুপ্তর বড়ো ছেলে। ভেল্টুর বোন রূপার বিয়ে হয়েছে আগরতলার অফিস লেনের জয়ন্ত গুপ্তর সঙ্গে। ভেল্টু একবার আগরতলাতেও এসেছে। সে খুব পরোপকারী। আমি নববারাকপুর থেকে আগরতলায় এলে সে সবসময় এয়ারপোর্টে গিয়ে আমাকে তুলে দেয়।

ভূদেব হালদার ঃ কলকাতার আমার কিডনীর ডাক্তার ডঃ দিলীপ কুমার পাহাড়ীর চেম্বারের কর্মী। আমি ডঃ পাহাড়ীকে দেখাতে গেলে তিনি আমাকে খুব সাহায্য করে থাকেন।

মহারাণী বিভূকুমারী দেবী ঃ ত্রিপুরার বর্তমান মহারাণী। মহারাজা কিরীট বিক্রমের মহিষী। তিনি ত্রিপুরার প্রাক্তন ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী। মহারাণী তাঁর দরবারকক্ষে আলাপচারিতায় সাক্ষাৎকারীদের প্রায় নন্দ্রজালিকভাবে প্রভাবিত করে রাখেন। ইংরেজী-হিন্দী-বাঙলা সমানে বলে চলেন তিনি। তাঁর পাঁচমিশালী বাঙলা শুনতে খুব ভালো লাগে। মহারাণী বিভূকুমারী খুব স্পষ্টবাদিনী। তিনি মুখের ওপর অপ্রিয় সত্য কথা বলে থাকেন। ত্রিপুরায় অবস্থানের সময় তিনি গ্রাম-পাহাড়ের দুর্গম স্থান পরিভ্রমণ করে সাধারণ উপজাতি-বাঙালীদের অবস্থা সরেজমিনে নিরীক্ষণ করে থাকেন। মহারাণী তাঁর শ্বশুর কুলের রাজধানী আগরতলা শহরকে নিজের পরিকল্পনা মাফিক আধুনিকভাবে গড়ে তোলার ইচ্ছা ব্যক্ত করে থাকেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। ত্রিপুরার শেষ রাণী হওয়ায় তিনি রাজবাড়ির এমন অনেক কিছু জানেন, যা এখন রেকর্ড করে না রাখলে বিস্মৃতির অন্তরালে ডুবে যাবে। মহারাজ কিরীট বিক্রম রাজবাড়ির সমস্ত বৈষয়িক দিকগুলো মহারাণীর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং খুব

নিষ্ঠার সঙ্গে মহারাণী তা পালন করে থাকেন। মহারাণী পরোপকারী বটে। মহারাণী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও জানেন বেশ পারঙ্গমতার সঙ্গে। রাজপ্রাসাদে তাঁর দরবার কক্ষে এসে রাজপরিবারের মেয়েরা তাঁর কাছ থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে যান। রাজবাড়িতে রাজআমলের কবিরাজী ওষুধ আছে। সে ওষুধও তিনি ব্যবহার করতে জানেন এবং রোগীদের দিয়েও থাকেন।

মহিম কর্ণেল : কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর (দেববর্মা)। তাঁকে সকলে মহিম কর্ণেল বলে জানে। তাঁর নামে আগরতলার কর্ণেল বাড়ির সামনের চৌমুহনীকে বলা হয় কর্ণেল চৌমুহনী। তাঁর পিতার নাম। মহিম কর্ণেল লেখাপড়া করেছিলেন কলকাতায়। এবং ত্রিপুরার রাজবাড়ির সূত্রে তাঁর সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর সহপাঠী এবং শিল্পী গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও তাঁর বিরল সাক্ষাৎকার ঘটেছিলো। বিদ্যাসাগর মশায় মহিমের গলায় সোনার লকেটে বাঙলা ভাষায় লেখা দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'ইহাতে যে বাঙলা ভাষার ছাপ। তবে বাঙালা আমার রাজভাষা?' মহিম কর্ণেল ত্রিপুরার রাজপরিবারের লোক ছিলেন না, কিন্তু ত্রিপুরার রাজ দরবারের বিশেষ প্রভাবশালী লোক ছিলেন। ত্রিপুরার রাজদরবারের বহু দৌত্যকার্য করেছেন ইংরেজদের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরায় এলে ত্রিপুরার রাজারা অনেক সময় কবিকে মহিম কর্ণেলের বাড়িতে রাখতেন। ওই বাড়িতে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথের একদিন উঠতে বেলা হয়ে যায়। তখন কর্ণেল বাড়ির এক মহিলা কবিকে জাগাতে গেলে তিনি খুব লজ্জা পেয়ে যান এবং জানা যায় যে ওই প্রিয়দর্শিনী মহিলাকে দেখে তিনি তার বিখ্যাত গান : 'রজনী পোহাতে জাগালে না কেন বেলা হলো মরি লাজে।' কর্ণেল মহিম ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে রাজানুগ্রহে সুদূর আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পুত্র সোমেন্দ্র চন্দ্রকে পড়তে পাঠান। সোমেন ঠাকুর সেখান থেকে এম. এ পাশ করে এসে রাজদরবারের শিক্ষা বিভাগে চাকুরী নেন।

মোহন চৌধুরী : মোহন চৌধুরী হলো বিপুলকান্তি করের ছদ্মনাম। মোহনবাবু ছিলেন সিলেট জেলার এক সামন্ত পরিবারের লোক। তাঁর পিতা ঘোড়ায় চড়ে প্রজাদের কাছে খাজনা আদায় করতে যেতেন। ম্যাট্রিকুলেশন পাশের পরে তিনি সন্ত্রাসবাদীদের কাজের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হয়ে যান আসাম অঞ্চলে। সেখানে তিনি দুর্ধর্ষ 'মেল-রেল' লুণ্ঠনে অংশ নেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর আগেই তিনি ভারতীয় আর্মিতে যোগ দেন এবং যত দূর জানা যায় তিনি সেখানে প্যারাট্রুপারেব ট্রেনিঙ নেন। ১৯৪৫ সালের নৌ বিদ্রোহের সময় তিনি তাঁর কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে আর্মি থেকে পালিয়ে বোম্বে শহরে এসে সি. পি. আই পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে যান। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন তাঁকে পার্টির আন্ডার গ্রাউন্ডের আর্মসেব দায়িত্বের কাজে যুক্ত করেন। তিনি তেলেঙ্গানা ও উড়িষ্যায় সি. পি. আই-এর সশস্ত্র বিপ্লবে অসম সাহসিকতার সঙ্গে অংশ নেন। তেলেঙ্গানাতে তাঁকে কমরেড সুন্দরাইয়ার নির্দেশে কাজ করতে হতো। সম্ভবত ১৯৫০ সালে তিনি সি. পি. আই পার্টির নির্দেশে ত্রিপুরায় চলে আসেন। যতদূর জানা যায় কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী, রঞ্জন রায় ও মোহন চৌধুরী কিছু আগে পরে ত্রিপুরায় আসেন। ত্রিপুরায় এসে মোহনবাবু শান্তিসেনার কাজকর্মের তদারকি করতে থাকেন এবং একসময় তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টির শান্তিসেনার সেক্রেটারী জেনারেল হয়ে যান। ত্রিপুরায় আসার পর থেকেই তিনি দশরথ-সুধন্বা, হেমন্ত-অঘোব এই চতুষ্টয় কমিউনিস্ট নেতার একান্ত বিশ্বস্ত কর্মী হিসেবে ট্রাইবেল বেল্টে কাজ করতে থাকেন। একসময় একান্ত আস্থাভাজন হয় কমরেড দশরথ দেবের ডানহাত হিসেবে কাজ করে যান। ত্রিপুরার জঙ্গী কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের মূলে কমরেড মোহন চৌধুরীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। চীনাযুদ্ধের সময় সি. পি. আই পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা হলে তিনি ত্রিপুবার অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে হাজারীবাগের জেলে যান। ১৯৬৪তে কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজন হলে তিনি মূল পার্টি সি. পি. আই-এ থেকে যান এবং জাতিয় পরিষদের সদস্য হয়ে তিনি সি. পি. আই-এর সর্বভারতীয় শান্তিসেনা (P.S.C)'র সেক্রেটারী জেনারেল হয়ে সারা ভারতে কাজ করতে থাকেন। ওই সময় তিনি ১৯৬৬ সনে সি. পি. আই.-এর হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং ত্রিপুরার ককবরক ভাষার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে ভাষাতত্ত্বের ছাত্র হিসেবে আমার সাহায্য চান। আমি তখন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের বিখ্যাত অধ্যাপক ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তাঁকে নিয়ে যাই এবং ডঃ চ্যাটার্জীর আমহার্স্ট স্ট্রীটের Institute of Languages and Applied Linguistics-এর ঘরে বসেই ত্রিপুরার ককবরক ভাষার বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে। পরে বীরচন্দ্র দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা, আতিকুল ইসলাম, ত্রিপুরচন্দ্র সেন, বংশী ঠাকুর, মহারাজকুমারী কমলপ্রভা প্রমুখকে নিয়ে আগরতলায় 'ককবরক উন্নয়ন পরিষদ' গড়ে উঠলে মোহনবাবু ওই সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে আমার ভাষাতত্ত্ব বিভাগের বন্ধু শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ও আমাকে ডঃ চ্যাটার্জীর নির্দেশক্রমে ১৯৬৭ সালের জুনে ত্রিপুরায় নিয়ে আসেন। সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মা তখন ত্রিপুরার ককবরক ভাষার ৮টি উপভাষাভাষী এলাকায় আমাদের ভাষা ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে দেন। মোহন চৌধুরীও এইসব ভাষা ক্যাম্পে উপস্থিত থেকে আমাদের কাজে সাহায্য করতেন। ককবরক ভাষার প্রতি তাঁর এক অদ্ভুত ভালোবাসা ছিলো। ককবরকের লিপি বিতর্ক নিয়েও তিনি একখানা মূল্যবান বই লিখে গেছেন। মোহন চৌধুরী বিয়ে করেন সুতারমোড়ার এক উপজাতি পরিবারে। তাঁর শ্বশুর সূর্যকুমার দেববর্মাও ছিলেন একজন উচ্চমানের কমিউনিস্ট কর্মী এবং কমিউনিস্ট নেতা সুধন্বা

দেববর্মার আপন জ্যাঠতুতো দাদা। মোহন চৌধুরীর স্ত্রীর নাম মঞ্জরী দেববর্মা (চৌধুরী)। বিশালগড়-চড়িলাম এলাকায় তিনি মোহন কমরেড হিসেবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি সাব্রুম-বিশালগড় থেকে সি. পি. আই-এর প্রার্থী হিসেবে ত্রিপুরা বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনি সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিভ্রমণে গিয়ে সে দেশের উপজাতি এলাকার ভাষাঞ্চলে যান এবং ওইসব ভাষার বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিতরূপে উত্তরণ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাঁর সেই অভিজ্ঞতা ত্রিপুরার ককবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণের কাজে লাগান। মোহন চৌধুরী তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যাকে উপজাতি পরিবারে বিয়ে দিয়েছেন।

মনোরঞ্জন দেববর্মা ঃ মনোরঞ্জন দেববর্মার বাড়ি সুতারমোড়ায়। তিনি প্রথম দিকে বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া স্কুলে পড়াশুনো করেছিলেন। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধাবী ছাত্র মনোরঞ্জনবাবু ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার পাশ করেন। অকালমৃত্যুর আগে তিনি ত্রিপুরা সরকারের পি. ডব্লিউ. ডি বিভাগে সুপারেনটেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তাঁর একপুত্র ও দুই কন্যা — তিনজনেই ইঞ্জিনীয়ার এবং দারুণ মেধাবী তারা। মনোরঞ্জনবাবু বিয়ে করেছিলেন আগরতলায় ত্রিপুরার ঐতিহাসিক রাজা নক্ষত্র রায়ের বংশধর। ত্রিপুরা পুলিশের প্রাক্তন ডি. আই. জি গোবিন্দ রায়ের মেয়ে প্রীতি দেববর্মাকে। প্রীতি দেববর্মা এখন শিশুবিহার স্কুলের শিক্ষিকা। সম্পর্কে সি. পি. আই (এম) নেতা ও বিখ্যাত ককবরক লেখক সুধন্বা দেববর্মা মনোরঞ্জনবাবুর আপন মামা। মনোরঞ্জনবাবু যখন ১৯৬৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তেন। তখন কমরেড মোহন চৌধুরী তাঁকে ভাষাবিদ ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে নিয়ে আসতেন। মনোরঞ্জনবাবু ডঃ চ্যাটার্জী ও আমাদেরকে ককবরক ভাষার তথ্য সরবরাহ করতেন। ডঃ চ্যাটার্জীর বাড়িতেই এই মেধাবী উপজাতি ইঞ্জিনীয়ারকে প্রথমে দেখি।

মঙ্গল ঠাকুর ঃ ত্রিপুরার কসবা কালীবাড়ি সন্নিহিত অঞ্চলে দু'আড়াইশ বছর আগে পাঁচটি বর্ধিষ্ণু উপজাতি জনপদ ছিলো। ককবরকে 'কচ' মানে টুকুরো এবং 'বা' অর্থ পাঁচ। 'কচবা'র অর্থ হলো পাঁচ টুকুরো অর্থাৎ পাঁচ টুকুরো গ্রাম। কলই উপজাতি এলাকায় ককবরক প্রবাদে আছে কোথাও যদি সুন্দরী রমণী না পাও তবে কচবায় যেয়ো। অর্থাৎ বর্ধিষ্ণু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওই উপজাতীয় পাঁচটি জনপদে সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যেতো। জনশ্রুতি আছে কচবার উপজাতীয় লোকেরা এক মুসলমান ফকিরকে অপমান করলে ওই ফকির বাঘের রূপ ধবে ওই গ্রামগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে মানুষ খেতে শুরু করে। তখন ওই গ্রামগুলো ভেঙে যায়। ওই এলাকার এক অংশ চড়িলাম হাইস্কুলের পেছনে চড়িলাম জঙ্গলে বসবাস শুরু করে এবং ওখানে এখনো প্রভুরাম সর্দারের পাড়ার অস্তিত্ব আছে। প্রভুবাম ঠাকুরের পরিবারের একাংশ ধারিয়াথল হয়ে হেরমা বাড়ির মরছুম এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। আর মঙ্গল ঠাকুব হলেন সেই পরিবারের লোক।

মনা ঠাকুর ঃ মনা ঠাকুর (দেববর্মা) ছিলেন আমার শ্বশুর বাড়িব গ্রাম হেরমা গ্রামের পতনদার। তাঁর নামে হেরমা গ্রামের নতুন নাম হয়েছে মনাঠাকুর পাড়া। মনা ঠাকুরের পূর্বপুরুষরা প্রথমে কসবা কালীবাড়ী সন্নিহিত উপজাতি জনপদে ছিলেন। মনাঠাকুরের বাবা কিছুদিন ধারিয়াথল গ্রামেও ছিলেন। পরে মনাঠাকুর মলছুম উপজাতিদের কাছ থেকে হেরমা গ্রামটি নিয়ে নেন। হেরমা ছিলেন একজন নাম করা মরছুম সর্দার। মনাঠাকুরের পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে। দুই মেয়েকেই মনাঠাকুর অন্য উপজাতীয় গ্রাম থেকে ছেলে এনে বিয়ে দিয়ে নিজের বাড়িতেই ঘরজামাই রাখেন। আমার আপন দাদাশ্বশুর গৌরচাঁন ঠাকুরের সাক্ষাৎ ঠাকুরদা ছিলে মনাঠাকুর। আগরতলাব উপজাতীয় ঠাকুরলোক পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি গোলকচন্দ্র ঠাকুরের এক দিদির সঙ্গে পাহাড়ে মনাঠাকুরের বাবার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলেন। মনাঠাকুর তাঁর এলাকায় বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি তাঁর বিরাট পরিবার নিয়ে টিলার ওপর জুম চাষ ও সমতলে কৃষিকাজ করতেন।

মাসিমা ঃ শ্রীমতী চাঁদলক্ষ্মী দেববর্মা। হেরমা বাড়ির যোগেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মাব স্ত্রী। আমি একবছর ধরে যোগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে থেকে ককবরক অভিধান সঙ্কলের কাজ করি। তখন চাদলক্ষ্মী দেবীকে আমি মাসিমা বলে ডাকতাম। তিনি সবসময় আমার সঙ্গে ককবরক ভাষায় কথা বলতেন এবং তিনিই আমাকে ককবরক বলতে শিখিয়েছিলেন।

মৃণালকান্তি কর ঃ বিখ্যাত সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার মৃণালকান্তি কর একসময় আগরতলার 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মৃণালকান্তি কর অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। উমাকান্ত একাডেমী থেকে তিনি ইংরেজী ও অঙ্কে রেকর্ড মার্ক পেয়ে বিশেষ পদক পেয়েছিলেন। এই পদক কোনো এক মুসলমান ভদ্রলোকের নামে। বাঙলা সাহিত্যে মৃণালবাবুর অগাধ দখল। তিনি রবীন্দ্রনাথ-সুধীন্দ্র দত্ত প্রমুখের কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারেন। বাঙলা বানানের এতটুকু ভুল তাঁর কলম দিয়ে বেরুতে পারেনা। তিনি বহু জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিতের প্রবন্ধের বানান ঠিক করে দেন।

মানিক মজুমদার ঃ ত্রিপুরা সরকারের প্রাক্তন আই. এ. এস শ্রীযুক্ত মানিক মজুমদারকে আমি ত্রিপুরার সব থেকে উপজাতি বিশেষজ্ঞ বলে মনে করি। তিনি ১৯৫৬ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকারেব থাকাকালীন খুব কাছের থেকে খুব দরদ দিয়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতিদের পর্যবেক্ষণ করেন একান্ত কৌতূহল ভরে। ত্রিপুরার উপজাতিদের ভেতরকার অতি মূল্যবান খুঁটিনাটি তথ্য তাঁর কাছ থেকে জানা যায়। জিরানীয়া, বগাফা, রাজনগর, অমরপুর, ছামনু, ডম্বুরনগর, গন্ডাছড়া, বুলঙবাসা, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে সার্কেল অফিসার, বি ডি ও, এ পি ই ও (A.P.E.O), পি ই. ও (P.E.O), এস ডি ও প্রভৃতি পদে থাকাকালীন উপজাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের অনেক ঘটনার সাক্ষী তিনি। ১৯৫৬ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত

ত্রিপুরার উপজাতিদের জীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে তার ভালো ও মন্দ দিক নিয়ে এমন বাস্তব অভিজ্ঞতা মজুমদার সাহেবের আছে। যা ঠিক মতো সংগ্রহ করতে পারলে রাজআমলের পরবর্তী ত্রিপুরার উপজাতীয় জীবনের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস লেখা যায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতীয় গ্রামের সর্দারদের নাম এখনো তিনি স্মরণ করতে পারেন এবং তাঁদের সামাজিক ভূমিকার উল্লেখযোগ্য দিক তাঁর জানা। উপজাতি মেয়েদের কাছে তিনি ছিলেন খুব দরদী অফিসার ও বিশেষ আপনজন। উপজাতি মেয়েরা তাঁর অফিসে ঢুকে বিশ্রাম করে জল-টল খেয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে আয়না চিরুনি নিয়ে মাথা আঁচড়িয়ে তারপর বাজারে যেতেন। আর বলতেন, 'মজুমদার তুমি তো আমাদের ঘিন করোনা, তাই তোমার কাছে আমরা বাড়ির লোকের মতো আসি।' মানিক মজুমদার উপজাতিদের সঙ্গে থেকে থেকে তাদের বিশেষ আস্থাভাজন হয়েছিলেন। কমলপুরে সার্কেল অফিসার থাকাকালীন একবার বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়ার এলুইন সাহেবকে নিয়ে গন্ডাছড়ায় উপজাতিদের কলোনী দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এলুইন সাহেব যে ক'বার ত্রিপুরায় এসেছেন, সে ক'বারই মানিক মজুমদারের ডাক পড়েছে তাঁকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে। এলুইন সাহেব উপজাতি জীবনের বহু অভিজ্ঞতার কথা বলতেন তাঁকে। মানিকবাবু যখন অমরপুরের এস ডি ও ছিলেন তখন অভিনেতা ও মুদ্রা বিশেষজ্ঞ বসন্ত চৌধুরী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং ডম্বুর থেকে এক রিয়াঙ উপজাতির কাছ থেকে একটা বাঘের বাচ্চা কিনে আনেন। মানিকবাবু ১৯৮৫ সালে আই. এ. এস. হবার পরে ডাইরেক্টর অফ সিডিউলড কাস্ট, লেবার কমিশনার, ডাইরেক্টর অফ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। মানিকবাবুর বাঙলাদেশে বাড়ি ছিলো কুমিল্লা শহরে। তিনি ছিলেন কুমিল্লা জেলা স্কুলের ছাত্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ পড়ার সময় থাকতেন ঢাকা হলে। ওই সময় বাঙলাদেশের তাবড় তাবড় ছাত্র নেতাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ওইসব ছাত্র নেতা বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মানিক মজুমদারের বর্তমান বাড়ি কৃষ্ণনগরে 'ওয়েস্ট এ্যন্ড মেসার' অফিসের পেছনে প্রতাপ রায় রোডে।

মনোমোহন দেববর্মা ঃ মনোমোহন দেববর্মার বাড়ি হেরমায়। আগে বাড়ি ছিলো দক্ষিণ হেরমায়। তিনি সম্পর্কে আমার বড়ো ভায়রাভাই।

ডঃ মহাদেব চক্রবর্তী ঃ ডঃ মহাদেব চক্রবর্তী ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মহাত্মা গান্ধী অধ্যাপক। তিনি ত্রিপুরার রাজতন্ত্র সম্পর্কিত বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টদের রিপোর্ট সম্পাদনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইতিহাসবিদ হিসেবে তাঁর নাম আছে। ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের খুঁটিনাটি দিক তিনি জানেন। ত্রিপুরার উপজাতিদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক নিয়েও তিনি গবেষণা করেন। মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত।

মন্দোদরী দেববর্মা ঃ মন্দোদরী দেববর্মার বাড়ি লালসিংমোড়ার বাথানমোড়া গ্রামে। তিনি ওই এলাকার বিশিষ্ট উপজাতি নেতা লাবণ্য দেববর্মার দৌহিত্রী। তিনি সি. পি. আই পার্টির নেত্রী এবং লালসিংমোড়া গাঁওসভার সি. পি. আই পার্টির চেয়ারম্যান।

মেজদা ঃ পৃথ্বীরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরী আমার আপন মেজদা। তিনি আমার থেকে চৌদ্দ বছরের বড়ো ও আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। বড়দা যৌথ সংসার থেকে আলাদা হয়ে গেলে মেজদা আমার সেজদা শক্তিরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরী ও আমাকে নিয়ে থাকেন এবং আমাদের দু'ভাইকে বড়ো করেন। মেজদার অনুপ্রেরণা ও নিরত আর্থিক সাহায্য না পেলে আমার উচ্চশিক্ষা হতো না। তাঁকে আমি পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করি। মেজদা কর্মজীবনে পোস্টাল বিভাগে চাকুরী করতেন। বর্তমানে অবসর নিয়ে সেজদার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সর্বক্ষণ দেখাশুনো করেন।

মান্না মাসি ঃ বন্ধুবর স্বপন বসুর বাড়ির কাজের লোক।

মীনাক্ষী সেন ঃ মীনাক্ষী সেন আগরতলার মহিলা কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা। বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের মহিলা কমিশনের সেক্রেটারী। মীনাক্ষী সেন মূলত লেখিকা। তাঁর লেখা 'জেলের ভেতর জেল' দু'খন্ডে প্রকাশিত হবার পর সাহিত্যজগতে আলোড়ন পড়ে যায়। আসলে মীনাক্ষী একসময় রাজনীতি করার সুবাদে দীর্ঘদিন ধরে জেলে ছিলেন ভীষণ নিপীড়নের মধ্যে। লালবাজারে তার ওপর নির্মম অত্যাচার করা হয়। কাছের দেখে দেখা জেলের বন্দীদের অত্যাচারের খুঁটিনাটি তথ্য অত্যন্ত মর্মন্তুদভাবে 'জেলের ভেতর জেল' এ প্রতিফলিত হয়েছে। তার এই বই পড়তে পড়তে টলস্টয়ের 'রেজারেকশন' উপন্যাসে বিধৃত জেলখানার দৃশ্য মনে পড়ে যায়। মীনাক্ষী সেন রাজনীতি নির্ভর কিছু মূল্যবান ছোটগল্প দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আমাদের কবি বন্ধু সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ে স্ত্রী।

মিঠু ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রফেসর ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদের ছোট শ্যালিকা। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ পাশ করেছে মিঠু। মিঠুদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের বারাসতের কাজী পাড়ায়। বারাসতে মিঠুদের বিরাট বিরাট আমবাগান আছে।

মধু মগ ঃ মধু মগের বাড়ি মনুবঙ্কুলের দো-অঙ-মগ পাড়ায়। তাঁর বাবার নাম ছদু মগ (ছদু মহাজন)। সম্পর্কে তিনি কংগ্রেস নেতা অঞ্জু মগের আত্মীয়। মধু খুব মর্মান্তিকভাবে মারা যান। একদিন খুব ভোরে মনুবঙ্কুল বাজারে বুদ্ধ দেবের মন্দিরে ভাত নিয়ে যাবার সম তাঁর বাড়ির সামনের নদী পার হতে গিয়ে বন্যার জলের তোড়ে ভেসে যান। এবং বেশ ক'মাইল দূরে নদীর পাড়ে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। মধু মগ মাস্টার ছিলেন। তাঁর কৃতী ছেলে থইঅ মগ একজন পরমাণু বিজ্ঞানী।

তিনি একসময় ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের রিসার্চ স্কলার ছিলেন।

মণিলালা চ্যাটার্জী : মণিলাল চ্যাটার্জীর বাড়ি আগরতলার কৃষ্ণনগরের ছাত্রসঙ্ঘ ক্লাবের কাছে। তিনি একজন ইংরেজীর জনপ্রিয় শিক্ষক। এককালে গায়ক হিসেবে মণিবাবুর নাম ছিলো। বিভিন্ন জলসায় একসময় তিনি গান গাইতেন।

মনোজ তলাপাত্র : আগরতলার মটরস্ট্যান্ডে মনোজ তলাপাত্রের আমেরিকান হোমিও হল নামে একটা ওষুধের দোকান আছে। তিনি নিজেও রোগী দেখে ওষুধ দিয়ে থাকেন।

মেঘনাদ দেববর্মা : ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী, গাড়ীর ড্রাইভার।

মানিক ধর : মানিকবাবু ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ট্রোলার সেকশনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মী। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী কর্মচারী ইউনিয়নের একজন কর্মকর্তা। কিন্তু আসলে মানিক ধর একজন মনস্তাত্ত্বিক লেখক। 'ডেইলী দেশের কথা'র শিশু বিভাগে 'বিল্টু সিরিজ' এ তিনি শিশু ও তরুণদের জন্যে নিয়মিতভাবে মনস্তাত্ত্বিক গল্প লিখে থাকেন। প্রতি বছর পুজো সংখ্যায় 'শিশু মহল' এ তাঁর রোমাঞ্চকর রহস্য উপন্যাস বেরিয়ে থাকে। আসলে শিশুদের বিজ্ঞানমনস্ক পাঠক করে তোলাই মানিকবাবুর মনের ইচ্ছে। ভারতবর্ষের উপজাতিদের জীবন নিয়েও তিনি কলম ধরেছেন। ত্রিপুরার উপজাতিদের টানাপোড়েন জীবন নিয়েও তিনি কলম ধরেছেন।

মলিন দেবনাথ : মলিন দেবনাথের বাড়ি দক্ষিণ চড়িলামে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ চড়িলামের রেশনশপের ডিলার। কংগ্রেসের একজন সুসংগঠক ও নেতা হিসেবে চড়িলাম এলাকায় তাঁর একসময় নাম ছিলো। মলিনবাবু দক্ষিশ চড়িলামের একজন প্রচিন ব্যক্তি। এবং কলোনী গঠনের বিভিন্ন জটিল পর্যায়ে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন।

মানস বটব্যাল : মানস বটব্যাল একজন লেখক। গৌহাটীতে তাঁর ওষুধের ব্যবসা আছে। 'উত্তর-পূর্বাঞ্চল সাহিত্য সম্মেলন' এর সঙ্গে জড়িত।

মনু : মনোরঞ্জন দেবনাথ। বাড়ি উত্তর চড়িলাম। পিতার নাম শ্রীযুক্ত প্রভাত দেবনাথ। মনু সি. পি. আই পার্টির একজন মিলিট্যান্ট যুব কর্মী।

মনীন্দ্র বাবু : মনীন্দ্র দেববর্মা : বাড়ি বিশ্রামগঞ্জের পদ্মনগরের ভগবান ঠাকুর পাড়ায়। তাঁর স্ত্রী দুর্লভী দেববর্মা সি. পি. আই (এম) পার্টির একজন নাম করা মহিলা কর্মী। তিনি বর্তমানে পদ্মনগর গাঁওসভার একজন উপজাতীয় মহিলা চেয়ারপার্সন।

মজিদ মিঞা : মজিদ মিঞার বাড়ি বিশ্রামগঞ্জের প্রমোদনগরে। তাঁদের আগে বাড়ি ছিলো বিশালগড়ে। পরে সেখানে উদ্বাস্তু বেড়ে যাওয়াই সেখানকার বাড়ি বিক্রি করে পাহাড়ের ভেতর চলে আসেন।

মানিক লাল দেববর্মা : মানিকলাল দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের রঙমালায়। তাঁর পিতার নাম যতীন্দ্র দেববর্মা। যতীন্দ্রবাবু কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজনের পরেও সি. পি. আইতে থেকে যান কমরেড অঘোর দেববর্মার সহযোগী হিসেবে। কিন্তু তাঁর পুত্র মানিকলাল সি. পি. এম-এর নামকরা কর্মী। রঙমালা গাঁওসভার সি. পি. এম-এর চেয়ারম্যান বর্তমানে মানিকবাবু।

মামা রাধাকৃষ্ণ : রাধাকৃষ্ণ দেববর্মা। বাড়ি চড়িলামের কাছে রামনগরের গ্রামের তুইদুবাড়ি। সম্পর্কে আমার মামা শ্বশুর।

ডাঃ মঙ্গল দেববর্মা : ডঃ মঙ্গল দেববর্মার গ্রামের বাড়ি হলো চড়িলামের বাঁশতলা গাঁওসভার রামদাসপাড়ায়। তাঁর পিতার নাম মনোমোহন দেববর্মা। মনোমোহনবাবু চড়িলাম-বিশ্রামগঞ্জ এলাকার একজন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি। ডাঃ মঙ্গল দেববর্মার বিশ্রামগঞ্জ বাজারে আগে চাউলের মিল ছিলো এবং বিশ্রামগঞ্জ বাজারেব পূর্বে পুলিশ ফাঁড়ি ছিলো তাঁদের ভাড়া দেয়া ঘরে। ডাঃ দেববর্মা চড়িলামের উপজাতি এলাকার প্রথম পাশ করা এম. বি. বি. এস ডাক্তার। তিনি একসময় ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের চীফ মেডিকেল অফিসার ছিলেন। একসময় আগরতলার ভি. এম হাসপাতালে আর. এম. ও ছিলেন তিনি। বর্তমানে তিনি 'সঞ্জীবনী' নামে একটা নার্সিং হোম করেছেন আগরতলার বনমালীপুর লালবাহাদুর ক্লাবের পাশে। ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে ডঃ মঙ্গল দেববর্মাই সর্বপ্রথম একটা নার্সিং হোমের মালিক।

মনোমোহন সাহা : মনোমোহন সাহার বাড়ি দক্ষিণ চড়িলামের কুরের পাড়ে। তাঁর চড়িলামের পুরনো বাজারে একটা বড়ো চায়ের দোকান ছিলো। উপজাতিরা তাঁকে 'সেঙ্কারী' বলে ডাকতো তাঁর বাহারী গোঁফের জন্যে। ককবরক ভাষায় গোঁফকে বলে 'সেঙ্কারি'। এই নামেই তার ছদ্মভাবে তাঁকে ডাকতো। চড়িলামের নট্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা মনোমোহন বাবুর কাছে বিপদে পড়ে ঢোল-ঢাক বন্দক রাখতো।

মুরারি মাস্টার : মুরারি দেববর্মা। মুরারিবাবুর বাড়ি চড়িলামের চণ্ডীঠাকুর পাড়ায়। তিনি বিখ্যাত চণ্ডীঠাকুরের ছোট মেয়ে স্বর্ণলতার ছেলে। বর্তমানে মাস্টারি থেকে অবসর নিয়ে গ্রামের বাড়িতেই থাকেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক হিসেবে বাঙালী-উপজাতি সমাজে তাঁর খ্যাতি আছে।

মরণ ভৌমিক : মরণ ভৌমিকের বাড়ি উত্তর চড়িলামের ফকিরামোড়ায়। মরণ ভৌমিকের সঙ্গে বেআইনী হস্তান্তরিত জমি নিয়ে চণ্ডীঠাকুরপাড়ার লোকেদের সঙ্গে মনোমালিন্য ছিলো। ১৯৮৭ সালের প্রজাতন্ত্রের আগের রাত্রে উগ্রপন্থীরা তাঁর পরিবারের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা পাঁচজনকেই নৃশংসভাবে হত্যা করে চলে যায়।

মানিক ঘোষ : মানিক ঘোষ ছিলেন সি. পি. আই (এম) পার্টির বিশালগড় লোকাল কমিটির সেক্রেটারী। চড়িলামের

ট্রাইবেল এলাকায় গিয়ে তিনি মিটিং করতেন এবং বেশ গুছিয়ে বক্তৃতা করতে পারতেন।

মানস দেববর্মা : মানস দেববর্মা একসময় আগরতলার মহারাজ বীরবিক্রম কলেজের ফিজিওলজির অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি ত্রিপুরা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হন। বর্তমানে তিনি ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য। এমন সম্মানিত পদ ত্রিপুরা থেকে এর আগে আর কেউ অলঙ্কৃত করতে পারেননি। মানস দেববর্মা সম্পর্কে বিখ্যাত আইনজীবী বীরচন্দ্র দেববর্মণের ভাগ্নে। বিখ্যাত আইনজীবী শুভাশিস তলাপাত্র মানস দেববর্মার জামাই। মানস দেববর্মা ত্রিপুরার একজন নাম করা ছোট গল্পকার। তাঁর সঙ্গে আমি ষাটের দশকের শেষপাদে কলকাতার মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর রাজপ্রাসাদের পাশে মহারাণী স্বর্ণময়ী হোস্টেলে ছিলাম। সেখান থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। তারপর ককবরক গবেষণার কাজে ত্রিপুরায় এসে সেই পরিচয় আরো নিবিড় হয়। মানস এখন আমার বন্ধু ও আত্মীয়।

মিহির দত্ত : মিহির দত্ত আগরতলা কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী। একসময় তিনি এডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার সহযোগী ছিলেন। আগরতলায় এসে তিনি শিক্ষা বিস্তারে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রাচ্যভারতী স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে তিনি আইন ব্যবসায় শুরু করেন। মিহির দত্ত একজন পুরোনো কমিউনিস্ট। কলকাতায় থাকাকালীন সেখানেও তিনি কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। ত্রিপুরায় ১৯৫২ সালের লোকসভার নির্বাচনে প্রকাশ্যে সি. পি. আই-এর কাজকর্ম করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই নির্বাচনে কমরেড দশরথ দেব ঐতিহাসিকভাবে জয়লাভ করেন। পার্টি বিভাজনের পর তিনি সি. পি. আই -এ থেকে যান। বর্তমানে তিনি সি. পি. আই-এর সদর বিভাগের সেক্রেটারী।

মঞ্জু দেববর্মা : মঞ্জু দেববর্মা এডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার ভাগ্নী। এবং বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়ির জায়গাতেই তিনি দালানবাড়ি করেছেন। তাঁর স্বামী বাঙালী। মঞ্জু দেববর্মা অন্যদিকে উপজাতি যুব সমিতির প্রাক্তন নেতা বুদ্ধ দেববর্মার আপন শালী। তিনি ত্রিপুরা সরকারের আই. সি এ. টি বিভাগের একজন কর্মী। তাঁর মামা বীরচন্দ্র দেববর্মা অসুস্থ হলে তিনি তাঁকে খুব সেবা শুশ্রূষা করেন। বীরচন্দ্র দেববর্মার শেষ জীবনের অনেক ঘটনার সাক্ষী তিনি।

মণিবাবু : মণিচন্দ্র দেববর্মা। এডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার বড়ো ভাই। তিনি প্রথম জীবনে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশে প্রায় তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি ছিলেন আগরতলার ঠাকুর বোর্ডিঙের ছাত্র। সেখানে তিনি ছাত্রদের নিয়ে থিয়েটার করার কাজে নেতৃত্ব দিতেন। কর্মজীবনে তিনি আগরতলার কোর্টের পেশকার ছিলেন। মণিবাবু তাঁর চার ভাইয়ের মধ্যে সব থেকে বৈষয়িক ছিলেন। তিনি তাঁর ছোট ভাই বীরচন্দ্র দেববর্মার সহযোগিতায় নিজের বাড়িতে বেশ কয়েকখানা দালান বাড়ি করেন। মণিবাবু ভালো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। রাজ আমলের আগরতলার অনেক খবর রাখতেন তিনি। রাজবাড়ির বহু খবর আমি তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম তিনি মহারাজ বীরবিক্রমের বিয়েতে বরযাত্রী হিসেবে গিয়ে যে সমস্ত রাজকীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা সবিস্তারে আমাকে বলেছিলেন। তিনি সত্যিই জ্ঞানী ছিলেন। সৌম্যদর্শনের এই ব্যক্তি বীরচন্দ্র দেববর্মার তিন-চার বছর আগে মারা যান।

মানিক চক্রবর্তী : আগরতলার কৃষ্ণনগরের সুপুরি বাগানে বাড়ি। মানিকবাবুরা রাজআমলের লোক। তাঁর একটা জনপ্রিয় মুদিখানার দোকান আছে। তাঁর স্কুলপড়ুয়া দু'ছেলে দাবা খেলায় খুব নাম করেছে এবং সর্বভারতীয় দাবা খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। মানিকবাবু তাঁর পাড়ায় গার্জিয়ান স্বরূপ। এই পাড়াটি উপজাতি-বাঙালীর এক মিশ্রপাড়া। এই পাড়ায় উপজাতি-বাঙালীর মধ্যে মৈত্রীর সেতু হিসেবে কাজ করে থাকেন মানিক চক্রবর্তী।

মিসেস চক্রবর্তী : অনুরূপা মুখার্জী (দেববর্মা)'র ত্রিপুরা আদিবাসী মহিলা সমিতির দীর্ঘদিনের দক্ষ কর্মী।

মিসেস মজুমদার : অনুরূপা মুখার্জী (দেববর্মা)'র ত্রিপুরা আদিবাসী মহিলা সমিতির একজন নিরলস কর্মী।

মধুসূদন : মধুসূদন দেববর্মা। বাড়ি আমার শ্বশুর বাড়ি হেরমায়। তার বাবার নাম সত্যমণি দেববর্মা। মধুসূদন একজন ককবরক মাস্টার। সম্পর্কে আমার বড়শালীর ছেলে। তার ডাক নাম দুয়া।

মণিলাল ভট্টাচার্য : মণিবাবু ত্রিপুরা সরকারের এনিম্যাল হাসবেন্ডারী বিভাগের একজন অফিসার।

মানস মজুমদার : ডঃ মানস মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে আসেন। এবং বাঙলা বিভাগের মডারেশ। এবং পি. এইচ. ডি সেমিনারে তাঁকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আনা হয়। তিনি বাঙলা সাহিত্যের একজন কৃতী অধ্যাপক।

মৌসুমী : শ্রীমতী মৌসুমী বসু। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক (লেকচারার) ডঃ সুদীপ বসুর স্ত্রী।

মধুসূদন শর্মা : ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসের কুক।

মণিকা নন্দী : আগরতলা মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা।

মানিক দেব : অধ্যাপক মানিক দেব মহারাজ বীরবিক্রম কলেজের সান্ধ্য বিভাগের বাঙলার অধ্যাপক। অধ্যাপনার বাইরে তাঁর সব থেকে বড়ো পরিচয় তিনি একজন সুদক্ষ শিক্ষক নেতা।

মজিদ : ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের পিওন। তার বাড়ি আগরতলার উপকণ্ঠে ভাবী অভয়নগরে।

মৃণালবাবু : মৃণাল। মৃণালবাবু ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিঙের একজন দক্ষ অফিসার। বামপন্থী

কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তিনি।

মণি দেববর্মা ঃ মণি দেববর্মার বাড়ি সিধাই থানার বড়কাঁঠাল গ্রামে। সম্পর্কে তিনি আমার পিসশ্বশুর। আমার পিসিশাশুড়ী নন্দরাণীকে বিয়ে করেছেন তিনি। তিনি একজন গ্র্যাজুয়েট এবং স্কুলের শিক্ষক। তাঁর একটি বিশাল রবারের বাগান আছে এবং তা থেকে প্রচুর আয় হয় তাঁর।

মাতলী ঃ মাতলী দেববর্মা। বাপের বাড়ি হেরমায়। শিক্ষক গয়াপান্ডব দেববর্মার মেয়ে। বিয়ে হয়েছে পাশের গ্রাম মণিরাম ঠাকুরপাড়ায়। তাঁর স্বামীর নাম শৈলেশ দেববর্মা। শৈলেশ দেববর্মা একজন সি. পি. আই কর্মী। মাতলী দেববর্মা সম্পর্কে আমার পিসিশাশুড়ী।

মনোজ দেববর্মা ঃ মনোজ দেববর্মার বাড়ি আগরতলার ঠাকুরপল্লী রোডে। তিনি আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ।

মণিময় দেববর্মা ঃ মণিময় দেববর্মার বাড়ি আগরতলার অফিসার্স কোয়ার্টার্স লেনে বিখ্যাত শিল্পী মহেন্দ্র দেববর্মার বাড়ির কাছে। মণিময় দেববর্মারা কুমিল্লার কর্তা। তাঁরা একসময় পুরোনো আগরতলায় থাকতেন। মণিময় দেববর্মা চাকুরী করতেন ত্রিপুরা সরকারের ফরেস্ট বিভাগে। এসিব পরিচয়ের বাইরে তিনি ছিলেন ত্রিপুরার পুঁথিপত্র, পুরোনো বই-পুস্তক ও পুরোনো যতসব রাজনৈতিক ও সামাজিক লেখা ও দলিলপত্রের একজন স্বনামধন্য সংগ্রহকারী। তাঁর বাড়িতে সাহিত্যজগতের এক বিরাট সংগ্রহশালা আছে। তাঁর সংগ্রহশালা থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হরিহর ভট্টাচার্য ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল্যবান কাগজপত্র কিনে নিয়ে গেছেন। মণিময়বাবু সুলেখকও ছিলেন। তিনি একসময় 'দৈনিক সংবাদে' 'ত্রিপুরার প্রজা আন্দোলনের কিছু তথ্য' এই শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে লেখালেখি পাঠক মহলে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন।

মলয় দাশগুপ্ত ঃ মলয় দাশগুপ্ত পেশায় একজন শিক্ষক এবং কলকাতার একজন নিষ্ঠাবান সি. পি. আই কর্মী। তিনি নিয়মিতভাবে সি. পি. আই-এর পশ্চিমবঙ্গের মুখপত্র 'কালান্তর' এ লিখে থাকেন। তিনি রাজনীতি নির্ভর গল্পও লেখেন। গল্পের বইও বেরিয়েছে তাঁর। আমরা মলয় দাশগুপ্তকে মলয়দা বলে ডাকি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় আমার। আমরা দু'জনে একসময় অধ্যাপক কমলেন্দু গাঙ্গুলীর ২০৮, বিবেকানন্দ রোডের বাড়িতে রাত কাটাতাম। আমি যখন উপজাতি রমণীর পাণিগ্রহণ করে কলকাতায় যাই তখন মলয়দারা কমলদার বাড়িতে আমাদেরকে দারুণভাবে অভিনন্দিত করেন এবং সেই উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। আমার স্ত্রীর দুধে আলতা রঙের কথা মলয়দা অনেককে বলে বেড়ান।

মিহির গুপ্ত ঃ মিহিরবাবু 'দৈনিক সংবাদ'এর একজন পুরোনো কর্মী।

মতিয়া চৌধুরী ঃ অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী। বাঙলাদেশের আওয়ামী লীগ পার্টির নেত্রী এবং বর্তমানে হাসিনা সরকারের মন্ত্রী। বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি আগরতলায় থাকতেন। সম্ভবত তখন তিনি বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একসময় কমরেড মোহন চৌধুরী তাঁকে নিয়ে চড়িলামের স্কুল মাঠে এক বিরাট জনসভা করেন বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে। ওই সভার সভাপতি ছিলাম আমি। মতিয়া চৌধুরী কমরেড মোহন চৌধুরীর উপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম সুতারমোড়ায় গিয়েও মিটিং করেন। সেই মিটিংয়েও আমি উপস্থিত ছিলাম। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা শোনার জন্যে হাজার হাজার লোক সমবেত হতেন।

মঞ্জরী চৌধুরী ঃ মঞ্জরী চৌধুরী (দেববর্মা)'র বাড়ি সুতারমোড়া গ্রামে। তিনি কমরেড সূর্যকুমার দেববর্মার কন্যা। বিয়ের পরের দিনই তাঁর শ্বশুরবাড়ি বাথানমোড়া গ্রামে কলেরা রোগে তাঁর স্বামী মর্মান্তিকভাবে মারা যান। পরে সি. পি. আই নেতা কমরেড মোহন চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এবং কমরেড মোহন চৌধুরীর অনিশ্চিত জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগী হন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন খুব সুখেরই ছিলো। মঞ্জরী চৌধুরী এখনো জীবিত।

মন্দিরা ঃ মন্দিরা চৌধুরী। সি. পি. আই নেতা কমরেড মোহন চৌধুরীর বড়ো মেয়ে। বিয়ে হয়েছে আগরতলার উজির বাড়িতে। তার স্বামীর নাম খোকন দেববর্মা। মন্দিরার দুই মেয়ে। বড়ো মেয়ে জেসি ক্লাস নাইনে পড়ে এবং ত্রিপুরী নৃত্যে সে খুব পটিয়সী। নাচের পারদর্শিতার জন্যে জেসি এবার কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তি পেয়েছে।

মনোরঞ্জন মজুমদার ঃ মনোরঞ্জনবাবু একজন প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক। তাঁর শিক্ষক জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে টাকারজলা-সুতারমোড়া উপজাতি এলাকায়। উপজাতি এলাকায় থেকে তিনি ভালোভাবে ককবরক ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি রবীন্দ্র পরিষদে ককবরক শেখান। মনোরঞ্জনবাবু একখানা ককবরক-বাঙলা অভিধান সংগ্রহ করেছেন এবং সেখানি প্রকাশিত হয়েছে ত্রিপুরা সরকারের ট্রাইবেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে। মনোরঞ্জনবাবু রবীন্দ্র নাথের কিছু ছোট গল্প ককবরকে অনুবাদ করেছেন। মনোরঞ্জন মজুমদার বাড়ি করেছেন গান্ধীঘাটের কাছের টাউন বড়দোয়ালীতে। তিনি উপজাতি জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের সাক্ষী।

মাদাম চিয়াঙ চিঙ ঃ দুলালী দেববর্মা। সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার স্ত্রীকে কমরেড মাও সেতুঙের স্ত্রীর মতো দেখানোয় আমি তাঁকে মাদাম চিয়াঙ চিঙ বলে ডাকতাম। দুলালী দেববর্মার গোলাপী পাপড়ির মতো রঙের সঙ্গোলিনী চেহারা

একেবারেই ছিলো চীনা চেহারার মতো।

মেঘ কর্তা : ত্রিপুরার রাজা ঈশানচন্দ্র ঠাকুরের উত্তরপুরুষ। গোলবাজারের খোলমহলের যগু কর্তাদের ধারা এসেছে মেঘ কর্তার ধারা থেকে।

মধুসূদন দেববর্মা : মধুসূদন দেববর্মার বাড়ি কৃষ্ণনগরের সুপুরি বাগানে। তার বাবার নাম নারায়ণ দেববর্মা। নারায়ণবাবু শিল্পী ছিলেন। যুবক মধুসূদন ককবরক ভাষার একজন সফল নাট্যকার এবং মঞ্চ অভিনেতা। তাঁর ত্রিপুরার উপজাতীয় রূপকথা ভিত্তিক নাটক বেথুয়াং (ছাতিম গাছ) যুব উৎসবে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে আন্তর্জাতিক যুব উৎসবের নাট্য প্রতিযোগিতায় মনোনীত হয়ে ছিলো। মধুসূদন কর্মসূত্রে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদে চাকুরী করেন।

মৌসুমী পাল : ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের কৃতী ছাত্রী। সে এম. এতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলো। 'নেট' পরীক্ষাতেও মৌসুমী সফল হয়েছে।

মনোরঞ্জন দাস : আসামের শোয়ালকুছি গ্রামের রেশম উৎপাদন সমিতির সদস্য।

মীনাক্ষী : মীনাক্ষী দেববর্মা। মীনাক্ষী ত্রিপুরা আদিবাসী মহিলা সমিতির সাবেক প্রেসিডেন্ট অনুরূপা মুখার্জী (দেববর্মা)'র বড়ো ভাইয়ের মেয়ে। তিনি বি. কম পাশ করে আগরতলার বোধজং গার্লস হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর বিয়ে হয় বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজি বিভাগের নামকরা অধ্যাপক ডঃ সরিৎ ভৌমিকের সঙ্গে। মীনাক্ষীর মা ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

মনীষ : মনীষ চৌধুরী। পিতা শ্যামল চৌধুরী। বাড়ি বেলঘরিরার এম. বি রোডে। মনীষ আমার ভাইপো শ্রমিক নেতা শ্যামল চৌধুরীর ছোট ছেলে, সম্পর্কে আমার নাতি। মনীষ বর্তমানে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র।

মঙছাসাই মগ : ত্রিপুরা স্বশাসিত উপজাতি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।

মনোমোহন রিয়াঙ : শ্রীযুক্ত মনোমোহন রিয়াঙ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেকাল্টি সেক্রেটারী। মনোমোহনবাবুর বাড়ি উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরে। বিয়ে করেছেন দক্ষিণ ত্রিপুরার বর্ধিষ্ণু রিয়াঙ উপজাতীয় গ্রাম লক্ষ্মীছায়। মনোমোহনবাবুরা একসময় দক্ষিণ ত্রিপুরার রিয়াঙ উপজাতি এলাকায় থাকতেন। তারপর রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াঙ বিদ্রোহের সময় অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তাঁর পূর্বপুরুষেরা উত্তর ত্রিপুরায় চলে যান।

মুকুল দেবরায় : শ্রীযুক্ত মুকুল দেবরায়ের বাড়ি উদয়পুরের কাকড়াবনে। তিনি সেখানকার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা।

মোহিনী রায়ছিয়ারী : আসামের কোকড়াঝাড়ের জনৈক সি. পি. আই নেতা।

মতিলাল সাহা : শ্রীযুক্ত মতিলাল সাহা ত্রিপুরার একজন প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা। তাঁর পিতার নাম শুকলাল সাহা। মতিবাবুরা বিশালগড়ের লোক। বিশালগড় থানার কাছেই তাঁদের বাড়ি। মতিলাল সাহার অন্যপরিচয় হলো তিনি চড়িলাম বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক পরিমল সাহার আপন ছোট ভাই। বিধায়ক পরিমল সাহা নিহত হলে চড়িলাম বিধানসভার উপনির্বাচনে দাদার কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে মতিলাল সাহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বামফ্রন্টের সি. পি. আই (এম) প্রার্থী ব্রজগোপাল ভৌমিক (রামু ভৌমিক)কে এক রোমহর্ষক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে পরাজিত করেন। মতিলাল সাহা ত্রিপুরার জোট সরকারের সময় মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

মালেক উকিল : বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নোয়াখালী জেলার চৌমুহনীর এম. পি।

মিজানুর রহমান চৌধুরী : বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী। চাঁদপুরের এম. পি।

মহসীন সাহেব : বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগের ট্রেজারার।

মুজিবর রহমান : বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান। তাঁর নেতৃত্বে বাঙলাদেশ স্বাধীন হয়েছিলো। বাঙলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতৃদেব তিনি। বঙ্গবন্ধুকে নিষ্ঠুরভাবে তাঁর সহযোগীরা এক মহা ষড়যন্ত্র করে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

মেজর সফিউল্লাহ : বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী।

মাহবুব আলী চাষী : বাঙলাদেশের বি এ আর ডি-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান। তাঁর অফিসেই নাকি মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিলো।

মনোরঞ্জন চৌধুরী : আগরতলা বার এসোসিয়েশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট।

মৌসুমী ভট্টাচার্য : অরুন্ধতীনগরের কাছে বাড়ি ক্যাম্পের বাজারে। আমার ছোট মেয়ে দেবযানীর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বান্ধবী।

মঙ্গললক্ষ্মী দেববর্মা : চড়িলামের কাছে রাঙামালার পুবেরমোড়া গ্রামের শিক্ষক যতীন্দ্র দেববর্মার স্ত্রী।

মনোমোহন দেববর্মা : মনোমোহন দেববর্মা ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। তিনি একসময় এম. এল. এ ও হয়েছিলেন। মনোমোহন দেববর্মা সম্ভবত ত্রিপুরার পাহাড়ের উপজাতিদের মধ্যে দ্বিতীয় বি. এ পাশ ব্যক্তি। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর খুব নাম ছিলো। ইংরেজী ভাষায় তাঁর খুব দখল ছিলো। মনো দেববর্মার বাড়ি জম্পুইজলার বাজারের কাছে

আড়িয়াকপরা পাড়ায়। আড়িয়াকপরা তাঁর ঠাকুরমা। মনোমোহন দেববর্মা বিয়ে করেছিলেন আগরতলার পদ্মপুকুরের বিখ্যাত ব্যক্তি ক্যাপ্টেন যোগেন্দ্র দেববর্মার মেয়েকে। যোগেন্দ্র দেববর্মার এক মেয়ে ডাক্তার। তিনি ডাঃ মঙ্গল দেববর্মার স্ত্রী। বি. এ পাশ করার পরে মনোমোহনবাবু ত্রিপুরা সরকারের চাকুরী নেন। কিন্তু রুল প্রিতে তাঁর চাকুরী চলে যায়। এই চাকুরী চলে যাবার মূলে নাকি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের হাত ছিলো। পরে শচীনবাবুই নাকি তাঁকে কংগ্রেসে ঢোকান এবং কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দাঁড় করিয়ে এম. এল. এ করান। পরে তিনি একসময় ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হন। কিন্তু প্রথম জীবনে তিনি সি. পি. আই পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। সেইসময় তিনি লেখালেখিও করতেন। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সুধন্বা দেববর্মা সম্পাদিত ককবরক ভাষার প্রথম সাহিত্য পত্রিকায় মনোমোহন দেববর্মা লেখা প্রকাশিত হয়। ভদ্র ও বিশেষ সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে মনোমোহন দেববর্মার খ্যাতি ছিলো। ১৯২০ সালে তিনি ক্যানসার রোগে দেহত্যাগ করেন।

মঞ্জু দাস ঃ মঞ্জু দাস আগরতলা মহারাজ বীরবিক্রম কলেজের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপিকা। মঞ্জু দাসের বাড়ি হলো জিরানীয়া ব্লক অফিসের কাছে। তাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র দাস। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। মঞ্জুর মা ককবরক ভাষী উপজাতি সম্প্রদায়ের। মঞ্জু বিয়ে করেছেন সি. পি. আই (এম) নেতা কমরেড বীরেন দত্তর পুত্র পরামর্থ দত্তকে। পরমার্থ আগরতলা কোর্টের একজন জনপ্রিয় তরুণ আইনজীবী।

মনোরঞ্জন দত্ত ঃ আগরতলার এম. বি. বি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

মনোজ রায় ঃ আগরতলার 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকার প্রভাতী কর্মী।

মানিক আচার্য ঃ 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার প্রভাতী হকার।

মুন্না ঃ অধ্যাপক কমলেন্দু গাঙ্গুলী ও বিখ্যাত মঞ্চ অভিনেত্রী উষা গাঙ্গুলীর পুত্র। তার ভালো নাম হীরকেন্দু গাঙ্গুলী।

মনীষ কর ভৌমিক ঃ আগরতলা কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী।

মণিচরণ দেববর্মা ঃ মণিচরণ দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের কাছে পুরোনো লেম্বুথল গ্রামে। তিনি পাহাড়ের একজন প্রাচিন শিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁদের বাড়িতে বাঙলাদেশের এক শিক্ষক এসে ওই এলাকার উপজাতি ছাত্রদের পড়াতেন। মণিচরণবাবুর বাবাও লেখাপড়া জানতেন। হেরমা গ্রামের শিক্ষক যোগেন্দ্র দেববর্মার আপন বড়ো ভাই হলেন মমিচরণ দেববর্মা। সম্পর্কে তিনি আমার দাদাশ্বশুর। আমার আপন দিদিশাশুড়ী শশীরাণীর আপন কাকার ছেলে তিনি।

মহেশ ঠাকুর ঃ মহেশচন্দ্র দেববর্মা। আগরতলার মধ্য বনমালীপুরের মহেশ ঠাকুর ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময়কার বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন রাজার নিজ তহবিলের চাবিদার। দসাসই চেহারার মানুষ ছিলেন মহেশ ঠাকুর। দেখবার মতো বাহারী গোঁফ ছিলো তাঁর। মেঠের মতো গলার আওয়াজে হাসতেন তিনি। সবসময় তিনি ঘি দিয়ে রান্না করে খেতেন। খেতেও পারতেন পালোয়ানের মতো। এই অতি ভোজনে তাড়াতাড়ি মারা যান তিনি। মহেশ ঠাকুরের স্ত্রীর নাম ছিলো ভুবনেশ্বরী। সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার বনমালীপুরের বর্তমান শ্বশুর বাড়িটিই মহেশ ঠাকুরের বাড়ি। এক দ্রোণ (১৬ কানি বা ১৬ বিঘা)-এর এই বাড়িতে বড়ো বড়ো পুকুর ছিলো। মহেশ ঠাকুরের একখানা ছবি আছে তাঁর উত্তরপুরুষ ভানুবিকাশ দেববর্মার কাছে। মহেশ ঠাকুর সম্পর্কে একটা প্রশ্ন। তিনি কি পাহাড়ের উপজাতীয় এলাকা থেকে এসে আগরতলার ঠাকুর পরিবারে ঘরজামাই উঠেছিলেন ? তাঁর স্ত্রীর নাম স্বর্ণময়ী। স্বর্ণময়ীর শ্বশুর বা মহেশ ঠাকুরের বাবার নাম জানা যাচ্ছে না।

মলয় ঠাকুর ঃ মলয় দেববর্মা ঃ সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার শ্বশুর নলিনী ঠাকুরের ঠাকুরদা ছিলেন আনন্দ ঠাকুর। আনন্দ ঠাকুরের এক ভাই হলেন মলয় ঠাকুর। আগরতলার উপকণ্ঠে যোগেন্দ্রনগরের কাছে মলয়নগরের নাম হয়েছে মলয় ঠাকুরের নামে।

মোহন কর্তা ঃ মোহনকিশোর দেববর্মণ। মোহন কর্তা ছিলেন মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরের পুত্র। মোহনকর্তা ছিলেন নামকরা ইঞ্জিনীয়ার (B.E)। রাজ আমলের কাজে যোগ দিয়ে গণতান্ত্রিক ত্রিপুরা সরকারে এসে অবসর নেন তিনি। মোহন কর্তার দুই ছেলে। বড়ো ছেলে মিহির দেববর্মণ রেলের বড়ো ইঞ্জিনীয়ার। ছোট ছেলেও ইঞ্জিনীয়ার। দিল্লীতে থাকেন তাঁরা। মোহন কর্তার দুই মেয়ে।

যামিনী ঠাকুর ঃ যামিনী দেববর্মা ঃ আগরতলার পুরোনো কালীবাড়ি লেনে যামিনী ঠাকুরের বাড়ি। যামিনী ঠাকুরের মেয়ে হলেন শ্রীমতী মাধুরী দেববর্মা। যামিনী ঠাকুরের পিতা গোলকচন্দ্র ঠাকুর রাজ আমলের আগরতলার একজন অতি সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। যামিনী ঠাকুরের কয়েক দ্রোণ (১৬ কানি বা বিঘায় এক দ্রোণ) জমি ছিলো। তাঁর ভিটে বাড়ি সংলগ্ন। বিরাট লেকও ছিলো একটি। এইসব জায়গায় এখন কয়েকশ' ঘরবাড়ি হয়েছে।

যোগেন্দ্র দেববর্মা ঃ যোগেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের হেরমা গ্রামে। তিনি তাঁর নিজের গ্রাম পুরোনো লেম্বুথল থেকে জামাই উঠেছিলেন হেরমায়। তাঁর শ্বশুরের নাম গিরিমণি দেববর্মা। স্ত্রীর নাম চাঁদলক্ষ্মী দেবী। যোগেন্দ্রবাবুর চার ছেলে, তিন মেয়ে। যোগেন্দ্র দেববর্মা উমাকান্ত একাডেমীতে পড়ার সময় ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৫ সালে দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় অনুষ্ঠিত জনশিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং জনশিক্ষা সমিতির প্রথম

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। যোগেন্দ্র দেববর্মা তাঁর মাতৃভাষা ককবরককে একজন অতি পারঙ্গম ব্যক্তি। ১৯৫৪ সালে সুধন্বা দেববর্মা সম্পাদিত 'কৃতাল কথমা' নামে ককবরক ভাষার এই সাহিত্য পত্রিকায় তিনি লিখতেন। তিনি 'যজ্ঞ বুড়া খুঁই কতর' নামে ককবরক ভাষায় একখানা ব্যঙ্গাত্মক নাটক লেখেন এবং এই নাটক উপজাতি গ্রামগুলোয় খুব সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে। ১৯৫৬ সালে যোগেন্দ্রবাবু ককবরক ভাষায় হোলীর গানের বই প্রকাশ করেন। তাঁর হোলীর গান হোলীর সময়ে হেরমার পাশাপাশি গ্রামগুলোতে খুব ঘটা করে গাওয়া হয়ে থাকে। আমি যোগেন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে থেকেই ককবরক শিখি এবং তাঁর পদতলে বসে ককবরক ভাষার একখানি ত্রৈভাষিক অভিধান (ককবরক-বাঙলা-ইংরেজী) সংকলন করি ১৯৬৮-৭০ সালের মধ্যকার সময়ে। অভিধানখানির এখন ছাপার কাজ চলছে। যোগেন্দ্রবাবু শিক্ষকতা করতেন। এখন অবসর নিয়ে বাড়িতে বসে হোমিওপ্যাথি চর্চা করেন এবং হেরমা বাজারে তাঁর একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের চেম্বার আছে। ত্রিপুরার পাহাড়ে এমন একজন উপজাতি পন্ডিত ব্যক্তি আর বোধ হয় নাই।

যোগেশ চন্দ্র বাগল ঃ যোগেশ চন্দ্র বাগল কলকাতার একজন অতি বিখ্যাত গবেষক-লেখক। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের লোক। এবং নীরব সি. চৌধুরীর বন্ধু ছিলেন। একসময় তিনি মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদনারও কাজের সঙ্গে যুক্তও ছিলেন। ইতিহাস নির্ভর বাঙলার নবজাগরণের ওপর বহু বই লিখে গেছেন। বঙ্কিম চন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস তিনি সম্পাদনা করেন। শেষ বয়সে তিনি আমাদের নববারাকপুরের বাড়ির কাছে বাড়ি করেন। শেষ বয়সে যোগেশবাবু একেবারেই অন্ধ হয়ে যান। আমার পরম সৌভাগ্য, আমি অন্ধের যষ্ঠির মতো তাঁকে হাত ধরে কলকাতায় বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও 'মৌচাক' এর বিশু মুখোপাধ্যায়ের মতো জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির কাছে নিয়ে যেতাম। তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' এর সহ-সভাপতি ছিলেন। তখন ওই প্রতিষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। নববারাকপুরে তিনি 'সাহিত্যিকা' নামে একটা সাহিত্যের আসর করেন। প্রতি মাসে কোনো এক বাড়িতে এই আসর বসতো।

যুগল দেববর্মা ঃ যুগল দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের ধারিয়াথল গ্রামে। তাঁর পিতার নাম কপিলমুণি দেববর্মা। যুগলবাবুদের পরিবার ধারিয়াথলের প্রাচীনতম পরিবারদের মধ্যে একটি। তাঁর পূর্বপুরুষরা দু'শ বছর আগে ওই গ্রাম পত্তন করেন। তাঁর বাবা কপিলমুণি ও জ্যাঠা মশায় লালমুনি ওই গ্রামের অন্যান্য প্রচিন লোকেরা মিলে আষাড়ের 'রথযাত্রার' প্রবর্তন করেন। সেই রথের জন্যে ধারিয়াথলে এখনো নির্দিষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তি ও আয়ের জন্যে বিরাট কাঁঠাল বাগান আছে। যুগলবাবুদের গ্রাম একসময় পরম বৈষ্ণব হয়ে যায়। মদ খাওয়া বা শূকর ও মোরগ-মুরগী পোষা বন্ধ হয়ে যায়। যুগলবাবুর নিজের পরিবারে সেই ধারা অনেকটা বজায় আছে। যুগলবাবু প্রথম দিকে কমিউনিস্ট পার্টিতে থাকলেও পরে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি গড়ে উঠলে ওই পার্টিতে যোগ দেন এবং তাঁর নিজের এলাকায় উপজাতি যুব সমিতির মূল সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু আশির জাতিদাঙ্গার পরে তিনি সি. পি. আই (এম) পার্টিতে যোগদান করেন এবং ওই পার্টির গুরুত্বপূর্ণ কর্মী হিসেবে খুব নাম করেন এবং ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সেক্রেটারীও হন। যুগলবাবু সমগ্র 'আঁদি অঞ্চল' এর একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি — কী সামাজিক, কী রাজনৈতিকভাবে। ধারিয়াথলের প্রাচীনতম প্রাইমারী বিদ্যালয়টিকে হাইস্কুল স্তরে উন্নীত করার মূলে তাঁর বিশেষ ভূমিকা আছে। দীর্ঘকাল ধরে তিনি ওই স্কুলের সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিতও আছেন।

যতীন্দ্র দেববর্মা ঃ যতীন্দ্র দেববর্মার বাড়ি হেরমা গ্রামের পাশের গ্রাম গৌরকপরা পাড়ায়। এলাকায় একজন ধনী ব্যক্তি হিসেবে তাঁর নাম আছে। একসময় এলাকার রেশনশপের ডিলার ছিলেন তিনি।

যোগেন্দ্র দেববর্মা ঃ যোগেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের কাছে চন্ডীঠাকুর পাড়ায়। তিনি চন্ডীঠাকুরের ছেলে।

যোগেন্দ্র ক্যাপ্টেন ঃ যোগেন্দ্র দেববর্মা। যোগেন্দ্র ক্যাপ্টেনের বাড়ি আগরতলার কৃষ্ণনগরের পদ্মপুকুরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মাফ্রন্টে যুদ্ধ করে খুব নাম করেছিলেন। মহারাজ বীরবিক্রম তাঁকে খুব পছন্দ করতেন এবম রাজকাযে গুরুত্বপূর্ণ পদে রেখে সবসময় নিজের সঙ্গেই রাখতেন। যোগেন্দ্র ক্যাপ্টেনের মৃত্যুর শ্রাদ্ধবাসরে স্বয়ং মহারাজ বীরবিক্রম উপস্থিত থেকে তত্ত্বাবধান করেছিলেন। যোগেন্দ্র ক্যাপ্টেনের বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা সকলেই শিক্ষিত। তাঁর বড়ো মেয়ে মলিনা দেববর্মা ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে স্কুলে এবং একই সঙ্গে আগরতলার আর্মি অফিসে চাকুরী করতেন। তিনিও বিয়ে করেছেন আর্মির একজন বাঙালী ক্যাপ্টেনকে। যোগেন্দ্র ক্যাপ্টেনের ছেলে-মেয়েরা খুবই উঁচু লম্বা এবং সুদর্শন প্রকৃতির। আগরতলার উপজাতীয় ঠাকুর পরিবারে এমন উঁচুলম্বা চেহারার লোক খুব কমই দেখা যায়।

যমুনা ঃ যমুনা দেববর্মা। আগরতলা মধ্য বনমালীপুরে বাড়ি। তিনি নলিনী ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা এবং সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার শ্যালিকা। যমুনা বিয়ে করেছেন বাঙালী পরিবারে। তাঁর স্বামীর নাম সমীরবরণ চক্রবর্তী। সমীরবাবু শ্বশুর বাড়িতেই বাড়িঘর করেছেন।

যুগল বৈদ্য ঃ যুগল বৈদ্যর বাড়ি আগরতলার প্রগতি রোডে লেবুকর্তার বাড়ির সামনে। যুগলবাবু স্কুল শিক্ষক ছিলেন। যুগলবাবু মাত্র দু'তিন মাস আগে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সি. পি. আই (এম) কর্মী। তাঁর মতো সদালাপী একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট কর্মী আমি কম দেখেছি। তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা এবং জনসংযোগের ক্ষমতা ছিলো অভূতপূর্ব। কৃষ্ণনগরের প্রতিটি পরিবারের হাঁড়ির খবর রাখতেন তিনি। তিনি প্রয়াত হলে রাজনীতি নির্বিশেষে

অনেককে কাঁদতে দেখেছি আমি।

যামিনী আচার্য : যামিনী আচার্যর বাড়ি আগরতলার কৃষ্ণনগরের সুপুরি বাগানে। যামিনী আচার্য রাজ আমলের লোক ছিলেন। শতবর্ষে পদার্পণ করে কয়েক বছর আগে মারা গেছেন তিনি। সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর ৪০ বছরের ওপর পেনশন গ্রহণ করেছেন তিনি। যামিনী আচার্যের অন্য পরিচয় হলো তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। এবং ত্রিপুরার রাজ পরিবারের পক্ষ থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে যেতেন বলে জানা যায়। ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের অবসানের পরে আগরতলার ঠাকুর-কর্তা পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভেঙে পড়ে। তখন বাড়ির সোনাদানা অলঙ্কার বিক্রি করে সংসার চালাতে হতো ঠাকুর-কর্তা পরিবারের সম্মানিত লোকেদের। যামিনী আচার্য এইসব ঠাকুর-কর্তা পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ লোক ছিলেন। তিনিই ঠাকুর-কর্তা পরিবারের স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে গিয়ে সেঁকবার দোকানে বা অন্য কোথাও বিক্রি করে টাকা এনে দিতেন বলে জানা যায়।

যশোদা দি : যশোদা হালদার। বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর এলাকায়। তাঁরা পৌত্র ক্ষত্রিয় পরিবারের লোক। যশোদাদির শ্বশুর বাড়িতে মন্দির আছে এবং সেখানে রোজ পুজো হয়। তিনি বন্ধুবর অধ্যাপক স্বপন বসুর বাড়ি প্রধান পাচিকার কাজ করেন। তাঁর হাতের রান্না খুব ভালো। স্বপনদের বাড়িতে তিনি দীর্ঘ বছর ধরে আছেন।

যজ্ঞেশ্বর সেন : যজ্ঞেশ্বর সেনের বাড়ি আগরতলার কর্ণেল চৌমুহনীর পাশে। তাঁর বাড়ির নাম সেন মহল। তিনি একজন নামকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র দাশ : ডঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র দাশ বড়দোয়ালী স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য আছে। তিনি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে জড়িত। কলকাতার 'All India Council for Man Education and Development' এর তিনি আজীবন সদস্য এবং এই সংস্থার ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ভট্টপুকুরে তাঁর বিশাল দোতলা বাড়ি।

যতীন্দ্র মাস্টার : যতীন্দ্র দেববর্মা। যতীন্দ্র দেববর্মা একজন স্কুল শিক্ষক। বাড়ি হেরমার কাছে রঙমালায়। তিনি খুব গরীব অবস্থা থেকে লেখাপড়া করেন। তাঁরা স্বামী স্ত্রীতে মিলে তাঁর মেয়েদের উচ্চশিক্ষিত করেছেন। তাঁর এক মেয়ে এম. এ পাশ। বিয়ে হয়েছে আমার খুড়তুতো শালা বিশ্বজিৎ দেববর্মার সঙ্গে।

যুগল দেববর্মা : যুগল দেববর্মার বাড়ি হেরমার পাশে রঙমালার দুরন্ত কপরা পাড়ায়। তিনি হেরমা বাড়ির যোগেন্দ্র দেববর্মার আপন ছোট ভায়রা। সম্পর্কে তিনি আমার পিসশ্বশুর। রাজনীতিতে তিনি একজন সি. পি. এম কর্মী।

যুগল : যুগল। ত্রিপুরার প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র জমাতিয়ার সিকিউরিটি। বাড়ি আগরতলার রামনগরে।

যগু কর্তা : জগদীশ কিশোর দেববর্মা। তবে আগরতলায় জগদীশকিশোর যগু কর্তা নামে সমধিক পরিচিত। যগু কর্তার পিতৃদেবের নাম দীনমোহন দেববর্মা। তিনি রাজ আমলের ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেলস-এর কর্ণেল ছিলেন। যগু কর্তারা ত্রিপুরার রাজপরিবারের লোক। তবে তাঁদের ধারা আসে ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের দিক থেকে। মেঘ কর্তা যগু কর্তাদের ধারারই বলে জানা যায়। যগু কর্তারা আগে আগরতলার রাজপ্রাসাদের মধ্যেই বসবাস করতেন। পরে বিধ্বংসী এক অগ্নিকান্ডে রাজঅন্দর ভস্মীভূত হলে যগু কর্তাদের পরিবার বর্তমান গোলবাজারের কাছে খোস বাগানের 'ওল্ড গেস্ট হাউস'-এ গিয়ে আশ্রয় নেন এবং পরবর্তীকালে সেখানেই থেকে যান। যগুকর্তারা চার ভাই — ব্রজেন্দ্র কর্তা, জগদীন্দ্র কিশোর, সদুর্শন কর্তা, এবং হৃষীকেশ কর্তা (আর্টিস্ট)। যগু কর্তার কোনো আপন বোন ছিলো না। তাঁর এক জ্যাঠতুতো বোন দশমী কুমারী শান্তিনিকেতনে গিয়ে শ্রীনিকেতন থেকে বাটিকের কাজ শিখে এসেছিলেন। এই তথ্য দিয়ে ছিলেন আমাকে শিল্পী ধীরেন কৃষ্ণ দেববর্মা। যগু কর্তা প্রথমে উমাকান্ত একাডেমীর ছাত্র ছিলেন। পরে কুমিল্লার কুমার বোর্ডিংয়ে থেকে স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে ভিক্টোরিয়া কলেজে লেখাপড়া করেন। তারপর কলেজ থেকে ত্রিপুরায় ফিরে এসে ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেলস-এ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে যোগদান করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি বার্মাফ্রন্ট ও চট্টগ্রাম ফ্রন্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। তিনি স্বনামধন্য মহিম কর্ণেলের কনিষ্ঠ কন্যা মীরা দেবীকে বিয়ে করেন। যগু কর্তার একমাত্র পুত্র ধ্রুবকিশোর দেববর্মা (ধ্রুবকর্তা) প্যালেস কম্পাউন্ডের ওয়েস্ট গেটে সুরম্য অট্টালিকা করে বসবাস করছেন। ধ্রুব কর্তার তিন বোন — মণিভা, ভাস্বতী, কাবেরী। যগু কর্তার শিকারী হিসেবে বিশেষ নাম ডাক ছিলো। তবে যগু কর্তার পরিবারের শিকারী সব থেকে নামকরা শিকারী হলেন বীরু কর্তা। যগু কর্তা ছিলেন বড় মহারাণী (মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের প্রথম মহিষী) প্রভারাণীর এডভাইজর। মহারাণী তাঁর পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করতেন না। ব্যক্তি জীবনে খুব পরোপকারী ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন যগু কর্তা। ১৯৮৭ সালের ১৪ই নভেম্বর যগু কর্তার দেহান্তর ঘটে।

রাজীব গান্ধী : ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। ফিরোজ গান্ধী ও ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র।

রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রেণুকা প্রভা : রেণুকা প্রভা দেববর্মা। রেণুকা প্রভা ছিলেন আগরতলার কর্ণেল বাড়ির মেয়ে। তিনি ছিলেন ঠাকুর মহিম কর্ণেলের দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয়া কন্যা। রেণুকা প্রভা বিয়ে করেছিলেন ফতেপুর (পশ্চিমবঙ্গের কাঁচড়াপাড়ার কাছে) এর

জমিদার পরিবারের আই. এ পাশ ছেলে সীতানাথ সিংহ রায়কে। সীতানাথ সিংহরায় রেণুকাপ্রভাকে নিয়ে কর্ণেল বাড়িতে ঘরজামাই ছিলেন। রেণুকা প্রভার একপুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রের নাম রাধানাথ সিংহরায়। বড়ো মেয়ে অনুরাধা ও ছোট মেয়ে ডালিয়া।

রাধানাথ সিংহরায় : রাধানাথ সিংহরায়ের পিতার নাম সীতানাথ সিংহরায় এবং মাতার নাম রেণুকাপ্রভা দেববর্মা। রেণুকাপ্রভা আগরতলার স্বনামধন্য মহিম কর্ণেলের কন্যা। সেই সম্পর্কে রাধানাথ সিংহরায় মহিম কর্ণেলের দৌহিত্র। তিনি ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে চাকুরী করতেন। তাঁর পিতা সীতানাথ সিংহরায়ের বাড়ি ছিলো পশ্চিমবঙ্গের কাঁচড়াপাড়ার কাছে ফতেপুরে। তাঁর পিতা ছিলেন সেই সময়কার আই. এ পাশ। রেণুকাপ্রভার সঙ্গে বিয়ে হলে তিনি আগরতলায় শ্বশুর বাড়ি কর্ণেল বাড়িতেই থাকতেন। কর্ণেল বাড়ি রাধানাথ সিংহরায়ের মামার বাড়ি।

রাধামোহন ঠাকুর : ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মণ। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রের আমলে রাজ পরিবারের বাইরে রাধামোহন ঠাকুরের পরিবার ছিলো সব থেকে সম্মানিত পরিবার। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে মহারাজা বীরচন্দ্রের রাজত্বকালে ত্রিপুরার প্রথম বিচারপতি ও পরে সমগ্র সৈন বিভাগের সৈনাধ্যক্ষ। অথচ ভাবতে অবাক লাগে তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলো ত্রিপুরার পাহাড়ের উপজাতিয় জুমিয়া। "তাঁর দাদামশায় তাঁর বাবাকে পাহাড় থেকে এনে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই হিসেবে রাখেন।" রাধামোহন ঠাকুর নিজের বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে মহারাজা বীরচন্দ্রের স্নেহ লাভ করেন এবং রাজবাড়িতে থেকে রাজকুমারদের সঙ্গে বিদ্যাচর্চার করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং বাঙলা, ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অথচ তাঁর নিজের মাতৃভাষা ছিলো তিব্বত-বর্মীয় ভাষা বংশের ভাষা ককবরক। পরবর্তীকালে যখন তিনি তাঁর মাতৃভাষা ককবরককে গবেষণা ধর্মী বই লেখেন তখন ওইসব ভাষাচর্চার প্রতিফলন ঘটেছিলো তাতে। বিবাহযোগ্য হয়ে তিনি মহারাজের আত্মীয়া মনোমোহিনীকে বিয়ে করেন এবং তাঁদের ঘরে পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রেরা হলেন — অনঙ্গমোহন, রেবতীমোহন, হৃদয়রঞ্জন, প্যারীমোহন এবং ললিতমোহন ও কন্যারা যথাক্রমে সৌদামিনী, বিনোদিনী, সুরসুন্দরী ও ললিতমঞ্জরী। রাধামোহন ঠাকুরের স্ত্রী ছিলেন রত্নাগর্ভা। পুত্রদের মধ্যে প্যারীমোহন ছিলেন হাওড়ার বটানিক্যাল গার্ডেনের প্রথম ভারতীয় কিউরেটর। তাঁর কিছু মূল্যবান লেখা আছে ওই সময়কার রিসার্স জার্নালে। ললিত ঠাকুর ছিলেন ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে সর্বপ্রথম এম. এ. এল. এল. বি। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ক্লাসমেট। রাধামোহন ঠাকুরের উত্তরপুরুষেরা খুবই উচ্চ শিক্ষিত এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞান ধারায় সবিশেষ যশস্বী। প্রপৌত্রী আগরতলার মহিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা শ্রীমতী করবী দেববর্মণ কবি ও উচ্চমানের সাহিত্যিক। তরুণ তীক্ষ্ণধী লেখক শঙ্খশুভ্র এই পরিবারের ছেলে। রাধামোহন ঠাকুরের উত্তরপুরুষের পরিবারে বাঙালী, ওড়িয়া, বিহারী মেয়েরা বিবাহসূত্রে অনুপ্রবেশ করেছেন। তেমনি এই পরিবারের মেয়েদের ত্রিপুরার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় উচ্চকোটী সমাজে। সব মিলিয়ে রাধামোহন ঠাকুরের উপজাতীয় পরিবার সর্বভারতীয় শিক্ষিত পরিবারগুলোর মধ্যে অন্যতম। রাধামোহন ঠাকুর বিভিন্ন ভাষায় পারঙ্গম ব্যক্তি হয়েও কিন্তু তাঁর মাতৃভাষা ককবরক ভুলে যাননি। তিনি সেই ভাষার উন্নতিকল্পে গবেষণামূলক লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। আগে ককবরক ভাষাকে সকলে ত্রিপুরী বা তিপরা ভাষা বলে জানতো। তিনি এই ত্রিপুরী ভাষাকে ককবরক নামে অভিহিত করে এই ভাষার ৮টি উপভাষা, (পুরান ত্রিপরী, রিয়াঙ, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, কলই, রূপিনী, মুরাছিঙ ও উলছই (উছই)কে একটি শিষ্ট রূপ দিয়ে গেছেন। এই জন্য তিনি ত্রিপুরার ককবরক ভাষাভাষী উপজাতীয় জনগণের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। ককবরক ভাষায় তাঁর কালজয়ী বইগুলো হলো : কক্-বরক্-মা (ত্রৈপুর ব্যাকরণ), ত্রৈপুর ভাষাভিধান (ককবরক-বাঙলা-ইংরেজী) ও ত্রৈপুর-কথামালা (ককবরক-বাঙলা-ইংরেজী)। রাধামোহন ঠাকুরকে ককবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণের সফল রূপকার বলা যেতে পারে। তিনি ককবরকের বিদ্যাসাগর। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আগরতলায় এলে রাধামোহন ঠাকুরের বাড়ি যেতেন এবং তার পৌত্র যোগেশ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে ককবরক ভাষা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইতেন। বিশেষ করে ককবরকের টোন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। এই তথ্য দিয়েছেন রাধামোহন ঠাকুর পরিবারের জামাই শ্রীমতী করবী দেববর্মণের স্বামী ডাঃ নীলমণি দেববর্মা।

রাণী গুইদালো : নাগাল্যান্ডের রাণী। তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন।

রাজলক্ষ্মী দেবী : শ্রীমতি রাজলক্ষ্মী চৌধুরী। রাজলক্ষ্মী দেবী হলেন স্বনাম ধন্য বিজনকৃষ্ণ চৌধুরীর স্ত্রী। তিনি কর্মজীবনে শিক্ষকতা করতেন।

রাজলক্ষ্মী দেবী আগরতলার রবীন্দ্র পরিষদের একজন সম্মানিত সদস্যা এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার দ্বিতীয় ভবন গড়ার কাজে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন তিনি। তিনি ত্রিপুরার বিভিন্ন জনহিতকর সংস্থার সঙ্গে জড়িত। শ্রীমতী অনুরূপা মুখার্জী প্রতিষ্ঠিত ত্রিপুরা আদিবাসী মহিলা সমিতির তিনি একজন সক্রিয় কর্মী। ত্রিপুরার সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রাজলক্ষ্মী দেবী। তিনি All India Council for Mass Education and Development-এর ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের সেক্রেটারী।

রাতুল দেববর্মা : রাতুল দেববর্মার বাড়ি আগরতলার ঠাকুরপল্লী রোডে। তিনি আগরতলা এ. জি অফিসের একজন দক্ষ কর্মী। রাতুলবাবু মূলত একজন কবি। কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি সমধিক। ইতিমধ্যে তাঁর বাঙলা কবিতার বই প্রকাশিত

হয়েছে। বইগুলোর নাম : 'খোয়াড়ের শব্দকল্প', 'পাশাপাশি হাঁটি' এবং 'শাখানটাঙের অবাক বালক'। কবি রাতুল দেববর্মা গত পঁচিশ বছর ধরে সাহিত্য পত্রিকা 'পৌণমী' সম্পাদনা করে চলেছেন।

রমেন্দ্র নারায়ণ দেববর্মা : রমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের হেরমা গ্রামে। তিনি ককবরক বিশেষজ্ঞ যোগেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি বি. এ পাশ করার পর শিক্ষকতায় যোদ দেন। বর্তমানে তিনি স্কুল ইনস্পেক্টর।

রাখাল দেবনাথ : রাখাল দেবনাথের বাড়ি দক্ষিণ চড়িলামে। তিনি দীর্ঘদিন সি. পি. আই পার্টির হোলটাইমার ছিলেন কমরেড অঘোর দেববর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে। পরে তিনি সি. পি. আই (এম) পার্টিতে যোগদান করেন এবং কমরেড দুর্গাদাস সিকদারের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। সি. পি. আই-এ থাকতে তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার। তাঁর মতো সৎ কমিউনিস্ট কর্মী আমি কম দেখেছি। কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে তিনি সি. পি.আই পার্টি করতেন। চড়িলামের উপজাতি-বাঙালীর কাছে তিনি ছিলেন মৈত্রীর সেতু বিশেষ।

রামকুমার ঠাকুর : রামকুমার দেববর্মা। রামকুমার দেববর্মার বাড়ি ছিলো খোয়াইয়ের কল্যাণপুরের কাছে। তিনি মহারাজা বীরবিক্রমের ঘনিষ্ঠতা লাভ করে খুব আস্থাভাজন হয়েছিলেন এবং সেই সুবাদে মহারাজকে ত্রিপুরার পাহাড়ের উপজাতিদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সত্যিকথা বলতে কি রামকুমার ছিলেন ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের পূর্বসূরী। আগরতলা উমাকান্ত একাডেমীর ত্রিপুরা বোর্ডিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। ওই বোর্ডিংয়ে থেকে পাহাড়ের উপজাতি ছাত্ররা লেখাপড়া করতেন।

রবি চক্রবর্তী : রবি চক্রবর্তীর বাড়ি আগরতলার পুরোনো কালীবাড়ি লেনে। তিনি একসময় সি. পি. আই পার্টির কর্মী হিসেবে সংস্কৃতি ফ্রন্টে কাজ করতেন। তিনি একজন সুরকার ও সুগায়ক।

রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক : পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁলাইনের দুর্গানগরের বাসিন্দা তিনি।

রূপা : রূপা গুপ্ত। রূপা আমাদের নববারাকপুরের বাড়ির প্রতিবেশী দিলীপ দাশগুপ্তের বড়ো মেয়ে। বিয়ে হয়েছে আগরতলার অফিস লেনের গুপ্তবাড়ির জয়ন্ত গুপ্তর সঙ্গে।

রবি মামা : বন্ধুবর অধ্যাপক স্বপন বসুর মামা। তিনি শেষ বয়সে স্বপনদের বাড়ি থাকতেন।

রবীন্দ্র চক্রবর্তী : রবীন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ি চড়িলামে।

রাধাকুমার দেববর্মা : রাধাকুমার দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের হেরমা পাড়ায়। তিনি একসয়ম ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন এবং হরিনাথ দেববর্মার ডান হাত হিসেবে কাজ করতেন। রঙমালা গাঁওসভার প্রধানও হয়েছিলেন তিনি। সম্পর্কে তিনি আমার স্ত্রীর বড়ো ভাই। বর্তমানে হেরমা বাজারে তিনি একটা মুদিখানার দোকান দিয়েছেন।

রতন চক্রবর্তী : ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিশিষ্ট বাগ্মী। পূর্বে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের আহ্বায়ক।

রক্ষিত দেবনাথ : 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকার রিপোর্টার।

রামু ভৌমিক : চড়িলামের ব্রজগোপাল ভৌমিকেব ডাক নাম বামু ভৌমিক। ব্রজগোপাল ভৌমিক দ্রষ্টব্য।

রতু : শুভব্রত দেব। শুভব্রত দেবের বাড়ি আগরতলার কৃষ্ণনগর রোডে, বিজয়কুমার স্কুলের কাছে। তিনি ক্যাকস্টন প্রিন্টার্স ও 'অক্ষর' প্রকাশনীর কর্ণধার। ত্রিপুরার প্রতিভাবান লেখকদের গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধের বই প্রকাশ করে শুভব্রত দেব ইতিমধ্যেই খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

রমেশ : রমেশ দেববর্মা। রমেশ দেববর্মার পৈত্রিক বাড়ি চড়িলামের চন্ডীঠাকুর পাড়ায়। তিনি চন্ডীঠাকুরের দৌহিত্র। রমেশবাবু ককবরক ভাষার একজন বিখ্যাত কবি। তিনি খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেছেন এবং নিউ টেস্টামেন্ট ককবরক ভাষায় অনুবাদ করে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

রামবাবু জমাদার : চড়িলামের চন্ডীঠাকুর পাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় স্বনামধন্য চন্ডীঠাকুরের নামে। রামবাবু জমাদার ছিলেন চন্ডীঠাকুরের পিতা।

রামনারায়ণ ঠাকুর : চন্ডীঠাকুর ও গোপাল ঠাকুরের পূর্বপুরুষ গজভীম নারায়ণের পূর্বের নাম রামনারায়ণ ঠাকুর। রামনারায়ণ ঠাকুর রাজার সঙ্গে গভীর জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে হাতির দাঁত উপড়িয়ে রাজাকে বসতে দিয়ে ছিলেন। তারপর থেকে তাঁর নাম হয় গজভীম নারায়ণ।

রঘুনাথ ঠাকুর : রঘুনাথ দেববর্মা। চড়িলামের চন্ডীঠাকুর পাড়ার পাশের পাড়ার নাম রঘুনাথ ঠাকুর পাড়া। স্বনামধন্য রঘুনাথ ঠাকুরের নাম অনুসারে এই পাড়ার নামকরণ হয়।

রণ দেববর্মা : রণ দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের ধারিয়াথল গ্রামে। একসময় তিনি উপজাতি যুব সমিতির নেতা ছিলেন। বর্তমানে তিনি সি. পি. এম পার্টির কর্মী। তিনি ধারিয়াথল গ্রামের গদাধর দেববর্মা (মাস্টার)'র আপন ভগ্নীপতি।

রবি সেন : রবীন সেন। আগরতলা মধ্যপাড়ায় রবীন সেনদের বাড়ি। তাঁর পিতার নাম প্রফুল্লচন্দ্র সেন। রবিবাবু একজন বিখ্যাত আলোক চিত্রশিল্পী। তিনি গায়ক মহেন্দ্র দেববর্মার সঙ্গে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ত্রিপুরার উপজাতিদের জীবনযাত্রা নিয়ে খুব উচ্চমানের একটা সিনেমা করেছিলেন। তাঁর কাছে ত্রিপুরার রাজবাড়ির দুষ্প্রাপ্য অনেক ছবি আছে।

১৯৪৫ সালে দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা জনশিক্ষা সমিতির প্রথম মিটিংয়ের দুষ্প্রাপ্য ছবি আছে রবিবাবুর কাছে। তিনি একজন সুলেখকও বটে। প্রাচিন আগরতলার অনেক মূল্যবান লেখা তিনি লিখেছেন ছবি সমেত। বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছবি সহকারে একখানা অতিমূল্যবান বই লিখে খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেছেন তিনি। বইখানি বাঙলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রকিশোর দেববর্মা ঃ রবীন্দ্রকিশোর দেববর্মার বাড়ি সিধাই-মোহনপুরের দিকে। তিনি একসময় সি. পি. আই (এম)-এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং দু'দুবার ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য (এক্সকিউটিভ মেম্বার) নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে ককবরক ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় মনোযোগ দিয়েছেন। এর মধ্যে তাঁর এক হাজার ককবরক প্রবাদের বই প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া গ্রাম পাহাড়ের উপজাতি জনপদ ও নদী-নালার নামের ব্যুৎপত্তির ওপর লেখালেখি করে তিনি গবেষক হিসেবে খুব খ্যাতি অর্জন করেছেন। রবীন্দ্রবাবু তাঁর মাতৃভাষায় ব্যাকরণও লিখেছেন। সম্প্রতি মূল ককবরক ভাষায় অমূল্য সব রূপকথা সংগ্রহ করেছেন এবং তা প্রকাশিত হতে যাবে। একজন উপজাতীয় বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমগ্র ত্রিপুরায় তাঁর খুব নাম।

রামকমল ঠাকুর ঃ আগরতলার কৃষ্ণনগরের সুপুরিবাগের বঙ্গঠাকুর দেওয়ানের বাবা হলেন রামকমল ঠাকুর। বঙ্গঠাকুর ত্রিপুরার রাজ আমলে রাজার দেওয়ান ছিলেন। তাই তাঁর নাম বঙ্গঠাকুর দেওয়ান।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ঃ কলকাতার 'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠীর অন্যতম স্থপতি। বিখ্যাত মঞ্চ অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তিনি নান্দীকার গড়ে তোলেন। অভিনেতা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর সঙ্গে আমার পরিচয় ষাটের দশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়। তিনি আমাদেরকে নিয়ে নাটক করতেন। আমরা আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় নাটক প্রতিযোগিতায় তাঁর কাছে তালিম নিতাম। আমাদের নাটকের রিহার্সাল হতো নান্দীকারের শ্যামবাজারের অফিস ঘরে। রুদ্রপ্রসাদ তখন ইটালীয়ান নাট্যকার পিরানদেলোর একটা নাটক অনুবাদ করেছিলেন 'শ্রীহরিসহায়' নাম দিয়ে। সেই নাটক মঞ্চস্থ করে আমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলাম। ওই নাটকের কাকাবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করে খুব নাম করেছিলাম। রুদ্রদা আমাকে খুবই ভালোবাসেন এবং আগরতলায় এলে আমাকে নিয়েই থাকেন।

রতি দেববর্মা ঃ রতি দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের বাঁশতলী গাঁওসভার মণিরাম ঠাকুর পাড়ায়। তিনি সি. পি. আই কর্মী।

রত্না দাশ ঃ আগরতলা মিউজিয়মের প্রাক্তন কিউরেটর।

রতন আচার্য ঃ রতন আচার্যর বাড়ি আগরতলার নাজির পুকুর পাড়ে। তাঁরা ত্রিপুরার রাজ আমলের লোক। রতনবাবু ত্রিপুরা সরকারের 'ট্রাইব্যাল রিসার্চ ইন্সস্টিটিউট' এর একজন দক্ষ রিসার্চ অফিসার। তিনি ত্রিপুরার রিসার্চের কাজে বিভিন্ন উপজাতি এলাকায় গিয়ে উপজাতিদের নানাবিধ আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তা নিয়ে মূল্যবান লেখাও লিখেছেন রিসার্চ জার্নালে। সম্প্রতি তিনি রিয়াঙ উপজাতিদের ওপর একখানা অত্যন্ত মূল্যবান বই প্রকাশ করেছেন। ট্রাইবেল রিসার্চের অফিসার হিসেবে রতন আচার্য অনেক গবেষকের সাহায্যও করে থাকেন তাঁর উপজাতি জীবনের জীবন্ত ও বাস্তবসব অভিজ্ঞতা দিয়ে।

রামলাল দত্ত ঃ রামলাল দত্তর বাড়ি বর্তমানে আগরতলার রামনগরের এক নম্বর রাস্তায়। তিনি কুমিল্লার বিখ্যাত 'সন্তান প্রেস' এর বর্তমান মালিক। রামলাল দত্তদের পরিবার কুমিল্লায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং যুগান্তর ও অনুশীলন পার্টির অনেক বিপ্লবী তাঁদের পরিবারে আত্মগোপন করে থেকে কাজকর্ম করতেন। এঁদের মধ্যে ত্রিপুরার বিপ্লবীরাও ছিলেন। রামলাল দত্তের ঠাকুরদার নাম সম্ভবত ছিলো রামকানাই দত্ত। তাঁর নামে একটা বিদ্যালয় আছে। রামলালবাবুদের পূর্বপুরুষদের ওষুধের ব্যবসা ছিলো এবং মাদ্রাজ, বোম্বে, কলকাতা প্রভৃতি শহরে তাঁদের এই ব্যবসা খুব নাম করেছিলো। রামলাল বাবুদের বিশাল পরিবারের লোকেরা সব ত্রিপুরার বাইরেই থাকেন। রামলাল দত্ত একজন সুলেখক। তাঁর প্রবন্ধের হাত চমৎকার। ত্রিপুরা ও কুমিল্লার ছাপাখানার ইতিহাসের ওপর তাঁর লেখা সত্যিই মূল্যবান। তাঁর বাড়িতে একটা লোভজনক লাইব্রেরী আছে এবং সেখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

রসময় দত্ত ঃ রসময় দত্তর বাড়ি আগরতলার মিলন সঙ্ঘের সন্নিকটে। তিনি প্রথমে ফরেস্ট বিভাগের উচ্চপদে আসীন ছিলেন। পরে ত্রিপুরার অনুন্নত রিয়াঙ উপজাতিদের উন্নতির জন্যে পি. জি. পি (Primitive Group Programme) ডিপার্টমেন্ট গড়ে উঠলে তিনি তাঁর প্রথম ডাইরেক্টর হন। পি. জি. পি'র ডাইরেক্টর হিসেবে তিনি খুবই নাম করেন। এবং রিয়াঙ উপজাতিদের স্বনির্ভর অনেক কলোনী করেন। রিয়াঙ উপজাতিদের পাশাপাশি বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতিদেরকেও তিনি পি. জি. পি প্রোগ্রামের আওতায় এনে তাদেরও অবস্থার উন্নতির জন্যে সচেষ্ট হন। শ্রীযুক্ত দত্তর সঙ্গে পি. জি. পি'র সাফল্য দেখবার কাজে অনেক উপজাতি এলাকায় আমি গিয়েছি। তিনি বাঁশের হুকোয় তামাক খেতে খেতে উপজাতি মহিলাদের সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। ত্রিপুরার উপজাতিদের সমস্যা সম্পর্কে দত্তসাহেব একজন ওয়াকিবহাল ব্যক্তি।

রাইমোহন জমাতিয়া ঃ একজন জেল পলাতক ডাকাত। জেল পলাতক অবস্থায় তাকে অনেক নিষ্ঠুর হত্যার কাজে

জড়িত থাকতে দেখা গেছে।

রমেন ভট্টাচার্য ঃ রমেন্দ্র ভট্টাচার্য ত্রিপুরা শিক্ষা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। পরে শিক্ষা বিভাগ থেকে আলাদা একটা স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট হলে তিনি সেই ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন।

রীণা রায় ঃ রীণা রায় প্রাক্-বিবাহ জীবনে ছিলেন রীণা সেনগুপ্ত। তিনি বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর জ্যেষ্ঠকন্যা। পরে 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক সমীরণ রায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার উন্নতির মূলে রীণা রায়ের বিশেষ অবদান রয়েছে। কলেজে লেখাপড়া করার সময় তিনি সি. পি. আই (এম) দলের ছাত্র ও যুব সংগঠন করতেন।

রামতারণ ভট্টাচার্য ঃ শ্রীযুক্ত রামতারণ ভট্টাচার্যের বাড়ি বর্তমানে আগরতলার রামনগরের ৮ নম্বর রাস্তায়। রামতারণবাবুরা সিলেট জেলার লোক। তাঁর পূর্বপুরুষরা সকলেই সংস্কৃত ভাষায় সুপন্ডিত। এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত ভাষায় বই-পুস্তক লিখেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ভাটপাড়ায় তাঁদের পরিবারের সুপন্ডিত সব লোকেরা আছেন। রামতারণ ভট্টাচার্য নিজেও একজন পরম সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বিদ্যাবাচসম্পতি ও দর্শন শাস্ত্রী। আগরতলায় রাজ আমলের পরে যখন তাঁর ও নিবারণ ঘোষ প্রমুখের চেষ্টায় রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয় গড়ে ওঠে তখন তিনি ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁর অগাধজ্ঞানের জন্যে রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য বিদ্যুৎকুল তাঁকে পুরস্কৃত করেন। রামতারণ ভট্টাচার্য মশায় এখনো 'ন্যায়দন্ড' নামে একখানা পত্রিকা সম্পাদনা করে থাকেন। প্রথম জীবনে রামতারণবাবু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টির মতো বিপ্লবী সংগঠনে জড়িত হয়ে পড়েন। পরে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আসামের কমিউনিস্ট নেতা বীরেশ মিশ্রের সঙ্গে কাজ করেন। ত্রিপুরায় এসে তিনি হোমিওপ্যাথি শুরু করেন এবং একজন পাশ করা ডাক্তার হিসেবে তিনি খুব নাম করেন। ত্রিপুরার আগরতলার প্রথম সারির রাজনীতিকরা তাঁর রোগী ছিলেন। পরবর্তীকালে রামতারণ মশায় কংগ্রেসী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাছ থেকে জানা যায় যে ত্রিপুরার রাজারা অতীতে কনৌজ থেকে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনেন তাঁদের মধ্যে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন এবং কৈলাসহরে কুকী এলাকায় তাঁদেরকে ভূমিদান করা হয়।

রমণী ক্যাপ্টেন ঃ রমণী মোহন দেববর্মা। পিতার নাম রাজারাম ঠাকুর। রজনী ক্যাপ্টেনের আগে বাড়ি ছিলো জেল রোডের ত্রিপুরা সরকারের হ্যান্ডলুম ও হ্যান্ডিক্রাফ্টস কর্পোরেশনের সমগ্র বাড়ি। বর্তমানে কর্ণেল চৌমুহনীর কাছে মোহন কর্তার বাড়ির পাশে বাড়ি। কর্মজীবনে তিনি First Tripura Rifles-এর ক্যাপ্টেন ছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মাফ্রন্টে গিয়ে খুব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। পরে তিনি মেজর পদের উন্নীত হন।

রাজেশ্বর রাও ঃ সি. পি. আই পার্টির প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী। কমরেড রাজেশ্বর রাও ত্রিপুরায় 'ককবরক উন্নয়ন পরিষদ'-এর ভাষা গবেষণার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এবং ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের নামে ১৯৭২ সালে 'ত্রিপুরার ককবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ' বইখানির ছাপার খবর তিনি কমিউনিস্ট পার্টির তহবিল থেকে বরাদ্দ করেছিলেন কমরেড অঘোর দেববর্মা ও কমরেড মোহন চৌধুরীর অনুরোধক্রমে।

রোমা রোলা ঃ বিখ্যাত ফরাসী লেখক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন প্যারিসে রোমারোলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন তাঁর সঙ্গে ত্রিপুরার রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর (লালু কর্তা) ছিলেন। এবং একই ছবিতে রোমারোলা-রবীন্দ্রনাথ-ব্রজেন্দ্রকিশোরকে দেখতে পাওয়া যায়।

রমেনদা ঃ রমেন মিত্র। সি. পি. আই-এর প্রথম সারির তাত্ত্বিক নেতা এবং সি. পি. আই নেত্রী ইলা মিত্রের স্বামী। সি. পি. আই পার্টির সকলের কাছে তিনি ছিলেন রমেন দা। রমেন দা পার্টির সর্বক্ষণের দুস্থ কর্মীদের কাছে ছিলেন অতি প্রিয় কমরেড। তিনি পার্টির কর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদেরকে চিঠি লিখে কলকাতার বড়ো বড়ো পার্টির ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতেন। তাঁর ডাঃ সুন্দরীমোহন এভিনিউয়ের বাড়িতে কমরেড ভবানী সেন থাকতেন। রমেনদারা ছিলেন রাজশাহীর জমিদার। তিনি ম্যাথমেটিক্স-এর এম. এস. সি ছিলেন।

রাণাকুসুম দেববর্মা ঃ রাণাকুসুম দেববর্মা একসময় ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ফ্রন্টের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এবং খোয়াই থেকে সম্ভবত কমরেড দশরথ দেবের বিরুদ্ধে খোয়াই থেকে বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি খ্রীষ্টধর্ম করে নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মযাজকের কাজ করে চলেছেন।

রাজেন্দ্র দেববর্মা ঃ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি জম্পুইজলায়। তিনি ত্রিপুরা সরকারের পুলিশ বিভাগের একজন দক্ষ ডি. এস. পি। আমার বন্ধু শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ও আমি ১৯৬৭ সালের জুন মাসে যখন ককবরক ভাষার গবেষণার কাজে অডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে থাকি তখন রাজেন্দ্রবাবুও বীরচন্দ্রবাবুর বড়ো ভাই মণিবাবুর ঘরে ভাড়া থাকতেন স্বামী-স্ত্রীতে। তখনই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে ছিলেন। রাজেন্দ্রবাবু একসময় ককবরকে লিখতেন এবং ওই ভাষা নিয়েও চর্চা করতেন।

রণেশ রায় ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের ছাত্র।

রামচরণ দেববর্মা ঃ রামচরণ দেববর্মার গ্রামের বাড়ি কমলপুরের আভাঙ্গা এলাকায়। বর্তমান বাড়ি আগরতলার ওল্ড

কালীবাড়ি লেনে। তিনি বাঙালী মহিলার পাণি গ্রহণ করেছেন। তিনি সি. পি. আই (এম) পার্টির সমর্থক। কর্মসূত্রে তিনি এয়ারলাইন্স কর্পোরেশনের একজন দায়িত্বশীল কর্মী।

মিস্টার রক্ষিং : মেঘালয়ের 'NEPA" (North-East Police Academy)র একজন দক্ষ পুলিশ অফিসার এবং তিনি ত্রিপুরার লোক।

রাণু : রাণু দেববর্মা। সি. পি. আই (এম) পার্টির নেতা এবং ককবরক ভাষার প্রথম ঔপন্যাসিক সুধন্বা দেববর্মার কন্যা এবং ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার স্ত্রী। রাণু দেববর্মা সম্পর্কে আমার পিস্‌শাশুড়ী। বাড়ি করেছেন আগরতলার এডভাইজার চৌমুহনীর কাছে অনুরূপা মুখার্জীর বাড়ির পাশে।

রঞ্জিত দেববর্মা : ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন প্রধান কার্যনির্বাহী সদস্য। তিনি সি. পি. আই (এম) পার্টির একজন প্রথম সারির নেতা ককবরক ভাষী উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে।

রেখা : রেখা দেববর্মা। পরবর্তীকালে বিবাহের পরে রেখা মুখার্জী। তিনি কমিউনিস্ট নেতা সুধন্বা দেববর্মার প্রথম পক্ষের কন্যা। বিয়ে হয়েছে আগরতলার রাজশিক্ষক অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পরিবারে।

রাজশ্রী বিশ্বাস : রাজশ্রী বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি ও All India Council for Mass Education and Development- এর প্রথম সারির নেত্রী। সত্তরের দশক থেকে আজ অবধি তিনি নিরলসভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ করে যাচ্ছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ও দৃঢ়চিত্তে। নিরক্ষরতা দরীকরণে এমন নিবেদিত প্রাণ মহিলা যেকোনো রাজ্যের গর্ব। সাক্ষরতার ওপর অনেক মৌলিক লেখাও তিনি লিখে থাকেন নিয়মিতভাবে।

রাজশ্রী বিশ্বাস হলেন রাণী রাসমণির উত্তরপুরুষ এবং মথুরবাবুদের শরিক। দক্ষিণেশ্বর থেকে কিছু দূরে গঙ্গার ধারে তাঁদের বাড়িতে অনেক মন্দির আছে এবং সেখানে বাৎসরিক উৎসবও হয়।

রঞ্জিত মজুমদার : রঞ্জিত মজুমদারের বাড়ি বিলোনীয়ার জুলাইবাড়িতে। তিনি সি. পি. আই পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী এবং বিলোনীয়া বিভাগীয় পরিষদের সদস্য। তিনি সি. পি. আই-এর ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদেরও সদস্য। কমরেড রঞ্জিত একেবারে ছাত্র অবস্থা থেকেই সি. পি. আই পার্টির সঙ্গে যুক্ত এবং খুব গরীব ঘরের ছেলে।

রথীনবাবু : ডাঃ রথীন্দ্রনাথ বসু। তিনি বন্ধুবর অধ্যাপক স্বপন বসুর বড়ো ভাই। বাড়ি বালিগঞ্জ গার্ডেন্স-এ।

রুচিরা : রুচিরা মুখার্জী। শ্রীমতী রুচিরা মুখার্জীর বাড়ি শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীতে। তিনি বিশ্বভারতীর চীনা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ সুজিত মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। ১৯৬৬ সনে আমি যখন গবেষক যোগেশ বাগলের চিঠি নিয়ে শান্তিনিকেতনে যাই তখন রুচিরা আমার পৌষালীতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পরে তিনি আমাকে সাহিত্যিক মুজতবা আলীর কাছে নিয়ে যান। শ্রীমতী মুখার্জী ফিলোজফি নিয়ে এম. এ পাশ করেন ' বর্তমানে তিনি আজকাল পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

রোহিনীকুমার ভট্টাচার্য : রোহিনীকুমার ভট্টাচার্যের বাড়ি দক্ষিণ বনমালীপুরে। তিনি ছিলেন ত্রিপুরার রাজ আমলের লোক। কর্মজীবনে তিনি পুলিশ বিভাগের পদস্থ অফিসার ছিলেন। যতদূর জানা যায় স্বদেশীরা ছদ্মবেশে রোহিনীবাবুর বাড়িতে এসে থাকতেন এবং তাঁর স্ত্রী সুহাসিনী দেবী যুগান্তর অনুশীলন পার্টির সেইসব স্বদেশী বিপ্লবীদের সেবা শুশ্রূষা করতেন। সুহাসিনী দেবীর ভাই নীরদ চক্রবর্তী ছিলেন একনজ জাঁদরেল স্বদেশী এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের বন্ধু। ত্রিপুরার বিখ্যাত সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের পিতা হলেন রোহিনীকুমার ভট্টাচার্য। রোহিনীবাবুর ছেলে কমল ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। কমল আমার বন্ধু।

রমেশচন্দ্র : বিশ্ব শান্তিসংসদ (World Peace Council)-এর প্রাক্তন সভাপতি। তিনি ছিলেন সি. পি. আই পার্টির তাত্ত্বিক নেতা এবং জাতীয় পরিষদের সদস্য। তিনি একসময় সি. পি. আই-এর ইংরেজী পত্রিকা নিউ এজ (New Age) সম্পাদনা করতেন। তিনি পার্টির হয়ে পরবর্তীকালে বিশ্ব শান্তিসংসদের সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন। তাঁর মতো বাগ্মী আমি কমই দেখেছি। বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের হত্যার পরে সি. পি. আই-এর বহুবাজার পার্টি অফিসে এক জনসভায় এই হত্যাকান্ডের তথ্য শুনেছিলাম।

রিঙ্কি : রিঙ্কি দেববর্মা। আমার প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত পরশুরাম দেববর্মা (ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন ডেপুটি চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার)'র বড়ো মেয়ে। কুমারী রিঙ্কি একজন টেকসটাইল ইঞ্জিনীয়ার এবং ত্রিপুরা সরকারের কর্মী।

রমেন : বন্ধুবর অধ্যাপক স্বপন বসুর অধ্যাপক ছাত্র।

রেবন্ত সেন : ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তর মামাতো কি পিসতুতো ভাই। কলকাতার শ্রমিক নেতা। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে অধ্যাপক কমলেন্দু গাঙ্গুলীর বাড়িতে।

রত্না : পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও All India Council for Mass Education and Development-এ কর্মী।

রাম চ্যাটার্জী : রাম চ্যাটার্জী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মন্ত্রী। তিনি একসময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। অতি সাহসিকতা ও মিলিট্যান্ট

চরিত্রের জন্যে রাম চ্যাটার্জীর নাম একসময় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মুখে মুখে ফিরতো।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য ঃ রামেশ্বর ভট্টাচার্য আগরতলা মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করেন। তিনি বিদ্যাবাচস্পতি ও দর্শনশাস্ত্রী পরম পন্ডিত রামতারণ ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রামেশ্বরবাবু একজন সাহিত্যিক ও কবি। ইতিমধ্যে তাঁর 'উপদ্রুত বসন্তে' নামে একখানি কবিতার বই বেরিয়েছে। ১৯৭৩ সালে তিনি 'পূর্বমেঘ' সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করেন। ইতিমধ্যে কবি কৃত্তিবাস চক্রবর্তী, লেখক সন্তোষ রায়ের সঙ্গে যৌথভাবে ত্রিপুরার পঞ্চাশ বছরের গল্প সংকলন সম্পাদনা করেছেন। ২০০১-এর আগরতলা বইমেলায় প্রকাশের জন্যে 'বিজনকৃষ্ণ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংকলন' সম্পাদনার কাজে রত আছেন। অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য ত্রিপুরা রাজ্যের একজন লেখক- সংগঠকও বটে। একসময় তিনি ধর্মনগরের পার্থ রায়, লেখক সন্তোষ রায়, কবি কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, কবি কৃত্তিবাস চক্রবর্তী, কবি রাতুল দেববর্মা প্রমুখকে নিয়ে 'উত্তর-পূর্বাঞ্চল সাহিত্য সম্মেলন' নামে এক সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সাহিত্য সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব ভাষাভাষী লেখকদের একটা সংগঠনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা। রামেশ্বরবাবু একসময় আগরতলার রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। বহু জনকল্যাণমূলক সামাজিক সংস্থার সঙ্গেও তিনি জড়িত। তিনি সাক্ষরতা আন্দোলনেরও একজন কর্মী। All India Council for Mass Education and Development-এর ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের তিনি সদস্য। ত্রিপুরায় উপজাতি-বাঙালীর মধ্যে মৈত্রী গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'জনসেবা পরিষদ' নামে যে সংগঠনটি গড়ে ওঠে তারও নিরলস কর্মী ছিলেন তিনি। এমন বন্ধু বৎসল, পরোপকারী মানুষ আমাদের ত্রিপুরার গৌরব।

লালুকর্তা ঃ এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ দ্রষ্টব্য।

লাবরেছাই মগ ঃ লাবরেছাই মগের বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরার জুলাইবাড়ির কাছে বর্ধিষ্ণু মগ উপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম কলসী গ্রামে। তিনি কলসী এলাকার জমিদার ছিলেন বলা যায়। তাঁর নিজের বাড়িতে একটি সুবৃহৎ বুদ্ধমন্দির আছে। সেখানে বৌদ্ধভিক্ষুরা থাকেন। তাঁর নিজের দালান বাড়িটিও বেশ বড়ো। লাবরেছাই মগের কলসী বাজারে খুব বড়ো একটা শুকনো মাছের দোকান ছিলো। তিনি বার্মা ও আবাকান থেকে শুকনো মাছ আনতেন। তাঁর দোকান থেকেই স্থানীয় মৎসজীবীরা শুকনো মাছ পাইকাড়ি কিনতেন। লাবরেছাই ছিলেন খুবই সুদর্শন।

লক্ষ্মী দেববর্মা ঃ আমার বড়ো মেয়ে তানিয়া (নন্দিনী)'র বান্ধবী।

লবঙ্গলতা ঃ লবঙ্গলতা দেববর্মা। লবঙ্গলতা ছিলেন চড়িলামের কাছে চন্ডীঠাকুর পাড়ার চন্ডীঠাকুরের বড়ো মেয়ে। লবঙ্গলতার বিয়ে হয়েছিলো আমার শ্বশুরবাড়ি হেরমার কুলচন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে। চন্ডীঠাকুর কুলচন্দ্র ঠাকুরকে ঘরজামাই রেখেছিলেন। লবঙ্গলতার তিন ছেলে — কার্ত্তিক দেববর্মা, রমেশ দেববর্মা ও সুধাংশু দেববর্মা। কার্ত্তিক দেববর্মা বাড়িতে থেকেই কৃষিকাজ করতেন। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। রমেশ দেববর্মা উমাকান্ত একাডেমী থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে প্রথম জীবনে স্কুলে মাস্টারি করতেন। পরে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তিনি অরুন্ধতীনগর ব্যাপটিস্ট মিশনে এসে নিউ টেস্টামেন্ট তাঁর মাতৃভাষায় অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং দীর্ঘ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে এই কাজ তিনি শেষ করেন। রোমান হরফে ককবরক ভাষায় লেখা এই ধর্মীয়গ্রন্থ ককবরক ধর্মীয় সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। লবঙ্গলতার এই ছেলে কবিও। তিনি ককবরক ভাষায় প্রকৃতি নির্ভর বহু উচ্চমানের কবিতা লিখেছেন। লবঙ্গলতার ছোট ছেলে সুধাংশু দেববর্মা ত্রিপুরা সরকারের তহশীলদার হিসেবে কাজে যোগ দেন। তহশীলদার থেকে তিনি হন রেভিনিউ ইন্সপেক্টর। পরে ডেপুটি কালেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করে অবসর গ্রহণ করে আগরতলার কর্ণেল বাড়িতে বাড়ি কিনে অবসর জীবনযাপন করছেন। লবঙ্গলতার পৌত্র (সুধাংশু দেববর্মার বড় ছেলে) সুখেন্দু দেববর্মা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একজন কৃতী অধ্যাপক।

লোটন ঃ লোটন দেববর্মা। হেরেমা গ্রামের যোগেন্দ্র দেববর্মার পৌত্র ও ধীরেন্দ্র দেববর্মার পুত্র।

ললিত দেববর্মা ঃ শ্রীযুক্ত ললিত দেববর্মার বাড়ি টাকারজলা হাসপাতালের পাশে। তিনি সি. পি. আই (এম) এবং কমরেড সুধন্বা দেববর্মার ঘনিষ্ঠ কর্মী। তিনি ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। আমার শ্বশুর মশায় শ্রীযুক্ত গণেশ দেববর্মার বন্ধু তিনি।

ললিতা সিং ঃ ললিতা সিংহের বাড়ি সেকেরকোটের কাছে নারায়ণ খামারে। তিনি মৈইতেই মণিপুরী সম্প্রদায়ের। তাঁর স্বামী নবকুমার সিং ছিলেন সি. পি. আই পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। পার্টি ভাগ হলে তিনি এডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার সহযোগী হিসেবে সি. পি. আই-তেই থেকে যান। কমরেড নবকুমার সিং প্রয়াত হলে পর কমরেড ললিতা সিংকে বীরচন্দ্র দেববর্মা নিজের বাড়িতে এনে রাখেন এবং কমরেড ললিতা বীরচন্দ্র দেববর্মার মৃত্যু পর্যন্ত বীরচন্দ্র দেববর্মার সংসারে থেকে পার্টির কর্মীদের দেখাশুনা ও সেবাশুশ্রূষা করতেন। বীরচন্দ্রবাবুর মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর পাশেই ছিলেন। কমরেড ললিতা সিংয়ের মতো বুদ্ধিমতী, বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন মহিলা যেকোনো পার্টিতে বিরল। আমরা সকলে বিশেষ করে আমাদের পরিবার ললিতাদির কাছে চিরঋণে আবদ্ধ।

লোকেন দাস ঃ ত্রিপুরা সরকারের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন ডাইরেক্টর।

লালুবাবু ঃ লালু রায়। লালুবাবু বন্ধুবর অধ্যাপক স্বপনবাবুর স্ত্রীর বড়ো ভাই। তাঁর বাড়ি বর্ধমানের গলসী গ্রামে। তাঁর

সেখানে কয়লার ব্যবসা আছে। খুব সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর নামডাক। লালুবাবু একান্তভাবে কালীভক্ত এবং গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে থাকেন।

ললিতা পিসি ঃ ললিতা দেববর্মা। আমার আপন ছোট পিসি শাশুড়ী এবং গৌরচাঁন ঠাকুরের মেয়ে। তাঁর বিয়ে হয়েছিলো ত্রিপুরা সরকারের পশুপালন বিভাগের কর্মী সুতারমোড়ার নরেন্দ্র দেববর্মার সঙ্গে। পরে নরেন্দ্র দেববর্মা দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে তিনি বাপের বাড়ি হেরেমা গ্রামে ফিরে আসেন এবং স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করে খোরপোষ আদায় করে নেন। তিনি শেষ জীবনে জুম চাষ করে খেতেন এবং তাঁর দু'বিঘে ধানের জমি ভাগাবর্গা দিয়ে কোনোমতে সংসার চালাতেন। আমার ছেলে-মেয়েদের তিনি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। আমার ছেলে-মেয়েরা তাঁদের এই দিদিমাকে 'নানা-খ্যাতি' বলে ডাকতো। তিনি সবসময় তাঁর নিজের ঘরে সোমরস তৈরী করতেন এবং নিজেও খেতেন ও আত্মীয়স্বজনদেরও খাইয়ে আমোদ-ফূর্তি করতেন। আমার এই ছোট পিসি শাশুড়ী হাড়ভাঙা ভালো করার এক অব্যর্থ ওষুধ জানতেন। একবার জঙ্গলে জুম করতে গিয়ে তিনি দেখেন যে একটা পাখি মুখে করে একটা গাছের কাঁচাপাতা-শেকড়বাকড় মুখে করে একটা ছোট্ট গাছের ডালে তার বাসায় এসে বসলো। পাখিটা উড়ে গেল পর তিনি পাখির বাসায় দেখেন একটা পাখির বাচ্চার দু'পা-ই ভাঙা। এবং তার মা লতাপাতা-শেকড়বাকড় বেঁধে দিয়ে গেছে তার দু'পায়ে। ললিতা পিসি সেই পাতা চিনে নেন এবং বাড়িতে কারোর হাড়-গোড় ভেঙে গেলে বা মচকালে তিনি সেই গাছের পাতা ও শেকড়-বাকড়ের জাব তৈরী করে দিয়ে ভালো করতেন।

লাবণ্য দেববর্মা ঃ লাবণ্য দেববর্মার বাড়ি লালসিংমোড়ার কাছে বাথানমোড়া গ্রামে। এলাকার পুরোনো শিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খুব নাম ছিলো। তাঁর মাথায় এক লম্বা শিখা ছিলো। তিনি ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে সি. পি. আই পার্টি করতেন। তাঁর দৌহিত্রী শ্রীমতী মন্দদোরী দেববর্মা লালসিংমোড়া গাঁওসভার সি. পি. আই পার্টির প্রাক্তন চেয়ারপার্সন। লাবণ্যবাবুর নিজের মূল বাড়ির কিছু দূরে মের্তা বাড়িতে একটা বাগান বাড়ি ছিলো এবং সেই বাগান বাড়িতে সুন্দর একটা লেকও ছিলো। সম্পর্কে তিনি হেরমার যোগেন্দ্র দেববর্মার আপন মাসতুতো ভাই এবং আমার দাদাশ্বশুর।

এল ডার্লং ঃ লেনথুয়া ডার্লং। মিস্টার ডার্লং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি কন্ট্রোলার। ডেপুটি কন্ট্রোলার হিসেবে তিনি বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ডার্লং সাহেব তাঁর ডার্লং-মিজো সমাজ নিয়ে ইংরেজীতে গবেষণাধর্মী মূল্যবান একখানা বইও লিখেছেন। তিনি তাঁর মাতৃভাষায় কবিতাও লিখে থাকেন। তিনি বর্তমানে ডার্লং ভাষার একখানা ব্যাকরণ প্রণয়নের কাজে ব্রতী হয়েছেন। ক'মাস আগে তিনি ত্রিপুরা সরকারের প্রতিনিধি হয়ে একটা সাংস্কৃতিক দল নিয়ে জাপানে গিয়েছিলেন এবং প্রায় একমাস ছিলেন সেখানে। জাপানের ভারতীয় দূতাবাসে তাঁর একজন নিকট আত্মীয় চাকুরী করেন। তিনি একজন আই. এফ. এস। এল. ডার্লঙের বাড়ি উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহরের কাছে দারছই গ্রামে।

শিপ্রা চট্টোপাধ্যায় ঃ আমার পরম পূজনীয় অধ্যাপক ও 'ত্রিপুরার ককবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ' এর লেখক ভাষাবিদ ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী। তিনি ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের গবেষণা কাজে ব্রতী ছিলেন। তিনি 'ত্রিপুরার ককবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ' বয়ের প্রকাশক। ডঃ চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হলে তিনি তিনি তাঁর দু'ছেলে নিয়ে আমেরিকাতেই বসবাস করছেন। মিসেস চ্যাটার্জী (শিপ্রা চট্টোপাধ্যায়) ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ পাশ ছিলেন। আত্মীয়তার সূত্রে তিনি ত্রিপুরার শিক্ষাবিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা ডঃ গোবিন্দ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের শালী এবং শ্রীমতী নীরা চ্যাটার্জীর আপন ছোট বোন।

শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ঃ শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ও আমি একই সঙ্গে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ পাশ করেছিলাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আমরা দু'জনই ছিলাম ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের ভাষাতত্ত্বের ছাত্র। তিনিই আমাদেরকে ১৯৬৭ সালের জুনে ত্রিপুরায় পাঠিয়েছিলেন প্রাথমিকভাবে ককবরক ভাষার গবেষণার কাজে 'ডেটা' নিতে। বন্ধুবর শ্যামসুন্দর ও আমি ককবরক ভাষার ৮টি উপভাষাভাষী এলাকায় গিয়ে ক্যাম্প করে তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম ডঃ চ্যাটার্জীর তালিম অনুযায়ী। শ্যামসুন্দর বর্তমানে Language Division of India'র বিরাট অফিসার। এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যান এবং ভাষাবিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাঁর স্ত্রী (আমাদের সহপাঠিনী) ডঃ কৃষ্ণা ভট্টাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics) বিভাগের অধ্যাপিকা।

শম্ভু দেববর্মা ঃ শম্ভু দেববর্মার বাড়ি জম্পুইজলায়। তাঁর সঙ্গে আমরা আমতলীর ভাষাক্যাম্পে কাজ করেছিলাম ককবরক গবেষণার কাজে এসে। পরবর্তীকালে তাঁকে 'ককবরক উন্নয়ন পরিষদ' এর তরফ থেকে কলকাতায় ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় পাঠানো হয়। ডঃ চ্যাটার্জী তাঁর কাছ থেকে ককবরক ভাষার তথ্য সংগ্রহ করতেন। কমরেড মোহন চৌধুরী, অঘোর দেববর্মা ও 'ককবরক উন্নয়ন পরিষদ' এর প্রেসিডেন্ট এডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মা টাকা তুলে শম্ভু দেববর্মাকে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের কলকাতার বাসায় রাখেন।

শক্তমণি কলই ঃ শক্তমণি কলইয়ের বাড়ি জম্পুইজলার বাজারের কাছে। শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ও আমি যখন টাকারজলার আমতলীতে ককবরক ভাষার গবেষণা কাজে ভাষা ক্যাম্প করি, তখন শক্তমণি কলই সেখানে এসে তাঁর কলই উপভাষার

তথ্য দিয়েছিলেন আমাদেরকে। 'কলই' ককবরক ভাষার একটি উপভাষা।

শুভব্রত দেব ঃ শুভব্রত দেবের ডাক নাম রতু। তাঁর সম্পর্কে বিশদভাবে লেখা হয়েছে 'রতু' এই চরিত্র পরিচিতিতে।

শিল্পী পরিতোষ সেন ঃ কলকাতার বিখ্যাত শিল্পী। তিনি প্যারিসে গিয়ে আর্টের কাজ শিখেছিলেন।

শ্যামলাল দেববর্মা ঃ শ্যামলাল দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের কাছে রঙমালা গ্রামে। তাঁর বাবার নাম রমণী দেববর্মা। তাঁর ঠাকুরদা কর্ণেল দেববর্মা ছিলেন এলাকার একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনিই শ্যামলালবাবুকে বাল্যকালে রামায়ণ পড়তে শেখান। পরে এই রামায়ণ পাঠ শ্যামলালবাবুকে খুব সাহায্য করে তার মাতৃভাষা ককবরকের সুলেখক হতে। শ্যামলালবাবু একাধারে কবি, নাট্যকার, ছোট গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক। তাঁর 'বেঙচুনাল' (মাকড়শার জাল) নাটক একসময় বিভিন্ন উপজাতি গ্রামে অভিনীত হতো। তিনি 'আদগু' নামে ককবরকে ছোটগল্প সংকলন করেছেন। শ্যামলালবাবু ককবরক ভাষার দ্বিতীয় ঔপন্যাসিক। তাঁর 'খণ্ড' (গন্ডী) উপন্যাসে ইতিমধ্যে খুব নাম করেছে এবং আমার পুত্র সুরঞ্জন কুণ্ডু চৌধুরী তার বঙ্গানুবাদও করেছে ইতিমধ্যে। শ্যামলাল দেববর্মা ত্রিপুরার সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের একটি বিশেষ নাম। বিশেষ করে তাঁর মাতৃভাষা ককবরকে সাহিত্যিক অবদান অপরিসীম। তিনি সি. পি. আই (এম) পার্টির সংস্কৃতিফ্রন্টের বিশিষ্ট কর্মী। বর্তমানে তিনি ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার।

শৈবাল মিত্র ঃ কলকাতার প্রখ্যাত লেখক। শৈবাল আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু। তিনি আগরতলার বইমেলায় একবার এসেছিলেন। তখন আমরা তাঁকে ত্রিপুরা আদিবাসী মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট অনুরূপা মুখার্জী (দেববর্মা)'র বাড়ি নিয়ে গিয়ে ককবরক ভাষার বিকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম।

শান্তি কুমার দেববর্মা ঃ শান্তিকুমার দেববর্মা সম্পর্কে আমার খুড়তুতো শালা। কাকাশ্বশুর শ্রীযুক্ত বসন্ত দেববর্মার পুত্র। শান্তিকুমার একজন কৃতী টি. ভি মেকানিক। এবং আগরতলা টি. ভি সেন্টারে সে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে।

শচীদি ঃ আগরতলার ভি. এম হাসপাতালের শিশুবিভাগের নার্স। তিনি এডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়ির একাংশ কিনে সেখানে থাকেন।

শ্রীমতী দেব ঃ আগরতলার রাধামোহন একাডেমীর ককবরক ভাষার জনৈকা ছাত্রী।

শান্তনু রায় চৌধুরী ঃ শান্তনু রায় চৌধুরীর বাড়ি আগরতলার আকাশবাণী কেন্দ্রের পাশে। তিনি একজন সংস্কৃতি কর্মী। এবং 'উত্তর-পূর্বাঞ্চল সাহিত্য সম্মেলন' এর একজন সংগঠক। বিশেষ পরোপকারী ও বন্ধুবৎসল হিসেবে আমাদের কাছে শান্তনু খুব প্রিয়।

শ্রীযুক্ত কর ঃ শ্রীযুক্ত করের বাড়ি ধর্মনগরে। তিনি সংসার ত্যাগ করে নবদ্বীপ ধামে স্থায়ীভাবে ধর্মীয় জীবন যাপন করছেন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঃ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আগরতলার বইমেলায় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় একাধিকবার এসেছেন। এবং 'ত্রিপুরা দর্পণ' এর সম্পাদক সমীরণ রায়ের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। একবার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় আরেক কবি পূর্ণেন্দু পত্রীকে নিয়ে আগরতলার বইমেলায় এসেছিলেন।

শ্যামল ভট্টাচার্য ঃ লেখক শ্যামল ভট্টাচার্যের বাড়ি আগরতলার রামনগরে। তিনি ত্রিপুরার একজন কৃতী ছোট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তিনি ভারতীয় আর্মিতে চাকুরী করেন। এবং তাঁর আর্মি জীবনের বিভিন্ন জায়গার অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর লেখা উপন্যাস 'বুখারি' ও 'জমিছলঙ' খুব নাম করেছে। তিনি বর্তমানে পাঞ্জাবে থাকেন। সেখান থেকে তিনি এক দুঃসাধ্য কাজ করেছেন। মূল পাঞ্জাবী ছোটগল্পের বঙ্গানুবাদ করেছেন। এবং তা আগরতলা থেকে 'মুখাবয়ব' সাহিত্য পত্রিকায় ছোট গল্পকার দেবব্রত দেব প্রকাশ করেছেন। এই প্রকাশনার মূল অনুষ্ঠান হয়েছে খোদ পাঞ্জাবেই।

শঙ্কর সেনগুপ্ত ঃ এয়ার লাইন্স কর্পোরেশনের কলকাতা অফিসের পদস্থ অফিসার। তিনি একসময় আগরতলা অফিসের দায়িত্বে ছিলেন। শঙ্করবাবু একজন লেখক।

শুভ বসু ঃ কলকাতার বিখ্যাত কবি। আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু। তখন শুভ বসুকে আমরা রামু বলে ডাকতাম। শুভ বসু সম্ভবত তাঁর ছদ্মনাম। কলকাতায় গেলে কফি হাউসের সাহিত্যিকদের আড্ডায় তাঁর সঙ্গে সবসময় দেখা হয়।

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ঃ আসামের বাঙালী কবি তিনি। কবি হিসেবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তাঁর খুব নাম। তিনি আগরতলার রবীন্দ্র পরিষদের কবি সম্মেলনেও যোগ দিয়েছেন বিশেষ সম্মানিত কবি হিসেবে।

শেখর দত্ত ঃ শেখর দত্ত কলকাতার 'টেলিগ্রাফ' পত্রিকার আগরতলার রিপোর্টার। রিপোর্টার হিসেবে তাঁর খুব নাম। ভালো ইংরেজী লেখার জন্যেও তাঁর খ্যাতি আছে। তিনি একজন সিরিয়াস পাঠক। প্রচীন ভারতীয় শাস্ত্রের ওপর গবেষণামূলক বই তিনি খুব পড়েন। ইতিহাসেও তাঁর খুব জ্ঞান। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলির বিপর্যয়ের কারণের ওপর লেখা বহু বই আছে তাঁর কাছে।

শম্ভু কার্তিক ঃ শম্ভু কার্তিক দেববর্মা। শম্ভু কার্তিক দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের কাছে রঙমালা গাঁওসভায় কমল চৌধুরী

পাড়ায়। তিনি এলাকার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। একসময় তিনি তাঁর এলাকায় ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

শশীকুমার দেববর্মা : শশীকুমার দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের কাছে চাঁদুরাম কপরা পাড়ায়। তিনি সি. পি. আই পার্টির গঠনকালে নাম করা কর্মী ছিলেন। তাঁর বাড়িতে কমিউনিস্ট পার্টির হেড কোয়ার্টার ছিলো ওই এলাকার। শান্তিসেনার সেক্রেটারী জেনারেল কমরেড মোহন চৌধুরী শশীকুমার বাবুদের বাড়ি থেকে তাঁর কাজকর্ম করতেন। পরবর্তীকালে সি. পি. আই (এম) নেতা সমর চৌধুরী ও শশীবাবুর বাড়িতে ছিলেন অনেকদিন ধরে। পরে শশীকুমার দেববর্মা ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক হয়ে যান। তাঁর বড়ো ছেলে গোপাল দেববর্মা একজন সি. পি. আই কর্মী।

শম্পিনী দেববর্মা : শম্পিনী দেববর্মা আমার রামনগরের মামাশ্বশুর শচীন্দ্র দেববর্মার মেয়ে। তার বিয়ে হয়েছিলো চন্তীঠাকুরপাড়ার হরেন্দ্র মাস্টারের ছেলে শচিন্দ্র দেববর্মার সঙ্গে।

শচিন্দ্র : শচিন্দ্র দেববর্মা। বাড়ি হেরমার পাশে গৌর কপরা পাড়ায়। সম্পর্কে সে আমার ভায়রাভাই। আসাম রাইফেলস-এ সে চাকুরী করে।

শচিন্দ্র দেববর্মা : সি. পি. আই নেতা শচিন্দ্র দেববর্মার বাড়ি গোলাঘাটির কাছে পেকুয়ারজলায়। তাঁর মতো নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট কর্মী মেলা ভার। সি. পি. আই পার্টির মূল সংগঠক তিনি। সিপাহীজলা হাইস্কুলে দীর্ঘদিন তিনি কাজ করেছেন। দক্ষ শিকারী হিসেবে তাঁর খুব নাম। স্কুল সেরে বন্দুক নিয়ে তিনি সিপাহীজলার গভীর জঙ্গলে চলে যেতেন বন শূকর ও হরিণ মারতে।

শান্তিকুমার দেববর্মা : শান্তিকুমার দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের কাছে বিখ্যাত চন্তীঠাকুর পাড়ায়। তিনি ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সাবেক নেতা বুদ্ধ দেববর্মার আপন ভাই এবং স্বনামধন্য চন্তীঠাকুরের পৌত্র।

শম্ভু চক্রবর্তী : শম্ভু চক্রবর্তীদের আগে বাড়ি ছিলো হেরমার পাশে রঙমালায়। তাঁর বাবা শচিন্দ্র চক্রবর্তী রঙমালা এলাকায় থেকে পৌরহিত্য ও মাস্টারি করতেন। ১৯৬৭ সালের ভীষণ ঝড়ে দেয়ালচাপা পড়ে নিজের বাড়িতেই মারা যান তিনি। তিনি রুদ্রসাগরের পৌষ সংক্রান্তি উৎসব কমিটির বিশেষ সদস্য ছিলেন। শম্ভু চক্রবর্তীরা ১৯৮০'র দাঙ্গার পরে রঙমালার বাড়ি-ঘরদোর ছেড়ে দিয়ে এখন দক্ষিণ চড়িলামের কামরাজ কলোনীতে থাকেন। শম্ভু চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরে চড়িলাম এলাকায় উপজাতি-বাঙালীদের মধ্যে সি. পি. আই পার্টি করতেন আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে। বর্তমানে ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি করেন। তিনি ককবরক ভাষা ককবরভাষীদের মতো বলতে পারেন।

শঙ্কর দাশ : শঙ্করবাবু আগরতলা কোর্টের একজন নামকরা আইনজীবী। বর্তমানে তিনি আগরতলা পুরসভার মাননীয় চেয়ারম্যান। শঙ্করবাবুর হবি হলো ইতিহাসভিত্তিক বইপড়া ও ডায়েরী লেখা। বুদ্ধিজীবী হিসেবে আগরতলা শহরে তাঁর নাম আছে। সুস্থ সংস্কৃতির জন্যে আগরতলার লেখক-সাহিত্যিকদের সঙ্গে সবসময় কাজ করে চলেছেন তিনি। তাঁর কাছে অনেক দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী-বাঙলা বই আছে।

শ্রীশ দেববর্মা : শ্রীশ দেববর্মা ছিলেন এডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার বর্ষীয়ান মুহুরী। তাঁর বাড়ি ছিলো অভয়নগরে। ভালো দাবাড়ু হিসেবে নাম ছিলো তাঁর। বীরচন্দ্র দেববর্মার সঙ্গে প্রায়ই তাঁকে দাবা খেলতে দেখতাম আমি।

শ্যামল রায় : ডাঃ শ্যামল রায় আগরতলা শহরের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। তাঁর স্ত্রী শিউলী রায় সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে ডাক্তারি পড়ে এসেছিলেন। ডাঃ শ্যামল রায়দের বাড়ি আগরতলার রামনগরে। কর্ণেল চৌমুহনী তাঁর চেম্বার আছে।

শচী দেবনাথ : শচী দেবনাথ সি. পি. আই পার্টির মহিলা নেত্রী। বাড়ি চড়িলামের কামরাজ কলোনীতে। তিনি একসময় সি. পি. আই পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের সদস্যা ছিলেন।

শৈলেশ দেববর্মা : শৈলেশ দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের কাছে মণিরাম ঠাকুর পাড়ায়। তিনি স্বনামধন্য দেবেন্দ্র জমাতিয়ার পৌত্র। শৈলেশ বাবু একসময় সি. পি. আই পার্টি করতেন। সম্পর্কে তিনি আমার পিসশ্বশুর।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী : শ্যামাপদ চক্রবর্তী বর্তমানে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু মূলত তিনি লেখক ও সাংবাদিক। অনেক দিন ধরে তিনি আগরতলার 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। শ্যামাপদবাবুর লেখার হাত ভালো। সমাজের নিপীড়িত ও নির্যাতিত লোকেদের নিয়ে তিনি বেশ ক'খানা উপন্যাস লিখেছেন। তিনি সি. পি. আই (এম) পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মী। শ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে 'একলব্য' সাহিত্য সংস্থা গড়ে তুলেছেন আর যার পেছনে ত্রিপুরার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতা আছে।

শিবদাস বাবু : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবদাস বাবু অবিভক্ত সি. পি. আই পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মী ছিলেন। গায়ক মহেন্দ্র দেববর্মা ও তিনি ত্রিপুরায় আই. পি. টি. এ গড়ে তোলেন। পার্টি ভাগ হলে তিনি সি. পি. আই (এম) এ যোগ দেন এবং ওই পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে কাজ করেন। পরবর্তীকালে মতাদর্শ কারণে তিনি সি. পি. এম. পার্টি ত্যাগ করেন এবং নবগঠিত পি. ডি. এফ. এ যোগ দেন।

শরৎ দেববর্মা : শরৎ দেববর্মার বাড়ি জিরানীয়ার শচীন্দ্রনগর কলোনীর কাছে।

শশী কুমারী ঃ শশীকুমারী দেববর্মা। তিনি হেরমাবাড়ির স্বনামধন্য গৌরচাঁন ঠাকুরের স্ত্রী। আমার শ্বশুর মশায়ের মা। শশীকুমারীর বাপের বাড়ি হেরমার কাছে পুরোনো লেম্বুথলে। তাঁর দাদা ছিলেন পাহাড়ের বিখ্যাত কবিরাজ। আমার এই দিদিশাশুড়ীর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পূর্ববঙ্গের বিশেষ এক সামন্ত পরিবারের লোক। সেখান থেকে তাঁরা ত্রিপুরায় আসেন। শশীকুমারী সম্পর্কে হেরমার যোগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার আপন জ্যাঠতুতো বোন। তাঁর চেহারা ছিলো চোখ জুড়ানো। স্বভাব চরিত্র এবং আচার আচরণে তিনি মানুষের মন কেড়ে নিতেন। সারাদিন তাকে কাজ করতে দেখেছি আমি। তিনি হেরমার অন্যান্যদের সঙ্গে চড়িলামের জঙ্গলে জুম করতেন। আমি ১৯৬৮ সালে তাঁকে চড়িলামের জঙ্গলে জুম করতে দেখেছি। তিনি হেরমা বাজারের কাছে আমার বিয়ের পর আমাকে নিয়ে জুম করেছিলেন। শশীকুমারীর দুই ছেলে আর দুই মেয়ে। ছেলেরা হলেন গণেশ দেববর্মা (আমার শ্বশুর মশায়) ও গোপাল দেববর্মা। বড়ো মেয়ে নলিনী (ডাক নাম নলু) ও ছোট মেয়ে ললিতা। আমার ছেলেমেয়েরা আমার দিদিশাশুড়ীর হাতেই বড়ো হয়েছে।

শিবু ঃ শিবপ্রসাদ সেনগুপ্ত। শিবপ্রসাদ সেনগুপ্ত হলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর ছোট ভাই। তিনি সি পি আই নেতা অঘোর দেববর্মা ও কালা মিঞা মাস্টারের সহপাঠী ছিলেন আগরতলার উমাকান্ত একাডেমীতে।

শিশির দেববর্মা ঃ শিশির দেববর্মার বাড়ি কৃষ্ণনগরের প্রতাপ রায় রোডে। তাঁর পিতা বিখ্যাত ধীরেন্দ্র ক্যাপ্টেন। ধীরেন্দ্র ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেলস এর যোদ্ধা হিসেবে বার্মাফ্রন্টে খুব নাম করেছিলেন। শিশির দেববর্মা ছিলেন উমাকান্ত স্কুলে কমিউনিস্ট নেতা সুধন্বা দেববর্মার ছাত্র। তিনি প্রথম ত্রিপুরা সরকারে এবং পরে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদে উচ্চপদে চাকুরী করে অবসর নেন। আগরতলার বিগত পুরসভার নির্বাচনে তিনি কৃষ্ণনগরের ৬নং ওয়ার্ড থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। শিকারে তাঁর খুব নেশা ছিলো। অন্যান্য শিকারীদের সঙ্গে গিয়ে প্রচুর হরিণ মেরেছেন তিনি। শিশিরবাবু একজন ভোজনরসিক।

শম্ভু চক্রবর্তী ঃ শম্ভু চক্রবর্তীর বাড়ি আগরতলার নাজিরপুকুর পাড়ে। তিনি ছিলেন সি পি আই (এম) পার্টির কর্মচারী নেতা। চাকুরী করতেন ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে। প্রতি নির্বাচনে তাঁর বাড়িতে পার্টির স্বেচ্ছাসেবকদের জন্যে খাওয়ার ব্যবস্থা হতো। শম্ভুবাবু নিজেও রাঁধতেন এবং সকলকে খাওয়াতেন।

শিপ্রা রায় ঃ শিপ্রা রায় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপিকা ছিলেন। বর্তমানে তিনি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অফিসার — এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী। শিপ্রা রায় কবিতা লেখেন। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁর অনেক গুণ। তিনি ত্রিপুরার মহিলা কবিদের নিয়ে একখানা মূল্যবান বইও লিখেছেন।

শ্যামচরণ দাস ঃ আসামের বিখ্যাত রেশম উৎপাদন কেন্দ্র শোয়ালকুছি বাজারের একটি ক্যাসেটের দোকানের মালিক।

শ্যামল চৌধুরী ঃ আমার আপন জ্যাঠতুতো দাদা হিমাংশু কুন্ডু চৌধুরীর মেজো ছেলে। শ্যামল চৌধুরী আমার ভাইপো হলেও আমার থেকে মাত্র দু'বছরের ছোট। আমরা আমাদের পূর্ববঙ্গের সাতক্ষীরার আশাশুনী থানার খাজরা গ্রামে একই সঙ্গে বড়ো হয়েছিলাম একই বাড়িতে। আমরা দু'জনে ছিলাম হরিহরাত্মা। বাল্যের বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে আমার তার সঙ্গে। শ্যামল কলকাতার একটা নামকরা টেকসটাইল ফার্মের বিশেষজ্ঞ। একসময় শ্রমিক আন্দোলনের নেতা ছিলো। তার দুই ছেলে। বড়ো ছেলে কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ার, ছোটছেলে আর জি কর হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ে।

শৈলবালা ঃ সি পি আই (এম) পার্টির নেতা সুধন্বা দেববর্মার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। তিনি ছিলেন ত্রিপুরার উপজাতি সমাজের রাজ আমলের শিক্ষাব্রতী স্বনামধন্য ওয়াখিরাই ঠাকুরের কন্যা শৈলবালা তাঁর পেকুয়ারজলার বাপের বাড়ি থেকে নিজে হাতির পিঠে উঠে শ্বশুরবাড়ি সুতারমোড়ায় আসতেন।

শ্রীদাম ঃ শ্রীদাম দেববর্মা। বর্তমানে তিনি ত্রিপুর উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের শিক্ষা বিভাগের কার্যনির্বাহী সদস্য। শ্রীদামবাবুদের পৈত্রিক বাড়ি সুতারমোড়ার কাছে মরগাঙ বাড়িতে। তাঁর জ্যাঠামশায় সুরেশ দেববর্মা ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিলেন। পরে শ্রীদামবাবুর বাবা ঢাকারজলা জম্পুইজলায় চলে যান। শ্রীদামবাবু শিলংয়ে লেখাপড়া করেছেন। ভদ্র, মার্জিতরুচির মানুষ হিসেবে তাঁর খুব সুনাম আছে। তিনি পূর্বে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির নেতা ছিলেন। বর্তমানে ওই পার্টি ত্যাগ করে আই পি এফ টি পার্টি করেছেন অন্যান্য সহকর্মদের নিয়ে।

শম্ভু রক্ষিত ঃ শ্রীযুক্ত শম্ভু রক্ষিত আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনা করেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপচারিতায় তিনি সকলের নজর কেড়ে নেন। তিনি আগরতলার সুস্থ সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। গায়ক ও আবৃত্তিকার হিসেবেও তাঁর নাম আছে অধ্যাপক রক্ষিত তাঁর বন্ধুদের নিয়ে নন্দলাল কর্তার বাড়ি 'গ্যালারী হীরেনকৃষ্ণ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলেছেন।

শঙ্কর ভট্টাচার্য ঃ শঙ্করবাবু আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের একজন অধ্যাপক।

শ্যামসুন্দর দত্ত ঃ ত্রিপুরা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন সেক্রেটারী। কর্মজীবনে তিনি ত্রিপুরার উপজাতিদের সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললে ত্রিপুরার উপজাতিদের আতিথেয়তা সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়।

শোভা দেববর্মা ঃ শ্রীমতী দেববর্মা বর্তমানে আগরতলা মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল। তিনি একজন সুবক্তা। তাঁর বিয়ে

হয়েছে কর্ণেল বাড়িতে — মহিম কর্ণেলের পরিবারে। বর্তমানে তিনি যে ঘরে থাকেন ঠিক সেই ঘরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আগরতলায় এলে থাকতেন।

শান্তা চক্রবর্তী : জি. বি. হাসপাতালের জনৈকা নার্স।

শুক্লা : শুক্লা দেববর্মা। আমার শ্যালক সুনীল দেববর্মার বড়ো শালীর মেয়ে। সুনীলের বাসায় থেকে আগরতলায় লেখাপড়া করে। তার বাড়ি রঙমালায়।

শুকলাল দেববর্মা : আগরতলা 'দৈনিক সংবাদ' এর প্রভাতী কর্মী।

শক্তিমান ঘোষ : শক্তিমান ঘোষ কলকাতার সি. পি. আই কর্মী। এবং হকার্স ইউনিয়নের নেতা।

শম্ভুকন্যা দেববর্মা : লালসিংমোড়ার কাছে পুরাইবাসা গ্রামের তাঁর বাপের বাড়ি। বিয়ে হয়েছে হেরমা বাড়ি।

শ্যামল চৌধুরী : ত্রিপুরার সি. পি. আই পার্টির প্রথম সারির নেতা ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন উদয়পুর বিভাগীয় পার্টি-সম্পাদক। শ্যামলবাবু সি. পি. আই-এর রাজ্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। কিন্তু মতাদর্শ কারণে সম্প্রতি তিনি সি. পি. আই পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছেন। শ্যামলবাবুর বাবা ছিলেন একজন অগ্রগণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁদের কুমিল্লার বাড়িতে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা যাতায়াত করতেন। শ্যামলবাবু উদয়পুরের লোক। উদয়পুরের বর্ষীয়ান সি. পি. আই নেতা সুনীল দাশ তাঁর আপন মামাতো ভাই। এবং রমেশ হাইস্কুলের ধীরেন দত্ত ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। শ্যামল চৌধুরী একজন রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও লেখক। সম্প্রতি তিনি আগরতলার দৈনিক সংবাদ, ত্রিপুরা দর্পণ প্রভৃতি কাগজে তাত্ত্বিক সব প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। ভারত-পাকিস্তান-বাঙাদেশ এই উপমহাদেশের মৌলবাদের ওপর গত বছর আগরতলার বইমেলায় তিনি একখানি মূল্যবান বই প্রকাশ করেছেন।

শ্যামাচরণ ত্রিপুরা : শ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে ত্রিপুরার রাজনীতির জগতের চাণক্য বলা যেতে পারে। এমন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ক্ষুরধার মেধার রাজনীতিবিদ যেকোনো রাজ্যে বিরল। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির শীর্ষস্থানীয় এই নেতা তাঁর জাতীয়তাবাদী পার্টিকে সবসময় সর্বভারতীয় রাজনীতির মেনস্ট্রীম (mainstream) এ রাখতে বদ্ধপরিকর। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি ভেঙে অনেক দল হয়েছে কিন্তু তিনি তাঁর একান্ত আস্থাভাজন সহকর্মীদের নিয়ে উপজাতিদের বহু আশা আকাঙ্ক্ষার এই পার্টিকে অটুট রেখেছেন। শ্যামাচরণ বাবু বর্তমানে উপজাতি যুব সমিতির উপদেষ্টা মন্ডলীর চেয়ারম্যান এবং তাঁর পার্টির বিধায়ক। রাজনীতিবিদ শ্যামাচরণ ত্রিপুরার রাজনৈতিক সত্তার পাশাপাশি সাহিত্যিক সত্তাও রয়েছে। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের একজন অতি উচ্চশ্রেণীর লেখক। তিনি লেখালেখি করেন বাঙলায়। তাঁর মনোমুগ্ধকর অতীব জনপ্রিয় লেখা 'চরণ চন্তাইয়ের ঝুলি' সমানে আগরতলার 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় বেরিয়ে চলেছে। চরণ চন্তাইয়ের ঝুলির ভেতর যে কত বিষয় আছে তা ভেবে পারা যায় না। রাজনীতি-সমাজনীতি-সংস্কৃতি-ধর্ম সব বিষয়ই চরণ চন্তাইয়ের ঝুলির ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে। চরণ চন্তাইয়ের ঝুলির মিঠেকড়া নিবন্ধ না পড়লে যেন পাঠকদের ভাত হজম হতে চায় না। তাঁর 'শূদ্রজাগরণ' নামে ইতিমধ্যে একখানি বইও প্রকাশিত হয়েছে। শ্যামাচরণবাবু উত্তর ত্রিপুরার ময়নামার লোক। বি. এ পাশ করে তিনি প্রথমে শিক্ষকতা করেছেন। ভারতীয় রেল বিভাগেও একসময় চাকুরী করেছেন বলেও জানা যায়। তারপর সব ছেড়ে ছুড়ে রাজনীতি ও লেখালেখিতে আত্মসমর্পণ করেছেন। শ্যামাচরণবাবু নাকি খুব ভোরে একপেট গরম ভাত খেয়ে নিয়ে লিখতে বসেন এবং অন্য কোনো কাজ না থাকলে লিখেই চলেন। ত্রিপুরা বিধানসভার গ্রন্থাগার থেকে তিনিই সব থেকে বেশী বই নিয়ে পড়াশুনা কবেন বলে শোনা যায়। শ্যামাচরণবাবু সম্পর্কে একটা গল্প আছে। জোট সরকারের আমলে তিনি যোজনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। থাকতেন ৭৯ টিলার এক পেল্লাই সরকারী ভবনে। তখন তিনি নাকি একটা বাঘের বাচ্চা পুষে ছিলেন। সেই বাচ্চা একদিন লোকালয়ে বেরিয়ে গিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলো। শ্যামাচরণবাবু ত্রিপুরার উপজাতি-বাঙালীর মধ্যে ভারসাম্যের এক সেতু বিশেষ।

শুভাশিস তলাপাত্র : শুভাশিস তলাপাত্র আগরতলা হাইকোর্টের একজন প্রখ্যাত আইনজীবী। কিন্তু তাঁর পরিচয় বোধ হয় সাহিত্য শিল্পাঙ্গনেই সব থেকে বেশী। সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে তাঁর গতায়ত। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র হওয়ায় তাঁর লেখাপড়ার পরিধিও একটু বেশী। বেশী তাঁর দেশী-বিদেশী বইয়ের সংগ্রহও। আবার বামপন্থী রাজনীতির জগতে পদচারণা থাকায় মার্ক্সবাদী তত্ত্ব ও সাহিত্যের এক নিষ্ঠাবান পাঠক তিনি। ছোট গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, কবি কতই না পরিচয় তাঁর। চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁর খ্যাতি। ছদ্মনামে কত যে বইয়ের প্রচ্ছদপট এঁকেছেন তিনি তা তাঁর কাছের লোকেরাই জানেন। তিনি পদ্মা-গোমতীরও একজন কর্ণধার হয়ে ভারত ও বাঙলাদেশের মৈত্রীর সন্ধানে কাজ করে চলেছেন।

সীতানাথ সিংহরায় : তিনি ছিলেন আগরতলার স্বনামধন্য মহিম কর্ণেলের জামাই রেণুকাপ্রভার স্বামী। তাঁর পূর্বে বাড়ি ছিলো পশ্চিমবঙ্গের কাঁচড়াপাড়ার কছে ফতেপুরে। তিনি আই. এ পাশ ছিলেন। বিয়ের পরে আগরতলায় এসে থাকেন এবং তখনকার বিজয়কুমার পাঠশালায় শিক্ষকতা করেন। সীতানাথ বাবু নব্বই বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন।

সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা : সোমেন্দ্র চন্দ্রের ডাক নাম ছিলো রেণু সাহেব। তিনি ছিলেন মহিম কর্ণেলের ছেলে। তিনি আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাশ করে এসে রাজন্য ত্রিপুরায় শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব নেন। তিনি ত্রিপুরার 'সেনসাস বিবরণী' সম্পাদনা করে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। আগরতলা উষা ক্যাপ্টেনের মেয়ে পঙ্কজা দেববর্মা

সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার মেয়ে।

সুহাস চট্টোপাধ্যায় ঃ ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা প্রফেসর ছিলেন। পড়াতেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে। এর পূর্বে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসিট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে অধ্যাপনা করতেন। তিনি ছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেনের কৃতী ছাত্র। ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমার পূজনীয় অধ্যাপক। তাঁর সঙ্গে আমি ককবরক ভাষা গবেষণার কাজ করি। তাঁর বিখ্যাত বই হলো ঃ 'ত্রিপুরার ককবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ'।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ ভাষাচার্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বইয়ের নাম ঃ ও‌ঃ ডি. বি. এল (The Origin and Development of the Bengali Language)। তিনি জাভা সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ছিলেন।

সুকুমার সেন ঃ ডঃ সুকুমার সেন। বিশিষ্ট ভাষাবিদ এবং বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক। তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' এখানা অতি বিখ্যাত বই। তিনি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের ভাষাচার্য সুনীতিকুমার ও ডঃ তারাপোরওয়ালার ছাত্র। পববর্তীকালে তিনি ওই বিভাগের অধ্যাপক হন এবং খয়রাপ্রফেসরের পদ অলঙ্কৃত করেন।

সুশ্রুত চট্টোপাধ্যায় ঃ আমার পূজনীয় অধ্যাপক ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। বর্তমানে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

সুধীর চ্যাটার্জী ঃ পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির নিষ্ঠাবন কর্মী। এবং All India Council for Man Education and Development-এর সাধারণ সম্পাদক। সুধীর চাটার্জীরা ব্রাহ্ম সমাজের লোক। ব্রাহ্ম সমাজের দিকপাল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ঠাকুরদাদা।

সুকুমার দেববর্মা ঃ সুকুমার দেববর্মার বাড়ি জম্পুইজলায়। তিনি ১৯৬৭ সালের জুনে টাকারজলা আমতলীতে ককবরক ভাষা ক্যাম্পে আমাদের পুরান ত্রিপুরী উপভাষার তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। পরে তাঁকে কলকাতায় ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের কলকাতায় পাঠানো হয় তাকে ককববক ভাষা গবেষণার কাজে তথ্য সরবরাহ করতে।

সুরেশ চন্দ্র দেববর্মা ঃ সুরেশ চন্দ্র দেববর্মার বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরার সাবরুমে। তিনি নোয়াতিয়া সম্প্রদায়েব লোক। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে আমি যখন বাইখোয়ার কাছে পূর্বচড়কবাই গ্রামে ককবরক ভাষা গবেষণা কবি তখন তিনি সেখানে এসে আমাকে ককবরকের নেয়াতিয়া উপভাষার তথা সরবরাহ কবেছিলেন।

সোনারাম দেববর্মা ঃ সোনারাম দেববর্মার বাড়ি বিশ্রামগঞ্জের খেঙরা বাড়ি এলাকায়। ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন খেঙরাবাড়ির চন্দ্র কুমার দেববর্মার বাড়িতে ককবরক ভাষার গবেষণার কাজ করি তখন সোনাবাম বাবুর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। তিনি সি. পি. আই নেতা অঘোর দেববর্মার একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

সাহানা সেনগুপ্ত ঃ সাহানা সেনগুপ্তরা আগরতলার রাজ আমলের লোক। তার পিতা হরেন্দ্র সেন চৌধুরী উমাকান্ত একাডেমীর শিক্ষক ছিলেন। বিশিষ্ট কৃষিবিদ শ্রীযুক্ত সেন চৌধুরীর দিদি তিনি। সাহানা দেবী ত্রিপুরা সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষিকা ছিলেন। অবসর গ্রহণেব পর তিনি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। তিনি All India Council for Mass Education and Development-এর ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের সেক্রেটারী ছিলেন এবং এখনো ওই সংস্থার একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি সি. পি. আই পার্টির প্রথম সারির কর্মী। সি. পি. আই-এর গণসংগঠন সারাভারত মহিলা ফেডারেশন ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের সাধাবণ সম্পাদিকা। তিনি ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্যাও। তিনি বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর স্ত্রী।

সমীরণ রায় ঃ আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক। কলকাতার লেখক শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। এবং তিনিই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁদেরকে আগরতলায় আনেন। তিনি তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে 'ছন্দনীড়' বলে একটি রাবীন্দ্রিক সংস্থা গঠন করেছেন। ২৫শে বৈশাখে খুব ঘটা করে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে এই সংস্থার পক্ষ থেকে নানারকম অনুষ্ঠান করা হয়। সমীবণ রায় 'রাজধানী আগরতলা'র ও সম্পাদক। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু মূল্যবান লেখা ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বন্ধু বৎসল ও পরোপকারী বলে আগরতলায় সমীরণের খুব খ্যাতি।

সুরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরী ঃ আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। শ্রীমান সুরঞ্জন ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করে বর্তমানে আগরতলার রামঠাকুর কলেজে পড়ায় 'পার্ট-টাইম শিক্ষক' হিসেবে। এছাড়া সে আগরতলার আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে তার মাতৃভাষা ককবরকে খবর পড়ে থাকে ক্যাজুয়াল কর্মী হিসেবে। সে 'জরা' (সময়) নামে ককবরক ভাষায় একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে। সে ইতিমধ্যে শ্যামলাল দেববর্মা লিখিত 'খণ্ড' (গন্ডী) এই ককবরক উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ করে ফেলেছে। সুরঞ্জন একজন তরুণ কবি।

সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ডঃ সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরার জিরানীয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের জিওলজির অধ্যাপক। সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত কবি এবং কবি গড়ার কারিগর। তিনি আগরতলায় তরুণ কবিদের একত্রিত করে তাঁদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি 'কলকাতা ও আগরতলা' থেকে স্পন্দন পত্রিকা সম্পাদনা করছেন।

এই সাহিত্য পত্রিকা ত্রিপুরার ককবরক ভাষা ও সাহিত্যের ওপর অনেক লেখা বেরিয়েছে। ককবরক ভাষার অনেক ছোটগল্পের ও বঙ্গানুবাদ বেরিয়েছে তাঁর পত্রিকায়। সত্যেন বাবু একজন অতি উঁচুমাপের কবি। তাঁর বিখ্যাত কবিতার বইগুলো হলো : লক্ষ চোখের সামনে (১৯৭৩), কী আছে এই হাতের মধ্যে (১৯৭৫), শব্দে গরখানা (১৯৭৭), চলে মানুষের ছায়া (১৯৮৫), অনন্ত মুহূর্তের কবিতা ও কবিতার মুহূর্ত (১৯৮৭), প্রেমের কবিতা (১৯৮৯), ভালোবাসার চাতাল জুড়ে (১৯৯৩), সোজা কথার সহজ পাঠ (১৯৯৭), রক্ত ও শরীর সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য (যন্ত্রস্থ) ও শব্দভেদী বাণ যায় নরকে (১৯৯৮)। এছাড়া কবি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি অনূদিত ও সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ রয়েছে।

সারদা রায় : সারদা রায় তেলিয়ামোড়ার সব থেকে ধনাঢ্য ব্যক্তি। পাহাড়ের ধান, তিল ও কার্পাসের একচেটিয়া ব্যবসা ছিলো এই পরিবারের। পাহাড়ের উপজাতিদের কাছে টাকা লগ্নি করে ও তাদের কাছ থেকে কম পায়সায় জুমের শষ্যাদি ক্রয় করে সারদা রায়দের পরিবার বড়ো হয়েছে। আমবাসা, কমলপুর প্রভৃতি জায়গায় তাদের আরও আছে। কংগ্রেস-কমিউনিস্ট এই দু'পার্টিকে নির্বাচনের সময় সারদা রায় বিজয় রায়েরা টাকা ও গাড়ি দিয়ে সাহায্য করতেন।

সুমন দেবরায় : আগরতলার প্রখ্যাত স্টুডিও 'স্টুডিও ক্লিক' এর মালিক শ্রীযুক্ত দিলীপ দেবরায়ের কৃতী আলোকচিত্রশিল্পী পুত্র।

সুভাষ দেববর্মা : বাড়ি চড়িলামের কাছে হেরমা গ্রামে। তিনি একজন গ্রাজুয়েট। চাকুরী করেন ব্যাঙ্কে। সম্প্রতি তিনি খ্রীষ্টান হয়ে গেছেন। সম্পর্কে তিনি আমার খুড়শ্বশুর।

সেনাপতি : সেনাপতির ভালোনাম বিপ্লব দেববর্মা। হেরমা গ্রামের স্বনামধন্য যোগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার দৌহিত্র। তার বাবা রেণু দেববর্মা সুতারমোড়া থেকে হেরমায় জামাই উঠেছে। বিপ্লব হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কম্পাউন্ডার হিসেবে ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে চাকুরী করে। একসময় সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলো।

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ : কলকাতার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। তিনি মনে করেন পূর্ববঙ্গের বাঙালীদের মধ্যে উলুধ্বনি এসেছে আরবদেশের ট্রাইবেলদের কাছ থেকে।

সেনকুমার দেববর্মা : সেনকুমার দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের কছে মণিরাম ঠাকুর পাড়ায়। তিনি একজন প্রবীণ সি. পি. আই কর্মী। সি. পি. আই-এর ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের সদস্যও ছিলেন একসময়। এমন অদ্ভুত দর্শন উপজাতি কমিউনিস্ট কমই দেখা যায়।

সন্তোষ রায় : সন্তোষ রায়ের বাড়ি আগরতলার রামনগরে। তিনি একজন শিক্ষক। কিন্তু সন্তোষ রায়ের মূল পরিচয় তাঁর লেখক সত্তার জন্যে। তিনি কবি, ছোটগল্পকার ও প্রাবন্ধিক। একসময় 'উত্তর-পূর্ব' নামে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতেন। 'উত্তর-পূর্ব সাহিত্য সম্মেলন' এর মূল সংগঠকদের মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত সন্তোষ রায়।

সন্ধ্যা : সন্ধ্যা পাল। বিয়ের পরে হয়েছে সন্ধ্যা মজুমদার। সে আমার বারাসতের ছোটদি শ্রীমতী নীলিমা পালের বড়ো মেয়ে। সন্ধ্যার স্বামীর নাম আনন্দ মজুমদার।

স্বপন বসু : ডঃ স্বপন বসু। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলাবিভাগে অধ্যাপনা করেন। সতী, সমকালে বিদ্যাসাগর, বাঙলায় নবচেতনার ইতিহাস প্রভৃতি বই লিখে তিনি খুব খ্যাতি অর্জন করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। স্বপন বসু আমার কলেজ জীবন থেকে বন্ধু। আমি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তাদের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করেছি। এখনো কলকাতায় গেলে বন্ধুবরের বালিগঞ্জের বাড়িতে থাকে।

সরস্বতী দি : ডঃ সরস্বতী মিশ্র। সরস্বতী মিশ্র বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমার থেকে এক বছরের সিনিয়র। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে আমাদের আগের বার এম. এ পাশ করেছিলেন। আমি তাঁদের বালির দাওনাগাজী রোডের বাড়িতে গিয়ে নিয়মিতভাবে পড়াশুনো করতাম। আমাদের দু'জনের মধ্যে ভাইবোনের সম্পর্ক। সরস্বতী দি আমার বিয়ের পর থেকে আমাদের পরিবারের সকলকে জামা-কাপড় কিনে দেয়। আপদে-বিপদে অর্থ সাহায্য তো আছেই। কর্মজীবনে সরস্বতী দি সরকারী কলেজের সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান। বাঙলা ব্যাকরণের ইতিহাসের ওপর একখানা অতি মূল্যবান গবেষণামূলক বই আছে ডঃ সরস্বতী মিশ্রের।

সুকুমারী ভট্টাচার্য : সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপিকা। প্রচীন ভারতীয় সাহিত্যে নারীর ভূমিকা নিয়ে তাঁর মূল্যবান বই আছে।

সত্যপ্রসাদ কুন্ডু চৌধুরী : আমার আপন খুড়তুতো দাদা। আমাব ছোটকাকা হেমেন্দ্র কুন্ডু চৌধুরীর বড়ো ছেলে। কলেজের পড়াশুনো শেষ করে তিনি ভারতীয় আর্মিতে যোগ দেন। এখন থাকেন বারাসতের ন'পাড়ায়।

সুকুমার রায় : সুকুমার রায়ের বাড়ি বাঙলাদেশ। বাঙলায় এম. এ পাশ করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্যে কলকাতায় আসেন এবং অধ্যাপক স্বপন বসুর বাড়িতে থাকতেন। মাইকেল মধুসূদনের ওপর তিনি একখানা বৃহৎ কলেবরের বই সম্পাদনা করেছেন।

সনকা : অধ্যাপক স্বপন বসুর বাড়ির কাজের মেয়ে।

সুধাংশু বাবু : কলকাতার 'দেজ' পাব্লিকেশনের কর্ণধার।

সুরেন্দ্র দেবনাথ ঃ সুরেন্দ্র দেবনাথ বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর মেমোরিয়াল সোসাইটির ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক। এই সংগঠনের সভাপতি হলেন শ্রীযুক্ত অবনীমোহন রায়। এই সংগঠনের কাজ হলো ত্রিপুরা রাজ্যে সকলের মধ্যে বিশেষ করে পশ্চাদপদ জাতি-উপজাতির মধ্যে ভারতীয় সংবিধানের জনক বাবাসাহেব আম্বেদকরের দর্শন প্রচার করা। অসবর্ণ ও অসধর্ম বিয়ের আয়োজন করে থাকে এই সংগঠন। সুরেন্দ্র দেবনাথ পূর্বে সি. পি. আই (এম) পার্টি করতেন। বর্তমানে সি. পি. আই পার্টির সঙ্গে যুক্ত। তিনি ও. বি. সি'র নেতাও বটে।

সত্যেন পাল ঃ অধ্যাপক সত্যেন পাল ঃ তিনি পশ্চিমবঙ্গের রারুইপুরের লোক। দীর্ঘদিন তিনি আগরতলার রামঠাকুর কলেজে পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক ছিলেন। গবেষণার ব্যাপারে তাঁকে যোগেশচন্দ্র বাগলের কাছে যেতে দেখেছি আমি।

সুনীল দেববর্মা ঃ সুনীল দেববর্মা ককবরক ভাষার একজন প্রথম সারির ছোটগল্পকার। তাঁর 'বুছু' (কাঁটা) ককবরক ভাষার ছোটগল্পের এই সংকলনটি খুবই নাম করেছে। তিনি ককবরক ভাষায় কবিতাও লেখেন। সম্পর্কে সুনীল আমার শ্যালক। বাড়ি হেরমা।

সুরেন্দ্র দেববর্মা ঃ সুরেন্দ্র দেববর্মা 'ট্রাইব্যাল লেঙ্গুয়েজ সেল' এর ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। তিনি ত্রিপুরার গড়িয়া পুজোর ওপর বিভিন্ন উপজাতীয় লেখকদের লেখা নিয়ে একখানা অতি মূল্যবান বই সম্পাদনা করেছেন। তিনি সাবরুমের নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের লোক। তাঁর স্ত্রী বাঙালী, কলকাতার মহিলা।

সুজিত চক্রবর্তী ঃ আগরতলা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারী। সুজিতবাবু একজন নামকরা সাংবাদিক। বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজারের কাছে।

সাধন শীল ঃ সাধন শীলের বাড়ি উত্তর চাঁড়লামে। তিনি চড়িলামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। গ্রামীণ সালিসী বিচারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সুভাষ দেববর্মা ঃ সুভাষ দেববর্মার বাড়ি লালসিংমোড়ার কাছে সুরাইবাসা গ্রামে। সে আমার পিসতুতো শ্যালক। চাকুরী করে ভারতীয় আর্মিতে।

সূর্যমুখী দেববর্মা ঃ সূর্যমুখী দেববর্মার বাড়ি বিশ্রামগঞ্জের আমতলীতে। তিনি সি. পি. আই (এম) পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ মহিলা কর্মী। আশির জাতি দাঙ্গায় সূর্যমুখীদের ঘরবাড়ি সবই পুড়ে গিয়েছিলো। সূর্যমুখী দেবী সম্পর্কে আমার পিসশাশুড়ী।

সমীর ঃ সমীর দাস। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের ছাত্র। পরে সে আমার কাছে ককবরক সার্টিফিকেট কোর্সে পড়াশুনো করে। সমীরদের বাড়ি উদয়পুরের বাগমায়।

সুধন্বা দেববর্মা ঃ ত্রিপুরা জনশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি হেমন্ত দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা, ডাঃ নীলমণি দেববর্মা ও দশরথ দেবকে নিয়ে ত্রিপুরায় রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার শেষলগ্নে উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্যে জনশিক্ষা সমিতি গড়ে তোলেন এবং পরবর্তীকালে সি. পি. আই পার্টিতে যোগ দেন এবং একাধিকবার বিধায়ক নির্বাচিত হন। সি. পি. আই -এর বিভাজনের পর তিনি সি. পি. আই (এম) পার্টিতে যোগ দেন। তিনি ত্রিপুরার প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের অধ্যক্ষ ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভায়। পরবর্তীকালে তিনি বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। সুধন্বা দেববর্মা ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন পুরোধা পুরুষ। রাজনীতির বাইরে তিনি ককবরক ভাষার সাহিত্য চর্চাও করতেন। ১৯৫৪ সালে তিনি 'কৃতাল কথমা' (নবসাহিত্য) নামে ককবরক ভাষায় প্রথম সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি ককবরক ভাষার প্রথম ঔপন্যাসিক। চারখন্ডে তিনি 'হাচুক খুরিঅ' (পাহাড়ের পাদদেশে) উপন্যাস লিখেছেন। যার প্রথম খন্ডের বঙ্গানুবাদ ইতিমধ্যে আগরতলার 'অক্ষর' প্রকাশনী প্রকাশ করেছে। অনুবাদের কাজ করেছি আমি। 'হাচুক খুরিঅ' ছাড়া 'চেথুয়াং' (ছাতিমগাছ) নামে ত্রিপুরার রূপকথা ভিত্তিক আরেকখানি উপন্যাস লিখে গেছেন তিনি। সুধন্বা দেববর্মা রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকও ককবরক ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর ককবরক -বাংলা মিশ্রিত 'এগিয়ে চলো' নাটক একসময় জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলো।

সমীরঞ্জন দেববর্মা ঃ সমীরঞ্জন দেববর্মা সি. পি. আই-এর একজন প্রবীণ কর্মী। তাঁর বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ বাজারের পাশে তুইচাকমা গ্রামে। তিনি বিশ্রামগঞ্জের স্বনামধন্য মানিক দেববর্মার ছোট ভাই। বিশ্রামগঞ্জের বৃহৎ বাজারটি সমীরঞ্জন বাবুদের টিলার ওপর গড়ে উঠেছে। বিশ্রামগঞ্জের আদিবাসী কলোনীর উত্থান-পতনের ইতিহাসের অনেক তথ্য তিনি জানেন।

সুধন্বা দেববর্মা ঃ সুধন্বা দেববর্মা বা সুধন দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের রামনগরে। তিনি সি. পি. আই (এম) পার্টির একজন প্রবীণ কর্মী। তাঁর বাড়িতেই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির আমলে থেকে সব নেতা গিয়ে থাকতেন এবং ওই এলাকায় মিটিং করতেন। সুধন্বা বাবু সম্পর্কে আমার বড় ভায়রা ভাই। আমার বড় মাশাশুশ্বরের মেয়ে পরিমলদির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে।

সুবোধ দেববর্মা ঃ সুবোধ দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের রামনগর গাঁওসভার বাজারের কাছে। সুবোধ দেববর্মার ডাকনাম ক্যাপ্টেন। সে সি. পি. আই (এম) পার্টির একজন মিলিট্যান্ট যুব কর্মী। তার ভয়ে ওই এলাকার সব তটস্থ থাকে।

সুনীলবাবু (সুনীল দেববর্মা) সুনীল দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের ধ্বারিয়াথলে। তিনি সি. পি. আই (এম)-এর তাত্ত্বিক

নেতা গদাধর দেববর্মার বড়ো ছেলে। সুনীলবাবু বি. এ পাশ, লাটিয়াছড়ার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর স্ত্রী তুলসী দেববর্মা সি. পি. আই (এম)-এর নামকরা মহিলা কর্মী। তিনি একসময় ধারিয়াথল গাঁওসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। সুনীলবাবু সম্পর্কে আমার স্ত্রীর দাদা, তাঁর পিসিমার ছেলে।

সুশীল দেববর্মা : সুশীল দেববর্মার বাড়ি লালসিংমোড়ার কাছে নতুন লেম্বুথল গ্রামে। এই গ্রামের লোকেরা যখন কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতিতে চলে যান। তখন সুশীল বাবুই ছিলেন একমাত্র বামপন্থী কর্মী সেখানকার। তিনি ত্রিপুরা সরকারের চাকুরী করেন।

সুরেন্দ্র দেববর্মা : চড়িলামের কাছে প্রখ্যাত চন্ডীঠাকুর পাড়ায় তাঁর বাড়ি। তিনি চন্ডীঠাকুরের ছেলে।

সমর চৌধুরী : ত্রিপুরার প্রথম সারির সি. পি. আই (এম) নেতা সমরবাবু। তিনি বিগত বামফ্রন্ট সরকারগুলোর মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে লোকসভার সদস্য। সমরবাবুর আসল নাম সমররঞ্জন বক্সী। ত্রিপুরায় তাঁকে সকলে সমর চৌধুরী বলে জানেন। পঞ্চাশের দশকে ত্রিপুরায় এসে তিনি কমিউনিস্ট সংগঠনে কাজকর্ম শুরু করেন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে। একসময় তিনি চড়িলামের হেরমা-ধারিয়া-রামনগর- সুতারমোড়ায় উপজাতি এলাকায় থেকে পার্টি করেছেন। পরে তিনি সোনামোড়ায় গিয়ে স্থায়ীভাবে সেখানে উপজাতি-বাঙালীর মধ্যে পার্টি গড়ে তোলেন। চড়িলাম ও সোনামোড়ার বৃহত্তর উপজাতি এলাকায় সমর চৌধুরী খুবই জনপ্রিয়। কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে সীমাহীন দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁকে অনেকসময় দিন কাটাতে হয়েছে। তাঁর মতো নিষ্ঠাবান ও পোড়খাওয়া জননেতা ত্রিপুরায় কমই আছেন। সমর চৌধুরীর ছোট ভাই চিত্তরঞ্জন বক্সী সি. পি. আই পার্টির মধ্যপ্রদেশের রাজ্য কমিটির সেক্রেটারী এবং সি. পি. আই-এর জাতীয় পরিষদের সদস্য।

সন্তোষ দাস : সন্তোষ দাসের বাড়ি উত্তর চড়িলামের পরিমল চৌমুহনীর কাছে ফকিরমোড়ায়। একসময় তিনি দক্ষিণ চড়িলাম গাঁওসভার প্রধান ছিলেন।

সুদীপ বসু : ডঃ সুদীপ বসু প্রথম জীবনে কমলপুর কলেজের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হন। বর্তমানে ডঃ বসু বিশ্বভারতীর বাঙলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। তিনি আমার পূজনীয় অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর বড়ো ছেলে।

সুয়োকর্ণ : ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট।

সুহার্ত্ত : ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট। তিনি ইন্দোনেশিয়াব কমিউনিস্ট নিধনের হোতা ছিলেন।

সহিদ চৌধুরী : সহিদ চৌধুরী সি. পি. আই (এম) পার্টির একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও জননেতা। তিনি সোনামোড়া বিভাগের লোক। তিনি বক্সনগর থেকে একবার এম. এল. এ হয়েছিলেন।

সূর্য চক্রবর্তী : আগরতলার কৃষ্ণনগরের সুপুরিবাগানে সূর্য চক্রবর্তীদের রাজ আমলের বাড়ি। সূর্যবাবু ছিলেন ভীষণভাবে নেতাজী ভক্ত। তিনি এডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার খুব স্নেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি কাউকেও ছেড়ে কথা বলতেন না। সেজন্যে সকলে বলতেন সূর্য চক্রবর্তীর মুখ খুব খারাপ।

সোমনাথ লাহিড়ী : পশ্চিমবঙ্গের সি. পি. আই নেতা। তিনি পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের সায়ত্ত শাসন মন্ত্রী ছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন পুরোধা পুরুষ।

সমীর বর্মণ : ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও জাতীয় কংগ্রেসের একজন প্রথম সারির রাজ্যনেতা তিনি প্রায় বরাবরই বিশালগড় থেকে ত্রিপুরা বিধানসভায় নির্বাচিত হন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রশাসনিকভাবে তিনি খুবই দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি আগরতলা কোর্টের একজন প্রভাবশালী প্রবীণ আইনজীবী। তাঁর পিতা বিখ্যাত আইনজীবী সুধীর বর্মণ।

সহদেব কর্তা : মহারাজ কুমার সহদেব বিক্রম দেববর্মণ। তিনি ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন রাজা মহারাজা বীরবিক্রমের কৃতী পুত্র। তিনি উচ্চ শিক্ষা নিয়ে স্বউদ্যোগে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তাঁর গবেষণার ভান্ডারে প্রচিন ত্রিপুরার অমূল্য তথ্যরাজি আছে। এইসব অমূল্য সম্পদের জন্যে তাঁর কাছে বহু অধ্যাপক ও গবেষক আসেন এবং তাঁর কাছ থেকে তথ্য নিয়ে তাঁদের ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্তির কাজে লাগান। ডঃ জগদীশ গণ চৌধুরী তাঁর একজন আস্থাভাজন পাত্র। তাঁর সঙ্গে যৌথভাবে সহদেব কর্তা প্রচিন ত্রিপুরার কিছু মূল্যবান সাহিত্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। এর মধ্যে 'কৃষ্ণমালা' অন্যতম। মহারা কুমারের ভান্ডারে হাতে লেখা অনেক পুঁথিও আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতের হাতে লেখা পুঁথি আমি তাঁর সংগ্রহশালায় দেখেছি। সহদেব কর্তা একজন কৃতী ভাস্কর। আগরতলার প্যালেসের অভ্যন্তরে তাঁর সুরম্য অট্টালিকার সামনে তাঁর ভাস্কর্যকর্মের বহু নিদর্শন রয়েছে। আগরতলার রাজভবনের কাছে গান্ধী মূর্তিটি তাঁরই হাতে তৈরী বলে জানা যায়। সহদেব বিক্রম দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। তিনি ভষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়েরও সান্নিধ্য লাভ করেছেন। বিখ্যাত অভিনেতা ও মুদ্রা বিশেষজ্ঞ ছিলেন তাঁর অকৃত্রিম সুহৃদ। বসন্তবাবু ত্রিপুরায় এলেই সহদেব কর্তার সংগ্রহশালায় চলে আসতেন। কর্তার সংগ্রহশালায় দুষ্প্রাপ্য একাধিক অতি মূল্যবান গণেশের মূর্তি আছে। গণেশের মূর্তি সংগ্রাহক বসন্ত বাবু ওই মূর্তি বারবার দেখতে আসতেন। সহদেব বিক্রমের কাছে চাকলা রোশনাবাদ সম্পর্কে অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্যও রয়েছে। ত্রিপুরার রাজ আমলের শেষলগ্নের ইতিহাসের অনেক গোপন কথা

কর্তা বাহাদুর জানেন। তাঁর দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহশালার একটা ক্যাটালগ করা খুব প্রয়োজন। সহদেব কর্তার মতো তন্ত্র শাস্ত্র সম্পর্কে এমন পারঙ্গম ব্যক্তি যেকোনো রাজ্যে বিরল তাঁর কাছে তন্ত্র শাস্ত্রের অমূল্য খনি আছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তন্ত্রশাস্ত্র কীভাবে উদ্ভূত হয়ে সারা ভারতে বিস্তারলাভ করেছিলো সে-সম্পর্কে অমূল্য সব তথ্য আছে ত্রিপুরার এই রাজকুমারের ভান্ডারে।

সবিতা ঃ সবিতা দেববর্মা। ত্রিপুরার প্রাক্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মনোমোহন দেববর্মার মেয়ে। সে বিয়ে করেছে হরলাল দেবনাথকে। হরলাল দেববর্মা এডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার বাড়ি মানুষ হয়েছে।

সুরেশ দেববর্মা ঃ সুরেশ দেববর্মার বাড়ি অভয়নগরে। তিনি কীর্তন গায়ক। অ্যাডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার শ্রাদ্ধবাসরে তিনি কীর্তন পরিবেশন করেছিলেন।

সুখেন্দু দেববর্মা ঃ অ্যাডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মার মুহুরী। তাঁর এক ভাই বোম্বে শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন মারাঠী মেয়ে বিয়ে করে।

সুকুমার দাস ঃ আগরতলার জি. বি. হাসপাতালের ডাক্তার।

সুধন্য দেববর্মা ঃ আগরতলার জি. বি. হাসপাতালের জনৈক ডাক্তার।

সুরদিতা ঃ সুরদিতা দেববর্মা। সুরদিতার বাড়ি বিশ্রামগঞ্জের আদিবাসী কলোনীর পাশে। সে বর্তমানে গৌহাটীতে টেকস্টাইল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে। তাঁর বাবা ননীগোপাল দেববর্মার স্কুল শিক্ষক। এবং আই. পি. এফ. টি নেতা।

স্বাতী সাহা ঃ লেখিকা ডঃ অরুন্ধতী রায়ের ছোট বোন।

সুকান্ত দেববর্মা ঃ সুকান্ত দেববর্মার বাড়ি খয়েরপুরের কাছে দুর্গা চৌধুরী পাড়ায়। তিনি চম্পকনগরের লোক শিক্ষালয় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে স্কুল পরিদর্শকের পদে উন্নীত হয়েছেন। সুকান্ত বাবু ককবরক ভাষার একজন কৃতী লেখক। রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতির অংশ বিশেষ ককবরক ভাষায় অনবদ্যভাবে অনুবাদ করেছেন তিনি। তাঁর পিতা পুলিন দেববর্মা। সি. পি. আই (এম) পার্টির নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। পুলিনবাবু ১৯৬২ সালে ত্রিপুরার অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে হাজারীবাগ জেলে ছিলেন। সুকান্তবাবুর পূর্বপুরুষেরা নাকি ফরিদপুর জেলার লোক ছিলেন।

সুরেশ চৌধুরী ঃ সুরেশ চৌধুরীর বাড়ি দক্ষিণ চড়িলামে। তিনি একসময় চড়িলামের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কংগ্রেস পার্টি করে চলেছেন।

সুবীরশেখর অধিকারী ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের ছাত্র। বর্তমানে সুবীর আগরতলার বীরবিক্রম কলেজের সান্ধ্য বিভাগের পার্টটাইম লেকচারার।

সত্যরঞ্জন দেববর্মা ঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মার বাড়ি হেরমার পাশে গৌরকপরা পাড়ায়। সে সি. পি. আই কর্মী ও রঙমালা গাঁওসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান হরমণি দেববর্মার ছেলে।

সরোজ চৌধুরী ঃ আগরতলার এম. বি. বি কলেজের ইংরেজীর প্রাক্তন অধ্যাপক। নাটক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি।

সুভাষ ঃ সুভাষ দাস। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগেরহ কর্মী।

সুখেন্দু দেববর্মা ঃ শ্রীযুক্ত সুখেন্দু দেববর্মা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একজন তরুণ কৃতী অধ্যাপক। অধ্যাপক সুখেন্দু বাবুর বাড়ি চড়িলামের কাছে বিখ্যাত চন্তীঠাকুর পাড়ায়। অধ্যাপক তাঁর বাবার নাম সুধাংশু দেববর্মা ও মায়ের নাম কুঞ্জেশ্বরী। কিছুদিন আগে ডেপুটি কালেক্টর পথ থেকে অবসর নিয়ে আগরতলা কর্ণেল বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

সুবিমল দত্ত ঃ ত্রিপুরা সরকারের কৃষি বিভাগের জনৈক অফিসার।

সুকুমার দেব ঃ সুকুমার দেব একজন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। বিশ্রামগঞ্জ বাজারে তাঁর চেম্বার আছে। তিনি বিশ্রামগঞ্জের উপজাতি এলাকায় ডাক্তার হিসেবে খুবই জনপ্রিয় এবং নিদানের বিধান। বিশ্রামগঞ্জের একজন প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে।

সুবোধ সরকার ঃ আগরতলার হেড পোস্ট অফিসের পিওন।

সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ ঃ ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল। তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক। একসময় কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ছিলেন।

সুবল দে ঃ শ্রীযুক্ত দে আগরতলার একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক। তিনি 'স্যন্দন পত্রিকা'র সম্পাদক। তাঁর সম্পাদিত 'স্যন্দন পত্রিকা' ত্রিপুরায় খুব নাম করেছে এবং সার্কুলেশনের দিক থেকে 'দৈনিক সংবাদ'-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

স্বপন নন্দী ঃ স্বপন নন্দী একজন চিত্রশিল্পী। তিনি কলকাতার আর্ট কলেজের ছাত্র। বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি পর্যটন বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর। শিল্পী হিসেবে স্বপন নন্দী বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। ঘোড়ার ছবি আঁকায় তিনি একজন পারঙ্গম শিল্পী। একই ক্যানভাসে একাধিক ঘোড়ার মনোমুগ্ধকর ছবি আঁকতে পারেন তিনি। শিল্পী স্বপন নন্দী আগরতলার একজন অত্যন্ত উঁচু মানের আবৃত্তিকার। শিল্প-সংস্কৃতির জগতে ত্রিপুরায় স্বপন নন্দী একটি বিশেষ নাম। স্বপন বাবুদের মেলারমাঠের বাড়িকে সাতলাখী বাড়ি বলা হয়। স্বপনবাবুর বাবা একসময় সাতলাখ টাকার লটারী পেয়েছিলেন।

সুবিমল রায় ঃ শ্রীযুক্ত সুবিমল রায় ত্রিপুরা সরকারের শিল্প বিভাগের পি. আর. ও ছিলেন। ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর

খুব নাম আছে। ভালো রবীন্দ্র সংগীত গাইতে পারেন তিনি। পুরোনো দিনের আগরতলা সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

সঞ্জীব রায়ঃ সঞ্জীব রায়ের বাড়ি শিলিগুড়ি। তিনি আগরতলা থেকে প্রকাশিত ও শুভব্রত দেব সম্পাদিত একুশ শতক পত্রিকায় চিঠি লিখতেন।

সুকুমার কর্তাঃ সুকুমার কর্তা ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোরের ছেলে। তাঁর ন্য দু'ভাইয়ের নাম কর্ণ কর্তা ও দুর্জয় কর্তা। মহারাজকুমারী কমলপ্রভা দেবীর আপন ভাই হলেন সুকুমার কর্তা। সুকুমার কর্তার বাড়ি কুঞ্জবনে মহারাজকুমারী কমলপ্রভার বাড়ির ঠিক পাশের।

সুদর্শন মুখোপাধ্যায়ঃ ত্রিপুরার রাজশিক্ষক অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের মানুষ সুদর্শন বাবু। তিনি একজন নামকরা লেখক। আগরতলার পুরনো দিনের রকমারি তথ্য তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়ে আসে।

সূর্য দেববর্মাঃ সূর্য দেববর্মার বাড়ি গোলাঘাটির কাছে পেকুয়ারজলায়। তিনি আমার পিসতুতো শালী পারুল দেববর্মার স্বামী।

সুকুমার মহাজনঃ সুকুমার মহাজন কাশ্মীরের লোক। মধ্যবনমালীপুরের নলিনী ঠাকুরের মেয়ে গীতা দেববর্মার স্বামী। গীতা যখন দিল্লীতে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী হয়ে ট্রেনিংয়ে ছিলেন, তখন সুকুমার মহাজনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সুকুমারবাবু দিল্লীর স্টেটসম্যান পত্রিকায় চাকুরী করতেন।

স্বর্ণময়ীঃ স্বর্ণময়ী দেববর্মণ। মধ্যবনমালীপুরের নলিনী ঠাকুরের শাশুড়ী, গিরিজা সুন্দরীর কন্যা।

সবোজ গুপ্তঃ কলকাতার ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার।

সলিল দেববর্মাঃ সলিল দেববর্মার বাড়ি আগরতলার রাধামোহন ঠাকুর সরণীতে। তিনি ককবরক ভাষার লিখিতরূপের অন্যতম রূপকার রাধামোহন ঠাকুরের প্রপৌত্র। তিনি বিগত বারে আগরতলা পুরসভার কাউন্সিলার ছিলেন। সি. পি. আই (এম) পার্টির প্রথম সারির নেতা সলিলবাবু। ত্রিপুরায় উপজাতি-বাঙালীর মধ্যে মৈত্রীবন্ধন অটুট রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন তিনি।

সতীশ রায়ঃ শ্রীযুক্ত সতীশ রায়ের বাড়ি আগরতলার কর্ণেল চৌমুহনীতে। তিনি 'ত্রিপুরা দর্পণ' এর সম্পাদক সমীরণের পিতৃদেব। সতীশবাবু একজন প্রবীণ ব্যক্তি হিসেবে আধুনিক আগরতলার গঠনপর্বের অনেক তথ্য জানেন। তাঁর বাড়িতে খুব ভোরে তাঁর প্রাতভ্রমণের সাথীদের জমজমাট চায়ের আড্ডা বসে প্রতিদিনই।

সাবিত্রী পালঃ শ্রীমতী পাল আগরতলা পুরসভা ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার।

সেকারামঃ মেঘালয়স্থিত নেপা (NEPA-North EAst Police Academy)'র ডাইরেক্টর।

সুজিত দেঃ আগরতলার 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার তরুণ সাংবাদিক।

সমীর দাসঃ গৌহাটী শহরের পি. আ. বি'র অফিস ইনচার্জ।

সূর্যকুমারঃ সূর্যকুমার দেববর্মা। সূর্যকুমার দেববর্মার বাড়ি লালসিংমোড়ার কাছে সুতারমোড়ায়। তিনি ত্রিপুরা জনশিক্ষা আন্দোলনের একজন কর্মী ছিলেন। পরে সি. পি. আই পার্টির কর্মী হিসেবে এলাকায় খুব নাম করেছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট নেতা সুধন্বা দেববর্মার আপন জ্যাঠতুতো দাদা। সূর্যকুমার দেববর্মার জামাই হলেন স্বনামধন্য কমিউনিস্ট নেতা মোহন চৌধুরী।

সোমা চক্রবর্তীঃ সোমা কলকাতার মেয়ে। পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম সংগঠক পার্থ সেনগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বকোষ পরিষদ' এর কর্মী।

সোমাকুমারী দেববর্মাঃ সোমার বাড়ি টাকারজলার কাছে গাঙঠাকুর পাড়ায়। সে আমার পিসতুতো শালী। আগরতলায় থেকে লেখাপড়া করে।

সুখরাম দেববর্মাঃ সুখরাম দেববর্মা ছিলেন সদরের এস. ডি. ও। আগরতলার নিজের অফিসে আততায়ীর হাতে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

সোনারামঃ সোনারাম দেববর্মা। ত্রিপুরার সদর উত্তরের সিধাই থানা লুঠের নায়ক কমিউনিস্ট নেতা মোহন চৌধুরীর একান্ত সহযোগী বন্ধু।

স্বপ্না দত্তঃ স্বপ্না দত্তর বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের বোলপুর শহরের বকুলতলায়। স্বপ্না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বান্ধবী। আমাদের সঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ করতো সে।

সৈয়দ মুজতবা আলীঃ বাঙলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক ও রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহভাজন ছাত্র।

সুনন্দা দেবীঃ সুনন্দা ভট্টাচার্য। ত্রিপুরার প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের স্ত্রী। তাঁরই মেলারমাঠ কোয়ার্টারের বাঙলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা ভীড় জমাতো। তাঁরই ঘরে বসে বাঙলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান)-এর জাতীয় পরিষদের সদস্যারা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ-থান্টের কাছে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা বন্ধ করার জন্যে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন।

সাহেদুর রহমান ঃ আগরতলায় বাঙলাদেশ ভিসা অফিসের প্রথম ভিসা অফিসার।

সুব্রত পাল ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিট অফিসার।

সুখদয়াল জমাতিয়া ঃ সুখদয়াল ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির একজন প্রথম সারির নেতা। তিনি ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন।

সুবীর ভৌমিক ঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের বি. বি. সি'র প্রধান। তাঁর বিখ্যাত বইয়ের নাম। সুবীর ভৌমিক আগরতলার ছেলে। পরে পি. টি. আই-এ কাজ করতেন। সুবীর ভৌমিকই মাদার তেরেসার মৃত্যুর খবর সর্বপ্রথম সারা পৃথিবীকে জানান এবং তাঁর এই কৃতিত্বের জন্যে তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করেন। তাঁর গবেষণামূলক লেখা ' Insurgent Cross Fire'.

সুমিত চক্রবর্তী ঃ সুমিত চক্রবর্তী দিল্লীর Mainstream পত্রিকার সম্পাদক এবং নিখিল চক্রবর্তী-রেণু চক্রবর্তীর ছেলে।

সতীশ বণিক ঃ সতীশ বণিকের বাড়ি বনমালীপুরে। তিনি একজন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি খুব গীতাভক্ত ছিলেন। ত্রিপুরার বিধানসভার কর্মী অন্নপ্রসাদ জমাতিয়াকে দিয়ে তিনি ককবরক ভাষায় গীতার অনুবাদ করিয়েছিলেন।

সঞ্জয় নাথ ঃ ডাঃ সঞ্জয় নাথ। ডাঃ নাথ আগরতলার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। আগরতলার ধলেশ্বরে তার একটি প্যাথলজিক্যাল লেবরার্টরী আছে।

সীমা দাশগুপ্ত ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের Controller of Examinations-এর কর্মী। সীমা সি. পি. আই (এম)-এর একজন নিষ্ঠাবতী কর্মী হিসেবে পরিচিত।

স্বপন জমাতিয়া ঃ ডাঃ স্বপন জমাতিয়া। জি. বি. হাসপাতালের চিকিৎসক।

রুমা সাহা ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অতিথি অধ্যাপিকা। ত্রিপুরার উপজাতিদের অর্থনীতির ওপর তিনি মৌলিক গবেষণার কাজে ব্রতী আছেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অমিতাভ সিনহার তত্ত্বাবধানে।

সমীর ঃ সমীর দাস। আমার ছেলে সুরঞ্জনের বন্ধু।

স্বপন মুখার্জী ঃ পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি ও All India Council for Mass Education and development-এর দীর্ঘদিনের নিরলস কর্মী। স্বপন ত্রিপুরায় বহুবার এসেছেন সাক্ষরতার কাজে।

সূর্যকান্ত ঃ ময়মনসিংহের বিখ্যাত জমিদার।

সুভদ্র সেন ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেনের পুত্র তিনি।

সুমন ঃ সুমন রায় বর্মণ। সুমন রায় বর্মণের বাড়ি আগরতলার ঠাকুরপল্লী রোডে। সি. পি. আই-এর বিশিষ্ট নেতা চিরব্রত রায় বর্মণের পুত্র সে।

সনাতন মুখার্জী ঃ হাওড়া কোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী।

সুধাংশু দেববর্মা ঃ সুধাংশু দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের কাছে বিখ্যাত চন্তীঠাকুর পাড়ায়। তিনি স্বনামধন্য চন্তীঠাকুরের দৌহিত্র ও লবঙ্গলতার পুত্র। সুধাংশু বাবু ডেপুটি কালেক্টরের পদ থেকে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করে কর্ণেল বাড়িতে বাড়ি কিনেছেন।

সুধারঞ্জন দেববর্মা ঃ সুধারঞ্জন দেববর্মার বাড়ি গোলাঘাটীর কাছে পেকুয়ারজলা গ্রামে। তিনি এস. ডি. ও ছিলেন। বর্তমানে ত্রিপুরা উপজাতি জেলাপরিষদের কৃষি বিভাগের দায়িত্বে আছেন। সুধাবাবু প্রথম জীবনে সংগীতচর্চা করতেন ও গান লিখতেন।

সত্যরঞ্জন দেববর্মা ঃ ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মা। জি. বি. হাসপাতালের নামকরা প্যাথলজিস্ট। আগরতলা অ্যাডভাইজর চৌমুহনীতে তাঁর একটা প্যাথলজিক্যাল লেবরেটরী আছে। তিনি স্বনামধন্য কমিউনিস্ট নেতা সুধন্বা দেববর্মার কন্যা রাণু দেববর্মাকে বিয়ে করেছেন।

সুজিত দে ঃ ডাঃ সুজিত দে। আগরতলার বিখ্যাত শিশু চিকিৎসক। তাঁর একদাদা বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্তর সহযোগী ছিলেন। পান্নালাল বাবু আগরতলায় এলে ডাঃ দে'র বাসায় থাকতেন।

সুনীল দাশগুপ্ত ঃ ত্রিপুরার প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা। তিনি সি. পি. আই-এর ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক। কমরেড দাশগুপ্ত সারাজীবন সি. পি. আই-এর সর্বক্ষণের কর্মী। শ্রমিক-মেহনতী মানুষের স্বার্থে হাসিমুখে দারিদ্র্য ভোগ করার অসীম ধৈর্য আছে তার। তিনি একজন খুব উঁচুমানের লেখক। কিন্তু একান্তভাবে আত্মপ্রচারে বিমুখ। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের সি. পি. আই-এর মুখপত্র 'ত্রিপুরার কথা' সম্পাদনা করে থাকেন।

সুখময় সেনগুপ্ত ঃ ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সুখময় বাবুরা রাজন্যশাসিত ত্রিপুরার লোক। কংগ্রেস নেতা হিসেবে তাঁর স্থান শচীন্দ্রলাল সিংহের পরেই। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে খুব সফল প্রশাসক হিসেবে তিনি নাম করেছিলেন। তাঁর সময়েই ত্রিপুরার

হাঁপানিয়া জুটমিল স্থাপিত হয়।

সুহাসিনী দেবী : সুহাসিনী দেবী ছিলেন বনমালীপুরের রোহিনী কুমার ভট্টাচার্যের স্ত্রী। রোহিনীবাবু রাজ আমলে ত্রিপুরার জাঁদরেল পুলিশ অফিসার ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাড়িতে স্বদেশীরা লুকিয়ে থাকতেন। সুহাসিনী দেবী তাঁদেরকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতেন ও সেবাশুশ্রূষা করতেন। তাঁর আপন ভাই নীরদ চক্রবর্তীও ছিলেন যুগান্তর-অনুশীলন দলের একজন বিপ্লবী। সুহাসিনী দেবীর চার ছেলে — অনিল, অমল, কমল ও শ্যামল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অনিল ভট্টাচার্য ত্রিপুরার অতি বিখ্যাত সাংবাদিক। তাঁর অপর পুত্র অমল ভট্টাচার্য ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের এস. পি। কমল ভট্টাচার্য আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু। কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামল ভট্টাচার্যের আখাউড়া রোডে বিভিন্ন সংবাদপত্রের একটা প্রসিদ্ধ দোকান আছে।

সাধন চৌধুরী : শ্রীযুক্ত সাধন চৌধুরীর বর্তমান বাড়ি প্যালেস কম্পাউন্ডের ওয়েস্ট গেটে। তিনি একসময় আগরতলায় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ছিলেন। একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তি খুব উজ্জ্বল। একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কংগ্রেস কর্মী হিসেবেও আগরতলায় খ্যাতি আছে তাঁর। আগরতলার বহু বিষয়ের খুঁটিনাটি খবর জানেন তিনি। তাঁর ভাগ্নে এস. আর. নন্দী ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন গুরুত্ব পদে আসীন ছিলেন।

সেজদা : শক্তিরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরী। সেজদা আমার থেকে মাত্র আড়াই বছরের মতো। পিঠোপিঠি আমরা দু'ভাই মানুষ হয়েছি আমাদের বাঙলাদেশের 'খাজরা'র বাড়িতে। সেজদা কলকাতায় বড়দা-সেজদার কাছে থেথে লেখাপড়া করতেন। স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি চলে যান জামসেদপুরে টেলারিং বিদ্যায় পারদর্শী হতে। বড়দা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরীই তাঁকে এই অভিনব বিদ্যার্জনে পাঠান। সেখানে তিনি মুসলমান কারিগরদের সঙ্গে থেকে হাতেনাতে খুব ভালো করে টেলারিং বিদ্যা আয়ত্ত করেন। এবং পরে কলকাতায় ফিরে গ্রান্টস্ট্রীটের 'লিবার্টি টেলার্স' কোর্টের কাজ শেখেন। বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে তাঁর মতো উঁচুমানে খলিফা আর নেই বললে চলে। পরে তিনি আমাদের নববারাকপুরে দোকান দেন এবং অচিরেই তিনি একজন বিখ্যাত খলিফা হিসেবে নাম করেন। সারা বনগাঁলাইনের লোক তাঁর 'স্টাইল হাউস' টেলারিংশপে এসে ভীড় জমান। পরে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সামনে 'স্টাইল ওয়ার' নামে আরেকটি দোকান খোলেন। সেজদা নববারাকপুরের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি। আমি যখন কলকাতায় হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করতাম তার সিংভাগ খরচ চালাতেন তিনিই। এমনকি আমি ত্রিপুরায় এসে ককবরক ভাষার গবেষণার কাজে ব্রতী হলে তিনি আমাকে প্রতিমাসে টাকা পাঠাতেন। আমাদের পরিবারের সমস্ত জামাকাপড় তিনি পাঠিয়ে দিতেন। ক'বছর আগে আমি অসুস্থ হয়ে কলকাতার নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে দীর্ঘদিন থাকলে তার যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই আমার।

সরোজ চন্দ : যতদূর জানি সরোজ চন্দ অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের সর্বশেষ সম্পাদক ছিলেন। তারপর হাজারীবাগ জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি নবগঠিত সি. পি. আই (এম) দলে যোগদান করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আবার সি. পি. আই-এ ফিরে আসেন। এই সময় তিনি সি. পি. আই-এর সর্বভারতীয় মুখপত্র 'নিউ এজ' (New Age)-এ লিখতেন। একসময় তিনি সি. পি. আই-এর ত্রিপুরা পার্টির মুখপত্র 'ত্রিপুরার কথা'ও সম্পাদনা করেছেন। সি. পি. আই-এ থাকার সময় একবার পূর্বজার্মানী পরিভ্রমণে যান তিনি। কিন্তু দীর্ঘকাল সি. পি. আই-এ থাকার পর আবার সি. পি. আই (এম) পার্টিতে চলে যান। এবং সেখানে গিয়ে তিনি সি. পি. আই (এম) পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'পিপলস ডেমোক্রেসি'তে লিখতে শুরু করেন। কমরেড সরোজ চন্দ একজন তাত্ত্বিকনেতা ও সুবক্তা। ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের খুঁটিনাটি তথ্য তাঁর নখদর্পণে। ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের কেউ কোনো ভুল তথ্য পরিবেশন করলে তা তাঁর নজর এড়ায় না এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার প্রতিবাদও করতে কসুর করেন না। শুধু কমিউনিস্ট পার্টির কথা কেন, ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস ও অন্যান্য পার্টির ইতিহাস তিনি সমানভাবে জানেন। আসলে সরোজ চন্দের মতো একজন ইতিহাস সচেতন জননেতা ত্রিপুরায় নেই। তাঁর কলমও খুব ধারালো এবং খুব তথ্যভিত্তিক। সেই কলমে অসংখ্য মূল্যবান লেখা লিখে চলেছেন তিনি। ত্রিপুরার নানা বিষয়ে তথ্য জানার জন্যে অধ্যাপক-গবেষকেরা তাঁর কাছে এসে উপকৃত হন। গণতান্ত্রিক ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাস লেখার কাজে অমূল্য তথ্য সরবরাহ করতে পারেন সরোজ চন্দ। বর্তমানে তিনি সি. পি. আই (এম) পার্টির ক্ষেতমজুর ফ্রন্টের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে চলেছেন।

সিরাজুদ্দীন আমেদ : ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের 'প্রফেসর' এবং কলা ও বাণিজ্য ফ্যাকাল্টির ডীন। তিনি স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়স্তর পর্যন্ত শান্তি নিকেতনে পড়াশুনো করেছেন। পরম পন্ডিত ডক্টর আমেদ। ভাষাতত্ত্বে তাঁর অগাধ জ্ঞান। তিনি 'রবীন্দ্রনাথের ভাষা চিন্তা' বই লিখে তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। ডঃ আমেদ হুগলী জেলার লোক। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী রাবেয়া খাতুন দর্শন শাস্ত্রে এম. এ এবং আগরতলার তুলসীবতী স্কুলের শিক্ষিকা।

সরিৎ ভৌমিক : ডঃ সরিৎ ভৌমিক বর্তমানে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজি বিভাগের অধ্যাপক। তিনি নর্থ বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় ত্রিপুরায় আসতেন চা বাগানের ওপর তথ্য সংগ্রহ করতে। এই সময়ে তিনি আগরতলায় বিয়ে করেন অনুরূপা মুখার্জী (দেববর্মা)'র ভাইঝি মীনাক্ষী দেববর্মণকে। এই বিয়ের ঘটকালি করি আমি। ডঃ ভৌমিক ত্রিপুরায় এলেই আমার শ্বশুরবাড়ির উপজাতীয় গ্রাম হেরেমায় গিয়ে থাকতেন এবং উপজাতিদের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে

আলোচনা করতেন।

হাসি রায় ঃ শ্রীমতী হাসি রায়ের বাপের বাড়ি আগরতলায় কর্ণেল বাড়ি। স্বনামধন্য মহিম কর্ণেল ছিলেন আপন জ্যাঠামশায়। তাঁর বিয়ে হয়েছিলো ত্রিপুরার রাজা নক্ষত্র রায়ের বংশধর প্রতাপ রায়ের পুত্র ও ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডল সমিতির সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা। প্রভাত রায় বংশীঠাকুর (অমরেন্দ্র দেববর্মা)-এর সঙ্গে একসঙ্গে রাজনীতি করতেন। শ্রীমতী রায় ত্রিপুরার এই দু'জন ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন জননেতা সম্পর্কে অনেক কথাই জানেন। হাসি রায়ের স্বামী একটি জনসভায় যেতে গাড়ি একসিডেন্টে মারা গেলে তাঁর আর দুঃখের সীমা থাকে না। অতিকষ্টে ছেলেপিলে মানুষ করে জীবনের শেষপ্রান্তে এসেছেন। তাঁর এক পুত্র শ্রীযুক্ত কিশোর রায় (দেববর্মণ) ত্রিপুরা সরকারের একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার। ইতিপূর্বে তিনি ত্রিপুরার গভর্নরের এডিকং ছিলেন। বর্তমানে পুলিশ বিভাগের এস. পি। হাসি রায় চিরকালই বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। কৃষ্ণনগরের বামফ্রন্টের বিভিন্ন মিটিংয়ে তাঁকে সভাপতির আসনে বসতে দেখা যায়। বর্তমানে তিনি বাড়ি করে তাঁর বাপের বাড়ি কর্ণেল বাড়িতেই থাকেন। আর সেখানেই আছে তাঁর 'আলেখবাবা সংঘ' নামে একটি মন্দির। সেই মন্দিরের তিনি মুখ্য সেবিকা। রোজ ভোরে আলেকবাবা সংঘের মধুর ভজনগানে এলাকার সকলের ঘুম ভেঙে যায়। জীবনের শেষপ্রান্তে এলেও শ্রীমতী রায়ের চেহারা চোখে পড়ার মতো। তাঁর মধুর ব্যবহার ও আন্তরিক আলাপচারিতা সকলে মুগ্ধ করে।

হরিমোহন রিয়াং ঃ হরিমোহন রিয়াংয়ের বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোড়ার কাছে পূর্ব চড়কবাই গ্রামে। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে আমি তাঁর বাড়িতে ককবরক ভাষা গবেষণার জন্যে ভাষা ক্যাম্প করেছিলাম। তখন তিনি আমাকে ককবরকের রিয়াং উপভাষার তথ্য সরবরাহ করেছিলেন।

হরচন্দ্র ঃ হরচন্দ্র দেববর্মা। হরচন্দ্র দেববর্মার বাড়ি গোলাঘাটির কাছে পুনিরাম ঠাকুর পাড়ায়। হরচন্দ্রবাবুর ঠাকুর মায়ের বাপের বাড়ি আমার শ্বশুর বাড়ি হেরমা গ্রামে। সেই সম্পর্কে তিনি আমার কাকাশ্বশুর। কর্মজীবনে হরচন্দ্র দেববর্মা একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি বিয়ে করেছেন লালসিংমোড়ার কাছে যজ্ঞ ঠাকুর পাড়ায় গোবিন্দ মাস্টার (দেববর্মা)'এর ছোট বোনকে। তাঁরা স্বামী স্ত্রী মিলে ছেলে-মেয়েদের মানুষের মতো মানুষ করেছেন। তাঁর দু'মেয়ে। দু'জনেই ইঞ্জিনীয়ার। আর একমাত্র ছেলে ডাক্তারি পড়ে। হরচন্দ্রবাবু ত্রিপুরা উপজাতির গঠনপর্বে একজন ভালো কর্মী ছিলেন।

হরিনাথবাবু ঃ হরিনাথ দেববর্মা। হরিনাথ বাবুর বাড়ি লালসিংমোড়ার কাছে সুতারমোড়ায়। তাঁর পূর্বপুরুষেরা কসবাকালীবাড়ির পার্শ্বস্থ এক উপজাতীয় জনপদে থাকতেন। সেখান থেকে একসময় তাঁরা সুতারমোড়ায় চলে আসেন। হরিনাথ পাহাড়ের ভেতর থেকে সেকবার কাম করতেন। তাঁর পেশা ছিলো সোনা-রূপোর অলঙ্কার তৈরী করা। এবং এই বৃত্তি অবলম্বন করে তিনি খুব ধনী হয়েছিলেন সুতারমোড়া গ্রামে। এই সচ্ছল পরিবারের ছেলে হরিনাথবাবু বি. এ. পাশ করে বিশালগড়ের কাছে কড়ইমোড়া হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। যতদূর জানা যায় তিনি ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদেও কিছুদিন ছিলেন। হরিনাথ দেববর্মা প্রথম জীবনে অবিভক্ত সি. পি. আই পার্টির সংস্পর্শে আসেন। এবং যুব কর্মী হিসেবে নির্বাচনের সময় কাজও করতেন। পরে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা মিলে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি গঠন করেন। দীর্ঘদিন তিনি ওই পার্টির নেতা ও সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৭ সালে তিনি চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। আশির মহাজাতি দাঙ্গার সময় তিনি দীর্ঘদিন আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন হলে একসময় যুব সমিতি-কংগ্রেস জোট সেখানে ক্ষমতায় আসে। আর হরিনাথবাবু জেলা পরিষদের চীফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার (CEM)-এর পদ অলঙ্কৃত করেন এবং জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে তিনি তাঁর দক্ষতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। তাঁর হাতেই জেলা পরিষদের আইনসভার সুরম্য অট্টালিকাটি গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তিনি মতাদর্শ কারণে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি ত্যাগ করেন এবং তাঁর অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে প্রথমে টি. টি. এন. সি এবং পরে আই. পি. এফ. টি এই উপজাতীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলটি গড়ে তোলেন। সদ্যসমাপ্ত উপজাতি জেলাপরিষদ নির্বাচনে এই দল বামফ্রন্টকে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে। আর এই দলের সর্বেসর্বা সভাপতি হলেন হরিনাথবাবু। হরিনাথ দেববর্মা একজন যাকে বলে ফায়ারব্রান্ড বক্তা। তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে পারেন। তাঁর মতো ফায়ারব্রান্ড বক্তা ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে আর কেউ নেই। সব মিলিয়ে হরিনাথ দেববর্মা ত্রিপুরার রাজনৈতিক জগতের একটি বিশেষ নাম। হরিনাথবাবু সম্পর্কে আমার বড়োশালার আপন মামাশ্বশুর।

হরিচরণ বাবু ঃ হরিচরণ দেববর্মা। হরিচরণ দেববর্মার বাড়ি চাঁড়ুলামের হেরমা গ্রামে। তাঁর বাবার নাম গিরিমণি কপরা (দেববর্মা)। তিনি ছিলেন হেরমার তালকুদার। হরিচরণবাবুর ঠাকুরদা বিশ্রামগঞ্জের শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে হেরমা গ্রামে জামাই উঠে ছিলেন এবং স্বনামধন্য মনাঠাকুরের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। মেয়ের বিয়েতে মনাঠাকুর একটা আস্ত গাছের গুড়ি দিয়ে সিন্দুক বানিয়ে দিয়েছিলেন। শতবর্ষ আগে গাছের গুড়ির এই সিন্দুকটি হরিচরণবাবুর ঘরে আছে। হরিচরণ বাবু হেরমার একজন কৃষক তিনি প্রথম জীবনে খুব সৌখীন ছিলেন এবং একটা ঘোড়াও কিনেছিলেন বিবাহযোগ্য মেয়েদের খুশী করার জন্যে। তিনি হেরমা গ্রামের একজন প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক এবং কীর্তনীয়া। তিনি প্রায় সব রকমের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারেন। সম্পর্কে তিনি আমার কাকাশ্বশুর। আমার বিয়ের সময় তিনিই আমাকে সুন্দরভাবে কাপড় পরিয়ে দিয়েছিলেন।

হামারী জমাতিয়া ঃ হামারী ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার কন্যা। হামারী হলো ককবরক নাম।

বাঙলায় অর্থ হলো কল্যাণময়ী। হামারী এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। হামারী কত্থক নৃত্যের একজন কৃতী ছাত্রী। ইতিমধ্যে সে কত্থক নৃত্যে স্নাতক হয়েছে।

হীরকেন্দু ঃ হীরকেন্দ্র গাঙ্গুলী। তার ডাকনাম মুক্কা। সে পশ্চিমবঙ্গের সি. পি. আই নেতা অধ্যাপক কমলেন্দু গাঙ্গুলীর একমাত্র ছেলে। তার মা অধ্যাপিকা ঊষা গাঙ্গুলী বিখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী। এবং 'রঙ্গকর্মী' এই হিন্দী নাট্য সংস্থার কর্ণধার।

হিরুবাবু ঃ হিরুবাবু চড়িলামের বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর পিতা আগরতলার বিখ্যাত নিউস্টার হোস্টেলের মালিক স্বনামধন্য নৃপেন্দ্র দত্তমজুমদার। হীরুবাবু একসময় কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে পড়তেন। এখন চড়িলামের বাড়িতেই থাকেন। সম্পর্কে বিজয় মজুমদারের আপন ভাই হীরুবাবু। তাঁর বুদ্ধিদৃপ্ত আলাপচারিতা সকলের মন কাড়ে।

হরেন্দ্র মাস্টার ঃ হরেন্দ্র দেববর্মা। হরেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের কাছে চন্ডীঠাকুর পাড়ায়। তিনি স্বনামধন্য চন্ডীঠাকুরের এক পুত্র। তিনি ছিলেন স্কুলমাস্টার। একদিন গোলাঘাটির দিক থেকে স্কুল থেকে ফেরার পথে দিনেদুপুরে তিনি খুন হয়ে যান।

হরলাল দেবনাথ ঃ হরলাল দেবনাথ অ্যাডভোকেট বীরচন্দ্রবাবুর বাড়িতেই আবাল্য মানুষ হন। তিনি বীরচন্দ্রবাবুর বড়ো ভাই মণিঠাকুরের সংসারেই থাকতেন পুত্রবৎ এবং সেখানেই থেকে লেখাপড়া করেন। হরলালকে সকলে বীরচন্দ্র দেববর্মাদের পরিবারের ছেলে বলে জানতো। বীরচন্দ্র দেববর্মা যখন এম. পি হয়ে দিল্লী থাকতেন, তখন হরলাল ত্রিপুরা সরকারের ইনডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে চাকুরী পেয়ে দীর্ঘদিন দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনের সেলস এম্পোরিয়ামে চাকুরী করেছেন। বর্তমানে তিনি আগরতলায়। বীরচন্দ্রবাবুর মৃত্যু শায্যায় উপস্থিত ছিলেন হররাল। হরলাল বিয়ে করেছেন ত্রিপুরার সাবেক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মনোমোহনবাবুর ছোট মেয়েকে। বীরচন্দ্রবাবু মারা গেলে হরলাল বীরচন্দ্রবাবুর সংসারের সবকিছু তাঁর আত্মীয়স্বজন ও সি. পি. আই পার্টিকে বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর নিজের বাড়ি প্যালেস কম্পাউন্ডের ওয়েস্ট গেটে চলে আসেন। এই বাড়িটি তাঁর শ্বশুর মনোমোহনবাবু তাঁর ছোট মেয়েকে তৈরী করে দিয়ে গেছেন। হরলাল এখন উপজাতি পরিবারের বাঙালী জামাই।

হরমণি দেববর্মা ঃ হরমণি দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের কাছে রঙমালা গাঁওসভার গৌরকপরা পাড়ায়। তিনি সি. পি. আই পার্টির একজন বিশ্বস্ত কর্মী। কিছুদিন আগে তিনি রঙমালা গাঁওসভার সি. পি. আই-এর চেয়ারম্যান ছিলো। তাঁর বড়ো একটা রবার বাগান আছে।

হরিপদ ঃ হরিপদ দেববর্মা। হরিপদ দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের কাছে রামনগরের খামার বাড়িতে। তাঁর পিতাব নাম দুর্গাচরণ দেববর্মা। তিনি চাকুরী করেন ত্রিপুরা সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি -পর্যটন বিভাগে। হরিপদ দেববর্মা ককবরক ভাষার একজন অগ্রগণ্য ছোটগল্পকার। তাঁর লেখা ছোটগল্পের সংকলন 'জালাই তকপুপু' গত বছর আগরতলার বইমেলায় ককবরক ভাষার শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন হিসেবে ত্রিপুরা সরকারের বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে। হরিপদ বিয়ে করেছে আমার বড়ো মামাশ্বশুরের মেয়ে বাই পরিমল (পরিমল দিদি)-এর মেয়ে ঊষা রাণীকে। সেই সম্পর্কে সে আমার জামাই। হরিপদ বাড়ি করেছে নাজির বাড়িতে।

হীরালাল ঃ হীরালালবাবুর দীর্ঘদিনের একটা চা-রুটির দোকান আছে আগরতলার অ্যাডভাইজার চৌমুহনীতে। ওই এলাকায় হীবালালের চায়ের দোকান বললে সকলেই চেনে।

হরিহর সাহা ঃ শ্রীযুক্ত হরিহর সাহার বাড়ি আগরতলার টাউন হলের পাশে। তিনি উজির বাড়ির জামাই। তাঁর স্ত্রী সুরমা দেববর্মণ স্বনামধন্য শিল্পী অনিলকৃষ্ণ ঠাকুরের মেয়ে। হরিহরবাবু এম. এ পাশ করে প্রাচ্যভারতী স্কুলে মাস্টারি করতেন। তিনি সি. পি. আই পার্টির সঙ্গে যুক্ত। একসময় তিনি 'ইসকাস (ISCUS)-এর সেক্রেটারী ছিলেন এবং তাঁর নিজ বাসভবনে একসময় খুব জমজমাটভাবে চলতো ইসকাস ভবন। ইসকাস ভবনে কলকাতার মনীষা গ্রন্থালয়ের একটা ব্রাঞ্চও ছিলো। সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত সব ধরনের বই অতি স্বল্প মূল্যে পাওয়া যেতো। হরিহরবাবুব ইসকাস ভবনে একসময় রুশভাষাও শেখানো হতো। সোভিয়েত ইউনিয়নে বেড়াতেও গেছেন হরিহরবাবু। কলকাতার সোভিয়েত কনসুলেট অফিসের রুশ কূটনীতিকেরা হরিহরবাবুকে হরিহর খাখা বলে ডাকতেন। সাবেক ইসকাস ভবনে এখন 'জনসেবা পরিষদ' এর অফিস হয়েছে। সেখানেও হরিহরবাবু কর্ণধারের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

হরেন্দ্র দেববর্মা ঃ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র দেববর্মার বাড়ি চড়িলামের রামনগরে। তাঁর পিতার নাম হরিরাই দেববর্মা। তাঁদের রামনগরের ধনাচরের বাড়িতে কমিউনিস্ট নেতারা গিয়ে থাকতেন। হরেন্দ্রবাবু ত্রিপুরা সরকারের চাকুরী জীবন থেকে অবসরর গ্রহণ করে এখন আগরতলায় নাজির বাড়িতে থাকতেন। তিনি নাজির বাড়ির জামাই।

হীরেন্দ্র শূর ঃ অধ্যাপক হীরেন শূর ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ত্রিপুরার ওপর তাঁর ইতিহাসের বই আছে। ওই বইয়ে রাজন্য ত্রিপুরার অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। হীরেন শূর মশায়ের পূর্বপুরুষেরা রাজ আমলের লোক এবং থাকতেন উদয়পুর বিভাগে। বর্তমানে ডক্টর শূর দক্ষিণ বনমালীপুরে বাড়ি করেছেন। ইতিহাসের জনপ্রিয় অধ্যাপক হিসেবে। ডক্টর শূরের খ্যাতি আছে। তাঁর কাছে ত্রিপুরার প্রচিন ইতিহাস বিষয়ক অনেক দলিল আছে বলে জানা যায়।

হেমন্ত দেববর্মা ঃ হেমন্ত দেববর্মার বাড়ি পুরনো আগরতলা'র কাছে বিখ্যাত দুর্গা চৌধুরী পাড়ায়। হেমন্ত দেববর্মা ছিলেন ত্রিপুরার জনশিক্ষা সমিতির প্রথম সেক্রেটারী। তাঁর গ্রামে তাঁরই উদ্যোগে ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জনশিক্ষা সমিতির চারস্তম্ভ — সুধন্বা-হেমন্ত-দশরথ-অঘোর। এই ব্যক্তি চতুষ্টয়ই রাজ আমলের পরে ত্রিপুরার উপজাতিদের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতেন। জনশিক্ষা সমিতি গঠনের মূলে হেমন্ত দেববর্মার অবদান সব থেকে বেশী। হেমন্ত দেববর্মা অবিভক্ত সি. পি. আই পার্টির নেতা ও এম. এল এ ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি নবগঠিত সি. পি. আই (এম) পার্টিতে যোগদান করেন। আশির জাতিদাঙ্গার সময় তাঁর অতিবিখ্যাত ও ঐতিহাসিক গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। সেই আঘাত তিনি ভুলতে পারেননি। এবং তখন থেকেই তিনি অনেকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং কয়েক বছর পরেই মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরে গায়ক মহেন্দ্র দেববর্মা তাঁর 'ইয়াপ্রি' পত্রিকায় কমরেড হেমন্ত দেববর্মা ও জনশিক্ষা আন্দোলন নিয়ে একটা বিশেষ সংকলন প্রকাশ করেছিলেন।

হেমপ্রতিভা ঃ হেমপ্রতিভা দেববর্মণ। হেমপ্রতিভার বাড়ি মধ্য বনমালীপুরে। তাঁর স্বামীর নাম নলিনী ঠাকুর (দেববর্মা)। তিনি সি. পি. আই. নেতা অঘোর দেববর্মার শাশুড়ী। তাঁর তিন ছেলে — নিতাই, গৌরাঙ্গ ও ভানুবিকাশ। আর মেয়েরা হলেন — দুলালী, গীতা ও যমুনা। তিনি খুব কমিউনিস্ট ভক্ত ছিলেন। এ নিয়ে তাঁর স্বামীর সঙ্গে সবসময় মতপার্থক্য ছিলো। দশরথ দেব, সুধন্বা দেববর্মা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অনেক দিন ভানুপ্রতিভা দেবীর আতিথ্যে ছিলেন। এবং তিনি তাঁদেরকে সেবাশুশ্রূষা করতেন।

হরিদাস ভট্টাচার্য ঃ হরিদাস ভট্টাচার্যের বাড়ি আগরতলার কৃষ্ণনগরের পদ্মপুকুরে। জানা যায় মাত্র ৩০০ টাকায় তিনি তাঁর বর্তমান বাড়িটি প্রকাশ ঠাকুরের কাছ থেকে কিনে ছিলেন। এই বাড়িটি ছিলো একটা পোড়ো বাড়ি। প্রকাশ ঠাকুর ভূতের উৎপাতে ওই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বনমালীপুরে চলে গিয়েছিলেন। হরিদাস ভট্টাচার্য ছিলেন ব্যাঙ্কের মালিক এবং লালুকর্তার সঙ্গে তাঁর অরুন্ধতীনগরের পাশে চা বাগানের যৌথ শেয়ার ছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লালুকর্তা (মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর) তাঁকে খুব একটা আস্থার সঙ্গে নিতে পারেননি। ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্যের পিতা হলেন হরিদাস ভট্টাচার্য।

হিরণকান্তি দেববর্মা ঃ হিরণকান্তি দেববর্মার বাড়ি আগরতলার এডভাইজর চৌমুহনীতে। তিনি তিনি এডভাইজার জিতেন ঠাকুরের ছেলে। ভালো ফুটবলার হিসেবে তাঁর নাম ছিলো। ঢাকা শহরেও গিয়ে তিনি খেলা করেছেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন আর্মির কর্ণেল। পুরসভার বিগত নির্বাচনে তিনি কৃষ্ণনগরের ৬নং কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

হিমাদ্রী দেববর্মা ঃ হিমাদ্রী দেববর্মা চাকুরী করেন ত্রিপুরা হ্যান্ডলুম এন্ড হ্যান্ডিক্র্যাফটস কর্পোরেশনের জেল রোডের অফিসে। তিনি একজন কর্মচারী নেতা এবং সি. পি. আই (এম) পার্টির বিশিষ্ট কর্মী। সুবক্তা হিসেবে তাঁর নাম আছে। থাকেন কৃষ্ণনগরের সুপুরি বাগানে।

হরিদাস চক্রবর্তী ঃ কংগ্রেস নেতা প্রিয়দাস চক্রবর্তীর দাদা।

হরিদাস আচার্য্যি ঃ শ্রীযুক্ত হরিদাস আচার্যের বাড়ি উত্তর চড়িলামের নতুন বাজারের কাছে। তিনি বিশিষ্ট হস্তরেখা বিশারদ ও পরম সংস্কৃত পন্ডিত। একসময় চড়িলামে সম্মানি‿ কংগ্রেস নেতা হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করেছেন।

হরকিষাণ সিং সুরজিৎ ঃ সি. পি. আই (এম) পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

হীরেন কর ঃ কলকাতার গড়িয়াহাট বাজারের প্রসিদ্ধ শাক বি[illegible]। পূর্ব নিবাস ময়মনসিং জেলায়।

হীরালাল সেনগুপ্ত ঃ ত্রিপুরার অতি জনপ্রিয় গণশিল্পী। বামপন্থী গণশিল্পী হিসেবে ত্রিপুরায় তাঁর জুড়ি নেই। ত্রিপুরাতে মিছিল-মিটিংয়ে গণসংগীতের সুদৃঢ় ভিত তিনিই তৈরী করেছেন, তিনি এই বিষয়ে পুরোধা পুরুষ। হীরালালবাবু একজন উঁচুমানের মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক লেখকও। ত্রিপুরার উপজাতীয় গণসংগীতের ওপর গবেষণামূলক কাজ করছেন তিনি।